দৈনন্দিন জীবনে
ইসলাম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

লেখকমণ্ডলী

সম্পাদনা পরিষদ
সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম
লেখকমণ্ডলী
সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত

ইফা প্রকাশনা : ১৯৭৯/১০
ইফা গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-0560-7

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০০

একাদশ সংস্করণ
জুন ২০১৩
আষাঢ় ১৪২০
শাবান ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
খিজির হায়াত খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪৫৬.০০ টাকা মাত্র

DAINANDIN ZIBANE ISLAM (Islam in Daily Life) : Written by some research scholars and edited by Board of Editors, Published by Nurul Islam Manik, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 456.00 ; US Dollar : 20.00.

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ৩৩-১২০

ইসলাম পরিচিতি	৩৩
ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম	৩৫
ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা	৩৬
ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম	৩৭
ঈমান, আমল ও ইহ্‌সানের নাম দীন	৩৯
আল্লাহ্‌	৪১
তাওহীদ-একত্ববাদ	৪৪
মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলী	৪৭
সৃষ্টি রহস্য	৫৩
নবী-রাসূল	৫৫
নুবূওয়াত ও রিসালাত : প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য	৫৭
ইস্‌মতে আম্বিয়া–নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া	৫৮
খতমে নুবূওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৬১
আল-কুরআনের আলোকে খতমে নুবূওয়াত	৬২
হাদীসের আলোকে খতমে নুবূওয়াত	৬৪
ইজ্‌মা ও যুক্তির আলোকে খতমে নুবূওয়াত	৬৬
মনীষীদের দৃষ্টিতে খতমে নুবূওয়াত	৬৬
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মহব্বত ও অনুসরণ	৬৮
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শাফা'আত	৭০
মু'জিযার তাৎপর্য	৭৩
মু'জিযা ও যাদু	৭৫
মু'জিযা ও কারামত	৭৫
ইস্‌তিদরাজ	৭৬
সাহাবায়ে কিরাম	৭৬
আল-কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা	৭৬
হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা	৭৮
মনীষীদের দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা	৮০
ফিরিশ্‌তা	৮২
আসমানী কিতাবসমূহ	৮৩
আসমানী কিতাবের সংখ্যা	৮৩
কুরআন পরিচিতি	৮৪

তাক্দীর : সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ৮৬
তাক্দীরের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব ৮৭
তাক্দীর সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত ৮৮
তাক্দীর লিপিবদ্ধ করার হিক্মাত ৮৯
তাক্দীরের সঙ্গে তাদ্বীরের কোন সংঘাত নেই ৮৯
তাক্দীর সম্পর্কে বিতর্ক ৯১
আখিরাত : ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ৯১
আখিরাতের উপর ঈমান আনার আবশ্যকতা ৯২
মৃত্যু ও বরযখ ৯৩
কিয়ামত ও পুনরুত্থান দিবস ৯৫
জান্নাত ও জাহান্নাম ৯৭
কুফর ৯৯
কুফরী কাজ ও কথা ১০১
শিরক-এর বিবরণ ১০২
কবীরা গুনাহ্ ১০৩
কবীরা গুনাহ্সমূহের সংখ্যা ১০৪
এক নযরে কবীরা গুনাহ্সমূহ ১০৫
নিফাক-এর বিবরণ ১০৭
বিদ্'আত-এর বিবরণ ১০৯
কুসংস্কারের বিবরণ ১১০
গ্রন্থপঞ্জি ১১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশু-কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম ১২১-১৭৬

শিশু আল্লাহ্র দেওয়া শ্রেষ্ঠ নি'আমত ১২১
শিশুর প্রতি মহানবী (সা)-এর ভালোবাসা ১২৩
শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব ১২৫
মাতৃগর্ভে শিশুর বিকাশে পিতামাতার দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলাম ১২৬
শিশুর প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ও স্বভাবজাত ১২৬
শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ১২৮
কন্যা সন্তানের প্রতি ইসলামের বিশেষ বিবেচনা ১৩০
সন্তান প্রসবকালীন করণীয় ১৩১
নবজাতকের আগমনে আনন্দ প্রকাশ ১৩১
নবজাতকের জন্য করণীয় ১৩২
কানে আযান ও ইকামাত বলা ১৩২
তাহ্নীক—নবজাতককে মিষ্টিমুখকরণ ১৩৩

তাহ্‌নীকের উপকারিতা ১৩৪
নবজাতক শিশুকে শালদুধ পান করানো ১৩৫
শিশু নামকরণ ১৩৬
নামের প্রভাব ১৩৬
মুহাম্মদ নামে নামকরণ ১৩৭
মুসলিম নামের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা ১৩৮
বিকৃত নামে ডাকা ১৩৮
আকীকা ১৩৯
ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে আকীকা ১৩৯
আকীকার গুরুত্ব ১৩৯
আকীকার সময় ১৩৯
আকীকার সংখ্যা ১৪০
আকীকার পশু ও তার বয়স ১৪০
আকীকার পশুর গোশ্‌ত ১৪১
আকীকার কল্যাণসমূহ ১৪১
অন্যের পক্ষ থেকে আকীকা ১৪১
উত্তম আকীকা ১৪২
আকীকার কুসংস্কার ১৪২
আকীকার দু'আ ১৪৩
শিশুর মাথা মুণ্ডানো ১৪৩
শিশুর মুণ্ডিত মস্তকে সুগন্ধি মাখা ১৪৪
শিশুর মাথা মুণ্ডানোর হিক্‌মাত ১৪৫
শিশুর মাথা মুণ্ডানোর পর সাদাকা ১৪৫
শিশুর প্রথম কালাম ১৪৫
শিশুর খাৎনা ১৪৬
শিশুর খাৎনার সময়কাল ১৪৬
খাৎনার কুসংস্কার ১৪৭
মায়ের দুধ পান করানো সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১৪৭
কৃত্রিম দুধের অপকারিতা ১৪৯
শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খাদ্য ও পানীয় নির্বাচন ১৪৯
গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনী মায়ের খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা ১৫০
শিশুর নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম ১৫১
শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতা ১৫১
রোগব্যাধি থেকে সতর্কতা অবলম্বনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১৫২
শিশুর জীবনরক্ষা ও পরিবর্ধনে পিতামাতার দায়িত্ব ১৫৩
শিশুর সুন্দর জীবন গঠনে সচেতনতা ১৫৩
শিশুর শিক্ষা ১৫৪

পারিবারিক পরিবেশে শিশুর শিক্ষা ১৫৪
শিশুর বিনোদন ও শরীরচর্চা ১৫৫
শিশুর চরিত্র গঠনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১৫৬
শিশুর সুন্দর চরিত্র গঠনে পিতামাতার দায়িত্ব ১৫৬
পিতামাতা, ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সঙ্গী-সাথীদের সাথে আচরণ ১৬০
পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, অনুমতি গ্রহণ; মুলাকাত ও মজলিসের আদব-কায়দা ১৬২
ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু-কিশোরদের শিক্ষা-দীক্ষা ১৬৫
শিক্ষার পদ্ধতি ১৬৬
শিক্ষক ও সহপাঠিদের সাথে আচার-আচরণ ১৬৭
পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ১৬৯
দৈহিক পরিচ্ছতা ১৬৯
পোশাক পরিচ্ছদ-এর পরিচ্ছন্নতা ১৭১
পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ১৭১
খাদ্য ও পানীয়-এর পরিচ্ছন্নতা ও মিতব্যয়িতা ১৭২
স্থির পানিতে পেশাব-পায়খানা না করা ১৭২
শক্ত মাটি ও পাথরের উপর এবং গর্তে পেশাব না করা ১৭২
গ্রন্থপঞ্জি ১৭৩

তৃতীয় অধ্যায়

ইল্‌ম-জ্ঞান ১৭৭-১৮৯

ইল্‌ম-এর ফযীলত ও গুরুত্ব ১৭৭
ইল্‌মের উৎস : ওহীভিত্তিক ইল্‌ম ১৭৯
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিভিত্তিক ইল্‌ম ১৮১
ইসলামী শিক্ষার প্রকারভেদ ১৮১
ফরযে আইন ১৮১
ফরযে কিফায়া ১৮২
নফল ইল্‌ম ১৮২
বর্জনীয় বিষয় ১৮২
অশ্লীল সাহিত্য ১৮৩
যাদু-টোনা, ভবিষ্যত গণনা ১৮৩
কূটতর্ক ১৮৪
ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্ব ১৮৪
শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ১৮৫
শিক্ষকের গুণাবলী ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ১৮৭
ইসলামের দৃষ্টিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ১৮৮
গ্রন্থপঞ্জি ১৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

তাহারাত-পবিত্রতা ১৯০-২১১

তাহারাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ১৯০
তাহারাতের উপকারিতা ও ফযীলত ১৯৩
নাজাসাত ও এর প্রকারভেদ ১৯৪
হাদাসে আসগারের হুকুম ১৯৫
নাজাসাতে হাকীকী থেকে পবিত্র করার পদ্ধতি ১৯৫
শরীর পবিত্র করার নিয়ম ১৯৬
তরল ও তৈলাক্ত জিনিস পবিত্র করার নিয়ম ১৯৭
পানির প্রকারভেদ ও এর হুকুম ১৯৭
ইস্‌তিনজার নিয়ম ১৯৮
উযূ ১৯৯
মিস্‌ওয়াক, ফযীলত, গুরুত্ব ও পদ্ধতি ১৯৯
উযূর আহ্‌কাম : ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ২০০
উযূর ফরযসমূহ ২০১
উযূর সুন্নাতসমূহ ২০১
উযূর মুস্তাহাবসমূহ ২০২
উযূর নিয়ম ২০২
উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ ২০৩
উযূর মাকরূহ্‌সমূহ ২০৩
গোসল ২০৩
গোসলের প্রকারভেদ ২০৩
গোসলের আহ্‌কাম ২০৪
গোসলের নিয়ম ২০৪
গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ ২০৪
হায়িয ও নিফাস ২০৫
হায়িযের মাসাইল ২০৫
নিফাসের পরিচয় ২০৫
নিফাসের সময়কাল ২০৫
হায়িয ও নিফাসের আহ্‌কাম ২০৬
তায়াম্মুমের বিবরণ ২০৬
যে যে অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায় ২০৭
তায়াম্মুমের আহ্‌কাম : ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ২০৭
তায়াম্মুমের পদ্ধতি ২০৭
তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ২০৮
মোজার উপর মাসেহ্ ২০৮
মাসেহ্ করার পদ্ধতি ২০৮
গ্রন্থপঞ্জি ২০৯

পঞ্চম অধ্যায়

সালাত-নামায ২১২-২৯২

সালাত-এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব ২১২
মি'রাজ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ২১৩
নামায ফরয হওয়ার দলীল ২১৪
নামাযের উপকারিতা ও ফযীলত ২১৬
নামায তরক করার ভয়াবহতা ২১৭
নামায যাদের উপর ফরয ২১৯
আযান ও ইকামাত ২২০
আযান-এর সংজ্ঞা ২২০
ইকামাত-এর সংজ্ঞা ২২০
আযান-এর বাক্যসমূহ ২২১
ইকামাতের বাক্যসমূহ ২২১
আযান ও ইকামাতের উত্তর ২২১
আযান-এর দু'আ ২২২
আযান-এর ফযীলত ও মাহাত্ম্য ২২২
নামায-এর ওয়াক্ত ২২২
নামাযের নিষিদ্ধ সময় ২২৪
যে সময় নামায আদায় করা মাকরূহ ২২৫
যে সময় শুধু নফল নামায আদায় করা মাকরূহ ২২৫
নামায আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি ২২৫
নামাযের ফরযসমূহ ২২৯
নামাযের শর্তাবলী (আহকাম) ২২৯
নামাযের আরকান ২৩০
নামাযের ওয়াজিবসমূহ ২৩১
নামাযের সুন্নাতসমূহ ২৩২
নামাযের মুস্তাহাবসমূহ ২৩৩
নামাযের রাকা'আতসমূহ ২৩৩
ফজরের নামায ২৩৩
যুহরের নামায ২৩৩
আসরের নামায ২৩৪
মাগরিবের নামায ২৩৪
এশার নামায ২৩৪
জুমু'আর নামায ২৩৪
দুই ঈদের নামায ২৩৪
নামায মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ ২৩৪

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ ২৩৬
মসজিদ ২৩৬
জামা'আতের ফযীলত ও গুরুত্ব ২৩৭
তাক্‌বীরে উলায় শরীক হওয়ার ফযীলত ২৩৮
জামা'আত তরকের অপকারিতা ২৩৯
জামা'আত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী ২৩৯
জামা'আতের আহ্‌কাম ২৩৯
মুদ্‌রিক, লাহিক ও মাসবূক-এর মাসাইল ২৪০
কুরআন তিলাওয়াত ২৪০
ক. ফযীলত ও গুরুত্ব ২৪০
খ. দশটি সূরা ২৪৪
কিরা'আত সম্পর্কীয় মাসাইল ২৪৬
ইমাম-এর পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম ২৪৮
নামাযের মাসনূন কিরা'আত ২৪৮
জুমু'আর নামাযের বিবরণ ২৪৯
জুমু'আর নামায ফরয হওয়ার শর্তাবলী ২৫০
জুমু'আর নামায সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ ২৫০
জুমু'আর নামাযের ফযীলত ২৫০
ঈদের নামায ২৫২
ঈদের নামাযের ফযীলত ২৫২
ঈদুল ফিত্‌র ২৫৪
ঈদুল ফিত্‌রের সুন্নাত কাজসমূহ ২৫৪
ঈদুল ফিত্‌রের নামায আদায়ের বিরবণ ২৫৫
ঈদুল আযহা ২৫৬
কুরবানী (উযহিয়্যা)-এর অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৫৬
কুরবানীর তাৎপর্য, গুরুত্ব ও ফযীলত ২৫৮
যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব ২৫৯
কুরবানীর পশু ও এদের হুকুম ২৬০
কুরবানীর দিন ও সময় ২৬২
যবেহ্ করার পদ্ধতি ২৬২
কুরবানীর গোশ্‌তের বিধান ২৬৩
কুরবানীর চামড়ার বিধান ২৬৩
কুরবানীদাতার মাসনূন আমল ২৬৪
মানতের কুরবানী ২৬৪
কুরবানী করার অসিয়্যত ২৬৪
কুরবানীর কাযা ২৬৫
তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ ২৬৫

২—

তারাবীহ্ নামাযের নিয়্যাত ২৬৫
তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত ২৬৭
বিত্‌রের নামায ২৬৮
বিত্‌রের নামায নিয়্যাত ২৬৮
বিত্‌রের নামায পড়ার নিয়মাবলী ২৬৮
দু'আ কুনূত ২৬৯
নফল নামায ২৬৯
ক. তাহাজ্জুদ নামায ২৭০
খ. ইশ্‌রাকের নামায ২৭১
গ. চাশ্‌তের নামায ২৭২
ঘ. আউওয়াবীনের নামায ২৭২
ঙ. যাওয়ালের নামায ২৭২
চ. ইস্‌তিস্‌কার নামায ২৭৩
ছ. কুসূফ ও খুসূফের (সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ) নামায ২৭৩
জ. কাযায়ে হাজাতের নামায ২৭৪
ঝ. তাহিয়্যাতুল মসজিদ ২৭৫
ঞ. তাহিয়্যাতুল উযূ ২৭৫
ট. সালাতুত্ তাসবীহ্ ২৭৬
মুসাফিরের নামায ২৭৭
কসরের নিয়মাবলী ২৭৮
কসর নামাযের ফযীলত ২৭৮
রুগ্ন ব্যক্তির নামায ২৭৯
কাযা নামায ২৮০
কাযা নামাযের হুকুম ২৮০
কাযা নামায আদায়ের মাসাইল ২৮১
মুমূর্ষু ব্যক্তির করণীয় ২৮৩
মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় ২৮৩
ক. মৃতের গোসল ২৮৩
মৃতের গোসলের মাসনূন তরীকা ২৮৪
খ. মৃতের কাফন ২৮৪
কাফন পরানোর পদ্ধতি ২৮৫
গ. জানাযার নামায ২৮৫
জানাযার নামাযের হুকুম ২৮৬
জানাযা নামাযের সুন্নাত ২৮৬
জানাযা নামায পড়ার পদ্ধতি ২৮৬
জানাযা কাঁধে নেয়ার পদ্ধতি ২৮৭
ঘ. মৃতকে দাফন ২৮৮
গ্রন্থপঞ্জি ২৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাওম-রোযা ২৯৩-৩১৬

সাওম-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২৯৩
রোযার ফযীলত ও উপকারিতা ২৯৮
যাদের উপর রোযা ফরয ৩০০
রোযার না রাখার অপকারিতা ৩০০
চাঁদ দেখার মাসাইল ৩০১
সাহ্‌রী ও ইফ্‌তার ৩০৩
রোযাদারকে ইফ্‌তার করানোর ফযীলত ৩০৪
সাহ্‌রী ও ইফ্‌তার সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা ৩০৪
রোযার প্রকারভেদ ৩০৪
রোযার নিয়্যাত ৩০৫
রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ ৩০৭
যেসব কারণে রোযার কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয় ওয়াজিব হয় ৩০৭
যেসব কারণে শুধু কাযা ওয়াজিব হয় ৩০৮
যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না ৩০৯
যেসব কারণে রোযা মাকরূহ হয় এবং যে সব কারণে মাকরূহ হয় না ৩১০
যেসব অবস্থায় রোযা না রাখা জায়িয ৩১০
যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয ৩১১
রোযার ফিদ্‌ইয়া ৩১১
ই'তিকাফ ৩১২
ই'তিকাফের শর্তাবলী ৩১২
ই'তিকাফের আদব ৩১৩
ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণসমূহ ৩১৩
ই'তিকাফে নিষিদ্ধ কাজসমূহ ৩১৩
লাইলাতুল কাদ্‌র ৩১৪
সাদাকাতুল ফিত্‌র ৩১৪
গ্রন্থপঞ্জি ৩১৫

সপ্তম অধ্যায়

যাকাত ৩১৭-৩৬৩

যাকাতের পরিচিতি ৩১৭
যাকাতের ফযীলত ও গুরুত্ব ৩১৮
যাদের উপর যাকাত ফরয ৩১৯
সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া ৩২০
নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা ৩২০
ঋণমুক্ত হওয়া ৩২০

সম্পদের মালিকানা এক বছর থাকা ৩২০
কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ৩২১
যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাত ৩২১
মৃত ব্যক্তির যাকাত ৩২১
তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত সম্পদের যাকাত ৩২১
বিদেশে অবস্থিত সম্পদের যাকাত ৩২১
যাকাতযোগ্য সম্পদ ও তার ব্যবহার ৩২১
সোনা-রূপা ও নগদ অর্থ ৩২২
ব্যবসা পণ্য ৩২২
কৃষি সম্পদ ৩২২
পশু সম্পদ ৩২৩
ভেড়া-ছাগলের নিসাব ও যাকাতের হার ৩২৩
গরু-মহিষের নিসাব ও যাকাতের হার ৩২৩
উটের নিসাব ও যাকাতের হার ৩২৪
খনিজ সম্পদ ৩২৪
প্রভিডেন্ট ফান্ড ৩২৫
যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ ৩২৫
যেসব সম্পদে যাকাত ফরয নয় ৩২৫
যাকাতের হক্‌দার ৩২৬
যাকাত প্রদানের নিয়ম ৩২৮
যাকাত সংগ্রহ ও ব্যয়-বন্টন ব্যবস্থা ৩২৮
যাকাত হিসাব করার বাস্তব নমুনা ৩৩০
যাকাত না দেওয়ার পরিণাম ৩৩১
গ্রন্থপঞ্জি ৩৩৩

অষ্টম অধ্যায়

হজ্জ

৩৩৪-৩৮৪

পরিচিতি ৩৩৪
হজ্জের পটভূমি ও পবিত্র স্থানসমূহ ৩৩৪
মক্কা শরীফ ৩৩৭
মক্কা শরীফের আদব ৩৩৯
হজ্জের ফযীলত ও গুরুত্ব ৩৪০
হজ্জের হাকীকত ও তাৎপর্য ৩৪১
হজ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তজার্তিক গুরুত্ব ৩৪৩
হজ্জের সময় ৩৪৪
হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ ৩৪৪
হজ্জের প্রস্তুতি ৩৪৫

ক. মানসিক ও ধর্মীয় প্রস্তুতি ৩৪৫
খ. আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ৩৪৬
হজ্জের প্রকারভেদ ৩৪৬
হজ্জের আহ্‌কাম ৩৪৭
হজ্জের ওয়াজিবসমূহ ৩৪৭
হজ্জের সুন্নাতসমূহ ৩৪৭
মীকাত ৩৪৮
ইহ্‌রাম ৩৪৯
ইহ্‌রামকারীর করণীয় ৩৫০
ইহ্‌রামকারীর জন্য নিষিদ্ধ বা বর্জনীয় কাজসমূহ ৩৫০
ইহ্‌রামের মাকরূহ বিষয়সমূহ ৩৫০
তাওয়াফ ও তার ফযীলত ৩৫১
তাওয়াফের নিয়ম-পদ্ধতি ৩৫১
ইযতিবা ও রমল ৩৫৩
তাওয়াফের আহ্‌কাম ৩৫৩
তাওয়াফের মুবাহ্‌ কাজসমূহ ৩৫৫
তাওয়াফের নিষিদ্ধ কাজসমূহ ৩৫৫
তাওয়াফের মাকরূহ বিষয়াদি ৩৫৬
তাওয়াফের প্রকারভেদ ৩৫৬
সাঈ ৩৫৭
সাঈ-র রুকন ৩৫৭
সাঈ-র শর্তসমূহ ৩৫৭
সাঈ-র ওয়াজিবসমূহ ৩৫৮
সাঈ-র সুন্নাতসমূহ ৩৫৮
সাঈ-র মুস্তাহাবসমূহ ৩৫৮
সাঈ-র মাকরূহ কাজসমূহ ৩৫৯
সাঈ-র সুন্নাত তরীকা ৩৫৯
জ্ঞাতব্য ৩৬০
রমী করা ৩৬০
কুরবানী ৩৬২
হল্‌ক ও কস্‌র ৩৬২
হজ্জের ব্যস্ততম ৫ দিন ৩৬২
মুযদালিফায় রাত্রিযাপন ৩৬৫
তাওয়াফে বিদা ৩৬৬
বদলী হজ্জ ৩৬৬
হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হলে ৩৬৮
জিনায়াত বা হজ্জের ত্রুটি-বিচ্যুতি ৩৬৯

জিনায়াত-এর প্রতিবিধান ৩৭০
উমরার ফযীলত ও আহ্কাম ৩৭৩
উমরা আদায়ের পদ্ধতি ৩৭৪
উমরার মাসাইল ৩৭৪
মদীনা শরীফ যিয়ারত ৩৭৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা শরীফ যিয়ারত ৩৭৭
যিয়ারতের আদব ৩৭৭
মদীনা শরীফে করণীয় ও দর্শনীয় ৩৮০
কুবার মসজিদ ৩৮০
মসজিদে জুমু'আ ৩৮১
মসজিদে গামামা ৩৮১
মসজিদে সুরাইয়া ৩৮১
মসজিদে ফাতহ্ ৩৮১
মসজিদে যুবাব ৩৮১
মসজিদে কিব্লাতাইন ৩৮১
মসজিদুল কাযীহ্ ৩৮২
মসজিদে বনূ কুরায়যা ৩৮২
মসজিদুল ইজাবা ৩৮২
হজ্জ থেকে ফেরা ও করণীয় ৩৮২
গ্রন্থপঞ্জি ৩৮৩

নবম অধ্যায়

পারিবারিক জীবন ৩৮৫-৪২৮

সূচনা ৩৮৫
মানব বংশের সম্প্রসারণ মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ ৩৮৫
বিয়ে-শাদী : পরিচিতি ও তাৎপর্য ৩৮৬
বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত ৩৮৭
যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ৩৮৯
পর্দার গুরুত্ব ও উপকারিতা ৩৯০
বিয়ে না করার অপকারিতা ৩৯৪
ব্যভিচার : কুফল ও বিধান ৩৯৫
বিয়ে সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম ৩৯৬
পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ৩৯৭
যাদের সাথে বিবাহ বৈধ ও যাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয় ৩৯৭
অমুসলিমদের সাথে বিবাহ ৩৯৯
কুফ্ (পাত্র-পাত্রীদের সমতা) ৪০০
বিবাহের রুকন ৪০০
বিবাহের শর্তাবলী ৪০০
বিবাহের শ্রেণীবিভাগ ৪০১

টেলিফোন, ট্যালেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বিবাহ ৪০১
দেনমহর ৪০২
বিবাহের মাসনূন তরীকা ৪০৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাদী মুবারক ৪০৩
হযরত ফাতিমা (রা)-এর শাদী মুবারক ৪০৬
ওলীমা বা বিবাহ ভোজের আয়োজন ৪০৬
বিবাহ-শাদীতে প্রচলিত কুপ্রথা ৪০৭
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ৪০৭
স্বামীর অধিকার ৪০৭
স্ত্রীর অধিকার ৪০৮
স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪০৯
স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪১০
একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা ও শর্তাবলী ৪১১
বহু বিবাহের যৌক্তিকতা ৪১১
তালাক : তালাকের সংজ্ঞা ৪১৩
তালাক বিধানের উদ্দেশ্য ৪১৩
তালাকের প্রকারভেদ ৪১৪
ইদ্দাত ৪১৫
ইদ্দাতের সময়সীমা ৪১৬
তালাকপ্রাপ্তা মহিলার পুনঃবিবাহ ৫১৬
খুলা‘ ৪১৭
খুলা‘র বিনিময়ের ধরন ৪১৮
খুলা‘র হুকুম ৪১৮
যিহার ৪১৮
যিহারের রুকন ৪১৯
যিহারের কাফ্ফারা ৪১৯
যিহারের হুকুম ৪১৯
ঈলা ৪২০
যে কাজ করলে ঈলাকারী হয় ৪২০
লি‘আন ৪২১
লি‘আন করার পদ্ধতি ৪২১
মাতাপিতা ও মুরুব্বীদের হক ৪২২
বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ ৪২৫
গ্রন্থপঞ্জি ৪২৬

দশম অধ্যায়

সামাজিক জীবন ৪২৯-৪৬১

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক বন্ধন ৪২৯
সামাজিক বন্ধনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ৪৩১

ইয়াতীম, দুঃস্থ ও মাযলূম মানুষের প্রতি কর্তব্য ৪৩২
মুসলমানগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ ৪৩৪
প্রতিবেশীর সাথে আচরণ ৪৩৫
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ৪৩৭
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ৪৩৮
অধীনস্থদের প্রতি সদ্ব্যবহার ৪৩৯
সহাবস্থান ও সম্প্রীতি ৪৪০
পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি ৪৪০
প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ৪৪১
সামাজিক সহাবস্থান ৪৪২
অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থান ৪৪৩
আদর্শ সমাজ গঠনে ঐক্যের গুরুত্ব ৪৪৩
ঐক্যের ভিত্তি ৪৪৪
ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপায় ৪৪৫
সালাম আদান-প্রদান ও দু'আ করা ৪৪৫
আপোস মীমাংসা ৪৪৫
আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তৌফিক চাওয়া ৪৪৬
হাদিয়া আদান-প্রদান ৪৪৬
হাদিয়া ও ঘুষ ৪৪৭
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ৪৪৭
উপহাস, দোষারোপ, মন্দ নামে ডাকা ও অহেতুক ধারণা করা ৪৫০
উপহাস ৪৫০
মন্দ নামে ডাকা ৪৫১
অহেতুক ধারণা করা ৪৫২
গীবত, অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণ পরিহার ৪৫২
চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ ৪৫৫
সামাজিক অপরাধ দমনে ইসলামী বিধান ৪৫৭
অপরাধ দমনে ইসলামী বিধানের বৈশিষ্ট্য ৪৫৭
ইসলামী বিধানে শাস্তির শ্রেণীবিভাগ ৪৫৮
হদ্দের শাস্তি ৪৫৮
কিসাস ৪৫৯
গ্রন্থপঞ্জি ৪৬০

একাদশ অধ্যায়

ইসলামী অর্থনীতি ৪৬২-৫৩০

ইসলামী অর্থনীতি : সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ৪৬২
ইসলামী অর্থনীতির মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ৪৬৩

ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ৪৬৪
ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি ৪৬৮
জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা ৪৭০
হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের অপকারিতা ৪৭১
উৎপাদনের উৎস ও উপকরণ ৪৭২
ভূমি ব্যবস্থা : ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমির গুরুত্ব ৪৭২
ভূমির মালিকানা ৪৭৩
ভূমির প্রকারভেদ ৪৭৩
চাষাবাদ ৪৭৫
বর্গাচাষ ৪৭৫
ভূমি উন্নয়ন ও সেচ ব্যবস্থা ৪৭৬
সরকারি পর্যায়ে ভূমি বন্টন ব্যবস্থা ৪৭৮
ভূমি ভোগ নীতিমালা ৪৭৯
ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও ফযীলত ৪৭৯
ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি ৪৮১
যে সব কর্মকাণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্যকে বাতিল করে দেয় ৪৮২
বৈধ ও অবৈধ ব্যবসা ৪৮৪
শিল্পের গুরুত্ব ও মূলনীতি ৪৮৪
চামড়া শিল্প বা ট্যানারী ৪৮৫
পরিবহন ও যানবাহন ৪৮৬
শিল্প ও জাতীয় উন্নয়ন ৪৮৭
মূলধন সংগ্রহ ও যৌথ কারবার ৪৮৭
ব্যাংকিং ব্যবস্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৪৮৮
ব্যাংকিং-এর মূলনীতি ৪৮৮
শরীয়াহ্ ব্যাংকের পরিকল্পনা ৪৮৯
মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ ৪৮৯
ইসলামী ব্যাংক ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ৪৯১
বৈদেশিক মুদ্রা ও হুণ্ডির লেনদেন ৪৯২
বীমা ও স্টক এক্সচেঞ্জ ৪৯২
প্রভিডেন্ট ফান্ড ৪৯৩
শেয়ার ব্যবসা ৪৯৩
বন্ড-এর হুকুম ৪৯৫
ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা ৪৯৫
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ৪৯৬
মালিকের অধিকার ও কর্তব্য ৪৯৮
শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য ৪৯৯
শ্রম বিনিয়োগের বৈধ উপায়সমূহ ৫০২

বায়তুলমাল ৫০৪
বায়তুলমালের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ ৫০৪
আয়ের উৎসসমূহের ব্যাখ্যা ৫০৫
বায়তুলমালের ব্যয়ের খাত ৫০৮
উত্তরাধিকার ৫১১
অসিয়্যাত ৫১২
হেবা ৫১২
উপার্জনের অবৈধ উপায় ৫১৩
সুদ ও সুদের পরিচিতি ৫১৩
সুদ সম্পর্কে ইসলামের বিধান ৫১৫
ঘুষ ৫১৬
জুয়ার সংজ্ঞা ও পরিচয় ৫১৬
শরী'আতের দৃষ্টিতে জুয়া ৫১৭
জুয়ার অপকারিতা ৫১৮
লটারীও একপ্রকার জুয়া ৫১৯
প্রতারণা, ওযনে কম দেওয়া ও ভেজাল মিশানো ৫১৯
হারাম বস্তুর ব্যবসা ৫২০
অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা এবং অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপার্জন ৫২১
চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও জবরদখল ৫২৩
কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্তৃক উপহার গ্রহণ ৫২৪
মজুতদারী ও কালোবাজারি ৫২৫
গ্রন্থপঞ্জি ৫২৬

দ্বাদশ অধ্যায়
রাষ্ট্রীয় জীবন ৫৩১-৫৯৬

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ৫৩১
ইসলামে রাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব ৫৩৫
খিলাফতের প্রকারভেদ ৫৩৬
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ৫৩৮
পর্যালোচনা ৫৩৮
রাষ্ট্র ও সরকার ৫৩৯
ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতিমালা ৫৪০
ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫৪৪
ইসলাম ও গণতন্ত্র ৫৪৫
ইসলাম ও কমিউনিজম ৫৪৬
ইসলাম ও পুঁজিবাদ ৫৪৭

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের গুরুত্ব ৫৪৭
খলীফার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ৫৪৮
খলীফা নির্বাচনে ইসলামের বিধান ৫৫০
খলীফা একজন হওয়া আবশ্যক ৫৫২
খলীফার ক্ষমতা ও দায়িত্ব ৫৫৩
খলীফার অপসারণ ৫৫৮
মজলিশে শূরা : গুরুত্ব ও গঠন প্রণালী ৫৫৯
শূরার উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য ৫৬১
শূরা ও রাষ্ট্রপ্রধান ৫৬২
কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ ৫৬৩
কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং এর প্রতিকার ৫৬৪
ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৫৬৫
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ৫৬৭
ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ৫৬৯
ইসলামের দৃষ্টিতে সুবিচার ৫৬৯
বিচারক নিয়োগ এবং বিচারের নীতিমালা ৫৭০
সাক্ষ্যের নীতিমালা ৫৭৩
জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৫৭৫
দীনি দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত ৫৭৫
জিহাদের সংজ্ঞা ও পরিচিতি ৫৭৭
জিহাদের প্রকারভেদ ৫৭৮
জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত ৫৭৯
জিহাদ ফরয হওয়ার পটভূমি ৫৮০
জিহাদের হুকুম ৫৮৩
জিহাদ ফরয হওয়ার শর্ত ৫৮৪
জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫৮৫
জিহাদ যাদের উপর ফরয ৫৮৬
রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা ৫৮৭
আন্তর্জাতিক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৫৮৮
ভ্রাতৃত্ব ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ৫৯০
গ্রন্থপঞ্জি ৫৯২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মু'আমালাত-লেনদেন ৫৯৭-৬৫৬

লেনদেনের গুরুত্ব ও স্বচ্ছতা ৫৯৭
ক্রয়-বিক্রয় : পরিচিতি ৫৯৮
প্রকারভেদ ৫৯৮

বিধি-বিধান	৫৯৯
শর্তাবলী	৬০০
শর্তাবলীর প্রকারভেদ	৬০০
ক্রয়-বিক্রয় সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী	৬০০
ক্রয়-বিক্রয়ে বৈধ ও অবৈধ পদ্ধতি	৬০১
নগদ লেনদেনে ক্রয়-বিক্রয়	৬০১
বাকী বিক্রয়	৬০১
মুরাবাহাহ্---মুনাফাভিত্তিক লেনদেন	৬০১
হুকূক (স্বত্ব) বিক্রয় (শেয়ার লাইসেন্স, রয়্যালটি, সুনাম)	৬০৩
হুকূকে মুজাররাদাহ	৬০৩
হুকূকে শর'ইয়্যাহ্	৬০৩
রচনা ও প্রকাশনা স্বত্ব ও তার বিক্রি	৬০৩
শেয়ার লাইসেন্স : সূচনা ও তাৎপর্য	৬০৪
নতুন কোম্পানীর শেয়ারের হুকুম	৬০৫
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী	৬০৫
শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য	৬০৬
সুনাম	৬০৯
ছাদের উপরে শূন্যস্থান বিক্রয়	৬১০
মুশারাকা	৬১০
শিরকাতুল মিল্কের সাথে সম্পৃক্ত জরুরী মাসাইল	৬১০
শিরকাতুল উকূদ	৬১১
বাই'য়ে সালাম	৬১২
বাগ-বাগিচার ফলমূলের বেচাকেনা	৬১৩
মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে বেচাকেনা	৬১৩
ওয়াদি'আত---জমা রাখা	৬১৪
আরিয়াত---ধার দেওয়া	৬১৫
প্রাসঙ্গিক মাসাইল	৬১৫
ইজারা	৬১৫
পারিশ্রমিক সংক্রান্ত কয়েকটি মাস'আলা	৬১৬
কোন্ কোন্ জিনিস ইজারা দেওয়া যায়	৬১৬
ইজারায়ে ফাসিদা সংক্রান্ত মাসাইল	৬১৭
রাহ্ন (বন্ধক)	৬১৭
বন্ধক গ্রহণের পর পাওনা আদায়ের পদ্ধতি	৬১৮
বন্ধকী বস্তুর ব্যবহার ও সংরক্ষণ	৬১৯
শুফ্'আ—পরিচয় ও অধিকার	৬১৯
হালাল-হারাম	৬২১
হালাল-হারামের মূলনীতি	৬২১

খাদ্য ও পানীয়	৬২৩
জলচর প্রাণী	৬২৪
স্থলচর প্রাণী	৬২৪
হালাল প্রাণীসমূহ	৬২৪
মৃত জন্তু হারাম হওয়ার কারণ	৬২৫
প্রবাহিত রক্ত	৬২৫
শূকরের মাংস	৬২৫
আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্যে উৎসর্গিত জন্তু	৬২৬
মৃত জন্তুর চামড়া, হাড্ডি, পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করা	৬২৭
শুধু পায়খানা ভক্ষণকারী প্রাণীর হুকুম	৬২৭
অপবিত্র বস্তু হারাম	৬২৮
অমুসলিম দেশ থেকে প্রাপ্ত গোশ্তের হুকুম	৬২৮
অনন্যোপায় হলে শরী'আতের বিধান	৬২৮
যবেহ্ ও শিকার	৬২৮
যবেহ্কারীর অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য	৬২৯
যবেহ্ করার মাসনূন তরীকা	৬২৯
যবেহ্-এর ক্ষেত্রে কি কি মাকরূহ	৬৩০
শিকার	৬৩০
শিকার করার উপায়	৬৩১
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী	৬৩২
মাদকদ্রব্য	৬৩২
মাদকদ্রব্যের উৎপাদক ও ব্যবসা	৬৩৫
মদপানের শাস্তি	৬৩৬
শাস্তির শর্ত	৬৩৬
পোশাক-পরিচ্ছদ	৬৩৭
অলংকারাদির ব্যবহার	৬৩৯
গৌরব ও অহংকারের পোশাক পরিধান করা	৬৪০
ক্রীড়াকৌতুক ও চিত্তবিনোদন	৬৪১
দৌড় প্রতিযোগিতা	৬৪৪
তীর নিক্ষেপ	৬৪৪
বর্শা চালানো	৬৪৪
ঘোড় সাওয়ারী	৬৪৪
শিকার করা	৬৪৫
কসম	৬৪৫
কসম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত	৬৪৬
কসমের কাফ্ফারা	৬৪৭
পাপকাজের কসম করা	৬৪৭

কসম সম্পর্কিত বিবিধ মাসাইল ৬৪৭
মানত ৬৪৯
মানত সম্পর্কিত বিবিধ মাসাইল ৬৫০
গ্রন্থপঞ্জি ৬৫২

চতুর্দশ অধ্যায়

অসিয়্যাত, ওয়াক্‌ফ ও মীরাস ৬৫৭-৬৮৪

অসিয়্যাতের পরিচিতি ও গুরুত্ব ৬৫৭
অসিয়্যাতের নিয়ম-নীতি ৬৫৮
অসিয়্যাতের শর্তাবলী ৬৫৯
যার জন্য অসিয়্যাত করা হয় (মূসা-লাহু)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলী ৬৫৯
যেসব কারণে অসিয়্যাত বাতিল হয় ৬৬০
অসিয়্যাত প্রত্যাহার ৬৬০
অসিয়্যাতের সর্বাধিক মাত্রা ৬৬০
অসিয়্যাতের হুকুম ৬৬১
অসী নিয়োগ ৬৬১
অসিয়্যাত পূরণের নিয়ম ৬৬৩
ওয়াক্‌ফ পরিচিতি ও গুরুত্ব ৬৬৩
ওয়াক্‌ফের শর্তাবলী ৬৬৪
ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম ৬৬৫
স্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ ৬৬৬
অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ ৬৬৬
বিভাজনকৃত নয় (মুশা')—এমন বস্তুর ওয়াক্‌ফ ৬৬৬
ওয়াক্‌ফের হুকুম ৬৬৭
ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা ৬৬৭
ওয়াক্‌ফকারী নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য এবং অন্যান্য আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্‌ফ করা ৬৬৭
মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা ৬৬৮
অন্যান্য জনহিতকর কাজে ওয়াক্‌ফ করা ৬৬৯
মুমূর্ষু ব্যক্তির ওয়াক্‌ফ ৬৭০
মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি নিয়োগ ৬৭০
মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব ৬৭১
মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির অব্যাহতি ৬৭২
মীরাস-এর সংজ্ঞা ও বিবরণ ৬৭২
উত্তরাধিকার বন্টনের ভিত্তি ৬৭৫
উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার শর্তাবলী ৬৭৫

মৃতের যে সমস্ত আত্মীয় ওয়ারিস হয় ৬৭৬
যেসব আত্মীয় ওয়ারিস হয় না ৬৭৬
ওয়ারিসদের শ্রেণী বিভাগ ৬৭৬
যাবিল-ফুরূয ৬৭৬
আসাবার বিবরণ ৬৭৭
আসাবা বি নাফসিহী ৬৭৭
আসাবার মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি ৬৭৭
আসাবা বি গায়রিহী ৬৭৮
আসাবা মা'আ গায়রিহী ৬৭৮
আসাবা সাবারিয়্যা ৬৭৮
যাবিল-ফুরূযের অংশসমূহের বিবরণ ৬৭৯
দাদী ও নানীর মীরাস ৬৮২
গ্রন্থপঞ্জি ৬৮২

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইহ্সান ও আখ্লাক ৬৮৫-৭৪৮

ইহ্সান : পরিচিতি ও গুরুত্ব ৬৮৫
তাসাওউফ : সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ৬৮৬
তাসাওউফ সত্য হওয়ার দলীল ৬৮৭
ইখ্লাস ও নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা ৬৯০
আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা) ও দীনের প্রতি মহব্বত ৬৯১
তাওবা ও ইস্তিগ্ফার ৬৯৩
তাক্ওয়া ৬৯৫
তাক্ওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৬৯৫
তাওয়াক্কুল ৬৯৭
যিক্র-আয্কার ৬৯৮
যিক্রের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ৬৯৮
দু'আ ৭০০
দু'আ কবূল হওয়ার আদবসমূহ ৭০১
দু'আ কবূল হওয়ার বিশেষ বিশেষ সময় ৭০১
দু'আ কবূল হওয়ার বিশেষ বিশেষ স্থান ৭০১
যেসব লোকের দু'আ কবূল হয় ৭০১
মাসনূন দু'আসমূহ ৭০২
হাদীসে বর্ণিত কতিপয় দু'আ ৭০৬
বিশেষ দু'আসমূহ ৭০৮
রিয়া ও খ্যাতির লিপ্সা পরিহার ৭১১

কাল্বে সালীম	৭১৩
মানব জীবনে ইহ্সানের প্রভাব	৭১৪
আখ্লাকে হাসানা : পরিচিতি ও গুরুত্ব	৭১৪
সততা ও সত্যবাদিতা	৭১৬
ধৈর্য ও সহমর্মিতা	৭১৭
সবরের প্রকারভেদ	৭১৭
সবরের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য	৭১৮
শোক্‌র ও কৃতজ্ঞতা	৭১৯
শোক্‌র ও গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৭২০
আদ্‌ল—ন্যায়পরায়ণতা	৭২১
আদলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৭২১
ক্ষমা ও উদারতা	৭২৩
বিনয় ও সরলতা	৭২৪
দানশীলতা ও বদান্যতা	৭২৫
আমানতদারী	৭২৭
অঙ্গীকার রক্ষা করা	৭২৮
সৃষ্টির সেবা	৭২৮
বীরত্ব ও সাহসিকতা	৭৩০
আত্মসংযম ও আত্মমর্যাদাবোধ	৭৩০
অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা	৭৩০
লজ্জাশীলতা	৭৩১
আখ্লাকে সায়্যিআ—(মন্দ স্বভাব) : পরিচিতি ও অপকারিতা	৭৩২
অহংকার ও আত্মম্ভরিতা	৭৩৩
মিথ্যাচার	৭৩৪
সম্মান ও সম্পদের মোহ	৭৩৫
দুনিয়ার মহব্বত	৭৩৬
কৃপণতা	৭৩৮
অপব্যয় ও অপচয়	৭৩৯
ক্রোধ ও রাগ	৭৪০
হিংসা-বিদ্বেষ	৭৪০
খোদপসন্দী ও আত্মগৌরব	৭৪১
অশ্লীল কথাবার্তা	৭৪২
ধোঁকা ও প্রতারণা	৭৪৩
খোশামোদ, তোষামোদ ও অতিশয় প্রশংসা	৭৪৩
গ্রন্থপঞ্জি	৭৪৫

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের প্রাত্যহিক প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে ইসলামের দিক-নির্দেশনা ও অনুশাসন। এতে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের যেমন বিস্তারিত নিয়ম-কানুন রয়েছে, তেমনি দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রমেরও রয়েছে সুবিন্যস্ত ও পরিশীলিত নির্দেশনা। ইসলামের প্রতিটি অনুশাসনের একটি বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক রূপ থাকলেও এর ভেতরে নিহিত রয়েছে এক গভীর অর্থব্যঞ্জক তাৎপর্য। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ইহ-পারলৌকিক বহুমাত্রিক কল্যাণ লাভ।

দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনে আমাদের যে কাজ-কর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী পালন করতে হয় তা সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে ইখলাসের সাথে আদায় করা হচ্ছে এই কল্যাণ লাভের পূর্বশর্ত। এক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত দীনিয়াত জাতীয় পুস্তিকাগুলো প্রায়শ অসম্পূর্ণ বিধায় দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল, যাতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসায়েল, দোয়া-দরূদ ও হুকুম-আহকাম পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপিত হবে।

এই বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের সর্বস্তরের মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে। দেশের বিশিষ্ট আলেমদের মেধা ও শ্রমসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে এর পাণ্ডুলিপি প্রণীত হয় এবং উঁচুমানের একটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যাচাই-বাছাই ও পরিমার্জনের পর এটি চূড়ান্ত হয়।

এই গ্রন্থে একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় তথা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল বিষয় স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটি ইতিমধ্যে ইসলামী আকীদা ও আমলের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা হিসেবে পাঠক মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হওয়ার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর একাদশ সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিকভাবে তাঁর হুকুম-আহ্কাম পালন করে ইহ-পরকালীন সফলতা লাভের তাওফীক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

দৈনন্দিন জীবন আমরা যা কিছুই করি না কেন, তাতে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। ইসলাম কেবল কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়, বরং এ হচ্ছে এক পরিপূর্ণ দীন বা জীবনবিধান। এখানে প্রতিটি কর্মই নেকআমল, যদি তা নিবেদিত হয় একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্র উদ্দেশে এবং তাঁর নির্দেশিত পন্থায়। একটি বিশ্বজনীন জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের ইবাদতের রয়েছে একটি সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং জীবনাচারের রয়েছে একটি আদর্শিক কাঠামো। তাই ইসলাম চর্চা করার জন্য প্রতিদিন, প্রতিক্ষণেই একজন মুসলমানকে সচেতন হয়ে চলতে হয়, তার কাজটি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ তথা মহানবী (সা)-এর আদর্শ অনুযায়ী হলো কিনা।

এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য এ জনপদে ইসলাম চর্চার গোড়া থেকেই দীনিয়াত বিষয়ক কিছু বইপত্র চালু আছে। বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চার উত্তরণের সাথে সাথে এগুলোর আকার-আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন হলেও সত্যিকার অর্থে যুগোপযোগী একটি পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। অথচ সমাজের সর্বস্তরের সকল পেশার মুসলমানই তার প্রাত্যহিক ইসলাম চর্চায় বিভিন্ন বিষয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং নিকটস্থ ইমাম সাহেবকে এর উত্তর জিজ্ঞাসা করেন বা বাজার থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সংগ্রহ করে পড়েন। কিন্তু এসব পুস্তিকায় দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর একটি পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য সমাধান না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন।

এই অভাব পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশের বিজ্ঞ আলেমদের লেখা ও সম্পাদনার মাধ্যমে 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করে। এতে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, পঞ্চ রুকন, অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ইত্যাদি হুকুম-আহ্কামসহ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও লেনদেন সংক্রান্ত এবং আচার-আচরণগত দিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল বিষয় সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে পরিবেশন করা হয়েছে। স্থানে স্থানে মূল আরবী ভাষ্যের উদ্ধৃতি এর উপযোগিতাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থটি আলেম, ইমাম, ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সর্বস্তরের মুসলিম নর-নারীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থটির দশম সংস্করণ প্রকাশের স্বল্প সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা এবার এর একাদশ সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি আগ্রহী সচেতন পাঠক মহলের নিকট গ্রন্থটি দিন দিন আরও সমাদৃত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে দীন ইসলাম পালন করে ইহ-পরলোকে কামিয়াব হবার তাওফীক দিন।

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ

সম্পাদকীয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ·

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দীন ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আকীদা-বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সহ দাওয়াত, জিহাদ, ইহ্সান ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি এক কথায় জীবনের সমস্ত বিষয়ই ইসলামের মধ্যে রয়েছে। জীবনের এমন কোন দিক বা ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের সঠিক দিক-নির্দেশনা নেই।

ইসলামী বিধি-বিধানের প্রধান উৎস হল চারটি। যথা : ১. কুরআন, ২. সুন্নাহ্, ৩. ইজ্‌মা ও ৪. কিয়াস। শেষোক্ত দু'টির মূল ভিত্তি হল, কুরআন ও সুন্নাহ্। সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবি'-তাবিঈন, মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও মুসলিম মনীষীবৃন্দ কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ইজ্‌মা ও কিয়াসের আলোকে সর্বকালেই দীনের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন বিশ্ব মানবের সামনে এবং এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করেছেন তাঁরা অসংখ্য গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দীনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদি। এসব গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা বিষয়াদি সংগ্রহ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এমনকি কারো কারো ক্ষেত্রে দুঃসাধ্যও বটে। এই প্রেক্ষিতে প্রয়োজন ছিল এমন একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করা যায় মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী সন্নিবেশিত থাকে। এই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা বিভাগ 'দৈনন্দিন জীবনের ইসলাম' শিরোনামে বাংলা ভাষায় একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা মুতাবিক দেশের বিশিষ্ট ফিকহ্‌বিদ, মুহাক্কিক আলিম এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণের উপর এর পাণ্ডুলিপি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সে সকল পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় একটি সম্পাদনা পরিষদের উপর। পরিষদ যথাসময়ে সম্পাদনার কাজটি সমাপ্ত করেন। এ জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে লাখো শোক্‌র। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কী করণীয় এবং কিভাবে তা সম্পাদন করতে হবে এই বিষয়ে এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল্লাহ্ তা'আলা এই মহান খিদ্‌মতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন।

এই কিতাবে সন্নিবেশিত বিষয়াদি আহ্‌লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে সংগৃহীত। সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে গ্রন্থখানির ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল রাখা এবং সঠিক তথ্য সন্নিবেশিত করার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনরূপ ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এই কিতাব প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে সম্পাদনা পরিষদের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। মহান আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত তিনি যেন মেহেরবানী করে গ্রন্থখানি কবূল করেন এবং সকলকে এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!

সম্পাদনা পরিষদ

লেখকমণ্ডলী

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
ড. মাওলানা আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক
ড. মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্
মাওালানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
মুহাম্মদ আজিজুল হক
মুহাম্মদ রজব আলী
ডা. আবু ওবায়েদ মোহসীন
মাওলানা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন
মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম
মাওলানা মাহবুবুল হাসান
মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল হক
মাওলানা ফয়সল আহ্মদ জালালী
মাওলানা আবূ মূসা
মাওলানা আনওয়ারুস্ সালাম

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান	চেয়ারম্যান
মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম	সদস্য
ড. মাওলানা এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী	সদস্য
মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী	সদস্য
মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রহীম	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	সদস্য-সচিব

লেখকমণ্ডলী

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
ড. মাওলানা আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক
ড. মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্
মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
মুহাম্মদ আজিজুল হক
মুহাম্মদ রজব আলী
ডা. আবু ওবায়েদ মোহসীন
মাওলানা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন
মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম
মাওলানা মাহবুবুল হাসান
মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল হক
মাওলানা ফয়সল আহ্মদ জালালী
মাওলানা আবূ মূসা
মাওলানা আনওয়ারুস্ সালাম

প্রথম অধ্যায়
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম (إِسْلَامٌ) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ও মুসলমান হওয়া। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্র অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা;[১] বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র 'দীন'—একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচারভিত্তিক শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই, হতেও পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ·

ইসলামই আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত দীন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ·

কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৫)

হাদীস শরীফে ইসলামের একটি সংজ্ঞা ও পরিচিতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

اَلاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ·

ইসলাম হল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা পালন করা এবং যাতায়াতের সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ আদায় করা। (বুখারী ও মুসলিম)

বস্তুত ইসলামই সকল নবী-রাসূলের অভিন্ন ধর্ম। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত আগমনকারী সকল নবী-রাসূলই মানুষকে ইসলামের দিকেই আহ্বান করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মাতকে গড়ে তুলেছেন।

ইসলাম ধর্মের মর্ম হল, আল্লাহ্র পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আর প্রত্যেক পয়গম্বরই যেহেতু নিজে আল্লাহ্র পূর্ণ অনুগত থাকার সাথে সাথে উম্মাত্কেও এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাই সকল নবীর দীনই ইসলাম।

হযরত ইব্রাহীম (আ)-ই সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের নাম ইসলাম এবং তাঁর উম্মাতকে 'উম্মাতে মুসলিমা' বলে অভিহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে মুসলিম তথা তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর হতেও এক উম্মাতে মুসলিমা অর্থাৎ তোমার এক অনুগত উম্মাত বানাও। (সূরা বাকারা, ২ : ১২৮)

হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁর সন্তানদের প্রতি অসিয়্যাত করে বলেন :

فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۔

তোমরা মুসলিম না হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা বাকারা, ২ : ১৩২)

হযরত ইব্রাহীম (আ) উম্মাতে মুহাম্মাদীকে এ নামে অভিহিত করেছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا ۔

এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৮)

মোটকথা, নবী-রাসূলগণের প্রচারিত ধর্মে মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকের শরী'আত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۔

আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করেছি। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৮)

হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে নবী-রাসূলগণের যে সিল্সিলা শুরু হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে। তিনি আখেরী নবী। তাঁর পর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। তাঁর আগমনে পূর্ববর্তী সমস্ত শরী'আত রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন 'ইসলাম' বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা) আনীত শরী'আতকে এবং 'মুসলিম' বলতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকেই বুঝাবে। এই হিসাবে ইসলামের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

هُوَ تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَمِيْعِ مَاجَاءَ بِهِ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِمَّا عُلِمَ مَجِيْئُهُ ضَرُوْرَةً ۔

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা) যে আদর্শ ও বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন, যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকে ইসলাম বলা হয়।[২]

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশনা মুতাবিক নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সঁপে দেওয়া এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার নামই হল ইসলাম। যে আত্মসমর্পণ করে তাকে বলা হয় মুসলিম। ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন ব্যক্তির ইসলাম পরিপন্থী নিজস্ব খেয়াল-খুশি এবং ধ্যান-ধারণার অনুসরণের কোন সুযোগ থাকে না। সে তো আল্লাহ্র গোলাম। তার হায়াত-মউত-জীবন-মরণ সব কিছুই এক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ـ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা আহ্যাব, ৩৩ : ৩৬)।

এ আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। জীবনের কোন ক্ষেত্রে একবিন্দু পরিমাণও এ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। সাহাবায়ে কিরামকে এভাবেই গড়ে তুলেছিলেন তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম—দীনে ফিত্রাত। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তা-ই হল 'ফিত্রাত'। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে :

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ـ

প্রতিটি শিশুই সহজাত প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে।

এখানে ফিত্রাত বা ইসলামের কথা উল্লেখ করে হিদায়াত গ্রহণের যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই প্রতিটি মানুষের মধ্যে উচ্চতর শক্তির সামনে আত্মসমর্পণের সহজাত প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তি আপ্লুত হৃদয়ে সে নিজেকে একান্ত করে সঁপে দিয়ে পেতে চায় আত্মিক পরম তৃপ্তি। এ সুপ্ত প্রেরণা-জয্বাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে কখনও কখনও মানুষ হয়েছে দিক্ভ্রান্ত। কেউ তো চন্দ্র-সূর্যকে মহাশক্তি মনে করে সেগুলোর কাছে মাথানত করেছে। কেউবা আগুনের পূজা করেছে। আবার কেউ নিজের চাইতে অধিকতর শক্তিমান মানুষের পূজায় আত্মনিয়োগ করেছে। কখনো তারা নিজেদের কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে সেগুলোর সামনে নতশির হয়েছে। আবার কখনো অহংকার স্ফীত হয়ে নিজেকে প্রভু বলে ঘোষণা করেছে। এক কথায় মানবতার ক্রমবিকাশের সকল স্তরে এ সহজাত প্রেরণা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও মানুষ এর থেকে মুক্ত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে মানুষের এ সহজাত প্রেরণার চাহিদা এটাই ছিল যে, মানুষ এমন এক মহান ও শাশ্বত সত্তার সামনে নিজেকে উৎসর্গিত করবে যিনি সকল শক্তি, সকল ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের উৎস; মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে যাঁর অবস্থান, যিনি মানুষের সকল দাবি ও চাহিদা পূরণে এবং

তাদের সহজাত প্রেরণা ও উচ্ছ্বাসকে তৃপ্ত করতে সক্ষম। এই পূর্ণতম সত্তাই হলেন মহান রাব্বুল আলামীন—সারা জাহানের পালনকর্তা। আল-কুরআনে মানুষের এ সুপ্ত প্রেরণাকে তৃপ্ত করার লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত তথা প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা রূম, ৩০ : ৩০)

ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার আখেরী নবী। কুরআন তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আখেরী কিতাব। মহানবী (সা)-এর আগমনের পর পূর্ববর্তী শরী'আত ও কিতাব সবই রহিত হয়ে গেছে। এরপর আর কোন নবী আসবেন না এবং কোন কিতাবও নাযিল হবে না। যাঁরা এ আকীদা পোষণ করবেন তাঁরা মুসলিম। আর যারা এ আকীদা পোষণ করবে না, তারা অমুসলিম-কাফির।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে কোন খুঁত নেই, নেই কোন অপূর্ণতা। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا .

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩)

কুরআন মাজীদে আর ও ইরশাদ হয়েছে :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ .

এবং আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে প্রতিটি বস্তুর স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৮৯)

এতে এ কথা বোঝা যায় যে, মানব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুর নীতি-নির্ধারণী বিবরণ আল-কুরআনে আছে। প্রয়োজনীয় জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সবকিছুই নির্ধারণ করতে হবে। মুজতাহিদ ইমামগণ তাঁদের সম্পূর্ণ জীবন ব্যয় করেছেন এই কাজে। মানব জাতির জীবন-যাপন পদ্ধতির পরিপূর্ণ ও সুষ্ঠু সমাধান তুলে ধরেছেন তাঁরা বিস্তৃতভাবে। এই জীবন ব্যবস্থায় কোনরূপ অপূর্ণতার কথা চিন্তা করা যায় না। মানুষের ঈমান-আকীদা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের মূলনীতিসমূহ ইসলামে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষেই পরিপূর্ণ এবং অতুলনীয়। এতে নতুনভাবে কোন কিছুর সংযোজন বা বিয়োজন করার আদৌ কোন অবকাশ নেই।

ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা ভারসাম্যপূর্ণ, স্বভাবসম্মত এবং মানবিক সামর্থ্যের উপযোগী। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ۔

আল্লাহ্ কারোর উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তাঁর সাধ্যাতীত। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৬)

ইসলাম শান্তিপূর্ণ, নির্ভেজাল এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাতে চায়। মানব জীবনের কোন একটি বিষয় অথবা কোন একটি দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট করাকে ইসলাম কোনক্রমেই সমর্থন করে না। ইবাদত-বন্দেগী, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-আচরণ ও আমল-আখ্লাক তথা জীবনের কোন স্তরে এমন কিছু করা আদৌ ইসলামসম্মত নয় যা ঈমান ও মানবতার ক্ষতি সাধন করে।

একবার তিনজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইবাদত-বন্দেগীর যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার জন্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনের নিকট আসলেন। তাঁদেরকে এ সম্বন্ধে জ্ঞাত করা হলে তাঁরা যেন একে স্বল্প বলে মনে করলেন। এরপর তাঁরা বললেন, কোথায় আমরা আর কোথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পূর্বাপর সব ক্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপর তাঁদের একজন বললেন, আমি সর্বদা রাতভর নামায আদায় করতে থাকব। দ্বিতীয় জন বললেন, আমি সব সময়ই রোযা রাখব একদিনও বাদ দিব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি স্ত্রীসংসর্গ বর্জন করব। কখনও বিয়ে করব না। তারপর নবী কারীম (সা) তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন : তোমরাই কী এ সব কথা বলেছিলে? আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ্ ভীরু ও তাক্ওয়া অবলম্বনকারী। তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি আবার বাদও দিই। আমি নামায আদায় করি আবার ঘুমিয়েও যাই। আমি বিয়েও করি (মহিলাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি না, এটাই হচ্ছে আমার নীতি ও আদর্শ)। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি ও আদর্শ হতে বিমুখ হয়ে থাকবে সে আমার পথের অনুসারী নয়। (বুখারী)

এতে সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, জীবনের সকল অবস্থাতেই ভারসাম্য রক্ষা করে চলা আবশ্যক।

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম নিজেদের মত অন্যদেরকেও ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা যোগায়। আর তাতেই বিশ্ববাসীর জীবনধারায় নেমে আসে প্রশান্তি এবং বিদূরিত হয়ে অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ এবং হানাহানি। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। সাদা-কালো সকল মানুষই আল্লাহ্র বান্দা। সমগ্র মানবজাতি একই পরিবারভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ

সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবারের ন্যায়।[৩]

বস্তুত মানব জাতি একটি দেহের মত। কেননা আমরা সকলেই আদম ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ আবশ্যক। তাই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলাম শুধু মানুষের প্রতিই সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয়নি, উপরন্তু প্রাণীর পরিচর্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্ভিদের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কেও ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اَلرَّحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ .

যারা দয়া করে, দয়াময় আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আকাশবাসী (আল্লাহ্) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আরাফা হতে মুযদালিফার দিকে যাচ্ছিলেন। তখন নবী কারীম (সা) তাঁর পিছনে উট হাঁকানো এবং প্রহারের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি তাদের দিকে ফিরে চাবুক দিয়ে ইশারা করে বললেন : হে লোকসকল! তোমরা ধীর-স্থিরভাবে চল। কেননা উট দৌড়িয়ে নিয়ে যাওয়া কোন নেকীর কাজ নয়। (মিশ্কাত, হজ্জ অধ্যায়)

মোটকথা সমস্ত সৃষ্টি জড়, অজড়, প্রাণী ও প্রকৃতি সকলেই ইসলামের উদারতায় উদ্ভাসিত। ইসলাম শুধু বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম নয়; বরং তা বিশ্বাস ও কর্মের এক সুষম সমন্বয়ের বাস্তব অভিব্যক্তি। সে জন্যই বৈরাগ্য ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ .

ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নেই।[৪]

এ হাদীসের এ বাণী প্রতিটি মানুষকে নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, পরের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য তথা বিশ্বের জন্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মই মূলত মানুষের মানবীয় পরিচয় বিকাশের এবং মনুষত্ব প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানকে তার নিত্যদিনের চিন্তা-কর্মে এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে, সে আল্লাহ্র বান্দা এবং নবীজীর উম্মাত।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ .

আমি জিন ও ইনসানকে শুধু ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬)

উল্লিখিত আয়াতে যে ইবাদতের কথা ব্যক্ত হয়েছে সে ইবাদত শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং উপরোক্ত আমলের আগে-পরে কর্মমুখর মুহূর্তগুলোতেও আল্লাহ্ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে যেন বৈষয়িক লোভ-লালসায় পড়ে কেউ পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী না হয়ে যায়। প্রতিদিনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শের অনুসরণই হল উল্লিখিত আয়াতে ইবাদতের মূল তাৎপর্য।

ঈমান, আমল ও ইহ্সানের নাম দীন

ঈমান, আমল ও ইহ্সানের নাম দীন।

১. ঈমান : ঈমান অর্থ হল, শরী'আতের যাবতীয় হুকুম-আহ্কাম অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং এগুলোকে নিজের দীন হিসাবে বরণ করে নেওয়া। পরিপূর্ণ মু'মিন সেই ব্যক্তি যিনি শরী'আতের বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন এবং এগুলোর মৌখিক স্বীকৃতিসহ বাস্তব জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে আমল করে চলেন।

ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। ঈমানে মুফাস্সাল শীর্ষক বাক্যে সেই বিষয়গুলোর সহজ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ·

আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফিরিশ্তাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, আখিরাতের উপর, তাক্দীরের ভাল-মন্দ সব কিছু আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়—এর উপর, এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার উপর।

উল্লিখিত মৌলিক বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কস্মিনকালেও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখবেন তাকেই মু'মিন বলা হবে।

২. আমল : আমল বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন, ক. ইবাদত, খ. মু'আমালাত—লেনদেন, গ. মু'আশারাত—আচার-আচরণ, ঘ. সিয়াসাত—রাষ্ট্রনীতি, ঙ. ইক্তিসাদিয়্যাত—অর্থনীতি, চ. দাওয়াত ও জিহাদ ইত্যাদি।

ক. ইবাদত : ইবাদত চার প্রকার : নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। পৃথিবীর লোভ-লালসার মধ্যেও মানুষ যেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কথা ভুলে না যায় তাই দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। নিজের মধ্যে তাক্ওয়া এবং সংযম অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বছরে একমাস রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সামর্থ্যবান ব্যক্তি প্রতি বছর নিজ অর্থ-সম্পদ থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং উৎপন্ন শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ অথবা ক্ষেত্রভেদে বিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য প্রদান করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে সামর্থ্যবান হলে আল্লাহ্র মহব্বতে মাতোয়ারা হয়ে জীবনে একবার হাজ্জ আদায় করার হুকুম রয়েছে।

খ. মু'আমালাত-লেনদেন : মু'আমালাত তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে আমানতদারী ও সততা ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষাসমূহের অন্যতম। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি নিজের লেনদেন ও কাজ-কারবারে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত, অঙ্গীকার পূর্ণ করে, মানুষকে

ধোঁকা দেয় না, আমানত খিয়ানত করে না, মানুষের হক নষ্ট করে না, ওজনে কম দেয় না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং সুদ-ঘুষসহ যাবতীয় অবৈধ রোজগার থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে, সেই হল প্রকৃত মুসলিম। এ কারণেই লেনদেনে সততা ও আমানতদারী রক্ষা করে চলার প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

গ. **মু'আশারাত-আচার আচরণ :** মু'আশারাত তথা সামাজিক জীবনের আচার-আচরণে যাতে শিষ্টাচারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং মানুষ পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করতে পারে, সে জন্য ইসলাম এ বিষয়ের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পরিবারে, সমাজে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, আপন-পর, নর-নারী সকলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে এ ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধিবিধান রয়েছে। সেসব বিধিবিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং অনুসরণের মাধ্যমেই একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ঘ. **সিয়াসাত-রাষ্ট্রনীতি :** ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ দীন, তাই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও ইসলাম নীতিমালা ঘোষণা করেছে। ইসলামে রাষ্ট্রনীতি ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ও ইসলামী বিধি-বিধান প্রত্যাখ্যানকারীর শাস্তি প্রদান একান্ত আবশ্যক। অনুরূপ দেশ ও জাতির নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সামরিক শক্তি অর্জন ও প্রয়োজনে সেনা অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই যারা ইসলামে সিয়াসাত নেই বা ইসলাম ও রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বলে মনে করে, তাদের ধারণা যথার্থ নয়।

ঙ. **ইক্তিসাদিয়্যাত-অর্থনীতি :** অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কিভাবে পরিচালনা করতে হবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। অর্থনৈতিক জীবনে যাতে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য শরী'আতের সীমালজ্ঘন করে আপন প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশি মুতাবিক উপার্জন ও ব্যয় করাকে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। শ্রমিকের মজুরী নিশ্চিত করা হয়েছে। গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায় সেজন্য যাকাত, উশ্‌র, খারাজ ইত্যাদির বিধান জারী করা হয়েছে। কেউ যেন অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে টাকার পাহাড় গড়ে তুলতে না পারে সেজন্য কঠোর নির্দেশ রয়েছে। এমনিভাবে আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ প্রথাকে রহিত করা হয়েছে। আরো রহিত করা হয়েছে জুয়া, লটারী, কালোবাজারীসহ অবৈধ অর্থ উপার্জনের যাবতীয় পন্থা-পদ্ধতি।

চ. **দাওয়াত ও জিহাদ :** ইসলাম শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। এই দীনকে টিকিয়ে রাখতে হলে দাওয়াতের কোন বিকল্প নেই। দাওয়াত মানে পথহারা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে, সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে আহ্বান করা। বস্তুত হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে এসেছেন সকলেই এ দাওয়াতের আমল করেছেন। কুরআন ও হাদীসে এর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যারা অসৎ কাজে বাধা দেয় না, তাদেরকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ জাতীয় লোকদেরকে ওহীর বরকত হতে বঞ্চিত হওয়ার কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

দাওয়াতের পাশাপাশি জিহাদও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীনের নির্দেশসমূহ যিন্দা করা এবং ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা যেমন একজন মু'মিনের দায়িত্ব, অনুরূপভাবে দীনের হিফাযতের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়াও একান্ত কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসার এক মহান ও কল্যাণময় মাধ্যম হল এই 'জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ'। জিহাদ ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে ব্যক্তি জিহাদ না করে বা অন্তরে জিহাদের নিয়্যাত না রাখে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। মু'মিনের যিন্দেগী আমৃত্যু জিহাদী যিন্দেগী। জিহাদ তার কর্মসূচি, শাহাদাত তার স্বপ্ন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তার উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে জিহাদের প্রতি জোর তাকিদ করা হয়েছে। কাজেই জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩. ইহ্সান ও আধ্যাত্মিকতা : ইহ্সান বিদ্যুতের পাওয়ার হাউজের মত। পাওয়ার হাউজের সাথে সংযোগ না থাকলে যেমন বাতি জ্বলে না, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ব্যতিরেকে বান্দার কোন আমল ও ইবাদতই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। এ কারণেই ইসলাম এ বিষয়টির প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইহ্সানের মূল কথা হল : ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত, অপবাদ, মিথ্যা অহংকার ইত্যাদি মন্দস্বভাব হতে পাক-পবিত্র হয়ে ইখ্লাস, আমানাতদারী, বিনয় ও নম্রতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি উত্তম চরিত্রের দ্বারা নিজেকে সুশোভিত করা। বস্তুর এর জন্য নিরলস সাধনা ও মুজাহাদা আবশ্যক। মুজাহাদার মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তখনই সে হতে পারে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, আশরাফুল মাখলূকাত। এর জন্য আত্মার সংশোধন আবশ্যক। বস্তুত আত্মাই দেহকে পরিচালিত করে, দেহ আত্মাকে নয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

انَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ ·

নিশ্চয়ই মানুষের শরীরে একটি গোশ্তের টুক্রা আছে। তা বিশুদ্ধ থাকলে গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর তা বিনষ্ট হলে গোটা শরীরই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায়। জেনে রাখ, ঐ গোশ্তের টুক্রাটি হল মানুষের কাল্ব বা আত্মা। (সহীহ্ বুখারী, ঈমান অধ্যায়)

মানুষের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধন এমন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বয়ং নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّمَا بُعِثْتُ لاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الاَخْلاَقِ ·

মাকারিমে আখ্লাক তথা সচ্চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।[৫]

আল্লাহ্

'আল্লাহ্' (الله) শব্দটি সৃষ্টিকর্তার 'ইস্মে যাত' বা সত্তাবাচক নাম। আল্লামা তাফতাযানীর বর্ণনামতে :

৬—

اَللّٰهُ عَلَمٌ عَلَى الاَصَحِّ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ بِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ ·

বিশুদ্ধতম মতানুসারে 'আল্লাহ্' শব্দটি ঐ চিরন্তন সত্তার সত্তাবাচক নাম যাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী এবং যিনি সমস্ত প্রশংসনীয় ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারী।[৬]

আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাই এ নামের দ্বিবচন ও বহুবচন হয় না। অধিকাংশ আলিমের মতে 'আল্লাহ্' শব্দটি কোন বিশেষ ধাতু থেকে উদ্ভূত নয়। আরবী ভাষায় এর হুবহু অর্থজ্ঞাপক কোন প্রতিশব্দ নেই। অন্য কোন ভাষায় 'আল্লাহ্' শব্দের কোন অনুবাদও হয় না। সুতরাং খোদা, God বা ঈশ্বর কোনটাই আল্লাহ্র শব্দের সম্যক পরিচয় বহন করতে পারে না।

শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, আল-আকীদাতুত্ তাহাভিয়্যা ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে আল্লাহ্র পরিচয় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "এ মহাবিশ্বের অবশ্যই একজন কাদীম তথা অনাদি-অনন্ত সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি সব সময় আছেন এবং থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ও অবশ্যম্ভাবী। প্রশংসনীয় সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা তিনি গুণান্বিত। সব ধরনের দোষত্রুটি হতে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। সকল সম্ভাব্য বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাশালী। সকল সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছায় আবর্তিত। তিনি সর্বশ্রোতা ও সম্যক দ্রষ্টা। তাঁর কোন উদাহরণ নেই। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং নেই কোন সহযোগী। তাঁর কোন নযীর নেই। তিনি বে-মেছাল সত্তা। তাঁর অবশ্যম্ভাবী ও নিত্য অস্তিত্বে, ইবাদত-বন্দেগীর অধিকারে এবং বিশ্ব জাহানের শৃঙ্খলা বিধানে কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনিই অসুস্থকে সুস্থ করেন, সকল সৃষ্টবস্তুর রিয্ক দেন এবং সব ধরনের অসুবিধা ও কষ্ট দূর করেন তিনিই।

"আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন সত্তায় প্রবিষ্ট ও একীভূত হওয়া থেকে পবিত্র। তিনি দেহ বিশিষ্ট নন এবং কোন দিক বা স্থানের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। মু'মিনগণ আখিরাতে তাঁর দীদার লাভে ধন্য হবেন। তিনি যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না। তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কাজ সম্বন্ধে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় না। তাঁর প্রতিটি কাজই হিক্মাতপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি ব্যতীত যথার্থ কোন নির্দেশদাতা নেই এবং নেই কোন হাকীম।"

আরশ্, কুর্সী, লাওহ-কলম, আসমান-যমীন, গাছপালা, বৃক্ষলতা এক কথায় দৃশ্যমান ও অদৃশ্য যতকিছু রয়েছে সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি স্বঅস্তিত্বে সর্বদা বিরাজমান। এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। স্বভাবগতভাবেই আমরা একথা বুঝতে পারি যে, এ বিশ্ব কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় সৃষ্টি হয় নি, বরং এর পিছনে রয়েছে এ মহাজ্ঞানীর সুনিপুণ পরিকল্পনা। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুরই অস্তিত্ব দান করেন। এ সত্ত্বেও অজ্ঞতা ও অহমিকার কারণে যুগে যুগে একদল লোক আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ·

(তাদেরকে রাসূলগণ বলেছিলেন) আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে : যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? (সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ১০)

সুপরিকল্পিতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিসহ সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ·

পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি ‘আলাকে, তারপর ‘আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, তারপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশ্‌তদ্বারা, তারপর একে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১৪)

এতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ইঙ্গিতেই আমাদের অস্তিত্ব। এ বিশ্ব আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার ফসল নয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ·

তারা কী স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা নিজেরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? (সূরা তূর, ৫২ : ৩৫-৩৬)

সারকথা হল, এ মহাবিশ্বের অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। তিনিই হলেন আল্লাহ্। তাঁর অস্তিত্ব প্রশ্নাতীত। তা সত্ত্বেও যুক্তির ধুয়া তুলে এ বিষয়ে অহেতুক তর্কের অবতারণা করা হলে সে প্রেক্ষিতে বলা যায় :

১. এ পৃথিবীতে আমরা যত মানুষ বসবাস করছি আমরা কেউই আমাদের নিজেদের স্রষ্টা নই। এমনিভাবে আমাদের সন্তানদের স্রষ্টাও আমরা নই। যে বিশাল আকাশের সামিয়ানার নিচে আমরা বসবাস করছি, তাও আমাদের সৃষ্টি নয়। যুগে যুগে যে সব দাম্ভিক ক্ষমতার দাপটে ইলাহ্ হওয়ার দাবি করেছে, তারাও এসব কিছুর স্রষ্টা হওয়ার দাবি করার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেনি। জড় পদার্থও এসব কিছুর স্রষ্টা হতে পারে না। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, কোন কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়ে যায়নি; বরং এক মহান স্রষ্টাই বিশ্বের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই হলেন মহান আল্লাহ্, যিনি এক ও অদ্বিতীয়।

২. কোন বাড়ি-ঘর, কলকারখানা দেখার সাথে সাথেই আমাদের হৃদয়পটে এ কথা ভেসে উঠে যে, কোন ইঞ্জিনিয়ার বা মিস্ত্রীই এগুলো তৈরি করেছেন। ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রী ছাড়া এগুলো হতেই পারে না। ঠিক তদ্রুপ এ মহাবিশ্ব স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়নি। তিনিই আগুন, পানি, মাটি, বাতাস সহ সর্বপ্রকার উপাদান দিয়ে এ বিশ্ব এবং এতে যত কিছু আছে, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

৩. খেলার বলকে পা দ্বারা আঘাত করলে তা দ্রুত উপরের দিকে উঠে আবার কিছুক্ষণের মধ্যে নিচে নেমে আসে। এটা কখনও উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে না। কিন্তু এ বিশাল মহাশূন্যের মধ্যে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র ঝুলন্ত অবস্থায়ই বিদ্যমান রয়েছে। এভাবে অসংখ্য তারকা অবিরত ঘূর্ণায়মান। কখনো কোথাও থামছে না, কখনো নিচে পড়ে যায় না, কখনো নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয় না এবং এগুলোর পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হয় না কখনো। কে এগুলোকে মহাশূন্যে নিয়ন্ত্রণ করছে? কে এ সুশৃঙ্খল নিয়মের তত্ত্বাবধান করছে? এ সব প্রশ্নের একমাত্র জওয়াব এটাই যে, এ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্‌র অসীম কুদ্‌রতেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

انَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلاَ وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ٠

আল্লাহ্ তা'আলাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এগুলো স্থানচ্যুত না হয়, এগুলো স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে সংরক্ষণ করবে? তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪১)

৪. এটা সুনিশ্চিত যে, আমাদের অস্তিত্বের একটা সূচনাকাল রয়েছে এবং এটাও সুবিদিত যে, পূর্বে আমরা কিছুই ছিলাম না। আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি এর উপাদানগুলোর অবস্থাও ঠিক অনুরূপই। অর্থাৎ এগুলোরও একটা সূচনাকাল রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদগণ এগুলোর একটি অনুমিত সূচনাকাল বর্ণনা করে থাকেন। সে সময়টা যতই দীর্ঘ হোক না কেন এর পূর্বে এ উপাদানগুলোর নিশ্চয়ই কোন অস্তিত্ব থাকে না। আর পূর্বে যে জিনিসের কোন অস্তিত্ব ছিল না তা আদৌ নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একটি নতুন জিনিস তৈরি করা হল। কিন্তু জানা গেল না যে, এর প্রস্তুতকারক কে। তখন এ কথা বলা হয় যে, এর প্রস্তুতকারক অজ্ঞাত ব্যক্তি। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, এর কোন প্রস্তুতকারক নেই। অনুরূপভাবে এ মহাবিশ্বেরও একজন স্রষ্টা আছেন কিন্তু আমরা তাঁকে দেখছি না। তাই এ কথা তো বলা যাবে না যে, এর কোন স্রষ্টা নেই। জনৈক কবি বলেছেন :

وَفِى كُلِّ شَىْءٍ لَشَاهِدٌ　　　يَدُلُّ عَلى اَنَّهُ وَاحِدٌ ٠

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান। আর তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়।[৭]

তাওহীদ-একত্ববাদ

আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। সত্তাগত দিক থেকে তিনি যেমনিভাবে এক ও অদ্বিতীয়, অনুরূপভাবে গুণাবলীর দিক থেকেও তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি লা-শারীক। ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারেও তাঁর কোন শরীক নেই। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ٠

তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্ তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু। (সূরা বাকারা, ২ : ১৬৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ٠

বলুন, তিনিই আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নয়। (সূরা ইখ্‌লাস, ১১২ : ১-৪)

একাধিক ইলাহ্ থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٠

যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২২)

একাধিক ইলাহ্ হওয়ার ধারণা অবাস্তব। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে :

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِن وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ ۢبِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔

আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ও নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ কত পবিত্র। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ৯১)

একাধিক ইলাহ্ হওয়ার ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। এর পেছনে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। এতদসত্ত্বেও কোন কোন মানুষ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে কেউ কেউ পাথরের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কেউ চন্দ্র-সূর্যের, কেউ বা আগুনের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। আবার কেউ তো নিজেই ইলাহ্ হওয়ার দাবি উত্থাপন করেছে, যেমন ফির'আউন ও নমরূদ। এ বিষয়ে নমরূদের সাথে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বিতর্কের বিষয়টি আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۔

তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইব্রাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলল, আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্বদিক হতে উদয় করেন, তুমি একে পশ্চিমদিক হতে উদয় করাও তো। তারপর যে কুফ্রী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা বাকারা, ২ : ২৫৮)

অনুরূপভাবে খ্রীস্টান সম্প্রদায় তাদের নবীর মর্যাদা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে ইলাহ্-এর মর্যাদার অধিষ্ঠিত করেছে। পরিণামে তারা পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ হয়েছে। অথচ নবী-রাসূলগণের সকলেই ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা। হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۔

মারইয়াম তনয় মাসীহ্ তো কেবল একজন রাসূল। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তারা উভয় খাদ্যাহার করতেন। দেখ, আমি ওদের জন্য নিদর্শন

কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আরো দেখ, ওরা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৭৫)

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। কেউ যদি তাঁর সত্তা, গুণাবলী এবং ইবাদতে অন্য কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করে তবে সে মহাপাপী; তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ٠

কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করলে আল্লাহ্ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৭২)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ٠

নিশ্চয়ই (আল্লাহ্র সাথে) শিরক চরম যুল্ম। (সূরা লুক্মান, ৩১ : ১৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً ۢبَعِيْدًا ٠

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (সূরা নিসা, ৪ : ১১৬)

এ ছাড়াও বহু আয়াতে তাওহীদের উল্লেখ রয়েছে। যুগে যুগে আগত নবী-রাসূলগণও তাওহীদের শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। প্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত লক্ষাধিক পয়গাম্বর এ পৃথিবীতে এসেছেন এবং তাঁরা সকলেই বলেছেন :

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ٠

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৭৩)

মুসলিম দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় :

১. একাধিক ইলাহ্ থাকা অবাস্তব। কেননা যদি আল্লাহ্ ছাড়া আরো কোন ইলাহ্ থাকে তবে কেন তারা নির্বাক! কেন তারা এ পৃথিবীতে নতুন কোন বিধান নাযিল করছে না? কল্পিত ইলাহ্দের এ নীরবতা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।

২. এ মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ইলাহ্ কি যথেষ্ট নয়? যদি যথেষ্ট হয় তবে অন্য ইলাহের কোন প্রয়োজন থাকে না। আর যদি যথেষ্ট না হয় তবে তো তিনি হবেন অপারগ। আর অপারগ এবং অক্ষম সত্তা কখনো ইলাহ্ হতে পারে না।

আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রমাণে আরো বহু প্রমাণ মুসলিম দার্শনিক ও গবেষকগণ পেশ করেছেন। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ এক, তাঁর সত্তা, গুণাবলী এবং ইবাদতে কেউ তাঁর শরীক বা অংশীদার নয়। এটাই তাওহীদ বা একত্ববাদের মূলকথা। এর পরিপন্থী আকীদা ও কর্ম উভয়ই শিরক, যা আল্লাহ্র একত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এর থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

মহান আল্লাহ্র গুণাবলী

আল্লাহ্র সত্তা অসীম। আমাদের জ্ঞান সসীম। এ সসীম জ্ঞানের মাধ্যমে অসীম প্রভুর সত্তা সম্বন্ধে যথাযথ পরিচয় লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি আল-কুরআনের বহু আয়াতে নিজের গুণবাচক পরিচয় তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ্র বহু সিফাত ও গুণাবলী রয়েছে। ইমাম আবূ মনসূর আল-মাতুরিদী (র)-এর মতে আল্লাহ্র সত্তাসূচক গুণ আটটি : ১. হায়াত, ২. ইল্ম, ৩. ইচ্ছা, ৪. কুদ্রত বা শক্তি, ৫. শ্রবণ, ৬. দৃষ্টি, ৭. কালাম ও ৮. তাকভীন।

১. হায়াত : হায়াত আল্লাহ্ তা'আলার একটি গুণ। তিনি চিরন্তন, চিরঞ্জীব। তিনি সব সময় আছেন এবং সব সময় থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। তিনি সমগ্র সৃষ্টির উৎস। তিনি নিজের ইচ্ছা ও পসন্দ অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা অস্তিত্ব দান করেন।

২. ইল্ম বা জ্ঞান : আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞানী। সর্ববিষয়ে তাঁর জ্ঞান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সমভাবে পরিব্যাপ্ত। তাঁর জ্ঞানে ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন সম্ভাবনা নেই। প্রকাশ্য অথবা গোপন, অতীত অথবা ভবিষ্যত, দুনিয়া অথবা আখিরাত সবকিছুই তাঁর নিকট সমান। কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। তাঁর ইল্ম, চিরন্তন ও বাসীত (অবিভাজ্য)। তাঁর ইল্ম সমস্ত সৃষ্টি পরিব্যাপ্ত। তিনি গোটা সৃষ্টির প্রতি সর্বদা নজর রাখেন। যমীনের বুকে বিশাল মরুভূমিতে যত বালুকণা আছে, সাগর-মহাসাগরে পানির যত বিন্দু আছে, বন-বনানীর গাছ-গাছালিতে যত ডালপালা রয়েছে, প্রতিটি ডালে যতটি ছড়া রয়েছে এবং প্রতিটি ছড়ায় যত শস্যদানা রয়েছে, মানুষের মাথায় ও পশুর চামড়ায় যত পশম রয়েছে সব কিছুই আল্লাহ্র ইল্মে বিদ্যমান। সৃষ্টি জগতের প্রতিপালনে যখন যার যা কিছু দরকার সবই তাঁর অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهِ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ - اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ .

তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। (সূরা মূলক, ৬৭ : ১৩-১৪)

এ সুপ্রশস্ত জ্ঞান এবং পূর্ণ অবহিতি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। তিনিই অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত। গায়বের ইল্‌ম কোন মানুষের নেই। তবে নবী-রাসূলগণকে যখন তিনি ইচ্ছা করেন অদৃশ্য সম্বন্ধে জানিয়ে দেন। সে ভিত্তিতে তাঁরা নিজ নিজ উম্মাতকে এ সম্পর্কে অবগত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۔

সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া আর কেউই তা জানে না। স্থল ও জলভাগে যা কিছু আছে এর সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না এবং ভেজা কিংবা শুক্‌নো এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৯)

৩. ইচ্ছা বা সংকল্প : এ বিশাল পৃথিবী আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নিজের ইচ্ছায়ই তা করেছেন। এ বিশ্ব তিনি তাঁর ইচ্ছামাফিক সৃষ্টি করেছেন। যখন যা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, করেছেন। তিনি কারো বাধ্য নন। রঙ-বেরঙের বিভিন্ন জিনিস যা আসমান-যমীনে দেখা যায়, এগুলো সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

এই যে সূর্য ও অন্যান্য তারকারাজি, লক্ষ-কোটি বছর ধরে আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে, এ তাঁরই ইচ্ছার প্রতিফলন। এ জগতে যত সৃষ্টি বস্তু রয়েছে এগুলোর গতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাচ্যুত করেন। তিনি যা চান এবং যেভাবে চান তাই হয়। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোন কিছুই হয় না। তাঁর ইচ্ছায় একই বস্তু হতে ভিন্ন স্বাদের একাধিক বস্তু জন্মায়। একই স্থানে উৎপাদিত ফসলের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মৌমাছি তুতগাছের পাতা খেলে তা মধুতে পরিণত হয়। আর গুটি পোকা সে গাছের পাতা খেলে তা পরিণত হয় রেশমে। অন্যান্য পশু-পাখি খেলে তা বিষ্ঠায় পরিণত হয়। আর হরিণে খেলে তা মিশ্‌কে পরিণত হয়। অথচ বৃক্ষ একটিই। (তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর)। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন অথবা কোন কিছুকে অস্তিত্ব দান করতে চান তখন তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۔

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। (সূরা হূদ, ১১ : ১০৭ অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۔

তাঁর ব্যাপার এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাকে বলেন, হও, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮২)

৪. কুদ্‌রত বা শক্তি : এ বিশ্ব, এর গতি এবং স্থিতি সবই আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদ্‌রত এবং শক্তিমত্তারই বহিঃপ্রকাশ। বস্তুর মধ্যে যে শক্তি নিহিত রয়েছে তার উৎস বস্তু নয়;

বরং এর উৎস আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কুদ্রত। মাটি ভেদ করে চারাগাছ বের হয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে তা বড় হয়ে থাকে। অবশেষে তা শক্তিশালী হয়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়। এটিও আল্লাহ্র কুদ্রতের বিরাট নিদর্শন। নদীর প্রবল স্রোতধারায় এক কূল ভাঙ্গে অপর কূল গড়ে। এ সবই আল্লাহ্র অসীম কুদ্রতের নিদর্শন।

মানুষের দেহে যে হৃদয় রয়েছে এবং তাতে যে স্পন্দন রয়েছে এবং শিরা-উপশিরায় যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে অনুভূতি রয়েছে, এসবই আল্লাহ্র কুদ্রতের বহিঃপ্রকাশ। এ মহাবিশ্বের কোন বস্তু সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তার শক্তি নিজস্ব। এতে আল্লাহ্র কুদ্রতের কোন দখল নেই; বরং বস্তুর শক্তির উৎস একমাত্র আল্লাহ্র যাত ও কুদ্রত।

৫. শ্রবণশক্তি : উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যাবতীয় প্রশংসা ঐ মহান সত্তার যিনি সমস্ত আওয়াজ শুনতে পান। একবার খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসেন। তারপর তিনি ঘরের এক কোণে বসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বললেন। আমি তাঁর কথা শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে নাযিল করেন :

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۔

আল্লাহ্ সে মহিলাটির কথা অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শুনেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১)

মানুষ যে কথাবার্তা বলে, আলোচনা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তা সব কিছুই শোনেন। একজনের কথা শুনতে গিয়ে তিনি অন্যজনের কথা থেকে বে-খবর থাকেন না। যদি কোথাও কোন গোপন পরামর্শ হয় তবে তাও তিনি শুনতে পান। যে ভাষায়ই কথা বলা হোক না কেন, তিনি সব শোনেন এবং সব বুঝেন। এমনকি গহীন সমুদ্রের তলদেশে বসেও যদি কেউ কথা বলে, তাও তিনি শুনতে পান।

৬. দৃষ্টিশক্তি : আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, তিনি সম্যক দ্রষ্টাও বটে। সৃষ্টির সব কিছুই তিনি দেখেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির অধিগত। এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর দৃষ্টির অগোচরে। তাঁর দৃষ্টিশক্তি কোন উপকরণের মুখাপেক্ষী নয়। যত গভীর অন্ধকারই হোক না কেন, সেখানেও তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে যায়। ইরশাদ হয়েছে :

اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ

তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। (সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ২৬)

৭. কালাম : এ বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় জিন, ইনসান, ফিরিশতা তথা সৃষ্টিকুলের পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহ্কাম জারী করেছেন এর সব কিছু কালামের মাধ্যমেই হয়েছে। কুরআন আল্লাহ্র কালাম। তা মাখলূক নয়, বরং কাদীম ও চিরন্তন। আল্লাহ্র কালাম অসীম যেমন তাঁর সত্তা অসীম। তাঁর কালামের কোন শেষ নেই। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ২৭)

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۔

বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র আনলেও। (সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ : ১০৯)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার কথা বলার ধরন এমন একটি বিষয় যা আমাদের জ্ঞান সীমার বাইরে। সে পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৮. তাকভীন : আসমান, যমীন, আরশ্, কুরসী, লাওহ্, কলম, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা এক কথায় সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর স্রষ্টা তিনিই। আমাদের কর্মের স্রষ্টাও তিনি। এ সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে :

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۔

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও। (সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ : ৯৬)

সৃষ্টি করা তাঁর এ গুণটিও অনাদি ও অনন্ত। যখন ইচ্ছা যা যেভাবে ইচ্ছা তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তাঁর কোন নমুনার প্রয়োজন হয় না। সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ধ্বংস করে তিনি পুনরায় তা সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۔

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই—তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি বলেন, হও, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮১-৮২)

আল্লাহ্‌র সত্তাবাচক এ সব গুণ ব্যতীত তাঁর অনেক গুণবাচক বা সিফাতী গুণ রয়েছে। যেমন : (اَلْخَالِقُ) সৃষ্টিকর্তা, (اَلْمُصَوِّرُ) রূপদাতা ইত্যাদি। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۔

একেক মুহূর্তে তিনি একেক শানে থাকেন। (সূরা আর-রাহমান, ৫৫ : ২৯)

তাঁর শান যেমন অসংখ্য ও অগণিত, অনুরূপভাবে তাঁর সিফাতও অসংখ্য ও অগণিত। হাদীস শরীফে আল্লাহ্‌র গুণবাচক নিরানব্বই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি (সিফাতী) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আল্লাহ্ ঐ সত্তা যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি (১) اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহমান্) - অসীম দয়াময়, (২) اَلرَّحِيْمُ (আর রাহীমু) - পরম দয়ালু, (৩) اَلْمَلِكُ (আল-মালিকু) - অধিপতি, (৪) اَلْقُدُّوْسُ (আল-কুদ্দুসু) - অতি পবিত্র, (৫) اَلسَّلَامُ (আস্-সালামু) - শান্তিদাতা (৬) اَلْمُؤْمِنُ (আল-মু'মিনু) - নিরাপত্তা বিধায়ক, (৭) اَلْمُهَيْمِنُ (আল-মুহায়মিনু) - রক্ষক, (৮) اَلْعَزِيْزُ (আল-'আযীযু) - পরাক্রমশালী, (৯) اَلْجَبَّارُ (আল-জাব্বারু) - প্রবল, (১০) اَلْمُتَكَبِّرُ (আল-মুতাকাব্বিরু)-মহিমান্বিত, (১১) اَلْخَالِقُ (আল-খালিকু) - সৃষ্টিকর্তা, (১২) اَلْبَارِئُ (আল-বারিউ) -উদ্ভাবনকর্তা, (১৩) اَلْمُصَوِّرُ (আল-মুসাওবিরু) - রূপদাতা, (১৪) اَلْغَفَّارُ (আল-গাফ্‌ফারু) - অতি ক্ষমাশীল, (১৫) اَلْقَهَّارُ (আল-কাহ্‌হারু) - মহাপরাক্রান্ত, (১৬) اَلْوَهَّابُ (আল-ওয়াহ্‌হাবু) -মহাদাতা, (১৭) اَلرَّزَّاقُ (আর-রায্‌যাকু) - রিযিকদাতা, (১৮) اَلْفَتَّاحُ (আল-ফাত্তাহু) - বিজয়দাতা, (১৯) اَلْعَلِيْمُ (আল-'আলীমু) - সর্বজ্ঞ, (২০) اَلْقَابِضُ (আল-কাবিযু) - সংকোচনকারী, (২১) اَلْبَاسِطُ (আল-বাসিতু) - সম্প্রসারণকারী, (২২) اَلْخَافِضُ (আল-খাফিযু) - অবলম্বনকারী, (২৩) اَلرَّافِعُ (আর রাফি'উ) - উন্নতিদাতা, (২৪) اَلْمُعِزُّ (আল-মু'ইয্‌যু) - সম্মানদাতা, (২৫) اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল্লু) - অপমানকারী, (২৬) اَلسَّمِيْعُ (আস-সামী'উ) - সর্বশ্রোতা, (২৭) اَلْبَصِيْرُ (আল-বাসীরু) - সর্বদ্রষ্টা, (২৮) اَلْحَكَمُ (আল-হাকামু) - মীমাংসাকারী, (২৯) اَلْعَدْلُ (আল-'আদ্‌লু) - ন্যায়নিষ্ঠ, (৩০) اَللَّطِيْفُ (আল-লাতীফু) - সূক্ষ্মদর্শী, (৩১) اَلْخَبِيْرُ (আল-খাবীরু) - সম্যক অবহিত, (৩২) اَلْحَلِيْمُ (আল-হালীমু) - পরম সহনশীল, (৩৩) اَلْعَظِيْمُ (আল-আযীমু) - মহিমময়, (৩৪) اَلْغَفُوْرُ (আল-গাফূরু) - অতি ক্ষমাশীল, (৩৫) اَلشَّكُوْرُ (আশ্-শাকূরু) - গুণগ্রাহী, (৩৬) اَلْعَلِيُّ (আল-আলীয়্যু) - মহান, (৩৭) اَلْكَبِيْرُ (আল-কাবীরু) - শ্রেষ্ঠ, (৩৮) اَلْحَفِيْظُ (আল-হাফীযু) - মহারক্ষক, (৩৯) اَلْمُقِيْتُ (আল-মুকীতু) - শান্তিদাতা, (৪০) اَلْحَسِيْبُ (আল-হাসীবু) - হিসাব গ্রহণকারী, (৪১) اَلْجَلِيْلُ (আল-জালীলু) - মহিমান্বিত, (৪২) اَلْكَرِيْمُ (আল-কারীমু) - অনুগ্রহকারী মহামান্য, (৪৩) اَلرَّقِيْبُ (আর-রাকীবু) - তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক, (৪৪) اَلْمُجِيْبُ (আল-মুজীবু) - আহ্বানে সাড়াদাতা, (৪৫) اَلْوَاسِعُ (আল-ওয়াসিউ) - সর্বব্যাপী, (৪৬) اَلْحَكِيْمُ (আল-হাকীমু) - প্রজ্ঞাময়, (৪৭) اَلْوَدُوْدُ (আল-ওয়াদূদু) - প্রেমময়, (৪৮) اَلْمَجِيْدُ (আল-মাজীদু) - গৌরবময়, (৪৯) اَلْبَاعِثُ (আল-বা'ঈসু) - পুনরুত্থানকারী, (৫০) اَلشَّهِيْدُ (আশ-শাহীদু) - প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, (৫১) اَلْحَقُّ (আল-হাক্কু) - সত্য, (৫২) اَلْوَكِيْلُ (আল-ওয়াকীলু) - কর্মবিধায়ক, (৫৩) اَلْقَوِىُّ (আল-কাবিয়্যু) - শক্তিধর, (৫৪) اَلْمَتِيْنُ (আল-মাতীনু)- মহাপরাক্রমশালী, (৫৫) اَلْوَلِىُّ (আল-ওয়ালীয়্যু) - অভিভাবক,

(৫৬) اَلْحَمِيْدُ (আল-হামীদু) - প্রশংসিত, (৫৭) اَلْمُحْصِىْ (আল-মুহ্সী) - পরিব্যাপ্তকারী, (৫৮) اَلْمُبْدِئُ (আল- মুবদিউ) - আদিস্রষ্টা, (৫৯) اَلْمُعِيْدُ (আল-মু'ঈদু) - পুনঃসৃষ্টিকারী, (৬০) اَلْمُحْيِىْ (আল- মুহ্য়ী) - জীবনদাতা, (৬১) اَلْمُمِيْتُ (আল-মুমীতু) - মৃত্যুদাতা, (৬২) اَلْحَىُّ (আল-হাইয়্যু) - চিরঞ্জীব, (৬৩) اَلْقَيُّوْمُ (আল-কায়্যুমু) চিরস্থায়ী, (৬৪) اَلْوَاجِدُ (আল-ওয়াজিদু) - সর্বপ্রাপক, (৬৫) اَلْمَاجِدُ (আল-মাজিদু) - মহীয়ান, (৬৬) اَلْوَاحِدُ (আল-ওয়াহিদু) - একক, (৬৭) اَلْاَحَدُ (আল-আহাদু) - এক, (৬৮) اَلصَّمَدُ (আস্-সামাদু) - অমুখাপেক্ষী, (৬৯) اَلْقَادِرُ (আল-কাদিরু) - ক্ষমতাবান, (৭০) اَلْمُقْتَدِرُ (আল-মুক্তাদিরু) - প্রবল ক্ষমতাবান, (৭১) اَلْمُقَدِّمُ (আল- মুকাদ্দিমু) - অগ্রবর্তীকারী, (৭২) اَلْمُؤَخِّرُ (আল-মুআখ্খিরু) - পশ্চাদবর্তীকারী, (৭৩) اَلْاَوَّلُ (আল-আউয়্যালু) - আদি, (৭৪) اَلْاٰخِرُ (আল-আখিরু) - অন্ত, (৭৫) اَلظَّاهِرُ (আয-যাহিরু) - ব্যক্ত, (৭৬) اَلْبَاطِنُ (আল-বাতিনু) - গুপ্ত, (৭৭) اَلْوَالِىُّ (আল-ওয়ালিয়্যু) - কার্যনির্বাহক, (৭৮) اَلْمُتَعَالِ (আল- মুতা'আলী) - সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, (৭৯) اَلْبَرُّ (আল-বাররু) - কৃপাময়, (৮০) اَلتَّوَّابُ (আত্-তাওওয়াবু) - তাওবা কবূলকারী, (৮১) اَلْمُنْتَقِمُ (আল-মুন্তাকিমু) - দণ্ডবিধায়ক, (৮২) اَلْعَفُوُّ (আল-আফুওয়্যু) - ক্ষমাকারী, (৮৩) اَلرَّءُوْفُ (আর রাউফু) - দয়ার্দ্র, (৮৪) مَالِكَ الْمُلْكِ (মালিকুল মুল্কি) - বিশ্বের অধিপতি, (৮৫) ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (যুল-জালালি ওয়াল ইক্রাম) - মহিমান্বিত ও মহানুভব, (৮৬) اَلْمُقْسِطُ (আল-মুক্সিতু) - ন্যায়পরায়ণ, (৮৭) اَلْجَامِعُ (আল-জামি'উ) - একত্রকারী, (৮৮) اَلْغَنِىُّ (আল-গানী'উ) - অভাবমুক্ত, (৮৯) اَلْمُغْنِىْ (আল- মুগ্নী) - অভাব মোচনকারী, (৯০) اَلْمَانِعُ (আল-মানি'উ) - বারণকারী, (৯১) اَلضَّارُّ (আদ্-দাররু) - অকল্যাণকারী, (৯২) اَلنَّافِعُ (আন্-নাফি'উ) - কল্যাণকারী, (৯৩) اَلنُّوْرُ (আন্-নূরু) - জ্যোতি, (৯৪) اَلْهَادِىْ (আল-হাদী) - পথপ্রদর্শক, (৯৫) اَلْبَدِيْعُ (আল বাদী'উ) - প্রথম উদ্ভাবক, (৯৬) اَلْبَاقِىُّ (আল-বাকী) চিরস্থায়ী, (৯৭) اَلْوَارِثُ (আল-ওয়ারিছু) - স্বত্বাধিকারী, (৯৮) اَلرَّشِيْدُ (আর-রাশীদু) - সুপথনির্দেশক, (৯৯) اَلصَّبُوْرُ (আস্-সাবূরু) - ধৈর্যশীল।[৮]

বিশেষজ্ঞ আলিমগণের কারো কারো মতে গুণাবলী তিন প্রকার : ১. সিফাতে জামালী, ২. সিফাতে জালালী ও ৩. সিফাতে কামালী।

সিফাতে জামালী : আল্লাহ্র ঐ সমস্ত গুণবাচক নাম যার মধ্যে তাঁর রহমত, মায়া, মমতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। যেমন আর-রাহ্মান, আর-রাহীম, আল-লাতীফ ইত্যাদি।

সিফাতে জালালী : আল্লাহ্র ঐ সমস্ত গুণবাচক নাম যার মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব ও শাহানশাহী ইত্যাদি প্রকাশ পায়। যেমন : আল-মালিক, আল-'আযীয, আল-কাহ্হার ইত্যাদি।

সিফাতে কামালী : আল্লাহ্র ঐ সমস্ত গুণবাচক নাম যার মধ্যে তাঁর সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ঐ সিফাতে কামালী আবার পাঁচ প্রকার :

১. সিফাতে ওয়াহ্দানিয়্যাত : সিফাতে ওয়াহ্দানিয়্যাত ঐ গুণাবলীকে বলা হয় যার মধ্যে আল্লাহ্র একত্ব ও অদ্বিতীয়তৃ প্রকাশ পায়। যেমন আল-ওয়াহিদ, আল-আহাদ ইত্যাদি।

২. সিফাতে ওয়াজূদী : সিফাতে ওয়াজূদী ঐ গুণাবলীকে বলা হয় যার মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব এবং অবিনশ্বরত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠে। যেমন আল-হায়্যু, আল-কাইয়্যুম ইত্যাদি।

৩. সিফাতে ইল্ম : সিফাতে ইল্ম ঐ গুণাবলীকে বলা হয় যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত হওয়া বুঝায়। যেমন আল-খাবীর, আল-আলীম ইত্যাদি।

৪. সিফাতে কুদ্‌রত : সিফাতে কুদ্‌রত ঐ গুণাবলীকে বলা হয় যার দ্বারা আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত ও ক্ষমতা প্রকাশ পায়। যেমন আল-ফাত্তাহ্, আল-কাদীর ইত্যাদি।

৫. সিফাতে কিব্‌রিয়ায়ী ও কুদ্দূসিয়াত : সিফাতে কিব্‌রিয়ায়ী ও কুদ্দূসিয়াত আল্লাহ্‌র ঐ গুণাবলীকে বলা হয় যার দ্বারা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বোঝা যায়। যেমন আল-'আলিয়্যু, আল-কুদ্দূস ইত্যাদি।

এ নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম ছাড়াও কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে আল্লাহ্ তা'আলার আরো অনেক নামের উল্লেখ রয়েছে।

আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ্ প্রসঙ্গে কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। যেমন : (يَدٌ) হাত, (وَجْهٌ) মুখমণ্ডল, (عَيْنٌ) চোখ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার কথাও কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে।

এ সবের তাৎপর্য সম্বন্ধে ইমাম মালিক (র) বলেন :

اَلْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُوْلٍ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ ـ

অধিষ্ঠিত হওয়া অর্থ অজানা নয়। তবে এর যথাযথ অবস্থা জানা নেই। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা বিদ্‌আত। অবশ্য এর উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব।[৭]

সৃষ্টি রহস্য

আসমান-যমীন এর দু'য়ের মাঝে আমাদের জ্ঞাত-অজ্ঞাত যত কিছু আছে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ্। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর মহিমা প্রকাশের লক্ষ্যে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন। তিনি আসমান-যমীন এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ـ

আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা সাজ্‌দা, ৩২ : ৪)

বস্তুত এ নিখিল বিশ্বে রয়েছে আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালাসহ অসংখ্য সৃষ্টিরাজি। আল্লাহ্ তা'আলা ভাসমান চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও অসংখ্য তারকা দ্বারা আসমানকে সুসজ্জিত করেছেন। এই সুসজ্জিত আসমান আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্‌রতের এক বিশেষ নিদর্শন। বিস্তৃত ও বিশাল পৃথিবীকে বিন্যাস করেছেন তিনি বৈচিত্র্যময় পাহাড়-পর্বত, খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ও সারি সারি বৃক্ষ ও তৃণলতার সমারোহে। এতে রয়েছে মানুষসহ হাজারো রকমের জীব-জানোয়ার ও পশুপাখি। মানুষের পুষ্টি ও তৃপ্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ

স্থলভূমিতে হরেক রকমের খাদ্যশস্য ও সব্‌জির আবাদ করে পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করে দিয়েছেন আমাদের জন্য।

জলভাগ : খাল-বিল, নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরে রয়েছে মাছের ও জলজ প্রাণীর প্রাচুর্য। পানির তলদেশে রয়েছে মণি-মুক্তাসহ অফুরন্ত রত্ন ভাণ্ডার। ভূগর্ভে রয়েছে অফুন্ত পানি ও স্বর্ণ-রৌপ্যের অমূল্য সম্পদ। এমনি করে হাজার হাজার মাখলূক আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এ সবের মধ্যে মানুষই হল সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলূকাত। সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে আক্‌ল-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনার এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। তাই স্বভাবতই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এসব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্‌র রহস্য কী? কেন তিনি এ সব কিছু সৃজন করেছেন? এ সব প্রশ্নের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কারো কারো মতে এ বিশ্বপ্রকৃতি আল্লাহ্‌র ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

আসমান-যমীন এবং এর মধ্যস্থিত যত কিছু আছে এসব কিছু সৃষ্টি করার হিক্‌মাত হল, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী এবং মা'রিফাতের প্রকাশ। গোটা সৃষ্টি যেন তাঁর তাসবীহ্-তাহ্‌লীল, ইবাদত-বন্দেগীতে নিয়োজিত হয়ে তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ٠

আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন এরপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (সূরা তাহা, ২০ : ৫০)

প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌র তাসবীহ্, তাহ্‌লীল ও ইবাদত-বন্দেগী করে যাচ্ছে। আরো ইরশাদ হয়েছে :

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٠

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আগে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আধিপত্য তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১)

আশ্‌রাফুল মাখলূকাত মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ٠

আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি এ জন্যই যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, (لِيَعْبُدُوْنِ) অর্থ (لِيَعْرِفُوْنِ) যাতে তারা আমার মা'রিফাত হাসিল করতে পারে।

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, মানব সৃষ্টির মূল রহস্য হল ইবাদত ও বন্দেগী। মানুষ ও জিন ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল-কুরআনে আলোচনা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বস্তুকে মানুষের কল্যাণ ও খিদ্‌মতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ـ

তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাকারা, ২ : ২৯)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ـ

তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ২০)

এ বিশ্ব চরাচরে যত কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের বিশেষ নিদর্শন। এতে আল্লাহ্‌র মা'রিফাত ও পরিচয় লুকায়িত আছে। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৬৪)

এখানে 'নিদর্শন রয়েছে' বলে আল্লাহ্‌র একত্ব, কুদ্‌রত ও মা'রিফাতের নিদর্শনের কথা বুঝানো হয়েছে।

নবী-রাসূল

মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেসব মহামানবকে মনোনীত করেছেন, তাঁদেরকেই 'নবী-রাসূল' বলা হয়। 'রাসূল' শব্দের অর্থ প্রেরিত পয়গাম্বর। শরী'আতের পরিভাষায় :

اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْأَحْكَامِ ـ

আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সৃষ্টির নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে 'রাসূল' বলা হয়।[১০]

রাসূল শব্দের বহুবচন রুসুল। কুরআন ও হাদীসে শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পক্ষান্তরে—

مَنْ اَوْحٰى اِلَيْهِ وَحْيًا خَاصًّا مِنَ اللّٰهِ بِتَوَسُّطِ الْمَلَكِ اَوِالْإِلْهَامِ فِىْ قَلْبِهِ اَوْ بِالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ ـ

আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সত্যস্বপ্ন অথবা ইল্‌হাম অথবা ফিরিশতা প্রেরণের মাধ্যমে যার প্রতি বিশেষ ধরনের ওহী নাযিল হয়েছে এরূপ মনোনীত মহামানবকে 'নবী' বলা হয়।[১১]

নবী ও রাসূল-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যেসব পয়গাম্বরের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে এবং যাঁদেরকে নতুন শরী'আত দেওয়া হয়েছে, তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়। আর প্রত্যেক পয়গাম্বরকেই নবী বলা হয়, তাঁকে নতুন কিতাব ও নতুন শরী'আত দেওয়া হোক বা না হোক।[১২] যে সকল নবীর প্রতি কিতাব নাযিল হয়নি তাঁরা পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রচারিত শরী'আতের অনুসরণ করে দীনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক রাসূলই নবী ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল ছিলেন না। নবী-রাসূল সকলেই জ্ঞানী, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, নিষ্পাপ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন আদর্শ মানব। তাঁদের উন্নত চরিত্রে মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে সাধনা করেছেন। সত্যের প্রচার ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের ব্রত। তাঁরা যা বলেছেন ও করেছেন সবই আল্লাহ্‌র নির্দেশে। নিজ খেয়াল-খুশিমত অথবা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনো কোন কিছু করেননি।

তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম পয়গাম্বর হলেন হযরত আদম (আ) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : ১. হযরত আদম (আ), ২. হযরত নূহ্ (আ), ৩. হযরত ইদ্‌রীস (আ), ৪. হযরত হূদ (আ), ৫. হযরত সালিহ্ (আ), ৬. হযরত ইব্‌রাহীম (আ), ৭. হযরত ইসমাঈল (আ), ৮. হযরত ইসহাক (আ), ৯. হযরত লূত (আ), ১০. হযরত ইয়াকূব (আ), ১১. হযরত ইউসুফ (আ), ১২. হযরত শু'আইব (আ), ১৩. হযরত মূসা (আ), (১৪) হযরত হারূন (আ), ১৫. হযরত ইল্‌ইয়াস (আ), ১৬. হযরত ইয়া'সা' (আ), ১৭. হযরত দাঊদ (আ), ১৮. হযরত সুলায়মান (আ), ১৯. হযরত আইউব (আ), ২০. হযরত ইউনুস (আ), ২১. হযরত যুল্‌কিফ্‌ল (আ), ২২. হযরত যাকারিয়া (আ), ২৩. হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ), ২৪. হযরত ঈসা (আ) ও ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সা)।

হযরত আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নবীগণের সংখ্যা কত? উত্তরে তিনি বললেন, একলক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে তিনশ' তের অপর বর্ণনামতে তিনশ' পনেরজন হলেন রাসূল।[১৩]

নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ফরয। ইসলামী আকীদা যা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِه ۚ

আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৫)

অবশ্য হযরত মুহাম্মাদ (সা) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পয়গাম্বর। তাঁর পর আর কোন নবী-রাসূল ও এ পৃথিবীতে আসবেন না। কারণ তাঁর সময়ই দীন পূর্ণতা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, নুবূওয়াত ও রিসালাত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দান। কারো চেষ্টা ও পরিশ্রমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করা যেমন আল্লাহ্‌র দান, তেমনি নুবূওয়াত এবং রিসালাতও তাঁর অনুগ্রহ মাত্র। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এই সত্যটির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে :

اَللّٰهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ ·

আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাগণের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ·

আল্লাহ্ তাঁর রিসালতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ : ১২৪)

নবী-রাসূলগণ সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা। তাঁদের কাউকে আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বিশ্বাস করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত যারা এরূপ আকীদা পোষণ করে তারা জাহান্নামী। খ্রীস্টান সম্প্রদায় যারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে প্রচার করত, আল-কুরআনে তাদের সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْاۤ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ : وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْاۤ اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ·

যারা বলে আল্লাহ্‌ই মারইয়াম তনয় মাসীহ্, তারা তো কুফরীই করেছে, অথচ মাসীহ্ বলেছিল, হে বানী ইসরাঈল, তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। যারা বলে আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন, তারা তো কুফরী-ই করেছে, যদিও এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৭২-৭৩)

নুবূওয়াত ও রিসালাত : প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য

মানুষ সৎপথে চলার যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে প্রবৃত্তির তাড়নায়, শয়তানের প্ররোচনায় এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সাধারণত অসৎপথে পরিচালিত হয়। ফলে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। আবার কখনো নিজেকে অতিক্ষমতাধর মনে করে মানুষ সমাজে নানা ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এতে মানব সমাজে নেমে আসে নানা বিপর্যয়। অত্যাচারী, সীমালংঘনকারীদের সীমাহীন তাণ্ডবলীলায় সমাজে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। অত্যাচার, অনাচার ও পাপাচারে সমাজ হয়ে যায় চরমভাবে কলুষিত। ঘোর অন্ধকার তখন মানব সমাজকে আচ্ছন্ন করে নেয়। ভুলে যায় মানুষ তখন সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীনকে। সমাজকে এ অবক্ষয় থেকে মুক্ত করার জন্য নবী-রাসূলগণের আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। তাই মহান আল্লাহ্ মানবজাতিকে সঠিক ও

সরল পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবী ও রাসূলগণের এক সুমহান জামা'আত। নবী-রাসূলগণের আবির্ভাব না হলে সত্য ও আলোর সন্ধান মানুষ কোনক্রমেই লাভ করতে সক্ষম হত না।

আল্লাহ্র সত্তা হল অসীম। কিন্তু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হল সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা একান্ত দয়াপরবশ হয়ে মানুষের হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের এক সুমহান সিল্‌সিলা। আর তাঁদেরকে দিয়েছেন দিক-নির্দেশনারূপে বহু কিতাব ও সহীফা। নবী-রাসূল এবং তাঁদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্কে চিনতে পারে, তাঁর হুকুম-আহ্কাম এবং তাঁর পসন্দনীয় পথ ও মত ইত্যাদি জানতে পারে।

মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ঊর্ধ্বলোক ও অদৃশ্য জগত সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে সক্ষম হয় না। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহ্মাদ সরহিন্দী (র) স্বীয় মাকতুবাতে এ প্রসঙ্গে বলেন, "মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নবীগণের সহযোগিতা ও পথপ্রদর্শন ছাড়াও বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারে বটে, কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাথে তাঁর মৌলিক গুণাবলীর সঠিক পরিচিতি, তাঁর পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়া নবী-রাসূলগণের সহযোগিতা ব্যতিরেকে আদৌ সম্ভব নয়।"[১৪]

নুবূওয়াত ও রিসালাতের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করে প্রখ্যাত গবেষক আলিমগণ বলেন, এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, এক বিশেষ পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব ও বিধি-বিধান আরোপ করেছেন।

বস্তুত মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্ বান্দা। আর আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যত কিছু আছে সবই হচ্ছে মানুষের স্বেচ্ছাসেবী খাদিম। কি করে মানুষ আল্লাহ্র দাসত্ব করবে এবং দুনিয়ার এসব বস্তু কেমন করে তারা ব্যবহার করবে তা জানার জন্য শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট নয় বলেই আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁদের প্রতি নাযিল করেছেন ওহী। বস্তুত ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এবং বুদ্ধি-বিবেচনালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে বলে এতে নানা ধরনের ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনার রয়েছে। কিন্তু নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহীভিত্তিক জ্ঞানে ভুল-ভ্রান্তির আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই ওহীলব্ধ জ্ঞানই একমাত্র নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য জ্ঞান।

ইস্‌মতে আম্বিয়া—নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া

ইসমতে আম্বিয়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা ইদ্‌রীস কান্দলভী (র) বলেন, "যাহির-বাতিন তথা ভিতর ও বাহির শয়তান কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা এবং এগুলোর প্ররোচনা থেকে পাক-পবিত্র থাকার নামই হল ইস্‌মত বা নিষ্পাপতা।"

'মা'সূম' (নিষ্পাপ) বলা হয় এমন সত্তাকে যিনি আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, স্বভাব-চরিত্র, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, কথাবার্তা, কাজকর্ম ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে পাপের উৎস তথা নফ্‌স ও শয়তানের প্রভাব থেকে সর্বদা মুক্ত ও নিরাপদ থাকেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার

এমন হিফাযতে থাকেন যার ফলে নফ্‌স ও শয়তান কোনভাবেই তাঁর নিষ্পাপতাকে কলুষিত করতে পারে না। নবী-রাসূলগণ সকলেই যেহেতু ঈমান-আকীদা, আমল-আখ্‌লাক, ইবাদত-বন্দেগী, কাজকর্ম, কথাবার্তা ইত্যাদি বিষয়ে ভিতর ও বাহির সবদিক থেকে শয়তান ও নফ্‌সের কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র থাকেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাঁরা যেহেতু আল্লাহ্‌র হিফাযত থেকে বাইরে থাকেন না, বরং আল্লাহ্‌ যা হুকুম করেন তাই তাঁরা বলেন ও করেন, কাজেই নবী-রাসূলগণ সকলেই হলেন মা'সূম ও নিষ্পাপ। তাঁরা সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকারের গুনাহ্‌ থেকেও মা'সূম। নুবূওয়াত প্রাপ্তির পরে তো মা'সূম বটেই, নুবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও মা'সূম। তাই তাঁরা হলেন উম্মাতের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁদের প্রতিটি কথা ও কর্ম মানবতার জন্য কল্যাণকর আদর্শ। তাঁদের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য অকল্যাণকর।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদী (র) বলেন, "ইস্‌মত আল্লাহ্‌ তা'আলার এমন একটি বিশেষ নি'আমত ও অনুগ্রহের নাম, যা নবী-রাসূলগণকে সর্বদা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে ব্যাপৃত রাখে এবং সর্বপ্রকার পাপ-পঙ্কিলতা হতে দূরে রাখে।"[১৫] মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী (র) বলেন, "নুবূওয়াত ও ইস্‌মত একই হাকীকতের দু'টি পৃথক পৃথক দিক অর্থাৎ যিনি নবী তিনি অবশ্যই মা'সূম আর যিনি মা'সূম তিনি অবশ্যই নবী হবেন।" সারকথা হল, ইস্‌মত নবী-রাসূলগণের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং ক্ষণিকের জন্যও ইস্‌মত নবী-রাসূলগণের সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয় না।[১৬]

উল্লেখ্য যে, ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র কোন হুকুম অমান্য করাকে মা'সিয়ত বা পাপ বলা হয়। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে তাকে মা'সিয়ত বা পাপ বলা হয় না।

ইমাম রাযী (র) বলেন, ইস্‌মতের সম্পর্ক মোট চারটি বিষয়ের সাথে, যথা : ১. আকীদা ও বিশ্বাস, ২. আহ্‌কামের প্রচার, ৩. ফাত্‌ওয়া ও ইজ্‌তিহাদ, ৪. কাজকর্ম ও স্বভাব-চরিত্র।

আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) সকলেই মা'সূম এবং নিষ্পাপ। আকীদাগত বিষয়ে তাঁদের থেকে কোনরূপ বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি হয়নি।

আহ্‌কামের প্রচারক্ষেত্রেও সমস্ত উম্মাতে মুহাম্মাদী একমত যে, আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম বান্দা পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যাপারে তাঁরা কোন প্রকার মিথ্যা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার মত অপরাধ হতে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও মুক্ত। তাঁদের প্রতি নাযিলকৃত ওহীর যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ·

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, সামনে থেকেও নয় এবং পিছন হতেও নয়। এ প্রজ্ঞাময়-প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম আস্‌-সাজ্‌দা, ৪১ : ৪২)

ইজ্‌তিহাদের ব্যাপারে আলিমদের অভিমত এই যে, কোন ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হলে নবীগণ প্রথমে ওহীর জন্য অপেক্ষা করতেন, পরে ইজতিহাদ করে উক্ত বিষয়ের সমাধান দিতেন। ইজ্‌তিহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র মর্জির খেলাফ কোন সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে সাথে সাথে

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা শুধরে দেওয়া হত। কাজেই দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রেও তাঁরা মা'সূম।

নবী-রাসূলগণের কাজকর্ম ও স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদির ব্যাপারে আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত হল, এ ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ্ নিজ কুদ্‌রত দ্বারা তাঁদেরকে নফ্‌স ও শয়তানের প্রভাব থেকে হিফাযত করেছেন। তবে কখনো কখনো অনিচ্ছা বা ভুলবশত তাঁদের থেকে এমন কাজও সংঘটিত হয়েছে যা বাহ্যিক তাঁদের শানের পরিপন্থী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পাপ নয়; বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তাঁদের থেকে এরূপ কিছু সংঘটিত করিয়েছেন। যেমন নামাযে চার রাকা'আতের স্থলে দুই রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে দেওয়া। এতে নামাযের প্রতি অমনোযোগী মনে হলেও প্রকৃত বিষয় তা নয়; বরং উম্মাতকে সাহু সিজ্‌দার বিধান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বারা এমনটি করিয়েছেন। এমনটি না হলে উম্মাত 'সাহু সিজ্‌দার' বিধান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারত না।

নবী-রাসূলগণ মা'সূম, এ সম্বন্ধে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۔

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ : ২১)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'উত্তম নমুনা' বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ তিনি হলেন সকলের জন্য সর্বক্ষেত্রে নমুনা। আর নমুনা এমন ব্যক্তিই হতে পারেন যিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি এবং পাপ পঙ্কিলতা হতে মুক্ত, যিনি বিন্দুমাত্রও আল্লাহ্‌র নির্দেশের খেলাফ কিছু করেন না। অন্যদিকে পাপ-পঙ্কিলতায় কলুষিত ব্যক্তি কখনো নমুনা হতে পারে না। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হলেন নিষ্পাপ এবং মা'সূম। এমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কিরাম সকলেই হলেন মা'সূম।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۔

আমি এ জন্যই রাসূল প্রেরণ করেছি যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হয়। (সূরা নিসা, ৪ : ৬৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۔

কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা, ৪ : ৮০)

প্রথমোক্ত আয়াতে উম্মাতের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, তারা যেন সর্বাবস্থায় দ্বিধাহীনভাবে রাসূলের অনুসরণ করে। এ হুকুম সকলের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য

করল। এতেও প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ নিষ্পাপ। আর যিনি নিষ্পাপ নন তার আনুগত্য কোনভাবেই আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে পারে না।

নবীগণের অন্তর গুনাহের উৎস-প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ্‌র বিশেষ হিফাযত এক মুহূর্তের জন্যও তাঁদের থেকে পৃথক হয় না। হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ.

আমি তার থেকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা সরিয়ে রাখার জন্যই এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ২৪)

প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ) থেকে মন্দকর্মকে সরিয়ে রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফ (আ)-কে মন্দকর্ম থেকে সরিয়ে রাখার কথা বলা হয়নি। এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হযরত ইউসুফ (আ) মন্দকর্ম করার আদৌ ইচ্ছা করেননি। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে হিফাযত করেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ সকলেই মা'সূম। কুরআনে আরো বহু আয়াতে আম্বিয়ায়ে কিরামের ইস্‌মত ও নিষ্পাপতার কথা বিবৃত হয়েছে।[১৭]

খতমে নুবূওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা যুগে যুগে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)। তাঁর পর আর কোন নবী-রাসূল ও পৃথিবীতে আসবেন না এবং আসার প্রয়োজনও নেই। একেই বলা হয় খতমে নুবূওয়াতের আকীদা। ঈমানদার হওয়ার জন্য এ আকীদা পোষণ করা অপরিহার্য। তাই কেউ যদি নবী-রাসূল হওয়ার দাবি করে, তবে সে নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী ও কাফির। অনুরূপ যারা খতমে নুবূওয়াতে বিশ্বাসী নয়, তারাও কাফির।

বস্তুত 'খতম' এবং 'নুবূওয়াত' আরবী শব্দ। খতম অর্থ সমাপ্ত, শেষ ইত্যাদি। আর নুবূওয়াত অর্থ পয়গাম্বরী। এ হিসাবে খতমে নুবূওয়াতের অর্থ হবে নুবূওয়াত ও রিসালতের পরিসমাপ্তি ঘটা। অর্থাৎ হযরত আদম (আ) থেকে নুবূওয়াত ও রিসালাতের যে সিলসিলা আরম্ভ হয়েছিল এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে। কুরআন, হাদীস, ইজ্‌মা, কিয়াস তথা শরী'আতের দলিল চতুষ্টয়ের দ্বারা এ আকীদা প্রমাণিত। এমনকি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। ইমাম শা'বী (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি যে সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে উল্লেখ রয়েছে :

اِنَّهٗ كَائِنٌ مِنْ وَلَدِكَ شُعُوْبٌ حَتّٰى يَاْتِيَ النَّبِيُّ الْاُمِّيُّ الَّذِيْ يَكُوْنُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ .

আপনার সন্তানদের মধ্যে বংশ পরম্পরা চলতে থাকবে। অবশেষে উম্মী নবী [মুহাম্মাদ] (সা)] আগমন করবেন। তিনি হবেন সর্বশেষ নবী।[১৮]

এ প্রসঙ্গে বার্নাবাসের 'বাইবেল' গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ)-এর উক্তি নিম্নরূপ :

My Consolation is the coming of the massenger, who shall destroy every false opinion of me, and His faith shall spread and shall take hold of

the whole world, for so hath God promised to Abraham our father. And that which giveth me consolation is that His faith shall have no end. but shall be kipt inviolato by God... these shall not come after Him true prophet sent by God."[১৯]

আল-কুরআনের আলোকে খতমে নুবূওয়াত

হযরত মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী ও রাসূল এ কথা আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। প্রখ্যাত আলিম হযরত মাওলানা মুফ্‌তী শফী (র) তদীয় 'খতমে নুবূওয়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খতমে নুবূওয়াতের বিষয়টি আল-কুরআনের শতাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। গোটা কুরআনই খতমে নুবূওয়াতের প্রমাণ বহন করে। কেননা কুরআন সংরক্ষিত, অবিকৃত ও অরহিত এক চিরন্তন কিতাব। খতমে নুবূওয়াতের আকীদাকে স্বীকার করে নেওয়া হলেই কুরআনের চিরন্তনতা প্রমাণিত হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের পর কোন নবীর আগমনের সম্ভাবনাকে যদি মেনে নেয়া হয় তবে পরবর্তী নবীর কারণে আল-কুরআনও রহিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিতে হয়। অথচ কুরআন হল এক চিরন্তন কিতাব। এর চিরন্তনতার দ্বারা এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটবে না। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ·

মুহাম্মাদ (সা) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ : ৪০)

আলোচ্য আয়াতে خَاتَمَ শব্দটির ت অক্ষরে ফাতাহ্ (যবর) ও কাস্‌রা (যের) উভয় প্রকার সহকারে পাঠের নিয়ম রয়েছে এবং উভয় কিরাআতই বিশুদ্ধ ও মুতাওয়াতির। হাসান ও আসিম (র) শব্দটিকে যবর-এর সাথে পড়তেন। আর অন্যান্য ক্বারীগণ শব্দটিকে যের-এর সাথে পাঠ করতেন। খাতাম ও খাতিম শব্দ দু'টোর অর্থ শেষ ও সমাপ্তকারী।[২০]

আলোচ্য শব্দের দ্বিতীয় অংশটি হল اَلنَّبِيِّيْنَ 'আন্-নাবিয়্যীন' শব্দে উল্লেখিত الف لام অব্যয় পদটি استغراق। সমাপ্ত নবীগণকে বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ -এর অর্থ হবে, নবী-রাসূলগণের সর্বশেষ ব্যক্তি অথবা নবীদের ক্রমধারা সমাপ্তকারী।

ইমাম রাগিব ইস্‌পাহানী (র) 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ لِاَنَّهُ خَتَمَ النُّبُوَّةَ اَىْ تَمَّمَهَا بِمَجِيْئِهِ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে এ জন্য 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' বলা হয় যে, তিনি নুবূওয়াতের সিলসিলা সমাপ্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আগমন করে নুবূওয়াতকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং এর ধারাবাহিকতাকে সমাপ্ত করে দিয়েছেন।[২১]

এ ছাড়াও মাজমাউল বিহার, সিহাহ্, সুরাহ এবং মুনতাহাল আরব ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থে এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর গ্রন্থসমূহেও خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা উল্লেখ রয়েছে।

আল্লামা সুয়ূতী (র) 'আদ্-দুর্‌রুল মানসূর' গ্রন্থে আবদ্ ইব্‌ন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন :

عَنِ الْحَسَنِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ قَالَ خَتَمَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اٰخِرَ مَنْ بُعِثَ ٠

হযরত হাসান (র) হতে, খাতামুন্ নাবিয়্যীন-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের সিলসিলা মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল।[২২]

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

لٰكِنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ الَّذِىْ خَتَمَ النُّبُوَّةَ فَطُبِعَ عَلَيْهَا فَلَا تُفْتَحُ لِاَحَدٍ بَعْدَهٗ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ ٠

তিনি [মুহাম্মাদ (সা)] আল্লাহ্‌র রাসূল ও সর্বশেষ নবী। তিনি নুবুওয়াতের ক্রমধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা আরো কারোর জন্য খোলা হবে না।[২৩]

তাফসীরের বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য কিতাব 'খাযিন'-এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে,

خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ خَتَمَ اللّٰهُ بِهِ النُّبُوَّةَ فَلَا نُبُوَّةَ بَعْدَهٗ اَىْ وَلَا مَعَهٗ ٠

খাতামুন্ নাবিয়্যীন অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের ধারা খতম করে দিয়েছেন, সুতরাং তারপর নুবুওয়াতের সিল্‌সিলা জারী থাকতে পারে না এবং তাঁর জীবদ্দশায়ও অন্য কেউ নবী হতে পারবে না।[২৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আখেরী নবী। তাঁর পর এ পৃথিবীতে কোন নবী-রাসূল আর আসবে না। দীন তার পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ রূপ নিয়েই আমাদের সামনে বিদ্যমান। ইরশাদ হয়েছে :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ ٠

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩)

এ আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, দীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং এখন হতে কিয়ামত পর্যন্ত নতুন কোন শরী'আত আসবে না এবং আসবেন না নতুন কোন নবী বা রাসূল।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ٠

বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৮)

আয়াতে উল্লেখিত الناس শব্দের ألف لام অক্ষর দু'টো إستغراق-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত মানুষ। এতে এ কথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) হলেন কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত মানুষের রাসূল। কাজেই তিনিই হলেন সর্বশেষ পয়গাম্বর।

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ إِصْرِىْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ٠

স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত যা কিছু দিয়েছি এরপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবেন তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮১)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেছেন যা তিনি নবী-রাসূলগণের নিকট থেকে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে আত্মার জগতে গ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা সুব্‌কী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির রূহ্ বা আত্মা সৃষ্টি করে তাদের থেকে স্বীয় রবূবিয়্যাতের স্বীকৃতি গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি নবীগণের নিকট থেকে আরেকটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তা হল, যদি তোমাদের কারো জীবদ্দশায় হযরত মুহাম্মাদ (সা) আবির্ভূত হন তবে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।

উক্ত আলোচনা হতে পরিষ্কারভাবে এ কথা বোঝা যায় যে, মহানবী (সা) কিয়ামাত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্যই নবী। হযরত ঈসা (আ) যখন পৃথিবীর শেষলগ্নে আগমন করবেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন উম্মাত হিসাবেই আগমন করবেন।[২৫]

হাদীসের আলোকে খতমে নুবূওয়াত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'সর্বশেষ নবী' এ কথাটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। মুহাদ্দিসগণের মতে খতমে নুবূওয়াত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : قَالَ اِنَّ مَثَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَاَحْسَنَهٗ وَ اَجْمَلَهٗ اِلاَّ مَوْضَعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَيَعْجَبُوْنَ لَهٗ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : পূর্ববর্তী নবীগণের সাথে আমার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি ঘর তৈরি করে এবং সে ঐ ঘরটি খুব সুন্দর ও মনোরম করে তৈরি করেছে। কিন্তু একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিয়েছে। লোকজন এর চতুর্দিক ঘুরে এর সৌন্দর্য অবলোকন করছে এবং আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলছে, এ একটি ইট কেন সংযোজন করা হল না? (তাহলে তো ঘরের নির্মাণ কাজ পুরো হয়ে যেত)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমিই সেই ইট। আর আমিই খাতামুন্ নাবিয়্যীন। অর্থাৎ নুবূওয়াতের ইমারত আমার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করেছে।[২৬]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْـرَةَ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : قَالَ كَانَتْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ ..

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী কারীম (সা) বলেন, বনী ইসরাঈলে আম্বিয়ায়ে কিরামই নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোন নবী ইন্তিকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নবী আসবেন না।[২৭]

অন্য এক হাদীসে আছে :

اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ ·

আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী আসবেন না।[২৮]

উক্ত হাদীসে نَبِىٌّ (নবী) শব্দটি نَفِىْ-এর পর نَكِرَه পতিত হয়েছে। আর এ কথা আরবী ব্যাকরণবিদদের নিকট স্বীকৃত যে, نَفِىْ-এর পর نَكِرَه عُمُوْمُ وَشُمُوْلُ তথা ব্যাপক অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ হিসাবে এ বাক্যের অর্থ হবে 'আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নতুন নবীই এ পৃথিবীতে আসবেন না'।

'মুনতাখাবুল কান্‌য' গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে আছে :

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فِىْ خُطْبَتِهٖ يَوْمَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ اَيُّهَا النَّاسُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ وَلاَ أُمَّةَ بَعْدَكُمْ فَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاٰتُوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسَكُمْ اَطِيْعُوْا وُلاَةَ اُمُوْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ..

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, হে লোক সকল! আমার পর আর কোন নবী আগমন করবেন না এবং তোমাদের পর আর কোন নতুন উম্মাত হবে না। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের মালের যাকাত আদায় করবে এবং তোমাদের নেতাদের (যদি শরী'আত বিরোধী না হয়) আনুগত্য করবে। তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।[২৯]

কুরআন-হাদীসের নির্দেশকে উপেক্ষা কেউ যদি নুবূওয়াতের দাবি করে, তবে সে হবে কাফির ও মিথ্যাবাদী। হাদীসে আছে :

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : سَيَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ . . .

হযরত সাওবান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই নবী হওয়ার দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী আসবে না।[৩০]

ইজ্মা ও যুক্তির আলোকে খতমে নুবূওয়াত

'রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বশেষ নবী'-এ কথাটি যেমনভাবে কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, অনুরূপভাবে তা ইজ্মা দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ইজ্মা সংঘটিত হয় তা হল খতমে নুবূওয়াতের আকীদা। এ কারণেই সাহাবাগণ সর্বসম্মতিক্রমে মিথ্যা নুবূওয়াতের দাবিদার মুসায়লামাকে কাফির আখ্যায়িত করেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশে বীর কেশরী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের এক বিরাট বাহিনী মুসায়লামা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন সাহাবী দ্বিমত পোষণ করেন নি। সাহাবাগণের এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং বিপুল সংখ্যায় তাঁদের শাহাদত বরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই হলেন সর্বশেষ পয়গাম্বর এবং তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে আসবে না।

যুক্তির মানদণ্ডেও বিষয়টিকে বিচার করা হলে দেখা যাবে যে, সাধারণত নিম্নবর্ণিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে নবী প্রেরণ করেছেন :

ক. পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেলে, খ. পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা পরবর্তীদের জন্য অসম্পূর্ণ বিবেচিত হলে বা সময়োপযোগী বলে গণ্য না হলে, গ. কোন নবীর জীবদ্দশায় সহায়ক নবীর প্রয়োজন হলে।

কুরআন হাদীসের প্রতি গভীরভাবে নযর করলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত কারণসমূহের কোন একটি কারণও বর্তমানে বিদ্যমান নেই। কাজেই যৌক্তিক দিক থেকেও নতুন নবী আগমনের কোনরূপ সম্ভাবনা বা প্রয়োজন নেই।

মনীষীদের দৃষ্টিতে খতমে নুবূওয়াত

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পর যদি কেউ নুবূওয়াত দাবি করে, তবে সে নিঃসন্দেহে 'কাফির' বলে গণ্য হবে। এমনকি উক্ত ব্যক্তির নিকট কেউ যদি প্রমাণ তলব করে, তবে সেও কাফির বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা প্রমাণ তলব করার দ্বারা এ কথা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নুবূওয়াতের যে দ্বার তালাবদ্ধ করে দিয়েছেন তাতে তার সন্দেহ রয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্তের পর তার প্রমাণ দাবি করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের উপর সন্দেহ প্রকাশ করাই 'কাফির' হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৩১]

আল্লামা ইব্‌ন নুজায়ম (র) কর্তৃক রচিত 'আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কে সর্বশেষ নবী হিসাবে বিশ্বাস না করে তবে কিছুতেই সে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে শামিল হতে পারবে না। বরং সে কাফির বলে গণ্য হবে। কেননা খতমে নুবূওয়াতের আকীদা দীন ইসলামের মৌলিক আকীদার অন্তর্ভুক্ত।[৩২]

ইমাম গাযালী (র) তাঁর রচিত 'কিতাবুল ইক্‌তিসাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। এ এমন এক সত্য কথা এবং সর্বসম্মত বিষয় যার ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করার কোন অবকাশ নেই। যারা খতমে নুবূওয়াতের আকীদাকে অস্বীকার করবে তারা 'কাফির' বলে গণ্য হবে।[৩৩]

শায়খ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র) তাঁর 'ফতুহাতে মাক্কিয়াহ্' গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, নুবূওয়াতের সিলসিলা খতম হওয়ার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আদেশ-নিষেধ অবতরণের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।[৩৪]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর নুবূওয়াতের দাবি করা কুফরী।[৩৫]

ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'তে আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী এ কথা কেউ যদি বিশ্বাস না করে তবে সে মুসলমান নয়। বরং সে 'কাফির' আর কেউ যদি নিজের সম্পর্কে দাবি করে যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল তবে সেও 'কাফির' সাব্যস্ত হবে।[৩৬]

বিশ্ববরেণ্য মুফাস্‌সির হাফিয ইব্‌ন কাছীর (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে এবং মহানবী (সা) তাঁর বর্ণনায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর আর কোন নবী আসবে না। যদি কেউ নুবূওয়াতের দাবি করে তবে সে হবে জঘন্য মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল ও পথভ্রষ্ট।[৩৭]

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, কেউ যদি বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' সত্য, তবে—"তাঁর পর কোন নবী আসবে না এবং তিনি শেষ নবী" এ কথা ঠিক নয়, তবে সে যিন্দীক। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। হানাফী, শাফিঈ তথা সমস্ত ইমামগণই এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৩৮]

আল্লামা আনওয়ারশাহ্ কাশ্মিরী (র) বলেন, খতমে নুবূওয়াতের আকীদা যরূরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত। যরূরিয়াতে দীনকে যে অস্বীকার করবে সে 'কাফির'।[৩৯]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের শুরু হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আসছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' তথা সর্বশেষ নবী। এটা দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানের আকীদা ও বিশ্বাস। সুতরাং কেউ যদি পয়গাম্বরী ও নুবূওয়াতী দাবি করে তবে সে কাফির। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্‌র কারো দ্বিমত নেই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহব্বত ও অনুসরণ

দীন ও ঈমানই হল এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নি'আমত। এ অমূল্য নি'আমত আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমেই লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি নির্মম অত্যাচার ও অপরিসীম নির্যাতন ভোগ করে হিদায়াতের বাণী পৌঁছিয়েছেন। তাঁর এ কুরবানী ও ত্যাগ না হলে আমাদের নিকট দীন পৌঁছত না, বরং আমরা কুফর ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতাম। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করা আমাদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভালবাসাকে অন্য সব কিছুর ভালবাসা থেকে ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। তবেই প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ .

বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা তাওবা, ৯ : ২৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ·

তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব।[৪০]

যৌক্তিকভাবেও যদি আমরা বিষয়টি বিশ্লেষণ করি তাহলেও দেখবো যে, সকলের চাইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই অধিক ভালবাসা কর্তব্য। কেননা সাধারণত চার কারণে একজন অপর একজন মানুষকে ভালবেসে থাকে : ১. বাহ্যিক সৌন্দর্য, ২. চারিত্রিক গুণাবলী, ৩. ইহ্সান ও ৪. আত্মীয়তা। উপরোক্ত চারটি কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। কাজেই সৃষ্টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই সর্বাধিক ভালবাসা পাওয়ার হক্দার।

এ ভালবাসা হবে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা। এর বাস্তবায়ন ঘটবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে। বস্তুত যাবতীয় আমল তথা লেবাস-পোশাক, পানাহার, আচার-অনুষ্ঠান, এক কথায় ব্যক্তিগত জীবন থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর ভালবাসা ও মহব্বতের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ ·

তোমাদের কেউ (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার ইচ্ছা ও কামনা আমার নিয়ে আসা আদর্শের পূর্ণ অনুসারী হবে।[৪১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভালবাসা যেমনিভাবে তাঁর অনুসরণ ব্যতীত সম্ভব নয়, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত সম্ভব নয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ·

বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১)

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করল সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্র আনুগত্য আদৌ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ·

কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা, ৪ : ৮০)

এ ছাড়াও আরো বহু আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কেউ যদি আনুগত্য না করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ·

কারোর নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস! (সূরা নিসা, ৪ : ১১৫)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ·

বলুন, আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, এর পর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সেই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে; রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া। (সূরা নূর, ২৪ : ৫৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাফা'আত

'শাফা'আত' শব্দটির ধাতু (شَفَعٌ)-এর অর্থ জোড়া, জড়িত হওয়া, অন্যের সাথে মিলিত হওয়া এবং কারো জন্য সুপারিশ করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় মঙ্গল এবং ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে নবী-রাসূল এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফা'আত বলা হয়।

হাশরের ময়দানের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কুরআন ও হাদীসে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : তখন সূর্য মানুষের অতি নিকটে চলে আসবে। সূর্যের তাপে কোন কোন লোক তার আমল অনুসারে নিজ ঘামে নিমজ্জিত হবে। মানুষ কষ্টে, দুঃশ্চিন্তায় ও পেরেশানীতে অস্থির হয়ে উঠবে। এমনি এক সংকট সময়ে রাহ্মাতুললিল্ 'আলামীন, শাফীউল মুয্নিবীন, হযরত মুহাম্মাদ (সা) মানুষের শাফা'আতের জন্য এগিয়ে আসবেন।

বস্তুত শাফা'আত দু'প্রকার : শাফা'আতে কুব্রা ও শাফা'আত সুগ্রা। শাফা'আতে কুব্রা তথা হাশরের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা হতে নিষ্কৃতি প্রদান এবং হিসাব গ্রহণের জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে যে শাফা'আত করা হবে, এর অধিকার একমাত্র রাসূলে কারীম (সা)-এরই থাকবে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۔

আশা করা যায়, আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমূদে অর্থাৎ প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইস্রাঈল, ১৭ : ৭৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কিরাম বলেছেন যে, 'মাকামে মাহমূদ দ্বারা এখানে 'শাফা'আতে কুব্রা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য নবী, রাসূল, শহীদ, আলিম, হাফিয এবং নেক্কার মু'মিনগণকেও গুনাহ্গারদের জন্য সুপারিশ করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। একে শাফা'আতে সুগ্রা বলা হয়। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রা) শাফা'আতের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করার পর উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, এ তো সেই 'মাকামে মাহমূদ' (প্রশংসিত স্থান) যেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নবী কারীম (সা)-এর সাথে ওয়াদা করেছেন। [সীরাতুন্ নবী (সা), আল্লামা শিবলী নু'মানী (র), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬]।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক নবীর উম্মাত নিজ নিজ নবীর অনুসরণ করবে। তারা বলবে হে অমুক (নবী)! আপনি সুপারিশ করুন, হে অমুক, (নবী)! আপনি সুপারিশ করুন। তাঁরা কেউ সুপারিশ করতে রাযী হবেন না। শেষ পর্যন্ত সুপারিশের দায়িত্ব নবী কারীম (সা) গ্রহণ করবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করবেন। উক্ত হাদীস হতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই সর্বপ্রথম

'শাফা'আতকারীর' মর্যাদা দান করে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (বুখারী শরীফ, তাফসীর অধ্যায়, আয়াত : عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দু'আর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যে দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবূল করবেন। সকল নবী তাঁদের দু'আ করে ফেলেছেন। আর আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য রেখে দিয়েছি। [মুসলিম শরীফ (বাংলা) ১ম খণ্ড, ৩৮৬নং হাদীস]।

অপর এক হাদীসে রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গৃহে কিছু গোশ্ত (হাদিয়া) আসল। সামনের রানের অংশটি তাঁর সামনে (আহারের উদ্দেশ্যে) পেশ করা হল। রানের গোশ্ত তাঁর নিকট খুবই পসন্দনীয় ছিল। তিনি তা থেকে এক টুকরা মুখে দিলেন। অতঃপর বললেন : কিয়ামত দিবসে আমিই হবো সকল মানুষের সর্দার। তা কি তোমরা জান? কিয়ামতের দিবসে যখন আল্লাহ্ তা'আলা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে একই মাঠে এমনভাবে জমায়েত করবেন যে, একজনের আহ্বান সকলে শুনতে পাবে, একজনের দৃষ্টি সকলকে দেখতে পাবে। সূর্য নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে নিপতিত হবে। পরস্পর বলাবলি করবে, কী দুর্দশায় তোমরা আছ দেখছ না? কী অবস্থায় তোমরা পৌঁছেছ উপলব্ধি করছ না? এখন তোমাদের জন্য কে সুপারিশ করবে? একজন আরেকজনকে বলবে, চল আদম (আ)-এর নিকট যাই। অতঃপর তারা আদম (আ)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, হে আদম (আ)! আপনি মানবকূলের পিতা। আল্লাহ্ স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার দেহে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। আপনাকে সিজ্‌দা করার জন্য ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা আপনাকে সিজ্‌দা করেছেন। আপনি দেখেছেন না, আমরা কী কষ্টে আছি। আপনি দেখেছেন না, আমরা কষ্টের কোন্ সীমায় পৌছেছি? আদম (আ) বলবেন, আজ পরওয়ারদিগার এত বেশি ক্রোধান্বিত, যা পূর্বে কখনো হন নি এবং পরেও কখনো হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, আমি সে নিষেধ লংঘন করে ফেলেছি। নাফ্‌সী, নাফ্‌সী! তোমরা অন্য কারো নিকট গিয়ে চেষ্টা কর। তোমরা নূহের নিকট যাও!

তখন তারা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট আসবে। বলবে, হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রথম রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে 'চিরকৃতজ্ঞ বান্দা' বলে উপাধি দিয়েছেন। আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি? আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌছেছে? নূহ্ (আ) বলবেন, আজ আমার পরওয়ারদিগার এত ক্রোধান্বিত, যা পূর্বেও কখনো হননি, আর পরেও কখনো হবেন না। আমাকে তিনি একটি দু'আ কবূলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে ফেলেছি। নাফ্‌সী, নাফ্‌সী! তোমরা ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট যাও।

তখন তারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট আসবে। বলবে, হে ইব্‌রাহীম! আপনি আল্লাহ্‌র নবী, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে আপনি আল্লাহ্‌র খলীল। আপনি আপনার পরওয়ারদিগারের

নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌছেছে? ইব্রাহীম (আ) তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্ আজ এত ক্রোধান্বিত যে, পূর্বে কখনো এমন হননি আর পরেও কখনো এমন হবেন না। বলবেন, নাফ্সী নাফ্সী! আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো নিকটে যাও। মূসার নিকট যাও।

তারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসবে। বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে তিনি তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে মানুষের মধ্যে মর্যাদা দিয়েছেন। আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌছেছে? মূসা (আ) তাদের বলবেন, আজ আল্লাহ্ এতই ক্রোধান্বিত যে, পূর্বে এমন কখনো হননি, আর পরেও কখনো হবেন না। আমি তাঁর হুকুমের পূর্বে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। নাফ্সী, নাফ্সী! আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান! তোমরা ঈসার নিকট যাও।

তারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট আসবে। বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, দোলনায় অবস্থানকালে আপনি মানুষের সাথে বাক্যালাপ করেছেন। আপনি আল্লাহ্র দেওয়া বাণী যা তিনি মারইয়ামের গর্ভে ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি তাঁর দেওয়া রূহ্। সুতরাং আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখেছেন যে, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌছেছে? ঈসা (আ) বললেন, আজ আল্লাহ্ তা'আলা এতই ক্রোধান্বিত যে, এরূপ না পূর্বে কখনো হয়েছেন আর না পরে কখনো হবেন। উল্লেখ্য, তিনি কোন অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বলবেন, নাফ্সী! তোমরা অন্য কারো নিকট যাও। মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট যাও।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তখন তারা আমার নিকট আসবে। বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, শেষনবী, আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না আমরা কী অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কী পর্যায়ে পৌছেছে? রাসূলুল্লাহ্ তখন বলবেন, আমি সুপারিশের জন্য যাব এবং আরশের নিচে এসে পরওয়ারদিগারের উদ্দেশ্যে সিজ্দাবনত হব। আল্লাহ্ আমার অন্তরকে সুপ্রশস্ত করে দিবেন এবং সর্বোত্তম প্রশংসা ও হামদ্ জ্ঞাপনের ইল্হাম করবেন, যা ইতিপূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। এরপর আল্লাহ্র বলবেন, হে মুহাম্মাদ ! মাথা উত্তোলন করুন। দু'আ করুন, আপনার দু'আ কবূল করা হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এরপর আমি মাথা তুলব। বলব, হে পরওয়ারদিগার! উম্মাতী, উম্মাতী! এদের মুক্তি দান করুন। আল্লাহ্ বলবেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতের মধ্যে যাদের উপর কোন হিসাব নেই তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। অবশ্য অন্য দরজা দিয়েও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে তারা প্রবেশ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : শপথ সে সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! জান্নাতের দু'চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজ্রের দূরত্ব মত। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ও বস্রার দূরত্বের সমান। [মুসলিম শরীফ (বাংলা) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯-৩৮১]।

উপরন্তু ফিরিশতা, শহীদ, হাফিয, আলিমগণও শাফা'আতের অনুমতি পাবেন। পবিত্র কুরআন ও সিয়াম আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবে বলেও হাদীসে উল্লেখ আছে।

মু'জিযার তাৎপর্য

মু'জিযার শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ পরাভূতকারী। আল্লামা তাফ্তাযানী (র) মু'জিযার পারিভাষিক অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে :

وَهِيَ اَمْرٌ يَظْهَرُ خِلاَفَ الْعَادَةِ عَلٰى يَدِمَنْ يَّدَّعِي النُّبُوَّةَ عِنْدَ تَحَدِّى الْمُنْكِرِيْنَ عَلٰى وَجْهٍ يَعْجِزُ الْمُنْكِرِيْنَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ ·

মু'জিযা বলা হয়, নুবূওয়াত অস্বীকারকারীদের সাথে চ্যালেঞ্জ করার সময় নুবূওয়াতপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি হতে এমন অলৌকিক কাজ সংঘটিত হওয়া যার মুকাবিলা করতে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় অক্ষম।[৪২]

বস্তুত মু'জিযা প্রকাশের উদ্দেশ্য হল, নবী-রাসূলগণের দাবির সত্যতা প্রমাণ করা এবং তাঁদের দাবিকে শক্তিশালী করা।[৪৩]

মু'জিযাকে আল-কুরআনে আয়াত ও বুরহান বলা হয়েছে। 'আয়াত' শব্দের অর্থ নিদর্শন বা আলামত। মু'জিযা যেহেতু নবী-রাসূলগণের দাবির পক্ষে নিদর্শন, তাই মু'জিযাকে 'আয়াত' বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে এসব বিষয় নবী-রাসূলগণের আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ স্বরূপ হওয়ায় এগুলোকে কুরআন মাজীদে 'বুরহান' অর্থাৎ প্রমাণ বলা হয়েছে।[৪৪]

প্রকৃতপক্ষে মু'জিযা হল, আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম কুদ্রতের অন্যতম নিদর্শন। এর মাধ্যমে যেমনি আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্রতের প্রকাশ ঘটে, ঠিক তেমনি এরদ্বারা সংশ্লিষ্ট নবীর নুবূওয়াত প্রমাণিত হয়।

মু'জিযা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি সত্য। কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তা সত্ত্বেও কোন কোন মানুষ এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং বলে, বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, এর মূলে আছে একটি শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা। মু'জিযা যেহেতু এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, তাই মু'জিযার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যায় না।

বস্তুত মু'জিযার অস্তিত্বকে বিশ্বাস না করার প্রধানতম কারণ হল, আল্লাহ্র কুদ্রতের উপর ঈমান না থাকা। পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার তারা জানে যে, আল্লাহ্র পক্ষে এ সব অলৌকিক বিষয়ের কোনটাই অসম্ভব নয়। তিনিই এ অস্তিত্বহীন পৃথিবীকে অস্তিত্ব দান করেছেন, পিতামাতা ছাড়া আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন, ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য অগ্নিকুণ্ডকে ফুলের বাগানে পরিণত করেছেন, মূসা (আ)-এর জন্য নদীতে রাস্তা করে দিয়েছেন, ঈসা (আ)-কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদ্রতে সপ্তাকাশ অতিক্রম করিয়ে আপন সান্নিধ্য দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মু'জিযা অস্বীকার করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক-এর প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা।

বস্তুত স্বাভাবিকতার জ্ঞান অর্জন হয় অভিজ্ঞতা থেকে। আর অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয় একই ঘটনা বারবার দেখার ফলে। এ দেখার উপরই আমাদের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের ধারণা নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে আমাদের কোন দেখাই দু'বার, হাজারবার তথা যতবারই দেখি না কেন, আমাদের এ দেখা নিশ্চয়ই শেষ দেখা নয়। কাজেই স্বাভাবিকতার ধুয়া তুলে মু'জিযাকে অস্বীকার করা আদৌ সমীচীন নয়।[৪৫]

উল্লেখ্য যে, বস্তুত সাধারণ স্বভাবই তার চূড়ান্ত স্বভাব নয়। কেননা, স্বভাব দু'প্রকার এক. বিশেষ স্বভাব, দুই. সাধারণ স্বভাব। দুনিয়াতে সাধারণত যেসব নিয়ম-নীতি বিদ্যমান রয়েছে তা সাধারণ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ সাধারণ স্বভাবের উর্ধ্বে আরেক ধরনের স্বভাব রয়েছে যাকে 'বিশেষ স্বভাব' বলা হয়। নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিশেষ স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। কাজেই মু'জিযাকে অস্বাভাবিক বিষয় বলে প্রত্যাখ্যান করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ মু'জিযা সাধারণ স্বভাবের বিপরীত কাজ হলেও বিশেষ স্বভাবের বিপরীত কোন কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা এবং অলৌকিক ঘটনার সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে অত্যন্ত প্রকাশ্যগুলির সংখ্যা দশ হাজারের অধিক।[৪৬] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বড় মু'জিযা হল আল-কুরআনুল কারীম। পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূলকেই এরূপ মু'জিযা প্রদান করা হয়নি। পূর্ববর্তী নবীগণের মু'জিযাসমূহ এক বিশেষ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। আবার তা ঐ নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর খতম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আল-কুরআন হল, নবী (সা)-এর এক চিরন্তন মু'জিযা। নবী (সা)-এর যুগে তা যেমন সংরক্ষিত ছিল; অনুরূপভাবে তা কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। কোনরূপ বিকৃতি একে স্পর্শ করেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবেও না।

কুরআন মাজীদের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আরেকটি মু'জিযা হচ্ছে তাঁর হাদীস ভাণ্ডার। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই, যা হাদীসের মধ্যে আলোচিত হয়নি। একজন উম্মী নবী কেমন করে এরূপ ব্যাপক দিক-নির্দেশনা জগতবাসীর সামনে তুলে ধরলেন, তা অবশ্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার দিক থেকে এর মধ্যে যেমনিভাবে রয়েছে মু'জিযার শান, অনুরূপভাবে এর হিফাযতে সাহাবা, তাবিঈন, তাবি'-তাবিঈন, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও উলামায়ে দীন যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাতেও রয়েছে বিরাট মু'জিযার পরিচয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী, কাজ এবং অনুমোদনকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা হাজার হাজার পৃষ্ঠার কিতাব প্রণয়ন করেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন এতে লক্ষাধিক ব্যক্তির জীবনী। এমনকি এ খিদ্‌মত আঞ্জাম দিতে গিয়ে আসমাউর রিজাল, সনদ এবং উসূলে হাদীস প্রভৃতি নামে স্বতন্ত্র কয়েকটি বিষয়ও তাঁরা প্রবর্তন করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোন নযীর নেই। তাই দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, আল-কুরআনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস ভাণ্ডারও তাঁর অন্যতম মু'জিযা। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ, মি'রাজ গমন, উস্‌তুওয়ানায়ে হান্নানার ক্রন্দন ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য মু'জিযাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

মু'জিযা ও যাদু

বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মতে মু'জিযা এবং যাদুর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে :

১. যাদুবিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল করা হয়, কিন্তু মু'জিযা শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল করা যায় না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তিনি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

২. যাদুর মুকাবিলা করা সম্ভব। তাই এক যাদুকর অন্য যাদুকরের যাদুকে নস্যাত করে দিতে পারে। কিন্তু মু'জিযার মুকাবিলা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. যাদুর কোন বাস্তবতা নেই। বরং যাদু হচ্ছে একটি দৃষ্টিবিভ্রম ও সম্মোহনজনিত বিষয়। পক্ষান্তরে মু'জিযা কোন দৃষ্টিবিভ্রম বা কাল্পনিক বিষয় নয়; বরং মু'জিযা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা যা আল্লাহ্র কুদ্রতের নিদর্শন।

৪. যাদু প্রদর্শন করা হয় পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। আর মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় দীনের সত্যতা প্রকাশের জন্য।[৪৭]

৫. যাদুকর তার ইচ্ছানুযায়ী যাদু প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু মু'জিযার প্রকাশ নির্ভর করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর।

মু'জিযা ও কারামাত

'কারামাত'-এর আভিধানিক অর্থ সম্মানিত হওয়া, গুণীন হওয়া ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় :

ظُهُوْرُ اَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ مِنْ قِبَلِهِ غَيْرُ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النُّبُوَّةَ ۔

নবী হওয়ার দাবিদার নয় এমন কোন গুণী ব্যক্তির থেকে অলৌকিক কোন কিছু সংঘটিত হওয়াকে 'কারামাত' বলা হয়।[৪৮]

বস্তুত ওলীগণ থেকে 'কারামাত' প্রকাশিত হওয়া সত্য। কুরআন মাজীদে বহু কারামাতের উল্লেখ রয়েছে। যেমন হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট অলৌকিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছা এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর উযীর আসাফ ইব্ন বারখিয়্যা কর্তৃক মুহূর্তের মধ্যে ইয়ামান হতে রাণী বিল্কিসের সিংহাসন নিয়ে আসার ঘটনা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওলী-দরবেশগণের জীবনের অসংখ্য ঘটনায় কারামাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।[৪৯]

মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে :

১. মু'জিযার উদ্দেশ্য হল নুবূওয়াত অস্বীকারকারী লোকদের নিকট নবীর সত্যতা প্রকাশ এবং অস্বীকারকারীদেরকে তা থেকে অক্ষম প্রমাণ করা। আর কারামাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওলীগণের সম্মান বৃদ্ধি করা।

২. মু'জিযা নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমেই প্রকাশ ঘটে। আর কারামাত ঘটে থাকে ওলীগণের মাধ্যমে।

৩. মু'জিযা প্রকাশ করা জরুরী। কিন্তু কারামাত গোপন রাখা উত্তম।

৪. ওলী তাঁর কারামাত সম্বন্ধে অবগত নাও থাকতে পারেন। কিন্তু নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত মু'জিযা সম্পর্কে তাঁরা অবহিত থাকেন।

ইস্‌তিদ্‌রাজ

'ইস্‌তিদ্‌রাজ' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ কাউকে ক্রমে ক্রমে নিকটে টেনে আনা, এক স্তর হতে অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়া অথবা কাউকে ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি।[৫০] পরিভাষায় কোন মুলহিদ বা অমুসলিম ব্যক্তি হতে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাকে 'ইস্‌তিদ্‌রাজ' বলে। কোন পাপী এবং ফাসিকের মাধ্যমে অলৌকিক কিছু সংঘটিত হওয়া আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মানুষের জন্য এক মহা পরীক্ষা।[৫১]

সাহাবায়ে কিরাম

'সাহাবী' শব্দের অর্থ সঙ্গী, সাথী। পরিভাষায়,

هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِيْمَانِ ‧

যাঁরা ঈমানের অবস্থায় নবী কারীম (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং মু'মিন অবস্থায়ই ইন্‌তিকাল করেছেন তাঁদেরকেই 'সাহাবী' বলা হয়।[৫২]

সাহাবীগণের সংখ্যা লক্ষাধিক। নবী-রাসূলগণের পরেই তাঁদের মর্যাদা। কুরআন ও হাদীসে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত জামা'আত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ‧

তারপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করলাম। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩২)

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণের পর সমস্ত বিশ্ব ভূ-মণ্ডলে আমার সাহাবীগণকে মনোনীত করেছেন।[৫৩]

আল-কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

সাহাবায়ে কিরামের উস্তাদ হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তিনি তালীম, তারবিয়্যত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ইসলাহ ও সংশোধনের মাধ্যমে তাঁদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁদের সত্যবাদিতা, নির্ভরযোগ্যতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ‧

মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সিজ্‌দায় অনবত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজ্‌দার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে। (সূরা ফাতহ্, ৪৮ : ২৯)

ইমাম কুরতবী (র) সহ সকল মুফাস্‌সির اَلَّذِيْنَ مَعَهٗ অংশটিকে عام বা ব্যাপক অর্থবোধক বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সাহাবীই এ আয়াতের মর্মার্থের অন্তর্ভুক্ত।[৫৪]

সাহাবায়ে কিরামের জামা'আত, আদর্শ জামা'আত। তাঁদের অনুসৃত পথ সঠিক ও নির্ভুল পথ। এ কারণেই তাঁদের বিরোধিতা করাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতার নামান্তর বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং এ জাতীয় লোকদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۔

কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের (সা) বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেদিকে সে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস! (সূরা নিসা, ৪ : ১১৫)

এ আয়াতে মু'মিন বলতে সাহাবায়ে কিরাম-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তাঁরাই মু'মিনদের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জামা'আত। এরদ্বারা আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের জীবন, তাঁদের আমল-আখ্‌লাক, চরিত্র ও কার্যধারার অনুসরণই হল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঠিক অনুসরণ। আর সাহাবায়ে কিরামের জীবন ও চরিত্রকে আদর্শ নমুনারূপে স্বীকার করে নিলেই তা সম্ভব হতে পারে।

আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তা এবং পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার আন্তরিক আগ্রহের কথা ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُوْلٰئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۔

কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন, আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৭)

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۔

আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। (সূরা বায়্যিনা, ৯৮ : ৮)

আল্লামা ইব্‌ন আবদুল বার (র) বলেন :

وَمَنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ اَبَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ۔

মহান আল্লাহ্ যাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন ইন্‌শা আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি কখনো তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না।[৫৫]

আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামের ভিতর ও বাহির, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছু সামনে রেখেই এ ঘোষণা দিয়েছেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে

'রাদিয়াল্লাহু আনহু' শব্দটি আজ পর্যন্ত সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয়ে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। উল্লেখ্য যে, যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদেরও সন্তুষ্ট থাকা একান্ত কর্তব্য। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্টি বা ক্ষোভ রয়েছে তাদের সম্বন্ধে আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন :

يَاوَيْلُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ أَوْسَبَّهُمْ أَوْسَبَّ بَعْضَهُمْ (الى قوله) فَأَيْنَ هٰؤُلَاءِ مِنَ الْإِيْمَانِ بِالْقُرْاٰنِ اِذْ يَسُبُّوْنَ مَنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ·

চরম ধ্বংস সেই নরাধমের জন্য যারা সকল সাহাবায়ে কিরামের প্রতি অথবা তাঁদের কোন একজনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা তাঁদেরকে মন্দ বলে। আল্লাহ্ যাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট তাঁদেরকে যারা মন্দ বলে, কোথায় থাকলো তাদের কুরআনের উপর ঈমান?[৫৬]

এ ছাড়াও আরো বহু আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

অনেক হাদীসে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِخْتَارَنِيْ وَاِخْتَارَ لِيْ اَصْحَابِيْ فَجَعَلَ لِيْ مِنْهُمْ وَزَرَاءَ وَاَخْتَانًا وَاَصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَلَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ·

রিসালাতের জন্য আল্লাহ্ আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার সাহচর্যের জন্য সাহাবাদের নির্বাচন করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে আমার উযীর, কতিপয়কে আমার জামাতা ও শ্বশুর নির্বাচন করেছেন। যারা তাঁদেরকে মন্দ বলবে তাদের উপর আল্লাহ্, ফিরিশ্তা ও মানবকুলের লা'নত নেমে আসবে। তাদের ফরয ও নফল কোন আমলই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করবেন না।[৫৭]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সাহাবায়ে কিরামের অতীব সম্মান ও মর্যাদার কথা উল্লেখপূর্বক বলেন :

"কেউ যদি কারো আদর্শ অনুসরণ করতে চায় তাহলে তার জন্য উচিত যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন (সাহাবী) তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করা। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিত্নার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। আর তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবী। হৃদয়ের পবিত্রতায়, ইল্মের গভীরতায় এবং আড়ম্বরহীনতায় তাঁরা ছিলেন এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম জামা'আত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে তাঁর নবীর সঙ্গ লাভ এবং দীন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাও, তাঁদের পথ-পন্থা অনুসরণ কর এবং তাঁদের আখ্লাক ও আদর্শ দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধর। তাঁরা ছিলেন সরল ও সঠিক পথের পথিক।[৫৮]

উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম কোন ব্যক্তির বড় থেকে বড় কোন নেক্ আমলও সর্বনিম্ন সাহাবীর ছোট হতে ছোট কোন আমলের সমতুল্য হতে পারে না। সুতরাং তাঁদেরকে গালমন্দ করার অধিকার কারো নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لاَ تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَوْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ ٠

তোমরা সাহাবাদের গালমন্দ করো না। কেননা আল্লাহ্র পথে তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও কোন সাহাবীর এক মুদ্ (প্রায় এক সের) বা তার অর্ধেকের সমতুল্য হবে না।[৫৯]

হাদীসে উল্লেখিত لاَ تَسُبُّوْا শব্দটির অর্থ সাধারণত 'গালি দিওনা' করা হয়। এই অনুবাদ যথার্থ নয়। কেননা আমাদের ভাষায় গালি শব্দটি অকথ্য কথনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অথচ আরবী ভাষায় কষ্টদায়ক ও অবমাননাকর যে কোন কথাকেই سب বলা হয়। আর গালির সমার্থক শব্দ হল شتم। এ কারণেই হাদীসের তরজমায় আমরা 'গালমন্দ করো না' বলেছি। সাহাবীকে ভালবাসার অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভালবাসা। তাঁদের সম্বন্ধে সামান্যতম কটুবাক্যও গুরুতর ধৃষ্টতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لاَ تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَاْخُذَهُ ٠

আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে বিশেষভাবে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানিও না। তাঁদের প্রতি ভালবাসা আমার প্রতি ভালবাসারই প্রমাণ এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণেরই প্রমাণ। তাঁদেরকে যে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ্কেই কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহ্কে কষ্ট দিল অতিসত্বর তিনি তাকে পাকড়াও করবেন।[৬০]

যারা সাহাবীগণের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাঁদের সমালোচনা করে তারা অভিশপ্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ ٠

কাউকে আমার সাহাবীদের মন্দ বলতে যদি দেখ তবে বলে দিবে, তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্টতর তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ।[৬১]

সাহাবাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَكْرِمُوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ٠

তোমরা আমার সাহাবীদের সম্মান করবে। কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।[৬২]

নবী (সা) তাঁদের প্রশংসায় আরো ইরশাদ করেছেন :

لاَ تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِىْ ٠

জাহান্নামের আগুন ঐ মুসলিম ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না যে আমাকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।[৬৩]

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীসের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা, ফযীলত এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদের পাশাপাশি উম্মাতকে তাঁদের অনুসৃত পথে চলার জোর তাকীদ প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে সাহাবীদের প্রতি দোষারোপ করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও। সর্বোপরি সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ভালবাসার এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দিদ্বেষের পরিচায়ক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মনীষীদের দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে সাহাবায়ে কিরামের নির্ধারিত এ মর্যাদা সম্পর্কে সর্বযুগের উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন।

শ্রেষ্ঠতম তাবিঈ হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সম্বন্ধে বলেন, "সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত পথ গ্রহণ করাই সকল মুসলিমের কর্তব্য। কেননা তাঁরা কোন কিছু থেকে বিরত থাকলে তা ইল্মের ভিত্তিতেই বিরত রয়েছেন এবং সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির কারণেই কাউকে কোন কাজে বাধাদান করেছেন। জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের সমাধানে তাঁরা ছিলেন সক্ষম এবং দীনের ক্ষেত্রে তাঁরাই হলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

"দীনের পথে তাঁরাই হলেন অগ্রবর্তী এবং সকল ক্ষেত্রে রয়েছে তাঁদের পর্যাপ্ত দিক-নির্দেশনা। তাঁদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র থেকে সকল ব্যাধির উপশম লাভ সম্ভব। সুতরাং তাঁদের অনুসৃত পথ ও পন্থায় সংযোজন বা বিয়োজন কোনটাই সম্ভব নয়। একদল তাতে সংযোজন করতে গিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। আরেক দল বিয়োজন করতে গিয়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে পড়েছে। বস্তুত সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন উভয় প্রান্তিকতার মধ্যবর্তী সহজ-সরল পথের অনুসারী।[৬৪]

আল্লামা ইব্ন সালাহ্ (র) 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থে লিখেছেন, সাহাবায়ে কিরামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের কারোই আদালত ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তা কুরআন, সুন্নাহ্ ও উম্মাতের ইজ্মার দ্বারা সুপ্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন, "তোমরা মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ উম্মাত।"

আল্লামা ইব্ন আবদুল বার (র) 'আল-ইস্তি'আব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম হলেন উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জামা'আত। তাঁদের আদালত ও ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ রয়েছে। সর্বোপরি নবী কারীম (সা)-এর সাহচর্যের জন্য মনোনীত ব্যক্তিগণের তুলনায় অধিক ন্যায়পরায়ণ আর কে হতে পারে?

আল্লামা ইব্ন তাইমিয়া (র) ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) থেকে উদ্ধৃত করেন যে, সাহাবীদের মন্দ আলোচনা করা, দোষারোপ করা বা খুঁত খুঁজে বের করা কারো জন্যই বৈধ নয়; বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নাতীত। রাসূল (সা) ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামই হলেন একমাত্র যোগসূত্র। দীন ও শরী'আতের তাঁরাই হলেন প্রথম ধারক ও বাহক। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে দীন ও শরী'আতের অস্তিত্বও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

আল্লামা কামাল ইব্‌ন হুমাম (র) "আল মুসায়িরা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আকীদামতে, সকল সাহাবীর সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা বিশ্বাস করা, তাঁদের সমালোচনা সর্বতোভাবে পরিহার করা এবং তাঁদের প্রশংসা করা আবশ্য কর্তব্য।

আল্লামা সাফারিনী (র) তৎপ্রণীত 'আকীদা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সকল সাহাবীর ন্যায়পরায়ণতা স্বীকার করা এবং আন্তরিকভাবে তাঁদের প্রশংসা করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। কেননা আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁদের প্রশংসা করেছেন। সর্বোপরি যদি তাঁদের শানে আল্লাহ্ ও রাসূলের কোন প্রশংসা বাণী উচ্চারিত নাও হত তবুও তাঁদের হিজরত ও জিহাদ এবং আল্লাহ্র পথে জান-মালের কুরবানী, তাঁদের ঈমানী শক্তি ইত্যাদি গুণাবলীর কারণে উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম জামা'আত বলে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য হত। সর্বজনমান্য ইমামদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে এ-ই হল উম্মাতের সর্বজনীন আকীদা ও বিশ্বাস।

'আল-আকাইদুন্ নাসাফিয়্যা' গ্রন্থে আল্লামা নাসাফী (র) লিখেছেন যে, মুসলিম উম্মাহ্র আকীদা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম সম্বন্ধে শুধু উত্তম আলোচনা করা উচিত। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) 'শরহে ফিক্‌হে আকবর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আমরা সাহাবায়ে কিরামের গুণচর্চা ব্যতিরেকে কখনো দোষচর্চা করব না। ইমাম তাহাভী (র) 'আকীদাতুত্ তাহাভী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যারা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে অথবা তাঁদের কুৎসা রটায়, আমরাও তাদের শত্রু বলে মনে করি। আমরা কেবল সাহাবায়ে কিরামের গুণচর্চা করি, দোষচর্চা করি না।

ইমাম মালিক (র) বলেন, সাহাবীগণকে যারা হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে এ সম্বন্ধে মুসলিম উম্মাহ্র সর্বজনীন সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁদের এসব কর্মকাণ্ড ইজতিহাদের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, এ সব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন কিন্তু আমরা জানি না। সুতরাং যে বিষয়ে সাহাবীগণ একমত আমরা তা অনুসরণ করব। আর যে বিষয়ে তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত আমরা তাতে নীরবতা অবলম্বন করব।

সারকথা হচ্ছে, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং তাঁদের প্রতি কটূক্তি হতে বিরত থাকা ওয়াজিব।

ফিরিশ্‌তা

'ফিরিশ্‌তা' শব্দটি ফার্সী। আরবীতে ফিরিশ্‌তাকে একবচনে 'মালাক' ও বহুবচনে 'মালাইকা' বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ বার্তাবাহক। ইসলামী পরিভাষায় ফিরিশ্‌তার পরিচিতি হল :

جِسْمٌ نُورَانِيٌّ مُتَشَكِّلٌ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لاَ يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٠

এমন নূরানী মাখলূক—যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা কখনো আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করেন না; বরং সর্বদা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে রত থাকেন।[৬৫]

বস্তুত ফিরিশ্‌তা নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্ট। তাঁরা সাধারণত অদৃশ্য, তাঁদের কোন আকার নেই। তবে তাঁরা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন। তাঁরা আমাদের মত রক্ত-মাংসের সৃষ্টি নন। তাঁদের কামনা-বাসনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিদ্রা কিছুই নেই। তাঁরা সবসময় আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকেন। আল্লাহ্ যখন যা হুকুম করেন, তাঁরা তাই পালন করেন। এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রহমত অথবা শাস্তি যা কিছু নাযিল হয়, তা এই ফিরিশ্‌তাগণের মাধ্যমে নাযিল করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণের প্রতি যেসব কিতাব নাযিল করেছেন, তা তাঁদের মাধ্যমে করেছেন। তাঁরা বান্দার আমল লিপিবদ্ধ করেন এবং জান কবয করেন। বিচার দিনে তাঁরা বান্দার ভাল-মন্দ আমলের সাক্ষ্য দিবেন।

ফিরিশ্‌তাগণের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত আছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ ٠

আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ : ৩১)।

চারজন বড় বড় ফিরিশ্‌তাসহ কতিপয় ফিরিশ্‌তার নাম আমরা জানি। যেমন : ১, জিব্‌রাঈল (আ) তিনি নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁকে রূহ্ বা রূহুল আমীনও বলা হয়। ২. মীকাঈল (আ), তিনি সকল জীবের জীবিকা বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত। ৩. আযরাঈল (আ), তিনি সকল জীবের জীবন বা রূহ্ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত। ৪. ইস্‌রাফীল (আ), তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের সাথে সাথে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এরপর কিয়ামত কায়েম হবে।

উপরে বর্ণিত চারজন ফিরিশ্‌তা ছাড়াও আরো কতিপয় ফিরিশ্‌তার উল্লেখ রয়েছে। যেমন : কিরামান কাতিবীন, যারা মানুষের ভালমন্দ আমল লিপিবদ্ধ করেন; মুন্‌কার ও নাকীর, তাঁরা মৃত্যুর পর কবরে প্রশ্ন করেন। জাহান্নামের রক্ষক ফিরিশ্‌তার নাম মালিক এবং জান্নাতের যিম্মাদার ফিরিশ্‌তার নাম রিযওয়ান। এমনিভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত ফিরিশ্‌তা রয়েছেন।

মাওলানা সুলায়মান নদভী (র) ফিরিশ্‌তাগণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, দুনিয়ার সকল ধর্মমতে এ জাতীয় সত্তাসমূহের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে।[৬৬]

আসমানী কিতাবসমূহ

নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে যেসব কিতাব লাভ করেছেন সেসব ধর্মগ্রন্থকে আসমানী কিতাব বলা হয়। সব আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনা ফরয। সূরা বাকারার শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۔

(মুত্তাকী তারাই) যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান রাখে। (সূরা বাকারা, ২ : ৪)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۔

রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও। তাঁদের সকলেই আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৫)

অনুরূপ আরো বহু আয়াতে এ কথা বিবৃত হয়েছে যে, সত্যিকার ঈমানদার হতে হলে কুরআন মাজীদ এবং পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনা আবশ্যক।

আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য হল, এ কথা বিশ্বাস করা যে, এগুলো আল্লাহ্র পক্ষ হতে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। মানব জাতির হিদায়াতের জন্য 'আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন নবীর প্রতি সে যুগের লোকদের হিদায়াতের জন্য এ কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনের উপর ঈমান আনার মর্ম হচ্ছে, এর মধ্যে যত হুকুম-আহ্কাম, বিধি-বিধান রয়েছে তা মনেপ্রাণে স্বীকার করা এবং এ কথা বিশ্বাস করা যে, এই কিতাব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এ কিতাব নাযিল হওয়ার পর অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর আমল করা রহিত হয়ে গেছে। কেননা পূর্বে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছে তা যেমনিভাবে রহিত, ঠিক তেমনি বিকৃতও বটে। কিন্তু কুরআন মাজীদের বিষয়টি এর থেকে স্বতন্ত্র। এতো এক শাশ্বত চিরন্তন কিতাব। সর্বকালের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এ কুরআন সমভাবে প্রযোজ্য।

আসমানী কিতাবের সংখ্যা

আল্লাহ্ প্রেরিত আসমানী কিতাবের সংখ্যা একশ' চার। তন্মধ্যে—১. তাওরাত, ২. যবূর, ৩. ইন্জীল ও ৪. কুরআন, এ চারখানা কিতাব বিখ্যাত।[৬৭] কুরআন শরীফে প্রথমোক্ত তিনখানা কিতাবের উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া আল-কুরআনে সহীফার কথাও উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۔

এতো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে : ইব্রাহীম ও মূসার (আ) গ্রন্থে। (সূরা আ'লা, ৮৭ : ১৮-১৯)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَانَّهُ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ۰

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৯৬)

কুরআন পরিচিতি

মানুষ ও জিন্ জাতির হিদায়াতের জন্য সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন। এই কিতাব নাযিল হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি। ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۰

যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর এ (কুরআন)-ই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে (নাযিলকৃত) সত্য। তিনি তাদের মন্দকাজগুলো বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۰

আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৪৪)

এ আয়াতে 'আয্-যিক্র' বলে কুরআন শরীফকেই বুঝানো হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۰

আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ২)

কুরআন মাজীদে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে এবং খাতামুন্ নাবীয়্যীন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই এই কিতাবের হিফাযাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই এতে কোন প্রকার তাহ্রীফ তথা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের কোন অবকাশ নেই। কুরআন শরীফ যেমনটি নাযিল হয়েছিল তেমনটিই রয়েছে এবং চিরকালই থাকবে। এর একটি শব্দ বা বর্ণও রদবদল হয়নি, কখনো হবেও না। অসংখ্য হাফিযের সিনায় পূর্ণ কুরআন শরীফ সংরক্ষিত আছে। এ-ও কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম মু'জিযা। অন্য কোন আসমানী কিতাব এভাবে সংরক্ষিত নেই। কুরআনই অপরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থরূপে চিরকাল বলবৎ থাকবে। এর মধ্যে বিধৃত আদর্শ, নীতি ও আইন-কানুন সবকালের, সব দেশের, সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

মহান রাব্বুল আলামীন লাওহে মাহফূয থেকে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাঁর তেইশ বছরের নুবূওয়াতকালে এ কিতাব নাযিল করেছেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র)-এর মতে কুরআনে যেসব ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং উপদেশপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণিত হয়েছে, তা পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় :

১. ইলমুল আহ্‌কাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কিত ইল্‌ম : (অর্থাৎ ইবাদত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে ওয়াজিব (অবশ্যকরণীয়), মান্দুব (প্রশংসনীয়), মুবাহ্ (বৈধ), মাকরূহ্ (অপসন্দনীয়) এবং হারাম (অবশ্য পরিত্যাজ্য) ইত্যাদি বিষয়াদি সম্পর্কিত ইল্‌ম।

২. ইলমুল মুখাসামা বা ন্যায়শাস্ত্র : অর্থাৎ ইয়াহূদী, খ্রীস্টান, মুশরিক ও মুনাফিক এই চারটি পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্কে পারদর্শিতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ইল্‌ম।

৩. ইল্‌মুত তাযকীর বি আলাইল্লাহ্ : অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিদর্শন সম্পর্কিত ইল্‌ম। এতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য, আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌হাম এবং সৃষ্টিকর্তার সর্ববিধ গুণাবলীর পরিচয় সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো এতে রয়েছে।

৪. ইলমুত্ তায্‌কীর বি আইয়ামিল্লাহ্ : অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বস্তুর অবস্থা, অনুগতদের পুরস্কার ও অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কিত বর্ণনা।

৫. ইলমুত্ তাযকীর বিল-মাউত ওয়া মা বা'দাল মাউত : অর্থাৎ মৃত্যু ও তার পরবর্তীকালের অবস্থা সম্পর্কিত ইল্‌ম। এতে পুনরুত্থান, একত্রীকরণ, হিসাব-নিকাশ, মীযান ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

আল-কুরআনে এসব ইল্‌ম বিতরণের জন্য সেকালের আরবদের নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, পরবর্তীকালের আরবদের বর্ণনারীতির ভিত্তিতে নয়। বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত করা হয়নি। 'ইল্‌মুল মুখাসামা' সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বসম্মত নীতি ও কল্যাণকর উপদেশের সহজ পন্থা অবলম্বন করেছেন। তর্ক বিশারদদের মত যুক্তির ম্যারপ্যাঁচে ধাপে ধাপে এগোবার দীর্ঘ পথ অবলম্বন করা হয়নি। এমনকি অধুনা প্রবন্ধকারদের মত বিভিন্ন কথার গাঁথুনি রচনার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। অধিকন্তু বান্দাদের জন্য যখন যেখানে যতটুকু প্রয়োজন তাই বয়ান করেছেন। কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হল, মানব সভ্যতার উৎকর্ষ বিধান, বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদার মূলোৎপাটন এবং কুসংস্কার ও কুকার্যসমূহ খতম করে আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠন করা।[৬৮]

কুরআন প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ জীবন পদ্ধতি। কুরআনে নির্দেশিত সিরাতুল মুস্তাকীম অনুসরণ করে নিজের ও অপরের ইহ-পরকালের শান্তি লাভ করতে পারে এবং পৌঁছাতে পারে অভিষ্ট লক্ষ্যে। এ জীবন যাপন করতে পারলেই মাটির মানুষ ফিরিশ্‌তার চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে। একমাত্র আল-কুরআনই মানুষকে গৌরবের আসনে তুলে ধরতে এবং উন্নত জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

আল-কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। এর মধ্যে ৮২টি মাক্কী ও ২০টি মাদানী ও ১২টিতে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এ ১২টি মাক্কী সূরা, কারো মতে মাদানী। মাক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত আকীদা তথা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে এবং মাদানী সূরাগুলোতে শরী'আতের হুকুম-আহ্‌কাম তথা আচার-ব্যবহার,

হালাল-হারাম, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সমগ্র কুরআনে ১১৪টি সূরায় প্রসিদ্ধ মতে আয়াত সংখ্যা মোট ৬৬৬৬টি।[৬৯]

কুরআন শরীফ ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডকে 'পারা' বলা হয়। সাতদিনে খতম করার সুবিধার্থে উক্ত সূরাগুলোকে সাত মনযিলে বিভক্ত করা হয়েছে, ১. সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত, ২. সূরা মায়িদা থেকে সূরা তাওবা পর্যন্ত, ৩. সূরা ইউনুস থেকে সূরা নাহ্‌ল পর্যন্ত, ৪. সূরা বানী ইসরাঈল থেকে সূরা ফুরকান পর্যন্ত, ৫. সূরা শু'আরা থেকে সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত, ৬. সূরা সাফ্‌ফাত থেকে সূরা হুজুরাত পর্যন্ত, ৭. সূরা কাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

আল-কুরআনে ৫৫৪টি রুকু এবং ১৪টি সিজ্‌দার আয়াত রয়েছে। আল-কুরআনের শব্দ সংখ্যা ৮৬,৪৩০; হরফ সংখ্যা ৩,২২,৬৭১; যবর সংখ্যা ৫৩,২৪৩; যের সংখ্যা ৩৯,৫৮২; পেশ সংখ্যা ৮,৮০৪। তাশদীদ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে ১,২৫৩ বার এবং মদ ব্যবহৃত হয়েছে ১,৭৭১ বার। আল-কুরআনে নুক্‌তা রয়েছে ১,০৫,৬৮২টি।[৭০]

তাক্‌দীর : সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

তাক্‌দীর শব্দটি আরবী 'কাদারুন' থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ নির্ধারণ করা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। পরিভাষায় তাক্‌দীরের সংজ্ঞা হল :

هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِيْ يُوْجَدُ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْعٍ وَضَرٍّ وَمَا يَحْوِيْهِ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ .

সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভালমন্দ, উপকার-অপকার ইত্যাদির স্থান-কাল এবং এসবের শুভ ও অশুভ পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত হওয়া।[৭১]

এর ব্যাখ্যা হল, জগতের যাবতীয় বস্তু তথা মানুষ ও জিনসহ যত সৃষ্টি রয়েছে সবকিছুর উৎপত্তি ও বিনাশ, ভাল ও মন্দ, উপকার ও অপকার ইত্যাদি কখন কোথায় ঘটবে এবং এর পরিণাম কি হবে, প্রভৃতি মাখলূক সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। জগতে যা কিছু ঘটছে এবং ঘটবে সবই তাক্‌দীরে লিপিবদ্ধ আছে। তাক্‌দীরের বাইরে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

كُلُّ شَيْئٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزَ وَالْكَيْسَ .

প্রত্যেক জিনিসই তাক্‌দীর অনুসারে সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনকি অক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তাও।[৭২]

'কাদার' শব্দের সাথে সাধারণত আরেকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা হল 'কাযা'। 'কাযা' শব্দের আভিধানিক অর্থ ফায়সালা করা, হুকুম দেওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় কাযা বলা হয় :

اَلْاِرَادَةُ الْأَزَلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَوْجُوْدَاتِ الْكَائِنَةِ فِيْمَا لَا يَزَالُ .

অনন্তকাল ধরে সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার অনাদি ইচ্ছা বা পরিকল্পনাকে 'কাযা' বলা হয়। আর 'কাদার' হচ্ছে ঐ সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত ও বাস্তব রূপ।[৭৩]

মোটকথা, কোন জিনিসই তাক্‌দীরের বাইরে নয়। তবে তাক্‌দীর মানুষের কাজের কারণ নয় এবং তাক্‌দীর লিপিবদ্ধ আছে বলেই মানুষ ভালমন্দ ইত্যাদি করছে বিষয়টি এমনও নয়;

বরং মানুষ ভবিষ্যতে যা করবে আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তা আদিতেই জানেন তাই তিনি তা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থাৎ মানুষ যা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন বলে মানুষ করছে, এ কথা ঠিক নয়। বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা যায়। ধরা যাক, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার তার রোগীর অবস্থা জানেন বলে তার ডায়েরীতে লিখে রাখলেন যে, এ রোগী অমুক সময় অমুক অবস্থায় মারা যাবে। অবশেষে যদি তাই হয়, এক্ষেত্রে ডাক্তারের লিখন তার মৃত্যুর কারণ নয়। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অবস্থা জানেন বলে সব লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তবে এ লিপিবদ্ধকরণ মানুষের কার্যের কারণ নয়। মানুষের কার্যের কারণ মানুষের ইচ্ছা বা সংকল্প। কাজেই ভালমন্দ কাজের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী হবে।[৭৪]

কারো কারো মতে, তাক্দীর দুই প্রকার—মুবরাম (مُبْرَم) ও মু'আল্লাক (مُعَلَّق)। যে তাক্দীরে কোন পরিবর্তন হয় না তাকে তাক্দীরে মুব্রাম বলে। আর যে তাক্দীরে পরিবর্তন হয় তাকে তাক্দীরে মু'আল্লাক বলে। যেমন : ঔষধ ও দু'আর দ্বারা তাক্দীর পরিবর্তন হওয়া। প্রকৃতপক্ষে তাক্দীর সবই মুব্রাম—অপরিবর্তনশীল।[৭৫]

তাক্দীরের বিষয়টি কখন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির তাক্দীর লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।[৭৬]

তাক্দীরের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের ন্যায় তাক্দীরের উপর বিশ্বাস রাখাও ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। বহু হাদীসে তাক্দীরের উপর ঈমান আনার কথা বিবৃত হয়েছে :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ ٠

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : কোন বান্দাই মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না এই চারটি কথায় বিশ্বাস করে—১. এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। ২. মৃত্যুতে বিশ্বাস করবে; ৩. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে; ৪. তাক্দীরে বিশ্বাস করবে।[৭৭]

তাক্দীরের উপর অবিশ্বাস করা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার 'ইলমে আযলী' (চিরন্তন জ্ঞান)-কে অস্বীকার করারই নামান্তর। এ অবিশ্বাস মানুষকে একাধিক স্রষ্টার বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : আমার উম্মাতের মধ্যে দুই শ্রেণীর মানুষ এমন আছে যাদের জন্য ইসলামের কোন অংশ নেই। তারা হল মুরজিয়া ও কাদ্রিয়া সম্প্রদায়।[৭৮]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে খাস্ফ (ভূমি ধসে যাওয়া) ও মাস্খ (আকৃতি বিকৃত হওয়া) সংঘটিত হবে এবং তা তাক্দীরে অবিশ্বাসীদের মধ্যেই হবে।[৭৯]

তাক্দীরে বিশ্বাস করা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ইলমে আযলী (চিরন্তন জ্ঞান)-কে স্বীকার করার প্রয়োজনেই আবশ্যক নয়; বরং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও তাক্দীরে বিশ্বাস করা জরুরী। কেননা যারা তাক্দীরে বিশ্বাসী নয় তারা হয়তো নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী নয় বলে মনে করে অথবা আল্লাহ্কে এমন পর্যায়ে মনে করে যে, তাঁকে মানা বা না মানাতে কোন ব্যবধান বা পার্থক্য নেই। বস্তুত তাক্দীরকে অস্বীকার করা আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

اِيْمَانٌ بِالْقَدْرِ نِظَامُ التَّوْحِيْدِ فَمَنْ اٰمَنَ وَكَذَّبَ بِالْقَدْرِ فَقَدْ نَقَضَ لِلتَّوْحِيْدِ ·

আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া তাক্দীরের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। কাজেই যে ব্যক্তি ঈমান আনল কিন্তু তাক্দীরকে অস্বীকার করল প্রকৃতপক্ষে সে একত্ববাদকেই প্রত্যাখ্যান করল।[৮০]

তাক্দীরে অবিশ্বাস এমন গুরুতর অপরাধ যে, রাহমাতুলল্লিল আলামীন (সা)-ও তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাক্দীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা ফরয। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "কেউ যদি আমার নির্ধারিত তাক্দীরের উপর সন্তুষ্ট না থাকে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ না করে তবে সে যেন আমি ছাড়া অন্য কাউকে রব বানিয়ে নেয়।[৮১]

তাক্দীর সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত

আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে, বান্দার কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। সৎকর্ম করলে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে আর অসৎকর্ম করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে।[৮২]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন :

اَنَّ التَّكْلِيْفُ اَمْرُ بَيْنَ الْبَيْنِ لاَ جَبْرَ وَلاَ قَدْرَ وَلاَ كَرْهَ وَلاَ تَسْلِيْطَ ·

মানুষকে শরী'আত পালনে দায়িত্বশীল (মুকাল্লাফ) করার বিষয়টি মাঝামাঝি ধরনের একটি বিষয়। এখানে যেমন পূর্ণাঙ্গ মাজবূরী ও বাধ্যবাধকতা নেই, তেমনি পূর্ণ ইখ্তিয়ার বা স্বাধীনতাও নেই।[৮৩]

মানুষকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কর্মের এমন একটি শক্তি প্রদান করা হয়েছে, যা খাল্ক তথা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু কাস্ব তথা অর্জনের ক্ষমতা রাখে। মানুষের মধ্যে এই কাস্বের ক্ষমতা আছে বলেই ভালোর জন্য প্রতিদান এবং মন্দের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আবার এ ক্ষমতাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় মানুষকে নিজ ইচ্ছা ও কর্মের খালিক বা স্রষ্টা বলে অভিহিত করা যায় না। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে এ শক্তি আছে বলে তাকে শক্তিহীন জড়পদার্থের মতও গণ্য করা যায় না। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (র) বলেন, বান্দার ইখ্তিয়ার এবং স্বাধীনতা তো আছে তবে এ ইখ্তিয়ার আল্লাহ্ তা'আলার ইখ্তিয়ারের অধীন।[৮৪] অর্থাৎ কর্মের ইচ্ছা এবং কর্মের শক্তি মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু এর সাথে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটলে কোন কিছুরই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না।

মানুষ এবং মানুষের কর্ম সবই আল্লাহ্‌র তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ·

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও। (সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ : ৯৬)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ·

আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬২)

তাক্‌দীর লিপিবদ্ধ করার হিক্‌মাত

সৃষ্টির পূর্বেই তাক্‌দীর লিপিবদ্ধ করার পিছনে বিশেষ হিক্‌মাত নিহিত রয়েছে। তা হল, মানুষ যেন সুখ ও সফলতায় অতিশয় আনন্দিত না হয় এবং দুঃখ ও বিপদে চরমভাবে ভেঙ্গে না পড়ে। কেননা মানুষ সাধারণত সুখ ও সফলতা পেলে আনন্দে মেতে উঠে এবং দুঃখ ও ব্যর্থতায় চরমভাবে ভেঙ্গে পড়ে। মানব চরিত্রের এ দু'টি অবস্থা মানুষকে আল্লাহ্‌ বিমুখতার দিকে ঠেলে দেয়। তাই এ দু'টি অবস্থাকে নৈতিক দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করা যায়। তাক্‌দীরে বিশ্বাস মানুষকে এ দু'ধরনের দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে। কারণ তাক্‌দীরে বিশ্বাসী ব্যক্তি এ কথা নিশ্চিতভাবে জানে যে, মানবজীবনে সুখ-দুঃখ, সফলতা ও ব্যর্থতা যা কিছুই ঘটছে সবই তাক্‌দীরে লিপিবদ্ধ আছে। তাক্‌দীরের বাইরে কিছুই ঘটছে না। কাজেই সুখ ও দুঃখ কোন অবস্থাতেই সে আল্লাহ্‌ থেকে বিমুখ হয় না। বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখের অবস্থায় তাঁর শোক্‌র আদায় করে।

ইরশাদ হয়েছে :

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِىْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ·

পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা খুবই সহজ, এটি এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্‌ পসন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২, ২৩)

তাক্‌দীরের সঙ্গে তাদ্‌বীরের কোন সংঘাত নেই

কার্য সম্পাদনের জন্য আস্‌বাব তথা উপায়-উপকরণ অবলম্বন করাকে তাদ্‌বীর বলা হয়। তাক্‌দীরের সঙ্গে তাদ্‌বীরের কোন সংঘাত নেই। কাজেই আস্‌বাব অবলম্বন করা তাক্‌দীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। কেননা তাক্‌দীরে এ আস্‌বাব অবলম্বনের কথাও লিখিত আছে।

একবার এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যে ঝাড়ফুঁক করিয়ে থাকি, চিকিৎসায় ঔষধ প্রয়োগ করে থাকি অথবা আত্মরক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করে থাকি, তা কি তাক্‌দীরের কোন কিছুকে রদ করতে পারে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমাদের এ সকল চেষ্টাও তাক্‌দীরের অন্তর্গত।[৮৫]

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন, তাক্‌দীর এবং তাদ্‌বীরের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। সংঘাত তখনই দেখা দিত যদি তাদ্‌বীর তাক্‌দীরের আওতা বহির্ভূত হত অথবা তাক্‌দীরের মধ্যে তাদ্‌বীরের বিষয়টি লিখিত না থাকত। তাক্‌দীর এবং তাদ্‌বীরের মধ্যে সংঘাত নেই এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফে বর্ণিত হযরত ইয়াকূব (আ)-এর ঘটনার মধ্যে দেখা যায়। তিনি নিজ সন্তানদেরকে মিসর পাঠানোর প্রাক্কালে আপাতদৃষ্টিতে যে সমস্যা অনুভব করেছিলেন এর থেকে সন্তানদেরকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তাদেরকে অসিয়্যাত করে বলেছিলেন :

يٰبَنِىَّ لاَ تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ‏.

হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না। ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬৭)

হযরত ইয়াকূব (আ) সন্তানদেরকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য এ তাদ্‌বীর অবলম্বন করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে তাক্‌দীর সম্বন্ধে অবহিত করে বলেছিলেন :

وَمَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ‏.

আল্লাহ্‌র বিধানের বাইরে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারি না। বিধান আল্লাহ্‌রই। আমি তার উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করুক। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬৭)

এ ক্ষেত্রে হযরত ইয়াকূব (আ) তাক্‌দীর এবং তাদ্‌বীর-এর মধ্যে যে সমন্বয় সাধন করেছেন এটি আমাদের জন্য উত্তম নমুনা।[৮৬]

মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী (র) বলেন, মানুষ বলতে পারে না যে, কোন্ বিষয়ে তার তাক্‌দীরে কি রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র দেওয়া ইখ্‌তিয়ার দ্বারা তাঁর হুকুম অনুযায়ী তাদ্‌বীর বা কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। তাদ্‌বীরের চরম সীমায় না পৌঁছে এ কথা বলা যায় না যে, এ কাজটি হবে না বা এটি আমার তাক্‌দীরে নেই। এ হিসাবে তাদ্‌বীরকে তাক্‌দীরের কুঞ্জী বলা হয়। এ জন্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) মানুষকে কাজ করার জন্য এত তাকীদ করেছেন। তাক্‌দীরের উপর ভরসা করে বসে থাকতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্মময় জীবনই-এর উত্তম আদর্শ।[৮৭]

তাক্‌দীরকে ওযর হিসাবে পেশ করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কর্ম সম্পাদনের শক্তি দিয়েছেন। আর এ কারণেই তাদের উপর শরী'আতের বিধি-বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তাক্‌দীর সম্পর্কে বিতর্ক

তাক্‌দীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। তাক্‌দীরের উপর ঈমান রাখা আবশ্যক। এ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া নিরাপদ নয়; বরং এ বিতর্ক অনেক ক্ষেত্রে কুফ্‌রী ও নাস্তিকতা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। হাদীসে এরূপ বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসন্তুষ্টির কথা বিবৃত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তখন তাক্‌দীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের উপর এত রাগ করলেন যে, রাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল, যেন তাঁর গণ্ডদেশে আনারের দানা নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের কি এ বিষয়ে হুকুম করা হয়েছে, না কি আমি এ নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, আবার কসম দিয়ে বলছি, তোমরা এ বিষয়ে কখনো বিতর্কে লিপ্ত হবে না।[৮৮]

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তাক্‌দীর সম্পর্কে আলোচনা করবে, কিয়ামাতের দিন তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে আলোচনা করবে না, তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে না।[৮৯]

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে বললেন, তাক্‌দীর সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, طَرِيْقٌ مُظْلِمٌ فَـلاَ تَسْلُكْهُ এটা অন্ধকার পথ, এ পথে চলবে না। পুনরায় প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, بَحْرٌ عَمِيْكٌ فَلاَ تَلْجِنُهُ গভীর সমুদ্র, এতে প্রবেশ করবে না। আবারো প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, سِرُّ اللّٰهِ قَدْ خُفِيَ عَلَيْكَ فَلاَ تَفْتِشْهُ এ হলো আল্লাহ্‌র গোপন রহস্য, তা তোমার থেকে গোপন রাখা হয়েছে। সুতরাং তুমি এ নিয়ে অতিরিক্ত অনুসন্ধান করবে না।[৯০]

আখিরাত : ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

'আখিরাত' অর্থ মৃত্যু পরবর্তী জীবন। আখিরাত বলতে মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকাল জীবনকে বুঝায়। কবর, হাশ্‌র, হিসাব, পুলসিরাত এবং জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুই-এর অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আখিরাতের জীবনকে দু'টি পর্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে, ১. মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত; ২. কিয়ামত থেকে অনন্তকাল অবধি। সেখান মৃত্যু ও ধ্বংস নেই।[৯১] প্রথম পর্যায়ের নাম 'বরযখ' বা কবরের জীবন। মৃত্যুর পর মানব দেহ কবরস্থ করা হোক কিংবা সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হোক অথবা আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া হোক বা অন্য কোনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হোক, সব অবস্থাই তার জন্য বরযখ। আর দ্বিতীয় পর্যায় হল, কিয়ামত, হাশ্‌র-নশর তথা অনন্তকালের জীবন। কিয়ামত বলতে এমন এক সময়কে বোঝায় যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে জগতের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর যখন আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হবে তখন তিনি আবার সকলকে জীবিত করবেন, সকলেই পুনরুত্থিত হয়ে হাশরের

ময়দানে একত্রিত হবে। এরপর সকলের কাছ থেকে জাগতিক জীবনের সব কিছু হিসাব গ্রহণ করা হবে। হিসাব-নিকাশের মানদণ্ডে আল্লাহ্র যে সব বান্দা উত্তীর্ণ হবেন তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। আর যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ পর্যায় হতেই মানুষ অনন্তকালের জন্য জান্নাতে বা জাহান্নামে অবস্থান করতে থাকবে।

আখিরাতের উপর ঈমান আনার আবশ্যকতা

আখিরাতে বিশ্বাস ইসলামের আকীদাসমূহের মধ্যে অন্যতম। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ হয় না। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ٠

আর যারা পরকালের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (সূরা বাকারা, ২ : ৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ٠

পূর্ব ও পশ্চিমদিকে মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, আখিরাত, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত আসমানী কিতাব এবং নবীগণের উপর ঈমান আনলে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৭৭)

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা ভ্রান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً ۢ بَعِيْدًا ٠

যে ফিরিশ্তাগণকে এবং তাঁর কিতাবসমূহকে, রাসূলগণকে এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করল, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। (সূরা নিসা, ৪ : ১৩৬)

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও আদর্শের উপর নিজেকে সুদৃঢ় রাখার জন্য আখিরাতের উপর আস্থাশীল হওয়া আবশ্যক। কারণ মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন শুরু হবে এবং সে জীবনে পুরস্কার কিংবা শাস্তি, সফলতা কিংবা ব্যর্থতা ইহকালের কর্মকাণ্ডের উপরই নির্ভরশীল, এ কথার বিশ্বাসই মানুষকে পার্থিব জীবনে সত্যপথের অনুসারী বানায় এবং আমলে সালিহের পথে উদ্বুদ্ধ করে। আখিরাতের বিশ্বাস মানব মনে সত্যের প্রতি আনুগত্য এবং অসত্য পরিহার করার মনোভাবের জন্ম দেয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ٠

এক ইলাহ্, তিনিই তোমাদের ইলাহ্, সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ২২)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে আখিরাতের বিশ্বাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত জিব্রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে? উত্তরে তিনি বললেন : আল্লাহ্কে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতকে বিশ্বাস করবে। আর বিশ্বাস করবে তাক্দীরের ভালমন্দের উপর।[৯২]

মৃত্যু ও বরযখ

মৃত্যু সকলের জন্যই অবধারিত। এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন ও হাদীসে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। মৃত্যু চিন্তা মানুষকে আল্লাহ্মুখী করে। অনন্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের কাজে বান্দাকে সর্বদা নিয়োজিত রাখে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۔

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۔

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে নাগালে পাবেই; এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۔

বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবেই। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট। তখন তোমরা যা করতে এ সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। (সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৮)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ۔

সকল প্রকার স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে তোমরা স্মরণ কর।[৯৩]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : চতুষ্পদ জন্তু যদি তোমাদের মত মৃত্যু জানতে পারত তবে তোমরা তাদের মধ্যে কোন একটিকেও মোটাতাজা দেখতে পেতে না।[৯৪]

আলমে বরযখ সম্বন্ধে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۔

তাদের সামনে বরযখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১০০)

এ আলমে বরযখে মৃতব্যক্তির সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে এ সম্বন্ধে হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : (কবরে মু'মিন) বান্দার নিকট দু'জন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে বসান। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? সে বলে, আমার রব আল্লাহ্। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দীন কি? সে বলে, আমার দীন ইসলাম? পুনরায় প্রশ্ন করেন, এই ব্যক্তি যাঁকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি কে? উত্তরে সে বলবে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সা)। তখন ফিরিশ্তা বলেন, তুমি তা কিরূপে বুঝতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : এটাই হল

আল্লাহ্‌র কালাম يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদেরকে 'শাশ্বত বাণী' (কালেমা তায়্যিবা)-এর উপর অবিচল রাখবেন। (সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ : ২৭)। নবী কারীম (সা) বলেন : এরপর আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী এ মর্মে ঘোষণা করবে যে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তাই তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফলে তার দিকে জান্নাতের স্নিগ্ধ হাওয়া এবং এর সুবাস বইতে থাকে। তারপর তার কবরকে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তার শরীরে তার রূহ্‌কে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর দু'জন ফিরিশতা তার নিকট এসে তাকে বসান এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? সে উত্তরে বলে, হায় হায়! আমি কিছুই জানি না। এরপর তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দীন কি? সে বলে, হায় হায়! আমি কিছুই জানি না। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, এই লোক যাকে তোমার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? এবারও সে বলে, হায় হায়! আমি কিছুই জানি না। এ অবস্থায় আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী এ মর্মে ঘোষণা করেন যে, সে মিথ্যা বলেছে, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তারপর তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ ও লু-হাওয়া আসতে থাকে। নবী (সা) বলেন, এরপর তার কবরকে এমন সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, তার একদিকের পাঁজরের হাড় অপরদিকের পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। এরপর তার কবরে একজন ফিরিশ্‌তা মোতায়েন করা হয় যার নিকট লোহার একটি হাতুড়ি থাকে। যদি এ হাতুড়ি দ্বারা পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তবে নিশ্চয়ই পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এ হাতুড়ি দ্বারা ঐ ফিরিশ্‌তা তাকে সজোরে আঘাত করতে থাকেন, ঐ আঘাতের আওয়াজ মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব হতে পশ্চিমের সমস্ত মাখলূক শুনতে পায়। সে আঘাতে ঐ ব্যক্তি ধূলিতে পরিণত হয়ে যায়। তারপর তার মধ্যে রূহ্ পুনরায় ফেরত দেওয়া হয় (এভাবে আযাব চলতে থাকে)।[৯৫]

উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পুণ্যবানদের রূহ্‌সমূহ দেহ হতে পৃথক হওয়ার পর তাদের জন্য জান্নাতের সুখ-শান্তির সৌন্দর্য ও অবস্থান প্রদর্শন করা হয়। অনুরূপভাবে অপরাধী ব্যক্তিদেরকে আযাবের কিছু না কিছু স্বাদ গ্রহণ করানো হয়। এটাই আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা। শায়খ উমর ইব্‌ন মুহাম্মাদ নাসাফী (র) তৎপ্রণীত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কবরে কাফির ও কোন কোন অবাধ্য মু'মিনদেরকে শাস্তি প্রদান করা এবং অনুগত দীনদার বান্দাদেরকে নি'আমত দান করার বিষয়টি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন-মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ـ

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪৬)

আল্লামা তাফ্‌তাযানী (র)-এর মতে আয়াতটি কবরের আযাবের সাথে সম্পর্কিত।[৯৬] পার্থিব জগতে অবস্থান করে আলমে বরযখের বিষয়ে সম্যক ধারণা হাসিল করা দুষ্কর। সে জগতের

অনেক কথা মানুষের ধারণার অতীত। কাজেই মৃত ব্যক্তিকে কেমন করে বসানো হয়, কেমন করে ফিরিশ্তা তাকে শাস্তি প্রদান করে এবং কিভাবে কবর সংকীর্ণ বা প্রশস্ত করা হয় এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা অর্থহীন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষ ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের অবস্থায় অনেক কিছু দেখে এবং সুখ বা দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি কিছুই অনুভব করতে পারে না। তাই বলে স্বপ্ন অবাস্তব এ কথা বলা যায় না। কবরের আযাবের বিষয়টিও ঠিক অনুরূপই। এতে সন্দেহ এবং সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

কিয়ামাত ও পুনরুত্থান দিবস

কিয়ামাত ও পুনরুত্থান দিবসের নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে। ঐ সময় যখন আসবে, তখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এতে আসমান ফেটে যাবে, চন্দ্র-সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে, যমীন চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, পাহাড় তুলার মত উড়তে থাকবে, সাগর-মহাসাগর শুকিয়ে যাবে এবং সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর জীবিতরা মারা যাবে। এরপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর সকলে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।[৯৭]

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ٠

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৮)

ময়দানে হাশরে বান্দাদের আমলের হিসাব হবে। নেকী-বদীর ওজন হবে। নেক্কার লোকদের ডান হাতে এবং বদ্কার লোকদের বাম হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে। বিচারের ময়দানে একটি সূক্ষ্ম সেতু থাকবে। একে 'সিরাত' বলা হয়। ঐ সেতু তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ ও ধারাল এবং চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম হবে। এর উপর দিয়ে সকলকে পথ অতিক্রম করতে হবে। পাপী লোকেরা তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। তারা হাত-পা কেটে জাহান্নামে পতিত হবে। আর নেক্কার লোকেরা আল্লাহ্র অনুগ্রহে অতি সহজে ঐ সেতু অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। পুলসিরাত অতিক্রম করার পর নেক্কার বান্দাগণ 'হাউযে কাওসার' হতে শরবত পান করবেন। একবার যিনি এই শরবত পান করবেন তিনি আর কখনো পিপাসিত হবেন না। এ শরবত দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে।[৯৮]

কিয়ামাত ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে পূর্বে যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ٠

তারপর কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১৬)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ۔

আমি মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে দিব, আবার মাটি হতেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব। (সূরা ত্বাহা, ২০ : ৫৫)

কিয়ামাত ও পুনরুত্থান প্রসঙ্গে যুক্তি পেশ করে বলা হয় যে, যদি পুনরুত্থান এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রতিফল তথা পুরস্কার বা তিরস্কারকে স্বীকার না করা হয় তবে ভালমন্দ এবং নেকী-বদীর স্বাভাবিক তারতম্য মূল্যহীন এবং মানব জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতে মানব জাতিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۔

তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১১৫)

মরার পর মানুষ পচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাবে তখন এ মানুষকে পুনরায় কেমন করে জীবিত করা হবে? এ জাতীয় প্রশ্ন করা একেবারেই অবান্তর। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ

... اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۔

সে বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পচে-গলে যাবে? বলুন, এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদেরকে অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭৮-৭৯-৮১)

পুনরুত্থান দিবস প্রসঙ্গে সৃষ্ট সংশয় নিরসনকল্পে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বাস্তব কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ) এবং আসহাবে কাহ্‌ফের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এতে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমনিভাবে তাদেরকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনিভাবে তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করতেও সক্ষম। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

গ্রীষ্মকালে যমীন শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে যাওয়ার পর তাতে বৃষ্টির পানি পতিত হলে এর মাঝে জীবন ফিরে আসে। সবুজ শ্যামলিমায় যমীন আচ্ছাদিত হয়ে যায়। ক্ষেত ও ফসলের সমারোহে কৃষকের মন ভরে উঠে। ঠিক তেমনিভাবে রহমতে ইলাহীর একবিন্দু বৃষ্টি মাটির নিচে দাফনকৃত লোকদের মাঝেও প্রাণ সঞ্চার করে তাদেরকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম।

এ জগতে প্রথমে অস্তিত্বহীন ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা একান্ত দয়াপরবশ হয়ে এগুলোকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সুতরাং যিনি প্রথমে কোন নমুনা ছাড়া এ জগতকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি কেন একে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না?

এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জগতের সকলকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। হাদীসেও এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

আবূ রযীন (রা) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা এ সৃষ্টিকে কেমন করে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন এবং সৃষ্টি জগতে এর কোন উপমা বা দৃষ্টান্ত আছে কি? উত্তরে নবী কারীম (সা) বললেন : তুমি কখনো শুষ্ক প্রান্তর অতিক্রম করেছো কি? তারপর ঐ ভূমি সতেজ শ্যামল হওয়ার পর তুমি তা পুনরায় অতিক্রম করেছো কি? সাহাবী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : এটিই হল পুনর্বার জীবিত করার উপমা বা দৃষ্টান্ত। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন।[৯৯]

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আদম সন্তানের সমস্ত অঙ্গই মাটি খেয়ে ফেলবে। কিন্তু মেরুদণ্ডের হাড় অক্ষুণ্ন থাকবে। এ থেকেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।[১০০]

জান্নাত ও জাহান্নাম

বিচারের পর আল্লাহ্ তা'আলা নেক্‌কার লোকদেরকে জান্নাত এবং বদ্‌কার লোকদেরকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। আর যারা বিচারে সাময়িকভাবে কিছু শাস্তি ভোগের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, তাদেরকেও তাদের গুনাহের শাস্তি প্রদান করার পর আল্লাহ্ জান্নাত দান করবেন। জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই তা সৃষ্টি করে রেখেছেন। কুরআন ও হাদীসে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।[১০১] কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ـ

যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য জান্নাতসমূহ্ রয়েছে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহ্‌র নিকট হতে সন্তুষ্টি রয়েছে, আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫)

জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে যে নি'আমত দান করবেন এ সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ـ

এই দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে, তারা এবং তাদের সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সব কিছু। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে সালাম। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫৫-৫৯)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ;

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ، فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ـ

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত, এতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৫)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : আমি আমার নেক্কার বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন নি'আমতসমূহ প্রস্তুত রেখেছি যা চোখ দেখেনি, কান শোনেনি এবং যা মানুষের অন্তরে কল্পনায়ও আসেনি।[১০২]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তোমাদেরকে যে নি'আমতসমূহ দেওয়া হয়েছে তা অপেক্ষা আরো অতিরিক্ত কিছু আমি তোমাদেরকে প্রদান করবো কি? উত্তরে তারা বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করেননি এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : এ সময় পর্দা সরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা তাঁর (কুদ্‌রতী) দীদার লাভ করবে। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্র দীদারই হবে সর্বোত্তম নি'আমত। তারপর তিনি لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ (যারা মঙ্গলজনক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক)। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।[১০৩]

হযরত আবূ সাঈদ এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : (জান্নাতী লোকেরা জান্নাতে যাওয়ার পর) কোন একজন ঘোষণাকারী এ মর্মে ঘোষণা করবেন যে, এখন থেকে চিরকাল তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। এখন থেকে চিরকাল জীবিত থাকবে, তোমাদের জন্য আর মৃত্যু নেই। তোমরা সর্বদাই যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না, আর এখন থেকে তোমরা সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে। কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে না।[১০৪]

অনুরূপ জাহান্নামীদের সম্বন্ধেও কুরআন এবং হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٠

যারা কুফরী করে ও আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (সূরা বাকারা, ২ : ৩৯)

জাহান্নামের শাস্তি প্রসঙ্গে অপর এক আয়াতে উল্লেখ রয়েছে :

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ٠

যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে, অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং সেখানে তারা থাকবে বীভৎস চেহারায়। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১০৩-৪)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهٖ مَافِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۔

যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, এরদ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে এবং তাদের জন্য থাকবে লৌহ মুদগর। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে, আর তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ১৯-২২)

অন্য আয়াতে আছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۔

যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করবই, যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই এর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৬)

জাহান্নামের শাস্তির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে যে ব্যক্তির আযাব সবচেয়ে সহজ এবং কম হবে, তার পায়ে জাহান্নামের দু'টি জুতা ও ফিতা পরিয়ে দেওয়া হবে। আর এ অগ্নি জুতার তাপ এত প্রচণ্ড হবে যে, চুলার উপর হাড়ির পানি যেভাবে ফুটতে থাকে ঐভাবে তার মস্তিষ্কও ফুটতে থাকবে। তার আযাবকে সর্বাধিক কঠিন আযাব বলে ধারণা করা হবে অথচ তার আযাব হল সবচেয়ে কম ও হাল্‌কা।[১০৫]

জাহান্নামীদের পানাহারের জন্য যেসব জিনিস সরবরাহ করা হবে এ প্রসঙ্গে নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : জাহান্নামীদের পান করার জন্য যে পুঁজ দেওয়া হবে, এর এক বালতি যদি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে গোটা দুনিয়াবাসী দুর্গন্ধে মারা যাবে।[১০৬]

যাক্কুম বৃক্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যদি যাক্কুমের এক ফোটা দুনিয়ায় পড়ে তবে দুনিয়াবাসীর সকল পানাহার দ্রব্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে যাকে এ যাক্কুম পানাহার করতে দেওয়া হবে তার কি অবস্থা হবে?[১০৭]

কুফ্‌র

'কুফ্‌র' শব্দের আভিধানিক অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় :

تَكْذِيْبُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهٖ مِنَ الدِّيْنِ ضَرُوْرَةً ۔

নবী কারীম (সা) কর্তৃক আনীত বিষয়াদি যা অকাট্যভাবে দীনের অঙ্গ বলে প্রমাণিত, এ সবের কোন একটি অস্বীকার করাকে কুফ্‌রী বলা হয়।[১০৮]

কাজেই আল্লাহ্, নবী-রাসূল, ফিরিশ্‌তা, আসমানী কিতাব, তাক্‌দীর, কিয়ামাত, আখিরাত, হাশ্‌র, বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম এবং ইসলামের অন্যান্য হুকুম-আহ্‌কাম যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, এসবের কোন একটি অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

আল্লামা আন্‌ওয়ারশাহ্ কাশ্মীরী (র) বলেন, কুফ্‌র চার প্রকার :

১. কুফ্‌রে ইন্‌কারী অর্থাৎ মুখে ও অন্তরে সত্যকে অস্বীকার করা এবং সত্যকে বিশ্বাস না করা আর মৌখিকভাবে তা স্বীকারও না করা।

২. কুফ্‌রে জুহুদ অর্থাৎ হক্ বা সত্যকে অন্তর দিয়ে সত্য জানা কিন্তু মুখে স্বীকার না করা।

৩. কুফ্‌রে মু'আনাদা অর্থাৎ সত্যকে সত্য জানা এবং মুখে তা স্বীকারও করা, তবে তা গ্রহণ না করা এবং অনুসারী না হওয়া।

৪. কুফ্‌রে নিফাক অর্থাৎ মুখে সত্যকে স্বীকার করা কিন্তু অন্তরে তা অস্বীকার করা।[১০৯]

কুফ্‌রী জঘন্য অপরাধ। তাই এর শাস্তিও কঠোর। কুরআন মাজীদে এর ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ .

যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা দিয়ে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার মুদ্‌গর। যখনই তারা যন্ত্রণা কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে; এবং তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ১৯-২২)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

যারা কুফ্‌রী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপসন্দ করেছে। কাজেই আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৮-৯)

যারা কুফ্‌রী করে, শয়তান তাদের অভিভাবক এবং তারা হল জাহান্নামী। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

আর যারা কুফ্‌রী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা জাহান্নামী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৫৭)।

কুফ্‌রী কাজ ও কথা

আল্লাহ্, রাসূল, কুরআন ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও এমন কিছু বিশ্বাস, কথাবার্তা এবং কাজকর্ম রয়েছে যা কুফ্‌রীরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ্ বা নবী-রাসূলকে গালি দেওয়া, তাঁদের প্রতি কটূক্তি করা, অথবা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদি। নবী-রাসূলকে গালি দেওয়ার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মাতের জন্য সুপারিশ করবেন, এটিকে অস্বীকার করাও কুফ্‌রী। ঈমান ও কুফ্‌রকে এক মনে করাও কুফ্‌রী। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন হুকুমকে খারাপ মনে করা, এর ত্রুটি-বিচ্যুতি তালাশ করা অথবা ফিরিশতাদের সম্পর্কে কটূক্তি করা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাও কুফ্‌রী।

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে সর্বশেষ নবী হিসাবে বিশ্বাস না করা কুফ্‌রী। অনুরূপ তাঁর পরে কোন নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস রাখাও কুফ্‌রী। নিজের ঈমান সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকা বা সন্দেহ পোষণ করাও কুফ্‌রী।[১১০]

কারো মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র উপর অভিযোগ আনা বা আল্লাহ্ তা'আলাকে যালিম বলা কুফ্‌রী। পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করা বা এর কোন নির্দেশ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফ্‌রী।[১১১]

কাউকে গুনাহের কাজ করতে দেখে কেউ যদি বলে তুমি কি মুসলমান না? উত্তরে সে যদি বলে, হ্যাঁ, আমি মুসলমান নই, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।[১১২]

কেউ যদি বলে, "আল্লাহ্ তা'আলা বললেও আমি এ কাজ করব না" অথবা এরূপ বলে যে, "জিব্‌রাঈল নেমে এসে বললেও আমি তার কথা মানব না" তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে "আমি এমন কাজ করব যা আল্লাহ্‌ও জানে না", তবে সে কাফির হয়ে যাবে।[১১৩]

কাফিরের কোন কাজ পসন্দ হওয়ার পর কেউ যদি আগ্রহ ব্যক্ত করে বলে, যদি কাফির হতাম তবে ভাল হত, তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে।[১১৪] নামায সম্পর্ক অবজ্ঞা প্রকাশ করা, যেমন এ কথা বলা যে, আমার উপর নামায ফরয নয়, জ্ঞানীদের জন্য নামায পড়া ঠিক নয়, নামায আদায় করে লাভ কি?

আমার অমুক আত্মীয় মরে গিয়েছে বা আমার ঐ সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, আমার নামায পড়ে কি হবে, ইত্যাদি বলা কুফ্‌রী। ইচ্ছাকৃতভাবে কিব্‌লা ব্যতীত অন্যদিকে ফিরে নামায আদায় করা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা উযূতে নামায পড়া কুফ্‌রী। আযানের ধ্বনি সম্পর্কে কটূক্তি করা কুফ্‌রী।[১১৫]

বিনা কারণে কোন আলিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা অথবা আলিমকে গালি দেওয়া কুফ্‌রী। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি যিনার অপবাদ দেওয়া, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকে অবৈধ মনে করা, অথবা এরূপ আকীদা পোষণ করা যে, হযরত জিব্‌রাঈল (আ) ভুলক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন, আসলে তাঁর ওহী নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল হযরত আলী (রা)-এর নিকট, এসব আকীদা কুফ্‌রী।[১১৬]

হালালকে হারাম জানা বা হারামকে হালাল জানা এবং তা প্রচার করাও কুফ্‌রী। হারাম বস্তু ভক্ষণ করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলাও কুফ্‌রী।[১১৭]

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভালমন্দের মালিক মনে করা, জ্যোতিষী বা গণকের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবরে বিশ্বাস করা, কারো সম্পর্কে এমন বিশ্বাস রাখা যে, তিনি গায়েবের খবর জানেন বা কোন কিছুই তার অজ্ঞাত নয় অথবা যে সকল বস্তু আল্লাহ্ ছাড়া কারো দেওয়ার ক্ষমতা নেই এমন বস্তু কেউ দিতে পারে বলে আকীদা পোষণ করা বা কারো কাছে তা চাওয়া কিংবা আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে পশু যবেহ্ করা কুফ্রী।[১১৮]

ইচ্ছাকৃতভাবে কুফ্রী কথা উচ্চারণ করলে ঈমান চলে যায়। পূর্বে নামায, রোযা, হাজ্জ, ইবাদত-বন্দেগী যত কিছু করা হয়েছে সব বাতিল হয়ে যাবে। বিবাহ নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই তাওবা করে পুনরায় মুসলমান হতে হবে। এরপর বিবাহ দুহরিয়ে নিতে হবে। আল্লাহ্ না করেন, কোন মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যায় তবে তাকে তিনদিনের সময় দিতে হবে। তার দিলে ইসলামের ব্যাপারে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে এর সমাধান দিতে হবে। এতে যদি তার বুঝে আসে এবং তাওবা করে মুসলমান হয় তবে ভাল, নতুবা তিনদিন পরে তাকে হত্যা করা হবে। মহিলা মুরতাদ হলে তাকে হত্যা না করে বন্দী করে রাখা হবে। তাওবা করলে ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্যথায় আমৃত্যু বন্দী করে রাখা হবে।[১১৯]

শির্ক-এর বিবরণ

'শির্ক' মানে শরীক করা বা অংশীবাদিত্ব। বস্তুত শির্ক দু'প্রকার—১. শির্কে আকবার। একে শির্কে জলীও বলা হয়; ২. শির্কে আসগর। একে শির্কে খফীও বলা হয়।

শির্কে আকবার হল আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা। এই শির্ক চার প্রকার হতে পারে :

১. আল্লাহ্র যাত বা সত্তায় কাউকে শরীক করা;
২. তাঁর গুণাবলীতে কাউকে শরীক করা;
৩. সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা;
৪. ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা।

শিরকে আসগর হচ্ছে, ইবাদতের মধ্যে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য শামিল রাখা। অথবা কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রত্যেক্ষ প্রভাবের ধারণা রাখা। আর লোক দেখানো ইবাদত (রিয়া) করাও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এই কথা ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র) বর্ণনা করেছেন।[১২০]

মহান আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা যেমন জায়িয নেই, অনুরূপভাবে কাউকে তাঁর সমগুণসম্পন্ন মনে করাও জায়িয নেই। বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্র সমতুল্য বা সমগুণসম্পন্ন ও সমশক্তিসম্পন্ন কাউকে মনে করা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। শির্ক গুরুতর অপরাধ এবং এটা চরম যুলুম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম। (সূরা লুক্মান, ৩১ : ১৩)

বান্দা আল্লাহ্র সাথে শির্ক করলে এবং আল্লাহ্র নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের মধ্যে কাউকে শরীক করলে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেন না। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۔

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (সূরা নিসা, ৪ : ১১৬)

যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۔

কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৭২)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۔

আর যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, এরপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩১)

শির্ক সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ ۔

যদি তোমাকে হত্যা করা হয় এবং জ্বালিয়েও দেওয়া হয়, তারপরও আল্লাহ্র সাথে তুমি কাউকে শরীক করবে না।[১২১]

তিনি আরো ইরশাদ করেন : আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মাতাপিতার নাফরমানী করা, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং অতীত কাজের উপর মিথ্যা শপথ করা কবীরা গুনাহ্-সমূহের মধ্য অন্যতম।[১২২]

কবীরা গুনাহ্

গুনাহ্ দু'ভাগে বিভক্ত : কবীরা ও সগীরা। কেউ কেউ বলেছেন, মূলত সব গুনাহ্ই গুনাহ্, এর কোন বিভাগ নেই। তবে মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের মতে, গুনাহ্ দু'প্রকার : সগীরা গুনাহ্ ও কবীরা গুনাহ্।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ ۔

যদি তোমরা কবীরা গুনাহ্সমূহ বর্জন কর, যা করতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাদের সগীরা গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেব। (সূরা নিসা, ৪ : ৩১)

হাদীস শরীফেও গুনাহ্ সগীরা ও কবীরা এই দু'প্রকার হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। (তাফসীরে ব্যায়যাবী, সূরা নিসা)

কবীরা গুনাহের আভিধানিক অর্থ বড় গুনাহ্। আর শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যে সকল কাজ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং যে সকল কাজের জন্য শাস্তির বিধান অথবা আল্লাহ্র ক্রোধের ঘোষণা রয়েছে, তাকে কবীরা গুনাহ্ বলা হয়।

কবীরা গুনাহ্ কোন ইবাদতের দ্বারা মাফ হয় না বরং এর জন্য তাওবা করা আবশ্যক। আর সগীরা গুনাহ্ নেক আমল দ্বারাও মাফ হয়ে যায়। উলামায়ে কিরামের মতে সগীরা গুনাহ্ও যদি বেপরোয়া ও ঔদ্ধত্বের সাথে বারবার করা হয়, তবে তাও কবীরার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

ইব্ন হুমাম ও হাসান বাসরী (র) বলেছেন, যে সকল গুনাহের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখ, লা'নত, আযাব ইত্যাদি দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করেছেন, সেগুলো কবীরা গুনাহ্। অন্যান্যগুলো সগীরা গুনাহ্।

কবীরা গুনাহ্সমূহের সংখ্যা

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কবীরা গুনাহের পূর্ণ সংখ্যার বর্ণনা একসাথে উল্লেখ নেই। তবে কুরআন ও হাদীসে যে সকল গুনাহ্কে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, উলামায়ে কিরাম এর সংখ্যা ৭০টি বলে বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁদের কেউ কেউ তার সংখ্যা এর চেয়ে অধিক বলেও উল্লেখ করেছেন। এ সকল কবীরা গুনাহের মধ্যে কোনটি কোনটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুতর।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) যে সকল অপরাধের কাজকে কবীরা গুনাহ্ হিসাবে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন: ৭টি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে তোমরা দূরে থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে ৭টি কাজ কি কি? তিনি বললেন : ১. আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. শরী'আতের বিধান ছাড়া কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৬. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৭. নিরাপরাধ ও পবিত্র মুসলিম মহিলাদের নামে যিনার অপবাদ রটানো। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন : কবীরা গুনাহ্ ৯টি : ১. আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ৩. নির্দোষ মহিলাকে যিনার অপবাদ দেওয়া, ৪. যিনা করা, ৫. যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, ৬. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৭. মুসলমান পিতামাতার নাফরমানী করা, ৮. হরম শরীফে কুফ্রী করা, ৯. যাদু করা।

সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর সাথে সুদ খাওয়া, চুরি করা ও মদ পান করাকে যোগ করেছেন।

হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনা, নবী কারীম (সা) আমাদের এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন যেখানে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেননি :

১. যার মধ্যে আমানাতদারী নেই তার ঈমান নেই; এবং
২. যে ওয়াদা রক্ষা করে না তার মধ্যে দীন নেই। (শারহে আকাইদে নাসাফী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোনটি? উত্তরে নবী (সা) বললেন : কোন কিছুকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর কোন্টি? নবী (সা) উত্তরে বললেন : তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তাকে হত্যা করা। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তারপর কোন্টি? নবী কারীম (সা) জবাব দিলেন : তোমার পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এরপর পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিনি তিলাওয়াত করে শোনালেন, (অর্থ) 'যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে মা'বূদ বলে ডাকে না, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন তাকে আইনের বিধান ব্যতীত হত্যা করে না এবং যিনায় লিপ্ত হয় না ...।' (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮; বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর ঘোষণায় গুরুতর কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা, মিথ্যা হলফ করা। (বুখারী)

হযরত আনাসের বর্ণনায় হাদীসটিতে মিথ্যা হলফের পরিবর্তে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

মু'আয্ ইব্ন জাবালের বর্ণনা : নবী কারীম(সা) আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন:

১. আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়;
২. পিতামাতার অবাধ্য হবে না যদিও তারা তোমাকে স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করতে বলেন;
৩. ইচ্ছে করে কখনো ফরয নামায তরক করবে না। কেননা তা করলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হিফাযতের দায়িত্ব উঠে যায়;
৪. কখনো শরাব পান করবে না, কেননা তা হচ্ছে সকল অশ্লীলতার উৎস;
৫. সাবধান! গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকবে;
৬. সাবধান! জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করবে না, যদিও সকলে ধ্বংস হয়ে যায়;
৭. লোকের মধ্যে মহামারী দেখা দিলে সে স্থান ত্যাগ করবে না;
৮. তোমার সামর্থ্যানুযায়ী পিতামাতার জন্য ব্যয় করবে;
৯. পরিবারের লোকদের আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে, শাসন করতে কখনো দ্বিধা করবে না;
১০. তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় প্রদর্শন করবে। (মুস্নাদে আহ্মাদ ও মিশকাত)

এক নযরে কবীরা গুনাহ্সমূহ

১. আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা।
২. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।
৩. পিতামাতার অবাধ্য হওয়া ও তাদের কষ্ট দেয়া।

৪. কাউকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
৫. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা।
৬. যিনা-ব্যভিচার করা। পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে মৈথুন করা।
৭. ওযনে কম দেয়া
৮. দারিদ্র্যের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা করা।
৯. কোন নির্দোষ মহিলার উপর যিনার অপরাদ দেয়া।
১০. সুদ খাওয়া ও সুদ দেয়া।
১১. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।
১২. যাদু, বান, টোনা ইত্যাদি করা।
১৩. আমানাতের খিয়ানাত করা।
১৪. ওয়াদা ভঙ্গ করা।
১৫. মিথ্যা বলা।
১৬. কুরআন শরীফ শিক্ষা করে তা ভুলে যাওয়া।
১৭. আল্লাহ্ তা'আলার কোন ফরয ইবাদত যেমন : নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিনা কারণে ছেড়ে দেয়া।
১৮. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজ্দা করা।
১৯. কোন মুসলমানকে কাফির, বেঈমান, আল্লাহ্র নাফরমান, আল্লাহ্র দুশমন ইত্যাদি বলা।
২০. চুরি করা।
২১. গীবত করা ও শোনা।
২২. খাদ্যশস্যের দাম বাড়লে খুশি হওয়া।
২৩. কোন বস্তুর দাম সাব্যস্ত হওয়ার পরও জোরপূর্বক তার মূল্য কম দেয়া।
২৪. শরাব পান ও মাদক দ্রব্য সেবন করা।
২৫. জুয়া খেলা।
২৬. গায়ের মাহ্রাম-এর নিকট নির্জনে বসা।
২৭. আল্লাহ্র নিয়ামতের না-শোক্রী করা।
২৮. যুলুম-অত্যাচার করা।
২৯. আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।
৩০. কারো প্রতি অহেতুক মন্দ ধারণা পোষণ করা।
৩১. অপরের দোষ অনুসন্ধান করা।
৩২. কারো ঘরে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা।
৩৩. বিনা ওযরে জুমু'আর নামায তরক করা।
৩৪. মিথ্যা কসম খাওয়া; আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া।
৩৫. কাফিরদের রীতিনীতি ও প্রথাকে পসন্দ করা।
৩৬. অশ্লীল নৃত্য-গীতি বা গানবাজনা উপভোগ করা।
৩৭. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ন্যায় ও সত্যের পথে আহ্বান না করা ও অন্যায় অসত্য প্রতিরোধের চেষ্টা না করা।

৩৮. মুসলমানের উপর যুলুম করা ও তাকে অপমান করা।
৩৯. কোন পশুর সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া।
৪০. শূকরের মাংস ভক্ষণ করা।
৪১. কোন হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করা।
৪২. আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্য কারোর নামে যবেহ্‌কৃত পশুপাখির গোশ্‌ত ভক্ষণ করা।
৪৩. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।
৪৪. জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে বিশ্বাস করা।
৪৫. গর্ব ও অহংকার করা।
৪৬. ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।
৪৭. সত্য ও ন্যায়ের উল্টো ফায়সালা দেয়া বা বিচার করা।
৪৮. যালিম ও অত্যাচারীর প্রশংসা করা।
৪৯. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।
৫০. নামাযের ওয়াক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায আদায় করা।
৫১. মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।
৫২. সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে মন্দ বলা।
৫৩. ঘুষ খাওয়া।
৫৪. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়া।
৫৫. কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা।
৫৬. কারণ ছাড়াই স্ত্রীর স্বামী সহবাসে অসম্মত হওয়া।
৫৭. আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে নির্ভয় থাকা।
৫৮. আলিম ও হাফিয-ক্বারীদের অসম্মান ও অবজ্ঞা করা।
৫৯. স্ত্রীর সাথে যিহার করা।
৬০. বেপরোয়াভাবে বারবার গুনাহে লিপ্ত হওয়া। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, আশ'আতুল লুম'আত, ফাতহুল বারী শারহে বুখারী)

নিফাক-এর বিবরণ

'নিফাক' মানে কপটতা, অন্তরে এক রকম ধারণা পোষণ করা এবং বাইরে অন্য রকম প্রকাশ করা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হল, অন্তরে কুফ্‌রী গোপন রেখে মুখে ঈমানের কথা বলা বা স্বীকার করা এবং লোক দেখানোর অনুষ্ঠানাদি পালন করা। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে 'মুনাফিক' বলা হয়।[১২৩]

নিফাক দু'প্রকার, ১. নিফাকে ই'তিকাদি (বিশ্বাসগত নিফাক); ২. নিফাকে আমলী।

বিশ্বাসগত নিফাক কুফরের চেয়েও মারাত্মক। কারণ মুনাফিক ব্যক্তি বাহ্যত ইসলামের কাজ করে মুসলিম সমাজকে প্রতারিত করে এবং তাদের কাছ থেকে আইনগত, আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আর শত্রুর গুপ্তচর হিসাবে কাজ করে এবং মুসলমানদের গোপন বিষয়ের ব্যাপারে দুশমনদের অবহিত করে দেয়। প্রকাশ্য শত্রু থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ কিন্তু গোপন শত্রুর চক্রান্ত থেকে বাঁচা খুবই দুষ্কর। এই মুনাফিক সম্প্রদায়ের দ্বারা

ইসলামের ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এ কারণে কুরআন মাজীদের বহু স্থানে তাদের সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে এবং স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۔ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۔ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۔ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۔ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۔ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۔ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۔

আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান এনেছি; কিন্তু তারা মু'মিন নয় (৮)। আল্লাহ্ ও মু'মিনদেরকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেও প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না (৯)। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, যেহেতু তারা মিথ্যা বলে। (১০)। তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী (১১)। সাবধান! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না (১২)। যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান এনেছে তাদের মত ঈমান আন, তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব? সাবধান! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না (১৩)। তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয় (১৬)। (সূরা বাকারা, ২ : ৮ -১৩, ১৬)

মুনাফিকরা ঈমান গ্রহণের দাবিতে মিথ্যাবাদী। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۔

আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ : ১)

মুনাফিকদের পরিণাম হবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তর। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۔

মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কোনও সহায় পাবে না। (সূরা নিসা, ৪ : ১৪৫)

কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে মুনাফিকদের অপতৎপরতা ও অপকর্মের বর্ণনা রয়েছে। এমনকি এ ব্যাপারে একটি সূরাও নাযিল হয়েছে। কাজেই মুনাফিকদের থেকে সচেতন থাকা আবশ্যক।

বিদ্‘আত-এর বিবরণ

‘বিদ্‘আত’ (بدعة)-এর আভিধানিক অর্থ নতুন, অভিনব, দৃষ্টান্তবিহীন উদ্ভাবন ইত্যাদি। মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম বিদ্‘আতের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ইমাম নববী (র) বলেন :

اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ غَيْرَ مِثَالٍ سَبَقَ وَفِي الشَّرْعِ اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

বিদ‘আত বলা হয় এমন কার্যকলাপকে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আর শরী‘আতের পরিভাষায় বিদ্‘আত বলা হয় এমন সব বিষয়কে যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় ছিল না।[১২৪]

মুফ্তী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান (র) বলেন :

هِيَ الْاَمْرُ الْمُحْدَثُ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا اقْتَضَاهُ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ .

এমন নব উদ্ভাবিত বিষয় যা সাহাবা ও তাবিঈনের যুগে ছিল না এবং যার উদ্ভাবন শরঈ কোন দলীলের সাথে সম্পৃক্ত নয়।[১২৫]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাতিবী (র) বলেন :

اِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَقِيْقِيَّةَ الَّتِيْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ لاَ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ وَلاَ اِجْمَاعٍ وَلاَ اسْتِدْلاَلٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ لاَ فِي الْجُمْلَةِ وَلاَ فِي التَّفْصِيْلِ وَلِذٰلِكَ سُمِّيَتْ بِدْعَةً لِاَنَّهَا مُخْتَرَعٌ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ .

প্রকৃত বিদ্‘আত তাই যার সমর্থনে শরী‘আতের কোন দলীল নেই, না আল্লাহ্র কিতাবে না রাসূলের হাদীসে, না ইজ্মার কোন দলীলে। না এমন কোন দলীল পেশ করা যায় যা উলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য। মোটামুটিভাবে ও বিস্তারিতভাবে কোনভাবেই নয়। যেহেতু এর কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই, তাই একে ‘বিদ্‘আত’ বলা হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আকীদা ও আমলের সেসব আবিষ্কৃত পন্থা ও পদ্ধতিতে বিদ্‘আত বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ্ (সা), সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি‘-তাবিঈনের যমানার পর সাওয়াব ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে এবং যে সব কাজের মৌলিক কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি‘-তাবিঈনের যুগে এর কোন প্রমাণ তাদের কথায় বা কাজে স্পষ্টরূপে কিংবা ইঙ্গিতে পাওয়া যায় না।[১২৬]

বিদ্‘আত গুমরাহী।[১২৭] আর গুমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। এ কারণেই হাদীসে বিদ্‘আতের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .

যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত।[১২৮]

আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যেমন বৈপরীত্য, তেমনিভাবে সুন্নাত ও বিদ্‘আতের মাঝেও অনুরূপ বৈপরীত্য রয়েছে। এ কারণে বিদ্‘আত যে পরিমাণ হতে থাকে, সুন্নাত সে পরিমাণে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلاَّ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ ·

কোন জাতি যখনই কোন বিদ্‘আতের উদ্ভাবন করে তখন ঐ পরিমাণ সুন্নাত অন্তর্হিত হয়ে যায়। সুতরাং কোন বিদ্‘আত উদ্ভাবন না করে সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[১২৯]

বিদ্‘আতের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখপূর্বক রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلاَ صَلٰوةً وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جِهَادًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ ·

বিদ্‘আতী ব্যক্তির নামায, রোযা, সাদাকা, হজ্জ, উমরা, জিহাদ এবং ফরয ও নফল ইবাদত কিছুই আল্লাহ্ তা‘আলা কবূল করেন না। সে ইসলাম থেকে তেমনিভাবে বেরিয়ে যায় যেমনি বেরিয়ে আসে আটার খামির হতে চুল।[১৩০]

অপর এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْإِسْلاَمِ ·

যে ব্যক্তি কোন বিদ্‘আতীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল সে ইসলাম ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করল।[১৩১]

হাদীস শরীফে যেহেতু বিদ্‘আতের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবি‘-তাবিঈগণ সকলেই বিদ্‘আত এবং কুসংস্কারসমূহের কঠোর মুকাবিলা করেছেন। ইমাম মালিক (র)-এর ফাত্ওয়া আজও এর জ্বলন্ত সাক্ষর হয়ে আছে। তিনি বলেছেন :

مَنْ اِبْتَدَعَ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ خَانَ فِي الرِّسَالَةِ ·

যে ব্যক্তি (ইসলামের মাঝে) কোন বিদ্‘আতের উদ্ভাবন করে এবং একে সওয়াবের কাজ মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে অভিযোগ আনল যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানাত করেছেন (নাউযুবিল্লাহ্)।[১৩২]

কুসংস্কারের বিবরণ

যেসব কাজ প্রথা ও রেওয়াজের ভিত্তিতে করা হয় এবং যা শরী‘আত অনুমোদিত ও সমর্থিত নয় এরূপ কাজকে কুসংস্কার বা রুসূম বলা হয়। কুসংস্কার সমাজ ও জাতির জন্য মারাত্মক ব্যাধি। একে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি,

বিবাহ-শাদী, আচার-অনুষ্ঠান তথা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এর মূলে রয়েছে ইসলামী তাহ্যীব-তামাদ্দুন, দীনি শিক্ষা, ইয়াকীন এবং তদানুযায়ী আমলের অভাব।

দরগাহ ও মাযারে ওরশ-এর নামে নাচ-গান-বাজনা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কবরের উপর চাঁদোয়া টানানো এবং গিলাফ লাগানো মাকরূহ্। আল্লামা ইব্ন আবেদীন (র) বলেন :

تَكْرَهُ السُّتُوْرُ عَلَى الْقُبُوْرِ ·

কবরের উপর চাঁদোয়া টানানো মাক্রূহ্ তাহ্রীমি।[১৩৩]

মাযারের নামে নযর ও মানত করা গুনাহের কাজ। মাযারে এসে বাচ্চাদের চল্লিশা করা, বাচ্চাদের চুল কামানো এবং মাযারে শিরনী রান্না করে তা বিতরণ করা কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজ যদি কবরস্থ ওলী-আল্লাহ্কে কাযিউল হাজাত (মকসূদ পূরণকারী) মনে করে করা হয়, তবে তা শিরক্ হবে। পীর-আউলিয়ার নামে পশু যবেহ্ করাও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ·

আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত পশু (তা হারাম)। (সূরা মায়িদা ৫ : ৩)

মাযারে সিজ্দা করা হারাম ও শিরকী কাজ। মাযারে বাতি দেওয়াও নিষিদ্ধ কাজ। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে :

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ·

(শরী'আতের বিধান লংঘন করে) যেসব মহিলা কবর যিয়ারত করে এবং যারা কবরে সিজ্দা করে এবং যারা কবরে বাতি জ্বালায়, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) অভিসম্পাত করেছেন।[১৩৪]

বিখ্যাত শামী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, চতুর্দিক থেকে কবর পাকা করা, কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা এবং কবরের উপর দিয়ে রাস্তা করে নেওয়া নিষিদ্ধ।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে :

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُوْرَ وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهَا وَاَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهَا ·

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবর পাকা করতে, কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে এবং কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন।[১৩৫]

মৃত ব্যক্তিদের কবরে ফুল দেওয়া কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। কোন পীর-দরবেশের মাযারে গিয়ে সরাসরি তাঁর নিকট সন্তান বা টাকা-পয়সা চাওয়া স্পষ্ট শিরক্। সওয়াবের নিয়্যতে কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ।[১৩৬]

কারো মৃত্যুর পর তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে পুরুষ-মহিলা মিলে উচ্চস্বরে বিলাপ করে কান্নাকাটি করা এবং বুক চাপড়িয়ে জামা-কাপড় ছিঁড়ে শোক প্রকাশ করা জাহিলী রুসমসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন :

اَنَا بَرِئٌ مِّمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ ·

যে ব্যক্তি মাথার চুল ছিঁড়ে, উচ্চৈস্বরে কান্নাকাটি করে এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।[১৩৭] এতে একদিকে পর্দাপ্রথা লংঘিত হয় এবং অপরদিকে শোকাতুর লোকদের শোক আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

কেউ মারা যাওয়ার পর ওয়ারিসগণের অনুমতি ছাড়া তার পরিত্যক্ত মালামাল গরীব লোকদের মধ্যে বিতরণ করা ঠিক নয়। এতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদেরও অংশ থাকতে পারে। বস্তুত অপ্রাপ্তবয়স্কদের অংশ হতে খরচ করা জায়িয নেই। মৃতব্যক্তি সর্বদাই ঈসালে সাওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই মৃত ব্যক্তির প্রতি ঈসালে সওয়াব করা ওয়ারিসদের জন্য কর্তব্য। তবে এর জন্য কোন দিন-তারিখ নির্ধারণ করাকে জরুরী মনে করা ঠিক নয়।

ঈদের দিন খুশির দিন। তবে শরী'আত অসমর্থিত পন্থায় কোনরূপ আনন্দ-উৎসব করা ঠিক নয়। ঈদের নামাযের পর মুসাফাহা এবং মু'আনাকা করাকে জরুরী মনে করা বিদ্'আত ও মাকরূহ। আল্লামা শামী (র) বলেন, অনুপস্থিতির পর যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত হয় তখন মু'আনাকা করার বিধান রয়েছে। অনুরূপভাবে যখন এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সাক্ষাত হয় তখন মু'আনাকা করা শরী'আত অনুমোদিত। কিন্তু নামাযের পর মুসাফাহা করা সর্বাবস্থায় মাকরূহ। কেননা নামাযের পর সাহাবীগণ পরস্পর মুসাফাহা করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১৩৮]

অমুসলিম সম্প্রদায়ে যেসব লেবাস পোশাক তাদের ধর্মীয় প্রতীক ও বৈশিষ্ট্যরূপে ব্যবহার করে থাকে সেসব বিষয়ে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা অপসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ۔

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : যদি কেউ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তবে সে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।[১৩৯]

এ হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, বিজাতীয়দের অনুকরণ, বিশেষভাবে যেসব জিনিস বিজাতির ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত, সেসব বিষয়ে বিজাতির অনুকরণ কোনক্রমেই জায়িয নেই।[১৪০]

সামাজিকতা, সাধারণ অভ্যাস এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে বিজাতীয় অনুকরণ মাকরূহ্ তাহ্‌রীমি। যেমন খ্রীস্টানদের টুপী, হিন্দুদের ধুতি এবং বৌদ্ধদের গেরুয়া কাপড়ের তৈরি পোশাক। এ ধরনের পোশাক পরিধান করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। পুরুষের বিশেষ পোশাকের ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুকরণ এবং মহিলাদের বিশেষ পোশাকের ক্ষেত্রে পুরুষের অনুকরণ সম্পূর্ণরূপে হারাম। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে :

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ۔

পুরুষের লেবাস অনুকরণকারী মহিলা এবং মহিলার লেবাস অনুকরণকারী পুরুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) লা'নত করেছেন।[১৪১]

অনুরূপ স্বর্ণের আংটি বা চেইন ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম। হাফ প্যান্ট পরিধান করা পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই হারাম। ইচ্ছাকৃতভাবে টাখ্‌নু-পায়ের গিরা আবৃত করে

পায়জামা, লুঙ্গি এবং ফুল প্যান্ট পরিধান করাও পুরুষের জন্য হারাম। পুরুষের গলায় টাই বাঁধাও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ হচ্ছে খ্রীস্টানদের প্রতীক।[১৪২]

চুলের আধিক্য প্রকাশ করার জন্য পরচুলা লাগানো কুসংস্কার। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে :

لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ۔

নবী কারীম (সা) ঐ সব নারীদের প্রতি লা'নত করেছেন যারা পরচুলা লাগায় এবং যারা অপরকে তা লাগিয়ে দেয়।[১৪৩]

শরীরে উল্‌কি উৎকীর্ণ করা, ভ্রূ উপড়ে ফেলা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করাও কুসংস্কার। যারা ঐ জাতীয় কাজ করে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُتَغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ ۔

সৌন্দর্যের জন্য উল্‌কি উৎকীর্ণকারী ও উল্‌কি গ্রহণকারী নারী, ভ্রূ উত্তোলনকারী নারী এবং দাঁত চিকন করে মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারী—যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন করে তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করেন।[১৪৪]

দাড়ি কামানো বা দাড়ি এক মুঠোর কম রাখা এবং গোঁফ লম্বা রাখা শরী'আতে হারাম, কবীরা গুনাহ্। অধিকন্তু এ কাজ সামাজিক কুপ্রথার শামিল। এ কথা জেনেও কেউ যদি এ অভ্যাস ত্যাগ না করে বরং এতে আনন্দ পায় বা লম্বা দাড়ি রাখাকে নিন্দনীয় মনে করে কিংবা শ্মশ্রুধারীদের নিয়ে বিদ্রুপ করে অথবা দাড়ি রাখার কারণে কাউকে হীন ও অসামাজিক মনে করে তবে তার ঈমানের ব্যাপারে আশঙ্কা রয়েছে। চতুর্দিকে চুল লম্বা রেখে মাথার মধ্যভাগের চুল মুণ্ডন করা অথবা মধ্যখানে লম্বা রেখে চতুর্দিকের চুল ছোট করে রাখা অথবা পিছনের তুলনায় সামনের চুল লম্বা রাখা অথবা পিছনের দিকে ঝুটি রাখা ইত্যাদি নবী (সা)-এর সুন্নাতের খেলাফ। ইসলামী শরী'আতে এভাবে চুল রাখার অনুমতি নেই।[১৪৫]

শবেবরাতে হালুয়া-রুটি এবং আশূরার সময় খিচুড়ী ও শরবতের ব্যবস্থা করাকে জরুরী মনে করা কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। শবেবরাতে বাড়ি-ঘর ও মসজিদে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা, পটকা বা বোমা ফাটানো এবং মরিচবাতি ও তারাবাতি জ্বালিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোও কুসংস্কার। এতে নিজের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, ইবাদতের পরিবেশ নষ্ট হয় এবং টাকা-পয়সার অপচয় ও অপব্যয় হয়। কুরআন মাজীদে অপচয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আশূরা উপলক্ষে তা'যিয়া মিছিলের ব্যবস্থা করা এবং তাতে ঢাক ঢোল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানো সম্পূর্ণভাবে নাজায়িয। আশূরার দিন আহাজারী বা মাতম করাও কুপ্রথার অন্তর্ভুক্ত।[১৪৬]

তা'যিয়া মিছিলে মর্সিয়া (শোকগাঁথা) পাঠ করা এবং বিশেষ রঙের পোশাক পরিধান করে শোক প্রকাশ করা বদ্‌রুসমের অন্তর্ভুক্ত। কারবালা প্রান্তরে শহীদানে কিরাম যেহেতু পিপাসার্ত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন তাই আশূরার দিন লোকদের মধ্যে শরবত বিতরণ করা হলে এতে কারবালার শহীদানের তৃষ্ণা নিবারণ হবে, এ আকীদা রাখাও এক ধরনের কুসংস্কার।[১৪৭]

ঘরে ছবি টানানো এবং বিনা প্রয়োজনে কুকুর পোষাও কুপ্রথাসমূহের মধ্যে শামিল। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ ·

যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে ঐ ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করে না।[১৪৮]

তবে গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ, শস্যক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, বাড়িঘরের পাহারা এবং শিকার করার উদ্দেশ্যে যদি কুকুর পোষা হয় তবে তা জায়িয। হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ ·

কিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারী ব্যক্তির সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে।[১৪৯]

কাজেই ছবি অংকন করা, ছবি উঠানো, ছবি রাখা, শরঈ প্রয়োজন ব্যতীত ছবি উঠানো এবং বিনা প্রয়োজনে কুকুর পোষা সবই নিষিদ্ধ।

বিনা কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ্। এভাবে পেশাব করা খ্রীস্টানদের অনুকরণ এবং কুপ্রথাও বটে। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত এক হাদীস উল্লেখ রয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلاَّ قَاعِدًا ·

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যদি কেউ তোমাদেরকে বলে যে, নবী কারীম (সা) দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন তবে এ কথা বিশ্বাস করবে না। তিনি তো সর্বদা বসে বসে পেশাব করতেন।[১৫০]

তবে ওযরের কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করারও অনুমতি রয়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানা খাওয়াও সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো এভাবে খানা খেয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনিভাবে খাওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে বরতনে কিছু খাদ্য রেখে দেওয়াও কুপ্রথার অন্তর্ভুক্ত। এতে খাদ্যের অপচয় এবং আল্লাহ্র নি'আমতের না-শোকরী হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا تَقُوْلُ لَهُ الْقَصْعَةُ اَعْتَقَكَ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ كَمَا اَعْتَقْتَنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ ·

কেউ যদি কোন পাত্রে খানা খাওয়ার পর তা চেটে খায় তবে ঐ পাত্রটি তার জন্য বলে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যেভাবে তুমি আমাকে শয়তান থেকে মুক্তি দিলে।[১৫১]

বাঁ হাতে পানাহার করা কুপ্রথার শামিল এবং যুক্তিগতভাবেও এরূপ করা ঘৃণিত কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং ডানহাতে পানাহার করতে হুকুম করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاْكُلْ بِيَمِيْنِهٖ وَاِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهٖ ·

তোমরা খানা খাওয়ার সময় ডানহাতে খানা খাবে এবং পান করার সময় ডানহাতে পান করবে।[১৫২]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ يَأْكُلَنَّ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِه وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بِهَا ٠

তোমরা কেউ বাঁ হাতে পানাহার করবে না। কেননা শয়তান বাঁ হাতে পানাহার করে।[১৫৩]

কপালে সিঁদুর বা তিলক দেওয়া হিন্দুয়ানী রুসম। মুসলমান মেয়েদের জন্য কপালে সিঁদুর বা তিলক দেওয়া হারাম।

এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সাক্ষাত হলে সালাম দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু মুখে সালাম না দিয়ে শুধু হাতদ্বারা ইশারা করা বা টা-টা দেওয়া কুপ্রথার অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে হিন্দুদেরকে 'আদাব' বলাও এক ধরনের কুপ্রথা। এভাবে 'আদাব' বলার অনুমতি কুরআন ও হাদীসে কোথাও নেই।

খাৎনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য লোকদের একত্রিত করা সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ। মুসনাদে আহ্‌মাদে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে হযরত হাসান (রা) বলেন, কোন এক ব্যক্তি হযরত উসমান ইব্‌ন আবুল আ'স (রা)-কে খাৎনার অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় আমরা খাৎনার অনুষ্ঠানে যোগদান করতাম না।[১৫৪]

খাৎনার অনুষ্ঠানে আদান-প্রদান করার যে রুসম রয়েছে তাও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। খাৎনাকে কেন্দ্র যে নাচ-গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে তাও শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম।[১৫৫] আর এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা করা অপব্যয় ও কুসংস্কার।

বিবাহ-শাদীর পূর্বে পাত্র কর্তৃক প্রয়োজনে পাত্রীকে দেখে নেওয়া জায়িয। কিন্তু পাত্রসহ পাত্রের বাবা, মামা, চাচা, দাদা, নানা, ভগ্নিপতি এবং চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই এক কথায় মাহ্‌রাম-গায়রে মাহ্‌রাম সকলে মিলে পাত্রী দেখার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা কুসংস্কার।

বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানে নাচ-গান, ঢোল-তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো সম্পূর্ণভাবে হারাম। গান না গাইলে সন্তান বোবা হয় এরূপ ধারণা করা কুসংস্কার। গোসল পর্বে বর-কনে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের শরীরে হলুদ মাখামাখি, রং ছিটাছিটি এবং বেগানা পুরুষ ও মহিলাদের পরস্পর হাতাহাতি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। প্রচলিত গায়ে হলুদ প্রথা এবং গোসল অনুষ্ঠানের শুরু করার অগ্রভাগে তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে গোসল আরম্ভ করাও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে কনেকে তার দুলাভাই এবং বরকে ভাবি বা এ জাতীয় গায়রে মাহ্‌রাম কেউ কোলে করে নিয়ে গোসলের চৌকিতে বসিয়ে গোসল দেওয়াও কুসংস্কার।

বিবাহের জন্য কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা কুসংস্কার। বিবাহের মধ্যে দাবি করে যৌতুক আদায় করা হারাম। বিবাহ-শাদীতে এমন মোটা অংকের মোহরানা সাব্যস্ত করা, যা আদায় করার আদৌ ইচ্ছা নেই, এভাবে মহর নির্ধারণ করা জায়িয নেই। আক্‌দ-এর সময় গায়রে মাহ্‌রাম লোকদের কনের নিকট গিয়ে ইয্‌ন আনাও কুপ্রথার শামিল।

বর যাওয়ার সময় আতশ্‌বাজি করা কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। কনের বাড়ির ফটকে গেট তৈরি করে বরের নিকট থেকে টাকা-পয়সা উসূল করাও কুপ্রথা। বিবাহের সময় বাড়ি বা কমিউনিটি সেন্টারে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা অপব্যয় করার শামিল। শরী'আতে এভাবে টাকা-পয়সা অপচয় করা জায়িয নেই।[১৫৬]

খানাপিনার পর্ব শেষ হওয়ার পর বরকে ঘিরে মহিলাদের জড়ো হয়ে আলাপচারিতায় লিপ্ত হওয়াও গুনাহের কাজ। বিবাহ-শাদীতে কনে পক্ষের লোকেরা বরকে এবং বর পক্ষের লোকেরা কনেকে সালামীর নামে যে টাকা-পয়সা বা আসবাবপত্র দিয়ে থাকে তা দেশ প্রথার অন্তর্ভুক্ত। এ সব কিছু মূলত বিনিময় পাওয়ার আশায় অথবা নিন্দাবাদের আশঙ্কায়ই সাধারণত আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। এরূপ করা কুসংস্কার।

বর শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছার পর তাকে বাড়ির সামনে বাধ্যতামূলকভাবে দাঁড় করিয়ে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলে মিলে তাকে এক নযর দেখা ও তার থেকে টাকা আদায় করা কুপ্রথার শামিল। নববধূকে ঘরে তুলে তার সাথে বরকে বসিয়ে মাহ্‌রাম ও গায়রে মাহ্‌রাম মহিলা একত্রিত হয়ে চিনি খাওয়াও এক ধরনের কুসংস্কার। বর কনেকে কোলে করে গাড়ি বা পাল্কি থেকে ঘরে তোলার যে রেওয়াজ রয়েছে তাও কুপ্রথার অন্তর্ভুক্ত। এ সব পরিহার করা অপরিহার্য।[১৫৭]

গ্রন্থপঞ্জি

১. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ৯১।
২. কাওয়াইদুল ফিকহ্, সাইয়্যেদ মুফ্তী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান (র), পৃ. ১৭৭।
৩. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, আদাব অধ্যায়, পৃ. ৪২৫।
৪. মিফ্তাহু কুনূযিস্ সুন্নাহ্, পৃ. ২১৩; মুসনাদে আহ্মাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড।
৫. মুসনাদে আহ্মাদ ও বায়হাকী, সূত্র : কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮।
৬. শারহে তাহযীব, আল্লামা তাফতাযানী (র), ২য় খণ্ড।
৭. ইহ্ইয়াউল উলূমুদ্দীন, ১ম খণ্ড, তাওহীদ অধ্যায়।
৮. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, দাওআত অধ্যায়, সূত্র : মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড।
৯. শরহে ফিকহ্ আকবার, সূত্র : আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন : ইমাম কুরতবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬।
১০. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৪; কাওয়াইদুল ফিক্হ, পৃ. ৩০৭।
১১. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ৫২১।
১২. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৩; তালীমুল ইসলাম, ২য় খণ্ড।
১৩. মিরকাত, মোল্লা আলী কারী (র), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭।
১৪. মানসাবে নুবূওয়াত, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (র), পৃ. ২২ (বাংলা)।
১৫. তরজুমানুস্ সুন্নাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯ (উর্দূ)।
১৬. তরজুমানুস্ সুন্নাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১।
১৭. মা'আরিফুল কুরআন, মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী (র) ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০-১১৩ (উর্দূ), তরজুমানুস্ সুন্নাহ্, মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী, পৃ. ৩২৮-৩৮২ (উর্দূ)।
১৮. খতমে নুবূওয়াত : মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (র) পৃ. ৪৫৩ (বাংলা)।

১৯. The Gospel of Barnabas, Begum Aisha Bawani Waqfs, Karachi, 1997. P. 122-23.
২০. লিসানুল আরব, তাজুল আরূস, কামূস প্রভৃতি অভিধান গ্রন্থ।
২১. খতমে নুবূওয়াত, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র), পৃ. ৭১ (বাংলা)।
২২. আদ্-দুর্রুল মানসূর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০।
২৩. তাফ্সীরে তাবারী, ২২ তম খণ্ড, পৃ. ১১।
২৪. তাফসীরে খাযিন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭।
২৫. খতমে নুবূওয়াত, মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী, পৃ. ১৬০ (বাংলা)।
২৬. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০১।
২৭. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯১ باب ما ذكر عن بنى اسرائيل
২৮. মুসলিম, বাবু খাতামিন্ নাবিয়্যীন; সূত্র : খতমে নুবূওয়াত,পৃ. ২৭৯ (বাংলা)।
২৯. মুসনাদে আহ্মাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১; খতমে নুবূওয়াত, পৃ. ৩১৫ (বাংলা)।
৩০. খতমে নুবূওয়াত, পৃ. ২৭৯।
৩১. মানাকিবুল ইমামিল আযম আবী হানীফা, ইব্ন আহ্মাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২।
৩২. খতমে নুবূওয়াত, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র), পৃ. ৪২৩।
৩৩. খতমে নুবূওয়াত, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র), পৃ. ৪৩৪।
৩৪. খতমে নুবূওয়াত, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র), পৃ. ৪৩৪।
৩৫. শারহে ফিক্হ আকবার, পৃ. ২০২; খতমে নুবূওয়্যাত, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী' (র) পৃ. ৪২৫।
৩৬. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩।
৩৭. তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৫।
৩৮. কাদিয়ানী জালিয়ত, মাওলানা মুহাম্মদ তাহির, পৃ. ৬৪।
৩৯. ফায়যুল বারী, শারহে বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।
৪০. বুখারী, ঈমান অধ্যায়, পৃ. ৭।
৪১. মিশকাত, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ্, পৃ. ৩০।
৪২. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ১২৪।
৪৩. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ১২৪।
৪৪. সীরাতুন নবী : আল্লামা শিবলী নু'মানী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৬ (উর্দূ)।
৪৫. বিশ্বনবী, কবি গোলাম মোস্তফা, পরিচ্ছেদ ৪, ইসলাম ও মোজেযা, পৃ. ৩৮০।
৪৬. নাশরুত্ তিব ফী যিকরিন নাবিয়্যিল হাবীব, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র), পৃ. ১৯৯।
৪৭. ইল্মুল কালাম, মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী (র) পৃ. ১৯৪-৯৫।
৪৮. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৩২।
৪৯. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৩৫।
৫০. আল-মুনজিদ।
৫১. ইলমুল কালাম, মাওলানা ইদ্রীস্ কান্ধলভী (র), পৃ. ১৯৭।
৫২. কাওয়াইদুল ফিক্হ, সাইয়্যেদ মুফ্তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান, পৃ. ৩৪৬।
৫৩. মুসনাদে রায্যার, সূত্র : মাকামে সাহাবী, পৃ. ৬০, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র); আল-জামি' লি আহ্কামিল কুরআন, ইমাম কুরতবী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।
৫৪. মাকামে সাহাবা, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র), পৃ. ৪০; আল-জামি' লি আহ্কামিল কুরআন, ইমাম কুরতবী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯২।

৫৫. মাকামে সাহাবা, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র), পৃ. ৪৪; আল-ইসতি'আব, ভূমিকা, আল্লামা ইব্ন আবদুর বার (র)।
৫৬. তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬।
৫৭. মাকামে সাহাবা, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র) পৃ. ৬০; আল-জামি'লি আহ্কামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।
৫৮. মুসনাদে রযীন, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ. ৩২।
৫৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৩।
৬০. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৪।
৬১. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৪।
৬২. মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৪।
৬৩. প্রাগুক্ত।
৬৪. আবূ দাউদ শরীফ, সূত্র : মাকামে সাহাবা, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র)।
৬৫. কাওয়াইদুল ফিকহ্, সাইয়্যেদ মুফ্তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র), পৃ. ৫০৪।
৬৬. সীরাতুন্নবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৩।
৬৭. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৪৩।
৬৮. আল-ফাওযুল কাবীর, হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ দেহলভী (র), পৃ. ২।
৬৯. মাবাহিস্ ফী উলূমিল কুরআন, মান্নাউল কাত্তান, পৃ. ৫৫।
৭০. কামালাইন, মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।
৭১. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ৮২; কাওয়াইদুল ফিকহ্, পৃ. ৪২৪; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড।
৭২. মিশকাত, পৃ. ১৯।
৭৩. নিবরাস, শারহু শারহিল আকাইদ, পৃ. ১৭৪; কাওয়াইদুল ফিকহ্, পৃ. ৪৩১।
৭৪. মিশকাত শরীফ (বাংলা), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।
৭৫. নিবরাস, শারহু শারহিল আকাইদ, পৃ. ১৯৪।
৭৬. মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৯।
৭৭. তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ. ২২।
৭৮. মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।
৭৯. মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।
৮০. তারজুমানুস্ সুন্নাহ্ ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯।
৮১. তানযীমুল আশতাত শারহে মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।
৮২. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ৮২-৮৪; নিবরাস, শারহু শারহিল আকাইদ, পৃ. ১৭৪-১৭৮।
৮৩. তানযীমুল আশতাত শরহে মিশকাত, ১ম খণ্ড।
৮৪. তানযীমুল আশতাত : ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।
৮৫. আহ্মাদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২২।
৮৬. তারজুমানুস্ সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬।
৮৭. মিশকাত শরীফ (বাংলা), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬।
৮৮. মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।
৮৯. মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।
৯০. দরসে মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭।

৯১. সিরাতুন নবী (সা), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩।
৯২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।
৯৩. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭।
৯৪. আল-মুরশিদুল আমীন, ইমাম গাযালী (র), পৃ. ৩৬৩।
৯৫. মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।
৯৬. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ৯৪।
৯৭. মরণের পর কি হবে, মাওলানা আশিকে ইলাহী, পৃ. ৮৪।
৯৮. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ৯৬-৯৮; আল-মুরশিদুল আমীন, ৩২-৩৩।
৯৯. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২।
১০০. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮১।
১০১. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃ. ১০০-১০১।
১০২. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৫।
১০৩. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০০।
১০৪. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৬।
১০৫. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০২।
১০৬. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৩।
১০৭. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৩।
১০৮. কাওয়াইদুল ফিকহ্, পৃ. ৪৪৫।
১০৯. ফায়যুল বারী শারহে বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১।
১১০. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৬৪।
১১১. আলমগীরী ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬।
১১২. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭।
১১৩. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭।
১১৪. বেহেশতী জেওর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।
১১৫. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮-২৬৯।
১১৬. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪।
১১৭. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২-২৭৩।
১১৮. বেহেশতী জেওর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।
১১৯. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬-২৮৩।
১২০. কাওয়াইদুল ফিকহ্, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭; ফাতহুল মুলহিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪।
১২১. মুসনাদে আহ্মাদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৮।
১২২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৭।
১২৩. কাওয়াইদুল ফিকহ্, পৃ. ৫৩০-২০০।
১২৪. মিরকাত, শারহে মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।
১২৫. কাওয়াইদুল ফিকহ্, পৃ. ২০৪।
১২৬. মা'আলিমুস্ সুনান, ৪র্থ খণ্ড।
১২৭. রাহে সুন্নাত, পৃ. ৯৯।
১২৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৭।
১২৯. আহ্মাদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১।

১৩০. ইব্‌ন মাজাহ, পৃ. ৬।
১৩১. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১।
১৩২. আল-ই'তিসাম, আল্লামা শাতিবী (র)।
১৩৩. শামী. ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২২।
১৩৪. আবূ দাউদ, পৃ. ৪৬১।
১৩৫. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৪৮।
১৩৬. সুন্নাত ও বিদ্‌'আত, মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র), পৃ. ৭১।
১৩৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫০।
১৩৮. ফাতাওয়ায়ে মাহ্‌মূদিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।
১৩৯. আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৯।
১৪০. ইস্‌লাহুর রুসূম, পৃ. ২৩।
১৪১. আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৬।
১৪২. ইসলাহুর রুসূম, প্রাগুক্ত।
১৪৩. বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল লিবাস।
১৪৪. বুখারী, কিতাবুল লিবাস, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮ (বাংলা)।
১৪৫. ইসলাহুর রুসূম, পৃ. ১৫-১৯।
১৪৬. ইসলাহুর রুসূম, পৃ. ১৫-১৯।
১৪৭. ইসলাহুর রুসূম, পৃ. ৯৭-১০২।
১৪৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮৫।
১৪৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮৫।
১৫০. তিরমিযী ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩।
১৫১. মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।
১৫২. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৬৩।
১৫৩. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৬৩।
১৫৪. ইসলাহুর রুসূম, প্রাগুক্ত।
১৫৫. প্রাগুক্ত।
১৫৬. প্রাগুক্ত।
১৫৭. প্রাগুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশু-কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম

শিশু আল্লাহ্র দেওয়া শ্রেষ্ঠ নি'আমত

আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে অগণিত নি'আমত দান করেছেন। এ সব নি'আমতের মধ্যে সুসন্তান অন্যতম শ্রেষ্ঠ নি'আমত, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের দান। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۰

আল্লাহ্ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছেন। তবুও কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৭২)

আল্লামা শাওকানী (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এ আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতির মধ্য থেকেই জোড়া বানিয়েছেন, যেন তোমরা তার সাথে অন্তরের সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হতে পারো। কেননা প্রত্যেক প্রজাতিই তার স্বজাতির প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে। আর ভিন্ন প্রজাতি থেকে তার মনে অনুরূপ আকর্ষণ থাকে না। মনের এ আকর্ষণ ও বিশেষ সম্পর্কের কারণেই বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আর এ-ই হচ্ছে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য।[১]

স্বামী-স্ত্রীর আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে সন্তানের মাধ্যমই। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলঙ্ক পুষ্প বিশেষ।

আল্লামা আলূসী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্তুতি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যমে।[২]

বস্তুত পৃথিবীতে কত অগণিত মানুষ এমন রয়েছে যাদের সম্পদের কোন অভাব নেই কিন্তু তা ভোগ করার জন্য কোন আপনজন নেই। হাজার চেষ্টা-সাধনা এবং কামনা করেও তারা সন্তান লাভ করতে পারছে না। আবার কত অসংখ্য লোক দেখা যায়, যারা কামনা না করেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক। কিন্তু তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ নেই। তাই বলতে হয়, সন্তান হওয়া না হওয়া একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বিশেষ নি'আমত। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ـ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা শূরা, ৪২ : ৪৯-৫০)

মানুষ যত বৈষয়িক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, ইচ্ছামত সন্তান জন্মবার ক্ষমতা তার নেই। অন্যদের সন্তান দান তো দূরের কথা, যার ভাগ্যে সন্তান নেই সে কোন উপায় অবলম্বন করেও সন্তান লাভ করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ্ যাকে কেবল পুত্র সন্তানই দিয়েছেন সে কোন উপায়েই একটি কন্যা সন্তান লাভ করতে পারে না। এ ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষই চরমভাবে অক্ষম। এরপরও যদি কেউ আল্লাহ্‌র ছাড়া অপর কোন সত্তাকে এরূপ ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করে তবে তা তার অদূরদর্শিতারই ফল। এর পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ـ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৮)

সন্তান আল্লাহ্‌র দেওয়া এক উত্তম নি'আমত। এ নি'আমতের সুফল মৃত্যুর পরও ভোগ করা যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন : মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য তখনো তিন প্রকার আমলের ফল সে পেয়ে থাকে, ১. সাদ্‌কায়ে জারিয়া, ২. এমন ইল্‌ম ও বিদ্যা যার সুফল ভোগ করা যায় ও ৩. এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।

সৎসন্তান রেখে যাওয়াকে 'আমল' বলার কারণ এই যে, সন্তান পিতামাতার কারণেই দুনিয়ায় আগমন করে থাকে এবং তাদের সযত্ন প্রতিপালনের ফলেই সে চরিত্রবান হতে পারে। হাদীসে সন্তান কর্তৃক দু'আর কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে পিতামাতার জন্য দু'আ করার ব্যাপারে সন্তানকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে পিতামাতার জন্য সবসময় আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করা। জীবিত সন্তান যেমন পিতামাতার জন্য নি'আমত, অনুরূপভাবে মৃত সন্তানও তাদের জন্য নি'আমত স্বরূপ।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে যার দু'টি সন্তান মারা যাবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, যদি কারো একটি মারা যায়? উত্তরে তিনি বললেন : একটি হলেও।[৩]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা মালাকুল মাউতকে বলেন, তুমি আমার বান্দার সন্তানের রূহ্ কবয করেছো ও তুমি তার নয়নমণি ও কলিজার টুক্‌রাকে কেড়ে নিয়েছো? ফিরিশ্‌তা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, সে কি বলেছে? ফিরিশ্‌তা বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ্ বলেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা তৈরি কর এবং তার নাম রাখ 'বায়তুল হাম্‌দ'।[৪]

সন্তান-সন্তুতি যেমন আল্লাহ্‌র অন্যতম নি'আমত, তদ্রূপ পরীক্ষার বস্তুও বটে। কারণ পৃথিবী মানব জাতির জন্য পরীক্ষার স্থান হিসেবে স্বীকৃত। তাই আল্লাহ্‌র দেওয়া ধন-সম্পদ আর সন্তান পরীক্ষার বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম।

এ পর্যায়ে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ·

আর জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি এক পরীক্ষা এবং আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৮)

উক্ত আয়াত থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যেমন করে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র দেওয়া নি'আমত, সন্তান-সন্তুতিও অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া নি'আমত। অন্যায় পথে ব্যয় করলে কিংবা যথাস্থানে ব্যয় না করলে যেমন আমানতে খিয়ানাত হয়, সন্তান-সন্তুতিকেও ভুল পথে এবং অন্যায় কাজে নিয়োজিত করলে তেমনি আল্লাহ্‌র আমানতে খিয়ানাত হবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সন্তান-সন্তুতি আল্লাহ্ প্রদত্ত অন্যতম নি'আমত বটে, তবে সে সন্তানকে অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ও দীনদার হতে হবে। আর সন্তান যদি অসৎ প্রকৃতির হয়, তবে এ সন্তান মাতাপিতার বিপদের কারণ হবে।

শিশুর প্রতি মহানবী (সা)-এর ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তরে শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। তিনি এ বিশ্ব চরাচরে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হিসাবে তাশরীফ এনেছেন। আল্লাহ্‌র প্রতিপালন যেমন সর্বজনীন, মহানবী (সা)-এর প্রেম ভালবাসাও তেমনি সর্বজনীন। হাদীসের বর্ণিত আছে:

একবার মহানবী (সা)-এর কানে হযরত হুসাইন (রা)-এর কান্নার শব্দ এলো। এতে তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত হলেন। তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-কে বললেন, তুমি কি জান না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়?[৫]

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিশু-কিশোরদের নিকট দিয়ে যাতায়াতকালে তাদেরকে সালাম করতেন।[৬]

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণদানের নিমিত্তে মিম্বরে আরোহণ করে দেখতে পেলেন যে, হাসান ও হুসাইন (রা) দৌড়াদৌড়ি করছেন এবং পা পিছলে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি ভাষণদান বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। শিশু দু'টির দিকে অগ্রসর হয়ে দুই বাহুতে উঠিয়ে নিলেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে বললেন : হে লোকসকল! তোমাদের ধন-সম্পদ এক পরীক্ষার বস্তু, আল্লাহ্‌র এ বাণী সত্যিই। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার এই দুই নাতিকে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে পা পিছলে পড়ছে দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না, তাই দৌড়ে গিয়ে এদের উঠিয়ে নিলাম।[৭]

একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করছিলেন। আর তখন হযরত হাসান ও হুসাইন (রা) এসে তাঁকে সিজ্‌দারত অবস্থায় পেয়ে একেবারে পিঠে চড়ে বসলেন। তিনি সিজ্‌দা দীর্ঘায়িত করলেন। আর তাঁরা পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত তিনিও তাঁদের নামিয়ে দিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম ফিরালে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আপনি সিজ্‌দা দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, আমার নাতিদ্বয় আমাকে সওয়ারী বানিয়েছে। কাজেই তাঁদেরকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেওয়াটা আমার পসন্দ হয়নি।[৮]

রাসূলে কারীম (সা) কখনও কখনও শিশুদের কান্না শুনতে পেলে নামায সংক্ষেপ করে দিতেন এবং বলতেন : "আমি চাই না যে, তার মায়ের কষ্ট হোক।"[৯]

একদা সকালে রাসূলে কারীম (সা) হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘরের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন আর তখন তাঁর কানে হযরত হুসাইন (রা)-এর কান্নার আওয়াজ এলো। নবীজীর তা অপসন্দ হল। তিনি ফাতিমাকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, তুমি কি জান না যে, তার ক্রন্দন আমার মনে ব্যথা দেয়![১০]

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তুলনায় সন্তান-সন্তুতির প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী আমি কাউকে দেখিনি। তাঁর পুত্র ইব্‌রাহীম (রা) মদীনায় উঁচু প্রান্তে ধাত্রী মায়ের কাছে দুধপান করতেন। তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি ঐ ঘরে যেতেন অথচ সেই ঘরটি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ ইব্‌রাহীমের ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিল একজন কর্মকার। তিনি ইব্‌রাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, এরপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ইব্‌রাহীম (রা) ইন্‌তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ইব্‌রাহীম আমার পুত্র। সে দুধপানের বয়সে ইন্‌তিকাল করেছে। সুতরাং জান্নাতে তাকে একজন ধাত্রী দুধপান করাবে।[১১]

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (সা)-এর নেতৃত্বাধীন কোন যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। এতে রাসূলে কারীম (সা) গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।[১২]

মহানবী (সা) বলেছেন : "তোমরা তোমাদের সন্তানদের যত্ন নিবে এবং তাদের আদব-কায়দা-শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে।"[১৩]

মহানবী (সা) আরো বলেছেন : "তোমরা শিশুদের ভালবাস এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাদের সাথে কোন ওয়াদা করলে তা পূর্ণ কর। কেননা তারা তোমাদেরকে তাদের রিযিক সরবরাহকারী বলে জানে।"[১৪]

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, মহানবী (সা)-এর অকৃত্রিম ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, সবার জন্য নিবেদিত। শিশু যেহেতু দুনিয়ায় পুষ্প বিশেষ, তাই তাদের খুব ভালবাসতেন, আদর করতেন, স্নেহ করতেন। কাজেই আমাদেরও শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা রাখা উচিত।

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব

পরিবার হচ্ছে সমাজ জীবনের প্রথম স্তর। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, পিতা-মাতা, ভাইবোন প্রভৃতি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে পরিবার। বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বিত রূপ হচ্ছে সমাজ। আর পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবনের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতার উপর।

মানুষ সামাজিক জীব। পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই এ সামাজিক জীবনের সূচনা হয়। মানুষ সকল যুগে ও সকল কালেই কোন না কোনভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা প্রথম স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। কাজেই আদর্শ সমাজ গঠনে আদর্শ পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

সন্তান প্রতিপালনের জন্যে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারেই সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়। শিশু সর্বপ্রথম প্রভাবান্বিত হয় তার পিতামাতার দ্বারা। কেননা শিশু তার আচার-আচরণে তাঁদেরকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে। তাই সন্তানদের সামনে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আচরণ প্রকাশ করাই পিতামাতার কর্তব্য। তারা যেন নিজেদেরকে উত্তম উদাহরণরূপে সমাজের সামনে পেশ করেন।

সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে সুস্থ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে হলে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর কাঠামোতে গড়ে তোলা আবশ্যক। অন্যথায় সমাজ সংস্কার ও আদর্শ জাতি গঠনের কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় না।

পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার প্রতি ইঙ্গিতবহ কয়েকটি আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো :

ইরশাদ হয়েছে :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً ۔

আর আল্লাহ্ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৭২)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۔

তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে। তারপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৪)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ۔

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬ : ৬)

বস্তুবাদী সমাজ পারিবারিক প্রথা বিলুপ্তির জন্য খুবই সচেষ্ট। এতে করে তাদের জীবনে নেমে এসেছে চরম অশান্তি ও বিপর্যয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্যে পরিবার একটি দুর্গ স্বরূপ। এ দুর্গ অক্ষুণ্ণ ও সুরক্ষিত থাকার উপরই নির্ভর করে ইসলামী সমাজ ও জাতীয় জীবনের নিরাপত্তা, সুস্থতা এবং স্থিতি।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, পারিবারিক জীবন ব্যতীত যেমন মানব সভ্যতার বিকাশ অচিন্ত্যনীয়, তেমনি শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে পারিবারিক জীবনের বিকল্প নেই। তাই ইসলাম সুস্থ পারিবারিক জীবনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

মাতৃগর্ভে শিশুর বিকাশে পিতামাতার দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলাম

ইসলাম শুধু যে জন্মের পর থেকেই শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দান করেছে তা নয়, বরং পূর্ব থেকেই তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহানবী (সা) বলেছেন : চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়। কন্যার ধন সম্পদের কারণে, তার বংশীয় আভিজাত্যের কারণে, তার রূপ-লাবণ্যের কারণে এবং তার দীনদারীর কারণে। তবে তুমি ধার্মিক বিয়ে করে ধন্য হও।[১৫]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা বলা যেতে পারে যে, লক্ষণীয় বিষয় হল, মহিলার রূপ বা সম্পদই যেন সর্বাধিক গুরুত্ব না পায়। ধর্মপরায়ণতার গুণটি যেন অবশ্যই যুক্ত থাকে। আর সে যেন মার্জিত দীনি পরিবারের সদস্য হয়। কেননা তার সন্তানেরা তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও আচরণ ইত্যাদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়।

শিশুর প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ও স্বভাবজাত

সন্তানের প্রতি পিতামাতার অকৃত্রিম ভালোবাসা আল্লাহ্ প্রদত্ত ও স্বভাবজাত বিষয় এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্তানের ভালোমন্দ সম্পর্কে পিতামাতা সর্বাধিক সচেতন হয়ে থাকেন। সন্তানের প্রতি পিতামাতার যদি এই অকৃত্রিম ভালোবাসা না থাকত তাহলে বিশ্ব চরাচরে মানব অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যেত। সন্তান-সন্তুতি পিতামাতার জন্য অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার এবং মানব বিকশিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। সৎসন্তান পিতামাতার জন্য আশীর্বাদ। তাই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً ۔

ধনৈশ্বর্য্য ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম। তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট। (সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ : ৪৬)

সন্তানের প্রতি পিতামাতার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা থাকার কারণেই তারা সন্তানের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ কল্পে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন। সন্তানকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তোলার পিছনে রয়েছে তাদের অপরিশোধযোগ্য অবদান। আল্লাহ্ তা'আলা মানব মনে যে প্রেম-ভালোবাসা, নম্রতা, কোমলতা, হৃদ্যতা রেখেছেন তার সবটুকু পিতামাতা সন্তানের কল্যাণে ব্যয় করে নিজেদেরকে সার্থক মনে করে থাকেন। সন্তান

ও ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়ণ নয় এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।[১৬]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি একটি শিশু নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে শিশুটিকে চুমু দিতে লাগলেন। রাসূলে কারীম (সা) এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, শিশুটির প্রতি কি তোমার দয়া জেগে উঠেছে? সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি এর চেয়েও অধিক দয়া করেন। কেননা তিনি দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১৭]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বরেন, এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে বলল, আপনি কি শিশুদের চুমু দেন? আমি তো কখনো শিশুদের চুমু দেই না। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ্র যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেন, তবে আমারই বা কি করার আছে?[১৮]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)- কে চুমু দিলেন, তখন সেখান আকরা ইব্ন হাবিস (রা) উপস্থিত ছিলেন। এ দেখে তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে, আমি কখনো তাদের চুমু দেইনি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না।[১৯]

হযরত আনাস (রা) বলেন, এক গরীব মহিলা তার দুই কন্যা নিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। স্ত্রীলোকটি তার দুই কন্যার প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাওয়ার জন্য মুখে তুলে নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় শিশুরা তাও খেতে চাইলে মহিলা তার খেজুরটি দু'টুক্রা করে তাদের হাতে অর্ধেক অর্ধেক করে তুলে দিল। আয়েশা (রা) বলেন, তার এ কাজ আমার নিকট আশ্চর্যজনক বলে মনে হল। তাই আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালাম। তিনি বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্ তা'আলা এই স্ত্রীলোকটিকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন অথবা এর বিনিময়ে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।[২০]

সন্তানের প্রতি ভালবাসা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এ কারণে নবী-রাসূলগণের জীবনেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। হযরত ইউসুফ (আ)-কে হারাবার পর যে আকুতি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, তা পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে :

وَقَالَ يَاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ٠

এবং সে বলল, আফসোস ইউসুফের জন্যে! শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। তারা বলল, আল্লাহ্র শপথ, আপনি তো ইউসুফের কথা ভুলবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্যু হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৪-৮৫)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সন্তানের প্রতি মায়া পিতামাতার একান্তই সহজাত, এতে সন্দেহ নেই।

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইসলামের কোন বিকল্প নেই। ইসলামে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের অধিকারের স্বীকৃতি যেমন রয়েছে, অনুরূপ শিশুদের অধিকারের নিশ্চয়তাও এতে পুরোপুরি রয়েছে।

ক. সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার

শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত ও সুরক্ষিত। কাজেই পিতামাতা কোন অবস্থাতেই সন্তান হত্যা করতে পারবে না। এমনকি চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হলেও নয়।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا .

তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকেও আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩১)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ .

যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৪০)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ .

যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ? (সূরা তাকভীর, ৮১ : ৮-৯)

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নারীদের বায়'আত গ্রহণকালে তাদের থেকে যেসব বিষয়ে শপথ নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি ছিল সন্তান হত্যা না করা।

ইসলামী শরী'আতে শিশুর জীবন রক্ষায় পিতামাতার দায়িত্ব অপরিসীম। শিশু পিতামাতার নিকট এক পবিত্র আমানত। এ আমানত সম্পর্কে তারা অচিরেই জিজ্ঞাসিত হবে। যদি পিতামাতা শিশুদের প্রতিপালনে মনোযোগী না হয়, তবে অবশ্যই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি মানুষ তার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দায়িত্ববান। তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদ ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্ববান। সে এসবের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২১]

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা সকলের জন্য তাদের সন্তান হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন।

খ. সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান

হাদীসে আছে, "সন্তানদের দান করার ব্যাপারে সমতা রক্ষা কর।"

অন্য হাদীসে আছে, "তোমাদের সন্তানদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কায়েম কর।"[২২]

এ সম্পর্কে প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থে, নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) বর্ণিত হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। বাশীর আনসারীর স্ত্রী উমরাহ্ তাঁর পুত্র নু'মান ইব্‌ন বাশীরকে একটি বাগান অথবা ক্রীতদাস দান করার জন্য স্বামীকে পীড়াপীড়ি করেন। এতে বাশীর ঐ ছেলেকে তা দান করেন। কিন্তু নু'মানের মা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাক্ষী রাখার দাবি করেন। সেমতে তিনি নু'মানকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার স্ত্রী উমরার গর্ভজাত এ পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। আর উমরাহ এ বিষয়ে আপনাকে সাক্ষী রাখার অনুরোধ করেছে। তখন মহানবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অন্যান্য সন্তানদেরও এরূপ দান করেছ? সে বলল, জ্বি-না। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমি এ যুলুমের সাক্ষী হব না। অতঃপর বাশীর এসে তার দান ফেরত নিয়ে নেন।[২৩]

হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম (সা)-এর নিকট বসা ছিল। এ সময় তার পুত্র সন্তান তার কাছে এলো। সে তাকে চুমু দিল এবং কোলে তুলে নিল। এরপর তার কন্যা সন্তান এলো এবং সে তাকে সামনে বসিয়ে নিল। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, তুমি এদের উভয়ের সাথে একই রকম ব্যবহার করলে না কেন?

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের প্রতি সমতা বিধান এবং সুবিচার করা অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে অবহেলা অমার্জনীয় অপরাধ।

গ. প্রতিপালন

সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে পিতামাতা উভয়েরই বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাদের উচিত সন্তানদের প্রত্যেকটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, তাদের যথাযথ পরিচর্যা করা, তাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[২৪]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি তার অধীনস্থদের দায়িত্ব নিল অথচ তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত থাকল, তার জন্য জান্নাত হারাম।[২৫]

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন দান হতে পারে না।[২৬]

সন্তান প্রতিপালন সাওয়াবের কাজ সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ·

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৩)

কাজেই সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

১৭—

কন্যা সন্তানের প্রতি ইসলামের বিশেষ বিবেচনা

ইসলাম সন্তানকে চোখ জুড়ানো সম্পদ বলে বিবেচনা করে থাকে। সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক, আচরণের ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। মহানবী (সা) ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান এবং মেয়েদের উপরে ছেলেদের অহেতুক প্রাধান্যদানে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثٰى فَلَمْ يَادِهَا وَيُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِيْ الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ .

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যার তত্ত্বাবধানে কোন শিশু বালিকা থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে এবং বালকদেরকে তার উপর কোনরূপ প্রাধান্য না দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।[২৭]

ইসলাম কন্যা সন্তানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে। এমনকি কুরআন মাজীদে 'সূরাতুন নিসা' নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা স্থান পেয়েছে। সূরা আলে ইমরান, নিসা, মারইয়াম, নূর, আহ্যাব-এ কন্যা সন্তানের অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ .

তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৫)

মহানবী (সা) পিতার অন্তরে কন্যা সন্তানের প্রতি গভীর মমত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বহু উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিন বোন প্রতিপালন করল, তাদেরকে শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিল এবং তাদের প্রতি দয়া করল, অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিলেন। তাহলে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত অবধারিত করে দিবেন।" তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দু'টি কন্যা সন্তান প্রতিপালন করলে? তিনি উত্তরে বললেন: দু'টি করলেও। বর্ণনাকারী বলেন, এমনকি তারা যদি একটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন তবে তিনি একটি সম্পর্কেও এরূপ বলতেন।[২৮]

তিনি আরও বলেছেন : কন্যা সন্তান সুগন্ধি ফুল। আমি তার সুগন্ধি গ্রহণ করি আর তার রিযিক তো আল্লাহ্র হাতে।[২৯]

মহানবী (সা) আরও বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যার প্রথম সন্তান মেয়ে।[৩০]

হযরত আনাস (রা) বলেন মহানবী (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করবে, তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে বললেন, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এরূপ কাছাকাছি থাকব।[৩১]

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া হয় আর সে তাদেরকে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করে, সে কন্যা সন্তানগুলো তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড় স্বরূপ হবে।[৩২]

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, কন্যা সন্তানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা জাহিলী যুগের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম জাহিলী যুগের এ সব বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইনসাফের বিধান প্রবর্তন করেছে। তাই সন্তানদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ না করে পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সকলকেই সমান নযরে দেখা উচিত।

সন্তান প্রসবকালীন করণীয়

সন্তান প্রসবের সময়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টদায়ক। তাই এ সময়ের প্রতিটি কাজ সতর্কতার সাথে করতে হবে। পরিপূর্ণ প্রসব ব্যথার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাড়াহুড়া করা অনুচিত; এতে সন্তান বা প্রসূতি অথবা উভয়ের জীবনের সমূহ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, এমনকি জীবনের আশংকাও দেখা দিতে পারে। প্রসবের সময় আঁতুড় ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা করা জরুরী। এ ছাড়াও সামর্থ্যনুযায়ী আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ, প্রসূতি বিষয়ক চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। অনভিজ্ঞ দাই ও নার্সদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

সন্তান প্রসবের সময় দাই বা নার্সের সামনে কেবল আবশ্যক পরিমাণ শরীর অনাবৃত করা যায়। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিবস্ত্র হওয়া অথবা সংশ্লিষ্ট লোকদের ব্যতীত অন্য কারো তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ إِلَيْهِ .

সতর-গুপ্তাঙ্গ যে দেখবে এবং যে দেখাবে উভয়ের উপরই আল্লাহ্র লা'নত।[৩৩]

নবজাতকের আগমনে আনন্দ প্রকাশ

সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ হতে আনন্দ প্রকাশ করা এবং শুভ সংবাদ জানানো মুস্তাহাব। পিতামাতার সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর পক্ষ থেকেও আনন্দ প্রকাশ করা মুস্তাহাব। তৎক্ষণাৎ আনন্দ প্রকাশ করা সম্ভব না হলে পরে নবজাতক ও তার পিতামাতার জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব।

হিজরতের পর মদীনায় মুহাজির সাহাবীদের প্রথম সন্তান ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)। তাঁর জন্মের পর পর মুহাজির সাহাবীগণ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।[৩৪]

শিশু জন্মগ্রহণ করার পর কিরূপে আনন্দ প্রকাশ করবে এ ব্যাপারে আল্লামা ইব্ন কাইয়্যিম (র) স্বীয় কিতাব "তুহ্ফাতুল মাওদুদ ফী আহ্কামিল মাওলূদ"-এ একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন :

"আবূ বকর ইব্ন মুনযির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান বাসরী (র)-কে দেখেছি, তাঁর কাছে একজন লোক আসল, তাঁর সাথে আরেকজন লোক ছিল। এ লোকটির সাথে তার এক নবজাতক শিশুও ছিল। তারপর উক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, শিশু জন্মগ্রহণের পর আমরা কিভাবে আনন্দ প্রকাশ করব ? হযরত হাসান বাসরী (র) বললেন, তুমি এভাবে বল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যে সন্তান দান করেছেন তার হায়াতে বরকত দান করুন আর সন্তানদাতা মহান আল্লাহ্র শুক্‌রিয়া আদায় করবে।

এ আনন্দ প্রকাশ ছেলেমেয়ে উভয় প্রকার শিশু সন্তানের জন্য করা উচিত। আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর বাসায় মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রেরণ করা জায়িয। এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, একে যেন রুস্‌ম ও অবশ্য পালনীয় কর্ম হিসেবে পালন করা না হয়। আর সাধ্যাতীত ব্যবস্থা করতে গিয়ে অযাচিত ধার-কর্জের সম্মুখীন হতে না হয়।[৩৫]

নবজাতকের জন্য করণীয়

নবজাতকের জন্য তিনটি কর্তব্যকর্মের প্রথমটি হল তাকে উত্তমরূপে গোসল করিয়ে শরীরে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করা। অবশ্য শীতকালে গোসল করানোর ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন তাকে ঠাণ্ডায় আক্রমণ করতে না পারে। গোসলের সময় খুব লক্ষ্য রাখবে যেন পানি তার নাক, কান এবং মুখে প্রবেশ করতে না পারে।

গোসলের পরপরই শরীর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে এবং আবহাওয়া অনুযায়ী নরম জাতীয় কাপড় দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

শিশুকে বেশি আলোকোজ্জ্বল স্থানে রাখবে না। অধিক আলোর প্রভাবে শিশুর চোখের জ্যোতি হ্রাস পেতে পারে। শিশুকে এক পার্শ্বে বেশিক্ষণ শুইয়ে রাখবে না এবং কোন একদিকে দীর্ঘসময় তাকিয়ে থাকতে দেবে না। এর ফলে শিশুর রাতকানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। কোলের শিশুকে একা ঘরে রেখে কোথাও যাবে না। এতে অবাঞ্ছিত কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে।[৩৬]

কানে আযান ও ইকামাত বলা

গোসল করানোর পর শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত দেওয়া। হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে :

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ حَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلٰوةِ.

হযরত আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি যে, হযরত ফাতিমা (রা)-এর গর্ভ থেকে হযরত হাসান (রা) জন্ম হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কানে নামাযের আযানের মত আযান দিয়েছিলেন।[৩৭]

উক্ত আযানে حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় ডানদিকে আর حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বামদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।[৩৮]

অপর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ وَاَقَامَ فِىْ اُذُنِهِ الْيُسْرٰى ·

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর জন্মগ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত দিয়েছিলেন।[৩৯]

নবজাতকের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত দিলে মাতৃকা রোগ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হাদীসে বর্ণিত আছে :

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ وُلِدَلَهُ مَوْلُوْدٌ فَاَذَّنَ فِىْ اُذُنِهِ الْيُمْنٰى وَاَقَامَ فِىْ اُذُنِهِ الْيُسْرٰى لَمْ تَضُرُّهُ اُمُّ الصِّبْيَانِ ·

হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : যার কোন নবজাতক জন্মগ্রহণ করবে আর সে নবজাতকের ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামাত দিলে মাতৃকা রোগ সে নবজাতকের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[৪০]

কানে আযান ও ইকামাত দেওয়ার হিকমত বর্ণনা করে কেউ কেউ বলেছেন যে, নবজাতকের কানে আযান ও ইকামাত দেওয়ার অর্থ হল, তাকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, আযান ও ইকামাত হয়ে গেছে এখন শুধু নামাযের অপেক্ষা, নামায শুরু হতে যে সামান্য সময় বাকী আছে তাই তোমার জীবন।

আর কেউ বলেছেন যে, আযান ও ইকামাতের মাধ্যমে নবজাতকের কানে প্রথমেই আল্লাহ্র পবিত্র নাম পৌছিয়ে দেওয়া হয় যেন এর প্রভাবে তার ঈমানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং শয়তানের প্ররোচনা হতে সে নিরাপদে থাকতে পারে।[৪১]

আর নবজাতক দুনিয়াতে পদার্পণ করার সাথে সাথেই তার কানে এ আহবান পৌঁছিয়ে দেওয়া যে, আযান ও ইকামাত ইসলামের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বাক্য।

আযান ও ইকামাতের আওয়াজ শোনার সাথে সাথে শয়তান নবজাতকের কাছ থেকে দূরে সরে যায় আর শয়তানের সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নবজাতক আশংকামুক্ত হয়ে যায়। এতে আর একটি হিক্মাত হল, শয়তান নবজাতকের মন-মস্তিষ্ক বিগড়িয়ে দেওয়ার আগেই তার কানে ইসলাম ও আল্লাহ্-রাসূলের দাওয়াত এবং ইবাদতের আহবান পৌছিয়ে দেওয়া।[৪২]

তাহ্নীক—নবজাতককে মিষ্টিমুখকরণ

নবজাতকের ক্ষেত্রে তৃতীয় করণীয় বা সুন্নাত হল তাহ্নীক। তাহ্নীক অর্থ হল, খেজুর চিবিয়ে সেই চর্বিত খেজুর নবজাতকের মুখে দেওয়া। চর্বিত খেজুরের কিছু অংশ নবজাতকের মুখে লাগানো যাতে এর কিছু রস তার পেটে পৌছে যায়। খেজুর সহজলভ্য না হলে সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যাতে যে কোন মিষ্টিদ্রব্য দ্বারা তাহ্নীক করা যায়। তাহ্নীক সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ ـ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নবজাতক শিশুদেরকে পেশ করা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন ও তাদেরকে মিষ্টি মুখ করাতেন।[৪৩]

যদিও যে কোন মিষ্টিদ্রব্য দ্বারা তাহ্নীক করা যায় কিন্তু খেজুর দ্বারা তাহ্নীক সম্পর্কে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে :

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ وُلِدَلِىْ غُلَامٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ ـ

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পেশ করলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম আর খেজুর দ্বারা তাকে মিষ্টিমুখ করালেন ও তার জন্য বরকতের দু'আ করে তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।[৪৪]

কোন বুযর্গের চর্বিত বস্তু নবজাতকের প্রথম খোরাক হলে তা যদি নবজাতকের অঙ্গ গঠনে প্রথম ভূমিকা রাখে তা হলে আশা করা যায় যে, নবজাতকের এই প্রথম খোরাক তার চরিত্র চিত্রণে জীবনভর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَوَلَدَتْ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَوَضَعْتُهُ فِىْ حِجْرِهِ ثُمَّ دَعَا لَهُ بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِىْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ دَخَلَ فِىْ جَوْفِهِ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ ثُمَّ دَعَالَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ـ

হযরত আসমা বিন্তে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কা শরীফে অবস্থানকালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। মদীনা শরীফে হিজরতের পর তিনি কুবা নামক স্থানে ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে নিয়ে এসে তাঁর কোলে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু খেজুর আনিয়ে সেগুলো চিবিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর মুখগহ্বরে কিছু থুথু ছিটিয়ে দিলেন। তাঁর পেটে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থুথু মোবারকই প্রবেশ করেছিল। পরে তাকে মিষ্টিমুখ করালেন। তারপর তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন।[৪৫]

তাহ্নীকের উপকারিতা

তাহ্নীকের একটি উপকারিতা হল, নবজাতকের মুখে চর্বিত বস্তু ঢেলে দেওয়ার পর জিহ্বা দ্বারা নড়াচড়ার কারণে তার দাঁতের মাড়ি মজবুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সাথে সাথে মাতৃস্তন্যে মুখ লাগানোর প্রতি সে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে মাতৃদুগ্ধ পান করতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

এ ছাড়াও তাহ্নীকে ব্যবহার্য খেজুর ও মধুতে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খেজুর ও মধুর ব্যাপক খাদ্যপ্রাণ ও পুষ্টিমান প্রমাণিত। এহেন পুষ্টিবহুল বস্তুর সাথে নবজাতক শিশুকে জীবনের সূচনালগ্নেই সম্পৃক্ত করাও তাহ্নীকের একটি বিরাট হিক্‌মাত।[৪৬]

নবজাতক শিশুকে শালদুধ পান করানো

করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে 'আশরাফুল মাখলূকাত' বলে ঘোষণা করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করার পর তার লালন-পালনের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই করেন। একটি নবজাতক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহু রাব্বুল আলামীন তার লালন পালনের ব্যবস্থা করে দেন। শিশুর মাতার বুকে নবজাত শিশুর জন্য দুধ সৃষ্টি করে রাখেন যা হাল্‌কা মিষ্টি ও উষ্ণ, যা নবজাত শিশুর নাজুক অবস্থার উপযোগী।

গর্ভ অবস্থার শেষ পর্যায়ে এবং প্রসবোত্তর ২-৪ দিন মায়ের স্তন্য হতে যে গাঢ় হলুদ রংয়ের দুধ আসে তাকে শালদুধ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 'কোলোস্টাম' বলে। এ দুধ পরিমাণে খুব অল্প। কিন্তু এই সামান্য দুধ নবজাতকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শালদুধ হলুদ বর্ণ এবং অত্যন্ত গাঢ় প্রকৃতির হয়ে থাকে বলে কেউ কেউ এ দুধকে ক্ষতিকর বলে মনে করে। অথচ হাদীসে রাসূল (সা) এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত যে, এ দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী।[৪৭]

শালদুধে স্নেহ ও শর্করার পরিমাণ কম। কিন্তু খনিজ লবণ, লৌহ ও আমিষের পরিমাণ সাধারণ দুধের চেয়ে বেশি, যা নবজাতকের পুষ্টিমান যথার্থ রাখার পাশাপাশি একটি উত্তম রেচক হিসাবেও কাজ করে থাকে। পুষ্টিমান রক্ষার পাশাপাশি শালদুধে থাকে প্রচুর পরিমাণে ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা রোগ প্রতিরোধকারী এন্টিবডি উপাদান। এর মধ্যে 'আইজি-এ' এবং 'আইজ-জি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপাদানসমূহ শিশুর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

তুলনামূলক গবেষণায় দেখা যায় যে, শালদুধ এবং সেই সাথে মায়ের দুধগ্রহণকারী শিশুদের এলার্জি, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণ, ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, মেনিনজাইটিস, অন্ত্রপ্রদাহ জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব অন্য শিশুদের তুলনায় অনেক কম। শালদুধে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-'ই' এবং ভিটামিন-'এ'। উভয় ভিটামিনই দীর্ঘদিন শিশুর যকৃতে জমা থাকে। ভিটামিন-'ই' শরীরে এন্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে এই ভিটামিন নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের লোহিত কণিকার ভাঙ্গন প্রবণতারোধে সহায়তা করে থাকে। ভিটামিন-'এ' চোখের রঞ্জক তৈরি, দাঁত, হাড়ের গড়নে সহায়তা, শরীরের আন্তঃ ও বহিঃ আবরণীর কোষকে রক্ষা করার পাশাপাশি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, পর্যাপ্ত শালদুধ ও মায়ের দুধ গ্রহণকারী শিশুদের শ্বাসনালীর সংক্রমণের হার অন্য শিশুদের চাইতে অনেক কম। মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে মা-শিশুর অকৃত্রিম বন্ধন তৈরি হয়। এই সংযোগ মা-শিশুর বন্ধন এবং মায়ের সাথে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ তৈরিতে বিশেষভাবে সহায়ক। তাই শালদুধ

ফেলে দেওয়া বা নষ্ট করা একেবারেই অনুচিত। শিশুকে শালদুধ সহ বুকের দুধ পান করানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে শালদুধ দেওয়া উচিত।

শিশুর নামকরণ

নবজাতক শিশুর জন্য মাতাপিতার আরো একটি বিশেষ কর্তব্য হল অন্তত জন্মের সপ্তম দিবসে তার জন্য একটি শ্রুতিমধুর ও অর্থবোধক নাম রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে হযরত আদম (আ) আল্লাহ্র শিখানো জ্ঞানে সবকিছুর নাম বলে দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিলেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই ঘটনা থেকে এটুকু বুঝা যায় যে, নাম জানা বা নাম রাখার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

নামের প্রভাব

মানুষের জীবনে নামের বিরাট প্রভাব পড়ে। সন্তানের জন্য একটি সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা প্রত্যেক পিতামাতার গুরুদায়িত্ব। যাতে এ নামের প্রভাবে পরবর্তী জীবনে সন্তানের স্বভাব-চরিত্রে শুচি-শুভ্রতা ফুটে উঠে। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে :

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَ اَنَّ جَدَّهُ حَزَنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِيْ حَزَنٌ قَالَ بَلْ اَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا اَنَا بِمُغَيِّرٍ اِسْمًا سَمَّانِيْ اَبِيْ قَالَ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ ـ

হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা হায্ন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, আমার নাম হায্ন (শক্ত)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না বরং তোমার নাম হওয়া উচিত 'সাহ্ল' (সহজ সরল)। তিনি উত্তরে বললেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি পরিবর্তন করব না। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, এরপর আমাদের পরিবারে পরবর্তীকালে কঠিন অবস্থা ও পেরেশানী লেগে থাকত।[৪৮]

তাই অর্থ না জেনে নাম রাখা ঠিক নয়। এতে অর্থ বিকৃতি ও হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু নাম রাখার ক্ষেত্রেও অর্থ, প্রয়োগবিধি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিদেশী ভাষার অর্থ জানা, সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে নাম রাখা বাঞ্ছনীয়। বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের নামে নাম রাখাও একটি নিরাপদ পন্থা।

সপ্তম দিনে শিশুর নামকরণ করা উত্তম। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهٖ يُذْبَحُ عِنْدَ يَوْمِ السَّابِعِ وَيُسَمّٰى وَيُحْلَقُ رَأْسُهٗ ـ

হযরত সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবজাতক আকীকার সাথে সম্পৃক্ত থাকে, জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে প্রাণী যবেহ্ করবে, তার নাম রাখবে আর মাথা মুণ্ডন করবে।[৪৯]

নবজাতকের নাম রাখার সময় একটি সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْوَلَدِ عَلٰى وَالِدِهٖ اَنْ يُحْسِنَ اِسْمَهُ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : পিতার উপর নবজাতকের হক তার জন্য সুন্দর নাম রাখা।[৫০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ .

আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রহমান।[৫১]

আল্লাহ্ তা'আলার বহু গুণবাচক নাম রয়েছে। ঐ সমস্ত নামের সাথে 'আবদ' শব্দ যোগ করে নাম রাখা উত্তম। অনুরূপভাবে নবী-রাসূল ও ওলী-বুযর্গগণের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখাও উত্তম।

অজ্ঞাতসারে বা অবহেলাবশত অর্থহীন বা বিদঘুটে কোন নাম রেখে ফেললে তা পরিবর্তন করে একটি সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা অবশ্য কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সাহাবীর ইসলাম-পূর্ববর্তী যুগের রাখা এ ধরনের কোন নাম শুনতে পেলে সাথে সাথে তা পরিবর্তন করে একটি সুন্দর অর্থবোধক ও শ্রুতিমধুর নাম রেখে দিতেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে :

عَنْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ .

হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত জুওয়ারিয়া (রা)-এর পূর্ব নাম ছিল 'বাররাহ'। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম পরিবর্তন করে জুওয়ারিয়া রাখলেন।[৫২]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيَّرَ اِسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ اَنْتِ جَمِيْلَةُ .

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আসিয়া'-এর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন : তোমার নাম হল 'জামীলা'।[৫৩] 'আসিয়া' অর্থ পাপী আর 'জামীলা' অর্থ রূপসী।

অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার ৯৯টি নাম যেগুলো তাঁর সাথেই খাস, আব্দ বা উবায়দ যোগ ছাড়া আলাদাভাবে সে সমস্ত নামে নাম রাখাও নিষিদ্ধ। যে সমস্ত নাম অন্যান্য জাতির উপাস্য ও দেবতাদের সাথে খাস, যেমন আবদুল উয্যা, আবদুল কা'বা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নামে নাম রাখাও নিষিদ্ধ। এ সমস্ত নাম রাখা হারাম। তাই নাম রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।[৫৪]

'মুহাম্মাদ' নামে নামকরণ

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র নাম 'মুহাম্মাদ' নামে নামকরণের বিশেষ ফযীলত

বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূতপবিত্র নাম ধারণ করে কল্যাণ ও বরকত অর্জনের মানসিকতা পোষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কাম্য হওয়া উচিত। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শুভ আবির্ভাবের পূর্বে আরবের বুকে এ নাম ছিল সম্পূর্ণ অশ্রুত। তাঁর আবির্ভাবের পর ইলহামী আদেশপ্রাপ্ত হয়ে পিতৃব্য আবদুল মুত্তালিব 'মুহাম্মাদ' (সর্ব প্রশংসিত) নাম রেখেছিলেন। এ দ্বারা এ নামের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায়। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمَّيْتُمْ مُحَمَّدًا فَلَا تَضْرِبُوْهُ وَلَا تَضْرِبُوْهُ وَلَا تَحْرِمُوْهُ.

হযরত আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : তোমরা কারো নাম মুহাম্মাদ রাখলে তাকে মারধর করবে না আর তার অসম্মানও করবে না।[৫৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন :

مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ اَوْلَادٍ فَلَمْ يُسَمِّ اَحَدَهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدْ جَهِلَ .

যার তিন-তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল, অথচ সে কারো নাম 'মুহাম্মাদ' রাখল না। সে একজন জাহিলের ন্যায় আচরণ করল।[৫৬]

হযরত উসমান উমারী (রা) মারফূ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : 'তোমাদের কারো ঘরে এক, দুই বা তিনজন 'মুহাম্মাদ' থাকলে তার কোন অনিষ্ট হবে না।'[৫৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন যে, 'মুহাম্মাদ' নামে বরকত নিহিত আছে, যে ঘরে 'মুহাম্মাদ' নামের লোক থাকবে সে ঘরে বরকত হবে, যে সমাবেশে 'মুহাম্মাদ' নামের লোক থাকবে সে সমাবেশে বরকত হবে।[৫৮]

মুসলিম নামের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা

মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে নাম রাখা উচিত। নামের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আলিম ক্বারী তৈয়্যব (র) একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, পালক ফেলে দিয়ে একটি মৃত হাঁস দেখে আপনারা কেউ বলতে পারবেন না যে, এটি কি বুনো হাঁস না গৃহপালিত সাধারণ হাঁস। প্রাণী বিজ্ঞানের গবেষণাগারে না গিয়ে এর প্রকার নির্ধারণ খুবই দুরূহ ব্যাপার। মানুষের পোশাক, নাম, আচরণবিধি ইত্যাদির গুরুত্বও এমনই।[৫৯]

বিকৃত নামে ডাকা

অনেক পিতামাতাই আদরের আতিশয্যে সন্তানের জন্য রাখা সুন্দর নামটিকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন। যদ্দরুন অর্থ পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণ নামটিই বিকৃত হয়ে যায়। এরূপ করা অনুচিত। নাম বিকৃত করা প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি কাউকে তার নাম পরিবর্তন করে ডাকবে, আল্লাহ্র ফিরিশ্তারা তার উপর লা'নত করেন।[৬০]

আকীকা

নবজাতক শিশুর নাম রাখার পর কর্তব্য হল ছেলে হলে দু'টি আর মেয়ে সন্তান হলে একটি কুরবানীতে যবেহযোগ্য পশু দ্বারা আকীকা করা। আকীকার দ্বারা সন্তানের উপর থেকে বালা-মুসীবত দূর হয়ে যায়, একটি সুন্নাতের উপর আমল করা হয়। এ ছাড়াও আরো বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে।

ইসলাম-পূর্ববর্তী যুগে আকীকা

আকীকা ইসলাম পূর্ববর্তী যুগেও প্রচলিত ছিল। যদিও তার ধরন-প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকম। এখনও ইয়াহূদীদের মধ্যে আকীকা প্রচলন রয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا تَعُقُّ الْجَارِيَةَ فَعُقُّوْا عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً ۔

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : ইয়াহূদীরা ছেলে সন্তানের জন্য আকীকা করে, মেয়ে সন্তানের জন্য করে না, তোমরা ছেলে সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল আকীকা করবে।[৬১]

عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا وُلِدَ لِاَحَدِنَا غُلَامٌ ذُبِحَ شَاةٌ ۔

হযরত আবূ-বুরায়দাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে আমাদের কারো ছেলে সন্তান হলে আমরা একটি ছাগল যবেহ্ করতাম।[৬২]

আকীকার গুরুত্ব

ইমামগণের ঐকমত্যে 'আকীকা' একটি মুস্তাহাব আমল। তাই নবজাতক সন্তানের পিতার পক্ষে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়পূর্বক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আকীকা করা মুস্তাহাব।[৬৩]

আকীকার সময়

সম্ভব হলে নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও স্বয়ং সপ্তম দিনে আকীকা করতেন। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চতুর্দশতম দিনে আকীকা করবে। তাও সম্ভব না হলে একবিংশতম দিনে, তাও সম্ভব না হলে যে কোন দিন সম্ভব হয় করবে। অবশ্য এক্ষেত্রে জন্মের সপ্তম দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উত্তম।

আকীকার সময়কাল সম্পর্কে হাদীসে রাসূলে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ اُمِّ وَاَبِىْ كُرْزٍ قَالَا نَذَرَتْ امْرَاَةٌ مِنْ اٰلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اِنْ وَلَدَتْ اِمْرَاَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَحَرْنَا جَزُوْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَا بَلِ السُّنَّةُ اَفْضَلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلٰكِنَّ ذٰلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِىْ اَرْبَعَةَ عَشَرَةَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِىْ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ ۔

হযরত কুরয (রা)-র পিতামাতা থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) বংশের একজন মহিলা মানত করল যে, আবদুর রহমান-এর স্ত্রীর কোন সন্তান হলে আমরা একটি উট যবেহ্ করব। হযরত আয়েশা (রা) (এ কথা শুনে) বললেন, এতো হতে পারে না। বরং সুন্নাত হল ছেলে সন্তানের জন্ম হলে দু'টি সমসয়স্ক ছাগল আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল দিয়ে আকীকা করবে। অবশ্য এই আকীকা জন্মের সপ্তম দিনে হলে উত্তম। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চতুর্দশতম দিনে, তাও সম্ভব না হলে একবিংশতম দিনে আকীকা করবে।[৬৪]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهٖ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ۔

হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, নবজাতক নিজ আকীকার সাথে বন্ধক থাকে, তার জন্মের সপ্তম দিন তার নামে একটি আকীকার পশু যবেহ্ করবে।[৬৫]

অত্র হাদীস শরীফের বরাতে তিরমিযী শরীফের টীকার ভাষ্যে উল্লেখ আছে, সকল ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে আকীকার পশু যবেহ্ করা সুন্নাত, সপ্তম দিনে যবেহ্ করা সম্ভব না হলে চতুর্দশতম দিনে যবেহ্ করা, তাও সম্ভব না হলে নবজাতকের জন্মের একবিংশতম দিনে তার নামে আকীকার পশু যবেহ্ করবে।

আকীকার সংখ্যা

নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দু'টি ছাগল, ভেড়া অথবা গরু-মহিষের দুই অংশ আকীকা করবে। আর সন্তান মেয়ে হলে একটি ছাগল, ভেড়া অথবা গরু-মহিষের একাংশ আকীকা করবে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ۔

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে নবজাতক ছেলে সন্তানের জন্য দুইটি সমবয়সী ছাগল আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করার জন্য নির্দেশ করেছেন।[৬৬]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ اُمِّ كُرْزٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ۔

হযরত উম্মে কুরয্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দুইটি ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করবে।[৬৭]

আকীকার পশু ও তার বয়স

আকীকা অনেকটা কুরবানীর ন্যায়। কুরবানীতে যে সমস্ত পশু যবেহ্ করা যায় এবং

কুরবানীর পশুর প্রকারভেদে বয়সের যে তারতম্য লক্ষণীয়, আকীকার পশুর ক্ষেত্রেও হুবহু তাই লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, কুরবানীর জন্য যে ছাগল উপযুক্ত তাই আকীকার জন্যও উপযুক্ত।[৬৮]

বয়স : ছাগল-ভেড়া এক বছর বয়সী; গরু-মহিষ দুই বছর বয়সী এবং উট পূর্ণ পাঁচ বছর বয়সী। অবশ্য এক বছরের কম বয়সী ভেড়াকে যদি এক বছর বয়সী ভেড়ার মত দেখা যায় তাহলে সে ভেড়া দ্বারাও আকীকা জায়িয হবে। কিন্তু অন্য কোন পশুর ক্ষেত্রে গঠন যত পরিপুষ্টই হোক না কেন, নির্দিষ্ট বয়সের চেয়ে একদিন কম হলেও আকীকা জায়িয হবে না।[৬৯]

আকীকা পশুর গোশ্‌ত

কুরবানীর ন্যায় আকীকার পশুর গোশ্‌তও তিন ভাগ করে এক-তৃতীয়াংশ নিজের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ গরীব-মিস্‌কীনদের জন্য সাদাকা করে দিয়ে বাকী এক-তৃতীয়াংশে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া সুন্নাত। অবশ্য ঘরের মানুষ বেশি হলে ইচ্ছা হলে সব গোশ্‌ত ঘরে রেখেও দেওয়া যায়। আবার সব বিলিও করে দেওয়া যায়। আকীকার গোশ্‌ত সচ্ছল আত্মীয়-স্বজনকেও দেওয়া যায়।[৭০]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : হযরত কুরয্‌ (রা)-এর পিতামাতা থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, সুন্নাত ও উত্তম হল নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দুইটি সমবয়সী ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল যবেহ্ করে আকীকা করবে। আকীকার গোশ্‌ত নিজেরাও খাবে এবং সাদাকাও করবে।[৭১]

আকীকার কল্যাণসমূহ

১. আকীকার মাধ্যমে দানশীলতার বিকাশ ঘটে। গরীব, মিস্‌কীন ও আত্মীয়-স্বজনের হক্ আদায় হয়। পরস্পরে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আপসে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়।

২. আকীকার আরো একটি হিক্‌মাত হল ইসলাম-পূর্ববর্তী যুগে নাসারাদের কোন সন্তান জন্ম হলে তাকে কয়লা রঙের পানি দ্বারা রাঙিয়ে দেওয়া হতো। তারা বলত যে, এ দ্বারা শিশু নাসারা হয়ে যায়, তাদের এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً .

আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহ্‌র রঙ (দীন), রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর ? (সূরা বাকারা, ২ : ১৩৮)

অতএব নাসারাদের এই প্রথার বিপরীতে ইসলামে উত্তম প্রথা থাকা যুক্তিসঙ্গত।

অন্যের পক্ষ থেকে আকীকা

কোন পিতামাতার নিজ সন্তানের জন্য আকীকা করার সামর্থ্য না থাকলে অন্য কেউ তাদের পক্ষ থেকে আকীকা করে দিতে পারে। আর তা একটি বড় ইহ্‌সান এবং একটি সৎকাজে সহায়তা দানও বটে। যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অনেক সাওয়াবের আশা করা যায়। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ .

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসান-এর জন্য একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করেছিলেন।[৭২]

উত্তম আকীকা

যদিও কুরবানীর উপযুক্ত সমস্ত প্রাণী দ্বারা আকীকা করা যায় কিন্তু বক্‌রী দ্বারা আকীকা করা উত্তম। এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

نَذَرَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْ اٰلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اِنْ وَلَدَتْ اِمْرَاَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَحَرْنَا جَزُوْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ بَلْ السُّنَّةُ اَفْضَلُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর পরিবারের এক মহিলা মানত করল যে, আবদুর রহমান-এর স্ত্রীর ঘরে কোন নবজাতকের জন্ম হলে আমরা উট যবেহ্ করে আকীকা করব। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এ হতে পারে না। বরং সুন্নাত এবং উত্তম হল নবজাতক ছেলে হলে দু'টি সমবয়সী ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল যবেহ্ করবে।[৭৩]

নবজাতকের পক্ষ থেকে আকীকা না করলে, নবজাতক বিভিন্ন প্রকার রোগ-বালাই ও বালা-মুসীবতে লিপ্ত থাকে, যার একমাত্র প্রতীকার হল আকীকা করা, এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : নবজাতক নিজ আকীকার সাথে বন্ধক থাকে।[৭৪]

আকীকার কুসংস্কার

আকীকায়ও অনেক কুসংস্কার বিদ্যমান। আকীকার দিন ছেলে হলে দু'টি ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল যবেহ্ করা, যবেহ্কৃত পশুর গোশ্ত কাঁচা অথবা রান্না করে বিতরণ করা শিশুর মাথা মুণ্ডন করে চুলের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য বা তৎমূল্য খয়রাত করা প্রভৃতি কাজকর্ম সুন্নাত ও মুস্তাহাব। এছাড়া অন্যান্য প্রচলিত প্রথাসমূহ ইসলামী শরী'আতে মূল্যহীন ও অযথা কাজ।

আকীকা উপলক্ষে প্রচলিত কুসংস্কারসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল :

১. অনেকেই মনে করে যে, আকীকার গোশ্ত দাদা-দাদী ও নানা-নানী খেতে পারে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

২. আরো একটি কুসংস্কার হল, সন্তানের মাথার চুল মুণ্ডানোর জন্য যখন মাথার উপরে ক্ষুর টানা হবে ঠিক সেই মুহূর্তে আকীকার জন্তু যবেহ্ করতে হবে। এ ধারণাও ঠিক নয়।

৩. আকীকা উপলক্ষে নবজাতকের নানার বাড়ির পক্ষ হতে কিছু পোশাক, খাবার ও সহায়ক সামগ্রী প্রেরণের একটি কুসংস্কার চালু আছে। এ ক্ষেত্রে প্রধান মন্দের দিকটি হল উপস্থিত সময়ে নানার পরিবারের সঙ্গতি না থাকলেও প্রথা অনুযায়ী উপহার সামগ্রী অবশ্যই পাঠাতে হবে। অর্থাৎ একটি অপ্রয়োজনীয় কাজ এমন গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করা হয় যে, এ ক্ষেত্রে শরী'আতের কোন বিধান লংঘন হয়েছে কিনা তাও লক্ষ্য করা হয় না। আর এই

দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়্যাত থাকে সেই সুনাম ও সুখ্যাতি এবং অহংকার প্রদর্শন যা একটি পরিষ্কার হারাম কাজ।

৪. আকীকা উপলক্ষে লেনদেন আকীকার ক্ষেত্রে আরেকটি কুসংস্কার। যে সন্তানের আকীকা করা হয় তার মাথার চুল কামানোর পর মহল্লাবাসী পুরুষ ও বন্ধু-বান্ধব মিলে একটি বাটিতে চাঁদা সংগ্রহ করেন। এ চাঁদা সংগ্রহ করা পরিবারের কর্তার একটি পবিত্র দায়িত্ব মনে করা হয় এবং নাপিতকে এ সংগৃহীত চাঁদা প্রদান করা হয়। এসব কুপ্রথা অবশ্যই বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

৫. আকীকার সময় বোন-ভাগ্নিকে উপহার প্রদান : আকীকার সময় আবশ্যিকভাবে বোন-ভাগ্নিকে পুরস্কৃত করার প্রথাগুলোও শরী'আতের বহির্ভূত কাজ। সুতরাং তা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

আকীকার গোশ্‌তের সাথে যে সকল হাড় রান্না করা হয়, আহার করার সময় তা দাঁতে চিবিয়ে ভেঙ্গে বা অন্য কোন উপায়ে ভগ্ন করা বিধি বহির্ভূত মনে করা হয়। তাই তা অনেকেই আস্ত রেখে দেয়, তাও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত।[৭৫]

আকীকার দু'আ

আকীকার পশু যবেহ্ করার সময় এ দু'আ পড়বে :

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِیْقَةُ ابْنِ فُلَانٍ دَمُوْهَا بِدَمِهٖ لَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّاَبِیْ وَاُمِّیْ مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَرُ.

শিশুর মাথা মুণ্ডানো

নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিন আকীকার পশু যবেহ্ করার পূর্বে তার মাথা মুণ্ডন করা মুস্তাহাব। তারপর কর্তিত চুলের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য অথবা তার মূল্য সাদাকা করাও মুস্তাহাব। এই মাথা মুণ্ডন কাজ আকীকার পূর্বেই সমাধা করতে হয়। হাদীস শরীফে নবজাতকের মাথার চুলকে তার জন্য কষ্টদায়ক বস্তুরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তা ফেলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغُلَامِ عَقِیْقَةٌ فَاهْرِیْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِیْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰی.

হযরত সালমান ইব্‌ন আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নবজাতকের পক্ষ থেকে এক-একটি আকীকা জরুরী, তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পশু যবেহ্ করবে। আর তাদের থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করবে।[৭৬]

হযরত হাসান (রা) বর্ণনা করেছেন যে, অত্র হাদীসে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করার অর্থ হল মাথার চুল মুণ্ডানো।[৭৭]

অন্য হাদীসে ইরশাদ রয়েছে :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَطِمَةُ اِحْلِقِيْ رَاْسَهُ.

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসান-এর পক্ষ থেকে একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করেছেন, আর ইরশাদ করেছেন : হে ফাতিমা, হাসান-এর মাথা মুড়িয়ে দাও।[৭৮]

আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে আকীকার পশুর রক্ত দ্বারা নবজাতকের মুণ্ডিত মস্তক রঞ্জিত করে দেওয়া হত। ইসলামের আবির্ভাবের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ গর্হিত কর্ম নিষিদ্ধ করে দেন।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَاْسُهُ بِدَمٍ .

হযরত আবদ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : নবজাতকের পক্ষ থেকে আকীকা করবে, কিন্তু নবজাতকের মস্তক আকীকার পশুর রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করবে না।[৭৯]

শিশুর মুণ্ডিত মস্তকে সুগন্ধি মাখা

অবশ্য রক্ত রঞ্জিত করার পরিবর্তে মুণ্ডিত মস্তকে জাফরান প্রভৃতি সুগন্ধি মাখা সুন্নাত। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ اَبِيْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا وُلِدَ لِاَحَدِنَا غُلَامٌ ذُبِحَ شَاةٌ وَلَطَخَ رَاْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَاْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ .

হযরত আবূ বুরায়দাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে আমাদের কারো নবজাতক সন্তান হলে তার জন্য একটি ছাগল যবেহ্ করা হত, আর তার রক্ত দ্বারা নবজাতকের মস্তক রঞ্জিত করে দেওয়া হত। পরে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দীনে ইসলাম দ্বারা ধন্য করলে আমরা নবজাতকের আকীকার জন্য একটি ছাগল যবেহ করতাম, তার মস্তক মুড়িয়ে দিতাম এবং মুণ্ডিত মস্তকে জাফরান মাখিয়ে দিতাম।[৮৭]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا عُقِرَ عَنِ الصَّبِيِّ خُضِبَ قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيْقَةِ فَاِذَا حَلَقُوْا رَاْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوْهَا عَلَى رَاْسِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِجْعَلُوْهَا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوْقًا .

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে কোন নবজাতকের আকীকা হলে কিছু তুলা আকীকার পশুর রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করে দেওয়া হত। আর নবজাতকের মাথা মুড়ানো হলে আকীকার পশুর রক্ত তার মস্তকে ঢেলে দেওয়া হত আর (ইসলামের আবির্ভাবের পর) রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন : নবজাতকের মুণ্ডিত মস্তকে তোমরা আকীকার প্রাণীর রক্তের পরিবর্তে খালূফ মাখবে। (ইব্‌ন হিব্বান, পৃ. ২২)

'খালূফ' একটি মিশ্রিত সুগন্ধি যা জাফরান প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

শিশুর মাথা মুণ্ডানোর হিকমাত

আল্লামা ইব্‌ন কাইয়্যম (র) স্বীয় কিতাব 'তুহ্‌ফাতুল মাউলূদ'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মাথা মুড়ানোর হিকমাত হল এ দ্বারা শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, চুলের গ্রন্থি খুলে যায় যদ্বারা চুলের উৎসস্থলে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি এবং শ্রবণশক্তিও বৃদ্ধি পায়।[৮১]

শিশুর মাথা মুণ্ডানোর পর সাদাকা

নবজাতকের মাথা মুণ্ডানোর পর তার চুলের সমপরিমাণ রৌপ্য বা তৎমূল্য সাদাকা করা মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَطِمَةُ اِحْلِقِىْ رَاْسَه اِصْدِقِىْ بِوَزْنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا اَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ ٠

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসান-এর পক্ষ থেকে একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করেছিলেন আর বলেছিলেন : হে ফাতিমা ! হাসান-এর মাথা মুড়িয়ে দাও আর তার চুলের সমপরিমাণ ওজনে রৌপ্য সাদাকা করে দাও। [হাদীসের রাবী হযরত আলী (রা) বলেন] তারপর আমি হাসান-এর কর্তিত চুল ওজন করে দেখলাম যে, সেগুলোর ওজন ছিল এক দিরহাম বা তার অংশবিশেষের ওযনের সমান।[৮২]

শিশুর প্রথম কালাম

শিশু যখন কথা বলতে শিখে তখন তাকে সর্বপ্রথম 'কালেমায়ে তাইয়্যিবা শিক্ষা দেবে। যার প্রভাব তার সমগ্র জীবনে প্রতিফলিত হওয়ার আশা করা যায়। তাছাড়া জীবনের ঊষালগ্নেই শিশুকে নিজ সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সেই সৃষ্টিকর্তা যে শরীকবিহীন, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয়, এই পরিচয় দিয়ে দেওয়া প্রত্যেক অভিভাবকের নৈতিক দায়িত্ব।

এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِفْتَحُوْا عَلٰى صِبْيَانِكُمْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ ٠

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : তোমরা নিজ নিজ শিশুকে সর্বপ্রথম কথা শিখাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'।[৮৩]

শিশুর খাৎনা

মুসলিম শিশুর জন্য পিতামাতার প্রতি আরো কর্তব্য হল উপযুক্ত বয়সে তার খাৎনা করা। পুরুষাঙ্গের সম্মুখ উপরিঅংশের অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলাকে খাৎনা বলে। খাৎনা করা সুন্নাত। এটি ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক আমলও বটে। খাৎনা সুন্নাতে ইব্‌রাহিমী এবং ফিৎরাত-এরও অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ ... .

ফিৎরাত তথা স্বভাবজাত কাজ পাঁচটি। তন্মধ্যে একটি হল খাৎনা করা।[৮৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ইরশাদ করেন :

عَشْرٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ الخ .

দশটি আমল নবী-রাসূলগণের সুন্নাত, ১. খাৎনা করা, ২. আতর ব্যবহার, ৩. মিস্‌ওয়াক করা, ৪. বিবাহ করা ... (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)।[৮৫]

সুন্নাতে খাৎনা প্রাচীনকাল থেকেই একটি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় বিধানরূপে প্রচলিত। খাৎনার মধ্যে বহু উপকারিতা নিহিত রয়েছে। খাৎনা না করলে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। ত্বকের ভিতর জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার না করা হলে তা বিষাক্ত হয়ে অনেক সময় ফুটো হয়ে যায়। উপরে ফুটো হলে তাকে বলা হয় 'ফাইমাসিস' (Phimosis) আর নিচে ফুটো হলে তাকে বলা হয় 'প্যারাফাইমাসিস' (Paraphimosis)। এ রোগ হলে উপরের বাড়তি চামড়া কেটে না ফেললে চামড়ায় পচন ধরতে পারে। স্ত্রী সহবাসে অসুবিধা হয়। এর ময়লার সাথে জমে থাকা বিভিন্ন রোগ জীবাণু স্ত্রীর জরায়ুতে লেগে নানা রকম রোগ-বালাই দেখা দিতে পারে। লিঙ্গের মাথায় মাংস জমে প্রশ্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে বিধায় এ অবস্থায় ক্যান্সারের মত মারাত্মক ব্যাধিও হতে পারে। খাৎনা না করালে চামড়ার ভাঁজে প্রশ্রাব ও বীর্য প্রভৃতি আটকে থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।[৮৬]

চিকিৎসকগণের মতে খাৎনাবিহীন পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার বেশি হয় এবং এ শ্রেণীর স্বামীদের স্ত্রীদেরও মধ্যে ক্যান্সার তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। খাৎনায় ফোরস্কীন বা বাড়তি অপ্রয়োজনীয় চামড়াটুকু পুরুষাঙ্গের মাথা থেকে কেটে ফেলা হয়।

ইসলামের খাৎনা বিধান বিজ্ঞানসম্মত এবং জীবনভিত্তিক। তাছাড়া খাৎনাকৃত পুরুষ তার যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে পারেন অতি সহজেই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

শিশুর খাৎনার সময়কাল

অধিকাংশ মুসলিম মনীষীর মতে, শৈশবকালে খাৎনা করা সুন্নাত। কেননা কিছুকাল পরেই তাকে শরী'আতের বিধি-নিষেধ পালন করতে হবে। আর সাবালকত্বে পৌঁছার পর সে যেন খাৎনাকৃত অবস্থায় থাকে। অবশ্য কোন অনিবার্য কারণবশত বয়োপ্রাপ্তির পরে করানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও খাৎনা করিয়ে নিতে হবে।[৮৭]

খাৎনা যেহেতু ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং তার পরিচয়জ্ঞাপক আমলও বটে। তাই খাৎনাকে কোন অবস্থাতেই এড়িয়ে চলার অবকাশ নেই। অবশ্য বয়োপ্রাপ্তির পর খাৎনাকালে পরপুরুষের সামনে গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত করার অনুমতি শুধুমাত্র প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রদান

করা হয়েছে। তাই খাৎনাকারীর জন্যও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর দেখা বৈধ হবে না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ اَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا ‌.

কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সে যেন অবশ্যই খাৎনা করিয়ে নেয়, যদিও সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।[৮৮]

খাৎনার কুসংস্কার

খাৎনা একটি শরীআত এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিধান। যেহেতু খাৎনার সাথে লজ্জা এবং সংকোচের বিষয়টিও জড়িত, তাই কম বয়সে খাৎনা করা ভাল। খাৎনা অনুষ্ঠানে সকল প্রকার আড়ম্বর ও লৌকিকতা বর্জন করাই উত্তম। মুসনাদে আহ্মাদে হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন ব্যক্তি হযরত উসমান ইব্ন আবিল আ'স (রা)-কে খাৎনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তথায় যেতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনকালেও এ ধরনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতাম।[৮৯]

এ হাদীস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ কাজের প্রচার শরী'আতের দৃষ্টিতে অনাবশ্যক।

মায়ের দুধ পান করানো সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ বিষয়ে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ‌.

মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৩)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِىْ عَامَيْنِ ‌.

আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে। এরপর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ‌.

আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলাম, তাকে দুধ পান করাও। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৭)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ‌.

তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও দুধ ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। (সূরা আহ্কাফ, ৪৬ : ১৫)

উপরের আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, শিশুকে পূর্ণ দুই বছর মায়ের দুধ পান করাতে পারবে। প্রয়োজনে আরও ছয়মাস সময় বাড়ানো যেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও রয়েছে যে, শিশুকে কম-বেশি দুই বছরই দুধ পান করানো উচিত। মা বা শিশুর শারীরিক অসুস্থতার অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিশুকে বুকের দুধ পান থেকে বিরত রাখার কথা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমাদের সন্তানদের দেহপসারিণী ও পাগলিনীর দুধ পান করানো থেকে দূরে রাখ।[৯০]

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে জানা যায়, দেহপসারিণীর দুধ পানে শিশু 'হেপাটাইটিস বি ভাইরাস' এমনকি এইডস ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

মাতৃদুগ্ধ পান করানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করে রাসূলে করীম (সা) আরও বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلٰى ۔

আল্লাহ্ মুসাফিরের উপর থেকে চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের অর্ধেক রহিত করে দিয়েছেন। আর মুসাফির, স্তন্যদানকারী ও গর্ভবতী মহিলা থেকে রমযানে রোযা রাখার বাধ্যবাধকতাও উঠিয়ে দিয়েছেন।[৯১]

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর শাসনামলের প্রথমদিকে যেহেতু মাতৃদুগ্ধ পানরত শিশুরা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আর্থিক অনুদান পেত না, সেহেতু মায়েরা শিশুদের জন্য অনুদান পাওয়ার আশায় তাড়াতাড়ি বুকের দুধ খাওয়ানো ছাড়িয়ে দিতেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে হযরত উমর (রা) শিশুদেরকে বুকের দুধ দানে মায়েদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জন্মের পর থেকেই এই আর্থিক অনুদান চালু করেন।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দানের ব্যাপারে যে গুরুত্বের কথা বলছে, সে গুরুত্বের কথা ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগেই ঘোষণা করেছে। আজকে বিশ্বব্যাপী মাতৃদুগ্ধ দানের ব্যাপারে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, এমনকি বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর পহেলা আগস্ট 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস' পালিত হচ্ছে, তা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন।

শিশুর জন্য মায়ের দুধ অপরিহার্য। মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানযুক্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন তৈরি খাবার যা শিশু সহজেই হজম করতে পারে এবং শিশুর শরীর সহজেই কাজে লাগিয়ে দেহের বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দেহের খাদ্য চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, মায়ের বুকের দুধের উপাদানে অনুরূপ পরিবর্তন প্রতিদিনই ঘটতে থাকে। তাই শিশুর জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই। যে তাপমাত্রায় বাচ্চার শরীর সহজেই এই দুধকে গ্রহণ করে কাজে লাগাতে পারে, বুকের দুধে ঠিক সেই তাপমাত্রাই পাওয়া যায়। মায়ের বুকের দুধে বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধক উপাদান থাকে। যেমন আই. জি.এ (IGA), ল্যাকটোফেরিন এবং লাইসোজাইম। এছাড়াও মায়ের দুধে প্রচুর শ্বেত রক্তকণিকা থাকে সেগুলো আবার IGA, ল্যাকটোফেরিন, লাইসোজাইম, ইন্টারফেরন তৈরি করে। বাইফিডস ফ্যাক্টর নামে আরও একটি পদার্থ মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায়। এগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ

করে। যার ফলে শিশুর ডায়রিয়া, কানপাকা রোগ, শ্বাসনালীর রোগ কম হয়। এছাড়াও মাতৃদুগ্ধ পানে হৃৎপিণ্ডের রোগ, করোনারী হার্ট ডিজিজ, খাদ্যনালীর রোগ ইত্যাদি প্রতিরোধ করে। মায়ের দুধ পানে শিশুর চেহারায় লাবণ্য সৃষ্টি করে, বাকশক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে। যারা শিশুকে বুকের দুধ পান করান তাদের জরায়ু তাড়াতাড়ি গর্ভধারণের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ফলে তলপেটের থলথলে ভাব ক্রমান্বয়ে চলে যায়। দ্বিতীয়ত গর্ভধারণের সময় শরীরে যে চর্বি জমা হয় তা শিশুকে দুধ পান করালে নিঃশেষ হয়ে যায়। আর তা মায়ের শারীরিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রসব পরবর্তী স্রাব তুলনামূলক অনেক কম হয়। যে মায়েরা শিশুকে দুধ পান করান তাদের স্তন ক্যান্সারের হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়।

এছাড়াও মাতৃদুগ্ধদানের ভিতর দিয়ে মা ও শিশুর মাঝে এমন একটি মানসিক বন্ধন রচিত হয় যা চিরস্থায়ী।

কৃত্রিম দুধের অপকারিতা

কৃত্রিম দুধ বানানো হয় পানি মিশিয়ে এবং পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন পাত্রে রেখে। এ ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় বিশেষ ধরনের দুধের বোতল এবং রবারের নিপ্‌ল। কৃত্রিম দুধ বলতে আমরা সচরাচর কৌটার গুঁড়া দুধকেই বুঝে থাকি। অবশ্য গরুর দুধ এবং ছাগলের দুধকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কেননা এগুলোর কোনটাই শিশুর শরীরের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ তাপমাত্রায় এবং উপাদানে পাওয়া যায় না। দিনে দিনে শিশুর শরীরের চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, কৃত্রিম দুধ দ্বারা তা পূরণ সম্ভব নয়। যেহেতু কৃত্রিম দুধে পানি মিশাতে হয় এবং বাচ্চার মুখে দুধ প্রবেশ করানোর আগ পর্যন্ত বিভিন্ন পাত্রের সাহায্য নিতে হয়, সেহেতু রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমণের বিরাট সম্ভাবনা এতে থেকে যায়। ঠিক সে কারণে দেখা যায়, যারা বোতলের দুধ খায়, সে সমস্ত বাচ্চার মধ্যে ডায়রিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। গবেষণালব্ধ তথ্যে দেখা যায় যে, জন্মের পর প্রথম চার থেকে ছয় মাস পর্যন্ত কৃত্রিম দুধ পানকারী শিশুদের ডায়রিয়ার প্রকোপ মায়ের দুধপানকারী শিশুদের তুলনায় ত্রিশগুণ বেশি। মায়ের বুকের দুধ ছাড়া অন্য কোন দুধ পান করলে এতে শিশুর এলার্জি সৃষ্টি হতে পারে। এর কারণে তাদের মধ্যে একজিমা, এজমা এবং খাদ্যনালীর ব্যথা দেখা দেয়। বর্তমানে শিশুদের ডায়াবেটিস-এর অন্যতম কারণ হিসেবে গরুর দুধের আমিষকে চিহ্নিত করা হয়। কৃত্রিম দুধে শিশুর শরীর অতিরিক্ত মোটা হয়ে যায় এবং এ থেকে হৃদরোগও সৃষ্টি হতে পারে।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খাদ্য ও পানীয় নির্বাচন

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সাধারণত প্রথম চার থেকে ছয় মাস পর্যন্ত শিশুরা মায়ের দুধ পান করবে। ছয় মাস থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি পাকা কলা, সিদ্ধ আলু ও ডিম, সুজি, পায়েস ইত্যাদি খেতে থাকবে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে খিচুড়ি, ভাত, রুটি ও অন্যান্য খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দুই থেকে আড়াই বছরের সময় দুধ ছেড়ে দিবে। তখন অন্যান্যদের মতই সব ধরনের খাবার গ্রহণ করবে। প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় অবশ্যই যেন শাক-সব্জি থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি

রাখতে হবে। টাট্‌কা শাক-সব্‌জির উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং লবণের ব্যবহার সীমিত রাখতে হবে। যেটুকু লবণ ব্যবহার করতে হবে তা যেন আয়োডিনযুক্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করাতে হবে। আর এর ভিতর দিয়েই খাদ্যের যে ছয়টি মৌলিক উপাদান অর্থাৎ আমিষ, শ্বেতসার বা শর্করা, স্নেহজাতীয় খাদ্য, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, খণিজ লবণ এবং পানি প্রয়োজনমত গৃহীত হবে। এতে শরীরের গঠন এবং ক্ষয়পূরণই শুধু নিশ্চিত হবে না, বরং রোগ-ব্যাধির প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ـ

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমি প্রচুর বারিবর্ষণ করি। এরপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করি এবং এতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, শাক-সব্‌জি, জলপাই, খেজুর, বহুবৃক্ষ-বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। এটা তোমাদের এবং তোমাদের গবাদিপশুর ভোগের জন্য। (সূরা আবাসা, ৮০ : ২৪-৩২)

আর এক আয়াতে বলা হয়েছে :

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১৯)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ ـ

তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। খেজুরগাছ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন এবং আনারও সৃষ্টি করেছেন, এগুলো একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন এর ফল আহার করবে। (সূরা আন'আম ৬ : ১৪১)

এছাড়াও সূরা বাকারা, ২ : ২২, সূরা আন'আম, ৬ : ৯৯, সূরা নাহল, ১৬ : ১১, সূরা লুকমান, ৩১ : ১০ এবং সূরা ক্বাফ, ২৫ : ৯ নং আয়াতে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের গুরুত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি একবার নবী (সা)-কে দেখলাম, তাঁর সামনে রান্না করা তরকারি রাখা হল। এতে ঝোলের মধ্যে কদু ও শুক্‌না গোশত ছিল। আমি দেখলাম তিনি খুঁজে খুঁজে কদু তুলে নিচ্ছেন ও খাচ্ছেন।[৯২]

আহার কখন গ্রহণ করা হবে এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আমরা এমন এক জাতি যে, আমরা ক্ষুধা না লাগা পর্যন্ত খাই না এবং যখন খাই উদর পূর্তি করে খাই না।[৯৩]

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী মায়ের খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা

গর্ভবতী ও যে মা শিশুকে দুগ্ধদান করছেন তার খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইসলামে বিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী মায়ের জন্য রমযান মাসের রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছেন।[১৪]

হাদীসের এই বাণী থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য রোযার বিধান সহজ করে দিয়েছেন। এ সময়ে মায়েদের বিশেষ পুষ্টির প্রয়োজন। গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অধিক পরিমাণ আহার আবশ্যক। তাকে মাছ, গোশ্ত, ডিম, দুধ ইত্যাদি খাওয়ানো যাবে না, এটি একটি কুসংস্কার। এসব কুসংস্কার বর্জন করা উচিত।

শিশুর নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম

শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। শান্তি বা যুদ্ধ উভয় অবস্থায়ই শিশুর জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ

আর তোমরা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করো না। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫১)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ ٠

যারা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে, অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৪০)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ٠

তারা যে ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। (সূরা নিসা, ৪ : ৯)

কুরআন মজীদের এ সমস্ত আয়াতে শিশুর জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। শিশুর নিরাপত্তার ব্যাপারে নবী কারীম (সা)ও বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : 'কোন ব্যক্তির পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার পোষ্যদের ক্ষতি সাধন করে।'[১৫]

শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতা

একটা শক্ত মজবুত ইমারত গড়তে হলে শক্ত মজবুত ভিত্তির প্রয়োজন। মানব জীবনের ভিত্তি হচ্ছে শৈশবকাল। শৈশবকালে দেহ ও মনকে যদি রোগমুক্ত রাখা যায় তাহলে পরিণত বয়সে সে একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করবে বলে আশা করা যায়। এ কারণেই সন্তান জন্মলাভের পর থেকেই শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ তাকীদ রয়েছে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে প্রথম সোপান হল শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দান। হাদীস গ্রন্থ তিরমিযীতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম যে নি'আমত সম্পর্কে বান্দাকে প্রশ্ন করবেন তা হল সুস্থতা। কিয়ামতে তাকে প্রশ্ন করা হবে, "আমি কি

তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দেইনি"?[৯৬] এই সুস্থতার ব্যাপারে শিশুদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অধিক যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। কারণ আজকার একজন সুস্থ শিশু আগামী দিনের সুস্থ সবল একজন নাগরিক। একটি সুস্থ জাতি গঠনে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরী।

রোগব্যাধি থেকে সতর্কতা অবলম্বনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

রোগব্যাধি থেকে সতর্কতা অবলম্বনে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আজকের বিশ্বে এ কথা বলা হয় "Prevention is better than cure" রোগ-প্রতিরোধ রোগ নিরাময় থেকে শ্রেয়। শুধু তাই নয়, বর্তমানে এ কথাও বলা যায় যে, "Prevention is Cheaper than cure", রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে নিরাময়ের চাইতে সস্তা। এ কারণেই ইসলাম এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পানপাত্রের মধ্যে নিশ্বাস ফেলতে ও তার মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।[৯৭] এটাও এক ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। কারণ নাক ও মুখের ভিতর অনেক ধরনের রোগজীবাণু থাকতে পারে, যেগুলো পানিকে দূষিত করে থাকে। আর এতে দেহের মধ্যে রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ .

তার (মৌমাছির) উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় (মধু) যাতে মানুষের জন্যে রয়েছে আরোগ্য। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৬৯)

কালোজিরা সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, কালোজিরার মধ্যে মৃত্যু ব্যতীত আর সমস্ত রোগের আরোগ্য রয়েছে।[৯৮] বর্তমানে মধু ও কালোজিরা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা হচ্ছে। রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নিরাময়ে এর যে অপরিমেয় শক্তি তা ক্রমশ আবিষ্কার হচ্ছে। ইসলামে পুত্র সন্তানদের খাৎনা করানোর যে নিয়ম এটা তাকে বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দাঁত ও মুখ সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী। পক্ষান্তরে দাঁত ও মুখ অপরিষ্কার থাকলে এতে বিভিন্ন প্রকারের রোগব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁত ও মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : আমি যদি মানুষের জন্য এটা কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাযের উযূর সাথে মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[৯৯] উযূর মধ্য দিয়ে দিনে পাঁচবার কনুই থেকে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত, পায়ের কব্জি থেকে পায়ের আঙ্গুল পরিষ্কার করা সম্ভব হয়। নাক, মুখ, কান ও চোখ দিনে পাঁচবার পরিষ্কার করা সম্ভব হয়ে থাকে। এর ফলে এই সমস্ত অঙ্গে-শরীরে কোন ধূলিকণা বা রোগজীবাণু লেগে থাকতে পারে না। ইসলামে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে মানুষ হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মত ভয়াবহ রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে। নিরাময় সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার নিরাময়ের ব্যবস্থা দেননি।[১০০]

জন্মের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শিশুকে নিয়মিতভাবে মারাত্মক কয়েকটি রোগের প্রতিরোধক টিকা অবশ্যই দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদীস স্মরণ রাখতে হবে যে, রোগও আল্লাহ্র সৃষ্টি আর নিরাময়ের ব্যবস্থাও তাঁরই। যদি জ্বর হয় তাহলে জ্বর কমানোর জন্য আধুনিক বিশ্বের চিকিৎসা হল ঠাণ্ডা পানি দিয়ে শরীর ধুয়ে ফেলা কিংবা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গা মুছে ফেলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্ট, তাই পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।[১০১]

শিশুর জীবনরক্ষা ও পরিবর্ধনে পিতামাতার দায়িত্ব

শিশুদের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যদি আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে অধীনস্থদের উপর কর্তৃত্ব দান করেন আর সে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত থাকে তাহলে জান্নাতের ঘ্রাণ তার নসীব হবে না।[১০২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং এ সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আর স্ত্রী স্বামীর ঘর-সংসার এবং সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।[১০৩]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১০৪]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে শিশুর জীবন রক্ষা ও পরিবর্ধনে পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। একটা শিশুকে পরিপূর্ণ মানবে রূপান্তর এবং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পিতামাতার দায়িত্ব সর্বাধিক।

শিশুর সুন্দর জীবন গঠনে সচেতনতা

শিশুর জীবন সুন্দর করে গড়ে তোলার ব্যাপারে সকলকেই সচেতন থাকতে হবে। কেননা শিশুরা হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত। কাজেই শৈশবেই শিশুকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যেন শিশু প্রশংসনীয় সুন্দর চরিত্রে সজ্জিত হয়ে গড়ে উঠতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদের মহৎ করে গড়ে তোল এবং তাদেরকে উত্তম আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।[১০৫]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সন্তানকে আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এক সা' পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী সাদাকা করা থেকে উত্তম।[১০৬]

একটি সুন্দর ব্যক্তি-জীবন কিভাবে গড়া যেতে পারে উপরিউক্ত হাদীসগুলোর মধ্যে তার দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। শিশু জীবনের সূচনা থেকেই এমনভাবে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যাতে তার চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। পাশাপাশি কঠোর অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের মাধ্যমেই যে সাফল্য পাওয়া যায় সেটিও তাকে যথাযথভাবে শিখাতে হবে। শৈশবকাল হচ্ছে মানব জীবনের ভিত্তিভূমি এবং এ সময় তাকে যা শিখানো হবে সেটি তার কোমল মনের উপরে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করবে। শৈশবের এই শিক্ষাই পরবর্তীকালে সুন্দর জীবন গড়তে তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

শিশুর শিক্ষা

শিশু যখন মায়ের কোলে, তখন থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। মনীষীদের উক্তি বলে কথিত আছে যে, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত তোমরা ইল্ম অন্বেষণ করবে।'

শিশু মায়ের কোলে থাকাকালীন তাকে আল্লাহ্র নাম শিখাবে। নবী-রাসূলগণের নাম শিখাবে। নবী-রাসূল এবং আওলিয়া কিরামের কাহিনী শুনাবে। ইসলামের সুমহান শিক্ষার কথা সুমধুর ভাষায় শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দিবে। মায়ের মিষ্টি মিষ্টি কথা শিশুর অন্তরে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। শিশুদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা দিবে। ছেলেমেয়েদের হাত দ্বারা গরীব-মিস্‌কীনকে দান করার অভ্যাস করাবে। তাদের হাত দিয়ে ভাইবোনদের খাদ্যদ্রব্য বন্টন করাবে। অধিক ভোজনের অপকারিতার কথা ছেলেমেয়েদের শুনাবে। ছেলেমেয়েদের জোরে চীৎকার করে কথা বলতে বারণ করবে। বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে খুবই লক্ষ্য রাখবে।

দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের সাথে নিজের ছেলেমেয়েদেরকে মিশতে দিবে না। মিথ্যা ও অহেতুক কথা এবং চোগলখোরী ইত্যাদি ধরনের অন্যায় অশালীন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। শিশুদের অধিক পরিমাণ ঘুমাতে দিবে না এবং ফজরের নামাযের পূর্বে তাদের নিদ্রা ত্যাগ করবার অভ্যাস করাবে। বয়স সাত বছর হওয়ার সাথে সাথে নামাযের অভ্যাস করাবে। মক্তবে যাওয়ার বয়স হওয়ামাত্র তাদেরকে সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিবে। ছেলেমেয়েদেরকে গান-বাজনা, টিভি-সিনেমা এবং অশ্লীল নভেল নাটক জাতীয় পুস্তকাদি পড়া থেকে বিরত রাখবে। ছেলেমেয়েদেরকে নিজেদের কাজ যথাসম্ভব নিজ হাতে করবার অভ্যাস করাবে। ছেলেমেয়েদেরকে খাওয়া-দাওয়া এবং মাহফিল-মজলিস ও লোকসমাজে উঠাবসার আদব-কায়দা রীতি-নীতি শিক্ষা দিবে। তারা ভাল কাজ করলে তাদের প্রশংসা করবে এবং ধন্যবাদ দিবে। আর মন্দকাজ করলে তাদেরকে মৃদু শাসন করবে।[১০৭]

পারিবারিক পরিবেশে শিশুর শিক্ষা

ইসলামে পরিবার হচ্ছে গোটা সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক। সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে বা জাতীয় জীবনে সঠিক ভূমিকা পালনের মৌলিক শিক্ষা লাভ করা হয় পারিবারিক পরিবেশে। পরিবারে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক, স্বামীর উপর স্ত্রীর হক, সন্তানের উপর পিতামাতার হক, পিতামাতার উপর সন্তানের হক, ভাইবোনের পারস্পরিক হক্ ইসলামে নির্ধারিত রয়েছে। এরই আলোকে শিশুর দৈনন্দিন জীবনের কর্মধারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বৃহত্তর পরিবেশে সে যে অবদান রাখবে তার প্রশিক্ষণ ঘটে এই ক্ষুদ্রতর অথচ বহুমাত্রিক পরিবেশে।

মহান আল্লাহ্র বাণী :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

হে মু'মিনগণ ! তোমরা যা করো না তা কেন বল ? (সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ : ২)

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, সততা, পরোপকারিতা, পরমত সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, জীবে দয়া ইত্যাদি সৎকর্মগুলো পিতামাতা নিজে আমল করে ছোটদের সামনে তুলে ধরবেন। শিশু পারিবারিক পরিবেশেই বড়দেরকে সম্মান আর ছোটদেরকে আদর করার শিক্ষা লাভ

করে। নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের শিক্ষা শিশু পারিবারিক পরিবেশেই লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۔

আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। (সূরা আহ্কাফ, ৪৬ : ১৫)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ۔

আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪)

হাদীসে রয়েছে : তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে স্নেহ কর এবং তাদেরকে ভাল ব্যবহার শেখাও।[১০৮]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তথা বিশ্ব মানবতার ক্ষেত্রে মানুষের কর্ম-কৌশলের প্রশিক্ষণ ঘটে পারিবারিক পরিবেশে। তাই ইসলাম পারিবারিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

শিশুর বিনোদন ও শরীরচর্চা

বিনোদন ও শরীরচর্চা শিশুর জীবনে আনয়ন করে সুখ ও আনন্দ এবং তার অন্তরে সৃষ্টি করে এক হাস্যোজ্জ্বল মানসিকতা। মানসিক আনন্দই অন্তরে উপলব্ধি ও জ্ঞানের চোখ খুলে দিতে সাহায্য করে। জায়িয পদ্ধতিতে বিনোদন ও আনন্দ প্রকাশ করাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নাজায়িয পদ্ধতি অবলম্বন করার কোন অবকাশ শরী'আতে নেই। নির্মল আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিশুদের সাথে কৌতুকপূর্ণ কথা বলতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেন, হে আবূ উমায়র ! তোমার নুগায়র পাখির খবর কি? বস্তুত আবূ উমায়র (রা)-এর একটি নুগায়র পাখি ছিল। তা দিয়ে তিনি খেল-তামাসা করতেন। পরে পাখিটি মারা যায়।[১০৯] এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাচ্চাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করা এবং তাদেরকে আনন্দ দান করা উত্তম।

ব্যায়াম ও শরীরচর্চা শিশুকাল থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুস্থ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে শিশুকালেই শরীর বলিষ্ঠ করা প্রয়োজন। এর জন্য ব্যায়াম ও শরীরচর্চার প্রয়োজন রয়েছে।

রাসূলে কারীম (সা) নিজে কুস্তি করেছেন, ঘোড়া চালনা করেছেন এবং তীর চালনা করেছেন। আবার অন্যদিকে হাবশীদের মাঝে বর্শা চালানোর প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। এর প্রত্যেকটিই সুস্থ শরীর গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কাজেই শিশুকাল থেকেই শিশুকে ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা উচিত।

শিশুর চরিত্র গঠনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। কাজেই আদর্শ সমাজ ও উন্নত পরিবেশ গঠন করতে হলে শিশুরা কেমন করে উন্নত চরিত্র এবং অনুপম আদর্শের অধিকারী হতে পারে সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। কেননা শিশুদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে না পারলে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়, যদি কারো আখ্লাক-চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় তবে এর কারণে সে নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং এ ক্ষতির প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সকল কিছু পরিব্যাপ্ত হয়ে উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বিরাট অকল্যাণ ডেকে আনে। কাজেই শিশুর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সদা সচেতন থাকা আবশ্যক। কুরআন ও হাদীসে শিশুদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জোর তাকীদ রয়েছে। চরিত্র গঠন বলতে তাদের মধ্যে আখ্লাকে যমীমা তথা দুষ্ট চরিত্রের প্রতি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং আখ্লাক হামীদা তথা উন্নত চরিত্র মাধুরীর দ্বারা তাদেরকে বিভূষিত করা বুঝায়। যেমন অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, গীবত, চোগলখোরী, মূর্খতা, উদাসীনতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদির প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করা। সাথে সাথে তাদের মাঝে আল্লাহ্, রাসূল, ফিরিশতা, আসমানী কিতাব, কুরআন, হাদীস ইত্যাদির প্রতি অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং সততা, আমানতদারী, অঙ্গীকার পূরণ করা, দানশীলতা, পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচার ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী শিক্ষা দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ وُلِدَلَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ إِسْمَهُ وَأَدَبَهُ ـ

কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার জন্য একটি সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।[১১০]

এছাড়া বহু হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

শিশুর সুন্দর চরিত্র গঠনে পিতামাতার দায়িত্ব

ইসলাম হল মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম—দীনে ফিত্রাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَا مَنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ ـ

প্রতিটি শিশুই ফিত্রাত তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রীস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।[১১১]

উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার যোগ্যতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। যদি শিশুর পিতামাতা এ ব্যাপারে যত্নবান হয় এবং পরিবেশ যদি সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুকূলে থাকে, তবে শিশুর মধ্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। আর যদি পিতামাতা এ বিষয়ে যত্নবান না হয় কিংবা পরিবেশ যদি গঠনের অনুকূলে না থাকে তবে শিশুর চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। কাজেই শিশুর চরিত্র গঠনের বিষয়ে পিতামাতার ভূমিকা অপরিসীম।

প্রথমে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে আল্লাহ্র অস্তিত্বের কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা এবং তাঁর উপর ঈমান আনার কথা বলবে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে এবং এ সব কিছুর যে একজন স্রষ্টা রয়েছেন তার কথা সন্তানদেরকে

বুঝাবে ও এ বিষয়ে অবহিত করবে। এরপর পর্যায়ক্রমে তাদেরকে রাসূল, ফিরিশতা, কুরআন মাজীদ, কবর, হাশর-নশর, আখিরাত ইত্যাদির উপর ঈমান আনয়নের কথা বলবে। শির্ক ও বিদ্‌'আত-এর অকল্যাণ ও ভয়াবহতার কথা তাদের সামনে তুলে ধরবে। এ প্রসঙ্গে হযরত লুক্‌মান (আ) তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন, তা কুরআন মাজীদে এভাবে উল্লেখ রয়েছে :

১ম নসীহত

يٰبُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

হে বৎস ! আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে চরম যুল্‌ম। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৩)

হযরত লুকমান (আ) তাঁর প্রিয় পুত্রকে যে নসীহত করেছেন এর প্রথম কথাটিই হচ্ছে শির্ক পরিহার করে তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্বের বিশ্বাস মনের মধ্যে দৃঢ়মূল ও স্থায়ী করার নির্দেশ।

২য় নসীহত

يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নিচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৬)

নসীহতের এ অংশে লুক্‌মান (আ) আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌ম ও কুদ্‌রতের ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতার অকাট্য বর্ণনা পেশ করেছেন। আল্লাহ্ সম্পর্কে এ আকীদা মানুষকে সকল প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ্ এবং নাফরমানী থেকে বিরত রাখে।

৩য় নসীহত

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ.

হে বৎস ! সালাত কায়েম করবে। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৭)

আকীদার ক্ষেত্রে তাওহীদ যেমন মূল, তেমনি আমলের ক্ষেত্রে নামায হচ্ছে সবকিছুর মূল।

নাবালিগ সন্তান-সন্তুতি যেন শিশুকাল হতে নামায কায়েমের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.

তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্তুতিদেরকে নামায আদায় করতে আদেশ করবে, যখন তারা সাত বছর বয়সে পদার্পণ করবে এবং নামাযের জন্য তাদেরকে শাসন করবে যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌছবে। আর তখন তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।[১১২]

৪র্থ নসীহত

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۔

সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৭)

নসীহতের এ অংশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আর তা হল এই যে, ঈমানদার মানুষমাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকতে পারে না; বরং সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধাদান করাও তার অন্যতম দায়িত্ব।

৫ম নসীহত

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۔

এবং বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করবে। এটাই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৭)

বালক-বালিকাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে শৈশবকাল থেকেই তারা বিপদে-আপদে ধৈর্যশীল ও সাহসী হয়ে গড়ে উঠে।

৬ষ্ঠ নসীহত

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ۔

অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৮)

অর্থাৎ তুমি নিজেকে সাধারণ লোক থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না; বরং নিজেকে তাদের একজন মনে করবে ও দশজনের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন করবে।

৭ম নসীহত

وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۔

এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করবে না। কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না। (সূরা লুক্‌মান, ৩১, ৩১ : ১৮)

৮ম নসীহত

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ ۔

তুমি পদক্ষেপ করবে সংযতভাবে। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৯)

৯ম নসীহত

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۔

এবং তুমি তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৯)

বালক-বালিকাদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষাদানের পর্যায়ে হযরত লুক্‌মানের এ নয়টি নসীহতের গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলোর ভিত্তিতে শৈশবকাল থেকেই বালক-বালিকাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য এবং এ কাজ পিতামাতাকেই যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে হবে।

নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ ۔

পিতামাতা সন্তানকে ভাল আদব-কায়দা ও স্বভাব-চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা উত্তম কোন দান দিতে পারে না।[১১৩]

সন্তান-সন্ততিকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য একদিকে পিতামাতা যেমনিভাবে সচেষ্ট থাকবেন, এর পাশাপশি তারা এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আও করবেন। কেননা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া মানুষের চেষ্টা কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না। কুরআন মাজীদে পিতামাতাকে তাদের সন্তানের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করার উপদেশ এবং শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সূরা ফুরকানে আল্লাহ্র নেক বান্দাদের অন্যান্য গুণের সাথে এ গুণটির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্র নেক বান্দা তারাই যারা সব সময় এই বলে দু'আ করে :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪)

ছেলেমেয়েদেরকে মিছামিছি বাঘ-ভালুকের ভয় দেখানো যাবে না। এতে তাদের মধ্যেও মিথ্যা বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে। ছেলেমেয়েদের হাত দিয়ে গরীব-মিসকীনদের দান করাবে এবং ভাইবোন ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে খাবার জিনিস বন্টন করাবে। এতে তাদের মধ্যে দানশীলতার অভ্যাস পয়দা হবে এবং কৃপণতার কুঅভ্যাস দূর হবে। ছেলেমেয়েদের চীৎকার করে কথা বলতে দিবে না।

মিথ্যা, অন্যের প্রতি অপবাদ, পরনিন্দা, গীবত, কুটনামী, অন্যের দোষচর্চা, ছিদ্রন্বেষণ করা, অন্যের প্রতি কুধারণা ইতাদি মন্দস্বভাবের ব্যাপারে তাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং সত্যবাদিতা, অন্যের গুণচর্চা করা, অপরের দোষ ঢেকে রাখা ইত্যাদি সদ্গুণাবলীর ব্যাপারে তাদের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করা। এ পর্যায়ে এতদুভয় ভালমন্দ স্বভাবের বর্ণনা করা। ছেলেমেয়েদেরকে নবী-রাসূল এবং পীর-ওলীগণের জীবন কাহিনী সম্বলিত বই-পুস্তক পড়তে দিবে। এতে তাদের মধ্যে সদ্গুণাবলী সৃষ্টি হবে এবং পড়াশুনার প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকবে। নভেল, নাটক, সিনেমা তথা চরিত্র বিধ্বংসী বই-পুস্তক তাদেরকে আদৌ পড়তে দিবে না। এতে তাদের মধ্যে বদ্ দীনি মানসিকতা সৃষ্টি হবে। বাদ্যযন্ত্র এবং তারাবাতি, মরিচবাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য তাদেরকে কখনো টাকা-পয়সা দিবে না। ছেলেমেয়েদেরকে নিজের কাজ নিজ হাতে করার অভ্যাস করাবে। যাতে তারা অলস বা অকর্মা না হয়ে যায়। কাজেই তারা শোয়ার সময় নিজের বিছানা নিজে বিছাবে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেই তা গুটাবে। নিজের কাপড় চোপরের হিফাযত নিজেই করবে।

ছেলেমেয়েদেরকে নম্রতা ভদ্রতা শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে গর্ব ও অহংকার করতে দিবে না। নিজের কাপড়, নিজের বাড়ি, নিজের বংশ ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে গর্ব করতে দেখলে

বারণ করবে। ছেলেমেয়ে কোন ভাল কাজ করলে তাদেরকে বাহবা দিবে। বরং কিছু পুরস্কার দিলে আরো ভাল হয়। এতে ভাল কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে। আর মন্দকাজ করলে তাদেরকে লজ্জা না দিয়ে নির্জনে তা বুঝিয়ে দিবে। তাদেরকে বলবে, দেখ, এরূপ করা ভাল নয়। এরূপ করলে মানুষ তোমাকে মন্দ বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন।

পিতামাতা, ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সঙ্গী-সাথীদের সাথে আচরণ

সন্তানের সবচেয়ে গভীর, ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক হল তার পিতামাতার সাথে। কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্র পরেই পিতামাতার হকের কথা বলা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۔

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ্ বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না। তাদের সাথে বলবে সম্মানসূচক নম্র কথা। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩-২৪)

পিতামাতার সেবা-যত্ন করা, তাঁদের আনুগত্য করার ব্যাপারে হাদীস শরীফেও খুব তাকীদ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

رَضِيَ الرَّبِّ فِيْ رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطِ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ ۔

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ পিতামাতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।[১১৪]

অপর এক হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ۔ ۔

হযরত আবূ উমামা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্তানের উপর তাদের পিতামাতার অধিকার কি? উত্তরে তিনি বললেন : তাঁরা উভয়ই হচ্ছে তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম।[১১৫] অর্থাৎ তাঁদের খিদমত করে জান্নাত লাভ করা যায়, আর তাঁদের অবাধ্যতা জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, বাবা-মা যদি অন্যায়ভাবেও কষ্ট দেয় তবুও তাঁদেরকে কষ্ট দেবে না। কথায়, কাজে এবং ব্যবহারে তথা জীবনের সর্ব অবস্থায় তাঁদের

প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। বাবা-মা কাফির হলেও প্রয়োজনে তাঁদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে। বাবা-মা মারা গেলে তাঁদের জন্য দু'আ করবে এবং তাঁদের আত্মার প্রতি ইসালে সাওয়াব করবে। তাঁরা ঋণ করে গেলে তাঁদের ঋণ পরিশোধ করবে এবং তাঁদের জায়িয অসিয়্যাত পূর্ণ করবে।[১১৬]

সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা হল, বয়সে যে ছোট সে তার বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং তাদের সামনে আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করে চলবে। অনুরূপভাবে বড়দের কর্তব্য হল, ছোটদেরকে স্নেহ ও আদর করা এবং তাদেরকে ভালবাসার নযরে দেখা। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا .

যারা ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।[১১৭]

আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও প্রতিবেশীদের সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কুরআন মাজীদে যেখানে পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রতিবেশীদের সাথেও সদাচার করার তাকীদ প্রদান করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে :

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا .

তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কোনকিছুকে তাঁর শরীক করবে না এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, আত্মগর্বীকে। (সূরা নিসা, ৪ : ৩৬)

আলোচ্য আয়াতে তিন ধরনের প্রতিবেশীর কথা উল্লেখ করে তাদের সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা নিকট প্রতিবেশীর অর্থ এমন প্রতিবেশী যার সাথে প্রতিবেশী হওয়ার পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। দূর প্রতিবেশীর অর্থ যার সাথে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই, শুধু পাশাপাশি বাস করে এতটুকুই তার সাথে সম্পর্ক। আর সঙ্গী-সাথীর অর্থ এমন লোকজন যারা কোথাও কোন কারণে একত্রিত হয়ে যায়। যেমন সফরের সাথী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথী অথবা একসাথে চাকুরি করে এমন লোকজন। উল্লিখিত সকল প্রকার প্রতিবেশীর সাথেই সদাচার করার জন্য এ আয়াতে হুকুম করা হয়েছে। হাদীস শরীফেও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : আল্লাহ্‌র শপথ! সে মু'মিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ! সে মু'মিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ! সে মু'মিন নয়। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সে লোকটি ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।[১১৮]

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلَى جَنْبِهِ ٠

সে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন নয়, যে পেটপুরে আহার করে অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।[১১৯]

সুতরাং সর্বদা প্রতিবেশীর উপকার করবে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কখনো প্রতিবেশীর কোন ক্ষতি করবে না। প্রতিবেশীর স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং তার মান-সম্মানের সংরক্ষণ করবে। সম্ভব হলে প্রতিবেশীর বাড়িতে হাদিয়া প্রেরণ করবে। সঙ্গী-সাথীদের সাথে সদাচার করাও আবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথী, সফরের সাথী, এক কথায় সকল প্রকার সঙ্গী-সাথীর সাথেই সদ্ব্যবহার করা উচিত। সঙ্গী-সাথীদের সাথে ভদ্রভাবে মেলামেশা করবে, নম্রভাষায় কথা বলবে এবং তাদের সাথে কখনো রূঢ় আচরণ করবে না।

সঙ্গী-সাথী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে। সত্যবাদী, নামাযী ও দীনদার ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসাবে নির্বাচন করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

وَلاَ تُصَاحِبْ اِلاَّ مُؤْمِنًا ٠

মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে সাথী নির্বাচন করবে না।[১২০]

তিনি আরো বলেন : ভাল এবং দুষ্ট সাথী মিশ্‌ক বহনকারী ও হাঁপরে ফুঁকদাতা (কামার) ব্যক্তির ন্যায়। মিশ্‌ক বহনকারী ব্যক্তির অবস্থা তো এমন যে, সে হয়তো এ মিশ্‌ক তোমাকে হাদিয়া দিবে অথবা তুমি তার থেকে তা খরিদ করবে অথবা তুমি তার থেকে এর সুঘ্রাণ লাভ করবে। আর হাঁপরে ফুঁকদাতা ব্যক্তি হয়তো তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে কিংবা তুমি তার নিকট থেকে দুর্গন্ধ পাবে।[১২১]

পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, অনুমতি গ্রহণ, মুলাকাত ও মজলিসের আদব-কায়দা

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ইসলামী বিধি-বিধানের অনুসরণ আবশ্যক। লেবাস পোশাকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টো, ১. সতর ঢাকা ও ২. সৌন্দর্য। এ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يٰبَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ٠

হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাক্‌ওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৬)

লেবাস-পোশাকের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্য লাভ। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يٰبَنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ٠

হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপব্যয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)

প্রথমোক্ত আয়াতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তাক্‌ওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকষ্ট।" কাজেই মুসলমান নর-নারী ও বালক-বালিকা সকলেরই এ পোশাক পরিধান করা বাঞ্ছনীয়।

মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের জন্য উত্তম পোশাক হল, সমাজের নামাযী ও পরহেযগার লোকদের অনুসরণে নিজের পোশাক নির্বাচন করা। যা শালীন, মার্জিত, রুচিশীল ও শোভনীয়। লেবাসের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য মহিলার অনুকরণ ও মহিলাদের জন্য পুরুষের অনুকরণ হারাম। কুসুম ও জাফরানী রঙের কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়িয নেই। অহংকার প্রকাশ পায় এমন পোশাক পরিধান করা উচিত নয়। এমন কাপড় পরিধান করা, যাতে শরীরের অঙ্গসমূহ দেখা যায়, তা পরিধান করাও সমীচীন নয়। রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়িয নেই। স্বর্ণের আংটি এবং স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করাও পুরুষের জন্য হারাম। টাখ্‌নু গিরার নিচ পর্যন্ত জামা, পায়জামা ও প্যান্ট পরিধান করা এবং গলায় টাই বাঁধা বৈধ নয়।[১২২]

সামর্থ্যবান লোকের জন্য জরাজীর্ণ মানুষের পোশাক পরিধান ইসলাম পসন্দ করেনি। ধনীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক দরিদ্রদের মধ্যে সাদাকা করে দিবে।

কাপড় পরিধান করার সময় ডানদিক থেকে এবং খোলার সময় বামদিক থেকে শুরু করবে। যেমন জামার ডান আস্তিন প্রথমে পরবে। পায়জামার ডান পা প্রথমে পরবে। আর খোলার সময় বাম আস্তিন এবং বাম পা প্রথমে খুলবে। নতুন কাপড় পরিধান করে নিম্নের দু'আটি পাঠ করেব :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ ۔

বেশি শান-শওকতের পোশাক পরিধান করা এবং একেবারে ময়লা কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। বরং সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। চুলের যত্ন করবে। তবে সর্বদাই চুল পরিপাটি করার পেছনে লেগে থাকা উচিত নয়। সুরমা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটা উচিত নয়। হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।[১২৩]

খাওয়ার শুরুতে "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" বলে ডান হাতে আহার আরম্ভ করবে। খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধোবে এবং কুলি করবে। এক পাত্রে কয়েকজন খেতে বসলে নিজের সামনে থেকে খাদ্য গ্রহণ করবে। এক মজলিসে কয়েকজন খেতে বসলে সকলের সামনে খাদ্যসামগ্রী পৌছার পর সকলে "বিসমিল্লাহ্‌" বলে খাওয়া শুরু করবে। নিজে আগে খাওয়া আরম্ভ করবে না এবং অন্যের খানার প্রতি তাকাবে না। কেউ কোন খাওয়ার জিনিস দিলে তা মুরুব্বীর অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করবে না। খানা খুব দ্রুত খাবে না এবং একেবারে ধীরে ধীরেও খাবে না। খুব ভালভাবে চিবিয়ে খানা খাবে। কিন্তু যেন শব্দ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। এক লোক্‌মা ভালভাবে না গিলে আরেক লোক্‌মা গ্রহণ করবে না। খাওয়ার সময় যদি কোন খাদ্য নিচে পড়ে যায় তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে নিবে। একে ঘৃণা করবে না। খেজুর, আঙুর বা তরমুজের টুক্‌রা একত্রে বসে খেলে একটি বা এক টুক্‌রা করে উঠাবে। দু'তিনটি একসাথে উঠাবে না। খুব গরম ভাত-তরকারি ইত্যাদি খাবে না। তারকারির দাগ যেন কাপড় বা বিছানায় না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখবে। পানি পান করার সময় গ্লাস ডান হাত দিয়ে ধরবে। পানি

এক শ্বাসে পান করবে না।[১২৪] তিনবারে পান করবে। পানির পাত্রে শ্বাস ফেলবে না; বরং পাত্রের বাইরে শ্বাস ফেলবে। পানি পান করার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলে পান করবে এবং পান শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলবে। বসে পানি পান করবে। বিশেষ প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানি পান করাতে কোন দোষ নেই।

কয়েকজন মিলে একত্রে খানা খাওয়ার সময় অন্যদের অনুমতি না নিয়ে আগে উঠবে না। খাওয়ার কোন জিনিস অপসন্দ হলে এর ত্রুটি প্রকাশ করবে না। খাওয়া শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলে আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে।[১২৫] খাওয়ার সময় আঙ্গুল এবং পাত্র পরিষ্কার করে খাবে। দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নাত। দাঁড়িয়ে খানা খাওয়া উচিত নয়।

কারো গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে তার অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে মাহ্রাম, গায়রে মাহ্রাম নারী-পুরুষ সকলেই সমান। এমনকি কেউ যদি তার মা-বোন অথবা কোন মাহ্রাম মহিলার কক্ষে যায় তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ইমাম মালিক (র) মু'আত্তা গ্রন্থে আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি আমার মায়ের নিকট যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাইব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, অনুমতি চাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো আমার মায়ের গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন : তবুও অনুমতি না নিয়ে তার কক্ষে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সর্বদা তার কাছেই থাকি। তিনি বললেন : তবুও অনুমতি না নিয়ে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পসন্দ কর ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা কক্ষে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে সুন্নাত তরীকা হল প্রথমে সালাম দিবে এবং পরে অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি চাওয়ার সময় নিজের নামও উল্লেখ করবে।[১২৬]

সালাম ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আমল। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালামের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। কিভাবে সালাম এবং এর জবাব দিতে হবে তাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। সালামের সুন্নাত তরীকা হল, এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে এমনভাবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলবে যাতে সে শুনতে পায়। এরপর যাকে সালাম দেওয়া হল সে সশব্দে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলবে। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব থাকলে মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে হাত দ্বারাও ইশারা করবে। কিন্তু কাছাকাছি থাকা অবস্থায় হাতদ্বারা ইশারা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে সেই বেশি সাওয়াবের অধিকারী হবে। যদি কেউ অপরের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছায় তবে وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ বলে জবাব দিবে। কয়েকজনের মধ্যে একজন সালাম করলে সকলের পক্ষ হতে তা আদায় হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মজলিসের মধ্যে একজন জবাব দিলে সকলের পক্ষ হতে তা আদায় হয়ে যায়।[১২৭] ছোট বড়কে আগে নম্রভাবে সালাম করবে। অবশ্য বড়ও ছোটকে সালাম করতে পারবে। দীর্ঘকাল পর সাক্ষাত হলে সালামের পর মুসাফাহা করাও বাঞ্ছনীয়। মুসাফাহার সময় উভয়ে বলবে يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا। দীর্ঘদিন পর সাক্ষাত হলে সালাম ও মুসাফাহার পর মু'আনাকা (আলিঙ্গন) করার বিধানও ইসলামে রয়েছে। মু'আনাকার সময় পরস্পর বলবে :

اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِىْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ ۔

মজলিসে গিয়ে নম্রভাবে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে সকলকে সালাম করবে। তথায় বিশেষ কোন মুরুব্বী থাকলে তাঁকে খাসভাবে সালাম করবে। মানুষের সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে এবং আদবের সাথে বসবে। মজলিসের মধ্যে থুথু ফেলবে না এবং নাক সাফ করবে না। যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে মজলিস থেকে উঠে গিয়ে নাক সাফ করে আসবে। মজলিসে বসা অবস্থায় যদি হাই বা হাঁচি আসে তবে মুখের উপর হাত বা রুমাল রাখবে এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করবে যাতে আওয়াজ কম হয়। কাউকে পারতপক্ষে পিছনে রেখে বসবে না এবং কারো প্রতি পা ছড়িয়ে বসবে না। মজলিসের মধ্যে কখনো আঙ্গুল ফুটাবে না। বারবার কারো দিকে তাকাবে না। বেশি কথা বলবে না। কথায় কথায় কসম খাবে না। প্রথমে নিজে কথা আরম্ভ করবে না। অন্যেরা কথা আরম্ভ করার পর কথা বলবে। কারো কথা বলার সময় কথা বলবে না। চুপ করে শুনবে। পরে কথা বলবে। মজলিসের মধ্যে বসা অবস্থায় যদি অন্য কেউ আসে তবে একটু সরে গিয়ে তার জন্য জায়গা করে দিবে। মজলিস থেকে বিদায়ের সময় 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে বিদায় নিবে।[১২৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু-কিশোরদের শিক্ষা-দীক্ষা

সন্তান জন্মের পর পর পিতামাতার উপর তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কতকগুলো হক কার্যকর হতে থাকে এবং তখন থেকেই সে হক অনুযায়ী আমল করা পিতামাতার কর্তব্য হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلٰثَةُ اَشْيَاءٍ اَنْ يُّحْسِنَ اِسْمَهُ اِذَا وَلَدَ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ اِذَا عَقَلَ وَيُزَوِّجَهُ اِذَا اَدْرَكَ ۔

পিতামাতার প্রতি সন্তানের হক্ হচ্ছে প্রথমত তিনটি—১. জন্মের পর পরই তার জন্য একটি উত্তম নাম রাখা, ২. জ্ঞান-বুদ্ধি হলে তাকে কুরআন তথা দীন শিক্ষা দেওয়া, ৩. আর সে যখন বালিগ হবে তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করা।[১২৯]

বস্তুত সন্তানের ভাল নাম না রাখা, কুরআন ও দীন শিক্ষা দান না করা এবং বালিগ হওয়ার পর তার বিয়ের ব্যবস্থা না করা মাতাপিতার জন্য অপরাধের মধ্যে গণ্য। এসব কাজ না করলে পিতামাতার পারিবারিক দায়িত্ব পালিত হতে পারে না এবং ভবিষ্যত সমাজও ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে উঠতে পারে না। এ কারণেই ইসলাম উপরোক্ত বিষয়াদির প্রতি, বিশেষভাবে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি জোর তাকীদ প্রদান করেছে। ইসলামে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন ফরয। এ ফরয কোন বিশেষ শ্রেণী, দল বা জাতির জন্য নয়, বরং এ হচ্ছে এমন একটি সার্বজনীন অধিকার যা প্রতিটি মানুষকে শামিল করে। এ ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা তারা এমন এক যুগে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, যা তোমাদের যুগ নয়।'[১৩০]

শিশুর বয়স যখন পাঁচ বছর হবে তখন কোন বুযর্গ আলিম ব্যক্তির মাধ্যমে দু'আ করিয়ে 'বিসমিল্লাহ্' শুরু করাবে এবং মক্তবে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। প্রথমে কুরআন শরীফ তথা দীনি ইল্‌ম শিক্ষা দিবে। বাইরে এ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে গৃহে শিক্ষক রেখে ব্যবস্থা করবে। শৈশবেই শিশুকে আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা না দেওয়া হলে তার চরিত্র গঠন করা আর সম্ভব নয়। কাজেই শিশু শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণেই বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বন্দীর মুক্তির শর্ত ছিল দশজন করে মুসলিম সন্তানকে লেখাপড়া শিখানো।[১৩১]

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তা'আলাকে রাজী ও সন্তুষ্ট করা এবং এর লক্ষ্য হল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওয়ারিস হওয়া। এর জাগতিক লক্ষ্য হল নিজেকে যোগ্যতম সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করা।

শিক্ষার পদ্ধতি

শিশুকে দুইভাবে দেওয়া যায়—১. পারিবারিক শিক্ষা, ২. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

শিশু কথা বলতে আরম্ভ করতেই তাকে আল্লাহ্ ও কালেমা শিক্ষা দেওয়া যায়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তাকে দীন সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা শিখানো যায়। দীনি শিক্ষার সাথে সাথে তাদেরকে জাগতিক শিক্ষাও দেওয়া যায়। এমনি করে শৈশবেই তাদেরকে শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করে গড়ে তোলা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক মহোদয়কে শিশুদের শিক্ষার প্রতি খুব বেশি সতর্ক নযর রাখতে হবে। উস্তাদ শিশুদেরকে মিষ্টভাষায়, মধুর ব্যবহারের মাধ্যমে এমনভাবে সবক দিবেন ও নিবেন; যাতে শিশুরা বাড়িতে থাকার চেয়ে প্রতিষ্ঠানে থাকতে বেশি পসন্দ করে। পড়াশুনা করানোর সময় শিশুদের সাথে কর্কশ ব্যবহার করবে না। শ্রেণীতেই সবক্ যেন মুখস্থ হয়ে যায় এর ব্যবস্থা করবে। কোন কথা ছাত্ররা একবার বলার দ্বারা বুঝতে না পারলে তা কয়েকবার বলা। বোঝার উদ্দেশ্যে ছাত্ররা প্রশ্ন করলে এতে বিরক্ত না হওয়া। ছাত্রদের যোগ্যতা অনুসারে তাদের পাঠ নির্ধারণ করা। পড়াশুনা করানোর সাথে সাথে অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখবে। ছাত্রদের দ্বারা রিডিং পড়াবে। প্রতিদিনের সবক ক্লাসে শুনবে। ক্লাসে প্রত্যহ হাতের লেখা দেখার ব্যবস্থা রাখবে। জটিল স্থানসমূহের সারাংশ লিখে দেওয়া এবং এর উপর মৌখিক আলোচনা করা সমীচীন। মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং পরীক্ষার পর উচ্চ নম্বরের উপর পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা। নিয়মিত সবক পড়ানো। সবক কখনো বাদ না দেওয়া। পিছনের পড়া যাতে ভুলে না যায় সে জন্য কমপক্ষে সপ্তাহে একবার পিছনের পড়া শুনবে। পড়ার সাথে সাথে লেখার উপরও জোর দিতে হবে। প্রথমে অসংযুক্ত অক্ষর শিকাবে। তারপর যুক্ত অক্ষর শিখাবে।

পড়াশুনার পাশাপাশি আদব-আখ্‌লাকও শিক্ষা দিতে হবে। জরুরী দু'আ-কালাম শিখাবে। পাক-পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি, পেশাব-পায়খানার নিয়ম-নীতি অবশ্যই শিখাতে হবে। নামায-রোযা তথা ইসলামী শিক্ষাও এ সময়েই দিতে হবে। এভাবে একজন শিশু ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে।

প্রণিধানযোগ্য যে, শিশুদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হলে দীনদার, পরহেযগার আদর্শ ব্যক্তিদের নিকট তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উস্তাদ আদর্শবান না হলে ছাত্রদেরকে আদর্শবান বানানো সম্ভব নয়। কাজেই শিশুদেরকে কোন প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর পূর্বে দেখে নিতে হবে যে, ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ আদর্শবান, নামাযী ও পরহেযগার লোক কিনা। এরূপ না হলে ঐ প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। কেননা শিশুরা সাধারণত অনুকরণপ্রিয় হয়ে থাকে। যা দেখে এবং শোনে, তারা তাই নিজ জীবনে অবলম্বন করে থাকে। উস্তাদ আদর্শবান হলে তারাও সাধারণত আদর্শবান হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উস্তাদ যদি দীনদার পরহেযগার না হয় তাহলে তাদের মধ্যেও দীনদারী আসে না। এ কারণেই প্রখ্যাত ইসলামী মনীষী আল্লামা ইব্ন সীরীন (র) বলেছেন :

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ ـ

এই ইল্ম হচ্ছে দীন। সুতরাং কার কাছে থেকে দীন হাসিল করছো তা প্রথমে দেখে নিবে।[১৩২]

এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যার-তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না।

শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে আচার-আচরণ

ইল্ম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া যেমন জরুরী, অনুরূপভাবে দীনি ইল্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন উস্তাদ, সহপাঠী, প্রমুখ ব্যক্তিদের হক আদায় করাও জরুরী। বস্তুত ইল্মে দীনের বরকত এ সকল হক আদায়ের উপরই নির্ভরশীল।

ছাত্রদের জন্য উস্তাদ এক বিরাট নি'আমত। কাজেই উস্তাদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ ও রাসূলের পর মানুষের প্রতি সবচেয়ে বড় দানশীল ব্যক্তি হলেন উস্তাদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে প্রশ্ন করে বললেন :

هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهُ اَوْ قَالَ اُمَّةً وَاحِدَةً ـ

তোমরা কি জান, সবচেয়ে বড় দানশীল কে ? জবাবে সাহাবীগণ বললেন, এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সবচেয়ে বড় দানশীল হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। তারপর আদম সন্তানের মধ্যে আমি হলাম সবচেয়ে বড় দানশীল। এরপর বেশি দানশীল ঐ ব্যক্তি যে ইল্ম শিখার পর এর প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন একাই একজন আমীরের মত অথবা এক উম্মাত হিসাবে অর্থাৎ এই মর্যাদা সহকারে উপস্থিত হবে।[১৩৩]

কাজেই ছাত্রের জন্য অপরিহার্য হল উস্তাদকে ভক্তি করা, তাঁর খিদ্মত করা এবং নরম ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলা। নামায পড়ে তাঁর জন্য দু'আ করা। সম্ভব হলে কিছু হাদিয়া প্রদান করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ .

কেউ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলে তোমরা তাকে এর বিনিময় প্রদান করবে। যদি বিনিময় দেওয়ার মত কিছু না পাও তবে তার জন্য তোমাদের মনে এ ধারণা হওয়া পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবে যে, তোমরা তার সমপরিমাণ বিনিময় প্রদান করতে সক্ষম হয়েছো।[১৩৪]

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, ছাত্র যত বড়ই হোক, উস্তাদের সাথে তার মর্যাদার তুলনা হয় না। উস্তাদের প্রতি আদব রক্ষা করা তাক্ওয়ার অন্তর্ভুক্ত। বে-আদব কখনো মুত্তাকী হতে পারে না। কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উস্তাদের প্রতি আদব রক্ষা করে চলা তাক্ওয়ার অন্তর্ভুক্ত। উস্তাদকে উস্তাদ হওয়ার কারণেই সম্মান করা উচিত। উস্তাদের সামনে আদব ও বিনয়ের সাথে আসা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "তোমরা দীনি ইল্ম শিক্ষা কর এবং ইল্মের জন্য স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন কর। আর যার নিকট ইল্ম শিখছো তাঁর নিকট বিনয় সহকারে গমন কর।"[১৩৫]

উস্তাদ কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। হযরত থানভী (র) বলেন, ছাত্রদের জন্য উচিত, উস্তাদের খিদমতে হাযির হওয়ার পূর্বে উত্তমরূপে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে হাযির হওয়া। উস্তাদের সামনে আদবের সাথে বসা। তাঁর দিকে পা ছড়িয়ে না বসা। উস্তাদের প্রতি আযমত প্রকাশ করা। উস্তাদের আলোচনা করার সময় এদিক ওদিক না তাকানো; বরং মনোযোগ সহকারে তাঁর আলোচনা শ্রবণ করা। উস্তাদের সাথে কখনো মিথ্যা না বলা এবং প্রতারণা না করা। কোন কথা বুঝে না আসলে এর জন্য উস্তাদকে দোষী বা অযোগ্য মনে করবে না; বরং এ কথা মনে করবে যে, আমার বুঝার শক্তির ত্রুটির কারণেই তা বুঝতে পারছি না। উস্তাদের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকবে। সাক্ষাতে তাঁকে প্রথমে সালাম করবে এবং তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবে। উস্তাদের সামনে বেশি কথা বলবে না এবং হাসি-তামাশাও করবে না। কোন ব্যাপারে উস্তাদ কঠোরতা করলে তা অম্লান বদনে বরণ করে নিবে। কোন ব্যাপারে উস্তাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে না। সময় সময় উস্তাদকে হাদিয়া প্রদান করবে। উস্তাদের জীবদ্দশায় এবং ইনতিকালের পর তাঁর জন্য দু'আ করবে।

সহপাঠীদের সাথে বয়স ও মর্যাদানুসারে সদ্ব্যবহার ও ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখবে। তাদের সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখাই ইসলামের আদর্শ। ক্লাসে পরে আগমনকারী সাথীকে বসার জন্য জায়গা করে দিবে। মজলিসে কারো দিকে পা ছড়িয়ে বসবে না। কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে বসবে না। কোন কারণবশত ক্লাস থেকে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে নিজের সিটে কোন রুমাল বা অন্য কিছু রেখে যাবে। যাতে অন্য লোকেরা বুঝতে পারে যে, এ লোক আবার ফিরে আসবে। ক্লাসে গিয়ে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসবে। ক্লাসের সাথীদের সাথে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

إِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ .

তোমার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ।[১৩৬]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ·

পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম।[১৩৭]

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এই গুরুত্বারোপে যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। দৈহিক রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হলে দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন পাত্র থেকে খাবার খেতে হয়। আর খাবারও যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। মনোদৈহিক রোগ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি পবিত্র মন।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ·

অবশ্যই আল্লাহ্ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকেও ভালবাসেন। (সূরা বাকারা, ২ : ২২২)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে পসন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন।[১৩৮]

রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[১৩৯]

আধুনিক বিজ্ঞানও পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণিত করে। বর্তমান বিজ্ঞানে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। বিশেষত রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আর এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় দু'টি কথা স্মরণীয় :

প্রথমত "Prevention is better than cure"—"প্রতিরোধ রোগ নিরাময়ের চাইতে শ্রেয়" "Prevention is cheaper than cure"—"প্রতিরোধ নিরাময়ের চাইতে সস্তা।" আধুনিক যুগের এই ধ্যান-ধারণাগুলো পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহ ইসলামের মৌল স্বাস্থ্যনীতির অনুসরণ মাত্র।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

হাত

হাত পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। হাত দিয়েই আমরা আহার করি, চোখ-মুখ মুছি এবং প্রয়োজনবোধে মুখগহ্বরে হাত দেই। আবার এই হাত দ্বারাই আমরা ময়লা আবর্জনা দূর করে থাকি। তাই হাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাত যদি অপরিষ্কার ও দূষিত থাকে তাহলে তা খাওয়া-দাওয়াকে দূষিত করবে এবং ঐ খাদ্যদ্রব্য খেলে রোগব্যাধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

হাতের আঙ্গুলেরই নখের ভিতর ময়লা জমে, তাই তা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। যদি তা পরিষ্কার রাখা না হয় তবে এতে খাদ্য দূষিত হয়ে যায়। মায়ের হাত দূষিত থাকলে সেই হাতে বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করালে কিংবা শিশুকে কোন খাদ্য খাওয়ালে তারদ্বারা শিশু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে হাত তিনবার না ধুয়ে যেন কোন পাত্রে তা না ঢুকায়।[১৪০]

তিনি আরও বলেছেন : নখ কাটা ফিত্‌রাত তথা নবীগণের সুন্নাত।[১৪১]

রাসূলের অন্যতম সুন্নাত হল, আহারের আগে ও পরে হাত ধুয়ে নেওয়া।

মুখ

মুখকে বলা হয় "Gateway of the body"—মুখ হচ্ছে দেহের ফটক। মুখের ভিতর দিয়ে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় দেহে প্রবেশ করে। সেজন্য মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই জরুরী। মুখের ভিতর কোন সংক্রমণ (Infection) হলে তা খাদ্যনালীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে।

এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। দিনে ৫ বার উযূর জন্য ১৫ বার মুখ ধুতে হয়। শুধু তাই নয়, এ সময় মিসওয়াক করা হয় বলে দাঁত পরিষ্কার থাকে, দাঁতের গোড়ায় পাথর জমে না। আর দাঁতের গোড়ায় বা মাড়িতে সংক্রমণ হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টদায়ক না মনে করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাযের ওযূর সাথে মিস্‌ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[১৪২]

নাক

নাকের সঙ্গে মুখ ও গলার সংযোগ রয়েছে। আর তাই খাদ্যনালী ও শ্বাসনালী উভয়ের সঙ্গেই নাকের যোগাযোগ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নাকের পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত জরুরী। নাকের চুলের মধ্যে বাতাসে ধূলিকণা জমা হয়, অন্যদিকে নাকে সংক্রমণজনিত প্রদাহ হতে পারে, যা সহজেই শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীকে আক্রমণ করতে পারে।

উযূর সাথে দিনে পনেরবার নাক পানিদ্বারা পরিষ্কার করা হয়। এই আমল আমাদের দেহকে অনেক রোগ থেকে হিফাযতে রাখে।

চোখ

আল্লাহ্‌র এই সুন্দর পৃথিবীর সৌন্দর্যকে আমরা চোখের দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করি। তাই চোখ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেওয়া একটি বড় নি'আমত। তাই চোখের রোগ যা অন্ধত্ব ডেকে আনতে পারে, সেগুলো থেকে দূরে থাকা আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন চোখ পরিষ্কার রাখা, চোখের ব্যায়াম এবং পরিমাণমত পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আহার করা। এই ব্যাপারে ইসলামের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। চোখের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় উযূ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। দিনে পাঁচবার উযূ করতে গিয়ে আমরা পনেরবার চোখ ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারি।

মাথা

মাথা তথা মাথার ত্বক এবং চুলের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা খুবই জরুরী। মাথার ত্বকের অপরিচ্ছন্নতা থেকে রোগ-ব্যাধির জন্ম হতে পারে এবং অন্যত্রও তা ছড়িয়ে যেতে পারে। বিশেষত চুলের গোড়ায় যে খুশকী হয় তা চুল পড়ে যাওয়া এবং টাক পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খুশকির কারণে আবার চোখেও রোগ হতে পারে। তাই মাথার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। উযূ করার সময় দিনে পাঁচবার মাথা মাসেহ্ করতে হয় যা মাথা পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

মহানবী (সা) বলেন : যার মাথার চুল আছে সে যেন তার পরিচর্যা করে।[১৪৩]

পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা

সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা বাঞ্ছনীয়।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ٠

তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٠

(হে নবী) আপনার পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ : ৪)

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ। ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি আমাদের সেই পরিবেশেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই বস্ত-বাড়ি, রাস্তাঘাট, খোলা মাঠ ইত্যাদি আবর্জনামুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন।[১৪৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পসন্দ করেন, তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে পসন্দ করেন, নিজে সুমহান এবং মহত্ত্বকে পসন্দ করেন এবং তিনি দানশীল, দানশীলতাকে পসন্দ করেন। কাজেই তোমরা (তোমাদের বাড়ির চত্বর) পরিচ্ছন্ন রাখবে।[১৪৫]

হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) ইরশাদ করেন : পানির ঘাটে, রাস্তার মাঝে এবং বৃক্ষের ছায়ায় মলত্যাগ থেকে বিরত থাকবে।[১৪৬]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন : ঈমানের সত্তরের চেয়েও অধিক শাখা রয়েছে। এর মধ্যে উত্তম শাখা হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমা পাঠ করা এবং ক্ষুদ্রতম শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।[১৪৭]

নবী কারীম (সা) আরও বলেন : আমার নিকট আমার উম্মাতের ভালমন্দ সকল আমলের ফিরিস্তি পেশ করা হয়েছিল। আমি ভাল কাজসমূহের তালিকার মধ্যে রাস্তা থেকে অপসারিত

কষ্টকর বস্তুকেও দেখতে পেয়েছি এবং মন্দ কাজসমূহের তালিকার মধ্যে দেখতে পেয়েছি মসজিদে নাকের ময়লা নিক্ষেপ করা যা সেখান থেকে মুছে ফেলা না হয়।[১৪৮]

বর্তমানকালে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। আমরা মুসলমান হিসেবে ইসলামের উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাকে যদি মেনে চলি তাহলে রোগব্যাধি ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকতে পারি।

খাদ্য ও পানীয়ের পরিচ্ছন্নতা ও মিতব্যয়িতা

খাদ্য ও পানীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র না রাখলে এগুলো সংক্রমিত হতে পারে এবং তা দ্বারা খাদ্যনালী তথা পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। সে কারণেই খাদ্য-পানীয়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা একান্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (সা) পানি ও খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ফুঁ দিতে এবং পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি পানাহারের পাত্র ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

জীবন ধারণে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা) একদা হযরত সা'দ (রা)-কে উযূ করার সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে দেখে বললেন : হে সা'দ! এ অপব্যয় কেন ? তখন তিনি বললেন, উযূতেও কি অপব্যয় আছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি একটি প্রবাহমান নদীতেও থাক।[১৪৯]

স্থির পানিতে পেশাব-পায়খানা না করা

স্থির পানি বা বদ্ধ জলাশয়ে পায়খানা-পেশাব করা একেবারেই অনুচিত। কোন বদ্ধ জলাশয়ে পেশাব-পায়খানা করলে তাতে রোগজীবাণু জন্ম নেয়। ফলে সেই পানিতে গোসলের সময় সেই পানি মুখে, নাকে, চোখে প্রবেশ করে নাক, মুখ, চোখ, খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীতে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করতে পারে। চর্মে বিভিন্ন ধরনের এ্যালার্জি রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে প্রস্রাব না করে এবং এরপর সেখানে গোসল না করে।[১৫০]

শক্ত মাটি ও পাথরের উপর এবং গর্তে পেশাব না করা

শক্ত মাটি কিংবা পাথরের ওপর প্রস্রাব করা উচিত নয়। কেননা এতে প্রস্রাবের ছিঁটা শরীর ও পোশাকে লেগে তা নাপাক করে দিতে পারে। অনুরূপভাবে গর্তে প্রশ্রাব করাও উচিত নয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সা) গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[১৫১]

এ ছাড়া পূর্বে বা পশ্চিমমুখী হয়ে অথবা পিঠ দিয়ে পেশাব-পায়খানা করা উচিত নয়। হাদীসে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ওযর ছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। জনসমক্ষে নির্লজ্জের মত পেশাব-পায়খানা করা গর্হিত এবং শিষ্টাচার-বর্জিত কাজ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ফাতহুল কাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭২।
২. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১১তম খণ্ড।
৩. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫১।
৪. তিরমিযী, সূত্র : ইব্‌ন কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮।
৫. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৬৬।
৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৯৭।
৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫৭১; ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ২০।
৮. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ২০, প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. বুখারী ও মুসলিম, ১ম খণ্ড।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, ২য় খণ্ড।
১৬. আবূ দাঊদ ও তিরমিযী।
১৭. আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী (র.)।
১৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, ২য় খণ্ড পৃ. ৪২১।
১৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ১২০।
২০. মুসলিম, সূত্র : রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
২১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২০।
২২. মুসনাদে আহ্‌মাদ।
২৩. বুখারী, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ।
২৪. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২০।
২৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২১।
২৬. তিরমিযী ও বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
২৭. আবূ দাঊদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
২৮. শারহুস সুন্নাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
২৯. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৬৮।
৩০. প্রাগুক্ত।
৩১. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২১।
৩২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২১।
৩৩. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৭০।
৩৪. সীরাতুন নবী (সা), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮।
৩৫. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।
৩৬. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, পৃ. ৩২-৩৩।
৩৭. তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
৩৮. ফাত্‌ওয়ায়ে শামী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১।

৩৯. বায়হাকী।
৪০. বায়হাকী।
৪১. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, পৃ. ৩২।
৪২. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, ১ম খণ্ড. পৃ. ১৬৮।
৪৩. মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯।
৪৪. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২১।
৪৫. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮২; মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯।
৪৬. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।
৪৭. তাফসীরে নূরুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪।
৪৮. সহীহ্ বুখারী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪০৯।
৪৯. তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩; আবূ দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৫০. কানযুল উম্মাল, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪১৭।
৫১. কানযুল উম্মাল, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪১৭।
৫২. মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮।
৫৩. মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮।
৫৪. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪।
৫৫. কানযুল উম্মাল, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪১৮।
৫৬. কানযুল উম্মাল, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪১৯।
৫৭. কানযুল উম্মাল, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪১৯।
৫৮. কানযুল উম্মাল, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪২১।
৫৯. আত্-তাশাব্বুহ ফিল ইসলাম।
৬০. কানযুল উম্মাল, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪১৮।
৬১. বায়হাকী।
৬২. আবূ দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৬৩. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।
৬৪. মুস্তাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯ ও এ'লাউস্ সুনান, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১১৫।
৬৫. তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩; আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৬৬. তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩; আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৬৭. তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩; আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৬৮. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭।
৬৯. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।
৭০. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮।
৭১. মুসতাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯; এ'লাউস সুনান, ১৭ খণ্ড, পৃ. ১১৫।
৭২. তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮; আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৭৩. মুসতাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৮; এ'লাউস সুনান, ১৭ খণ্ড, পৃ. ১১৫।
৭৪. তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩; আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৭৫. বেহেশ্‌তি জেওর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫।
৭৬. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮; আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৭৭. আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।

৭৮.কানযুল উম্মাল, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯।
৭৯. এ'লাউস্ সুনান, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১২০।
৮০. আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫।
৮১. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।
৮২. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
৮৩. বায়হাকী ও মুস্তাদরাকে হাকেম।
৮৪. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭৪।
৮৫. তিরমিযী শরীফ।
৮৬. ইহ্ইয়ায়ে উলূমুদ্দীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১।
৮৭. ইহ্ইয়ায়ে উলূমুদ্দীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১।
৮৮. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।
৮৯. মুসনাদে আহ্মাদ, সূত্র : ইসলাহুর রুসূম, পৃ. ৪৬।
৯০. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৭৩।
৯১. আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৭৮।
৯২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৬৪।
৯৩. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৭৬।
৯৪. আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৭৮।
৯৫. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৭০; সূত্র : আবূ দাউদ, রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ১৪৮।
৯৬. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৭০।
৯৭. আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৭১।
৯৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮৭।
৯৯. সহীহ্ ইব্ন খুযায়মা ও তা'লীকে বুখারী, সূত্র : মিশকাত টিকা, পৃ. ৪৪।
১০০. বুখারী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮৭।
১০১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮৮।
১০২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২১।
১০৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২০।
১০৪. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
১০৫. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৫০।
১০৬. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
১০৭. বেহেশতী জেওর, ৪র্থ খণ্ড।
১০৮. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৭৭।
১০৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪১৬।
১১০ মাসউলিয়্যাতুল আবিল মুসলিম ফী তারবিয়াতিল আওলাদ, পৃ. ৫৭।
১১১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১।
১১২. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫৮।
১১৩. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
১১৪. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪১৯।
১১৫. ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২১।
১১৬. বেহেশ্তি জেওর (বঙ্গানুবাদ), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৯।

১১৭. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
১১৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২২।
১১৯. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৪।
১২০. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৬।
১২১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৬।
১২২. বেহেশ্‌তি জেওর (বঙ্গানুবাদ), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৪।
১২৩. বেহেশ্‌তি জেওর (বঙ্গানুবাদ), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২।
১২৪. প্রাগুক্ত।
১২৫. বেহেশ্‌তি জেওর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮।
১২৬. মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ), পৃ. ৯৩৭।
১২৭. বেহেশ্‌তি জেওর (বঙ্গানুবাদ), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।
১২৮. বেহেশ্‌তি জেওর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮।
১২৯. তাম্বীহুল গাফিলীন, ফকীহ্ আবুল লাইস সমরকন্দী, পৃ. ৪৭।
১৩০. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৫১।
১৩১. প্রাগুক্ত।
১৩২. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৭।
১৩৩. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৭।
১৩৪. আবূ দাউদ, সূত্র : হুকূকুল উস্তাদ, পৃ. ২১।
১৩৫. তাবারানী, সূত্র : হুকূকুল উস্তাদ, পৃ. ৩২।
১৩৬. তিরমিযী ও আহ্‌মাদ, সূত্র : যাদুত্-তালিবীন, পৃ. ৩৪।
১৩৭. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩৩।
১৩৮. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৭৯।
১৩৯. মুসলিম ও তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮-৩৯।
১৪০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৫।
১৪১. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৪।
১৪২. বুখারী ও ইব্‌ন খুযায়মা, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৪।
১৪৩. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮২।
১৪৪. মুসলিম, সূত্র : রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ২৮৫।
১৪৫. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩।
১৪৬. আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩।
১৪৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১২।
১৪৮. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৬৯।
১৪৯. আহ্‌মাদ ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৭।
১৫০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫০।
১৫১. আবূ দাউদ ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩।

তৃতীয় অধ্যায়

ইল্‌ম-জ্ঞান

ইল্‌ম-এর ফযীলত ও গুরুত্ব

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। তাই প্রত্যেক মুসলিমকে সে কার আনুগত্য করবে, কিভাবে আনুগত্য করবে এবং কি কি কাজ থেকে বিরত থাকবে তা জানার জন্যে ইল্‌ম বা জ্ঞানের প্রয়োজন। এজন্যেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নুবূওয়াতের সূচনাতেই সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো হেরা গুহায় নাযিল করেন তাতে ইল্‌ম-এর গুরুত্ব প্রকাশ পায়। আয়াতগুলো হচ্ছে :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত।

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

(সূরা আলাক, ৯৬ : ১-৫।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে :

ক. মহান স্রষ্টার সর্বপ্রথম নির্দেশ হচ্ছে اقْرَأْ পড়।

খ. 'জমাট রক্তের' মত সাধারণ ও তুচ্ছ বস্তু থেকে 'মহিমান্বিত প্রতিপালক'-এর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে জ্ঞানসাধনাকে সেতুবন্ধন বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ. কলম-এর সাহায্যে তিনি মানব জাতিকে জ্ঞানদান করেছেন।

এই প্রথম প্রত্যাদেশ থেকেই ইল্‌মের ফযীলত সুস্পষ্ট।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ·

বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? (সূরা যুমার ৩৯ : ৯)

অন্য আয়াতে উল্লেখ রয়েছে :

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ·

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। (সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ٠

তিনি যাকে ইচ্ছা হিক্‌মাত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমাত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। (সূরা বাকারা, ২ : ২৬৯)

নবী কারীম (সা)-কে কিতাব ও হিকমাত দানের মাধ্যমে তাঁকে যে মহান মর্যাদা দান করা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ٠

আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিক্‌মাত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১১৩)

নবী কারীম (সা)-এর হাদীসে বক্তব্যটি এভাবে রয়েছে :

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ ٠

আল্লাহ্ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন। বস্তুত আমি বন্টনকারী এবং দাতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা।[১]

মানব জাতির চরম উৎকর্ষ সাধনকারী ইসলাম। তাই প্রতিটি মুসলমানের জন্যে জ্ঞানার্জনকে ফরয ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ٠

ইল্‌ম (জ্ঞান) অন্বেষণ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।[২]

আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হতে হলে অবশ্যই ইল্‌ম অর্জন করে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারসমূহ জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে রত থাকে, আল্লাহ্‌র কাছে তার মর্যাদা যে কত বেশি নিম্নবর্ণিত হাদীসটি তার প্রমাণ।

হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন :

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ لَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ اَلْاَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ ٠

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণের লক্ষ্যে পথ চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন। তালিব ইল্‌ম (শিক্ষার্থী)-এর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের ডানা তাঁদের জন্য বিছিয়ে দেন। আর আলিম-এর জন্যে আসমান-যমীনের সবকিছু ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমন কি পানির মাছও। আবিদ ব্যক্তির তুলনায়

আলিমের মর্যাদা ঠিক সেরূপ যেমনটি পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা সমস্ত তারকার তুলনায়। আলিমগণ হচ্ছেন, নবীগণের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কাউকে দীনার ও দিরহামের উত্তরাধিকারী করে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকারী করেন ইল্‌মের। যে ব্যক্তি তা অর্জন করল সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করল।[৩]

অন্য এক হাদীসে ইল্‌ম অর্জনকে সর্বোত্তম ইবাদত বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৪]

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ طَلَبُ الْعِلْمِ .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে :

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْعِلْمُ لِلّٰهِ إِنَّ الْعِلْمَ يَنْفَعُكَ مَعَهُ قَلِيْلُ الْعَمَلِ وَكَثِيْرُهُ وَإِنَّ الْجَهْلَ لاَ يَنْفَعُكَ مَعَهُ قَلِيْلُ الْعَمَلِ وَلاَ كَثِيْرُهُ .

সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহ্ বিষয়ক ইল্‌ম। নিঃসন্দেহে ইল্‌ম তোমার উপকারে আসবে, চাই তার সঙ্গে অল্প আমল হোক বা অধিক আমল হোক আর অজ্ঞতা তোমার কোনও উপকারে আসবে না, চাই তার সাথে অল্প আমলই থাক বা অধিক আমলই থাক।[৫]

ইল্‌মের উৎস : ওহীভিত্তিক ইল্‌ম

আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের অন্যতম দু'টি নাম হলো عَلِيْمٌ وَحَكِيْمٌ (আলীম ও হাকীম) অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাবান। কুরআন শরীফের অসংখ্য স্থানে তাঁর এ দু'টি গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইল্‌ম বা জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হচ্ছেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজে। তিনি দয়া করে যাকে যতটুকু ইল্‌ম দান করছেন, সে ততটুকু জ্ঞানই লাভ করেছে। তাই সৃষ্টির প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا .

আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা বাকারা, ২ : ৩১)

বলাবাহুল্য, বস্তুসমূহের নামই শুধু নয়, এগুলোর বস্তুগুণ এবং বৈশিষ্ট্যসমূহও আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন বলে তাফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। [দ্র: বয়ানুল কুরআন, হযরত থানভী; তাফসীরে উসমানী; তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী' (র)]

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফিরিশ্‌তাগণকে সেসব বস্তুর নাম বলতে আদেশ করলেন তখন তাঁরা যে জবাব দিয়েছিলেন তা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, সকল জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁরা বলেছিলেন :

سُبْحٰنَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ .

আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা, ২ : ৩২)

সূরা আলে ইমরানে নিম্নোক্ত আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষালাভের পূর্বে মানুষ স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। ইরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔

আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল (সা) প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ্ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন, যদিও তাঁরা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৪)

ইল্ম বা জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হচ্ছে ওহী বা আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যাদেশ। এই ওহীর মাধ্যমেই যেহেতু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। (সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ৩) এবং আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۔

রাসূল (সা) তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশ্‌র, ৫৯ : ৭)

সুতরাং নবী কারীম (সা) তাঁর হাদীসের মাধ্যমে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাও ওহীভিত্তিক ইল্ম। হাদীস বিশারদগণ তাই হাদীসকে 'ওহীয়ে গায়ের-মাতলূ' নামে অভিহিত করেন।

কুরআন এবং হাদীসের এই ওহীভিত্তিক জ্ঞানসম্ভার থেকে যাঁরা সরাসরি উপকৃত হয়ে নিজেদেরকে আকাশের নক্ষত্রসম আলোর দিশারীরূপে গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন সেই সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে যে ইল্ম বা জ্ঞানসম্ভার পাওয়া যায়, তাও নির্ভরযোগ্য ইল্ম। তাই বিশ্বখ্যাত ইসলামী মনীষী ইমাম আওযাঈ (র) তাঁর শাগরিদ বাকিয়্যাকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

يَا بَقِيَّةُ الْعِلْمُ مَا جَاءَ عَنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ۔

হে বাকিয়্যা! ইল্ম হচ্ছে তা-ই যা মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীগণের নিকট থেকে অর্থাৎ তাঁদের মাধ্যমে এসেছে।[৬]

এই ইল্মই হচ্ছে মানুষের জীবনের দিক-দিশারী ও পরকালের সম্বল। এই ইল্মের দ্বারাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারসমূহ্ জানা যায় এবং সেমতে আমল করে ইহ্‌লৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভ করা যায়। এ জন্যেই ওহীভিত্তিক ইল্মের অধিকারীগণকেই আলিমরূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এঁরাই মহানবী (সা)-এর হাদীসে বর্ণিত 'ওরাসাতুল আম্বিয়া' বা 'নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারী'। মানব জাতির হিদায়াতের গুরুদায়িত্ব এই ওহীভিত্তিক ইল্ম এবং তার আলিমগণের সাথেই সম্পৃক্ত। পার্থিব সুখ-সম্ভোগ বা চাওয়া পাওয়া নয়। মানুষের নৈতিক উন্নতি এবং পারলৌকিক পরিত্রাণই তাঁদের গবেষণা ও সাধনার বিষয়বস্তু। দুনিয়া হাসিল করা এই ইল্মের উদ্দেশ্য নয়। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম (সা)-এর স্পষ্ট সতর্কবাণী রয়েছে। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে ইল্ম হাসিল করা হয় তা যদি কেউ পার্থিব কোন স্বার্থ হাসিলের জন্যে অর্জন করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[৭]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিভিত্তিক ইল্‌ম

পক্ষান্তরে আরও কিছু বিদ্যা আছে যা মানুষ তার ইন্দ্রিয় শক্তি, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করে থাকে। এগুলোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিভিত্তিক ইল্‌ম নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

মানুষের এ জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

এবং তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৮৫)

মানুষের ইন্দ্রিয়ের শক্তি যেহেতু খুবই সীমাবদ্ধ, তাই তার জ্ঞানও একান্তই সীমাবদ্ধ।

ইসলামী শিক্ষার প্রকারভেদ

ইল্‌ম তলব করা বা জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয হলেও সকল ইল্‌ম অর্জন কিন্তু এক পর্যায়ের ফরয নয়; বরং এর বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। সে হিসাবে ইলম তিন পর্যায়ের :

ফরযে আইন

দীনী সম্পর্কীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির ইল্‌ম হাসিল করা ফরযে আইন, যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এ পর্যায়ে রয়েছে, ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহ শিক্ষা করা অর্থাৎ যে সমস্ত আকীদা পোষণ করা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বলা চলে না, সেই বিশ্বাসাবলীর জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। ঈমানে মুফাস্সালে এসব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

আমি ঈমান আনলাম : ১. আল্লাহ্র প্রতি, ২. তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি, ৩. তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, ৪. তাঁর রাসূলগণের প্রতি, ৫. আখিরাতের প্রতি, ৬. তাক্‌দীরের ভালমন্দ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, এর প্রতি এবং ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

কুরআন শরীফের সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ রুকূতে এবং অন্যান্য সূরায় এ বিশ্বাসসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর ইল্‌ম হাসিল করা ফরযে আইন।

অনুরূপ পাকী না-পাকীর আহ্‌কাম ও মাসাইল, নামায-রোযাসহ অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব ইবাদত এবং হারাম ও মাকরূহ বিষয়সমূহ সম্পর্কে ইল্‌ম হাসিল করা ফরযে আইন। হজ্জ যার উপর ফরয তার জন্যে হজ্জের মাস্‌আলা জানা, বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানায় নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা এবং বিবাহ-শাদীর উদ্যোগ গ্রহণকারীর জন্য বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন।

কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তাঁর বিখ্যাত 'তাফসীরে মাযহারী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, করণীয় ও বর্জনীয় বাতেনী আমলসমূহ যেগুলোর জ্ঞানকে 'ইল্‌মে তাসাওউফ' বলা হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেকের জন্য ফরযে আইন।

এ ক্ষেত্রে ফরযে আইন বলতে ইল্‌মে তাসাওউফের কেবল ঐ অংশের জ্ঞানকে বুঝায় যে অংশে ফরয-ওয়াজিব পর্যায়ের বাতেনী আমলের বিবরণ রয়েছে। যেমন বিশুদ্ধ আকাইদ, সবর-শোকর, কানা'আত (অল্পে তুষ্টি) ইত্যাদির এক বিশেষ স্তর পর্যন্ত।

পক্ষান্তরে, গর্ব-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, দুনিয়ার মোহ ইত্যাদি কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে হারাম। এ সব বিষয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া, গ্রহণীয় বিষয়সমূহ অর্জন করা এবং হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। এ সকল বিষয়ের উপরই ইল্‌মে তাসাওউফের ভিত্তি যা শিক্ষা করা সকলের জন্য ফরযে আইন।

ফরযে কিফায়া

যে সমস্ত ইল্‌ম জরুরী বটে, কিন্তু সকলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করা আবশ্যিক নয়, সমাজের এক শ্রেণী বিশেষভাবে তা অর্জন করলেই গোটা সমাজ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। এই ইল্‌মকে ফরযে কিফায়া পর্যায়ের ইল্‌ম বলা হয়ে থাকে।

মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র)-এর 'তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' গ্রন্থে ফরযে কিফায়া ইল্‌মের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : গোটা কুরআন মাজীদের সম্পূর্ণ অর্থ জানা এবং কুরআনে বর্ণিত সকল বিষয় অনুধাবন করা, হাদীসের মর্ম উলবব্ধি করা, হাদীস শাস্ত্রের বুৎপত্তি অর্জন এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে গৃহীত বিধানাবলীর জ্ঞান লাভ করা এতো ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, গোটা জীবন ব্যয় করেও এতে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই ইসলামী শরী'আতে একে ফরযে কিফায়া বলে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক এই সকল জ্ঞান অর্জন করে নিলেই অন্যান্যরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।[৮]

চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান প্রভৃতিও এ পর্যায়ে পড়ে। সমাজের একাংশ এ বিদ্যা অর্জন করলেই গোটা সমাজ এরদ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মু'আমালাত, অসিয়্যাত ও ফারাইয বা উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাও এ পর্যায়েরই ইল্‌ম।

নফল ইল্‌ম

নফল শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত। শরী'আতের দৃষ্টিতে ফরয, ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক পর্যায়ের নয়, অথচ এর বিনিময়ে সাওয়াব লাভ হয়, এগুলোর ইল্‌ম হাসিল করা নফল।

নফল ইবাদত সম্পর্কে ইল্‌ম অর্জন করা এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে,

ফরয সংক্রান্ত বিষয়াদির ইল্‌ম হাসিল করা ফরয।

ওয়াজিব সংক্রান্ত বিষয়াদির ইল্‌ম হাসিল করা ওয়াজিব।

নফল সংক্রান্ত বিষয়াদির ইল্‌ম হাসিল করা নফল।

বর্জনীয় বিষয়

বিদ্যা নামে কিছু কিছু বিষয় এমনও আছে যেগুলো মানবাত্মা তথা মানজাতির জন্যে রীতিমত ক্ষতিকর। অশ্লীল শিক্ষা ও সাহিত্য, অপসংস্কৃতি, যাদু-টোনা, ভবিষ্যদ্বাণী, কূটতর্ক ইত্যাদি এ পর্যায়ে পড়ে।

অশ্লীল সাহিত্য

লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ। কিন্তু এমনকিছু বইপত্র ও পত্রিকা ম্যাগাজিন রয়েছে যেগুলোতে অশ্লীল কথাবার্তা ও কুরুচিপূর্ণ ছবিতে ভরপুর। এগুলোকে ইংরেজীতে 'পর্ণোগ্রাফী' বলা হয়ে থাকে। কোমলমতি বালক-বালিকাদের সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশের সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে এগুলো তাদেরকে অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেয়। অধুনা সিনেমা, ভিসিআর এবং ডিশ এন্টিনার সুবাদে বিদেশী ন্যক্কারজনক যৌনতাপূর্ণ ব্লু ফিল্ম মহামারীর মত কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র বিনষ্ট করছে। সাহিত্য ও প্রচার মাধ্যমগুলো বিজ্ঞানের নিত্য নতুন উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সুসজ্জিত হয়ে পূর্বের তুলনায় শত সহস্রগুণে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে ভবিষ্যত প্রজন্মকে নীতি-নৈতিকতার পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। আপত্তিকর কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাসের সাহায্যে ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী জীবনবোধ ও ঈমান-আকীদা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলা হচ্ছে। যে সমস্ত সাহিত্যকর্ম আমাদের তরুণ-তরুণীদেরকে বিপথগামী ও হীনমন্যতাগ্রস্ত করে তোলে, এগুলো অবশ্যই বিষতুল্য পরিত্যজ্য। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ·

যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মান্তিক শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা নূর ২৪ : ১৯)

যাদু-টোনা, ভবিষ্যত গণনা

যাদু-টোনা এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শির্‌ক এবং পাপাচার অবলম্বনে জিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেওয়া হয় এবং মানুষের ক্ষতিসাধন করা হয়। এ জাতীয় যাদু-টোনা কুফ্‌রীর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন শরীফে যাদু-টোনাকে অনিষ্টকর বিদ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরদ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি ও তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনষ্ট ছাড়া কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। (সূরা বাকারা, ২ : ১০২)

হাদীস শরীফে একে ধ্বংসাত্মক কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৯]

জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার মাধ্যমে বা হাতের রেখার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা, ভবিষ্যতের নিশ্চিত জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَئٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلٰوَاتُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ·

যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন কিছু জানতে চায়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না।[১০]

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে :

اَلْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ ·

জ্যোতিষী হল গণক আর গণক হল যাদুকর।

তাই জ্যোতিষী বা গণকের কাছে যাওয়া এবং তাদের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের পরিপন্থি কাজ। সকল মু'মিনের এ কাজ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।[১১]

কূটতর্ক

কূটতর্ক লিপ্ত হওয়া নিন্দনীয় ও দূষণীয় কাজ। এতে সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পরিবর্তে মানুষের মনে জেদের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। জেদের বশবর্তী হয়ে মানুষ প্রতিপক্ষকে জব্দ ও হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালায়। পরিণামে মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্ব-কলহ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই অপসন্দনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ۔

তারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এ কথা বলে, বস্তুত এরা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৮)

কূটতর্কের অপকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللهِ الاَلَدُّ الْخَصِمَ ۔

বাক-বিতণ্ডাকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যধিক অপসন্দনীয়।[১২]

কাজেই অহেতুক কূটতর্ক ও ঝগড়া-বিতণ্ডা থেকে সকলেরই বিরত থাকা একান্ত অপরিহার্য।

ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্ব

ইল্ম অর্জনের ব্যাপারে অনুকূল পরিবেশ একটা মৌলিক বিষয়। ইল্ম অর্জনে সফলতা লাভের জন্য পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি পরিবারে যেমন জ্ঞানার্জনের অনুকূল নিরিবিলি পরিবেশের প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কোলাহলময় স্থান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের অভাব বিদ্যা অর্জনের পথে বিরাট অন্তরায়। উপযুক্ত শিক্ষক, সহায়ক পুস্তকসমৃদ্ধ পাঠাগার ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের জন্য সহজলভ্য করতে হবে। বাড়িতে অভিভাবকগণকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসে শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্রাবাস কর্তৃপক্ষকে এদিকে যথেষ্ট মনোযোগী থাকতে হবে।

শৈশবকাল থেকেই শিশুদেরকে সুশিক্ষা প্রদানের প্রতি যত্নবান হতে হবে। এ সময়ের শিক্ষাই তার ভবিষ্যত জীবনের দিক-দিশারী হিসাবে কাজ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَثَلُ الَّذِىْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ فِىْ صِغَرِهِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ وَمَثَلُ الَّذِىْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ فِى كِبَرِهِ كَالَّذِىْ يَكْتُبُ عَلَى الْمَاءِ ۔

শৈশবকালে ইলম শিক্ষা করা পাথরে কারুকার্য খচিত করার ন্যায়। আর বৃদ্ধকালে ইলম শিক্ষা করা পানির উপর লেখার ন্যায়।[১৩]

শিক্ষার্থীদেরকে সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রদান করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে কোনরূপ খিয়ানাত করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

تَنَاصَحُوْا فِى الْعِلْمِ فَاِنَّ خِيَانَةَ اَحَدِكُمْ فِىْ عِلْمِهِ اَشَدُّ مِنْ خِيَانَةٍ فِىْ مَالِهِ وَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

ইলম শিক্ষাদানে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তোমরা পরস্পরে উপদেশ দিবে। কেননা সম্পদের খিয়ানাতের তুলনায় ইলমের খিয়ানাত মারাত্মক দূষণীয় বিষয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন।[১৪]

শিক্ষার্থীদের মেধা ও চারিত্রিক গুণাবলীর উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎসাহিত করার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যথাসময় পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ এবং মেধাভিত্তিক পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান না থাকলে মেধাবী শিক্ষার্থী এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীও শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে সক্ষম হবেন না।

রাজনৈতিক কোন্দল, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মুক্ত রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা রক্ষা ও পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে সহশিক্ষার পরিবর্তে ছেলেমেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়। যৌবনের প্রারম্ভে সহশিক্ষার কুপ্রভাবে প্রায়শঃই ছেলেমেয়েদের চারিত্রিক স্খলন ঘটে। শিক্ষার পরিবেশকে এ অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখা অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা অত্যাবশ্যক।

উপরোক্ত বিষয়াদির ব্যাপারে যত্নবান হলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে।

শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

সুষ্ঠুভাবে ইল্‌ম অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক তার মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. শিক্ষার্থীর নিয়্যাত খালিস হতে হবে। তার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। হাদীসে আছে, প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।

২. শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রকার লোভ-লালসা ও চারিত্রিক অধঃপতন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত ইমাম শাফিঈ (র)-এর বিখ্যাত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِىْ - فَاَوْصَانِىْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِىْ - فَاِنَّ الْعِلْمَ فَضْلُ مِنْ اِلٰهِىْ - وَفَضْلُ اللّٰهِ لاَ يُعْطٰى لِعَاصِىْ .

আমি ওয়াকী' (র)-এর কাছে আমার স্মরণশক্তির দুর্বলতার অনুযোগ করলে তিনি আমাকে পাপ পঙ্কিলতা পরিহারের উপদেশ দেন। কেননা, ইলম হচ্ছে আল্লাহ্‌র একটি দান আর আল্লাহ্‌র দান পাপী ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় না।

৩. জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীর একাগ্রতা থাকা আবশ্যক। কোন এক মনীষী বলেছেন, "ইলম চায় তোমার পূর্ণ ও আশু মনোযোগ। তুমি যদি পুরোপুরি আত্মনিবেদিত না হও, তবে ইলম তার কোন অংশও তোমাকে দিবে না।"

৪. উস্তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল থাকতে হবে যেমনটি থাকে ব্যক্তি তার চিকিৎসকের প্রতি।

৫. উস্তাদের আযমত ও সম্ভ্রম অন্তরে পোষণ করবে এবং আচার-আচরণে পূর্ণ শিষ্টাচার রক্ষা করবে। তাঁর আসনে কখনো বসবে না। তাঁর সম্মুখে চিৎকার করে কথা বলবে না। তাঁর সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হবে না। তবে শিক্ষা বা পাঠসংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকলে আদব বজায় রেখে প্রশ্ন করতে আপত্তি নেই। এমন কোন প্রশ্ন করবে না যাতে শিক্ষক লজ্জার সম্মুখীন হন।

৬. উস্তাদ ছাড়াও যে কোন বিজ্ঞ ও বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির এবং শিক্ষা উপকরণ এবং কিতাব-পত্র প্রভৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

৭. উস্তাদের বক্তব্য নোট করে নিবে এবং সহপাঠীদের সাথে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা করবে।

৮. সহপাঠীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে এবং সম্প্রীতিমূলক আচরণ করবে।

৯. যে ইল্ম শিক্ষা করবে সাথে সাথে তার উপর আমল করবে। কেননা আমলই হচ্ছে ইল্ম হাসিলের উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তি যদি কেবল অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করার মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেয় অথচ সেগুলো নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের কাজে ব্যয় না করে, তবে এ উপার্জন ও সঞ্চয় মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া যে ইল্ম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইলমে উন্নতিও দান করেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১০. বাহ্যিক ইল্ম হাসিলের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতির এবং আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে যাবে।

১১. ইলমকে মহাসম্পদরূপে জ্ঞান করবে এবং এ মহাসম্পদের তুলনায় পার্থিব সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। পার্থিব সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ হবে না। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-এর অমর পংক্তি স্মরণীয় :

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالٌ ·

মহা প্রতাপান্বিত প্রভু আমাদের ব্যাপারে ভাগ-বন্টনের যে ফয়সালা করেছেন তাতে আমরা তুষ্ট। তিনি আমাদের জন্যে রেখেছেন ইল্ম আর শত্রুদেরকে দিয়েছেন সম্পদ।

১২. সর্বাবস্থায় জাহিল, দুশ্চরিত্রদের সঙ্গ পরিহার করে চলবে। কেননা, মনীষীগণ বলেন :

اَلصُّحْبَةُ مُؤَثِّرَةٌ ·

সাহচর্য প্রভাব বিস্তারকারী। অর্থাৎ অসৎ লোকদের সাহচর্য সংক্রামক রোগের মত মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই তাদের সংসর্গ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

হযরত আলী (রা) বলেন :

اَلْجُهَّالُ لِلْعِلْمِ اَعْدَاءٌ ·

জাহিলরা (মূর্খরা) হচ্ছে ইল্মের শত্রু।

১৩. সর্বপ্রকার কূটতর্ক ও বাদানুবাদ পরিহার করে চলবে। কেননা বাদানুবাদের উদ্দেশ্য প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে অন্যকে জব্দ করে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করা। এটা কোন প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়। ইমাম গাযালী (র) এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

১৪. শিক্ষার্থীকে আত্মমর্যাদাশীল হতে হবে এবং গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলতে হবে। যাতে অন্যের মুখাপেক্ষী না হতে হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় কোন অর্থকরী বিদ্যাও শিখে নেওয়া

উচিত। এজন্যে প্রাথমিক যুগে আলিমগণ 'ইলমে তিব্ব' (চিকিৎসা বিদ্যা) বা অন্য কোন অর্থকরী বিদ্যাও শিখে নিতেন।

এ প্রসঙ্গে স্মতর্ব্য, মুসলিম বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ লোকের ধর্মীয় ইমাম, ইমামে আযম বলে বিশ্বখ্যাত হযরত আবূ হানীফা (র) বস্ত্র ব্যবসায়ী তথা বয়ন শিল্পী ছিলেন। বিখ্যাত মোগল সম্রাট আলমগীর জিন্দাপীর নামে খ্যাত সম্রাট আওরঙ্গজেব কুরআনের লিপিকর্মের দ্বারা তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। তাঁরও পূর্বে দিল্লী সম্রাট নাসিরউদ্দীন টুপী সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁরা রাজকোষ থেকে কোন বেতন-ভাতা নিতেন না।

১৫. বিষয় নির্বাচন ও পরামর্শ—প্রত্যেকের রুচি ও মেধা একরকম হয় না বিধায় শিক্ষার্থীকে তার রুচি মাফিক বিষয় নির্বাচন করে নিতে হবে এবং এজন্যে শিক্ষকগণের বা অন্যান্য বিজ্ঞজনের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

১৬. সময়ানুবর্তিতা—শিক্ষার্থীকে অবশ্যই সময়নিষ্ঠ এবং সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী হতে হবে। তাকে সময়মত পানাহার, নামায আদায় ও বিশ্রাম নিতে হবে এবং সময়মত পড়ার টেবিলে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাযির থাকতে হবে। নির্ঘন্ট ঠিক করে তা মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে জীবনে শৃঙ্খলাবোধ ও সময়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৭. শিক্ষা সফর—শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে ভ্রমণ করা বাঞ্ছনীয়। এতে ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রাচীন নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করা যায়।

১৮. প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষার ব্যাপারে অন্যদেরকে উৎসাহিত করবে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষকের গুণাবলী ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

শিক্ষকের উচ্চ ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই শিক্ষককে উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে।

শিক্ষকের ভাষা সাবলীল, উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং বর্ণনাভঙ্গি শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।"

তিনি আরও বলেন : اَنَا اَفْصَحُكُمْ "আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রাঞ্জলভাষী।"

শ্রোতাদের বোঝার সুবিধার্থে তিনি এক-একটি কথা অনেক সময় তিনবার করে উচ্চারণ করতেন। আর সে যুগে শিক্ষাদান কর্ম পরিচালিতই হতো বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে। হাদীসের সুবিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার মূলত মৌখিকভাবে এবং বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছিল।

শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন সে বিষয়ে তিনি প্রথমে ভালভাবে জ্ঞান আহরণ করে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্ত আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীগণ তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। এতে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনে উচ্চধারণা সৃষ্টি হবে এবং শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষক তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কোন কোন সময় শিক্ষার্থীদেরকে তার বক্তব্য বিষয় তারা কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে তার পরীক্ষা স্বরূপ প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করবেন। পারস্পরিক

কথোপকথনের মাধ্যমে তাদেরকে তাঁর বক্তব্যের প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী করে তুলতে প্রয়াস পাবেন। এতে ছাত্র ও শিক্ষকের দূরত্ব অনেকটা কমে এসে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হবে। এটা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভের সহায়ক হয়ে থাকে।

শিক্ষকের কোন বক্তব্য শিক্ষার্থীর কাছে অস্পষ্ট মনে হলে নির্দ্বিধায় শিক্ষককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে তার জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নেবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ ۔

"অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।"[১৫]

তবে উস্তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আদব-কায়দার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তার উদ্দেশ্য একান্তই জ্ঞান অর্জন হতে হবে। উস্তাদকে বিব্রত করা বা নিজের বাহাদুরী দেখানো নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে অনেক সময় বিভিন্ন প্রশ্ন করে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতেন। আবার সাহাবায়ে কিরামও বিভিন্ন বিষয় নির্দ্বিধায় তাঁর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন।

শিক্ষকের বর্ণনাভঙ্গি আকর্ষণীয় হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠে। এ জন্যে শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের বর্ণনা যাতে চিত্তাকর্ষক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষণীয় বিষয়ের মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদির অবতারণা যেন মূল বিষয়কে শিক্ষার্থীদের মানসপট থেকে আড়াল করে না দেয় সেদিকে শিক্ষককে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানকালে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব অত্যধিক। তাই এ সময়ে শিক্ষক যথাসাধ্য শিক্ষার্থীদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের চেষ্টা করবেন। শ্রেণীকক্ষে বড় আকৃতির ব্ল্যাকবোর্ড থাকবে এবং প্রয়োজনমত শিক্ষক নিজে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বা তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ লিখে দিবেন। মাঝে মধ্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারাও লেখাবার বা অঙ্ক কষাবার চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থী কোথাও আটকে গেলে নিজে সাহায্য করবেন। এভাবে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একখানা হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : "সালাত তোমরা ঠিক তেমনিভাবে আদায় করবে যেমনটি আমাকে আদায় করতে দেখ।"

এ হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সালাত আদায়ের পদ্ধতি হাতে-কলমেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক অবস্থায় বাস্তবভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষকের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। মর্যাদার দিক দিয়ে শিক্ষকও পিতামাতার তুল্য। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) বলেন, "যার কাছে আমি একটি শব্দও শিখেছি আমি তার গোলাম। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রি করে দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে আযাদ করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে গোলাম বানিয়েও রাখতে পারেন।"[১৬]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) জীবনে কোন দিন তাঁর উস্তাদের বাড়ির দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেননি এবং তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ (র) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কেবল এ আশঙ্কায় নিজে মাদ্‌রাসা খুলে শিক্ষাদানে ব্রতী হননি যে, পাছে তাঁর উস্তাদের শাগরিদগণ উস্তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে তাঁর প্রতিষ্ঠানে এসে ভর্তি হয়ে পড়ে আর বাহ্যত তিনি উস্তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যান। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের পুত্রদ্বয় ও তাঁদের উস্তাদের ঘটনা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। একদিন তিনি যখন দূর থেকে লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর এক পুত্র উস্তাদের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর তিনি নিজে হাত দিয়ে পা পরিষ্কার করছেন। তখন শাহী দরবারে উস্তাদকে তলব করে এই বলে ভর্ৎসনা করেন যে, আমার পুত্রদেরকে আপনি কি আদব-কায়দা শিক্ষা দিলেন ? তাঁরা কেন নিজ হাতে আপনার পা ধুয়ে দিল না ?

সুতরাং উস্তাদ ছাত্রদের জন্য পিতৃতুল্য সম্মানের পাত্র। শিক্ষককেও তাঁর ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল হতে হবে এবং পিতৃস্নেহ দিয়ে আপন সন্তানের মত তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২।
২. ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৪
৩. আবূ দাউদ ও তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৪।
৪. জামি' সাগীর, পৃ. ৪৯।
৫. কানযুল হাকাইক ফী হাদীসি খায়রিল খালাইক, জামি' সগীরের পাদটিকা।
৬. জামিউ বয়ানিল ইল্‌ম ওয়া ফাযলিহী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০।
৭. আহমদ ও আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৪-৩৫।
৮. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃ. ৫৯৭।
৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৭।
১০. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৯৩।
১১. রাজীন, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৯৪।
১২. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।
১৩. রিয়াদুস সুন্নাহ্ (কবীর) পৃ. ৫০।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫৫।
১৬. তালীমুল মুতা'আল্লিম।

চতুর্থ অধ্যায়

তাহারাত বা পবিত্রতা

তাহারাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

'তাহারাত' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা। শরী'আতের পরিভাষায় শরীরের বিশেষ অঙ্গসমূহ বিশেষ পদ্ধতিতে ধৌত করাকে 'তাহারাত' বলা হয়। ভিন্ন মতে, নাপাকী ও হদস্ দূর করাকে 'তাহারাত' বলা হয়।[১]

ইসলামে তাহারাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম যদিও এমন এক দেশে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে যেখানে পানির ব্যবস্থা ছিল খুবই কম। তবুও ইসলাম বিশেষ অবস্থায় গোসল করাকে ফরয সাব্যস্ত করেছে। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর উভয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র হবে না এবং নামাযও আদায় করতে পারবে না। ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ٠

যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে যাও তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৬)

নামায আদায়ের জন্য পরিধেয় বস্ত্রও পাক হওয়া আবশ্যক। ইসলামী শরী'আত এই পবিত্রতাকে অপরিহার্য করেছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٠

তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ : ৪)

যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা কোন রোগের কারণে পানি ব্যবহার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে পবিত্র মাটিদ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ٠

তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হও এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটিদ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে মাসেহ করবে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৬)

অনুরূপ জুমু'আর দিন নামায আদায়ের পূর্বে গোসলের হুকুম দেওয়া হয়েছে, যেন মানুষ গোসলের মাধ্যমে পাক-সাফ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে জুমু'আর জামা'আতে শরীক হতে পারে এবং অপরিচ্ছন্নতা ও দেহের দুর্গন্ধের কারণে যেন কোন নামাযীর কষ্ট না হয়। পেশাব-পায়খানার পর ইস্তিন্জা করা এবং নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে ময়লা দূর করা অপরিহার্য করা হয়েছে।

এই নির্দেশাবলীর দ্বারা জানা যায় যে, ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এমনকি একে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ·

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।[২]

শুধু তাই নয়, বরং পবিত্রতা অর্জন করাকে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা লাভের উপায় বলে কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ·

আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকেন তাদেরকেও। (সূরা বাকারা, ২ : ২২২)

মুসলমান যেন পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার পাবন্দী করে এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত থাকে, এ লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উম্মাতের জন্য কিছু বিধি-বিধান জারী করেছেন, যা সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিনবার হাত না ধোয়া পর্যন্ত পানির পাত্রে হাত ঢুকাবে না। কেননা, নিদ্রা অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল তা তার জানা নেই।[৩]

এই হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, জাগ্রত অবস্থায় এবং নিদ্রিত অবস্থায় তথা সর্বদাই পাক-পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নিদ্রাবস্থায় কোন স্বপ্নের কারণে যদি শরীর নাপাক হয়ে যায় তবে গোসল করা অপরিহার্য। হাতের পবিত্রতার প্রতি এ জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে যাতে নাপাক হাত পানিতে ভিজে পাক পানিকে নাপাক না করে দেয়। কাজেই ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নাপাক হাত কোনক্রমেই পানির পাত্রে ঢুকাবে না।

দাঁতে জমে থাকা ময়লার কারণে নানা রকমের পীড়া সৃষ্টি হয়। এজন্য দাঁত পরিষ্কার করাকে শরী'আতে সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন : যদি আমার উম্মাতের উপর কঠিন ও কষ্টকর না হত তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্ওয়াক করার হুকুম করতাম।[৪]

একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হলেন। তাদের দাঁত অপরিষ্কার হওয়ার দরুণ লাল দেখাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের দাঁত লাল দেখছি কেন ? তোমরা মিস্ওয়াক করো না?[৫]

রাস্তায় চলাচলকারী লোকদের এবং বৃক্ষের নিচে আশ্রয়গ্রহণকারী পথিকদের যেন ময়লা আবর্জনা দুর্গন্ধে কষ্ট না হয় এ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তিনটি লা'নতযোগ্য কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। অর্থাৎ পানির ঘাট, চলার পথ এবং গাছের ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা থেকে বেঁচে থাকবে।[৬]

স্থির পানিতে পেশাব করে পুনরায় তাতে গোসল করা ইসলামী বিধানমতে বৈধ নয়। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করা ইসলামে নিষিদ্ধ, কেননা এভাবে পেশাব করলে পেশাবের ছিটাফোটা শরীরে লাগার আশংকা

রয়েছে। এমনকি শক্ত মাটিতে পেশাব না করে নরম মাটিতে পেশাব করার হুকুম করা হয়েছে। কেননা শক্ত ও কঠিন যমীনে পেশাব করলে এর ছিঁটাফোটা শরীরে ফিরে আসার আশংকা থাকে। কাজেই পেশাবের স্থানের মাটি যেন নরম ও ঢালু হয় এ দিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক। গোসলখানায় পেশাব করাও শরী'আতে নিষিদ্ধ। বিশেষভাবে যদি এর মাটি কাঁচা থাকে এবং পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে। কেননা এরূপ গোসলখানায় পেশাব করলে গোসলের সময় পেশাব মিশ্রিত পানির ছিঁটা শরীরে লেগে শরীর নাপাক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। যদি তা নাও হয় তথাপি নাপাক হওয়ার সন্দেহ মনের মাঝে অবশ্যই জাগ্রত হবে। পেশাব-পায়খানা করার পর ইস্‌তিন্‌জা করার বিধান শরী'আতে রয়েছে। মাটির ঢেলা অথবা অন্য কোন এমন পবিত্র জিনিস যা মানুষ ও জিনের খাদ্যদ্রব্য নয়, তবে নাজাসাতকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে—এরদ্বারা পরিষ্কার করার পর পানি দ্বারা তা ধুয়ে নেওয়া উত্তম। পবিত্রতা অর্জনের পর পানি ছাড়া শুধু মাটির দ্বারা হাত পরিষ্কার করার কথাও হাদীসে রয়েছে। এতে ব্যবহৃত হাতের মধ্যে কোন প্রকার দূষিত জীবাণু থাকার আশংকা থাকে না। এ কাজে বাম হাত ব্যবহার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। ডান হাত ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন গোসল করা, কাপড় ধোয়া, কাপড় পরিবর্তন করা, আতর ব্যবহার করা এবং তৈল মাখা খুবই উত্তম কাজ।

জুমু'আর দিন গোসল করার ব্যাপারে ইসলামে জোর তাকীদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আরবের লোকেরা চামড়া জাতীয় ভারী পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। মেহনত ও মজদুরীর উপর তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাছাড়া মসজিদ ছিল খুবই সংকীর্ণ এবং ছাদ ছিল খুবই নিচু। আর মসজিদের ছাদ নির্মিত হত নানা প্রকার পত্র-পল্লব দ্বারা। একবার গরমের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আগমন করলেন। তখন চামড়ার পোশাক পরিধানের কারণে উপস্থিত লোকজন ঘর্মাসিক্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁদের দেহের দুর্গন্ধ মসজিদের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দুর্গন্ধ অনুভব করলেন এবং বললেন : হে লোক সকল! শুক্রবার আসলে তোমরা গোসল করবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী উত্তম তৈল ও খুশবু ব্যবহার করবে।[৭]

জুমু'আর দিন ছাড়া অন্যান্য সময়ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস ব্যবহার করে বা আহার করে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। কেননা এতে উপস্থিত মুসল্লীদের কষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে।

দৈহিক ও পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা জুমু'আর দিনের সাথেই কেবল সম্পৃক্ত নয়; বরং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার এ হুকুম জীবনের সকল অবস্থার সাথেই সম্পর্কিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত ও অপরিচ্ছন্ন। তখন তিনি বললেন : তার মাথার চুল পরিপাটি করার কোন কিছু নেই কি? আরেকবার তিনি অপর এক

ব্যক্তিকে ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বললেন, এ ব্যক্তিটি কি কাপড় ধোয়ার মত কোন পানি পায় না ?

মোটকথা, ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইমাম গাযালী (র)-এর মতে তাহারাত-এর চারটি স্তর রয়েছে :

এক. বাহ্যিক পবিত্রতা।

দুই. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ পাপাচার থেকে পবিত্র রাখা।

তিন. অন্তরকে অসৎ চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা।

চার. মন-মস্তিষ্ককে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা।

উপরোক্ত স্তর চতুষ্টয়ের একটি অপরটির সাথে পর্যায়ক্রমে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাহ্যিক নাপাকী থেকে পবিত্র করা। তারপর এগুলোকে পাপাচার হতে মুক্ত রাখা। তারপর অন্তর পাক-পবিত্র রাখা। অবশেষে মন-মস্তিষ্ক আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু থেকে পবিত্র রাখার সাধনায় আত্মনিয়োগ করা।[৮]

তাহারাতের উপকারিতা ও ফযীলত

তাহারাতের উপকারিতা অনেক। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, পবিত্রতার বদৌলতে মানুষ মহান মর্যাদার অধিকারী হয়। মানুষের অন্তরাত্মা পশুত্বের প্রভাবমুক্ত হয়ে ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এতে বান্দার গুনাহ্ মাফ হয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল হয়। পবিত্রতা মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে। এতে শরীর ও মন সজীব এবং সতেজ হয়। হৃদয়ে প্রফুল্লতা হাসিল হয়। ইবাদতের স্বাদ অনুভূত হয়।[৯]

হাদীস শরীফে তাহারাতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "সালাতের চাবি হল তাহারাত।"[১০]

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "যখন কোন মুসলিম অথবা মু'মিন বান্দা উযূ করে আর সে তার মুখ ধোয় তখন উযূর পানি অথবা উযূর পানির শেষ ফোটার সাথে সাথে তার চেহারা থেকে সব গুনাহ্ বের হয়ে যায়, যা সে তার দু'চোখ দিয়ে করেছিল। তখন সে তার দু'হাত ধোয় তখন উযূর পানি অথবা উযূর পানির শেষ ফোটার সাথে সাথে তার উভয় হাত থেকে সকল গুনাহ্ বের হয়ে যায়, যা সে হাত দিয়ে করেছিল। শেষ পর্যন্ত সে তার গুনাহ্ থেকে পাক হয়ে যায়।"[১১]

অপর এক হাদীসে আছে, নবী কারীম (সা) একদিন সাহাবীগণকে বললেন : আমি কি তোমাদের এমন এক বিষয়ের কথা বলব যার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন ? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন : তা হল কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণভাবে উযূ করা, বেশি বেশি মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের অপেক্ষা করা। এ হল জিহাদের উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত।[১২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন : কোন ব্যক্তি যদি খুব ভাল করে উযূ করে এই দু'আ পড়ে, তবে জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়েই ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটি হল :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তাওবাকারীদের শামিল করুন এবং পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত করুন।[১৩]

সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনার ভাই নই ? তিনি বললেন : তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমার ভাই। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাহাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন ? তিনি বললেন : কেন, যদি কোন ব্যক্তির ঘোড়া (কপাল ও হাত-পা সাদাযুক্ত) ঘোর কাল ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারে না? তারা বললেন, হ্যাঁ।

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, উযূর ফলে তাদের মুখমণ্ডল হবে নূরানী এবং হাত-পা দীপ্তিময়। আর হাউযের (কাওসারের) পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রবর্তী।[১৪]

নাজাসাত ও এর প্রকারভেদ

'নাজাসাত' অর্থ অপরিত্রতা। পবিত্রতার বিপরীত। মানুষ বা জীব-জন্তুর শরীর থেকে যে ময়লা বা নাপাক বস্তু বের হয়, একে শরী'আতের পরিভাষায় 'নাজাসাত' বলা হয়।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, নাজাসাত বলতে এমন বস্তুকে বোঝায় যাকে সুস্থ প্রকৃতির মানুষ অপবিত্র মনে করে তা পরিহার করে এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলে। যেমন, মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি।[১৫]

নাজাসাত দুই প্রকার—নাজাসাতে হাকীকী ও নাজাসাতে হুক্মী।

নাজাসাতে হাকীকী : নাপাকীর এমন এক অবস্থা যা দেখা যায় এবং যা সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে এবং সেসব নাপাকী থেকে মানুষ নিজের শরীর, জামা-কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রকে রক্ষা করতে চায়। যেমন, মল-মূত্র, বীর্য, রক্ত, মদ ইত্যাদি।[১৬]

নাজাসাতে হুক্মী : নাপাকীর এমন এক অবস্থা যা দৃশ্যমান নয়, বরং শরী'আতের মাধ্যমে তা জানা যায়। যেমন উযূহীন অবস্থায় থাকা, গোসলের প্রয়োজন হওয়া। নাজাসাতে হুক্মীকে হাদাসও বলা হয়। উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকারের নাপাকী হতে শরীর পাক থাকা আবশ্যক।[১৭]

নাজাসাতে হাকীকী আবার দুই প্রকার, নাজাসাতের গালীযা এবং নাজাসাতে খাফীফা।

নাজাসাতে গালীযা : মানুষের মল-মূত্র, রক্ত, মুখভর্তি বমি, বীর্য, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত যে কোন তরল বস্তু, মদ, হারাম পশুর পেশাব-পায়খানা ও দুধ, শূকরের গোশ্ত, পশম, হাড়সহ সবকিছু, হালাল পশুর পায়খানা এবং হাঁস, মুরগী, পানকৌড়ি ও তিতিরের পায়খানা, পশুর রক্ত, ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পুঁজ অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ, নাপাক বস্তু থেকে নিঃসৃত নির্যাস, সকল পশুর পায়খানা, রক্ত, মৃত পশুর গোশ্ত, চর্বি ইত্যাদি এবং দাবাগাতহীন চামড়া নাজাসাতে গালীযা।

তরল নাজাসাতে গালীযা শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা এক দিরহাম তথা হাতের তালুর পরিমাণ হলে মাফ। আর গাঢ় হলে ওজনে সাড়ে চার মাশা পরিমাণ মাফ। বর্ণিত পরিমাণের অতিরিক্ত হলে উভয় ক্ষেত্রেই তা ধৌত করা ব্যতিরেকে পাক হবে না।[১৮]

নাজাসাতে খাফীফা : নাজাসাতে খাফীফা নাজাসাতে গালীযার তুলনায় হাল্কা ও লঘু। নাজাসাতে খাফীফা যে স্থানে লাগে তার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে তা মাফ। কাপড়ের যে স্থানে নাপাকী লাগে তার এক-চতুর্থাশ যেমন কাপড়ের আঁচল, জামার হাতা ইত্যাদি, অথবা শরীরের যে অঙ্গে নাপাকী লাগে তার এক-চতুর্থাংশ যেমন, হাত, পা ইত্যাদি।[১৯]

গরু-মহিষ ইত্যাদি হালাল পশুর পেশাব, কাক চিল ইত্যাদি হারাম পাখির মল, হালাল পাখির পায়খানা যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়।[২০]

নাজাসাতে হুক্মী : নাজাসাতে হুক্মী দুই প্রকার, হাদাসে আসগার বা ছোট নাপাকী এবং হাদাসে আকবার বা বড় নাপাকী।

হাদাসে আসগার বলতে ঐ সব অবস্থা বুঝায় যার কারণে উযূ থকে না।

হাদাসে আসগারের হুকুম

হাদাসে আসগার থেকে পবিত্র হতে হলে উযূ করতে হবে। পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার ক্ষতিকারক হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পবিত্র হওয়া যায়। উক্ত হাদাস অবস্থায় নামায আদায় করা যাবে না। কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে বিনা উযূতে অর্থাৎ হাদাসে আসগার অবস্থায় মৌখিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা যায়।

হাদাসে আকবারের হুকুম

হাদাসে আকবার বলতে ঐ সব অবস্থা বুঝায় যার কারণে গোসল ফরয হয়। এ হাদাস থেকে পবিত্র হতে হলে গোসল করতে হয়। গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যায়। হাদাসে আকবার অবস্থায় নামায আদায় করা যাবে না। কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। এমনকি মৌখিকভাবেও কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না এবং মসজিদে প্রবেশ করাও যাবে না।

নাজাসাতে হাকীকী থেকে পবিত্র করার পদ্ধতি

ধাতু নির্মিত বস্তু যেমন তলোয়ার, ছুরি, চাকু, সোনা, রূপা, তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম ও স্টীলের বাসন, বাটি, পাতিল, চিনামাটি, কাঁচ, আয়না অথবা পাথরের থালাবাটি ইত্যাদি যা নাজাসাত শোষণ করতে পারে না; নাপাক হয়ে গেলে মাটি দিয়ে ঘষে মেজে নিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। এমনভাবে ঘষে মেজে বা মুছে নিতে হবে যেন নাজাসাতের কোন চিহ্ন বা গন্ধ না থাকে। উপরোক্ত জিনিসগুলো নাক্শাখচিত হলে সেক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এসব জিনিসপত্রে যদি নাক্শাখচিত হয় যেমন অলংকার অথবা নক্শী করা থালাবাটি, তাহলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। শুধু ঘষলে অথবা ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে পবিত্র হবে না। ধাতু নির্মিত থালাবাটি অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন চাকু, ছুরি, চিমটা, মাটি বা পাথরের থালাবাটি প্রভৃতি আগুনে দিলে পাক হয়ে যায়।

চাটাই, চৌকি, টুল, বেঞ্চ, অথবা এ ধরনের কোন জিনিসের উপর ঘন বা তরল নাজাসাত লেগে গেলে শুধু মুছে ফেললে পবিত্র হবে না, পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

শরীর পবিত্র করার নিয়ম

শরীরে নাজাসাতে হাকীকী লাগলে তিনবার ধুয়ে নিলে পাক হয়ে যায়। শরীরে নাপাক তেল অথবা অন্য কোন তৈলাক্ত কিছু মালিশ করার পর শুধু তিনবার ধুয়ে ফেললেই শরীর পবিত্র হয়ে যাবে; তৈলাক্ততা দূর করা আবশ্যক নয়।[২১] যদি নাপাক রঙে শরীর বা চুল রাঙানো হয়, তাহলে এতটুকু ধুয়ে ফেললে যথেষ্ট হবে যাতে পরিষ্কার পানি বের হয়। রঙ তুলে ফেলার দরকার নেই।[২২]

মোজা, জুতা অথবা চামড়ার তৈরি অন্যান্য জিনিস যদি নাপাক হয়ে যায় আর নাজাসাত জমাটবাঁধা ঘন হয় যেমন গোবর, পায়খানা, রক্ত, বীর্য প্রভৃতি, তাহলে নাজাসাত ঘষে তুললে পবিত্র হয়ে যাবে।

আর নাজাসাত যদি তরল হয় এবং শুকিয়ে গেলে দেখা না যায়, তাহলে ধোয়া পর্যন্ত পবিত্র হবে না। ধুয়ে ফেলার নিয়ম এই যে, প্রত্যেকবার ধোয়ার পর এতটা বিলম্ব করতে হবে যেন পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তিনবার ধুতে হবে।[২৩]

কাপড়ে নাজাসাত লাগলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকবার ভালো করে চাপ দিয়ে নিংড়াতে হবে। ভালো করে নিংড়িয়ে ধুবার পরও যদি দুর্গন্ধ থেকে যায় কিংবা দাগ থাকে, তাতে কোন দোষ নেই; পবিত্র হয়ে যাবে। নাজাসাত যদি এমন জিনিসে লাগে যা নিংড়ানো যায় না যেমন, খাট, পালং, মাদুর, পাটি, চাটাই, মাটির পাত্র, কলস, বাসন, চীনা মাটির বরতন, পেয়ালা, বোতল ইত্যাদি, তবে তা পবিত্র করার নিয়ম এই যে, একবার ধুয়ে এমনভাবে রাখতে হবে যেন সমস্ত পানি ঝরে বন্ধ হলে আবার ধুবে। এরূপ তিনবার ধুয়ে নিলে পবিত্র হয়ে যাবে।[২৪]

দুই পাল্লাবিশিষ্ট কাপড়ের এক পাল্লা যদি পবিত্র ও অপর পাল্লা অপবিত্র হয়, তবে ঐ পবিত্র পাল্লার উপর নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে না। কিন্তু সেলাই করা না হলে অপবিত্র পাল্লা নিচে রেখে নামায আদায় করলে নামায আদায় করা জায়িয হবে।[২৫]

অপবিত্র মাটি শুকিয়ে গেলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। এমন মাটিতে নামায আদায় করা যাবে, তবে তা দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়িয হবে না।[২৬]

মাটি থেকে উদগত ঘাস, শস্য, গাছের চারা নাপাক হওয়ার পর তা শুকিয়ে গেলে পবিত্র হয়ে যায়।

চুনসুরকী বা সিমেন্ট-বালি দিয়ে গাঁথা ইট নাপাক হলে তা শুকিয়ে গেলে পবিত্র হয়ে যাবে।[২৭] আর গাঁথুনি ছাড়া বিছানো আলগা ইট নাপাক হলে তা ধুয়ে পবিত্র করতে হবে।

নাপাক মাটিদ্বারা হাঁড়ি পাতিল বানালে কাঁচা থাকা পর্যন্ত নাপাক থাকবে, তবে আগুনে পোড়াবার সাথে সাথে তা পবিত্র হয়ে যাবে।[২৮]

যে যমীন গোবরদ্বারা লেপা হয় তা নাপাক। তার উপর পবিত্র বিছানা না বিছালে নামায হবে না। তবে লেপা গোবর ভালভাবে শুকিয়ে গেলে তার উপর এমনকি ভিজা কাপড় বিছিয়ে

নামায আদায় করাও জায়িয। অবশ্য কাপড় যদি এত বেশি ভিজা হয় যে এতে গোবর লেগে যাবার সম্ভবনা থাকে, তাহলে নামায দুরস্ত হবে না।[২৯]

দাবাগাত (পাকা) করার পর প্রত্যেক চামড়া পবিত্র হয়ে যায়। সে চামড়া হালাল পশুর হোক বা হারাম পশুর হোক। কিন্তু শূকরের চামড়া কোনক্রমেই পবিত্র হবে না।[৩০]

তরল ও তৈলাক্ত জিনিস পবিত্র করার নিয়ম

নাপাক তৈল অথবা চর্বি থেকে সাবান তৈরি করলে সাবান পবিত্র হয়ে যাবে।[৩১]

তেল, ঘি, মধু, সিরাপ বা শরবত যদি নাপাক হয়ে যায় তাহলে তাতে সমপরিমাণ বা ততোধিক পানি ঢেলে জ্বাল দিতে হবে। পানি শেষ হবার পর পুনরায় ঐ পরিমাণ পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এ ভাবে তিনবার করলে তা পবিত্র হয় যাবে।

জমাট ঘি, চর্বি অথবা মধু যদি নাপাক হয়, তাহলে নাপাক অংশটুকু ফেলে দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে।[৩২]

পানির প্রকারভেদ ও এর হুকুম

পানি স্বভাবত পবিত্র। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا

আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৮)

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পানি নাপাক হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা পবিত্র বলে গণ্য হবে।

পবিত্রতা অর্জনের দিক থেকে পানি পাঁচ প্রকার :

১. তাহির মুতাহ্হির গায়র মাকরূহ্ : অর্থাৎ এমন পানি যা নিজে পাক ও অন্য বস্তুকেও পাক-পবিত্র করে এবং যার দ্বারা উযূ, গোসল করা মাকরূহ্ নয়। যেমন : বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, পুকুর, নালা, ঝর্ণা, কূপ, টিউবওয়েল প্রভৃতির পানি; সে পানি মিঠা হোক অথবা লোনা, শিশিরের হোক অথবা বরফের হোক।

২. তাহির মুতাহ্হির মাক্রূহ্ : অর্থাৎ এমন পানি যা নিজে পাক এবং অন্য বস্তুকেও পাক করে তবে তার দ্বারা উযূ ও গোসল করা মাকরূহ্। যেমন বিড়াল বা এমন কোন প্রাণী পানিতে মুখ লাগিয়েছে যার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ্।

৩. তাহির গায়রে মুতাহ্হির : অর্থাৎ এমন পানি যা নিজে পাক তবে অন্য বস্তুকে পবিত্র করে না। এ পানিদ্বারা উযূ ও গোসল জায়িয নয়। যেমন ব্যবহৃত পানি। অর্থাৎ যা হাদাস (নাপাকী) দূর করার জন্য বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শরীর হতে পৃথক হওয়ামাত্রই পানি ব্যবহৃত হয়ে যায়। সুতরাং এরূপ পানি দিয়ে উযূ ও গোসল জায়িয হবে না। তবে এমন পানি শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা নাপাক হবে না।

৪. নাপাক পানি : যেমন প্রবহমান পানিতে নাপাকী পড়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো যে, পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদ বদলে দিল, অথবা আবদ্ধ অনেক পানি কিন্তু নাপাকী পড়ার কারণে সবদিকের পানির রং, গন্ধ বা স্বাদ বদলে গেছে অথবা অল্প আবদ্ধ পানি তাতে যদি সামান্য নাজাসাত পড়ে এবং তারদ্বারা পানির রঙ, গন্ধ এবং স্বাদে কোন পরিবর্তন না আসে তথাপিও

সেসব পানি দিয়ে উযূ ও গোসল জায়িয হবে না এবং তা দিয়ে কোন নাপাক বস্তু পবিত্র করা যাবে না।

৫. মাশকূক পানি : অর্থাৎ এমন পানি যা দিয়ে উযূ-গোসল জায়িয হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ থাকে। যেমন, যে পানিতে গাধা বা খচ্চর মুখ দিয়েছে, সে পানির হুকুম এই যে, এ পানি দিয়ে উযূ করার পর তায়াম্মুমও করতে হবে।[৩৩]

উল্লেখ্য যে, ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট এবং ঘামের হুকুম চার প্রকার :

১. পাক—যেমন মানুষ ও হালাল পশুর উচ্ছিষ্ট।

২. মাকরূহ—যেমন বিড়ালের উচ্ছিষ্ট।

৩. নাপাক—যেমন শূকর ও অন্যান্য হারাম পশুর উচ্ছিষ্ট।

৪. মাশকূক—যেমন গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট।[৩৪]

পানির সাথে যদি কোন পবিত্র জিনিস মিশে যায় এবং তা দ্বারা পানির রঙ, ঘ্রাণ অথবা স্বাদ বদলে যায়, যেমন স্রোতের পানির সাথে বালু মিশে গেলে অথবা জাফরান বা সাবান পড়ে পানিতে তার কিছুটা রং এসে গেলে অথবা এ ধরনের আরো কোন পবিত্র জিনিস পড়ে গেল, এসব অবস্থায় পানি পবিত্র থাকবে এবং তরল থাকার শর্তে তা দিয়ে উযূ ও গোসল জায়িয হবে।[৩৫]

আর যদি কোন পবিত্র জিনিস দিয়ে পানি জ্বাল দেওয়ার পর পানির গুণাবলী পরিবর্তন হয়ে যায় তবে এ পানিদ্বারা উযূ ও গোসল জায়িয হবে না।[৩৬] তবে বরই পাতা বা উশনান জাতীয় সুগন্ধি ঘাস দ্বারা জ্বাল দেওয়া পানি দিয়ে উযূ ও গোসল জায়িয হবে।

স্রোতের পানিতে যদি নাপাকী পড়ে এবং তাতে পানির রং গন্ধ এবং স্বাদে পরিবর্তন না দেখা গেলে তা দিয়ে তাহারাত হাসিল করা জায়িয।[৩৭]

বড় পুকুর যার একদিকে পানি নাড়া দিলে অন্যদিকে নড়ে না, এ ধরনের পুকুরের একদিকে নাপাকী পড়লে অন্যদিক দিয়ে তাহারাত হাসিল করা জায়িয।[৩৮]

যে জীবের দেহে প্রবহমান রক্ত না থাকে যেমন মাছি, মশা, ভোমর, বিচ্ছু প্রভৃতি তা পানিতে পড়ে মরে গেলে অথবা মরে যাওয়ার পর পানিতে পড়লে সে পানি পবিত্র থাকে এবং তা দিয়ে উযূ ও গোসল করা জায়িয।[৩৯]

পানিতে বসবাসকারী জীব যদি পানিতে মরে, যেমন মাছ, কাকড়া, ব্যাঙ ইত্যাদি, তাহলে পানি পবিত্র থাকবে।

যে পানি গাছ বা ফল-ফলাদি থেকে বের হয় যেমন আখের রস, ফলের রস, ডাবের পানি ইত্যাদি দ্বারা উযূ ও গোসল জায়িয নেই।

পবিত্র পানিতে ব্যবহৃত পানি মিশে গেলে এবং ব্যবহৃত পানি পরিমাণে বেশি হলে সমস্ত পানি ব্যবহৃত পানি বলে গণ্য হবে এবং তা দিয়ে উযূ ও গোসল জায়িয হবে না।[৪০]

যে জীবের দেহে প্রবহমান রক্ত আছে এমন জীব যদি অল্প পানিতে পড়ে মরে যায় অথবা মরে যাওয়ার পর পড়ে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

ইস্‌তিন্‌জার নিয়ম

পেশাব-পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জনকে 'ইস্‌তিন্‌জা' বলা হয়। শরী'আতে ইস্‌তিন্‌জার উপর বিশেষ তাকীদ প্রদান করা হয়েছে। ইস্‌তিন্‌জায় অবহেলা করাকে বড় গুনাহ এবং কবরে আযাবের কারণ বলে হাদীসে শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সয় বললেন : এ দু'জন মুর্দার উপর আযাব হচ্ছে, (এ আযাব) কোন কঠিন কারণের জন্যে নয়। এদের মধ্যে একজন পেশাবের পর ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না ... (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)।[৪১]

পেশাব-পায়খানার পর আবশ্যকমত মাটির ঢিলা, নেকড়া, টয়লেট পেপার ইত্যাদি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। শুধু পানি দিয়েও পবিত্রতা অর্জন করা যায়। পানি না পাওয়া গেলে ঢিলাদ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করাও জায়িয আছে।[৪২]

মলদ্বার বা প্রশ্রাবদ্বার ভালোভাবে পরিষ্কার করা সুন্নাত। অবশ্য তিনটি বা পাঁচটি প্রয়োজনে সাতটি অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব।[৪৩]

প্রশ্রাব করতে বসার সময় হাঁটুর উপরের কাপড় খুলে বসা উচিত নয়। প্রশ্রাব করার সময় এর ছিঁটা যাতে কাপড়ে বা শরীরে না লাগে সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।[৪৪]

পেশাব-পায়খানার জন্য নির্ধারিত স্থানে যাওয়ার পূর্বে নিম্নের দু'আ পড়া উত্তম :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ۔

প্রথমে বাম পা দিয়ে পেশাব-পায়খানার স্থানে প্রবেশ করবে এবং সম্ভব হলে বাম পায়ের উপর ভর করে বসবে। পায়খানা ইস্‌তিনজার পর ডান পা আগে দিয়ে বের হয়ে নিম্নের দু'আটি পড়বে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ ۔

পেশাব-পায়খানার সময় কিব্‌লার দিকে মুখ বা পিঠ করা, কোন গর্তে পেশাব করা, ছায়াদানকারী বা ফলবান গাছের নিচে, নদী ও পুকুরের তীরে এবং লোক চলাচলের পথে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ।[৪৫]

বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ।

উযূ

মিস্‌ওয়াক : ফযীলত, গুরুত্ব ও পদ্ধতি

মিস্‌ওয়াক 'সিওয়াক' (سَــوْكٌ) ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ মাজা, ঘষা। পরিভাষায় মিস্‌ওয়াক বলা হয় গাছের ডাল বা শিকড় যা দিয়ে দাঁত মাজা ও পরিষ্কার করা হয়।[৪৬]

আর দাঁত মাজাকেও মিস্‌ওয়াক করা বলা হয়। মিস্‌ওয়াক করে দাঁত পরিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত প্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং এর প্রতি তাকীদও করেছেন। মিস্‌ওয়াকের বহু ফযীলাত হাদীসে বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

اَلسِّوَاكُ مِطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ ۔

মিস্‌ওয়াক মুখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপায়।[৪৭]

অন্য এক হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِىْ اُمَامَـةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَـا جَاءَنِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْـهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلاَّ اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ تَـمْغِىْ مُقَدَّمَ فَمِىْ ۔

হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : এমনটি কখনো হয়নি যে. জিব্‌রাইল আমার নিকট এসেছেন আর আমাকে মিস্‌ওয়াকের আদেশ দেননি। এতে আমার আশংকা হচ্ছিল যে, (মিস্‌ওয়াককরণে) আমার মুখের অগ্রভাগ ছিলে না ফেলি।[৪৮]

হাদীসে আরো রয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ الصَّلٰوةِ الَّتِيْ يَسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِيْ لَايَسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا ۔

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : মিস্‌ওয়াক করে যে নামায আদায় করা হয় সে নামাযে মিস্‌ওয়াকবিহীন নামাযের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি ফযীলত রয়েছে।[৪৯]

মিস্‌ওয়াক করলে আল্লাহ্‌র রিযামন্দী হাসিল হয়। দরিদ্রতা দূর হয়, সচ্ছলতা আসে, উপার্জন বাড়ে, মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, মাথার ব্যথা উপশম হয়, কাশি দূর হয়, দাঁত মজবুত হয়, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, পাকস্থলী ঠিক থাকে, শরীর শক্তিশালী হয়, মানুষের স্মরণশক্তি ও জ্ঞান বাড়ে, অন্তর পবিত্র হয়, সৌন্দর্য বাড়ে, ফিরিশতা তার সাথে মুসাফাহা করেন, নামাযের জন্য বের হলে তাকে সম্মান করেন, নামায আদায় করে বের হলে আরশ বহনকারী ফিরিশতা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, শয়তান অসন্তুষ্ট হয়, বিজলীর ন্যায় পুলসিরাত পার হবে, আমলনামা ডান হাতে পাবে, ইবাদাতে শক্তি পাবে, মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব হবে, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হবে এবং পূত-পবিত্র হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে।[৫০]

যেসব গাছের স্বাদ তিতা সেসব গাছের ডাল দিয়ে মিস্‌ওয়াক করা মুস্তাহাব। যায়তুনের ডাল দিয়ে মিস্‌ওয়াক করা উত্তম। মিস্‌ওয়াক নরম হওয়া উচিত এবং তা হাতের আঙ্গুলের মত মোটা হওয়া এবং এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে উযূতে কুলি করার পূর্বে মিস্‌ওয়াক করা উত্তম। তবে কোন কোন আলিম উযূ করার পূর্বে মিস্‌ওয়াকের কথাও বলেছেন। মিস্‌ওয়াক করার মানসূন তরীকা হল, মুখের ডানদিক থেকে শুরু করা এবং দাঁতের প্রস্থের দিক থেকে মিস্‌ওয়াক করা। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে নয়।[৫১] মিস্‌ওয়াক না পাওয়া গেলে আঙ্গুল, শুকনো কাপড় দ্বারা মিস্‌ওয়াক করাও জায়িয এবং এতে মিস্‌ওয়াকের ফযীলাত লাভ হবে।

মিস্‌ওয়াক করার পদ্ধতি হলো, ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী মিস্‌ওয়াকের নিচে আর মধ্যমা ও তর্জনী মিস্‌ওয়াকের উপরে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা এর মাথার নিচ ভালভাবে ধরা। এভাবে মিস্‌ওয়াক করা হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে।[৫২]

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর, নামাযের আগে, মজলিসে যাওয়ার পূর্বে এবং কুরআন ও হাদীস তিলাওয়াত করার পূর্বে মিস্‌ওয়াক করা মুস্তাহাব।[৫৩]

উযূর আহ্‌কাম : ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব

'উযূ' আরবী শব্দ। এর অর্থ সুন্দর, পরিষ্কার, স্বচ্ছ। শরী'আতের পরিভাষায় নির্ধারিত নিয়মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে উযূ বলা হয়।[৫৪] কুরআন-মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ্ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৬)

উযূর ফরযসমূহ

উযূর ফরয চারটি। এ চারটির মধ্য থেকে কোন একটি বাদ গেলে উযূ হবে না।

১. মুখমণ্ডল একবার ধোয়া, অর্থাৎ মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরা মুখমণ্ডল ধোয়া।

২. উভয় হাত কনুই সহ একবার ধোয়া।

৩. মাথার এক-চতুর্থাংশ একবার মাসেহ্ করা।

৪. উভয় পা গ্রন্থিসহ একবার ধোয়া।[৫৫]

উযূর সুন্নাতসমূহ

১. 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' বলে উযূ শুরু করা।

২. উভয় হাত কব্জি সহ ধোয়া।

৩. মিস্ওয়াক করা।

৪. তিনবার কুলি করা।

৫. তিনবার নাকে পানি দেওয়া।

৬. রোযাদার না হলে উত্তমরূপে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া।

৭. দাড়ি ঘন হলে তা খিলাল করা।

৮. হাত ও পায়ের আঙ্গুলসহ খিলাল করা।

৯. প্রত্যেক অঙ্গ তিন-তিনবার করে ধোয়া।

১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ্ করা।

১১. উভয় কান মাসেহ্ করা।

১২. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় উত্তমরূপে ধোয়া।

১৩. অঙ্গসমূহ ক্রমানুসারে ধোয়া।

১৪. উযূ নিয়্যাত করা।

১৫. এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অপর অঙ্গ ধোয়া।

১৬. ডান অঙ্গ আগে ধোয়া।

১৭. হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে ধোয়া আরম্ভ করা।

১৮. মাথার সামনের ভাগ থেকে মাসেহ্ শুরু করা।

১৯. গর্দান মাসেহ্ করা।[৫৬]

উযূর মুস্তাহাবসমূহ

১. এমন উঁচুস্থানে বসে উযূ করা যাতে পানির ছিঁটা গায়ে না পড়ে।

২. কিব্‌লার দিকে মুখ করে বসা।

৩. উযূর সময় বিনা ওযরে অপরের সাহায্য না নেওয়া।

৪. উযূর সময় অনাবশ্যক কথাবার্তা না বলা।

৫. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় মাসনূন দু'আ পড়া।

৬. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলা।

৭. কনিষ্ঠাঙ্গুলী কানের ছিদ্রে ঢুকান।

৮. আংটি ঢিলা না হলে তা নাড়া দেওয়া।

৯. ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া।

১০. বাম হাত দিয়ে নাক সাফ করা।

১১. মা'যূর না হলে ওয়াক্ত আসার আগেই উযূ করা।

১২. উযূর পর কালেমায়ে শাহাদাত : اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ পাঠ করা।

১৩. সবশেষে উযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা এবং এ দু'আ পড়া :
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ।[৫৭]

উযূর নিয়ম

উযূকারী ব্যক্তি প্রথমে এ নিয়্যাত করবে যে, আমি পবিত্রতা অর্জন, নামায আদায় এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে উযূ করছি।[৫৮]

তারপর কিব্‌লার দিকে মুখ করে কিছুটা উঁচু স্থানে বসবে যাতে উযূর পানির ছিঁটা শরীরে বা কাপড়ে না লাগে।[৫৯] 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলে উযূ শুরু করবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুবে। মিস্‌ওয়াক করে তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করবে।[৬০] রোযাদার না হলে তিনবার গড়গড়া করে কুলি করবে। তারপর তিনবার এমনভাবে নাকে পানি দিবে যেন নাকের নরম গোশ্‌ত পর্যন্ত তা পৌঁছে। অবশ্য রোযাদার ব্যক্তি হলে এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করবে। বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক সাফ করবে। প্রত্যেকবার নাকে নতুন পানি দিতে হবে।[৬১] তারপর দু'হাতের তালু ভরে পানি নিয়ে তিনবার সম্পূর্ণ চেহারা এমনভাবে ধুবে যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুক্‌না না থাকে। দাড়ি ঘন হলে তার মধ্যে খিলাল করতে হবে।[৬২] তারপর দু'হাত কনুই সহ ভালো করে ধুবে। প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত তিন-তিনবার ধুবে।[৬৩] হাতে আংটি থাকলে এবং মেয়েলোকের হাতে চুড়ি-গয়না থাকলে তা নড়াচড়া করতে হবে যেন সবস্থানে ভালোভাবে পানি পৌঁছে।[৬৪] তারপর দু'হাত ভিজিয়ে সম্পূর্ণ মাথা এবং কান মাসেহ্ করবে। মাসেহ্ করার পর দু'পা গোড়ালি সহ তিনবার এমনভাবে ধুবে যে, ডান হাত দিয়ে পানি ঢালবে এবং বাম হাত দিয়ে ঘষবে। বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দিয়ে পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে

ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে খিলাল শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করবে। বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুলে শেষ করবে।[৬৫]

উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

নিম্নবর্ণিত কারণে উযূ ভঙ্গ হয় অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যায় :

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনকিছু বের হলে।

২. স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব দ্বারা, যদিও তাতে রক্ত না দেখা যায়।

৩. পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের যে কোন স্থান থেকে যে কোন নাপাক বস্তু বের হয়ে গড়িয়ে গেলে। যেমন, রক্ত, পুঁজ।

৪. থুথু, কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত, পুঁজ খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখ ভরে বমি হলে।

৫. থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ বেশি বা সমান হলে।

৬. চিৎ হয়ে, কাত হয়ে অথবা ঠেস দিয়ে ঘুমালে।

৭. বেহুঁশ হলে।

৮. পাগল হলে।

৯. নেশাগ্রস্ত হলে।

১০. জানাযা নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযে অট্টহাসি দিলে।

১১. পুরুষ ও মহিলার গুপ্তাঙ্গ কোন অন্তরায় ব্যতীত একত্রিত হলে; বীর্যপাত ছাড়াও উযূ নষ্ট হবে।[৬৬]

উযূর মাকরূহ্সমূহ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা। প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণ পানি ব্যয় করা। চেহারার উপর এমন জোরে পানি নিক্ষেপ করা যে, পানির ছিঁটা অন্যত্র পড়ে। উযূর সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা। বিনা ওযরে অন্যের সাহায্য নেওয়া। নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাথা মাসেহ্ করা।[৬৭]

গোসল

'গোসল' আরবী শব্দ। অর্থ সমস্ত শরীর ধোয়া। শরী'আতের পরিভাষায় পবিত্রতা ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে 'গোসল' বলা হয়।[৬৮]

গোসলের প্রকারভেদ

ফরয গোসল : ১. জানাবাতের পরের গোসল, ২. হায়িয বন্ধ হওয়ার পরের গোসল, ৩. নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়ার পরের গোসল।[৬৯]

সুন্নাত গোসল : যেমন জুমু'আর দিন জুমু'আর নামাযের জন্য, দুই ঈদের নামাযের জন্য, হজ্জ অথবা উমরার ইহ্রামের জন্য এবং হাজীদের জন্য আরাফার দিনে-দুপুরের পর।[৭০]

মুস্তাহাব গোসল : যেমন ইসলাম গ্রহণের জন্য, বালিগ হওয়ার পর (বালিগ হওয়ার লক্ষণ পাওয়া না গেলে ছেলেমেয়ের বয়স পনের বছর হওয়ার পর), মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সংজ্ঞাহীনতা

দূর হওয়ার পর, সিঙ্গা লাগনোর পর, মুর্দাকে গোসল দেওয়ার পর, শবেবরাতে, শবেকদরে, মদীনা শরীফ প্রবেশকালে, মুযদালিফায় অবস্থানের জন্যে ১০ তারিখ সুব্হে সাদিকের পর, মক্কায় প্রবেশকালে, তাওয়াফে যিয়ারাতের জন্য, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্য, ইস্তিস্কার নামাযের জন্য, ভয়ের নামাযের জন্য, দিনে অস্বাভাবিক অন্ধকার বা প্রচণ্ড ঝড়ের জন্য এবং তাওবার নামাযের জন্য ইত্যাদি।[৭১]

গোসলের আহ্কাম

গোসলের ফরয : গোসলের ফরয তিনটি—কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ও সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধোয়া যেন চুল পরিমাণও কোন স্থান শুকনা না থাকে।[৭২]

গোসলের সুন্নাত : 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে শুরু করা, গোসলের নিয়্যাত করা, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া, শরীর থেকে নাপাকী দূর করা, লজ্জাস্থান ধোয়া, উযূ করা, সারা শরীরে তিনবার পানি দিয়ে ধোয়া, মিসওয়াক করা।[৭৩]

গোসলের মুস্তাহাব : গোসল করার সময় কারো সাথে কথা না বলা, এমন স্থানে গোসল করা যেন মানুষের নযরে না আসে, সতর ঢেকে গোসল করা। গোসল শেষ হলে পরে দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করা।[৭৪]

গোসলের নিয়ম

সুন্নাত মুতাবিক গোসলের নিয়ম হল এই যে, প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধুবে। তারপর লজ্জাস্থান ধুবে। তারপর শরীরে কোথাও নাপাকী থাকলে তা সাফ করতে হবে। তাপর দু'হাত ভালো করে ধুয়ে নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করবে। ভাল করে কুলি করা এবং নাকের ভিতর ভালো করে পানি পৌঁছানো। গোসলের স্থানে পানি জমা থাকলে গোসলের পর পা ধুবে (গোসল যদি ফরয হয় তাহলে 'বিস্মিল্লাহ্' ব্যতীত অন্য কোন দু'আ পড়বে না)। উযূর পর মাথার উপর এবং সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢালবে। নিয়ম হল প্রথমে ডান কাঁধের উপর তারপর বাম কাঁধের উপর তিন-তিনবার। তারপর মাথা ও সমস্ত শরীরের উপর তিনবার পানি ঢালবে। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধুবে।[৭৫]

গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. ইহ্তিলাম : সহবাস ব্যতিরেকে কামভাব সহ পুরুষ বা মহিলার বীর্য বের হলে স্পর্শ দ্বারা হোক, দেখার দ্বারা হোক, স্বপ্নদোষ হোক, হস্তমৈথুন দ্বারা হোক, শোয়া অবস্থায় হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক, গোসল করা ওয়াজিব।[৭৬]

২. স্ত্রী সহবাস : স্ত্রী সহবাস করলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে। বীর্য বের হোক বা না হোক।

৩. হায়িয বন্ধ হলে।

৪. নিফাস বন্ধ হলে।

হায়িয ও নিফাস

বালিগ হওয়ার পর স্বভাবগতভাবে মহিলাদের জরায়ু থেকে রোগব্যাধির কারণ ব্যতিরেকে যে রক্ত নির্গত হয়, একে শরী'আতের পরিভাষায় হায়িয বলে।[৭৭]

হায়িয হওয়ার বয়স কমপক্ষে নয় বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোন বালিকার রক্তস্রাব হয় তাহলে তা হায়িয বলে গণ্য হবে না। সাধারণত পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত মহিলাদের হায়িয হয়ে থাকে। পঞ্চান্ন বছরের পর রক্তস্রাব হলে হায়িয বলে গণ্য করা হবে না। তবে এ বয়সে রক্তের রঙ যদি গাঢ় লাল হয় অথবা কালচে লাল হয় তাহলে তা হায়িয বলে গণ্য হবে।[৭৮]

হায়িযের সময়কাল কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত এবং উর্ধ্বে দশ দিন দশ রাত। তিন দিন তিন রাতের কম রক্তস্রাব হলে তা হায়িয বলে গণ্য হবে না। তেমনি দশ দিন দশ রাতের বেশি রক্তস্রাব হলে তাও হায়িয বলে গণ্য হবে না। একে বলা হবে 'ইস্তিহাযা।'[৭৯] যা রোগের কারণে হয়ে থাকে। এর হুকুম হায়িযের হুকুম থেকে ভিন্নতর।[৮০]

হায়িযের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে একেবারে সাদা রঙ ব্যতীত যে রঙের রক্তই আসবে তা লাল, হলুদ, সবুজ, কালো, ধূসর যা-ই হোক না কেন, সবই হায়িয বলে গণ্য হবে।[৮১]

হায়িযের মাসাইল

যদি কোন মেয়ের তিন-চারদিন রক্ত আসার অভ্যাস থাকে। তারপর কোন মাসে তার অধিক দিন এলো, তাহলে তা হায়িয হবে। যদি দশ দিনের বেশি সময় রক্ত আসে তাহলে যতদিনের অভ্যাস ছিল ততদিন হায়িয বলে গণ্য করা হবে এবং বাকী অংশ 'ইস্তিহাযা'[৮২]। দু'হায়িযের মধ্যে পবিত্র অবস্থার সময়কাল কমপক্ষে পনের দিন। বেশির কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই।[৮৩]

কোন মহিলার হায়িযের সময়কালের কম সময় অর্থাৎ দু'একদিন রক্ত আসার পর পনের দিন সে পবিত্র থাকলো। তারপর আবার দু'একদিন রক্ত এলো। এ পনের দিন সে পবিত্র থাকবেই। তারপর যে রক্ত এলো সেটা হবে 'ইস্তিহাযা'।

যদি কোন মহিলার অভ্যাস নির্দিষ্ট না থাকে—কখনো চার দিন, কখনো সাত দিন কখনো দশ দিন স্রাব তাহলে এসব হায়িয বলে গণ্য হবে। তবে যদি দশ দিনের বেশি রক্ত আসে, তাহলে দেখতে হবে গত মাসে কত দিন এসেছিল, ততদিন হায়িয ধরা হবে। আর বাকী ইস্তিহাযা।[৮৪]

নিফাসের পরিচয়

সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের জরায়ু থেকে যে রক্ত বের হয় তাকে 'নিফাস' বলে।[৮৫]

নিফাসের সময়কাল

নিফাসের সময়কাল উর্ধ্বে চল্লিশ দিন। আর কমের নির্দিষ্ট সীমা নেই। সন্তান প্রসবের পর যদি কোন স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব না হয় তবুও তার গোসল করা ওয়াজিব।[৮৬]

গর্ভপাত হওয়ার অবস্থায় সন্তানের অঙ্গ গঠন হয়ে থাকলে যে স্রাব আসে তা নিফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে। চল্লিশ দিনের বেশি রক্তস্রাব হলে প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিন নিফাসের

এবং বাকী ইস্তিহাযার। আর যদি প্রথম সন্তান না হয় এবং নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে, তাহলে তার অভ্যাসের দিনগুলো নিফাসের। বাকী দিনগুলো ইস্তিহাযার।[৮৭]

হায়িয ও নিফাসের আহ্কাম

হায়িয ও নিফাসের দিনগুলোতে নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। তার কাযাও আদায় করতে হবে না। হায়িযের সময় মুস্তাহাব হলো নামাযের সময় হলে উযূ করে নামায আদায় করার স্থানে বসে থাকবে। সাধারণত নামায আদায় করতে যে সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে 'সুব্হানাল্লাহ্', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়তে থাকবে। এমনিভাবে হায়িযের দিনগুলোতে রোযা নিষিদ্ধ। অবশ্য পরে রোযা কাযা করতে হবে। নফল রোযা রাখা অবস্থায়ও হায়িয শুরু হলে পরে এর কাযা করা জরুরী। হায়িয ও নিফাসের সময় মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। হায়িয ও নিফাসের সময় কা'বা ঘরের তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। কুরআন তিলাওয়াত করাও নিষিদ্ধ। তবে যদি এক আয়াত থেকে কম হয় এবং কিরা'আতের নিয়্যাত না থাকে যেমন শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বা খানা খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ্' পড়াতে কোন দোষ নেই। হায়িয ও নিফাসের সময় কুরআন স্পর্শ করাও জায়িয নয়। অবশ্য জুযদান অথবা রুমালের সাহায্যে কুরআন স্পর্শ করা যায়।

পরিধানের কাপড় দিয়ে বা কুরআনের সাথে সেলাই করা কাপড় দিয়ে স্পর্শ করাও জায়িয নয়। কোন বস্তু বা স্থানে কুরআনের পূর্ণ এক আয়াত লিখা থাকলে তাও স্পর্শ করা জায়িয নয়। তবে হায়িয ও নিফাস অবস্থায় কুরআন দেখা নিষিদ্ধ নয়। হায়িয ও নিফাসের সময় স্ত্রী সহবাস হারাম। এ ছাড়া একসাথে খানপিনা করা, এক বিছানায় শুয়ে থাকা ইত্যাদি জায়িয আছে। হায়িয ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করা ওয়াজিব।

তায়াম্মুমের বিবরণ

'তায়াম্মুম'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা। শরী'আতের পরিভাষায় 'তায়াম্মুম' বলা হয় পবিত্র মাটিদ্বারা (নাজাসাতে হুকুমী থেকে) পাক হওয়ার নিয়্যাতে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা। তায়াম্মুম উযূ ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। তায়াম্মুমের এ অনুমতি উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ দান। বস্তুত তাহারাত হাসিল করার আসল মাধ্যম হল পানি, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে রেখেছেন। তথাপি এমন অবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে যে, কোন স্থানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা পাওয়া গেলেও পানি দিয়ে তাহারাত হাসিল করা কারো সাধ্যের বাইরে অথবা পানি ব্যবহারে রোগবৃদ্ধি অথবা প্রাণের আশংকা রয়েছে। এসব অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মাটি দিয়ে তাহারাত হাসিল করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তার পদ্ধতিও বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে বান্দা দীনের উপর আমল করতে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

আর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটিদ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ্ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৬)

যে যে অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায়

বে-উযূ অবস্থায়, জানাবাত অবস্থায়, হায়িয ও নিফাসের শেষে পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করা জায়িয। অপারগতার ব্যাখ্যা এই যে, পানি আছে কিন্তু ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে, অথবা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়িয। অথবা পানি আছে তার পার্শ্বে শত্রু অথবা হিংস্র প্রাণী আছে। সফরে পানি সঙ্গে আছে; কিন্তু সামনে কোথাও পানি পাওয়া না যেতে পারে। অথবা উযূ বা গোসল করলে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা আছে যার কাযা নেই; যেমন জানাযা। পানি কেনার সামর্থ্য অথবা কিনলে সংকটে পড়ার আশংকা রয়েছে। এসব অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়িয।[৮৮]

তায়াম্মুমের আহ্কাম : ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি :

১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাত করা।[৮৯]
২. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ্ করা এবং
৩. তারপর উভয় হাত পাক মাটিতে মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুই সহ মাসেহ করা।[৯০]

তায়াম্মুমের সুন্নাত ৭টি :

১. তায়াম্মুমের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহ্' বলা,
২. উভয় হাত পাক মাটিতে মেরে সামনের দিকে নেওয়া,
৩. তারপর পিছনের দিকে নিয়ে আসা,
৪. হাত মাটিতে মারার পর মাটি ঝেড়ে ফেলা,
৫. মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখা,
৬. তারতীব রক্ষা করা। অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল, তারপর উভয় হাত মাসেহ্ করা।
৭. বিরতিহীনভাবে তায়াম্মুম করা অর্থাৎ উভয় মাসহের মধ্যে বিলম্ব না করা।[৯১]

তায়াম্মুমের মুস্তাহাব :

যে ব্যক্তির প্রবল ধারণা যে, শেষ সময়ে পানি পাওয়া যাবে, এমন ব্যক্তির জন্য শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। আর যদি পানি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তায়াম্মুম করে মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায আদায় করা।[৯২]

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

প্রথমে নিয়্যাত করে 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' পড়ে তায়াম্মুম শুরু করবে। তারপর দু'হাতের তালু একটু প্রসারিত করে পাক মাটির উপর মেরে সামনের দিকে অগ্রসর করবে।

তারপর পিছনের দিকে টেনে আনবে। বেশি ধূলাবালি হাতে লেগে গেলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা মুখ দিয়ে ফুঁক দিয়ে তা ফেলে দিবে। তারপর উভয় হাত দিয়ে এভাবে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ্ করবে, যাতে চুল পরিমাণ স্থানও বাদ না যায়। তারপর দ্বিতীয়বার এভাবে মাটির উপর হাত মেরে এবং হাত ঝেড়ে নিয়ে প্রথমে বাম হাতের তিন আঙ্গুলের মাথার নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক থেকে শুরু করে কনুই সহ মাসেহ্ করবে। তারপর বাম হাতের তালুসহ বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদাত অঙ্গুলী দিয়ে কনুই থেকে অঙ্গুলী পর্যন্ত ভিতরের অংশ মাসেহ্ করবে এবং আঙ্গুলগুলোর খিলালও করবে। পরে এভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ্ করবে। হাতে কোন ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ্ করা জরুরী।[৯৩]

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে উযূ নষ্ট হয় সেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়। যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। যদি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে, তাহলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৯৪] কোন ওযর অথবা রোগের কারণে যদি তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে, সে ওযর বা রোগ দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

মোজার উপর মাসেহ্

উযূ করে চামড়ার মোজা পরার পর উযূ ভঙ্গ হলে পুনরায় উযূর সময় পা না ধুয়ে মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়িয আছে। তবে মোজা খুলে পা ধুয়ে নেওয়া উত্তম। কাপড়ের মোজা বা হাত মোজার ওপর মাসেহ করা জায়িয নয়।

সফরে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত আর সফর ব্যতীত মুকীমের জন্য একদিন একরাত পর্যন্ত মোজার ওপর মাসেহ্ করা জায়িয আছে। যে উযূ করে মোজা পরেছে, তারপর একদিন একরাত বা তিনদিন তিনরাতের হিসাব ধরা হবে। গোসলের প্রয়োজন হলে মোজা খুলে ফেলতে হবে, মাসেহ্ চলবে না। পায়ের পিঠে মোজার ওপর মাসেহ্ করবে, পায়ের তলায় নয়।

মাসেহ্ করার পদ্ধতি

মোজার উপর মাসেহ্ করার সময় হাতের আঙ্গুলসমূহ ভিজিয়ে পায়ের উপরের সামনের দিকে যেন মোজার উপর আঙ্গুলগুলোর চাপ পড়ে। তারপর ক্রমশ আঙ্গুলগুলো টেনে পায়ের গিঁটের উপর পর্যন্ত নিয়ে আসবে। অন্য কোনভাবে মাসেহ্ করলেও তা জায়িয আছে। তবে তা মুস্তাহাবের খেলাফ। প্রত্যেক মোজার উপর অন্তত হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান মাসেহ্ করা ফরয। শুধু মোজার তলার দিকে বা গোড়ালির দিকে মাসেহ্ করলে জায়িয হবে না।

যে যে কারণে উযূ ভঙ্গ হয় সেসব কারণে মাসেহ্ও ভঙ্গ হয়। সুতরাং উপরোক্ত সময়কালের মধ্যে উযূর সঙ্গে সঙ্গে মোজার উপরও মাসেহ্ করবে। মোজা খুললেও মাসেহ্ ভঙ্গ হয়। তাই কারো উযূ ভঙ্গ না হওয়া সত্ত্বেও একটি মোজা খুলে ফেললেও মাসেহ্ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তখন শুধু পা ধুয়ে নিবে, পুরো উযূ করতে হবে না।

মাসেহের সময়কাল পূর্ণ হলে মাসেহ্ ভঙ্গ হয়ে যায়। উযূ ভঙ্গ না হলেও তখন মোজা খুলে উভয় পা ধুয়ে নিবে।

মোজা যদি এ পরিমাণ ফেটে যায় যে, পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান বের হয়ে যায়, তবে এরূপ মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়িয নয়।

মা'যূর ব্যক্তির ক্ষেত্রে মাসহের পর ওয়াক্ত চলে গেলে মাসেহ্ ভঙ্গ হবে। উযূর সময় মোজা খুলে পা ধুতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কাওয়াইদুল ফিকহ্, সাইয়্যেদ মুফ্তী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান (র), পৃ. ৩৬৫।
২. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮।
৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৫।
৪. সহীহ্ ইব্ন হিব্বান, সূত্র : মা'আরিফুস সুনান, পৃ. ১৪৪।
৫. মুসনাদে আহ্মাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।
৬. আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩।
৭. আবূ দাঊদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১।
৮. আল-মুরশিদুল আমীন, ইমাম গাযালী (র)), পৃ. ৩৬-৩৭।
৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র), পৃ. ১৭৭।
১০. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।
১১. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২।
১২. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।
১৩. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯।
১৪. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪০।
১৫. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮।
১৬. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ১২১।
১৭. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ১১৯-১২০।
১৮. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭।
১৯. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬, নূরুল ইজাহ্, পৃ. ৫৪।
২০. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।
২১. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৮০।
২২. বায়যাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯।
২৩. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪; হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।
২৪. বেহেশতী জেওর (উর্দু), ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭।
২৫. বেহেশতী জেওর (উর্দু), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০।
২৬. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪; হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।
২৭. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।
২৮. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।
২৯. বেহেশতী জেওর (উর্দু), ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯।
৩০. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ১৩৪; শারহে বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩।

৩১. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।
৩২. বেহেশতী জেওর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯।
৩৩. তাহতাবী আলাল মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ১৬-১৭।
৩৪. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।
৩৫. ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।
৩৬. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।
৩৭. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭, ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭০।
৩৮. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।
৩৯. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।
৪০. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।
৪১. আবূ দাউদ ও তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত।
৪২. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৩৬।
৪৩. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৩৬।
৪৪. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৩৩-৩৪; বেহেশতী জেওর (উর্দূ), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।
৪৫. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৪০-৪১।
৪৬. দরসে তিরমিযী, মাওলানা তকী উসমানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।
৪৭. নাসাঈ ও বুখারী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৪।
৪৮. আহ্মদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৫।
৪৯. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৫।
৫০. মারাকিল ফালাহ্, করাচী পৃ. ৫৪।
৫১. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৫৩।
৫২. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৫৩।
৫৩. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৫৩।
৫৪. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৪৪।
৫৫. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৪৪-৪৬।
৫৬. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬; মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৫০-৫৯।
৫৭. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮-৯; তাহতাবী আলাল মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৬০-৬২।
৫৮. দুররুল মুখ্তার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।
৫৯. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৬০।
৬০. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।
৬১. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।
৬২. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৫৫।
৬৩. দুররুল মুখ্তার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮।
৬৪. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।
৬৫. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৫৮।
৬৬. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৬৮-৭৪।
৬৭. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৬৪।
৬৮. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৭৬।
৬৯. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬; মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৭৬-৭৭।

৭০. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬; হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।
৭১. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৮৬-৮৭।
৭২. ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০।
৭৩. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৮৩-৮৪।
৭৪. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৮৪।
৭৫. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।
৭৬. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭।
৭৭. শারহে বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।
৭৮. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।
৭৯. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।
৮০. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩।
৮১. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।
৮২. ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-১৫৮।
৮৩. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬।
৮৪. শারহে বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০-১১২।
৮৫. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।
৮৬. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।
৮৭. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।
৮৮. শারহে বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮-৯০; হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।
৮৯. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।
৯০. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০; শারহে বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।
৯১. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।
৯২. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০; মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৯৭-৯৮; হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।
৯৩. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।
৯৪. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯।

পঞ্চম অধ্যায়

সালাত বা নামায

সালাত-এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব

'সালাত' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দু'আ, রহমত, ইসতিগ্‌ফার ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট রুক্‌ন ও যিক্‌রসমূহকে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে আদায় করাকে সালাত (নামায) বলা হয়।[১] সালাতকে নামাযও বলা হয়।

ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে এটি অন্যতম। ঈমান ছাড়া অন্য চারটি রুকনের মধ্যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন। নামাযকে দীনের খুঁটি বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর হয় না, তদ্রুপ নামায ছাড়াও দীন পরিপূর্ণ হয় না। নামাযের ফরযিয়াত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। বালিগ পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই তা অবশ্য পালনীয়। শরী'আতসম্মত ওযর ছাড়া নামায তরক করা জায়িয নেই। নামাযের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করলে কাফির বলে গণ্য হবে।[২] নামায আদায় করাই মু'মিন ব্যক্তির ঈমানের নিদর্শন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ ‏.

বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা।[৩] অর্থাৎ নামাযই প্রমাণ করে দেয় যে, কে অনুগত বান্দা আর কে অস্বীকারকারী কাফির। সুতরাং একজন মু'মিন বান্দাকে তার ঈমানের প্রমাণ স্বরূপ প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করতে হবে। তাই ইসলামে ঈমানের পরই নামায কায়েমের জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন মজীদের বহু জায়গায় নামায কায়েমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ‏.

তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' কর। (সূরা বাকারা, ২ : ৪৩)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে। যদি এ বিষয় ঠিক থাকে তবে সে মুক্তি পাবে এবং সফলকাম হবে। আর যদি তা ঠিক না থাকে তবে সে ব্যর্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[৪]

অপর এক হাদীসে আছে, একবার হযরত উমর (রা) তাঁর প্রশাসকদের নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করলেন যে, আমার মতে তোমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে নামায। যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করল এবং যথাসময় নামায আদায় করল, সে তার দীনের হিফাযত করল। আর যে ব্যক্তি তা বরবাদ করল, সে নামায ছাড়া অন্য আমলকেও চরমভাবে বরবাদ করে দিবে।[৫]

মি'রাজ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায

চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, বৃক্ষ-লতা, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, এক কথায় এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা যত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন সব কিছুই নিজ নিজ পদ্ধতিতে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সিজ্‌দাবনত হয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে সকলেই মশগুল। কোথাও কোন অবাধ্যতা ও হঠকারিতা নেই। কোথাও নেই বিরক্তির সামান্যতম প্রকাশ। আদেশ পালন করে এবং সার্বক্ষণিক সিজ্‌দায় রত থেকেই সকলেই কৃতার্থ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ٠

আল্লাহ্‌কেই সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীব-জন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশ্‌তাগণও। তারা অহংকার করে না। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৪৯)

এতে প্রমাণিত হয় যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ্‌র দরবারে সিজ্‌দাবনত হয়। তবে তাদের সিজ্‌দার ধরন ও পদ্ধতি আমাদের মত নয়। শুধু একটুকুই নয়, বরং তাদের তাসবীহ্, তাহ্‌লীল এমনকি সালাত আদায়ের কথাও কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ٠

আপনি কি দেখেন না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই জানে তাদের সালাত এবং পবিত্রতা ও মহিমা পদ্ধতি। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (সূরা নূর, ২৪ : ৪১)

"প্রত্যেকেই জানে তাদের সালাত (নামায) আদায়ের পদ্ধতি"—মহান আল্লাহ্‌র এ ঘোষণা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এ পৃথিবীতে যত মাখলূক রয়েছে সকলেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করছে। অনুরূপ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণও নামায আদায় করেছেন।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এ উম্মাতের বৈশিষ্ট্য। মি'রাজ রজনীতে এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ্ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয করেছেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, মি'রাজ রজনীতে নবী (সা)-এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছিল। পরে তা কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। এরপর বলা হয়, হে মুহাম্মাদ! আমার কথায় কোন রদবদল হয় না। আপনার জন্য এ পাঁচ ওয়াক্তের সাওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই সমান।[৬]

পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সাব্যস্ত করার মনস্তাত্ত্বিক ফায়দা হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের মনে সদা এ কথা জাগ্রত থাকবে যে, পঞ্চাশ ওয়াক্তই হচ্ছে ফরয নামাযের প্রকৃত সংখ্যা। অর্থাৎ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময়, শক্তি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য দিয়েই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ ধারণা যার অন্তরে জাগরূক থাকবে

তার পক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা মোটেই কঠিন ও কষ্টকর কাজ বলে মনে হবে না। বরং সে মনে করবে, আমাকে তো আরো অধিক সংখ্যক নামাযের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছিল। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর পূর্ব নির্দেশ শিথিল না করতেন তবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযই আমাকে আদায় করতে হত। কিন্তু তিনি তাঁর দুর্বল বান্দাদের উপর একান্ত দয়া পরবশ হয়ে পাঁচ ওয়াক্তকেই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন। নামাযের ওয়াক্ত পঞ্চাশ থেকে পাঁচ-এ কমিয়ে আনার এ রহস্যপূর্ণ নির্দেশের মধ্যে একদিকে যেমন বান্দার মনোবল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে বান্দার মনে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহের কথাও বিশেষভাবে জাগরুক হচ্ছে।

যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজ হয়েছিল এর পরদিনই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে তাঁর নিকট পাঠালেন তাঁকে নামাযের ওয়াক্ত, রাকা'আত ইত্যাদি সম্বন্ধে বাস্তবভাবে অবগত করার জন্য। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : জিব্রাঈল (আ) বায়তুল্লাহ্র পাশে আমাকে নিয়ে দুইদিন নামায আদায় করেন। প্রথম দিন তিনি যুহরের নামায আদায় করেছেন যখন কোন বস্তুর ছায়া জুতার ফিতার মত সামান্য লম্বা হয়। আসরের নামায আদায় করেছেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হয়। মাগরিবের নামায আদায় করেছেন যখন সূর্য ডুবে যায় এবং রোযাদার ইফতার করে। এশার নামায আদায় করেছেন যখন 'শাফাক' (সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে শেষ লালিমা পরবর্তী শুভ্রতা) লীন হয়ে যায়। অবশেষে ফজরের নামায আদায় করেছেন যখন উজ্জ্বল হয়ে সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে এবং রোযাদারের জন্য খাদ্য গ্রহণ হারাম হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় দিন তিনি যুহরের নামায আদায় করেছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয় অর্থাৎ গত দিনের আসরের নামায আদায় করার সময়ের কাছাকাছি সময়ে। আসরের নামায আদায় করেছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়। মাগরিবের নামায আদায় করেছেন প্রথম দিনের সময়েই। এশার নামায আদায় করেছেন যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে তিনি ফজর আদায় করেছেন যখন ভালভাবে পৃথিবী ফর্সা হয়ে যায়। এরপর জিব্রাঈল (আ) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এ হল আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের নামাযের ওয়াক্ত। এ দু'য়ের মাঝের ওয়াক্তই হল আপনার নামাযের ওয়াক্ত।[৭]

নামায ফরয হওয়ার দলীল

নামাযের ফরযিয়াত কুরআন, হাদীস, ইজ্‌মা এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। নামায ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ .

তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' কর। (সূরা বাকারা, ২ : ৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا .

নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা নিসা, ৪ : ১০৩)

এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা ফরয। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৮)

তাফসীর বিশারদগণ উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'দুলূক' (لِدُلُوْكِ) শব্দ দ্বারা যুহর, আসর ও মাগরিব, 'গাসাকিল লায়ল' (غَسَقِ الَّيْلِ) শব্দ দ্বারা এশার নামায এবং 'কুরআনাল ফাজর' (قُرْاٰنَ الْفَجْرِ) শব্দের দ্বারা ফজরের নামাযের নির্দেশ করা হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাদীসেও এর প্রতি সমর্থন রয়েছে। এ ছাড়া আরো বহু আয়াত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে।[৮]

নামাযের ফরযিয়াত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَحَجُّوْا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ـ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ আদায় করবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করবে, তা হলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে দাখিল হতে সক্ষম হবে।[৯]

উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوٰاتٍ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।[১০]

নামাযের ফরযিয়াতের বিষয়টি যৌক্তিকভাবেও প্রমাণিত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করেছেন, ঈমান ও হিদায়াত নসীব করেছেন। সর্বোপরি তিনি আমাদেরকে উম্মাতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এগুলো তিনিই আমাদেরকে দিয়েছেন। কাজেই আমাদের জন্য অপরিহার্য হল, এসব নি'আমতের শোকর আদায় করা, তাঁর আনুগত্য করা এবং দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার নামায আদায় করা। এ নামাযের দ্বারা যেমনিভাবে আল্লাহ্‌র নি'আমতের শোকর আদায় হচ্ছে, তেমনিভাবে এর বদৌলতে মুসল্লীর গুনাহ্ মাফ হয়ে যাচ্ছে এবং মুসল্লী নিজেকে গুনাহ্ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হচ্ছে। কেননা বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন তার থেকে কোন গুনাহ্ প্রকাশ হওয়ার কল্পনাই করা যায় না। মোটকথা নামাযের ফরযিয়াত কুরআন, হাদীস, ইজ্‌মা, কিয়াস তথা দলীল চতুষ্টয়ের দ্বারা সুপ্রমাণিত।[১১]

নামাযের ফরযিয়াত এবং ওয়াক্ত যেমনিভাবে কুরআন, হাদীস, ইজ্‌মা, ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক তেমনিভাবে নামাযের রাক'আতসমূহও হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত।[১২] দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করার পিছনে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট হিকমত নিহিত রয়েছে, আর তা হল নামাযের এ প্রাত্যহিকতার মাধ্যমে মুসল্লী তার আত্মা ও রূহের খাদ্য লাভ করে। অনুরূপভাবে এরদ্বারা মুসল্লী নিজের 'কল্‌ব'কে সৃষ্টিবিমুখ ও স্রষ্টামুখী করে লোভ-লালসা ও শয়তানের চতুর্মুখী প্ররোচনা থেকে হিফাযত করতে সক্ষম হয়। কাজেই এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া সকলের জন্যই অপরিহার্য।

নামযের উপকারিতা ও ফযীলত

নামায আদায়ের বহু উপকারিতা ও ফযীলত রয়েছে। যেমন : ১. আত্মিক, ২. শারীরিক, ৩. সামাজিক ও ৪. পারলৌকিক ইত্যাদি।

নামাযের আত্মিক উপকারিতা হল, নামায যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার আনুগত্যের বাস্তব রূপ ও আল্লাহ্‌র সাথে মি'রাজ সমতুল্য, কাজেই আল্লাহ্‌কেই হাযির-নাযির জেনে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় রেখে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যদি আল্লাহ্‌র প্রতি চরম আনুগত্যের ধ্যান সহ নামায আদায় করা হয় তবে এ নামাযে অবশ্যই মুসল্লীর আত্মিক উন্নতি হবে।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ·

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে। (সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১-২)

এ ধরনের নামায মানুষকে অন্যায় ও অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে। মানুষের আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ·

নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে। আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৫)

নবী কারীম (সা) বলেন :

اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلاَ يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ مَادَامَ فِىْ مُصَلاَّةِ ·

তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন সে যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা যতক্ষণ সে তার মুসল্লায় থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহ্‌র সাথে মুনাজাত তথা গোপন কথায় লিপ্ত থাকে।[১৩]

নামাযের শারীরিক উপকারিতা হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হলে দৈনিক পাঁচবার উযূ করতে হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। নামায আদায় করতে শারীরিক নড়াচড়া হয় তাও স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। তাছাড়া মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের জন্য কিছু হাঁটাচলা করতে হয় তাও শরীরের জন্য খুবই উপকারী। বিশেষ করে ফজরের সময় ঘুম থেকে জেগে মসজিদে যাতায়াত করে সকালের মৃদুমন্দ বাতাস উপভোগ করা স্বাস্থ্যের জন্য বড়ই কল্যাণকর। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণও এ কথা অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেছেন।

নামাযের সামজিক উপকারিতা হল, নামায আদায় মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যবোধ শিক্ষা দেয়। নিয়মিত নামাযী ব্যক্তি কখনো কর্তব্যে অবহেলা এবং অনিয়ম প্রদর্শন করতে পারে না। জামা'আতের নামাযে তো এ ছাড়া আরো অনেক উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

নামাযের পারলৌকিক উপকারিতা হল, নামায যেহেতু আল্লাহ্‌র মহব্বত ও আনুগত্য প্রকাশের অন্যতম পন্থা, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তাই নামায হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখিরাতে জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় বা উসীলা। এ কারণেই 'নামাযকে জান্নাতের চাবি' বলা হয়েছে। সে স্থানে পৌঁছার জন্য মানুষের গুনাহ এবং পাপমোচন করিয়ে যোগ্যতম করে তোলে এ নামাযই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ اِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا اِذَا اجْتَنَبَتِ الْكَبَائِرَ ـ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমু'আ হতে অন্য জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান সে সকল গুনাহ্ মোচনকারী, যে সকল গুনাহ্ মধ্যবর্তী সময়ে করা হয়। যদি কবীরা গুনাহ্‌সমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।[১৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করবে, কিয়ামতের দিন নামায তার জন্য নূর হবে, হিসাবের সময় দলীল হবে এবং নাজাতের উসীলা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করবে না নামায তার জন্য নূর, দলীল এবং নাজাতের উসীলা হবে না। অধিকন্তু তার হাশর হবে কারূন, ফির'আউন, হামান এবং উবাই ইব্‌ন খাল্‌ফের সাথে।'[১৫] আরো বহু হাদীসে নামাযের ফযীলতের কথা বর্ণিত রয়েছে।

নামায হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার দাসত্ব তথা গোলামী ও মহব্বতের চূড়ান্ত প্রকাশ। একজন মুসলমান যদি নামাযের পূর্ণ হাকীকত অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যদি নিছক প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে এবং যদি নামাযের মর্মবাণী হৃদয়ে অনুরণিত হয়, তাহলে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, নামায মুসল্লির জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিবে। নামাযের বাইরের কোলাহলপূর্ণ জীবনেও সে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে সক্ষম হবে নামাযের রঙে। নামাযই নিয়ন্ত্রণ করবে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি পদক্ষেপ।

বস্তুত গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত এবং গায়রুল্লাহ্‌র গোলামীর শৃংখল হতে মানুষকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং দাসত্বে নিয়োজিত করা নামাযের অন্যতম লক্ষ্য।

নামাযের শুরুতেই মুসল্লী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে 'আল্লাহু আকবর'—আল্লাহ্ই মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সমতুল্য কেউ নয়। সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দরবারে সমর্পণ করে দিচ্ছে।

রুকূ'-সিজ্‌দার মাধ্যমে বান্দা এ কথাই ঘোষণা করছে যে, আমার এ মাথা তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এ মাথা পৃথিবীর কারো সামনে নত হতে পারে না।

খুশু-খুযূ তথা বিনয় ও একাগ্রতা নামাযের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খুশু-খুযূর সাথে নামায আদায়ের অর্থ হল, নামাযী ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌কে হাযির-নাযির জেনে এমনভাবে নামায

আদায় করবে যে, তার হৃদয় থাকবে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ভালবাসায় ভরপুর এবং তাঁর প্রতি ভয়, তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বের চিন্তায় বিগলিত। দাঁড়ানো অবস্থায় নামাযী ব্যক্তি মনে মনে ভাববে যে, আমি আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান এবং আমি তাঁরই প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি। এভাবে রুকূ'তে গিয়ে সে চিন্তা করবে যে, আমি কেবল আল্লাহ্‌র সামনেই আমার মাথা অবনত করছি। সিজ্‌দায় এ কথা ভাববে যে, আমি কেবল তাঁরই সামনে সিজ্‌দাবনত হচ্ছি এবং তাঁরই সামনে সকল অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করছি।

উত্তম হল, নামাযের মধ্যে যে সব সূরা, কিরা'আত, তাসবীহ্ ইত্যাদি পাঠ করা হয় তা বুঝে পাঠ করা। বস্তুত নামাযের প্রকৃত স্বাদ তখনই পুরোপুরিভাবে লাভ করা যাবে যদি নামাযী নিজের পঠিত কথাগুলো ও বাক্যগুলোর অর্থ বুঝে পাঠ করে।

প্রকৃতপক্ষে নামাযের মধ্যে খুশু-খুযূ রক্ষা করা এবং আল্লাহ্‌র দিকে নিজের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখে একাগ্রচিত্তে মনোযোগী হওয়াই নামাযের প্রাণ বা মূল-রূহ্। আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা এভাবে নামায আদায়ের জন্য সচেষ্ট থাকেন তাঁদের সফলতা অর্জন অবশ্যম্ভাবী।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ٠

নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও নম্র। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১-২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ٠

তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন। (সূরা বাকারা, ২ : ৪৫)

খুশু-খুযূ সম্বন্ধে হাদীস শরীফে বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

'যদি কোন ব্যক্তি ওয়াক্তমত নামায আদায় করে, নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে উযূ করে এবং কিয়াম, রুকূ' ও সিজদা ইত্যাদি খুশু-খুযূর সাথে আদায় করে, তবে তার এ নামায দীপ্তিময় উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং নামাযীর জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকে, তুমি যেমনিভাবে আমার হিফাযাত করলে মহান আল্লাহ্ তা'আলাও অনুরূপভাবে তোমার হিফাযাত করুন। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি ওয়াক্তমত নামায আদায় না করে, পরিপূর্ণভাবে উযূ না করে এবং রুকূ' ও সিজদা ইত্যাদি খুশু-খুযূর সাথে আদায় না করে, তবে তার এ নামায কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠে এবং এ মর্মে বদ্ দু'আ করে যে, আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করলে। তার এ নামায পুরানো কাপড়ের মত পেঁচিয়ে তার মুখে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়।[১৬]

নামায তরক করার ভয়াবহতা

নামায তরক করা গুনাহে কবীরা। হাদীসে নামায তরককারীর প্রতি কঠিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

فَرَقٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ ٠

বান্দা ও কুফ্রীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায তরক করা।[১৭]

অর্থাৎ নামায তরক করাই প্রমাণ করে যে, কে আল্লাহ্র বান্দা এবং কে অস্বীকারকারী কাফির। অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : "যে ব্যক্তি নামায আদায় করে না, দীন ইসলামে তার কোন অংশ নেই।"[১৮]

বেনামাযী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। এ সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ٠

স্মরণ কর, সেই চরম সংকটের দিনের কথা, যেদিন তাদেরকে আহবান করা হবে সিজ্দা করার জন্য; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে আহবান করা হয়েছিল সিজ্দা করতে। (সূরা কালাম, ৬৮ : ৪২-৪৩)

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম হল, কিয়ামতের দিন যখন সর্বকালের সকল মানুষ ময়দানে হাশরে সমবেত থাকবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ তাজাল্লী প্রকাশিত হবে। সে সময় উচ্চস্বরে আওয়াজ দেওয়া হবে যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সরাসরি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়। এ ঘোষণার পর নামাযীগণ সিজ্দায় লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু বেনামাযীরা সিজ্দা করতে সক্ষম হবে না। তাদের পিঠ কাঠের মত শক্ত হয়ে যাবে। তখন অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিবে।[১৯] এ ছাড়াও আরো বহু শাস্তির কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

নামায যাদের উপর ফরয

বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক), আকিল (বুদ্ধিমান) এবং হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর নির্ধারিত সময়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল এবং ঋতুমতী নারীর উপর নামায ফরয নয়।

কাফির মুসলমান হলে, নাবালিগ বালিগ হলে, পাগল সুস্থ হলে এবং মহিলা হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র হলে তাহ্রীমা বাঁধার সময় বাকী থাকলে সে ওয়াক্তের নামায আদায় করা তার উপর ফরয। আর এসব কারণ যদি নামাযের শেষ ওয়াক্তে পাওয়া যায় যেমন শেষ ওয়াক্তে কেউ পাগল হলো, শেষ ওয়াক্তে কোন নারীর হায়িয-নিফাস আসল, এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে নামায আদায় করা তার উপর ফরয নয়।[২০]

আযান ও ইকামাত

'আযান' ও 'ইকামাত' শব্দ দু'টি আরবী। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ও জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য আযান ও ইকামাত দিতে হয়। দুটোই সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্। এ ছাড়া অন্যান্য নামায যেমন : বিত্‌র, তারাবীহ্, জানাযা, দুই ঈদের নামায, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নামায ইত্যাদিতে আযান নেই। মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর প্রকাশ্যে জামা'আতের সাথে মসজিদে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তখনো নামাযের জন্য আহ্বান জানানোর নির্ধারিত কোন নিয়ম-পদ্ধতি ছিলো না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্যোগেই মসজিদে একত্রিত হলে জামা'আত আরম্ভ হতো। এতে করে নির্দিষ্ট সময়ে জামা'আত শুরু করা যেতো না। তাই, নবী কারীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য পরামর্শ সভায় বসেন। সভায় কেউ মত প্রকাশ করেন, নাসারাদের ন্যায় 'নাকূস' বাজানো হোক, কেউ পরামর্শ দেন ইয়াহূদীদের মতো শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হোক। আবার কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক। হযরত উমর (রা) বললেন, নামাযের সময়ের পূর্বে মহল্লায় মহল্লায় লোক পাঠিয়ে দেওয়া হোক, যে اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ বলে লোকদেরকে নামাযের আহ্বান জানাবে।

এ প্রস্তাবের পর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে বিলাল ! উঠ এবং اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ বলে নামাযের জন্য আহ্বান জানাও। ঐ রাতেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) স্বপ্নযোগে আযানের বাক্যগুলো শুনতে পান। ইকামাতের বাক্যগুলোও তাঁকে শিখিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যুষে সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) নবী কারীম (সা)-এর নিকট এসে স্বপ্নের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ঘটনা শুনে নবী কারীম (সা) বললেন, এটি সত্য স্বপ্ন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাক্যগুলো হযরত বিলাল (রা)-কে শিখিয়ে দিতে বললেন। হযরত বিলাল (রা) উচ্চকণ্ঠে আযান দিতে থাকেন। এটা হিজরী প্রথম সনের ঘটনা। আযান শুনে হযরত উমর (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানান, তিনিও রাতে অনুরূপ বাক্যই স্বপ্নে শুনেছেন। অনুরূপ স্বপ্ন বারজন মতান্তরে ষোলজন সাহাবী দেখেছেন বলে জানা যায়।[২১]

আযান-এর সংজ্ঞা

'আযান' শব্দের অর্থ ডাকা, আহবান করা, অবহিত করা ও ঘোষণা দেওয়া। শরী'আতের পরিভাষায় জামা'আতে নামায আদায় করার লক্ষ্যে আশেপাশের মানুষকে একত্রিত করার জন্য আরবী নির্দিষ্ট শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে উচ্চকণ্ঠে ডাক দেওয়া ও ঘোষণা করাকেই 'আযান' বলা হয়। যিনি আযান দেন তাঁকে 'মুয়ায্‌যিন' বা আহবানকারী বলা হয়।[২২]

ইকামাত-এর সংজ্ঞা

'ইকামাত' অর্থ দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠিত করা। শরী'আতের পরিভাষায় জামা'আত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আযানের শব্দ বা বাক্য সমেত নামায আরম্ভ হওয়ার কথা ঘোষণা করাকেই 'ইকামাত' বলে।

অর্থাৎ মুসল্লীদের জানিয়ে দেওয়া যে, জামা'আত শুরু হচ্ছে, সবাই দাঁড়িয়ে যান, কাতার সোজা করুন। অবশ্য, এ জন্য ইকামাতে দু'বার حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ অর্থাৎ নামায দাঁড়িয়ে গেছে, দু'বার বলতে হয়।

আযান-এর বাক্যসমূহ

নামাযের সময় হলে পূতপবিত্র হয়ে কোন উঁচু স্থানে কিব্‌লার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দু'কানের মধ্যে শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয় প্রবেশ করিয়ে উঁচুস্বরে আযানের নিম্নোক্ত বাক্যগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করতে হয় :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহ্ মহান।' (চারবার)

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।' (দু'বার)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল।' (দু'বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ 'এসো নামাযের দিকে।' (দু'বার)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'এসো কল্যাণের দিকে।' (দু'বার)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহ্ মহান।' (দু'বার)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।' (একবার)

উল্লেখ থাকে যে, ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ—এর পর اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম) বাক্যটি দু'বার বলতে হয়। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ উচ্চারণের সময় ডানদিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বামদিকে মুখ ফিরাতে হয়। তবে বুক কিব্‌লামুখী থাকবে।

ইকামাত-এর বাক্যসমূহ

ইকামাত ও আযান প্রায় অনুরূপ। নামায শুরু করার পূর্বক্ষণে আযানের বাক্যগুলো তাড়াতাড়ি বলতে হয়। তবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ—এর পর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বাক্যটি দু'বার বলতে হয়।

আযান ও ইকামাতের উত্তর

আযান শ্রবণকারীর উপর মৌখিক জবাব দেওয়া সুন্নাত। মুয়ায্যিনের সাথে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করে জবাব দিবে। তখন মুয়ায্যিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবে, তখন لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে জবাব দিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আযানের জবাবে অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৩]

মুয়াযবযিন ফজরের আযানে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ দু'বার বলবে, শ্রোতা তখন প্রতিবার বলবে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (আপনি সত্য কথাই বলেছেন এবং মঙ্গলের কথাই বলেছেন)।

ইকামাতের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব। ইকামাত সময় قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলার পর মুসল্লীকে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (আল্লাহ্ নামায স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন যতদিন এ আকাশ এবং যমীন প্রতিষ্ঠিত থাকে) বলতে হয়।[২৪]

আযান-এর দু'আ

আযান শ্রবণকারীকে আযান শোনার পর দু'আ পড়তে হয়। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আযান শোনার পর এ দু'আ পড়বে, সে আমার শাফা'আত পাওয়ার যোগ্য হবে :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

হে আল্লাহ ! এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই নামাযের তুমিই প্রভু, হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, সুমহান মর্যাদা এবং বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গীকার।[২৫]

আযান-এর ফযীলত ও মাহাত্ম্য

প্রতিদিন পাঁচবার আযানের আওয়াজ মু'মিনের কানে এসে পৌঁছলে তার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠে আল্লাহ্র সমীপে হাযির হওয়ার জন্য। আযানের বহু ফযীলত রয়েছে। হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়্যতে অব্যাহতভাবে সাত বছর আযান দিবে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লিখে দেওয়া হবে।'[২৬]

'কিয়ামাতের দিন মুয়াযযিনের ঘাড় সবার চাইতে উঁচু হবে।'[২৭] অর্থাৎ তাদেরকে বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করা হবে।

নামায-এর ওয়াক্ত

প্রতিদিন নির্দিষ্ট পাঁচবার নামায আদায় করা ফরয। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

তোমরা সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা নিসা, ৪ : ১০৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৮)

আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করার পর হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে নবী কারীম (সা)-কে নামায আদায়ের পদ্ধতি এবং নামাযের সময় জানিয়ে দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَمَّنِيْ جِبْرَئِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْاُوْلٰى مِنْهُمَا حِيْنَ كَانَ الْفَيْئُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ كُلُّ شَيْئٍ مِثْلَ ظِلِّهٖ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَاَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ بَرِقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ اَسْفَرَتِ الْاَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ٠

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আ) কা'বা শরীফের পাশে নামাযে দু'বার আমার ইমামাত করেছেন। প্রথম দিন তিনি যুহরের নামায আদায় করেন এমন সময় সূর্য ঢলে পড়েছে এবং ছায়া ছিলো জুতার ফিতার মত সরু। আর আসরের নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি মাগরিবের নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। আর তিনি এশার নামায এমন সময় আদায় করেছেন, যখন শফক বা পশ্চিমাকাশের লালিমা দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। আর তিনি ফজরের নামায আদায় করেন সুবহে সাদিকের সময়। দ্বিতীয় দিন তিনি যুহরের নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে এবং প্রতিটি বস্তুর ছায়া ছিলো হুবহু তারই সমান। আসর আদায় করেন এমন সময় যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া ছিলো তার দ্বিগুণ। আর মাগরিব আদায় করেন প্রথম দিনের মত এমন সময় যখন সূর্য ডুবে গেছে। আর এশা এমন সময় আদায় করেন, যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেছে। আর ফজরের নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন পৃথিবী ফর্সা হয়ে গিয়েছিল। এরপর হযরত জিব্রাঈল (আ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : হে মুহাম্মাদ (সা) ! এটাই আপনার নামায আদায় করার নির্ধারিত সময়। আর আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের নামায আদায় করার এটাই ছিলো নির্ধারিত সময়। আপনার জন্য নির্ধারিত ওয়াক্ত হলো এ দু'সময়ের মধ্যবর্তী সময়।[২৮]

নিম্নে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা বর্ণনা করা হলো :

সুবহে সাদিক শুরু হলেই ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরে নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকে।

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথেই যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। ছায়ায়ে আসলী বা দ্বিপ্রহরের ছায়া ছাড়া প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহর নামাযের সময় বাকী থাকে। গরমের সময় যুহরের নামায বিলম্বে এবং শীতের মৌসুমে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব।

ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সমতল ভূমিতে কোন বস্তুর যে ছায়া থাকে, তাকেই 'ছায়ায়ে আসলী' বলে। যুহরের নামাযের সময় শেষ হতেই আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আসর নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকে। সূর্যের রঙ পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আসরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ‐

তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে সালাতুল উসতা বা আসর নামাযের প্রতি। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৮)

সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। পশ্চিমাকাশের লালিমা বিলুপ্তকাল পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় বাকী থাকে। সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে মাগরিবের নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

পশ্চিমাকাশের লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর আকাশপ্রান্তে যে সাদা আভা চোখে পড়ে তা বিলুপ্ত হওয়ার পর এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকী থাকে। এশার নামায বিলম্ব করে রাতের তৃতীয়াংশ হওয়ার পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ব্যক্তির বিতর নামায দেরী করে শেষরাতে আদায় করা মুস্তাহাব। শেষরাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে ঘুমানোর পূর্বেই বিত্‌র নামায আদায় করা উত্তম। এশার নামায আদায়ের পরই বিত্‌রের সময় শুরু হয়। ফজর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকী থাকে।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

তিনটি সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ : ১. সূর্যোদয়ের সময়, ২. ঠিক দুপুরের সময় এবং ৩. সূর্যাস্তের সময়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُصَلِّيَ وَاَنْ نَقْبُرَ فِيْهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتّٰى تَزُوْلَ وَحِيْنَ تَضِيْفَ لِلْغُرُبِ حَتّٰى تَغْرُبَ ‐

হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আ'মের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নির্ধারিত তিন সময়ে নামায আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন : ১. সূর্যোদয়ের সময়, যতক্ষণ না সূর্য উপরে উঠবে (এ সময়টি প্রায় ২৩ মিনিটে), ২. সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সময় যতক্ষণ না ঢলে পড়ে এবং ৩. সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়, যতক্ষণ না অস্ত যাবে (এ সময়টি প্রায় ২০ মিনিট)।

উপরোক্ত তিনটি সময়ে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সব ধরনের নামায নিষিদ্ধ। সিজদায়ে তিলাওয়াতও নিষিদ্ধ।

যে সময় নামায আদায় করা মাকরূহ

১. পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ হলে বা বায়ু নিঃসরণের প্রয়োজন থাকা অবস্থায়;

২. পানাহার উপস্থিত থাকা অবস্থায় ক্ষুধার্তের জন্য পানাহারের আগে নামায আদায় করা মাকরূহ।

উপরোক্ত প্রয়োজনগুলো সেরে তবেই নামাযে মনোনিবেশ করতে হয়, যাতে করে নিবিষ্ট মনে নামায আদায় করা যায়।

যে সময় শুধু নফল নামায আদায় করা মাকরূহ

১. জুমু'আ, দুই ঈদ, বিয়ে বা হজ্জের খুত্বা দেওয়ার জন্য ইমাম নিজের জায়গা থেকে উঠলে;

২. ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় হয়ে আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত;

৩. আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত;

৪. ফজরের সময় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল আদায় করা;

৫. জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেলে;

৬. ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে বা মাঠে;

৭. ঈদের নামাযের পর ঈদের ময়দানে নফল নামায আদায় করা;

৮. আরাফাতের ময়দানে যুহর-আসরের মাঝে এবং আসরের পরে;

৯. মুযদালিফায় মাগরিব-এশার মাঝে ও পরে;

১০. মাগরিব নামাযের পূর্বে। যে সব মসজিদে আযানের পর জামা'আত কিছুটা বিলম্বে শুরু হয় সেখানে নামাযের পূর্বে দুই রাকা'আত নফল আদায় করে নেয়া যেতে পারে।

নামায আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি

নামায আদায় করার সময় উযূ করে কিব্‌লামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে উপস্থিত জেনে পড়বে :

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

আমি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর আমি তাদের মধ্যে নেই যারা তাঁর সঙ্গে অন্যকে শরীক করে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৭৯)

এরপর নিয়্যাত করতে হবে। 'নিয়্যাত' শব্দটি আরবী। অর্থ সংকল্প, দৃঢ় প্রত্যয়, ইত্যাদি। কোন কিছু করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকেই নিয়্যাত বলে। নির্দিষ্ট কোন বাক্যের মাধ্যমে মৌখিক উচ্চারণ অত্যাবশ্যক নয়। অবশ্য নির্দিষ্ট বাক্যাবলীর মাধ্যমেও নামাযের নিয়্যাত করা যায়, যেমন : চার রাকা'আত যুহরের সুন্নাতের নিয়্যাত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ .

আমি কিব্‌লামুখী হয়ে যুহরের চার রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায়ের নিয়্যাত করছি। আল্লাহু আকবার।

আরবী ও বাংলা যে কোন ভাষায়ই নিয়্যাত করা যায়। তবে, আরবীতে নিয়্যাত করাই উত্তম। এমনিভাবে ফরয হলে ফরয, নফল হলে নফল এবং দু'রাকা'আত হলে 'রাকা'আতায়' আর তিন রাকা'আত হলে 'সালাসা রাকা'আতি' বলবে। ইমাম হলে বলবে :

أَنَا اِمَامٌ لِمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَحْضُرُ ۔

উপস্থিত এবং যাঁরা জামাতে শামিল হবেন আমি সবার ইমাম।

আর মুক্তাদী হলে বলতে হয় :

اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ ۔

আমি এ ইমামের ইক্তিদা করছি। কিব্‌লামুখী হয়ে শরীর স্বাভাবিক রেখে দাঁড়াতে হয়। দু'পায়ের মধ্যখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখতে হয়। সিজদার স্থানের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। নিয়্যাতের সাথে সাথে 'আল্লাহু আক্‌বার' (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলে দু'হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে হয়। এ সময় আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রেখে তালু কিবলার দিকে রাখতে হয়। তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার পর দু'হাত নাভীর নিচে বাঁধতে হয়। এ সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর থাকবে। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও ছোট আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরতে হয়। ডান হাতের বাকি অন্যান্য আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর এলিয়ে রাখতে হয়। তাক্‌বীরের পর এ সানা পড়তে হয় :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ۔

হে আল্লাহ্ ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি, আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদা অতি ঊর্ধ্বে। আপনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নেই।

এরপর পড়তে হয় :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এবং এরপর পড়বে :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু অশেষ মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

তারপর পড়তে হয় সূরা ফাতিহা :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٥ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّيْنَ اٰمِيْنَ ۔

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই—যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়, যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। সে সব লোকের পথ যাঁদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনি ক্রোধান্বিত আর তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।

সূরা ফাতিহার পর নামাযী ব্যক্তি ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই চুপে 'আমীন' বলবে। এরপর কুরআনের একটি ছোট সূরা অথবা বড় এক আয়াত, অথবা ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে। মুক্তাদী ইমামের কিরা'আত পড়া নিবিষ্ট মনে শুনবে। কিরা'আত পড়ার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে যাবে। হাত হাঁটুর উপর রেখে আঙ্গুল ফাঁক করে হাঁটু ধরবে। রুকূ'র সময় মাথা যেন কোমর ও পিঠের বরাবর থাকে। রুকূ'তে তিনবার পড়তে হয় سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ। (পবিত্র আমার মহান প্রভু)। এই তাসবীহ্ কমপক্ষে তিনবার পড়বে। তাসবীহ্ বেজোড় পড়তে হয়। মহিলাদের রুকূ'তে একটুকু ঝুঁকতে হবে যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছে। আঙ্গুলগুলো মেলিয়ে হাঁটুর উপর রাখতে হয় এবং দু'হাতের কনুই দু'পাশের সাথে মিলিয়ে রাখতে হয়। রুকূ'র পর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (আল্লাহ্ তার কথা শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে) বলে সটান হয়ে দাঁড়াবে। তারপর বলবে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের প্রতিপালক! সব প্রশংসা তোমারই) ইমাম হলে প্রথমটি এবং মুক্তাদি হলে দ্বিতীয়টি বলতে হয়।

এরপর তাক্বীর বলে সিজদায় যেতে হয়। প্রথমে দু'হাঁটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক, পরক্ষণে কপাল যমীনে রাখতে হয়। দু'হাতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে মুখমণ্ডল। বৃদ্ধাঙ্গুল রাখতে হয় কান বরাবর। হাতের আঙ্গুলগুলো কিব্লামুখী করে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে রাখতে হয়। দু'কনুই যমীন থেকে উপরে রাখতে হয়। হাঁটু পেট ও রান থেকে পৃথক রাখতে হয়। সিজদার অবস্থায় উভয় পা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলো যথাসম্ভব কিবলামুখী রাখবে। সিজ্দার সময় মহিলাদের পেট উরুর সাথে এবং বাহু বগলের সাথে মিলয়ে রাখবে। কনুই পর্যন্ত হাত মাটিতে রাখবে। দু'পা খাড়া না রেখে বিছিয়ে রাখবে। সিজ্দায় কমপক্ষে তিনবার পড়তে হয় سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى (পবিত্র আমার মহান প্রতিপালক)। প্রতি রাকা'আতেই দুই সিজ্দা করবে। সিজ্দা থেকে তাক্বীর বলে প্রথমে কপাল এবং তারপর নাক ও হাত উঠিয়ে বসবে। বসার সময় ডান পা কিব্লামুখী করে খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর দু'জানু হয়ে বসবে। এ সময় উভয় হাত উভয় রানের উপর রাখবে। এরপর তাক্বীর বলে দ্বিতীয় সিজ্দায় যাবে। উভয় সিজ্দা আদায়ের পর তাক্বীর বলে দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াবে। তারপর বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতিহা এবং কিরা'আত পড়ে দ্বিতীয় রাকা'আত পূর্ণ করবে। তারপর বসে বসে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়বে। মহিলাদের দু'পা ডানদিকে করে বাম পাশের উপর এমনভাবে বসতে হয় যেন ডানের উরু বাঁয়ের উরুর সাথে এবং ডান নিতম্বের মাংসপিণ্ড বাম পায়ের উপরে থাকে। দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে উঠে বসে এ তাশাহহুদ পড়বে :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

সমুদয় প্রশংসা, সব ইবাদত এবং সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর সালাম আর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন প্রভু নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। 'লা-ইলাহা' বলার সময় ডান হাতের বুড়ো ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে চক্র বানিয়ে অন্যান্য আঙ্গুলগুলো বন্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল আসমানের দিকে তুলে ইশারা করতে হয় এবং 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় আঙ্গুল নামিয়ে নিতে হয়। সালাম ফেরানো পর্যন্ত আঙ্গুগুলো এভাবে রাখতে হয়।

নামায চার রাকা'আত হলে 'তাশাহ্হুদ' পড়ার পর তাক্বীর বলে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াবে। এরপর পূর্বের ন্যায়ই বিসমিল্লাহ্ ও সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। সুন্নাত বা নফল নামায হলে সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়তে হবে। ফরয নামায হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতের সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা আয়াত পড়তে হবে না। চতুর্থ রাকা'আতের শেষে সিজ্দার পর বসে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর এ দুরূদ শরীফ পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

হে আল্লাহ্ ! সালাম ও রহমত বর্ষণ করুন, মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চিয়ই আপনি প্রশংসিত, মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্ ! বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন, ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

দুরূদ পড়ার পর নিম্নের দু'আ পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

হে আল্লাহ্! আমি আমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি। আর একমাত্র আপনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে গুনাহ্ ক্ষমা করতে পারে। তাই, আপনি আমাকে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার উপর দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়াবান।

উপরোক্ত দু'আ পড়ার পর প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ এবং পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলে নামায শেষ করতে হয়।

নামাযের ফরযসমূহ

নামাযের ফরয ১৪টি। এগুলোর একটিও ছুটে গেলে নামায বিশুদ্ধ হবে না। এর মধ্যে ৭টি নামাযের পূর্বে ফরয এবং এগুলোকে নামাযের শর্ত বলা হয়। ৭টি নামাযের ভিতরে ফরয এবং এগুলো নামাযের রুকন বলা হয়।

নামাযের শর্তাবলী (আহকাম)

১. সমুদয় অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র হওয়া। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۔

আর তোমরা অপবিত্র হলে পাক সাফ হয়ে যাও। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৬)

কারো উযূর দরকার হলে উযূ বা তায়াম্মুম করতে হবে, গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে।

২. পরিধেয় পোশাক পবিত্র হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۔

আর তোমার পোশাক পবিত্র কর। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৪)

নামাযের সময় পরনে যা-ই থাকবে তা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। নচেৎ নামায হবে না। যেমন : জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ি, কোট, শেরওয়ানী, মোজা, লুঙ্গি, শাড়ি, সালোয়ার, কামিজ ইত্যাদি।

৩. নামাযের জায়গা পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ নামাযীর দু'পায়ের, দু'হাঁটুর, দু'হাতের ও সিজ্দার স্থান পাক হওয়া আবশ্যক।

৪. সতর ঢাকা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۔

হে বনী আদম ! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)

পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য দু'হাতের কব্জি, পদদ্বয় এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ সতর, এ অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা ফরয।

৫. নামাযের ওয়াক্ত হওয়া। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۔

নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মু'মিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা নিসা, ৪ : ১০৩)

সুতরাং সময়মত নামায আদায় করতে হবে। যে সময়ে নামায আদায় করা ফরয, সে সময়েই ঐ নামায পড়তে হবে।

৬. কিব্লমুখী হওয়া। এ সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۔

তোমরা (নামাযের সময়) কা'বার দিকে মুখ কর। (সূরা বাকারা, ২ : ১৫০)

এর অন্যথা করে অন্যদিকে মুখ করে কোন কারণ ব্যতীত নামায আদায় করলে নামায হবে না।

৭. নিয়্যাত করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ٠

আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী)

তাই, যে নামায আদায় করা হয়, তার জন্য মনে মনে নিয়্যাত করবে। ইমামের পিছনে নামায আদায় করলেও নিয়্যাত করতে হবে। (হিদায়া, পৃ. ৯২-৯৮)

নামাযের আরকান

নামাযের ভিতরে ৭টি কাজ ফরয :

১. তাহরীমা অর্থাৎ নামায আরম্ভ করার সময় আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব প্রকাশ পায় এমন কোন শব্দদ্বারা নামায শুরু করা ফরয। তবে "আল্লাহু আক্‌বার" বলে নামায আরম্ভ করা ওয়াজিব। একে 'তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা' এ জন্য বলা হয়, এ তাক্‌বীরের মাধ্যমে নামাযের বাইরের সব ধরনের কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٠

তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ : ৩)

২. কিয়াম করা অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ٠

তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৮)।

ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয। কোন ওযর থাকলে যেভাবে নামায আদায় করা সম্ভব সেভাবে নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে।

৩. কিরা'আত পড়া। ইরশাদ হয়েছে :

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ٠

তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু পড়। (সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ২০)

চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকা'আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকা'আতে কিরা'আত পড়া ফরয।

৪. রুকূ' করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ٠

তোমরা রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর। (সূরা বাকারা, ২ : ৪৩)

প্রত্যেক রাকা'আতে একবার রুকূ' করা ফরয। রুকূ' করার নিয়ম হচ্ছে, দাঁড়ানো থেকে একটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছে যায়। রুকূ'র সময় পিঠ বিস্তৃত রাখতে হয়। নবী কারীম (সা) এভাবেই রুকূ' করতেন। বসে নামায আদায়ের সময় এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন কপাল হাঁটু বরাবর গিয়ে পৌঁছে।

৫. সিজ্দা করা। প্রতি রাকা'আতে দু'টি সিজ্দা করা ফরয। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا .

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা রুকূ' কর এবং সিজ্দা কর। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৭)

৬. শেষ বৈঠকে বসা। নামাযের শেষ রাকা'আতের সিজ্দার পর 'তাশাহ্হুদ' পড়তে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় বসা ফরয।

৭. সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করা ফরয। শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দুরূদ, দু'আ মাসূরা পড়ার পর সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করতে হয়।[২৯]

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি। নামাযের ওয়াজিব বলতে ঐসব করণীয় বিষয় বোঝায়, যার কোন একটিও ছুটে গেলে 'সিজ্দায়ে সাহু' করলে নামায বিশুদ্ধ হয়ে যায়। ভুলবশত বা স্বেচ্ছায় সিজ্দায়ে সাহু না করা হলে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব। সিজ্দায়ে সাহুর নিয়ম হচ্ছে, শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে আরো দু'টি সিজদা আদায় করতে হয়।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ :

১. সূরা ফাতিহা পড়া। অর্থাৎ ফরয নামাযে এবং বিত্র, সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

২. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকা'আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা বা বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পড়া।

৩. প্রথমে সূরা ফাতিহা তারপর অন্য সূরা পড়া। অন্য কোন সূরা পড়ার পর সূরা ফাতিহা পড়লে ওয়াজিব আদায় হবে না। এজন্য 'সিজ্দায়ে সাহু' অত্যাবশ্যক।

৪. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকা'আতে এবং অন্যান্য নামাযের সব রাকা'আতে কিরা'আত পড়া ওয়াজিব। যদি কেউ ভুলবশত চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকা'আতে কিরা'আত না পড়ে শেষ দু'রাকা'আতে পড়ে বা প্রথম দু'রাকা'আতের এক রাকা'আতে এবং শেষ দু'রাকা'আতের এক রাকা'আতে পড়ে তবে 'সাহু সিজদা' আদায় করা ওয়াজিব।

৫. কিরা'আত, রুকূ' ও সিজ্দার মধ্যে ক্রমধারা ঠিক রাখা।

৬. কাওমা করা। অর্থাৎ রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭. জলসা করা অর্থাৎ দু' সিজ্দার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৮. তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকূ', সিজ্দা, কাওমা ও জলসায় কমপক্ষে এক তাসবীহ্ পরিমাণ স্থির থাকা যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

৯. কা'দায়ে উলা অর্থাৎ তিন বা চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকা'আতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়া বা পড়ার পরিমাণ সময় বসা।

১০. প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

১১. জাহরী নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে ইমামের উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়া এবং সিররী নামাযের মধ্যে ইমাম ও একাকী নামাযীর অনুচ্চ শব্দে কিরা'আত পড়া। অর্থাৎ ফজরের উভয় রাকা'আত, মাগরিব, এশার প্রথম দু'রাকা'আতে, জুমু'আ ও ঈদের নামায, তারাবীহ্ এবং রমযানের বিত্‌রের নামাযে ইমামের উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়া আর যুহর ও আসরের নামাযে, মাগরিব ও এশার শেষ রাকা'আতগুলোতে আস্তে আস্তে কিরা'আত পড়া।

১২. সালাম ফিরানো অর্থাৎ 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলে নামায শেষ করা।

১৩. বিত্‌র নামাযের দু'আয়ে কুনূত পড়ার জন্য অতিরিক্ত তাক্‌বীর বলা এবং দু'আয়ে কুনূত পড়া।

১৪. দু' ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাক্‌বীর বলা। (আলমগীরী, পৃ. ১৩৯-৪০)

নামাযের সুন্নাতসমূহ

নামাযের সুন্নাত ২১টি। যেমন :

তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা বলার পূর্বে পুরুষের কানের লতি এবং মহিলার কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠানো।

২. তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় দু'হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে কিব্‌লামুখী ও খুলে রাখা।

৩. 'তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা' বলেই পুরুষের নাভীর নিচে এবং মহিলার বুকের উপর হাত বাঁধা। ডানে হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখতে হয়, ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরতে হয়। বাকি আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর বিছিয়ে রাখতে হয়। তবে দু'আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা মহিলাদের জন্য সুন্নাত নয়। মহিলারা কেবল ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার উপর রাখবে।

৪. তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় মস্তক অবনত না করা।

৫. তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা এবং এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাবার সময় ইমামের জন্য তাক্‌বীর উচ্চস্বরে বলা।

৬. সানা, অর্থাৎ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' শেষ পর্যন্ত পড়া।

৭. 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়া।

৮. প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' পড়া।

৯. 'আমীন' বলা। যে নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়বে সে নামাযে সূরা ফাতিহা শেষ হওয়ার পর ইমাম ও মুক্তাদী সবাইকে 'আমীন' বলতে হয়। একাকী নামায আদায়কারীরও একই হুকুম।

১০. ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়া।

১১. সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ্ ও আমীন আস্তে পড়া।

১২. কিরা'আতে মাসনূন তরীকা অবলম্বন করা। অর্থাৎ যে নামাযে যতটুকু কুরআন পড়া সুন্নাত ততটুকু পড়া।

১৩. রুকূ' ও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার করে তাসবীহ্ পড়া। অর্থাৎ রুকূ'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং সিজায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল 'আ'লা' পড়া।

১৪. রুকূ'তে মাথা, পিঠ এবং কোমর সোজা রেখে দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা।

১৫. কাওমা বা রুকূ' থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় ইমামের 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং মুক্তাদীর 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা।

১৬. সিজ্‌দায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক এবং কপাল রাখা।

১৭. বসা অবস্থায় দু'হাত হাঁটুর উপর রাখা। বাম পা বিছিয়ে পায়ের উপর বসা আর ডান পা এমনভাবে খাড়া রাখা যেন আঙ্গুলগুলোর মাথা কিব্‌লার দিকে থাকে।

১৮. আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় 'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা।

১৯. শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু'র পর দুরূদ শরীফ পড়া।

২০. দুরূদ শরীফ পড়ার পর মাসনূন দু'আ পড়া।

২১. প্রথমে ডানে এবং পরে বাঁয়ে সালাম ফিরানো।[৩০]

নামাযের মুস্তাহাবসমূহ

১. পুরুষের জন্য তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় চাদর বা জামার হাতা থেকে হাত বাইরে রাখা। আর মহিলাদের জন্য হাত বের না করেই 'তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা' বলা।

২. নামাযীর দাঁড়ানো অবস্থায় সিজ্‌দার জায়গার দিকে, রুকূ' অবস্থায় দু'পায়ের উপর, জলসা ও কা'দার সময় দুই হাঁটুর উপর এবং সালাম ফিরানোর সময় দুই কাঁধের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

৩. রুকূ' ও সিজ্‌দায় তিনবারের বেশি তাসবীহ্ পড়া।

৪. যতদূর সম্ভব কাশি দাবিয়ে রাখা।

৫. হাই এলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা। মুখ খুলে গেলে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত এবং অন্যান্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ ঢাকা।[৩১]

নামাযের রাকা'আতসমূহ

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। এ ফরয নামায ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তে ওয়াজিব, সুন্নাত এবং নফল নামায রয়েছে। নিম্নে এর বিবরণ দেওয়া হল :

ফজরের নামায

ফজরের নামায প্রথমে সুন্নাত দুই রাকা'আত এবং পরে ফরয দুই রাকা'আত। হাদীসে ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে খুব তাকীদ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : "তোমরা ফজরের সুন্নাত কিছুতেই ছাড়বে না। যদিও ঘোড়া তোমাদেরকে পদদলিত করে।"[৩২]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : "ফজরের সুন্নাত আমার কাছে দুনিয়া ও তার যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা বেশি প্রিয়।"[৩৩]

ফজরের সুন্নাতের প্রথম রাকা'আতে কুল ইয়া (সূরা কাফিরূন) এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে কুল হুওয়াল্লাহু (সূরা ইখলাস) পড়া উত্তম।

যুহরের নামায

যুহরের নামায প্রথমে চার রাকা'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্' তারপর চার রাকা'আত ফরয এবং এরপর দুই রাকা'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ।

আসরের নামায

প্রথমে চার রাকা'আত সুন্নাতে গায়রে মু'আক্কাদাহ্, তারপর চার রাকা'আত ফরয।

মাগরিবের নামায

প্রথমে তিন রাকা'আত ফরয, তারপর দুই রাকা'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্।

এশার নামায

প্রথমে চার রাকা'আত সুন্নাতে গায়রে মু'আক্কাদাহ্, তারপর চার রাকা'আত ফরয এবং এরপর দুই রাকা'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্। তারপর বিত্‌রের তিন রাকা'আত। বিত্‌রের এই তিন রাকা'আত নামায ওয়াজিব।

জুমু'আর নামায

প্রথমে চার রাকা'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্, তারপর দুই রাকা'আত ফরয, এরপর চার রাকা'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্, এরপর দুই রাকা'আত সুন্নাত।

উল্লেখ্য যে, ফরয নামাযের পর মাকরূহ এবং নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য সময়ে নফল আদায় করা জায়িয।

দুই ঈদের নামায

ঈদের নামায দুই রাকা'আত ওয়াজিব।

নামায মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ

১. প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী পোশাক-পরিচ্ছদ পরা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেউ মাথায় চাদর দিয়ে ঘাড়ের উপর না দিয়ে দু'ধারে ঝুলিয়ে রাখলো অথবা জামা বা শেরওয়ানীর আস্তিনের মধ্যে হাত না ঢুকিয়ে কাঁধের উপর রাখা।

২. ধূলাবালি থেকে রক্ষার জন্য কাপড় গুটিয়ে নেয়া, ধূলা ঝেড়ে ফেলা, সিজ্‌দার জায়গা থেকে পাথর ইত্যাদি সরিয়ে ফেলার জন্য বারবার ফুঁক দেওয়া অথবা হাতের সাহায্যে সরিয়ে ফেলা, অবশ্য একবার হাত দিয়ে বা ফুঁক দিয়ে পাথর ইত্যাদি সরিয়ে ফেলায় ক্ষতি নেই।

৩. পোশাক-পরিচ্ছদ, দাড়ি, বোতাম, মাথার চুল বা অন্য কিছু নিয়ে খেলা করা, মুখে আঙ্গুল দেওয়া, হাত-পায়ের আঙ্গুল ফোটানো বা বিনা কারণে শরীর চুলকানো।

৪. হাট-বাজার, সভা-সমাবেশে যাওয়া পসন্দ করা হয় না, এমন জীর্ণ মলিন পোশাক পরে নামায আদায় করা।

৫. অলসতা বা উপেক্ষাবশত খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহ্।

৬. পেশাব-পায়খানা বা বায়ু নিঃসরণের প্রয়োজন সত্ত্বেও তা পূরণ না করে নামায আদায় করা।

৭. পুরুষের জন্য মাথার চুল বেঁধে নামায আদায় করা।

৮. এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকানো।

৯. নামায আদায়ের সময় কোমরে হাত রাখা।
১০. এদিক-ওদিক তাকানো।
১১. সিজ্‌দায় পুরুষের দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া।
১২. নামাযীর দিকে মুখ করে আছে—এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা।
১৩. ইমামের মিহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো। উভয় পা মিহরাবের বাইরে এবং সিজ্‌দা ইত্যাদি ভেতরে হলে দোষ নেই।
১৪. ইচ্ছা করে হাই তোলা। হাই ঠেকাতে সক্ষম হয়েও তা না ঠেকানো।
১৫. প্রাণীর ছবি সম্বলিত পোশাক পরে নামায আদায় করা, এমন মুসাল্লায় নামায আদায় করা, যার মধ্যে কোন প্রাণীর ছবি থাকে বা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা, যেখানে মাথার উপর, ডানে ও বামে ছবি থাকে।
১৬. সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পেছনে একাকী দাঁড়ানো।
১৭. হাত বা মাথার ইশারায় সালাম করা।
১৮. চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা। একাগ্রতা, বিনয় ও নম্রতার জন্য চোখ বন্ধ করা যেতে পারে।
১৯. বিনা ওযরে শুধু কপাল বা নাক দিয়ে অথবা টুপি বা পাগড়ীর উপর সিজ্‌দা করা।
২০. বিনা ওযরে আসন পেতে বসা, অথবা হাঁটুর সাথে পেট ও বুক লাগিয়ে বসা।
২১. কোন কারণ ব্যতীত ইমামের একা উঁচুস্থানে দাঁড়ানো। মুক্তাদী সাথে থাকলে জায়িয হবে।
২২. দাঁড়ানো অবস্থায় কিরা'আত শেষ না করে রুকূ'তে যেতে যেতে কিরা'আত শেষ করা।
২৩. ফরয নামাযে কুরআনের সূরা ক্রমধারা বজায় না রেখে পড়া। যেমন প্রথম রাকা'আতে اِنَّا اَعْطَيْنَا (সূরা কাওসার) পড়া এবং পরের রাকা'আতে اَرَاَيْتَ الَّذِىْ (সূরা মাঊন) পড়া। অথবা মাঝখানে তিন আয়াত সম্বলিত সূরা বাদ দিয়ে তারপরের সূরা পড়া। যেমন প্রথম রাকা'আতে اَرَاَيْتَ الَّذِىْ পড়ে দ্বিতীয় রাকা'আতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (সূরা কাফিরূন) পড়া। মধ্যবর্তী সূরা কাওসার (اِنَّا اَعْطَيْنَا) ছেড়ে দেওয়া। এমনিভাবে একটি সূরার ক'টি আয়াত প্রথম রাকা'আতে পড়ে পরবর্তী রাকা'আতে দু'এক আয়াত বাদ দিয়ে পড়াও মাকরূহ। এক রাকা'আতে এমন দু'টো সূরা পড়া মাকরূহ, যার মাঝখানে এক বা একাধিক ছোট বা বড় সূরা বাদ থাকে। প্রথম রাকা'আত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকা'আতে লম্বা কিরা'আত করা বা নামায আদায়ের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করে নেওয়া মাকরূহ। উল্লেখ্য, তারাবীহ্ বা অন্যান্য নফল নামাযের ক্ষেত্রে এগুলো মাকরূহ নয়।
২৪. নামাজের মধ্যে যেসব কাজ সুন্নাত তার কোন একটি ছেড়ে দেওয়া।
২৫. সিজ্‌দার সময় পদযুগল মাটি থেকে সম্পূর্ণ উঠিয়ে ফেলা।
২৬. নামাযের মধ্যে সূরা, আয়াত বা তাসবীহ্ আঙ্গুল দিয়ে গণনা করা।
২৭. নামাযের মধ্যে গায়ের আড়মোড়া ভাঙ্গা বা অলসতা প্রদর্শন করা।
২৮. মুখে এমন কিছু রেখে নামাযে দাঁড়ানো, যাতে করে কিরা'আতে অসুবিধা হয়।[৩৪]

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

১. নামাযের মধ্যে অল্প হোক বা বেশি হোক, কথা বললেই নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় নামায আদায় করতে হবে। কথা বলার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে যেমন :

এক. নামাযী কোন লোকের সাথে কথা বলা বা কারো কথার উত্তর দেওয়া, তা যে কোন ভাষায়ই হোক না কেন।

দুই. স্বগত বা কোন প্রাণীকে লক্ষ্য করে কিছু বলা।

তিন. নামাযের মধ্যে এমন কিছু চাওয়া যা মানুষের কাছে চাওয়া যায়।

চার. ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দেওয়া, মুক্তাদী ছাড়া অন্য কারো লোক্‌মা গ্রহণ করলে ইমামের নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২. নামাযের মধ্যে কুরআন শরীফ দেখে পড়লে বা অন্য কোন লেখা দেখে পাঠ করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

৩. ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নামাযের ফরযের মধ্যে যে কোন একটি ছুটে গেলেও নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৪. বিনা প্রয়োজনে এমনভাবে গলা পরিষ্কার করা যাতে দু'একটি হরফের মত আওয়ায হয়, এতে নামায ভঙ্গ হবে।

৫. দুঃখ-কষ্ট বা বেদনার কারণে নামাযের মধ্যে উঃ আঃ ইত্যাদি আওয়ায করা। আল্লাহ্‌র ভয়ে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করলে নামায ভঙ্গ হবে না।

৬. ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ভুলবশত নামায অবস্থায় পানাহার করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য দাঁতের ফাঁক থেকে ছোলা থেকে কম পরিমাণ কোন আহার্য বেরুলে তা খেলে নামায নষ্ট হবে না।

৭. নামাযের মধ্যে এমন কাজ করা, বাইরের কেউ দেখে মনে করবে, আদৌ লোকটি নামায আদায় করছে না। যেমন : দু'হাতে কাপড় ঠিক করা, মহিলাদের নামাযের মধ্যে চুলে ঝুটি বাঁধা বা নামায অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো, নামাযের মধ্যে চলাফেরা করা।

৮. কুরআন তিলাওয়াতে এমন ভুল করা, যাতে অর্থ বিগড়ে যায়।

৯. প্রাপ্তবয়স্কদের নামাযে অট্টহাসি হাসা।

মসজিদ

'মসজিদ' আরবী শব্দ। অর্থ সিজ্‌দার জায়গা। মুসলমানদের জন্য মসজিদ এমন এক পবিত্রতম স্থান যাকে কেন্দ্র করে মুসলিম মিল্লাতের গোটা জীবন আবর্তিত হয়ে থাকে। মসজিদ ছাড়া ইসলামী জনপদের ধারণাই করা যায় না। এ কারণেই নবী করীম (সা) মদীনায় পৌছার পরপরই মসজিদ তৈরির ব্যবস্থা করেন। তিনি স্বহস্তে পাথর বহন করে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

ইসলামী সমাজে মসজিদ শুধু নামায আদায়ের স্থান নয়, বরং মুসলমানের সকল কর্মকাণ্ডের এবং সকল তৎপরতার কেন্দ্রস্থল হল এই মসজিদ। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের পড়ার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। এতে মসজিদ হয়ে উঠে সকল সমস্যার

সমাধানের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। জাতি গঠনের মহৎ উপাদান হিসাবে এবং সুষ্ঠু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশে মসজিদ কি ভূমিকা পালন করতে পারে মদীনার মসজিদে নববী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۔

তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে। (সূরা তাওবা, ৯ : ১৮)

নবী কারীম (সা) মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তা চালু রাখার জন্য বিভিন্নভাবে প্রেরণা দিয়েছেন। নবী কারীম (সা) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মসজিদ তৈরি করে, তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাতে ঘর তৈরি করেন।'[৩৫]

হাদীসে বর্ণিত আছে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে যার মন সবসময় মসজিদে লেগে থাকে।[৩৬]

মসজিদ আবাদ করার অর্থ ঘর বা বিল্ডিং তৈরি করা বুঝায় না। বরং প্রকৃতপক্ষে মসজিদে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করা এবং জামা'আতে নামায প্রতিষ্ঠা করাই বোঝায়। মসজিদ মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের মূলকেন্দ্র হওয়া উচিত। নবী কারীম (সা) তা-ই করেছিলেন। তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করেছিলেন।

জামা'আতের ফযীলত ও গুরুত্ব

নামাযের পূর্ণ ফযীলত ও বরকত হাসিল হয় তা জামা'আতের সাথে আদায় করা হলে। জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্। কোন কোন ফকীহ্-এর মতে নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব।[৩৭]

জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়ে কুরআন মজীদ ইরশাদ হয়েছে :

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۔

এবং যারা রুকূ' করে তোমরা তাদের সাথে রুকূ' কর। (সূরা বাকারা, ২ : ৪৩)

বস্তুত নামাযের স্বভাব ও প্রকৃতির দাবি এটাই। কেননা জামা'আতের অবস্থায়ই নামায তার স্বকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত-আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম জামা'আতের ব্যাপারে খুব যত্নবান ছিলেন। তাঁদের আমল দেখে মনে হয় জামা'আত নামাযেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমনকি মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ (সা) জামা'আতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাকে অপসন্দ করেছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি (নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়ার নিমিত্তে) বললেন, লোকজন নামায আদায় করে ফেলেছে ? আমি বললাম, না, তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে হে আল্লাহ্র রাসূল ! তিনি বললেন, আমাকে একটা পাত্রে পানি দাও। আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। তখন তিনি উযূর অঙ্গসমূহ ধুয়ে দাঁড়াতে চাইলেন কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়ে

গেলেন। আবার জানতে চাইলেন লোকজন কি নামায আদায় করে ফেলেছে ? আমি বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমাকে একটি পাত্রে পানি দাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর তিনি উযূর অঙ্গসমূহ ধুয়ে (জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য) উঠতে চাইলেন কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। আবার যখন হুঁশ ফিরে এলো তখনও তাঁর সেই একই প্রশ্ন, লোকজন কি নামায পড়ে ফেলেছে ? আমি বললাম, না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন তিনি বললেন, আমার জন্য একটি পাত্রে পানি দাও। (আমি উযূর পানি দিলে) তিনি বসে উযূর অঙ্গসমূহ ধুয়ে (নামাযের জামা'আতের শরীক হওয়ার নিমিত্তে) উঠতে চাইলেন। কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আবারো জানতে চাইলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে নিয়েছে ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। বস্তুত তখন সাহাবায়ে কিরাম এশার নামাযের জন্য মসজিদে বসে বসে নবী কারীম (সা)-এর অপেক্ষা করছিলেন। তখন তিনি আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা)-কে নামায পড়ানোর জন্য বলে পাঠালেন।[৩৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : একা নামায আদায় করার তুলনায় জামা'আতে নামায আদায় করলে সাতাশ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায়।[৩৯]

জামা'আতে নামায আদায় করাতে বহু হিক্‌মাত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। জামা'আতের প্রতি পাবন্দী করার দ্বারা মানুষের মন অধিক আকৃষ্ট হয়। এতে নিজের নামাযকে সহীহ্ ও সুন্দর করার বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি এতে নামাযের মাসাইল ও নিয়ম-কানুন শেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। জামা'আতের একটি বড় ফায়দা এই যে, যখন একদল মুসলমান এক কাতারে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দাঁড়ায় এবং বিনয় বিগলিত অন্তর নিয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ জানায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের সাগরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ফলে অযুত সহস্র ধারায় নেমে আসে তাঁর অফুরন্ত করুণা ও রহমত। জামা'আতের বিশেষ ফায়দা এই যে, অনেক সময় আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার ইখলাস ও তাক্‌ওয়ার বদৌলতে গোটা জামা'আত আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়াতলে স্থান পেয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র কোন খাস বান্দার হৃদয়ের সজীবতা তখন সকলের হৃদয়কে সজীব করে তোলে। ফলে একজনের উসীলায় গোটা জামা'আতে নামায কবূল হয়ে যায়। এ ছাড়াও বহু পার্থিব উপকার এতে রয়েছে, যেমন জামা'আতে নামায আদায় করার ফলে নামাযীর মধ্যে সময়ের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষায় যোগ্যতা গড়ে উঠে। এতে মুসল্লীদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়।

তাক্‌বীরে উলায় শরীক হওয়ার ফযীলত

তাক্‌বীর উলায় নামাযে শরীক হওয়ার ফযীলত সম্বন্ধে হযরত আনাস (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন প্রত্যেক নামায নিয়মিতভাবে জামা'আতের সাথে এমনভাবে আদায় করবে যে, তার প্রথম তাক্‌বীর ছুটে যাবে না, তার জন্য দু'টো জিনিস থেকে অব্যাহতির ফায়সালা করা হয়। এক. জাহান্নামের আগুন থেকে অব্যাহতি; দুই, মুনাফিকী থেকে অব্যাহতি ও হিফাযত।[৪০]

জামা'আত তরকের অপকারিতা

নামায জামা'আতেই আদায় করতে হবে। নবী কারীম (সা) জীবনে জামা'আত ত্যাগ করেননি। নবীর উম্মাত হিসেবে জামা'আতে নামায আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। জামা'আত ছাড়া সালাত আদায়ের অপকারিতা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : হে মুসলমান সকল ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুনানে হুদা বা হিদায়াতের পন্থা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে মসজিদে আদায় করাই হচ্ছে সুনানে হুদা। তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামায আদায় করা শুরু কর, যেমন অমুক ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে ঘরে নামায আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিলে। যদি তোমরা নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে হিদায়াতের পথ থেকে তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়বে।[৪১]

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আযান শোনার পর জামা'আতে নামায আদায় করতে উপস্থিত হয় না এবং তার না আসার কোন ওযরও নেই, এমতাবস্থায় তার সে নামায কবূল হবে না, যা সে একাকী পড়ে। জনৈক সাহাবী জানতে চাইলেন, ওযর বলতে কি বোঝায় ? উত্তরে নবী কারীম (সা) বলেন, ভয় অথবা অসুস্থতা।[৪২]

জামা'আত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

১. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য জামা'আত ওয়াজিব নয়।
২. পুরুষ হওয়া। মহিলাদের জামা'আতের নামায আদায় ওয়াজিব নয়।
৩. জ্ঞানবান হওয়া। অজ্ঞান, পাগল বা নেশাগ্রস্থদের জন্য জামা'আত ওয়াজিব নয়।
৪. যে সব ওযরের কারণে জামা'আত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে, সে সব ওযর না থাকা।[৪৩]

জামা'আতের আহ্কাম

১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতবদ্ধভাবে নামায আদায় করা সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্, ওয়াজিবের কাছাকাছি। মসজিদেই জামা'আতে নামায আদায় করতে হয়। প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে, ঘরে, আফিসে, মাঠে; ভ্রমণে জামা'আত আদায় করতে হয়।
২. জুমু'আ ও দুই ঈদের নামাযের জন্য জামা'আত শর্ত।
৩. রমযানের তারাবীহ্র নামাযও জামা'আতে আদায় করা সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্।
৪. কুসূফের নামাযও জামা'আতে আদায় করা সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ।
৫. রমযানের বিত্রের নামায জামা'আতে আদায় করা মুস্তাহাব।
৬. জামা'আতে কাতার সোজা করা সুন্নাত। নবী কারীম (সা) জামা'আতের কাতার সোজা করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন : তোমরা নামাযে কাতার সোজা ও বরাবর রাখ। এরূপ করা নামাযের অংশ।[৪৪]
৭. নামাযীর সামনে সুত্রা দেওয়া।
ক. নামাযীর সামনে দিয়ে লোকজন যাতায়াতের আশংকা থাকলে সামনে একহাত উঁচু ও অন্তত এক আংগুল পরিমাণ মোটা কিছু দাঁড় করে রাখা মুস্তাহাব। একে 'সুত্রা' বলা হয়।

খ. নামাযীর সামনে সুত্‌রার বাইরের দিক দিয়ে যাতায়াত করা যাবে, অবশ্য নামাযী এবং সুত্‌রার মধ্যখান দিয়ে যাতায়াত করা যাবে না।

গ. ইমামের সুত্‌রাই মুক্তাদিদের সুত্‌রা বলে গণ্য হবে।[৪৫]

মুদ্‌রিক, লাহিক ও মাসবূক-এর মাসাইল

জামা'আতে সম্পৃক্ত হওয়ার নিরিখে মুক্তাদী তিন প্রকার। যথা : ১. মুদ্‌রিক, ২. লাহিক ও ৩. মাসবূক।

মুদ্‌রিক : যে মুক্তাদী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে পূর্ণ নামায পেয়েছে, তাকে মুদ্‌রিক বলে।

লাহিক : যে মুক্তাদীর ইমামের সাথে নামাযরত অবস্থায় উযূ ছুটে গেছে তাকে লাহিক বলে।

লাহিক কোনোরূপ কথা না বলে সরাসরি কাতার ভেদ করে উযূ করতে চলে যাবে। উযূ করে ফিরে এসে আবার ইমামের সাথে নামাযে যোগদান করবে। ইমামের সালাম ফিরানোর পর সে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটি যাওয়া নামাযটুকু যথরীতি আদায় করবে। তার উযূ করে ফিরে আসতে আসতে যদি ইমামের নামায শেষ হয়ে যায়, তবে সে একাকী অবশিষ্ট নামায পড়ে নিবে। কিন্তু এ সময় কথা বললে তাকে আবার পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

মাসবূক : যে মুক্তাদী ইমামের সাথে নামাযের কিছু অংশ পেয়েছে, তাকে মাসবূক বলে। ইমামের সালাম ফিরানোর পর সে তার ছুটে যাওয়া নামায যথারীতি কিরা'আতসহ আদায় করবে এবং এতে ভুল হলে সাহু সিজদাও করতে হবে। প্রথমে কিরা'আতওয়ালা রাকা'আত এবং পরে কিরা'আতবিহীন শুধু সূরা ফাতিহাওয়ালা রাকা'আত পড়বে। তারপর শেষ বৈঠকের তাশাহ্‌হুদ ও দুরূদ পাঠ করে সালাম ফিরাবে।[৪৬]

কুরআন তিলাওয়াত

ক. ফযীলত ও গুরুত্ব

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার এই মহাগ্রন্থ। মানব জাতির সর্বপ্রকার সমস্যার সঠিক সমাধান দিয়েছে আল-কুরআন। এটি মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর অধ্যয়ন, অনুধাবন ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের কল্যাণ। এই ঐশী বাণীর কার্যকারিতা শাশ্বত ও চিরন্তন। আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে লক্ষ্য করে ঘোষণা করেছেন :

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ـ

আমি আপনার নিকট উপদেশ (মহাগ্রন্থ আল-কুরআন) এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের সামনে তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ বাণীসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৪৪)

পবিত্র কুরআনে আরো ঘোষিত হয়েছে :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ‐

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন এবং তাদের পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব এবং হিকমাত শিক্ষা দেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৪)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ‐

আর অবশ্যই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, তারপর কেউ কি এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে ? (সূরা কামার, ৫৪ : ২২)

এই পবিত্র মহাগ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব হলো, বিশ্বে এমন কোন মৌলিক সমস্যা নেই যার সঠিক, বাস্তবসম্মত এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কিত মূলনীতি এতে বর্ণিত হয়নি। কুরআন সর্বযুগের সকল মানবের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আন্তঃদেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমুদয় বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা কুরআনে যেমন রয়েছে, অন্য কোন গ্রন্থে তা নেই। আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা :

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ‐

নিশ্চয়ই আমি এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মানব জাতির কল্যাণের জন্য সকল বিষয় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছি। (সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ৫৪)

অতীতের ঐশী গ্রন্থাবলীর সবগুলোই একই সাথে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একসাথে অবতীর্ণ হয়নি। প্রায় ২৩ বছর ধরে ঘটনা, পরিস্থিতি ও সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন স্থান, কাল ও পাত্রভেদে নাযিল হয়েছে। কুরআনে, কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে :

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ‐

তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না ? আর যদি তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসতো তবে এতে অনেক অসঙ্গতি পেত। (সূরা নিসা, ৪ : ৮২)

কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ ‐

হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শরীফ স্বয়ং শিখেছে এবং অন্যকেও শিখিয়েছে। (বুখারী)

যেহেতু কুরআনে কারীমে রয়েছে ইসলাম ধর্মের মূল নীতিমালা এবং এর প্রচার ও প্রসারের তাকীদ এসেছে বারবার, সেহেতু কুরআনের শিক্ষা লাভ ও শিক্ষাদান শ্রেষ্ঠতম ইবাদত হওয়াই

স্বাভাবিক। এর প্রকারভেদও ভিন্ন হতে পারে। উচ্চমানের শিক্ষা পদ্ধতি হলো, অর্থ ও ব্যাখ্যা অবগত হওয়া এবং স্বাভাবিক শিক্ষা পদ্ধতি হলো শব্দ ও তিলাওয়াত শিক্ষা করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِیْ وَمَسْئَلَتِیْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِیَ السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ ۔

হযরত আবূ সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন আমার যিক্র এবং আমার নিকট প্রার্থনা করা হতে বঞ্চিত, তাকে প্রার্থনাকারীদের চাইতেও বেশি সাওয়াব আমি দান করে থাকি। আর আল্লাহ্র কালামের মর্যাদা অন্য সব কালামের উপর এত বেশি, যে পরিমাণ স্বয়ং আল্লাহ্র মর্যাদা সমস্ত মাখলূকের উপর।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

اِنَّ الَّذِیْ لَيْسَ فِیْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ ۔

যে হৃদয়ে আল-কুরআনের কোন অংশ নেই, সেই হৃদয় একটি বিরান গৃহের ন্যায়।[৪৭]

রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ حَرْفًا فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ۔

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে, সে ব্যক্তি দশ নেকী পাবে। যেমন : আলিফ-লাম-মিম তিনটি অক্ষর, যে ব্যক্তি এই তিনটি হরফ তিলাওয়াত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ১০+১০+১০=৩০ নেকী প্রদান করবেন।[৪৮]

অপর এক হাদীসে আছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِیْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ ۔

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : ইল্মে কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ঐসব ফিরিশতার শ্রেণীভুক্ত, যাঁরা পুণ্যবান এবং আল্লাহ্র হুকুম লেখার কাজে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি কষ্ট স্বীকার করে ঠেকে ঠেকে কুরআন তিলাওয়াত করে, সেও দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।[৪৯]

বস্তুত কুরআন পঠন-পাঠনে বিশেষ মনোযোগী হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, কুরআনে কারীমের মাধ্যমেই মানব জাতি মানযিলে মাকসূদে পৌঁছার পথ সুগম করতে পারে। হাদীসে এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحَسَدَ الاَّ عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ ·

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : একমাত্র দু'ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যেতে পারে। এক. যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং সে দিনরাত তিলাওয়াতে মশগুল থাকে। দুই. ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সম্পদের অধিকারী করেছেন এবং সে দিবারাত্র তা থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে।[৫০]

যে কুরআনের এত মর্যাদা তা বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতকারী সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ ·

অনেক কুরআন তিলাওয়াতকারী রয়েছে এমনও, যারা কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে, আর কুরআন তাদেরকে লা'নত করে।

অপর এক হাদীসে রয়েছে :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ ·

হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরআনের কারণে অনেক লোককে উচ্চমর্যাদা দান করেন। আবার অনেককে অপদস্থও করেন।[৫১]

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلاَّ الْفٰسِقِيْنَ ·

আল্লাহ্ তা'আলা অনেককেই এই গ্রন্থদ্বারা পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককেই এর বদৌলতে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি ফাসিকগণ ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না। (সূরা বাকারা, ২ : ২৬)

অপর এক আয়াতে আছে :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ خَسَارًا ·

আর আমি কুরআনের মধ্যে এমন সব বস্তু নাযিল করেছি যা বিশ্ববাসীর জন্য রোগমুক্তি ও রহমতস্বরূপ, পক্ষান্তরে অত্যাচারীদের জন্য এটা একমাত্র ক্ষতিই বৃদ্ধি করে থাকে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৮২)

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اقْرَءْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَاُهَا ·

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক এবং মর্যাদার আসনে উন্নীত হতে থাক। আর তাজবীদের সাথে থেমে থেমে পড়, যেমনি দুনিয়াতে থেমে থেমে পড়তে। নিশ্চয়ই তোমার মর্যাদার আসন হবে তোমার তিলাওয়াতকৃত আয়াতের শেষপ্রান্তে।[৫২]

খ. দশটি সূরা

১. সূরা ফীল, ১০৫ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ·

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ (١) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ (٢) وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ (٥)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। ১. আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর সাথে কী করেছিলেন ? ২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? ৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, ৪. যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করে, ৫. তারপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।

২. সূরা কুরাইশ, ১০৬ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ·

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ (١) اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ (٥) وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (٤)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। ১. যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, ২. আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের, ৩. অতএব তারা ইবাদত করুক এই ঘরের মালিকের, ৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন, ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

৩. সূরা মাউন, ১০৭ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ·

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ (١) فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (٣) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ (٤) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (٥) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ (٦) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ (٧)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। ১. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে, ২. সে তো সেই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, ৩. এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করে না, ৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, ৫. যারা সালাত সম্পর্কে উদাসীন, ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, ৭. আর গৃহস্থলীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

৪. সূরা কাউসার, ১০৮ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (٣)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। ১. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি, ২. সুতরাং আপনার প্রতিপালকের সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন, ৩. নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।

৫. সূরা কাফিরূন, ১০৯ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (١) لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ (٣) وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ (٤) وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (٦)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। ১. বলুন, হে কাফিররা! ২. আমি তার ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর, ৩. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি, ৪. আর আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ, ৫. আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি, ৬. তোমাদের দীন তোমাদের এবং আমার দীন আমার।

৬, সূরা নাসর, ১১০ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا (٣)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। ১. যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়, ২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, ৩. তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তিনি তো তাওবা কবূলকারী।

৭. সূরা লাহাব, ১১১ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ (١) مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (٥)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। ১. ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয়, এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও, ২. তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি, ৩. সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে, ৪. এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে, ৫. তার গলদেশে পাকান রজ্জু।

৮. সূরা ইখ্‌লাস, ১১২ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ·

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (١) اَللّٰهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (٤)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। ১. বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়, ২. আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, ৩. তিনি কাকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি, ৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

৯. সূরা ফালাক, ১১৩ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ·

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ (٥)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। ১. বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার স্রষ্টার, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে, ৩. অনিষ্ট হতে রাত্রের অন্ধকারের যখন তা গভীর হয়, ৪. আর অনিষ্ট হতে ঐসব নারীর যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় (যাদু করার উদ্দেশ্যে), ৫. আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।

১০. সূরা নাস, ১১৪ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ·

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) اِلٰهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। ১. বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, মানুষের প্রতিপালকের, ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের মা'বূদের, ৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, ৬. জিনের মধ্যে হতে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

কিরা'আত সম্পর্কীয় মাসাইল

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত অনন্য নিয়ামত। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত অপরিহার্য। সুতরাং বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা অত্যাবশ্যক। কিরা'আত

সম্পর্কীয় মাসাইল অবগত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব। কিরা'আত সম্পর্কীয় মাসাইল নিম্নরূপ :

১. আরবী অক্ষরগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হবে। বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণের পার্থক্য নিরূপণ করে যেটি যেভাবে উচ্চারণ করতে হয়, ঠিক সেভাবেই উচ্চারণ করতে হবে। যথার্থ এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য সবসময় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ভুল পড়লে গুনাহ্গার হবে।

২. ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর কুরআনের যে কোন সূরা অথবা বড় এক আয়াত বা ছোট ৩টি আয়াত পড়া ওয়াজিব। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। বিত্র, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকা'আতেই সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়তে হয়।

৩. নামাযে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা আয়াত মিলানো ওয়াজিব। কেউ নামাযে প্রথমে সূরা বা আয়াত পড়ে পরে সূরা ফাতিহা পড়লে ওয়াজিব আদায় হবে না।

৪. ফজর, মাগরিব, এশা, জুমু'আ ও দুই ঈদের নামাযে কিরা'আত উচ্চস্বরে পড়তে হয়। ইমাম ভুলে আওয়াজ না করে কিরা'আত পড়লে 'সিজদা সাহু' করতে হবে। ইচ্ছাকৃত নীরবে পড়লে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

৫. যুহর ও আসর নামাযে ইমামকেই নীরবে কিরা'আত পড়তে হয়। একাকী বিত্র নামায আদায়কারীর জন্য নীরবে কিরা'আত পড়া ওয়াজিব।

৬. ফজর, মাগরিব ও এশার নামায কোন কারণবশত একাকী আদায় করলেও উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়া উত্তম।

৭. ইমাম ফজর, মাগরিব ও এশার কাযা নামায আদায় করলেও উচ্চস্বরে কিরা'আত ওয়াজিব।

৮. একই সূরা প্রথম ও দ্বিতীয় রাকা'আতে না পড়াই উত্তম।

৯. সির্‌রী বা আস্তে আস্তে কিরা'আতের নামাযেও মুখে উচ্চারণ করে কিরা'আত পড়তে হয়। মুখ বন্ধ করে মনে মনে পড়া যাবে না।

১০. কিরা'আত শেষ হওয়ার পূর্বে রুকূ'-এর ঝুঁকে পড়া অবস্থায় কিরা'আত পড়া মাকরূহ্।

১১. ফরয নামাযে ইচ্ছাকৃত কুরআনের ক্রমধারার বিপরীত কিরা'আত পড়া মাকরূহ্। ভুলে পড়লে মাকরূহ্ হবে না।

১২. ফরয নামাযে একই সূরার অনেক আয়াত একত্রে পড়া এবং দু'আয়াতের কম ছেড়ে দ্বিতীয় রাক'আতে সামনে থেকে পড়া মাকরূহ্। কেউ যদি দুই সূরা এভাবে পড়ে, মাঝখানে ৩ আয়াত সম্বলিত সূরা ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী সূরা পড়া মাকরূহ্। যেমন : প্রথম রাকা'আতে اَرَاَيْتَ الَّذِىْ (সূরা মাঊন) এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (সূরা কাফিরূন) পড়ে মাঝে اِنَّا اَعْطَيْنَا (সূরা কাউসার) ছেড়ে দেয় তাহলে মাকরূহ্ হবে। এ হুকুম ফরয নামাযের জন্য। নফলের জন্য নয়।

১৩. ফরয নামাযের এক রাকা'আতে মাঝখানে এক বা একাধিক আয়াত ছেড়ে দুই সূরা পড়া মাকরূহ্। নফল নামাযের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়।

১৪. কেউ নতুন মুসলমান হয়ে সবেমাত্র নামায আরম্ভ করেছে, কিন্তু কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত মুখস্থ নেই, এমতাবস্থায় অনতিবিলম্বে সূরা বা আয়াত মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নামাযে سُبْحَانَ اللّٰه (সুবহানাল্লাহ্) অথবা اَلْحَمْدُ لِلّٰه (আলহামদু লিল্লাহ্) ইত্যাদি পড়তে হবে। কুরআনের সূরা বা আয়াত মুখস্থ করার ব্যাপারে অলসতা বা অবহেলা করলে গুনাহ্গার হতে হবে।[৫৩]

ইমাম-এর পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম

ইমামের পিছনে নামাযে মুক্তাদীর কিরা'আত পড়া বৈধ নয়। উচ্চস্বরে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কিরা'আত পড়া মাকরূহে তাহরীমী। এরূপ করতে নবী কারীম (সা) নিষেধ করেছেন।

নবী কারীম (সা) একবার ফজর নামাযের পর সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার পেছনে তোমাদের কেউ কি কিরা'আত পড়েছিল ? এক সাহাবী জানান, জ্বী হ্যাঁ, আমি পড়েছিলাম। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : আমি জানতে চাই, তোমরা আমার সাথে কুরআন পড়তে ঝগড়া কর কেন ?[৫৪]

ইমামের পিছনে নিঃশব্দে কিরা'আত পড়া মাকরূহ না হলেও অত্যাবশ্যক নয়। কেননা, ইমামের কিরা'আতেই প্রত্যেক মুক্তাদীর কিরা'আত হিসেবে পরিগণিত।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ـ

ইমামের পেছনে নামায আদায় করলে ইমামের কিরা'আত মুক্তাদীর কিরা'আত হিসেবে পরিগণিত হবে।[৫৫]

নামাযের মাসনূন কিরা'আত

নবী কারীম (সা) নামাযে সাধারণত কী ভাবে এবং কোন্ কোন্ সূরা পড়তেন তা নিম্নে কথা হলো :

১. সফর অবস্থায় সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা মিলিয়ে নিলেই চলবে। তবে, সফর ব্যতীত ইমাম বা একাকী নামাযীর বিশেষ পরিমাণে সূরা পড়া সুন্নাত। যেমন :

ফজর ও যোহর নামাযে সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে পড়া সুন্নাত। আসর ও এশার নামাযে সূরা তারিক থেকে সূরা বায়্যিনা পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে পড়া সুন্নাত। মাগরিবের নামাযে সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে পড়া সুন্নাত।

২. নিজের পক্ষ থেকে কোন সূরা নির্দিষ্ট করে নেয়া শরী'আত পরিপন্থী। অধিকাংশ সময় নবী কারীম (সা) নামাযে যে সব সূরা পড়তেন, নামাযে সে সব সূরা পড়া সুন্নাত। যেমন : নবী কারীম (সা) ফজরের সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকা'আতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখ্‌লাস পড়তেন।

নবী কারীম (সা) বিত্র নামাযের প্রথম রাকা'আতে সূরা দুহা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাস পড়তেন।

নবী কারীম (সা) জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে প্রায়ই সূরা আস্-সাজদা এবং সূরা দাহর পড়তেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সা) জুমু'আর দিন ফজর নামাযে الم تَنْزِيْلُ পড়তেন।

৩. নবী কারীম (সা) জুমু'আর নামাযে প্রায়ই সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া অথবা সূরা জুমু'আ এবং মুনাফিকূন পড়তেন।

৪. নবী কারীম (সা) ফরয নামাযের প্রথম রাকা'আতে দ্বিতীয় রাকা'আত অপেক্ষা লম্বা কিরা'আত পড়তেন।

৫. ফজর নামাযে অন্যান্য নামায অপেক্ষা লম্বা কিরা'আত পড়তে হয়। নবী কারীম (সা) ফজরে লম্বা কিরা'আত পড়তেন।[৫৬]

জুমু'আর নামাযের বিবরণ

جُـمُـعَـةٌ শব্দটি আরবী। এর অর্থ একত্রিত হওয়া, সম্মিলিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া। যেহেতু, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক মু'মিন-মুসলমান একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে একত্রিত হয়ে জামা'আতের সাথে সেদিনের যুহরের নামাযের পরিবর্তে জুমু'আর নামায ফরযরূপে সম্পাদন করে, সে জন্য ঐ নামাযকে 'জুমু'আর নামায' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় জুমু'আর নামাযকেও ফরয বলে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ـ

হে মু'মিনগণ ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য তোমাদের আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। (সূরা জুমু'আ, ৬৮ : ৯)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় জুমু'আর নামায প্রতিষ্ঠা করাও ফরযে আইন বা সমষ্টিগত অপরিহার্য কর্তব্য। এর অপরিহার্যতা অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে।

জুমু'আর নামায প্রথমে চার রাকা'আত কাব্লাল জুমু'আ (قَبْلَ الْجُمُعَةِ) তারপর ফরয (فَرْضُ) দুই রাকা'আত। তারপর বা'দাল জুমু'আ (بَعْدَ الْجُمُعَةِ) চার রাকা'আত এবং সর্বশেষ ওয়াক্তিয়া সুন্নাত (وَقْتُ السُّنَّةِ) দুই রাকা'আত।

আখিরি যুহরের অতিরিক্ত ৪ রাকা'আত সুন্নাত নামায সম্পর্কে বিধান হচ্ছে, স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র না হলে অথবা জনবিরল গ্রামাঞ্চল যেখানে জুমু'আর নামায জায়িয কিনা সন্দেহ রয়েছে, সেখানে বা'দাল জুমু'আর (بَعْدَ الْجُمُعَةِ) পর এই ৪ রাকা'আত নামায আদায় করতে হয়। তবে, আমাদের দেশে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এমন সম্ভাবনা নেই। কেননা, আমাদের দেশের প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলগুলোও জনবহুল। অতএব, যে সম্ভাবনার উপর আখিরি যুহরের বিধান, সেটা আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়।

জুমু'আর নামায ফরয হওয়ার শর্তাবলী

১. মুসলমান, প্রাপ্তবয়স্ক, হুঁশ ও বোধসম্পন্ন হওয়া।

২. সুস্থ হওয়া। কারণ অসুস্থ, অন্ধ, লেংড়া (যিনি চলতে পারেন না) এবং অচল বয়োবৃদ্ধদের উপর জুমু'আর নামায আদায় করা ফরয নয়। তারা যুহরের নামায আদায় করলেই চলবে।

৩. মুকীম হওয়া। মুসাফিরের জন্য জুমু'আর নামায ফরয নয়।

৪. পুরুষ হওয়া। কারণ, মহিলাদের উপর জুমু'আ আদায় করা ফরয নয়। তবে, আদায় করলে যুহর আদায় হয়ে যাবে।

৫. আযাদ হওয়া। গোলামের উপর জুমু'আ ফরয নয়।

৬. সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হওয়া। অর্থাৎ এমন ধরনের কোন বাধা-বিপত্তি না থাকা, যে জন্য নামায জামা'আতে আদায় না করা জায়িয। যেমন : শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশংকা, মুমূর্ষু রোগীর সেবায় নিয়োজিত থাকা এবং মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।[৫৭]

জুমু'আর নামায সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ

জুমু'আর নামায সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া।

২. শহর বা বড় গ্রাম হওয়া।

৩. মুসলিম শাসক বা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা।

৪. যুহরের ওয়াক্ত হওয়া। যুহরের ওয়াক্তের আগে বা পরে জুমু'আর নামায আদায় সহীহ্ হবে না। উল্লেখ্য যে, জুমু'আর কোন কাযা নেই। কোন কারণবশত কেউ জুমু'আ না পেলে, তাকে যুহরের নামায আদায় করতে হবে।

৫. খুত্‌বা। অর্থাৎ নামাযের পূর্বে মুসল্লীদের সামনে দাঁড়িয়ে আরবীতে খুত্‌বা দেওয়া, যদি খুত্‌বা ছাড়া নামায আদায় করা হয় অথবা নামাযের পর খুত্‌বা দেওয়া হয় তবে জুমু'আ আদায় হবে না। জুমু'আর ফরয নামায আরম্ভ করার পূর্বে মুয়াযযিনের আযানের পর ইমাম দু'টি খুত্‌বা দিবেন।

৬. জামা'আত হওয়া। অর্থাৎ ইমাম ছাড়া অন্ততঃপক্ষে তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ খুত্‌বার শুরু থেকে নিয়ে জামা'আত শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকা।[৫৮]

জুমু'আর ফরয দু'রাকা'আতের নিয়্যাত :

نَوَيْتُ اَنْ أُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِى فَرْضُ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَى صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

আমি কিব্‌লামুখী দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমার উপর যুহর নামাযের ফরয রহিত করে দেওয়ার জন্যে জুমু'আর দু'রাকা'আত ফরয নামায আদায় করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

জুমু'আর নামাযের ফযীলত

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ বসবাস করতে পারে না। আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে মানুষের প্রতিটি কাজই ইবাদত হলেও ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্দিষ্ট এমন কিছু

কাজ রয়েছে যা পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য। এগুলোর মধ্যে একটি হল জুমু'আর নামায। মুসলমানদের সামাজিক ইবাদতের মধ্যে জুমু'আর নামায অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন শুক্রবারে এ নামায জামা'আতে আদায় করতে হয়।

এ দিনটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে :

يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيْدُ الْأُسْبُوْعِ لِلْمُسْلِمِيْنَ .

জুমু'আর দিন হলো মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক ঈদের দিন।

এই দিন সমাজের সর্বস্তরের লোক একত্রিত হয়ে একই কাতারে শামিল হয়ে এক ইমামের পেছনে সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায আদায় করে থাকে। সবার মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠার সেতুবন্ধন হলো জুমু'আর নামায।

জুমু'আর দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, মহান আল্লাহ্ এদিন অগণিত নিয়ামত মানব জাতিকে দান করেন। আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে এ দিন সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই বিশেষ মর্যাদাশীল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিনেই জুমু'আর নামায আদায় করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাপ্তাহিক এই নামায সামাজিক সুসম্পর্ক ও শৃঙ্খলার সোপান। ধনী-দরিদ্র, আমীর-ফকীর একই কাতারবদ্ধ হলে মনে হয় সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই একটি শান্তিময় গ্রহ। বাস্তবিকপক্ষেই দিবসটি বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যময় বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানকল্পে আযান ধ্বনিত হবার সাথে সাথে কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এক কথায় দুনিয়াদারির কাজ-কর্ম হতে বিরত থেকে নামায সমাপনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই নামায আদায়ের লক্ষ্যে এ দিন গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, যথাযোগ্য ভাল পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করা এবং খুত্বা মানোযোগসহ শোনা একান্ত কর্তব্য। জুমু'আর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

১. যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে মসজিদে যাবে, যথারীতি সুন্নাত এবং নফল নামায আদায় করবে, মনোযোগের সাথে খুত্বা শুনবে এবং ইমামের সাথে জুমু'আর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সে জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ এবং এরপর পরবর্তী আরও তিনদিনের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।

২. যারা জুমু'আর নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে হেঁটে মসজিদে যায়, তাদের প্রত্যেক কদমের জন্য এক বছরকালের নফল রোযা রাখার সওয়াব প্রদান করা হবে।

৩. যে ব্যক্তি বিনা কারণে জুমু'আর নামায আদায় করে না, সে মুনাফিকের পর্যায়ভুক্ত।

৪. যে ব্যক্তি অলসতাবশত পরপর তিন জুমু'আ পরিহার করে, আল্লাহ্ তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

৫. যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে মারা যাবে, তার কবর আযাব ক্ষমা করে দেওয়া হবে, আর সে একজন শহীদের মর্যাদা পাবে।

৬. জুমু'আর নামায সহায়-সম্বলহীনদের জন্য হজ্জের সমতুল্য।

৭. জুমু'আর দিন ও রাত্রি নূরে পরিপূর্ণ।

৮. জুমু'আর দিন কে কখন মসজিদে আসেন, ফিরিশতা তা লিখে থাকেন। সবার আগে যিনি মসজিদে আসেন তিনি একটি উট সাদাকা দেওয়ার সাওয়াব পান। এভাবে তারপর যিনি আসবেন তিনি গরু সাদাকা করার, ক্রমান্বয়ে পরবর্তীতে আগমনকারীরা ছাগল, মুরগী এবং এমনকি ডিম সাদাকা দেওয়ার সাওয়াব পান। এরপর ইমাম যখন খুত্‌বা পড়েন, তখন ফিরিশতারা সাওয়াব লেখা বন্ধ করে খুত্‌বা শুনতে থাকেন।

৯. শুক্রবার সপ্তাহের সবদিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম দিন। কারণ, মুসলমানদের জন্য এই দিনে জুমু'আর নামাযে অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এছাড়া, জুমু'আর ফযীলত সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।[৫৯]

অতএব, আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, আযানের পর সাংসারিক কাজ ফেলে রেখে কালিমামুক্ত চিত্তে জুমু'আর নামাযে শামিল হওয়া। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সত্যিকার কল্যাণ ও অনাবিল শান্তি। জুমু'আর নামাযের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার দৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব।

ঈদের নামায

ঈদ (عِيْدٌ) শব্দটি 'আওদ' (عَوْدٌ) থেকে উদ্ভূত। ঈদ-এর অর্থ আনন্দ, খুশি, আমোদ, আহ্লাদ, উৎসব ইত্যাদি। عَوْدٌ অর্থ ফিরে আসা, পুনঃ পুনঃ আসা। মুসলমানদের জাতীয় জীবনে ঈদ বারবার আসে। ঈদের দিন অত্যন্ত পুণ্যময়, এদিন ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে। এই বিশেষ দিন মুসলমানদের জীবনে বছরে দু'বার ফিরে আসে, তাই শব্দটি عَوْدٌ হতে উদ্ভূত। বছরের এই দু'টি বিশেষ উৎসবকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় বলা হয় 'ঈদ'। এর একটি 'ঈদুল ফিত্‌র', অন্যটি 'ঈদুল আযহা'। ঈদের দিন বিশ্ব-মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে গিয়ে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, আমীর-ফকীর একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ ইবাদত করে থাকে। উম্মাতে মুহাম্মদী (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কিছু বরকতময় অনুষ্ঠান প্রদান করেছেন, যা অন্য কোন নবী-রাসূলের কাওম লাভ করেনি। তন্মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের অনুষ্ঠান ঈদ।

ঈদের নামাযের ফযীলত

ঈদ বিশ্ব-মুসলিম-এর একটি বার্ষিক সম্মিলন ও উৎসবের দিন। ঈদের দিন নামায আদায়ের লক্ষ্যে ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে সকল ভেদাভেদ ও হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সম্মিলিতভাবে ঈদের নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। ঈদের পরশে ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম-ভালবাসার স্বর্গীয় বন্ধনে পরস্পরকে বেঁধে নেয়া উচিত। ঈদের দিন মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক পরম আনন্দ ও উৎসবের দিন। পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনা আর কঠোর সংযম ও কৃচ্ছতা সাধন শেষে রোযাদারদের অবস্থা উদ্ভাসিত হয় নিম্নের হাদীসে :

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ·

রোযাদারদের জন্য দু'টি আনন্দ, ১. রোযা ভঙ্গের সময়, অর্থাৎ ইফতারের সময় এবং, ২. তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।[৬০]

পূর্ণ একমাস আল্লাহ্র হুকুমে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা রাখার পর ঈদের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মাঠে গেলে একে অপরের হাতে হাত, বুকে বুক রাখলে মুসলমান ভুলে যায় সারা মাসের উপবাসের কষ্ট। ঈদের নামায হলো সামাজিক নামায। বছরান্তে দু'দিন সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা ঈদের জামা'আতে সানন্দে উপস্থিত হয়। একে অন্যের সাথে সাক্ষাত ও কুশল বিনিময়ের একটা অপূর্ব সুযোগ। তখন ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, আমীর-ফকীর, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের কোন ভেদাভেদ থাকে না। মহান আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের পর একে অন্যের সাথে বুক মিলিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের যে অনন্য সুযোগ লাভ করা যায়, তার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ঈদের নামায। ইদুল ফিত্রের সময় সমাজের গরীব-দুঃখীকে সাদাকা-ফিত্র এবং কুরবানীর মাধ্যমে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তা-ই দুনিয়াকে বেহেশ্তের বাগানে পরিণত করে।

পবিত্র ঈদের দিনের অনেক ফযীলত রয়েছে। যারা দুই ঈদের নামায যথারীতি আদায় করে তাদের দু'আ কবুল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অফুরন্ত পুরস্কার প্রদানে ধন্য করেন। হাদীস শরীফে যে ক'টি রাতে আল্লাহ্র পক্ষ হতে দু'আ কবূল হবার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে দুই ঈদের রাত অন্যতম।

ঈদ উৎসবের সন্ধিক্ষণে কে কতো দামী এবং সুন্দর পোশাক পরলো বা কে কত উন্নতমানের পানাহার করলো সেটা কখনো বিচার্য নয়, বরং বিচার্য বিষয় হচ্ছে নিজ আত্মাকে কে কতটুকু নিষ্পাপ রাখতে পেরেছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর নৈকট্য লাভে কে কতটা ধন্য হয়েছে তাই।

ঈদের দিনের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন : 'যে ব্যক্তি পুণ্য লাভের অদম্য স্পৃহায় দুই ঈদের রাতে জেগে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, সেদিন তার অন্তর এতটুকু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে না, যেদিন অন্য সবার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত মৃতবৎ হয়ে পড়বে।'

হাদীসে আছে, 'যারা ঈদের নামায আদায় করার জন্য ঈদের ময়দানে একত্রিত হয় তাদের সম্পর্কে দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর ফিরিশ্তাদের জিজ্ঞেস করেন, যারা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব পালন করে আজ এখানে সমবেত হয়েছে তাদের কী প্রতিদান দেয়া উচিত ? ফিরিশ্তারা জবাবে বলেন, তাঁদের পুণ্যময় কাজের সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক দেয়া দরকার। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইয্যতের শপথ করে বলেন, অবশ্যই তিনি তাদের প্রার্থনা কবূল করবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ঈদের নামায সমাপনকারী তাঁর নেক বান্দাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন—আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। আর তোমাদের কৃত অতীত পাপকে নেকীতে পরিণত করে দিয়েছি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : নামায সমাপনকারীরা নিষ্পাপ অবস্থায় ঈদের মাঠ থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ।

ঈদের নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈদ আসে বিশ্ব-মুসলিমের বাৎসরিক আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণের সওগাত নিয়ে, সেই ঈদকে যথার্থ মর্যাদায় উদ্যাপন করা এবং ঈদের নামায যথাযথভাবে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য

কর্তব্য। বছরে দু'দিন যে সম্মিলনের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ্ করে দিয়েছেন, এর মাধ্যমেই মানুষ পারে কুরআন নির্দেশিত সমাজ নির্মাণ করতে, পারে কুরআনী শাসন কায়েমের পদক্ষেপ নিতে, সমাজের কলুষতা বিদূরিত করতে। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পরস্পর প্রীতির ডোরে আবদ্ধ হয়ে ঈদের আনন্দের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা)-এর অবশ্য কর্তব্য।

ঈদুল ফিত্‌র

'ঈদুল ফিত্‌র (عِيْدُ الْفِطْر) আরবী শব্দ। অর্থ হলো খুশি, আনন্দ ও উপবাস ভঙ্গকরণ। সুদীর্ঘ একটি মাস আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে রোযা রাখার পর বিশ্ব-মুসলিম এই দিনটিতে রোযা ভঙ্গ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দোৎসব করে বলে এর নামকরণ হয়েছে 'ঈদুল ফিত্‌র'।

রমযান মাসের শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখে যে মাসের প্রথম দিন মুসলিম মিল্লাত 'ঈদুল ফিত্‌র' উপলক্ষে ঈদগাহে অথবা মসজিদে সমবেত হয়ে মহানন্দে ও উল্লাসে ধনী-দরিদ্র, আমীর-ফকীর, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত মিলিতভাবে যে দু'রাকা'আত নামায আদায় করে তা-ই ঈদুল ফিত্‌রের নামায। এই দু'রাকাত নামায আদায় করা ওয়াজিব।[৬০]

এই নামায আদায়ের সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত। কেউ বিশেষ কোন কারণে এ নামায আদায় করতে না পারলে এর কোন কাযা করতে হয় না। কারণ, ঈদের নামাযের কোন কাযা নেই।

ঈদুল ফিত্‌রের সুন্নাত কাজসমূহ

ঈদুল ফিত্‌রের দিনে সুন্নাত কাজগুলো নিম্নরূপ :

১. সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠা।

২. মিস্‌ওয়াক করা।

৩. নামাযের পূর্বে গোসল করা।

৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৫. চোখে সুরমা লাগানো।

৬. পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা।

৭. ফজর নামাযের পরে যথাশীঘ্র ঈদগাহে গমন করা।

৮. সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম খাবারের বন্দোবস্ত করা ও প্রতিবেশী ইয়াতীম-মিস্‌কীন, গরীব-দুঃখীকে পানাহার করানো।

৯. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন গ্রহণ করা।

১০. ঈদের মাঠে যাবার পূর্বে সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা।

১১. ঈদগাহে যে পথে যাবে, নামায শেষে অন্য পথে ফিরে আসা।

১২. যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।

১৩. ঈদের নামায মসজিদে আদায় না করে ঈদগাহে বা মাঠে আদায় করা।

১৪. ঈদগাহে যাবার পথে নিম্নের তাক্‌বীরে তাশরীকটি নিম্নস্বরে পড়তে পড়তে যাওয়া :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ٠

মহান আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্রই জন্য সকল প্রশংসা।[৬১]

ঈদুল ফিত্‌রের নামায আদায়ের বিবরণ

পবিত্র রমযানের দীর্ঘ একমাস সিয়াম-সাধনার পর শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে ঈদুল ফিত্‌রের দুই রাকা'আত নামায আদায় করতে হয়। এ দিন জামা'আতের সাথে দুই রাকা'আত নামায আদায় করা ওয়াজিব। ঈদগাহে, নির্দিষ্ট মাঠে কিংবা ওযরবশত মসজিদে মুসলমানদের সমবেতভাবে এ নামায পড়তে হয়। এ নামাযের জন্য আযান ও ইকামতের কোন বিধান নেই। মাঠে যিকর-আয্‌কার, তাক্‌বীর, দুরূদ শরীফ পড়ার পর নির্ধারিত সময়ে সবাইকে কাতারবদ্ধ করিয়ে ইমাম দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত নিয়্যাত করবেন :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنَا اِمَامٌ لِمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَحْضُرُ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٠

আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে কিব্‌লামুখী দাঁড়িয়ে ঈদুল ফিতরের দুই রাকা'আত ওয়াজিব নামায ছয় তাক্‌বীরের সাথে যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা উপস্থিত হবেন, তাদের সবার ইমাম হিসেবে আদায় করার নিয়্যাত করছি, আল্লাহু আক্‌বার। মুক্তাদীর নিয়্যাত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٠

কিব্‌লামুখী দাঁড়িয়ে এই ইমামের পিছনে ইক্তিদা করে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ঈদুল ফিত্‌রের দু'রাকা'আত ওয়াজিব নামায ছয় তাক্‌বীরের সাথে আদায় করার নিয়্যাত করছি,আল্লাহু আক্‌বার।

নিয়্যাত আরবী বা বাংলায় করা যায়।

এরপর তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত বেঁধে সানা অর্থাৎ নিম্নের দু'আ পড়তে হবে :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ٠

এরপর ইমাম উচ্চস্বরে পরপর তিনবার তাক্‌বীর বলবেন, প্রত্যেকবার অঙ্গুলি কর্ণমূল পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দিবেন। মুক্তাদীগণও ইমামের তাক্‌বীর অনুসরণ করবেন। প্রথম দুই তাক্‌বীরে হাত ছেড়ে দেবেন, কিন্তু তৃতীয় তাক্‌বীরের পর হাত নাভীর নিচে বাঁধবেন। এরপর উচ্চস্বরে ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য একটি সূরা বা সূরার অংশ তিলাওয়াত করবেন। তারপর অন্যান্য নামাযের ন্যায় রুকূ'-সিজদা সমাপনান্তে দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াবেন। দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং কিরা'আত মিলানোর পর রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিন

তাক্‌বীর আগের রাকা'আতের মতই আদায় করে রুকূ'-সিজদা করার পর অন্যান্য নামাযের মতই নামায সমাপন করবেন। মুক্তাদীগণ কিরা'আত না পড়ে শ্রবণ করবেন এবং অন্যান্য কাজেও ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করবেন।

নামায হতে সালাম ফিরিয়ে ইমাম সাহেব পরপর দু'টি খুত্‌বা দান করবেন। মুক্তাদীগণ মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবেন। এরপর অন্যান্য নামায সমাপনান্তে যেভাবে মুনাজাত করা হয়, দু'আ-দুরূদ পড়া হয়, তদ্রূপ বিশ্বের মুসলমানদের পাপরাশি মার্জনা এবং ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য বিশেষ মুনাজাত করবেন। এরপর পরস্পর থেকে বিদায় নিয়ে তাক্‌বীর ও দু'আ-দুরূদ পড়তে পড়তে ফিরবেন।

ঈদুল আযহা

ঈদুল আযহা (عِيْدُ الْأَضْحٰى) শব্দদ্বয় আরবী। বিশ্ব-মুসলিম পরম ত্যাগের নিদর্শনস্বরূপ যিলহাজ্জ মাসের ঐতিহাসিক দশ তারিখে মহাসমারোহে পশু যবেহের মাধ্যমে কুরবানীর যে আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকেন তা-ই ঈদুল আযহা। বস্তুত হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালন করতে প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করার মতো যে ঐতিহাসিক নযীর স্থাপন করে গেছেন, সে সুন্নাত পালনার্থে মুসলিম জাতি আজো কুরবানী করে থাকে। যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ বিশ্ব-মুসলিম ঈদগাহে জমায়েত হয়ে দুই রাকা'আত ঈদুল আযহার ওয়াজিব নামায আদায় করেন। ঈদুল ফিত্‌রের নামাযের নিয়মে ঈদুল আযহার নামায আদায় করতে হয়। কেবলমাত্র নিয়্যাতকাল عِيْدُ الْفِطْرِ (ঈদুল ফিত্‌র)-এর জায়গায় عِيْدُ الْأَضْحٰى (ঈদুল আযহা) পড়তে হয়।

ঈদুল ফিত্‌রের ক্ষেত্রে যে সব সুন্নাতের বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে, ঈদুল আযহার দিনও সেগুলো পালন করা কর্তব্য। তবে, আরো কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ :

১. উচ্চস্বরে তাক্‌বীরে তাশরীক পাঠ করা।

২. দুপুর পর্যন্ত অন্য কোন খাদ্য-খাবার গ্রহণ না করে কুরবানীর গোশ্‌ত আহার করা মুস্তাহাব।

৩. ঈদের নামায তাড়াতাড়ি পড়ে কুরবানী করা।

৪. সক্ষম ব্যক্তিরাই কুরবানী দেবেন।

৫. ঈদুল আযহার পূর্বে ৯ যিলহজ্জ হতে ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামায পড়ার পর উচ্চস্বরে তাক্‌বীরে তাশরীক পড়া।

৬. ঈদুল আযহার নামায ওযরবশত ১০ তারিখে পড়তে না পারলে ১১, ১২ কিংবা ১৩ তারিখে পড়া যায়।

৭. ঈদুল ফিত্‌রের খুত্‌বায় সাদাকায়ে ফিত্‌র সম্পর্কে এবং ঈদুল আযহার খুত্‌বায় কুরবানীর বিভিন্ন মাস'আলা সম্পর্কে ভাষণ দিতে হয়।[৬২]

কুরবানী (উযহিয়্যা)-এর অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কুরবানীকে আরবী ভাষায় 'উযহিয়্যা' বলা হয়। উযহিয়্যা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ঐ

পশু যা কুরবানীর দিন যবেহ্ করা হয়। শরী'আতের পরিভাষায়, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে পশু যবেহ্ করাকে কুরবানী বলা হয়।[৬৪]

কুরবানীর তাৎপর্য হলো, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা। বস্তুত মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম কুরবানী হযরত আদম (আ)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের কুরবানী। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদ ইরশাদ হয়েছে :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۔

আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনান, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবূল হলো এবং অন্যজনের কবূল হলো না। (সূরা মায়িদা, ৫ : ২৭)

এ কুরবানীর বিধান যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ সমস্ত শরী'আতেই বিদ্যমান ছিল। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۔

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর উপর তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৪)

মূলত প্রচলিত কুরবানী হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ। এ ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (١٠٢) فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ (١٠٣) وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (١٠٥) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰؤُا الْمُبِيْنُ (١٠٦) وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ (١٠٨) سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ (١٠٩) كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (١١٠)

১০২. তারপর সে (ইসমাঈল) যখন তাঁর পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইব্‌রাহীম (আ) বলল : হে বৎস ! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। ১০৩. যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্‌রাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল। ১০৪. তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, হে ইব্‌রাহীম (আ)! ১০৫. তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। ১০৬. নিশ্চয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। ১০৭. আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। ১০৮. আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ১০৯. ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ১১০. এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ : ১০২)

বস্তুত হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানী দেওয়ার এ অবিস্মরণীয় ঘটনাকে প্রাণবন্ত করে রাখার জন্যেই উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপরও তা ওয়াজিব করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۔

সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। (সূরা কাউসার, ১০৮ : ২)

কুরবানীর তাৎপর্য, গুরুত্ব ও ফযীলত

নেক আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব সময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ইব্‌ন মাজাহ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ۔

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।[৬৫]

অপর এক হাদীসে আছে :

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا فَمَالَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ ۔

হযরত যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ কুরবানী কী? তিনি বললেন : ইহা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আ)-এর সুন্নাত। তাঁরা (আবার) বললেন, এতে আমাদের কি কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন : এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বক্‌রীর পশমেও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন : বক্‌রীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকি আছে।[৬৬]

কুরবানীর এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন ঐ আবেগ-অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও ঐকান্তিকতা, যা নিয়ে কুরবানী করেছিলেন আল্লাহ্‌র খলীল হযরত ইব্‌রাহীম (আ)। কেবল গোশত ও রক্তের নাম কুরবানী নয়; বরং আল্লাহ্‌র রাহে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত শপথের নাম কুরবানী। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা কেবল পশুর গলায় ছুরি চালায় না, বরং সে তো ছুরি চালায় সকল প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহ্‌র প্রেমে পাগলপারা হয়ে। এটিই কুরবানীর মূল নিয়ামক। এ অনুভূতি ব্যতিরেকে কুরবানী করা হযরত ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর সুন্নাত নয়, এটা এক রুসম তথা প্রথা মাত্র। এতে গোশ্‌তের ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু ঐ তাক্‌ওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানীর প্রাণশক্তি। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۔

আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না এর গোশত ও রক্ত, পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৭)

যে কুরবানীর সাথে তাক্‌ওয়া এবং আবেগ ও অনুভূতি নেই, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সেই কুরবানীর কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্‌র নিকট ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য, যার প্রেরণা দেয় তাক্‌ওয়া। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۔

অবশ্যই আল্লাহ্‌র মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন। (সূরা মায়িদা, ৫ : ২৭)

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

যদি আকিল, বালিগ, মুকীম (মুসাফির নয় এমন) ব্যক্তি ১০ই যিলহাজ্জ ফজর হতে ১২ই যিলহাজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।[৬৭]

কুরবানী হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়; বরং যে অবস্থায় সাদাকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হয়, ঐ অবস্থায় কুরবানীও ওয়াজিব হবে।[৬৮]

মুসাফির ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।[৬৯]

কোন মহিলা নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব।[৭০]

কুরবানী ওয়াজিব নয় এমন ধরনের কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানী করলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং বহু সাওয়াবের অধিকারী হবে। এরূপ কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানীর নিয়্যাতে পশু খরীদ করলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়।[৭১]

নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব। সন্তানের পক্ষ থেকে পিতার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে পিতা যদি নিজের মাল হতে নাবালিগ ছেলের পক্ষ হতে কুরবানী করে তাহলে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে।[৭২]

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তির উপর শুধুমাত্র একটি কুরবানী ওয়াজিব। একাধিক কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। যদিও সে অধিক সম্পদের মালিক হোক না কেন।[৭৩] অবশ্য যদি কেউ একাধিক কুরবানী করে তবে এতে সে অনেক সাওয়াব লাভ করতে পারবে।

ঋণ করে কুরবানী করা ভাল নয়, যখন যে ব্যক্তির উপর কুরবানীই ওয়াজিব নয় তখন অন্যের থেকে ধার নিয়ে কুরবানী করার কোন প্রয়োজন নেই।[৭৪]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। তার জন্য কুরবানী না করাই উত্তম। এরপরও যদি সে কুরবানী করে তাহলে সাওয়াব পাবে।[৭৫]

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়িয। আর এতে সে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করাও বিশেষ সাওয়াবের কাজ।

কুরবানীর পশু ও এদের হুকুম

কুরবানীর পশু ছয় প্রকার : উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া ও মহিষ। এ সমস্ত পশু ব্যতীত অন্য পশু কুরবানী করা জায়িয নেই।[৭৬]

দুম্বা, ছাগল, ভেড়া পূর্ণ একবছর বয়সের হলে এদের দ্বারা কুরবানী দুরস্ত হবে। অবশ্য ছয় মাসের ভেড়া, দুম্বা মোটাতাজা হলে এবং দেখতে এক বছর বয়সের ন্যায় দেখা গেলে এদের কুরবানী জায়িয। গরু, মহিষ পূর্ণ দুই বছর বয়সী হতে হবে। দুই বছরের কম হলে কুরবানী জায়িয হবে না। উট পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে। এর কম হলে কুরবানী জায়িয হবে না।[৭৭]

গরু, মহিষ ও উট—এই তিন প্রকার পশুর এক-একটিতে সাত ব্যক্তি পর্যন্ত শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারবে। তবে কুরবানীর জন্য শর্ত হলো কারো অংশ যেন এক-সপ্তমাংশ হতে কম না হয় এবং প্রত্যেক শরীককেই কুরবানী অথবা তাকাররুব যেমন আকীকা ইত্যাদির নিয়্যাত করতে হবে। যদি শরীকদের একজনও গোশ্ত খাওয়ার নিয়্যাত করে তবে কারো নিয়্যাত দুরস্ত হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন শরীকের অংশ সপ্তমাংশ হতে কম হয় তবে সকলের কুরবানীই নষ্ট হয়ে যাবে।[৭৮]

গরু, মহিষ ও উট-এর মধ্যে সাতজনের কম অংশীদার হতে পারে। যেমন দুই, চার বা এর কম অংশ কেউ নিতে পারে। তবে এখানেও এই শর্ত জরুরী যে, কারো অংশ যেন এক-সপ্তামাংশের কম না হয়। নতুবা কারো কুরবানী সহীহ্ হবে না।[৭৯]

যদি গরু খরিদ করার পূর্বেই সাতজন ভাগী হয়ে সকলে মিলে খরিদ করে তবে এটা জায়িয। আর যদি কেউ একা কুরবানী করার জন্য একটা গরু খরিদ করে থাকে এবং মনে মনে ইচ্ছা রাখে যে, পরে আরও লোক শরীক করে তাদের সাথে মিলে একত্রে কুরবানী করবে, তবে তাও দুরস্ত আছে। কিন্তু যদি গরু ক্রয় করার সময় অন্যকে শরীক করবার ইচ্ছা না থাকে, একা একাই কুরবানী করার নিয়্যাত থাকে, তারপর যদি অন্যকে শরীক করতে চায় তবে এমতাবস্থায় যদি ঐ ক্রেতা এমন গরীব লোক হয় যে, তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তাহলে অন্য কাউকে শরীক করতে পারবে না। এককভাবেই গরুটি কুরবানী করতে হবে। আর যদি ঐ ক্রেতা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় যে, তার উপর কুরবানী ওয়াজিব, তাহলে সে অন্য কাউকে শরীক করতে পারবে। কিন্তু নেককাজে নিয়্যাত পরিবর্তন ঠিক নয়।[৮০]

কুরবানীর পশু যবেহ্ করার পূর্বে যদি কোন শরীক ব্যক্তি মরে যায় তবে তার বালিগ ওয়ারিসগণ যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করার অনুমতি প্রদান করে, তবে সকলের কুরবানী দুরস্ত হবে। আর যদি ওয়ারিসগণ নাবালিগ হয় অথবা বালিগ ওয়ারিসগণ যদি অনুমতি প্রদান না করে তবে মৃত ব্যক্তির প্রদত্ত অংশ কুরবানীর আগে পৃথক না করা পর্যন্ত কারো কুরবানী সহীহ্ হবে না।[৮১]

যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় ও তৎপরিবর্তে অন্য একটি পশু খরিদ করা হয় তারপর প্রথম খরিদকৃত পশুটিও পাওয়া যায়, এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে যে কোন একটি পশু কুরবানী করলে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। আর যদি লোকটি গরীব হয় তবে উভয়টি কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হবে।[৮২]

গর্ভবতী পশুও কুরবানী করা জায়িয। অবশ্য বাচ্চা পয়দা হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলে এ ধরনের গর্ভবতী পশু কুরবানী করা মাকরূহ, এ পশুর পরিবর্তে অন্য পশু কুরবানী করাও দুরস্ত আছে।[৮৩]

পশুটি গর্ভবতী কিনা জানা ছিল না এমতাবস্থায় যবেহ্ করার পর যদি তার পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া যায় তবে ঐ বাচ্চাও যবেহ্ করে দিবে এবং এর গোশ্ত খাওয়াও দুরস্ত আছে। অবশ্য তা যবেহ্ না করে সাদাকা করে দেওয়াও জায়িয। আর যদি পেটে মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তবে এর গোশ্ত খাওয়া জায়িয নয়।[৮৪]

যে পশুর দু'টি চোখ অন্ধ বা একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা এক-তৃতীয়াংশের বেশি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এ ধরনের পশু কুরবানী করা দুরস্ত নয়। অনুরূপভাবে যে পশুর একটি কান বা লেজের এক-তৃতীয়াংশের বেশি কেটে গিয়েছে এরূপ পশুও কুরবানী করা দুরস্ত নয়।[৮৫]

যে পশু এমন খোঁড়া যে, মাত্র তিন পায়ের উপর ভর করে চলে, চতুর্থ পা মাটিতে লাগেই না, কিংবা মাটিতে লাগে বটে, কিন্তু এর উপর ভর করে চলতে পারে না, এরূপ পশু কুরবানী করা দুরস্ত নয়। আর যদি খোঁড়া পায়ের উপর ভর করে চলতে পারে, তবে তা কুরবানী করা দুরস্ত আছে।[৮৬] যবেহ্ করার জন্য পশু মাটিতে শোয়ানোর সময় যদি তার পা ভেঙ্গে যায় তবে এ পশুও কুরবানী করা জায়িয আছে।[৮৭]

কোন পশু যদি এমন হয় যে, তার হাড়ের মজ্জাও শুকিয়ে গেছে, তবে এ ধরনের পশু কুরবানী করা দুরস্ত নয়। হাড়ের ভিতরের মজ্জা যদি না শুকায় তবে তা কুরবানী করা দুরস্ত আছে।[৮৮]

যে পশুর দাঁত উঠেনি তার কুরবানী দুরস্ত নয়। অবশ্য যদি অধিকাংশ দাঁত বাকি থাকে তবে এরূপ পশুর কুরবানী দুরস্ত আছে।[৮৯]

যে পশুর কান এক-তৃতীয়াংশের অধিক কাটা তা দ্বারা কুরবানী জায়িয নেই।[৯০]

যে পশুর শিং উঠেনি তা দিয়ে কুরবানী জায়িয আছে। অনুরূপভাবে শিং-এর অগ্রভাগ ভেঙ্গে গিয়ে থাকলে তা দিয়ে কুরবানী জায়িয। কিন্তু শিং মূল থেকে ভেঙ্গে গিয়ে থাকলে তা দ্বারা কুরবানী জায়িয নেই।[৯১]

যে জন্তুর গায়ে বা কাঁধে দাদ বা খুজলি হয়েছে তার কুরবানীও জায়িয। অবশ্য খুজলির কারণে গোশ্তের উপর প্রভাব পড়ায় যদি পশু একেবারে কৃশ হয়ে যায় তবে এরূপ পশুর কুরবানী জায়িয নেই।[৯২]

কুরবানী ওয়াজিব এমন সচ্ছল ব্যক্তি কুরবানীর জন্য কোন পশু খরিদ করার পর যদি তাতে এমন কোন দোষত্রুটি দেখা যায় যার কারণে তা কুরবানী করা দুরস্ত হয় না, তবে সে এর পরিবর্তে অন্য একটি পশু খরিদ করে কুরবানী করবে। অবশ্য যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় সে ঐ পশুটিই কুরবানী করবে। অন্য পশু খরিদ করার প্রয়োজন নেই।[৯৩]

যেসব পশু শুধু নাপাকী ভক্ষণ করে, সেগুলো নির্ধারিত দিন বেঁধে রাখার পূর্বে কুরবানী করা জায়েয নেই। উটকে ৪০ দিন, গরু-মহিষ ২০ দিন, ছাগল-ভেড়াকে ১০ দিন বেঁধে রাখা জরুরী যাতে নাপাকী ভক্ষণ করতে না পারে এবং গোশ্ত দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে যায়।[৯৪]

কুরবানীর দিন ও সময়

কুরবানীর সময়কাল হল যিলহাজ্জের ১০ তারিখ হতে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। এই তিন দিনের যে কোন দিন কুরবানী করা জায়িয। তবে প্রথম দিন কুরবানী করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন।[৯৫]

যিলহাজ্জের ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পর কুরবানী করা দুরস্ত নয়।[৯৬]

ঈদুল আযহার নামাযের পূর্বে কুরবানী করা দুরস্ত নয়। অবশ্য যে স্থানে ঈদের নামায বা জুমু'আর নামায দুরস্ত নয় সে স্থানে ১০ই যিলহাজ্জ ফজরের নামাযের পরও কুরবানী করা দুরস্ত আছে।[৯৭]

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কোন ব্যক্তি ১০ ও ১১ই যিলহাজ্জ যদি সফরে থাকে তারপর ১২ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে বাড়িতে আসে, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।[৯৮]

যদি কোন মুকীম ব্যক্তি গরীব হয় এবং ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে আল্লাহ্ তাকে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বানিয়ে দেন, তবে তার উপরও কুরবানী ওয়াজিব হবে।

যবেহ্ করার পদ্ধতি

নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ্ করা মুস্তাহাব। যদি নিজে যবেহ্ করতে না পারে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ্ করাবে। এমতাবস্থায় নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম।[৯৯]

যবেহ্ করার সময় কুরবানীর পশু কিব্‌লামুখী করে শোয়াবে। অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ (বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বর) বলে যবেহ্ করবে। ইচ্ছাকৃত বিস্‌মিল্লাহ্ পরিত্যাগ করলে যবেহ্‌কৃত পশু হারাম বলে গণ্য হবে। আর যদি ভুলক্রমে বিস্‌মিল্লাহ্ ছেড়ে দেয় তাহলে তা খাওয়া জায়িয আছে।[১০০]

কুরআনীর সময় মুখে নিয়্যাত করা জরুরী নয়। অবশ্য মনে মনে নিয়্যাত করবে যে, আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করছি। তবে মুখে দু'আ পড়া উত্তম।[১০১]

কুরবানীর পশু কিবলামুখী করে শোয়ানোর পর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে :

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ٠

তারপর بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলে যবেহ্ করবে।

এরপর যবেহ্ করে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ٠[১০২]

যদি নিজের কুরবানী হয় তবে مِنِّىْ বলবে। আর যদি অন্যের বা অন্যদের কুরবানী হয় তবে مِنْ শব্দের পরে দাতার বা দাতাগণের নাম উল্লেখ করবে।

যবেহ্ করার সময় চারটি রগ কাটা জরুরী : ১. কণ্ঠনালী, ২. খাদ্যনালী, ৩. ওয়াদজান অর্থাৎ দুই পাশের দু'টি মোটা রগ। এগুলোর যে কোন তিনটি যদি কাটা হয় তবুও কুরবানী শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি দু'টি কাটা হয়, তবে কুরবানী দুরস্ত হবে না।[১০৩]

যবেহ্ করার পূর্বে ছুরি ভালভাবে ধার দিয়ে নেওয়া মুস্তাহাব।[১০৪]

কুরবানীর পশুকে এমনভাবে যবেহ্ করা উচিত যাতে পশুর কোন প্রকার অপ্রয়োজনীয় কষ্ট না হয়। এমনিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে যবেহ্ করা উচিত।[১০৫]

যবেহ্কারী ব্যক্তির সাথে যদি কেউ ছুরি চালানোর জন্য সাহায্য করে, তাকেও 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা ওয়াজিব।[১০৬]

কুরবানী গোশ্তের বিধান

কুরবানীর গোশ্ত নিজে খাবে, নিজের পরিবারবর্গকে খাওয়াবে, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দিবে এবং গরীব ও মিস্কীনকে সাদাকা করবে। গোশ্ত বিতরণের মুস্তাহাব তরীকা হল, তিনভাগ করে একভাগ পরিবার-পরিজনের জন্য রাখবে এবং বাকী দুইভাগের একভাগ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে আর একভাগ গরীব-মিস্কীনকে বন্টন করে দিবে।[১০৭]

কয়েক ব্যক্তি একসাথে শরীক হয়ে যদি একটি গরু কুরবানী করে তবে পাল্লাদ্বারা মেপে সমানভাবে গোশ্ত বন্টন করে নিবে। অনুমান করে বন্টন করা জায়িয নেই। কেননা ভাগের মধ্যে কমবেশি হলে সুদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য যদি গোশ্তের সঙ্গে মাথা, পায়া এবং চামড়াও ভাগ করে দেওয়া হয় তবে যেভাগে মাথা, পায়া এবং চামড়া থাকবে সে ভাগে যদি গোশ্ত কম হয় তবে এ বন্টন দুরস্ত হবে। আর যে ভাগে গোশ্ত বেশি ঐ ভাগে মাথা, পায়া বা চামড়া দিলে বন্টন দুরস্ত হবে না; সুদ হবে এবং গুনাহ্গার হতে হবে।[১০৮]

কুরবানীর গোশ্ত অমুসলিমকে দেওয়াও জায়িয। কিন্তু মজুরী বাবদ দেওয়া জায়িয নেই। অবশ্য মুসলিমকে দেওয়াই উত্তম।[১০৯]

কুরবানীর গোশ্ত কুরবানীদাতার জন্য বিক্রি করা মাকরূহ তাহরীমী। যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে এর মূল্য সাদাকা করা ওয়াজিব।[১১০]

কসাইকে গোশ্ত বানানোর মজুরী স্বরূপ গোশ্ত, চামড়া, রশি প্রভৃতি দেওয়া জায়িয নেই। পারিশ্রমিক দিতে হলে তা ভিন্নভাবে আদায় করবে।

গরু, মহিষ বা উটের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি শরীক থাকলে তারা নিজেদের মধ্যে গোশ্ত ভাগ করে নেওয়ার পরিবর্তে যদি সমস্ত গোশ্ত একত্রে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে অথবা রান্না করে তাদের খাওয়ায় তবে এটাও জায়িয। কিন্তু শরীকদের কোন একজন ভিন্নমত প্রকাশ করলে জায়িয হবে না।[১১১]

কুরবানীর গোশ্ত তিনদিনের বেশি সময় জমা করে রাখাও জায়িয আছে।[১১২]

কুরবানীর পশুর রশিও সাদাকা করা মুস্তাহাব।[১১৩]

কুরবানীর চামড়ার বিধান

কুরবানীর চামড়ার দান করে দিবে এবং নিজেও ব্যবহার করতে পারবে। আর বিক্রি করলে

তার মূল্য গরীব ও মিসকীনদেরকে দান করতে হবে। বিক্রিত পয়সা নিজে খরচ করে যদি অন্য পয়সা দান করে তবে আদায় হবে—তবে মাকরূহ হবে।

কুরবানীর চামড়ার মূল্য মাদ্‌রাসা—মসজিদ মেরামত কাজে অথবা মাদ্‌রাসার মুহ্‌তামিম, মুতাওয়াল্লী, ইমাম-মুয়ায্‌যিন প্রমুখ ব্যক্তিকে বেতন হিসাবে প্রদান করা জায়িয নেই।[১১৫]

কুরবানীর পশুর গোশত কাটা ইত্যাদি কারণে যথোচিত মূল্যের কমে কসাইর নিকট চামড়া বিক্রয় করাও দুরস্ত নয়।[১১৬]

কুরবানীদাতার মাসনূন আমল

যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে তার জন্য মুস্তাহাব হলো যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর শরীরের কোন অংশের চুল না কাটা ও নখ না কাটা। আর যার কুরবানী করার সামর্থ্য নেই, তার জন্য উত্তম হলো কুরবানীর দিন কুরবানীর পরিবর্তে চুল ও নখ কাটা এবং নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা।[১১৭]

কুরবানীর পূর্বে কুরবানীর পশুর দ্বারা কোন কাজ নেওয়া, যেমন হাল চাষ করা, এর উপর আরোহণ করা, দুগ্ধ দোহন করে পান করা কিংবা কুরবানীর জন্তুর পশম কেটে বিক্রয় করা মাকরূহ।[১১৮]

মানতের কুরবানী

কোন ব্যক্তি যদি কুরবানীর মানত করে এবং যে উদ্দেশ্যে মানত করেছে তা যদি পূর্ণ হয় তবে সে গরীব হোক বা ধনী হোক, তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।[১১৯]

কুরবানীর জন্য পশুর যে সমস্ত গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে, মানত কুরবানীর পশুও ঐ সমস্ত গুণসম্পন্ন হতে হবে।

মানতের কুরবানীর পশুর সমস্ত গোশ্‌ত এবং চামড়া গরীব-মিস্‌কীনদেরকে সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব। এর গোশ্‌ত নিজে খেতে পারবে না এবং কোন ধনী ব্যক্তিকেও খাওয়াতে পারবে না। যদি নিজে খায় কিংবা কোন ধনী ব্যক্তিকে হাদিয়া দেয়, তাহলে ঐ পরিমাণ গোশ্‌ত বা মূল্য পুনরায় গরীব ও মিস্‌কীনদেরকে দান করতে হবে।[১২০]

কুরবানীদাতা যদি যাকাত-ফিত্‌রা খাওয়ার উপযোগী হয় তবে সে মানতের গোশ্‌ত খেতে পারে। কিন্তু না খাওয়াই উত্তম।

কুরবানী করার অসিয়্যাত

যদি পিতার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয় কিন্তু কোন কারণবশত সে কুরবানী করতে না পারে, তবে তার পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য সন্তানদেরকে অসিয়্যাত করা জরুরী। অসিয়্যাত করার পর যদি সে মারা যায় তবে তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মাল হতে কুরবানী করবে।

অসিয়্যাতের কুরবানীর গোশ্‌ত সমস্তই সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব। মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ তা খেতে পারবে না। কোন ধনী ব্যক্তিকেও আহার করাতে এবং হাদিয়া দিতে পারবে না।[১২১]

কুরবানীর কাযা

কোন ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু কুরবানীর তিনটি দিনই গত হয়ে গেল অথচ সে কুরবানী করল না, এমতাবস্থায় তাকে একটি বক্‌রী কিংবা এর মূল্য সাদাকা করতে হবে। আর যদি গরীব ব্যক্তি কুরবানীর পশু খরিদ করা সত্ত্বেও কুরবানী করতে না পারে তবে হুবহু ঐ পশুটিই সাদাকা করে দিতে হবে। মানতকারীদের উপরও এই হুকুম হবে।[১২২]

তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ

'তারাবীহ্' (تَرَاوِيْح) আরবী শব্দ। এটি বহুবচন। এর একবচন 'তারবীহাতুন' (تَرْوِيْحَةٌ)। এর আভিধানিক অর্থ বসা, বিশ্রাম করা, আরাম করা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় রমযানে এশার নামায পড়ার পর অতিরিক্ত ২০ রাকা'আত সুন্নাত নামাযকে তারাবীহ্ নামায বলা হয়। এই সুন্নাত নামায আদায়ের মাঝে প্রতি দুই রাকা'আত বা চার রাকা'আত অন্তর দু'আ-দুরূদ পড়ার মাধ্যমে একটু বিশ্রাম করাকেও 'তারাবীহ্' বলা হয়।

তারাবীহ্ নামায দুই রাকা'আত করে ২০ রাকা'আত ১০ বার সালামের সাথে আদায় করতে হয়। এর সপক্ষে নিম্নের হাদীস প্রণিধানযোগ্য :

عَنْ سَائِبِ ابْنِ يَزِيْدٍ قَالَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ شَهْرَ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً ٠

সাইব ইব্‌ন ইয়াজিদ (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁরা সবাই রমযান মাসের প্রতি রাতে ২০ রাকা'আত করে তারাবীহ্ নামায আদায় করতেন।[১২৩]

রমযান মাসের প্রথম রাত থেকে আরম্ভ করে শাওয়ালের চাঁদ ওঠার পূর্ব রাত পর্যন্ত এক মাস তারাবীহ্ নামায আদায় করা সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্।

রমযানের প্রত্যেক রাতে এশার চার রাকা'আত ফরয এবং দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায় করার পর বিত্‌র নামাযের আগেই তারাবীহ্ নামায আদায় করতে হয়। এর পূর্বে বা পরে তারাবীহ্ আদায় করা ঠিক নয়। তারাবীহ্ নামায জামা'আতবদ্ধ হয়ে আদায় করাই শ্রেয়।

তারাবীহ্ নামাযের নিয়্যাত

তারাবীহ্ নামায একাকী আদায় করলে নিয়্যাত করতে হয় এভাবে :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَ كْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٠

কিব্‌লামুখী দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত তারাবীহ্‌র সুন্নাত নামায আদায় করছি 'আল্লাহু আক্‌বার'।

জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা হলে ইমাম সাহেব مُتَوَجِّهًا শব্দ উচ্চারণ এর পূর্বে নিম্নের বাক্য পড়বেন : اَنَا اِمَامُ لِمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَحْضُرُ আমি যারা উপস্থিত এবং যারা উপস্থিত হবেন, সবারই ইমাম।

মুক্তাদী مُتَوَجِّهًا শব্দের পূর্বে উচ্চারণ করবেন : اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ আমি এই ইমামের পিছনে ইক্তিদা করছি।

অতঃপর 'তাক্বীরে তাহরীমা' উচ্চারণ করে অন্যান্য সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্র ন্যায় তারতীব অনুসারে সুবহানাকা, আউযুবিল্লাহ্, বিস্মিল্লাহ্ এবং সূরা ফাতিহার সাথে অন্য যে কোন সূরা বা বড় এক আয়াত অন্যথায় ছোট তিন আয়াত উচ্চস্বরে তিলাওয়াতের পর রুকূ' ও সিজদা দ্বারা যথারীতি সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত হয়। মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবেন, যেমন অন্যান্য জামা'আতের নামাযে করা হয়।

তারাবীহ্র নামায জামা'আতে বা একাকী যেভাবেই আদায় করা হোক না কেন, দুই রাকা'আত পর পর অন্তত একবার নিচের দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ بَارِكْ وَسَلِّمْ ·

ওগো প্রভু ! তুমি আমাদের সরদার, নবী, সুপারিশকারী, অভিভাবক মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের উপর দুরূদ, বরকত এবং শান্তি বর্ষণ করো।

অথবা চার রাকা'আতের অন্তর বসে তিনবার, কমপক্ষে একবার নিম্নের দু'আ পড়তে হয় :

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ·

আমি একমাত্র সেই প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি রাজাধিরাজ এবং ফিরিশ্তাদের অধিপতি, তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব এবং গৌরবের মালিক। আমি সেই চিরঞ্জীব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি কখনো নিদ্রা যান না, আর কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি পবিত্রতম, আমাদের প্রভু, ফিরিশ্তাকুল ও আত্মার রব।

উল্লিখিত দু'আ কেউ না জানলেও তাকে তারাবীহ নামায আদায় করতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই এই নামায সুন্নাত। এই নামাযে মুনাজাতের ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। চার রাকা'আত শেষে উল্লিখিত দু'আর পর মুনাজাত করা যায় অথবা বিশ রাকা'আত সমাপনান্তে নিম্নের দু'আ দ্বারাও মুনাজাত করা যেতে পারে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ·

হে আল্লাহ্ ! আমরা তোমার রহমতের মাধ্যমে তোমারই দরবারে জান্নাত প্রার্থনা করছি। আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার নিমিত্ত তোমারই দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে

জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টিকর্তা, হে পরাক্রমশালী, হে ক্ষমাশীল, হে অনুগ্রহকারী, হে দোষত্রুটি গোপনকারী, হে দয়ালু, হে প্রতাপশালী, হে সৃষ্টিকর্তা, হে মহীয়ান। হে আল্লাহ্ ! তোমার রহমত দ্বারা তুমি আমাদেরকে নরকাগ্নি থেকে রক্ষা করো। হে রক্ষাকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

কেউ যদি একই সাথে চার রাকা'আত পড়তে চায়, তাহলে চার রাকা'আতের নিয়্যাত করে নামাযে দাঁড়িয়ে দুই রাকা'আতের পর 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী দুই রাকা'আত যথারীতি সমাপনান্তে দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়ে নামায শেষ করতে হয়। অবশ্য কেউ দু'আ মাসূরা না পড়লেও নামায শুদ্ধ হবে। উল্লেখ্য, তারাবীহ্ নামাযে কুরআন খতম করা সুন্নাত।

তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত

তারাবীহ্ নামায মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মূলত শরী'আতের প্রতিটি বিধানেই বিশেষ ফযীলত নিহিত রয়েছে। তারাবীহ্ নামাযও শরী'আতের একটি বিধান। নবী কারীম (সা) মাহে রমযান-এর তারাবীহ্ নামাযের বহু ফযীলত বর্ণনা করেছেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَّقِيَامَ لَيْلِه تَطَوُّعًا ـ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মাহে রমযানের রোযা ফরয করে দিয়েছেন এবং রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে (ইবাদত করা) তারাবীহ্ নামায পড়াকে বিধান করে দিয়েছেন।[১২৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইয়াকীনের সাথে রমযানের রোযা রাখবে, তার অতীতের সমুদয় গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মাহে রমযানের রাতে দাঁড়িয়ে ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে ইবাদত করবে, তার অতীতের সমুদয় গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।[১২৫]

রমযানের ফযীলত সম্পর্কে মহানবী (সা) তাঁর এক খুত্বায় ইরশাদ করেছেন : মহান আল্লাহ্ তা'আলা রমযান মাসের রাতে দাঁড়ানো (তারাবীহ্ নামায আদায় করাকে) অতীব পুণ্যের কাজরূপে নির্ধারণ করেছেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে পুণ্য লাভের অদম্য স্পৃহায় তারাবীহ্ নামায আদায় করবে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও ইরশাদ করেছেন : রোযাদার ব্যক্তি যদি তারাবীহ্ আদায় না করে, তাহলে তার রোযা শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ঝুলতে থাকে, আর ঐ রোযাদারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে নালিশ করতে থাকে।

মাহে রমযানকে ধৈর্যের মাসরূপে উল্লেখ করে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ـ

রমযান মাস হচ্ছে ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত।

পবিত্র মাহে রমযানে তারাবীহ্ আদায় করার জন্য সবাই একত্রিত হয়। দীর্ঘ একটি মাস পরস্পরের দেখা-সাক্ষাত ও মতবিনিময়ের ফলে পরস্পরের মাঝে মমত্ববোধ, ভালবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে, হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়।

মাহে রমযানে তারাবীহ্ নামায আদায় করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : মহান আল্লাহ্ তা'আলা মাহে রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং রাতে তারাবীহ্ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) মাহে রমযানকে তিন ভাগে বিভক্ত করে ইরশাদ করেছেন :

وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ ۔

পবিত্র মাহে রমযানের প্রথম অংশে আল্লাহ্‌র রহমত, মধ্যম অংশে মাগফিরাত এবং শেষের অংশে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র রমযানের দিবস-রজনী উভয়ই ফযীলতপূর্ণ। তারাবীহ্ নামায স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আদায় করেছেন। সাহাবীগণকেও আদায় করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। কুরআন ও হাদীসে এই নামাযের যথেষ্ট ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। অতএব, ফযীলতপূর্ণ এ নামায রমযানের পুণ্যময় সময়ে জামা'আতের সাথে আদায় করা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

বিত্‌রের নামায

'বিত্‌র' (وِتْرٌ) আরবী শব্দ। এর অর্থ বিজোড়। এ নামায তিন রাকা'আত বিধায় এটিকে বিত্‌র বলা হয়। এশার নামাযের পর তিন রাকা'আত বিত্‌র নামায আদায় করা ওয়াজিব। রমযানে তারাবীহ্ নামায আদায়ের পর জামা'আতবদ্ধভাবে ইমামের পিছনে বিত্‌র নামায আদায় করা যায়। বিত্‌র নামায আদায়ের ব্যাপারে নবী কারীম (সা) বিশেষভাবে তাকীদ দিয়ে বলেন : বিত্‌রের নামায ওয়াজিব। যে ব্যক্তি বিত্‌র আদায় করবে না, আমাদের জামা'আতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।[১২৬]

বিত্‌র নামাযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلاَثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

বিত্‌রের তিন রাকা'আত ওয়াজিব নামায কিব্‌লামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আদায় করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

বিত্‌র নামায পড়ার নিয়মাবলী

অন্যান্য ফরয নামাযের ন্যায় দুই রাকা'আত নামায পড়ে তাশাহ্‌হুদ পড়তে হয়। তৃতীয় রাকা'আতে উঠে সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা বা আয়াত পড়তে হয়। কিরা'আত শেষ করার পর তাক্‌বীর বলে দু'হাত কান পর্যন্ত তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার অনুরূপ উঠাতে হয়। তারপর হাত বেঁধে নিঃশব্দে দু'আ কুনূত পড়তে হয়। দু'আ কুনূত পড়ে রুকূ'তে যেতে হয়। তারপর

যথারীতি দুই সিজ্‌দার পর শেষ তাশাহ্‌হুদ, দুরূদ ও দু'আ মাছূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে বিত্‌র নামায সমাপ্ত করতে হয়।

উল্লেখ্য, তৃতীয় রাকা'আতে রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে দু'আ কুনূত ভুলে গেলে রুকূ' করে নামায শেষে 'সিজদা সাহু' করলেই চলবে। যদি ভুলে প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে দু'আ কুনূত কেউ পড়ে ফেলে তা হলেও তৃতীয় রাকা'আতে পুনরায় পড়তে হবে এবং সিজ্‌দা সাহু দিতে হবে। বিত্‌র নামাযে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়া যায়। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) বিত্‌র নামাযে প্রথম রাকা'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ এবং দ্বিতীয় রাকা'আতের كَافِرُوْنَ ও তৃতীয় রাকা'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়তেন।

দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ۔

হে আল্লাহ্! আমরা আপনারই সাহায্যপ্রার্থী এবং একমাত্র আপনার কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী আপনার উপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আপনার উপরই ভরসা করি, আপনার উত্তম প্রশংসা করি, আপনার শোক্‌র আদায় করি, আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞ হই না, যারা আপনার নাফরমানী করে, তাদেরকে পরিত্যাগ করছি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি। ওগো প্রভু! আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্যই নামায পড়ি এবং আপনার জন্যই সিজদা করি, আপনার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই, আপনার হুকুম পালনের জন্যই প্রস্তুত থাকি, আপনার দয়ার আশা করি, আপনার শাস্তিকে ভয় পাই। নিঃসন্দেহে আপনার শাস্তি ভোগ করবে কাফির সম্প্রদায়।[১২৭]

কারো দু'আ কুনূত মুখস্থ না থাকলে অনতিবিলম্বে মুখস্থ করে নিতে হবে। মুখস্থ না করা পর্যন্ত নিম্নের দু'আ পড়তে হবে :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দান করুন এবং পরকালেও মঙ্গল দিন। আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। (সূরা বাকারা, ২ : ২০১)

এ দু'আও জানা না থাকলে তিনবার পড়তে হবে : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন।

অথবা তিনবার পড়তে হবে يَا رَبِّ ওগো প্রভু !

নফল নামায

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং ওয়াজিব-সুন্নাতের পাশাপাশি নবী কারীম (সা) বিভিন্ন সময় নফল নামাযও আদায় করেছেন। হাদীসে এসব নামাযের অনেক ফযীলতের কথা উল্লেখ আছে। মূলত নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত আমলের পাশাপাশি উদ্বৃত্ত আমলের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌র

নৈকট্য লাভ করতে পারে। এজন্যে সময় পেলেই নফল নামায আদায় করা উচিত। আত্মার প্রশান্তির জন্য এটা মহৌষধ। নিম্নে বিশেষ বিশেষ নফল নামায সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

তাহাজ্জুদ নামায

তাহাজ্জুদ (تَهَجُّدٌ) আরবী শব্দ। অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে উঠা। কুরআনের নির্দেশ :

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ‧

আর রাতের কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদ পড়তে থাকুন। এটা আপনার জন্য আল্লাহ্‌র অতিরিক্ত ফযল ও করম। আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৯)

তাহাজ্জুদ নামায সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা) নিয়মিত এ নামায পড়তেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

নিয়মিত তাহাজ্জুদগুযারদের উদ্দেশ্য করে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ‧

নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে সেদিন প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে। উপভোগ করবে তা, যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দিবেন। কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাতের অতি অল্প অংশ অতিবাহিত করত নিদ্রায় এবং শেষরাতে ইস্তিগফার করতো। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৫-১৮)

তাহাজ্জুদ নামাযের উপকারিতা বোঝা যায় এ আয়াতে :

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً ‧

অবশ্য প্রবৃত্তি দলনে রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর এবং বাকস্ফূরণে সঠিক। (সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ : ৬)

আল্লাহ্‌র স্বীকারোক্তি হচ্ছে :

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ‧

এবং তারা সারারাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমনের পর তাঁর মুবারক জবান দিয়ে প্রথম এ কথাগুলো শুনিয়েছিলেন :

"হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার কর, মানুষকে আহার দান কর, আত্মীয়তা অটুট রাখ, আর মানুষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লে তোমরা উঠে নামায পড়তে থাকবে। তাহলেই তোমরা নিরাপদে বেহেশ্‌তে যাবে।" (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নামায হচ্ছে রাতের তাহাজ্জুদ নামায। (মুসলিম)

হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন : তোমরা তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা কর, এটা নেক লোকের স্বভাব, এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট করে দিবে, গুনাহ্গুলো মিটিয়ে দিবে, গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, আর শরীর থেকে রোগ দূর করবে। (মুসলিম)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, রাতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার দিকে নেমে আসেন এবং বলেন, ডাকার জন্য কেউ কি আছে, যার ডাক আমি শুনব, চাওয়ার জন্য কেউ কি আছে যাকে আমি দিবো, গুনাহ্ মাফ চাওয়ার কেউ কি আছে, যার গুনাহ্ আমি ক্ষমা করে দিবো। (বুখারী)

এমনিভাবে কুরআন-হাদীসে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এটি হচ্ছে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। কেউ সফলতার উচ্চ শিখরে উঠতে চাইলে তাহাজ্জুদ নামায তার জন্য অন্যতম মাধ্যম।

রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে তারপর গাত্রোত্থান করে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে হয়। তাহাজ্জুদ নামাযের মাসনূন সময় হলো, এশার নামায আদায়ের পর কিছু সময় ঘুমিয়ে অর্ধ রাতের পর গাত্রোত্থান করে নামাযে দাঁড়ানো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো মধ্যরাতে, কখনো তার কিছু আগে বা পরে ঘুম থেকে উঠতেন, মিস্ওয়াক করতেন এবং উযূ করে নামায পড়তেন।

তাহাজ্জুদের নামায নিম্নে দুই রাকা'আত এবং উর্ধে বার রাকা'আত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই দুই করে বার রাকা'আত নামায পড়তেন। সে জন্য বার রাকা'আত পড়াই ভালো। অবশ্য, এটা জরুরী নয়। তাহাজ্জুদের নিয়্যাত হচ্ছে :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٠

আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিবলামুখী হয়ে তাহাজ্জুদের দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায়ের নিয়্যাত করছি, আল্লাহু আক্বার।

ইশ্‌রাকের নামায

হাদীস শরীফে ইশ্‌রাকের নামাযের অনেক ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, এই নামাযে এক হজ্জ ও এক উমরার সাওয়াব পাওয়া যায়। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : যে ব্যক্তি দুহার দুই রাকা'আত নামায পড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে তার (সগীরা) গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করা হবে, যদি তা সমুদ্রের ফেনার সমানও হয়।[১২৮]

ফজরের নামাযের পর জায়নামাযে বসে থাকতে হয়। বসে বসে দুরূদ শরীফ, কালেমা, কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোন তাসবীহ্ পড়তে হয়। দুনিয়ার কথাবার্তা বা কাজকর্মে জড়ানো যাবে না। এভাবে সূর্য উদয় থেকে ২৩/২৪ মিনিট অতিবাহিত হলে দুই বা চার রাকা'আত নফল নামায পড়তে হয়। অবশ্য, ফজরের পর আবশ্যকীয় কাজে কেউ লিপ্ত হলে

সূর্য উঠার পর ইশ্‌রাকের নামায পড়লেও জায়িয হবে, তবে সাওয়াব কম হবে। এ নামাযের নিয়্যাত নিম্নরূপ :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিব্‌লামুখী হয়ে নবীর সুন্নাত দুই রাকা'আত ইশ্‌রাকের নামায পড়ছি, আল্লাহু আক্‌বার।

চাশ্‌তের নামায

এ নামায পড়া মুস্তাহাব। সূর্য আকাশের এক-চতুর্থাংশ উপরে উঠলে, রৌদ্র প্রখর হয়ে গেলে চাশ্‌তের ওয়াক্ত হয়। বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সময় থাকে। এ সময়ে কেউ চাইলে দুই, চার, আট অথবা বার রাকা'আত নফল নামায আদায় করতে পারে। নবী কারীম (সা) কখনো চার রাকা'আত, আবার কখনো এর বেশিও পড়ছেন। নিম্নরূপে নিয়্যাত করতে হবে :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الضُّحٰى سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

কিব্‌লামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নবীর সুন্নাত চার রাকা'আত চাশ্‌তের নামাযের নিয়্যাত করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য চার রাকা'আত নামায পড় দিনের প্রথমাংশে, আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো দিনের শেষাংশে।[১২৯]

আউওয়াবীনের নামায

এ নামায পড়া মুস্তাহাব। মাগরিবের ফরয এবং সুন্নাত নামায আদায় করার পর অন্যূন ছয় রাকা'আত এবং অনুর্ধ বিশ রাকা'আত নফল নামায পড়তে হয়। এ নামাযের অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। নবী কারীম (সা) এ নামাযের বিরাট ফযীলত বর্ণনা করছেন এবং পড়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। এ নামাযের জন্য নিয়্যাত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَوَّابِيْنَ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

কিব্‌লামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নবীর সুন্নাত সালাতুল আউওয়াবীনের দুই রাকা'আত (নফল) নামাযের নিয়্যাত করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

যাওয়ালের নামায

সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়লেই এ নামাযের ওয়াক্ত হয়। যাওয়ালের চার রাকা'আত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। দুই দুই রাকা'আত করে নিয়্যাত করতে হয়। সূরা ফাতিহার সাথে যে কোন সূরা মিলিয়ে এ নামায পড়া যায়। এভাবে নিয়্যাত করবেন :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الزَّوَالِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিব্‌লামুখী হয়ে নবীর সুন্নাত যাওয়ালের দুই রাকা'আত নামায আদায় করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

ইস্‌তিস্‌কার নামায

'ইস্‌তিস্‌কা' অর্থ পানি প্রার্থনা করা। অনাবৃষ্টিতে মানুষের কষ্ট হতে থাকলে, আল্লাহ্‌র দরবারে পানি প্রার্থনা করে দু'আ করা সুন্নাত। একেই আবরীতে ইস্‌তিস্‌কা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম (সা) বৃষ্টি প্রার্থনার সময় বলতেন : হে আল্লাহ্! তুমি তোমার বান্দাকে এবং তোমার পশুদেরে পানি দান কর আর তাদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ কর এবং তোমার মৃত যমীনকে জীবিত কর।[১৩০]

'ইস্‌তিস্‌কা' নামায আদায়ের মাসনূন পদ্ধতি হলো, এলাকার সব মুসলমান পুরুষ সাথে বালক, বৃদ্ধ ও গরু-ছাগল নিয়ে, পায়ে হেঁটে দীনহীন পোশাক-পরিচ্ছদ পরে অবনত মস্তকে কাকুতি-মিনতির সাথে মাঠে বেরুতে হয়। সবাইকে কৃত পাপের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। নিখাদ অন্তরে তাওবা করতে হয়। কেউ কারো হক নষ্ট করলে তা ফেরত দিতে হয়।

জিম্মী, অমুসলিম বা কাফিরকে সঙ্গী করা যাবে না। উপস্থিত সবার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরু আলিমকে ইমাম নিযুক্ত করে সম্মিলিতভাবে আযান-ইকমাত ব্যতীত জামা'আতে দুই রাকা'আত নামায আদায় করতে হয়। ইমাম উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়বেন। সালাম ফিরানোর পর ঈদের খুতবার ন্যায় দু'টি খুতবা দেবেন।

এরপর ইমাম কিব্‌লামুখী দাঁড়িয়ে হস্তদ্বয় প্রসারিত করে রহমতের পানির জন্য প্রার্থনা করবেন। মুসল্লীগণও দু'আ করবেন।

পরপর তিনদিন এরূপ করতে হয়। তিনদিনের বেশি নয়। এ তিনদিন রোযা রাখাও মুস্তাহাব। তিনদিনের পূর্বেই বৃষ্টি এসে গেলেও তিনদিন পূর্ণ করা উত্তম। উল্লেখ্য, মাঠে যাবার পূর্বে সাদাকা-খয়রাত করাও মুস্তাহাব। এ নামাযের নিয়্যাত হলো :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিব্‌লামুখী হয়ে রাসূলের সুন্নাত দুই রাকা'আত ইস্‌তিস্‌কার নামাযের নিয়্যাত করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

কুসূফ ও খুসূফের (সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ) নামায

কুসূফ (كُسُوْف) ও খুসূফ (خُسُوْف) আরবী শব্দ। পারিভাষিক অর্থে কুসূফ সূর্যগ্রহণকে এবং খুসূফ চন্দ্রগ্রহণকে বলা হয়।

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় আযান-ইকামত ব্যতীত দুই রাকা'আত করে নামায আদায় করা সুন্নাত। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন : চন্দ্র, ও সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার দু'টো নিদর্শন। কারো জন্ম-মৃত্যুতে এগুলোর গ্রহণ হয় না। তোমরা যখন দেখো সূর্য বা চন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে, তখন আল্লাহ্কে ডাকো, তাঁর কাছে দু'আ করো এবং নামায পড়, যতক্ষণ না গ্রহণ ছেড়ে গিয়ে সূর্য বা চন্দ্র পরিষ্কার হয়।[১৩১]

উল্লেখ্য, সূর্যগ্রহণের সময় ইমাম সমবেত লোকদের নিয়ে নফল নামাযের ন্যায় দুই রাকা'আত নামায আদায় করবেন। প্রতিটি রাকা'আতে একটি করে রুকূ' করতে হয়। প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা বাকারা বা সূরা আলে-ইমরানের ন্যায় লম্বা লম্বা কিরা'আত পড়তে হয়। দীর্ঘ রুকূ' ও সিজ্দা করাও সুন্নাত। সূর্যগ্রহণ ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত দু'আ করতে হয়। মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলবেন। দু'আতে থাকা অবস্থায় কোন ফরয নামাযের সময় হলে নামায পড়ে নিতে হয়। চন্দ্রগ্রহণের নামায জামা'আতে আদায় করা সুন্নাত নয়। একাকীও এ নামায আদায় করা যায়। কুসূফ ও খুসূফের নিয়্যাত নিম্নরূপ :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিব্লামুখী হয়ে দুই রাকা'আত কুসূফের সুন্নাত নামায আদায় করছি, আল্লাহু আক্বার।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিব্লামুখী হয়ে দুই রাকা'আত খুসূফের সুন্নাত নামায আদায় করছি, আল্লাহু আক্বার।

কাযায়ে হাজাতের নামায

'সালাতুল হাজাত' বা প্রয়োজন পূরণের দুই রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। কেউ কোন ধরনের বিপদ-আপদ বা অভাব-অনটনে পড়লে অথবা কারো মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকলে তা পূরণের জন্য সর্বাগ্রে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের কথা স্মরণ করতে হয়। উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি দুই রাকা'আত নামায আদায় করতে হয়। একবার একজন দৃষ্টিহীন সাহাবী নবী কারীম (সা)-এর খিদ্মতে হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমার দৃষ্টিশক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করুন। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন, তুমি ধৈর্যধারণ করলে অনেক প্রতিদান পাবে আর তুমি বললে দু'আ করতে পারি। লোকটি দু'আ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় নবী কারীম (সা) তাকে এ নামায শিক্ষা দেন।[১৩২] এ নামাযের নিয়্যাত করতে হবে এভাবে :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْحَاجَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিব্‌লামুখী হয়ে রাসূলের সুন্নাত দুই রাকা'আত সালাতুল হাজতের নামায আদায় করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

নামায শেষ করে নিজেরকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে হয়, তারপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে হয় এবং দুরূদ শরীফ পড়ে নিম্নের দু'আটি কয়েকবার পড়তে হয় :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ·

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষাকারী এবং বড়ই দয়াবান। তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র, বিশাল আরশের তিনি মালিক, প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র, তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (ওগো প্রভু) আমি আপনার কাছে সে-সব জিনিস ভিক্ষা চাচ্ছি, যার জন্য আপনার রহমত অপরিহার্য এবং যা আপনার দান ও মাগফিরাতের কারণ হয়। আমি প্রতিটি মঙ্গলের অংশীদার হওয়ার কামনা করি। আর প্রতিটি পাপ থেকে নিরাপদ থাকার ইচ্ছা পোষণ করি। (ওগো প্রভু) আপনি আমার গুনাহ্ ক্ষমা করা ছাড়া এবং আমার দুঃখ-দুর্দশা দূর করা ব্যতীত ক্ষান্ত হবেন না এবং আমার যেসব প্রয়োজন আপনার পসন্দনীয় তা পূরণ না করে ছাড়বেন না, আপনি অনুগ্রহকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী।[১৩৩]

এরপর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য যা চাওয়ার তা চাইতে হয়। এ নামায প্রয়োজন পূরণের জন্য পরীক্ষিত।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ

মসজিদে প্রবেশকারীদের জন্য দুই রাকা'আত বা আরো অধিক নামায পড়া সুন্নাত। এ নামাযকেই বলা 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'-এর নামায। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে, দুই রাকা'আত নামায পড়ার আগে বসবে না।[১৩৪]

মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ঘর। আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীর জন্য মসজিদ তৈরি করা হয়। তাই, মসজিদে প্রবেশের পরই আল্লাহ্‌র দরবারে সিজ্‌দাবনত হওয়া উচিত। কেউ মসজিদে প্রবেশ করার পর ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাত নামায আদায় করলেও তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায আদায় হবে। নিয়্যাত করবেন এভাবে :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ·

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিব্‌লামুখী হয়ে দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুন্নাত নামায আদায় করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

তাহিয়্যাতুল উযূ

উযূ করার পর উযূর পানি শুকানোর পূর্বে দু'রাকা'আত বা চার রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। এ নামাযকে তাহিয়্যাতুল উযূ বলা হয়। তাহিয়্যাতুল উযূর ফযীলত বর্ণনা করে নবী

কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি ভালভাবে উযূ করে দু'রাকা'আত নামায পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, গোসলের পরও দু'রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা, গোসলের সঙ্গে উযূও হয়ে যায়। নিয়্যাত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ·

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিব্‌লামুখী হয়ে দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল উযূর সুন্নাত নামায আদায় করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

সালাতুত্ তাসবীহ্

সালাতুত্ তাসবীহ্ একই সালামে চার রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। দু'রাকা'আতও পড়া যায়। হাদীসে এ নামাযের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ নামাযকে সালাতুত্ তাসবীহ্ এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এ নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে নিম্নের তাসবীহ্ পঁচাত্তরবার পড়তে হয় :

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ·

সমস্ত পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

সালাতুত্ তাসবীহ্ পড়ার পদ্ধতি হলো, চার রাকা'আত সালাতুত্ তাসবীহ্‌র নিয়্যাত করে হাত বাঁধতে হয়। অতঃপর সানা পড়তে হয়। তারপর পনেরবার উপরোক্ত তাসবীহ্ পড়তে হয়। এরপর আউযুবিল্লাহ্ বিস্‌মিল্লাহ্ ও ফাতিহা পড়ে কুরআনের কিছু অংশ পড়তে হয়। এরপর দশবার তাসবীহ্ পড়তে হয়। রুকূ'তে গিয়ে রুকূ'র তাসবীহর পর দশবার এ তাসবীহ্, রুকূ' থেকে উঠে কাওমার সময় দশবার এ তাসবীহ্, সিজ্‌দায় سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى এরপর এ তাসবীহ্ দশবার, সিজ্‌দা থেকে উঠে বসে দশবার পড়তে হয়। দ্বিতীয় সিজ্‌দায়ও ঐভাবে দশবার পড়তে হয়।

দ্বিতীয় রাকা'আতে ফাতিহার পূর্বে পনেরবার, কিরা'আতের পর দশবার, রুকূ'তে দশবার, রুকূ' থেকে উঠে দশবার, দুই সিজ্‌দা দশ+দশবার এবং দুই সিজ্‌দার মাঝখানে দশবার পড়তে হয়। এভাবেই তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে আদায় করতে হয়। প্রত্যেক রাকা'আতে পঁচাত্তরবার করে চার রাকা'আতে তিনশ'বার এ তাসবীহ্ পড়তে হয়। তাসবীহ্ গণনার সময় আঙ্গুলের আঁকে গোনা যাবে না। কোন স্থানে তাস্‌বীহ্ ভুলে গেলে অন্য স্থানে পূরণ করতে হয়। নিয়্যাত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ·

আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিব্লামুখী হয়ে চার রাকা'আত সালাতুত্ তাসবীহ্ সুন্নাত নামায আদায় করছি, আল্লাহু আক্বার।

মুসাফিরের নামায

কস্র নামাযের বিবরণ : 'কসর' (قَصْرٌ) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ কম করা, সংক্ষেপ করা। ইসলামী শরী'আতে কোন ব্যক্তি ৪৮ মাইল দূরে বা ততোধিক দূরত্বের সফরে বের হলে এর কোথাও ১৫ দিন বা ততোধিক সময় অবস্থানের নিয়্যাত না করলে সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। মুসাফিরকে চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায—যোহর, আসর এবং এশা সংক্ষেপ করে বা কমিয়ে দু' রাকা'আত আদায় করতে হবে। এটাই হলো কস্র বা সংক্ষেপকরণ।

কেউ তিন মঞ্জিল, অর্থাৎ ৪৮ মাইলের কম দূরত্বে যাওয়ার সিদ্ধান্তে ঘর থেকে বের হলে তাকে পূর্ণ চার রাকা'আত নামাযই আদায় করতে হবে। কোন স্থানে পায়ে হেঁটে বা উটে চড়ে যেতে তিন দিন লাগে আর উড়োজাহাজ, স্টীমার, লঞ্চ, ট্রেন বা অন্য কোন দ্রুতযানে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে, তখনও সে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে এবং নামাযে কসরই করতে হবে। কোন মুসাফির যদি পনের দিনের কম সময়ের নিয়্যাত করে ভ্রমণে বের হয়, কিন্তু নিয়্যাত ছাড়া পনের দিনের বেশি অবস্থান করে, এমতাবস্থায়ও তাকে কসরই করতে হবে। যারা নিজ বাড়িতে অবস্থান করে অথবা দূরে কোথাও গিয়ে পনের দিনের বেশি সময় থাকার নিয়্যাত করে শরী'আতের দৃষ্টিতে সেও মুকীম। আর মুকীমকে পুরো নামাযই আদায় করতে হয়, কসরের বিধান তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ বিধান তিন বা দু'রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই ফজর এবং মাগরিবের নামাযের কোন কসর নেই।[১৩৫]

কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে :

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۔

তোমরা যখন যমীনে সফর করবে তখন তোমাদের জন্য নামাযে কস্র করায় কোন আপত্তি নেই। (সূরা নিসা, ৪ : ১০১)

কস্রের নামায সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَا يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قِيْلَ اَاَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ لَيْلاً قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا ۔

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মদীনা থেকে মক্কাভিমুখে রওনা হয়েছিলাম। তিনি ফরয নামায দু'রাকা'আত আদায় করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মদীনায় ফিরে এলাম। এ সময় হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনারা কি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন ? তিনি প্রত্যুত্তর করলেন, আমরা দশদিন অবস্থান করেছিলাম।[১৩৬]

মুসলিম মিল্লাতের জন্য নামাযের কস্‌র বা সংক্ষেপকরণ এক বিশেষ নি'আমত। মহান আল্লাহ্‌র দয়া, বিশেষ অনুগ্রহ। তাঁর বান্দাদের সফরের ক্লেশ লাঘব করার জন্যই নামাযে কস্‌রের বিধান রেখেছেন। এর অমর্যাদা করে পূর্ণ নামায আদায় করলে গুনাহ্‌ হবে।

কস্‌রের নিয়মাবলী

১. কেবলমাত্র চার রাকা'আতবিশিষ্ট ফরয নামাযে কস্‌রের বিধান রয়েছে। যেমন : যুহর, আসর ও এশার ফরয নামায চার রাকা'আতের পরিবর্তে দু'রাকা'আত আদায় করে কস্‌র করতে হয়।

২. মুসাফির নামাযে ইমামত করলে মুক্তাদীদের আগেই জানিয়ে দেবেন এবং ইমাম দু'রাকা'আত নামায শেষ করে সালাম ফিরালে মুক্তাদীরা উঠে বাকি নামায শেষ করবেন।

৩. মুসাফির মুকীম ইমামের পেছনে নামায আদায় করলে ইমামের অনুসরণে পূর্ণ চার রাকা'আতই আদায় করতে হবে।

৪. মুসাফিরের প্রবাসের কোন নামায যদি বাড়ি ফিরে এসে কাযা করতে চায়, তাহলে তাকে কস্‌র আদায় করতে হবে। আবার বাড়ি থাকাকালীন কোন নামাযের কাযা প্রবাসে আদায় করতে চাইলে পুরো চার রাকা'আতই আদায় করতে হবে।

৫. কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে মুসাফির সাজলে শরী'আতের দৃষ্টিতে সে মুসাফির হিসাবে পরিগণিত হবে না এবং তার জন্য কস্‌রের হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

৬. কসর নামাযের জন্য নিদিষ্ট ওয়াক্তের নিয়্যাত উল্লেখ করতে হবে। যথা, আসরের নামাযের কসর আদায় করতে হলে নিয়্যাত করতে হবে এভাবে :

نَوَيْتُ اَنْ اَقْصَرُ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٠

কিব্‌লামুখী দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাঁরই নির্দেশে আসর ওয়াক্তের ফরয চার রাকা'আতের স্থলে দু'রাকা'আত নামায আদায় করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসাফিরের জন্য কস্‌র নামায একটি বিশেষ অনুগ্রহ। সফরের ব্যস্ততায় পুরো নামায আদায় করা যে বান্দার পক্ষে কষ্টসাধ্য, তা মহান প্রভু সম্যক জ্ঞাত আছেন বিধায়ই প্রিয় বান্দাদের জন্য নি'আমত স্বরূপ বিশেষ বিধান জারী করেছেন। সেজন্য আমাদের তাঁর শোক্‌র আদায় করা উচিত। আর তাঁর বিধান যথাযথ মেনে চলাই হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

কস্‌র নামাযের ফযীলত

কস্‌র নামাযের ফযীলত অপরিসীম। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কস্‌রের বিধান দিয়েছেন। বস্তুত মানুষের মঙ্গলের জন্যই শরী'আতের সব বিধান। যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, চার রাকা'আত নামাযের স্থলে দু'রাকা'আত পড়াতে সাওয়াব কমে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এই নামাযই চার রাকা'আত বলেই পরিগণিত হবে।

মুসাফির অবস্থায় নামায কসর করলে তাতে কোন গুনাহ্ নেই, বরং আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করার জন্য পূর্ণ সাওয়াব হবে।

সফরে মুসাফিরকে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। সফরের সময় যানবাহনে চলাচলেও কষ্ট রয়েছে। বান্দার এসব কষ্টের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কস্র নামাযের বিধান দিয়েছেন। তা না হলে পুরো নামায আদায় করা মুসাফিরের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়তো।

আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালনে সার্বিক ফযীলত নিহিত রয়েছে, আর সে নির্দেশ অনুসারেই মুসফিরকে কস্র আদায় করতে হয়।

মানুষ আল্লাহ্র প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি অনুগত থাকাই তার একান্ত কর্তব্য। সেহেতু মানুষের তথা মুসলিম মিল্লাতের দায়িত্ব-কর্তব্য হলো যেখানে যে অবস্থাতেই সে থাকুক না কেন, আল্লাহ্র ইবাদতে ব্যাপৃত থাকতে হবে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তাহলেই সে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে। অতএব, আল্লাহ্র যেকোন নির্দেশ পালন করাই হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।

রুগ্ন ব্যক্তির নামায

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। নির্ধারিত ওযর ব্যতীত নামায পরিত্যাগ করা যাবে না। কোন অক্ষম বা রোগী যথাযথভাবে নামায আদায় করতে না পারলে, যেভাবেই সম্ভব নামায আদায় করতে হবে। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো :

এক. যত কঠিন রোগগ্রস্তই হোক না কেন, যথাসম্ভব ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে। নামাযের সমুদয় আরকান-আহকাম যথাযথভাবে আদায় করতে সামর্থ্য না হলে ইশারায় হলেও ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে।

দুই. নামায দাঁড়িয়ে আদায় করতে হবে। শক্তি থাকাবস্থায় বসে নামায আদায় করা যাবে না। পুরো নামায দাঁড়িয়ে পড়ার শক্তি না থাকলে যতটুকু সম্ভব দাঁড়িয়ে পড়ে বাকি নামায বসে পড়া যাবে। কোন অক্ষম রোগী যদি শুধু 'তাক্বীরে তাহ্রীমা' বলার জন্য দাঁড়াতে সক্ষম হয় তাহলে দাঁড়িয়ে 'তাক্বীরে তাহ্রীমা' বলে বসে নামায আদায় করতে পারবে।

তিন. দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কোনক্রমেই সক্ষম না হলে, দুর্বলতার কারণে দাঁড়ালে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, দাঁড়ালে মাথা ঘুরালে, দাঁড়ালে খুব বেশি কষ্ট হলে বা দাঁড়ালেও রুকূ' ও সিজ্দা করার শক্তি না থাকলে এসব অবস্থায় বসেই নামায আদায় করতে হবে।

চার. বসে নামায পড়া সম্ভব হলে তাশাহ্হুদে বসার ন্যায় বসে নামায পড়তে হবে। এভাবে বসা সম্ভব না হলে, যেভাবে সম্ভব, সেভাবে বসেই নামায আদায় করতে হবে। রুকূ' ও সিজ্দা করতে সক্ষম না হলে ইশারা করে হলেও নামায আদায় করতে হবে।

পাঁচ. ইশারা করতে হবে মাথা দ্বারা। চোখ এবং মুখ দিয়ে ইশারা করা যথেষ্ট নয়। রুকূ'তে যতটুকু, সিজ্দাতে তার চেয়ে বেশি মাথা ঝুঁকাতে হবে।

ছয়. বালিশ বা এ জাতীয় কিছু কপাল পর্যন্ত উঁচু করে সিজ্‌দা করা মাকরূহ। সিজ্‌দার জন্য মাটি পর্যন্ত কপাল ঝুঁকানো সম্ভব না হলে ইশারা করেই সিজ্‌দা করতে হবে।

সাত. এতই রোগাক্রান্ত যে, বসেও নামায পড়তে অক্ষম বা বসে নামায পড়তে খুবই কষ্ট হয়, রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে বা ব্যান্ডেজ খুলে যাওয়ার আশংকা থাকলে শুয়েই নামায আদায় করতে হবে। শুয়ে নামায আদায় করার উত্তম পন্থা হচ্ছে, চিত হয়ে কিব্‌লার দিকে পদদ্বয় রাখতে হবে। পা সটান না করে হাঁটু উঁচু করে রাখতে হয়, আর মাথার নিচে বালিশ বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে মাথা একটু উঁচু করতে হয়। শুয়ে ইশারায় রুকূ' ও সিজ্‌দা করতে হয়। এও সম্ভব না হলে উত্তরদিকে মাথা দিয়ে কিব্‌লার দিকে মুখ ফিরাতে হয় এবং ডান কাত হয়ে নামায আদায় করতে হয়। এটাও সম্ভব না হলে যেভাবেই সম্ভব নামায আদায় করতে হবে। নামাযের কোন ক্ষমা নেই।

আট. রোগীর অবস্থা এত খারাপ যে, ইশারা-ইঙ্গিতেও নামায পড়তে একেবারেই অক্ষম, এমতাবস্থায় নামায পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সুস্থ হলে কাযা আদায় করতে হবে। এমন অবস্থা পাঁচ ওয়াক্তের বেশি থাকলে কাযা হবে না। এ নামায আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি দুর্বলতাজনিত কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং এ অবস্থা ছয় ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত চললে এসব নামাযের কাযা ওয়াজিব হবে না। কোন সুস্থ লোকও যদি জ্ঞান হারিয়ে ছয় ওয়াক্ত পর্যন্ত থাকে, তা হলে তার জন্য এসব নামায ক্ষমা করে দেয়া হবে; কাযা করতে হবে না।

নয়. নামাযরত অবস্থায় কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়তে হবে, বসে না পারলে শুয়ে বা ইশারা করে বাকি নামায আদায় করতে হবে।

দশ. চলন্ত নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি, বিমান বা এ ধরনের কোন যানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়তে হবে। তবে, দাঁড়িয়ে পড়তে কোন অসুবিধা না থাকলে দাঁড়িয়ে পড়া উচিত।

এগার. সুস্থ থাকাকালীন কিছু নামায কাযা হওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে, সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা না করেই যেভাবেই হোক কাযা নামায আদায় করে নিতে হবে।

বার. কোন রোগীর বিছানা নাপাক হলে, পবিত্র বিছানা যোগাড় করা কষ্টসাধ্য হলে, বা বিছানা বদলানো কষ্টসাধ্য হলে, নাপাক বিছানার উপরই নামায় আদায় করা যাবে।

কাযা নামায

ফরয বা ওয়াজিব নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আদায় করলেই তাকে কাযা নামায বলা হয়। কাযা নামায আদায় করার অনুমতি শরী'আত দিলেও নামায ইচ্ছাকৃত কাযা করা কবীরা গুনাহ্। নিম্নে কাযা নামাযের হুকুম ও মাস'আলা-মাসাইল বর্ণনা করা হলো।

কাযা নামাযের হুকুম

এক. ফরয নামাযের কাযা ফরয এবং ওয়াজিব নামাযের (বিত্‌র) কাযা ওয়াজিব।

দুই. মানত করা নামাযের কাযাও ওয়াজিব।

তিন. নফল নামায আরম্ভ করার পর তা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কারণবশত নফল নামায নষ্ট হয়ে গেলে বা কোন কারণবশত শুরু করার পর ছেড়ে দিলে তার কাযা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

চার. সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্ এবং নফল নামাযের কাযা নেই। তবে ফজর নামাযের সুন্নাতের বিষয় এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফজরের সুন্নাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদীস শরীফে ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে খুবই তাকীদ করা হয়েছে। তাই, ফজরের সুন্নাত কাযা হলে যুহর নামাযের পূর্বেই কাযা পড়তে হবে। এরপরে পড়লে শুধু ফরয দু'রাকা'আত পড়তে হবে। সুন্নাতের কাযা পড়তে হবে না। ফজরের ফরয যথাসময়ে পড়া হলে সুন্নাত বাকি থাকলে বেলা উঠার পর থেকে যুহরের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যাবে। বেলা গড়িয়ে যাবার পর নয়। অন্য কোন সুন্নাত বা নফল নামায ওয়াক্তের মধ্যে পড়তে না পারলে কাযা করা ওয়াজিব নয়।

পাঁচ. যুহরের ফরযের পূর্বের চার রাকা'আত সুন্নাত কোন কারণবশত পড়া না হলে ফরযের পর পড়ে নিতে হবে। যুহরের পর দু'রাকা'আত সুন্নাতের পূর্বে বা পরে পড়া যাবে। অবশ্য যুহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে কাযা ওয়াজিব হবে না।[১৩৭]

কাযা নামায আদায়ের মাসাইল

১. কোন ওযর ব্যতীত নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ্। এজন্য হাদীস শরীফে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। অবহেলা জনিত কারণে এ ধরনের ভুল হলে আল্লাহ্র দরবারে তাওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

২. কোন ওযর বা অক্ষমতাজনিত কারণে নামায কাযা হলে আদায়ে বিলম্ব করা ঠিক নয়। অবিলম্বে কাযা আদায় করতে হবে। কোন কারণ ব্যতীত বিলম্ব করা গুনাহের কাজ।

৩. কয়েকজনের একই সাথে নামায কাযা হলে সম্ভব হলে জামা'আতের সাথে কাযা আদায় করা সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্। যেমন, ভ্রমণের সময় ওয়াক্তের মধ্যে নামায আদায় করা যায়নি বা কোন গ্রাম বা মহল্লায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে সবার নামায কাযা হয়ে যায় অথবা কয়েকজন একই সাথে ঘুমিয়ে থাকার দরুন নামায কাযা গেছে এ অবস্থায়ও জামা'আতের সমুদয় হুকুম বলবৎ থাকবে।

৪. কখনো কারো নামায কাযা হলে চুপে চুপে ঘরে আদায় করা ভালো। অবহেলার দরুন নামায কাযা হলে মানুষকে জানতে দেয়াও গুনাহ্। অক্ষমতার জন্য হলেও কারো কাছে প্রকাশ করা দূষণীয় এবং মাকরূহ্। তাই, যথাসম্ভব গোপন রাখতে হবে। মসজিদেও কাযা পড়া যাবে, তবে কাউকে জানতে দেয়া অনুচিত।

৫. কাযা নামায আদায়ের নির্ধারিত কোন সময় নেই। সময় হলে সুযোগ করে পড়ে নিতে হয়। তবে নিষিদ্ধ সময়গুলোতে পড়া যাবে না।

৬. কয়েক ওয়াক্তের কাযা একত্রিত হলে অবিলম্বে সব ওয়াক্তের কাযা একই সাথে আদায় করতে হবে। ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করা আবশ্যক নয়।

৭. অবহেলাবশত কেউ দীর্ঘদিন নামায পড়া থেকে বিরত থাকার পর আল্লাহ্‌র দরবারে তাওবা করলো। তাওবার পর হয়তো আল্লাহ্ তার সময়মত নামায না পড়ার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিতেও পারেন, কিন্তু যে নামায পড়া হয়নি, তার ক্ষমা নেই। তাই, পূর্ববর্তী সব নামাযের কাযা আদায় করতে হবে।

৮. কয়েক মাস বা বছর নামায কাযা হলে একটা অনুমান করে কাযা নামায শুরু করতে হবে। সে অনুপাতে নিয়্যাত করতে হবে।

৯. সফরকালীন সময়ের কাযা নামায মুকীম অবস্থায় পড়লে কসর পড়তে হয়, অনুরূপ মুকীম অবস্থায় কাযা নামায সফরে পড়লে পূর্ণই পড়তে হবে।

১০. বিত্‌র নামায কাযা হলে ফজর হওয়ার পূর্বেই পড়া উচিত। বিত্‌রের কাযার কথা স্মরণ রেখেও প্রথমে ফজরের নামায পড়লে এবং পরে বিত্‌র পড়লে বিত্‌রের পর আবার ফজরের নামায পড়তে হবে।

১১. রোগ শয্যায় ইশারায় নামায আদায় করা যেতো। কিন্তু কিছু নামায কাযা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় উত্তরসূরীদের অসিয়্যাত করতে হবে, যেন মৃত্যুর পর তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কাযা নামাযের ফিদইয়া আদায় করে। উল্লেখ্য, এক কাযা নামাযের ফিদইয়া হচ্ছে পৌনে দুই কেজি গম। এর মূল্যও পরিশোধ করা যায়।

১২. জুমু'আর নামাযের কাযা নেই। জুমু'আর নামায পড়তে না পারলে চার রাকা'আত যুহর কাযা পড়তে হয়।

১৩. রোগী এমন দুর্বল যে ইশারায় নামায পড়ার শক্তি নেই বা অজ্ঞান হয়ে যায়। এমনিভাবে ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা হয়। সে ব্যক্তির জন্য কাযা করা ওয়াজিব নয়। অবশ্য, পাঁচ ওয়াক্তের পর জ্ঞান ফিরলে সব নামাযই কাযা পড়তে হবে।

১৪. কেউ জীবনের একটা অংশ অবহেলায় কাটিয়েছে। তার অসংখ্য নামায কাযা হয়েছে। এক পর্যায়ে তাওবা করার তাওফীক হলো। এমতাবস্থায় পিছনের নামাযগুলো আদায়ের সহজ পন্থা হচ্ছে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করার সাথে সাথেই যেসব সুন্নাত ও নফল নামায পড়া হয়, সেসব নমাযের নিয়্যাত সুন্নাত ও নফলের স্থলে ছুটে যাওয়া ফরয নামাযের কাযার নিয়্যাত করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত অতীত জীবনের সব নামায পূর্ণ হয়েছে, এ বিষয়ে প্রবল ধারণা না জন্মে, ততদিন এভাবে নামায আদায় করতে হবে। ছুটে যাওয়া নামায ঋণের ন্যায়। ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, ছুটে যাওয়া নামায আদায় করাও তেমনি অপরিহার্য।

১৫. ঈদের জামা'আতে ইমামের সাথে সিজ্‌দা করার পর কোন কারণে নামায নষ্ট হয়ে গেলে ঐ নামাযের আর কাযা পড়া যাবে না। কেননা, ঈদের নামাযের কোন কাযা নেই। ঈদের নামাযের জন্য জামা'আত শর্ত বিধায় ওয়াক্তের মধ্যে একাকীও আদায় করা যাবে না।

১৬. কোন কারণবশত ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার নামায প্রথম দিন পড়তে না পারলে ঈদুল ফিত্‌রের নামায পরদিন এবং ঈদুল আযহার নামায বারো তারিখ পর্যন্ত পড়া যাবে।

১৭. কারো পাঁচ ওয়াক্তের বেশি নামায কাযা হলে তার ক্রমানুসারে কাযা নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়। যখনই সুযোগ হয়, পড়া যাবে। কাযা নামাযের পূর্বে নামায পড়াও জায়িয। অবশ্য একাধারে ছয় ওয়াক্ত নামাযের কম কাযা হলে তারতীব রক্ষা করে ক্রমানুসারে নামায আদায় করা জরুরী।[১৩৮]

মুমূর্ষু ব্যক্তির করণীয়

কোন মু'মিন যদি বুঝতে পারে তার মৃত্যু আসন্ন। এহেন মুমূর্ষু লোকের জীবনের অন্তিমকালে অবনত মস্তকে ভক্তিসহকারে দু'রাকা'আত নামায পড়ে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অতীত জীবনের সমুদয় গুনাহর জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তবেই, এই নামায এবং তাওবা তার ইহজীবনের সর্বশেষ নেক আমল হিসেবে পরিগণিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। নবী কারীম (সা)-এর সময় থেকেই এ নামায মুস্তাহাবরূপে পড়ার প্রচলনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয়

মানুষ মরণশীল। নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে মানুষকে একদিন পাড়ি জমাতে হয় অবিনশ্বর জগতের উদ্দেশ্যে। সাড়ে তিন হাত মানুষের শরীর থেকে রূহ বা আত্মা বেরিয়ে গেলেই মানুষ মৃত বলে পরিগণিত হয়। মৃত ব্যক্তির জন্য জীবন্ত মানুষের অবশ্যই কিছু করণীয় রয়েছে। এখানে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

ক. মৃতের গোসল

১. নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন, কাফন দাফনে তাড়াতাড়ি কর। মৃত ব্যক্তি কারো বাড়িতে বেশি সময় পড়ে থাকা ঠিক নয়।[১৩৯]

২. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ফরযে কিফায়া। কেউ লা-ওয়ারিস হলে তার গোসলের দায়িত্ব সামষ্টিকভাবে সকল মুসলমানের। গোসল ব্যতীত কোন মৃতকে দাফন করা হলে জ্ঞাত সব মুসলমানই গুনাহ্‌গার হবে।

৩. গোসল ছাড়া কোন মৃতকে কবরে রাখা হলে, তার উপর মাটি দেয়া না হলে, তাকে উঠিয়ে গোসল দেয়া অত্যাবশ্যক। অবশ্য, উপরে মাটিদ্বারা ভরাট করে ফেললে পুনরায় কবর থেকে উঠানো ঠিক নয়।

৪. কাফন পরানোর পর মনে পড়লো মৃতের কোন অঙ্গ বা অংশ ধোয়া হয়নি, এমতাবস্থায় কাফন খুলে ধুয়ে নিতে হবে। সামান্য অংশ শুকনো থাকলে, যেমন কোন আঙ্গুল শুকনো রয়ে গেছে বা সে পরিমাণ অন্য কোন অংশ, এমতাবস্থায় কাফন খুলে ধুয়ে ফেলার প্রয়োজন নেই।

৫. মৃতকে একবার গোসল দেয়া ফরয। তিনবার দেয়া সুন্নাত।

৬. পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের গোসল দিতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর গোসল দিতে পারবে। কারণ, ইদ্দতের সময় পর্যন্ত তাকে স্বামীর বিয়ের মধ্যেই ধরতে হবে। কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীর গোসল দিতে পারবে না। কারণ স্ত্রীর ইন্‌তিকালের সাথে সাথেই বিয়ে শেষ হয়ে যায়।

৭. অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাকে নারী-পুরুষ উভয়েই গোসল দিতে পারবে।

৮. মৃতের প্রিয়জনদেরই গোসল দেয়া ভালো। পদ্ধতি জানা না থাকলে অবশ্য অন্য যে কেউ গোসল দিতে পারে।

৯. নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই ইন্তিকাল করলে তাকে গোসল দেয়া ফরয। মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলেও গোসল দেয়া ভালো।

মৃতের গোসলের মাসনূন তরীকা

গোসলের সময় মৃতকে চৌকি বা গোসলের খাটিয়ার উপর শোয়াতে হয়। তারপর পরনের কাপড় সরিয়ে পুরুষ হলে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটা কাপড় রাখতে হয়। এরপর হাতে কাপড় জড়িয়ে পেশাব-পায়খানার জায়গা পরিষ্কার করে দিতে হয়। এরপর উযূ করাতে হয়। প্রথমে সমুদয় মুখমণ্ডল, পরে কনুই পর্যন্ত দু'হাত, তারপর মাথা মাসেহ্, অবশেষে দু'পা। নাকে ও মুখে পানি দেয়ার দরকার নেই। তুলা ভিজিয়ে দাঁতের মাড়ি এবং নাকের ভেতর মুছে দেয়া জায়িয। গোসল ফরয অবস্থায় এবং হায়িয-নিফাস অবস্থায় মারা গেলে মুখে ও নাকে পানি পৌঁছানো জরুরী। পানি যেন ভেতরে না যায় সেজন্য নাক, মুখ ও কানে তুলা দিতে হয়। এরপর ধুতে হয়। সাবান বা এ জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা যায়। এরপর মৃতকে বাম কাত করে শুইয়ে বরইপাতা দিয়ে অল্প গরম পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে তিনবার ঢালতে হবে, যেন বাম কাত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে ডান কাত করে তিনবার পানি ঢালতে হয়। এরপর মৃতকে কোন কিছুর উপর ঠেস দিয়ে বসিয়ে আস্তে আস্তে পেটে চাপ দিতে হবে। কোন মল বেরুলে পরিষ্কার করতে হবে। এরজন্য পুনরায় উযু ও গোসল করানোর দরকার হবে না। পরে বাম কাত করে শুইয়ে কর্পূর মেশানো পানি ঢলতে হবে তিনবার। সবশেষে একটি কাপড় দিয়ে সারা শরীর মুছে দিতে হয়। মৃতকে গোসল দেয়ার এটাই মাসনূন তরীকা।

খ. মৃতের কাফন

১. মৃতকে কাফন পরানো ফরযে কিফায়া।

২. গোসল দেয়ার পর শরীর শুকালেই কাফন পরাতে হয়।

৩. মৃতের জীবনে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যার উপর ছিল, তারই কাফন কিনতে হবে। মৃতের যদি এমন কেউ না থাকে, যদি কোন সম্পদও রেখে না গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় কাফনের দায়িত্ব সামষ্টিকভাবে সকল মুসলমানের। কেউ একা বা সকলে মিলে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৪. কাফন এমন ধরনের কাপড় দ্বারাই দিতে হবে, যা তার জীবিতাবস্থায় তার জন্য জায়িয ছিলো। মহিলাদের জন্য রেশমী বা রঙিন কাপড়ের কাফন দেয়া জায়িয। পুরুষের জন্য রেশমী বা জাফরানী রঙের কাপড় দেয়া যাবে না।

৫. জীবদ্দশায় যে ধরনের কাপড় ব্যবহার করতো, কাফন সে ধরনের কাপড় দ্বারাই দিতে হবে। বেশি মূল্যবান কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া মাকরূহ। নিকৃষ্ট ধরনের কাপড় দেওয়াও ঠিক নয়।

৬. নতুন হোক বা পুরনো, সাদা কাফন হওয়াই উত্তম।

৭. জীবদ্দশায় নিজের জন্য কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করা জায়িয। কবর খনন করে রাখা মাকরূহ।

৮. পুরুষের জন্য তিনটি কাপড় সুন্নাত। যেমন, ক. সেলাইবিহীন জামা, খ. তহবন্দ ও গ. চাদর।

জামা হবে গলা থেকে পা পর্যন্ত। ইজার বা তহবন্দ মাথা থেকে পা পর্যন্ত হতে হবে। চাদর তার থেকে এক হাত লম্বা হবে, যেন মাথা এবং পা দু'দিকে বাঁধা যায়। জামায় আস্তিন বা কল্লি হবে না।

৯. মহিলাদের কাফন পাঁচ কাপড়। যেমন, ক. জামা, খ. ইজার, গ. মাথাবন্ধ, ঘ. সিনাবন্ধ ও ঙ. চাদর।

মহিলাদের জামা হবে গলা হতে পা পর্যন্ত। জামায় কল্লি বা আস্তিন হবে না। ইজার হবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদর তার থেকে এক হাত লম্বা হবে। মাথাবন্ধ দ্বারা মাথা ঢেকে চেহারার উপর দিয়ে দিতে হবে। বাঁধা বা পেঁচানো যাবে না। সিনাবন্ধ হবে বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত। যেন বাঁধা যায়, একটুকু চওড়া হতে হবে।

১০. উপরে বর্ণিত কাফন সংগ্রহ করতে না পারলে পুরুষের ইজার ও চাদর এবং মহিলাদের ইজার, চাদর আর মাথাবন্ধ হলেও চলবে। তাও সংগ্রহ করতে না পারলে যা-ই পাওয়া যাবে, তা দিয়েই কাফন পরাতে হবে। কোন অংশ খোলা থাকলে পাতা বা অন্য কিছু দিয়ে ঢাকতে হবে, যেন উলঙ্গ না থাকে।

১১. মৃত সন্তান প্রসব করলে বা গর্ভপাত হলে পবিত্র কাপড় জড়িয়ে দাফন করতে হবে।

কাফন পরানোর পদ্ধতি

পুরুষকে কাফন পরানোর পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমেই কাফনের চাদর চৌকি অথবা খাটিয়ার উপর বিছাতে হবে। চাদরের উপর বিছাতে হবে ইজার। এরপর মৃতকে জামা পরিয়ে ইজারের উপর শোয়াতে হবে। ইজার এমনভাবে জড়াতে হবে, যেন মৃতের ডান পাশ বাম পাশের উপর থাকে। এভাবেই চাদর পরাতে হবে।

মহিলাদের কাফন পরানোর পদ্ধতি হলো, প্রথম বিছাতে হবে চাদর। এরপর জামা পরিয়ে মৃতের চুল দু'ভাগ করে ডানে ও বাঁয়ের জামার উপর রেখে দিতে হবে। এরপর না বেঁধে মাথাবন্ধ মাথায় উড়ে দিয়ে মুখের উপর রাখতে হবে। তারপর মৃতকে ইজারের উপর শুইয়ে দিতে হবে। ইজার এমনভাবে পরাতে হবে, যেন ডান পাশ বাম পাশের উপর পড়ে। অনুরূপভাবে সিনাবন্ধ ও চাদর জড়াতে হবে। মাথা, কোমর ও পা কাপড়ের ফিতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে, যেন দাফনের জন্য নেয়ার সময় খুলে না যায়।

গ. জানাযার নামায

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে কেউ পড়লেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। এ নামায হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করা। আত্মীয়-

পরিজনসহ এলাকাবাসী সমবেত হয়ে তার জন্য দু'আ করলে আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জানাযার নামাযে বেশি লোক হওয়া ভালো। অবশ্য, লোক সমাগমের জন্য জানাযার নামায বিলম্ব করে পড়া অনুচিত।

জানাযার নামাযের হুকুম

জানাযা নামাযে ফরয দু'টি। যেমন : ১. আল্লাহু আকবার চারবার বলা। প্রতিটি তাকবীর এক রাকা'আতের স্থলাভিষিক্ত। জানাযার নামাযে রুকূ' ও সিজ্‌দা নেই। ২. দাঁড়ানো। ওযর ব্যতীত বসে জানাযার নামায পড়া জায়িয নয়। কোন কিছুর উপর উঠে নামায পড়াও জায়িয নয়।

জানাযা নামাযের সুন্নাত

জানাযা নামাযের সুন্নাত তিনটি। যথা : ১. আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা পড়া; ২. নবী কারীম (সা)-এর উপর দুরূদ পড়া ও ৩. মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করা।

জানাযা নামায পড়ার পদ্ধতি

জানাযা নামায পড়ার জন্য অন্যূন তিন কাতার করা সুন্নাত। এর চেয়ে বেশি কাতার করা যাবে। তবে কাতার বেজোড় হওয়া উচিত। মৃতকে কিব্‌লার দিকে সম্মুখে রেখে বক্ষ বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন। সবাইকে নিম্নের দু'আ আরবী বা বাংলায় পড়তে হবে :

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ وَالثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ·

আমি জানাযার ফরযে কিফায়া নামায চার তাক্‌বীরের সাথে কিব্‌লামুখী হয়ে এ ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে মৃতব্যক্তিকে দু'আ করার উদ্দেশ্যে আদায় করছি, আল্লাহু আক্‌বার।

মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে। لِهٰذَا-এর স্থলে لِهٰذِهِ বলতে হবে। এরপর উচ্চস্বরে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে হস্তদ্বয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার মত হাত বেঁধে নিম্নের দু'আ পড়তে হয় :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ·

হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমার। তুমি সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। তোমার নাম মঙ্গল ও বরকতপূর্ণ, তোমার মহত্ত্ব অতি বিরাট, তোমার প্রশংসা অতি মহত্ত্বপূর্ণ এবং একমাত্র তুমি ছাড়া আর কোন প্রভু নেই।

সানা পড়ার পর পুনরায় হাত না উঠিয়ে তাক্‌বীর বলে নিম্নের দু'আ পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ · اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ·

হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর পরিজনের উপর তুমি তোমার খাস রহমত অবতীর্ণ করো যেমন ইব্‌রাহীম (আ) এবং তাঁর পরিজনের উপর খাস রহমত অবতীর্ণ করেছো। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসারযোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর পরিজনের উপর খাস বরকত নাযিল কর যেমনি নাযিল করেছো ইব্‌রাহীম (আ) এবং তাঁর পরিজনের উপর।

এরপর তাক্‌বীর বলে মৃতের জন্য দু'আ পড়তে হয়। মৃত (পুরুষ বা মহিলা) প্রাপ্তবয়স্ক হলে এ দু'আ পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ٠

হে আল্লাহ্! আমাদের জীবিত, আমাদের মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড়, আমাদের পুরুষ ও নারী সবার গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি যাদেরকে জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, তুমি যাদের মৃত্যু দাও তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও।

তারপর চতুর্থ তাক্‌বীর বলে ইমাম ডানে ও বামে সালাম ফিরাব, সাথে সাথে মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে।

মৃত অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে হলে নিম্নের দু'আ পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ٠

হে আল্লাহ্ ! এ বাচ্চাকে আমাদের নাজাত ও আরামের জন্য আগে পাঠিয়ে দাও, তার জন্য যে দুঃখ তা আমাদের প্রতিদান ও সম্পদের কারণ বানিয়ে দাও, তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানাও যা তোমার দরবারে কবুল হবে।

মৃত অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে হলে পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ٠

উপরের দু'আ কারো জানা না থাকলে তারা বলবে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ٠

হে আল্লাহ্ ! তুমি নারী-পুরুষ মু'মিনদের ক্ষমা করে দাও।

এও বলতে না পারলে, কেবলমাত্র চার তাক্‌বীর বললেও নামায হয়ে যাবে।

জানাযা কাঁধে নেয়ার পদ্ধতি

জানাযা কাঁধে উঠিয়ে চলার সময় মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো, সামনের পায়া ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলতে হয়। প্রত্যেকের দশ কদম পর পর পায়া বদল করতে হয়। এমনিভাবে যেতে

হয় চল্লিশ কদম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি জানাযা কাঁধে করে চল্লিশ কদম যাবে তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

ঘ. মৃতকে দাফন

১. মৃতকে দাফন করাও ফরযে কিফায়া।

২. কবরের দৈর্ঘ্য হবে মৃতের উচ্চতার সমান, গভীরতা তার অর্ধেক, প্রস্থ হবে দুই হাত, যাতে মৃতকে রাখা যায়।

৩. মৃতকে কবরে নামানোর পূর্বে তাকে কবরের কিব্‌লার দিকে রাখতে হয়। যারা নামাবে, তাদের কিব্‌লামুখী হতে হবে। মৃতের মাথা উত্তরদিকে এবং পা দক্ষিণদিকে থাকবে।

৪. কবরে নামানোর সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলা মুস্তাহাব।

৫. মৃতকে কবরে রেখে ডান কাত করে কিব্‌লামুখী করে দেয়া সুন্নাত।

৬. মহিলা হলে পর্দার সাথে নামানো মুস্তাহাব। শরীর খুলে যাওয়ার আশংকা থাকলে পর্দা করা ওয়াজিব।

৭. কবরে মাথার দিক থেকে মাটি দেয়া মুস্তাহাব। দুই হাতে মাটি কবরে রাখতে হয়। প্রথমবার বলতে হয় مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ দ্বিতীয়বার বলতে হয় : وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ এবং তৃতীয়বার বলতে হয় : وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

৮. দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের পাশে থেকে মৃতের জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব।

৯. মাটি দেয়ার পর কবরে পানি ছিটানো মুস্তাহাব।

১০. একটি কবরে একজন মৃতকেই দাফন করা উচিত। তবে প্রয়োজনে একাধিকও করা যায়।

১১. সৌন্দর্যের জন্য কবরের উপরে দালান-কোঠা, গম্বুজ, মিনার ইত্যাদি তৈরি করা হারাম।

১২. সমুদ্র ভ্রমণে কারো মৃত্যু হলো। সেখান থেকে স্থলভূমি এত দূরে যে, পৌঁছতে পৌঁছতে লাশ বিকৃত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এমতাবস্থায় গোসল দিয়ে জানাযার পর মৃতকে সমুদ্রে ছেড়ে দিতে হবে। তবে স্থলভূমি কাছে হলে কবর দেয়াই উচিত।[১৪০]

গ্রন্থপঞ্জি

১. কাওয়াইদুল ফিকহ্, সাইয়্যেদ মুফ্‌তী মুহাম্মাদ আমীরুল ইহ্‌সান (র) পৃ. ৩৫১।
২. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০।
৩. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫৮।
৪. তিরমিযী, সূত্র : ফাযাইলে আমল, পৃ. ২৫০।
৫. মুআত্তা : ইমাম মালিক, সূত্র : মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।
৬. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১।
৭. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০।

৮. বাদায়েউস সানায়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।
৯. বাদায়েউস সানায়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।
১০. বাদায়েউস সানায়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।
১১. বাদায়েউস সানায়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।
১২. বাদায়েউস সানায়ে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১।
১৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৬৯।
১৪. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫৭।
১৫. আহমদ ও বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫৯।
১৬. তাবারানী, সূত্র : ফাযাইলে নামায, পৃ. ২৪৮।
১৭. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫৮।
১৮. দুর্‌রে মানসূর, সূত্র : ফাযাইলে আমল, পৃ. ২২২।
১৯. ফাযাইলে আমল, পৃ. ২৩৬-২৩৭।
২০. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১।
২১. আশরাফুল হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬।
২২. আল-মুখতাসারুল কুদূরী, পৃ. ৪৮।
২৩. মুসলিম শরীফ, পৃ. ১১৪।
২৪. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪।
২৫. বুখারী শরীফ, পৃ. ৮৬।
২৬. তিরমিযী শরীফ, পৃ. ২৯।
২৭. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৬৪।
২৮. তিরমিযী শরীফ, পৃ. ৯৬-৯৭।
২৯. হিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-১০০।
৩০ আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৮।
৩১. আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৮।
৩২. আহ্‌মদ ও আবূ দাউদ।
৩৩. মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফ।
৩৪. আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৮।
৩৫. তিরমিযী শরীফ, পৃ. ১০৩।
৩৬. বুখারী শরীফ।
৩৭. আলমগীরী, ১ম খন্ড পৃ. ৮২।
৩৮. বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৫।
৩৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৯৫।
৪০. তিরমিযী, পৃ. ১২৭।
৪১. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৯৭।
৪২. আবূ দাউদ শরীফ।
৪৩. আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
৪৪. বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।
৪৫. আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
৪৬. আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১।

৪৭. তিরমিযী ও দারিমী, সূত্র : মিশকাত (বাংলা) ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮।
৪৮. প্রাগুক্ত।
৪৯. বুখারী, সূত্র : মিশকাত শরীফ (উর্দু), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪।
৫০. বুখারী, সূত্র : মিশকাত শরীফ (উর্দু),প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫।
৫১. প্রাগুক্ত।
৫২. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত।
৫৩. আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০।
৫৪. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।
৫৫. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
৫৬. মা-লা বুদ্দা মিনহু, পৃ. ৪৯-৫০।
৫৭. বেহেশ্তি জেওর, পৃ. ২০৬-২০৭।
৫৮. আল-মুখ্তাসারুল কুদূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮৩।
৫৯. বেহেশ্তি জেওর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০৬।
৬০. আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৮।
৬২. আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-৭৯।
৬৩. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
৬৪. শামী ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।
৬৫. ইব্ন মাজাহ্, মুসান্নাফে ইব্ন আবী শায়বা, সূত্র : হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৭।
৬৬. আহ্মাদ ও ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ.১২৯।
৬৭. শামী, খণ্ড ৯, পৃ. ৪৫৭।
৬৮. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪৪।
৬৯. শামী, খণ্ড ৯, পৃ. ৪৫৩।
৭০. তারীখে কুরবানী, পৃ. ৪১।
৭১. কিফায়াতুল মুফ্তী, খণ্ড ৮, পৃ. ১৭৬।
৭২. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ২২৮।
৭৩. কিফায়াতুল মুফ্তী, খণ্ড ৮, পৃ. ১৭৮।
৭৪. কিফায়াতুল মুফ্তী, খণ্ড ৮, পৃ. ৯৭।
৭৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃ. ৯৬১।
৭৬. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪৮।
৭৭. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪৯।
৭৮. আলমগীরী, খণ্ড ৫, পৃ. ৩০৪।
৭৯. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪২৮।
৮০. ফাতওয়ায়ে হিন্দীয়া, খণ্ড ৫, পৃ. ৩০৪।
৮১. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৩।
৮২. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩২।
৮৩. বেহেশ্তি জেওর, খণ্ড ৩, পৃ. ৪২।
৮৪. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ২২৭।
৮৫. আলমগীরী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৯৮।

৮৬. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ২২৮।
৮৭. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩২।
৮৮. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ২২৭।
৮৯. শামী,খণ্ড ৫, পৃ. ২২৮।
৯০. শামী খণ্ড ৫, পৃ. ২৩৩।
৯১. আলমগীরী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৯৭।
৯২. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩২।
৯৩. শামী, খণ্ড ২, পৃ. ২২৯।
৯৪. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ২২৯।
৯৫. আলমগীরী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৯৬।
৯৬. আলমগীরী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৯৬।
৯৭. কুদূরী, পৃ. ১৯৮।
৯৮. আলমগীরী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৯২।
৯৯. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৭২।
১০০. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৫।
১০১. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৭২।
১০২. বেহেশ্‌তি জেওর্‌, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৭।
১০৩. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৭।
১০৪. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৮।
১০৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৪৭।
১০৬. শামী, খণ্ড ৯, পৃ. ৪৭৩।
১০৭. শামী, খণ্ড ১, পৃ. ৪৭৩।
১০৮. শামী, খণ্ড ২, পৃ. ২৩২।
১০৯. আলমগীরী, খণ্ড ৫, পৃ. ৩০।
১১০. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৭৮।
১১১. মাসাইলে ঈদায়ন, পৃ. ১৮৩।
১১২. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫০।
১১৩. মাসাইলে ঈদায়ন, পৃ. ১৮৪।
১১৪. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৪।
১১৫. মাসাইলে ঈদায়ন, পৃ. ১৯২।
১১৬. শামী, খণ্ড ৪, পৃ. ২৩৪।
১১৭. আবূ দাউদ শরীফ।
১১৮. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৪।
১১৯. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৮৬।
১২০. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৮৬।
১২১. শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ৩২৮।
১২২. হিদায়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩০-৪৩১।
১২৩. ফিকহুস্ সুন্নাহ্, পৃ. ১৫৪।
১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-৫৫।
১২৬. আবূ দাউদ শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১১৩।
১২৭. ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, পৃ. ২১৩-২১৪।
১২৮. মিশকাত (উর্দূ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
১২৯. মিশকাত (উর্দূ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮।
১৩০. মিশকাত (উর্দূ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।
১৩১. মিশকাত (উর্দূ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬।
১৩২. ইলমুল ফিকহ্, ২য় খণ্ড।
১৩৩. বেহেশ্তি জেওর, পৃ. ১৬৬-৬৭।
১৩৪. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
১৩৫. আল-মুখ্তাসারুল কুদূরী, পৃ. ৭৬-৭৭।
১৩৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত (উর্দূ), পৃ. ৩০৪।
১৩৭. ফাতায়ায়ে আলমগীরী, পৃ. ২২৯-২৩০।
১৩৮. বেহেশ্তি জেওর, পৃ. ১৭২-১৭৫।
১৩৯. আবূ দাউদ শরীফ।
১৪০. ফাতায়ায়ে আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-৩০৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাওম — রোযা

সাওম-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

'সাওম' শব্দটি আরবী। সাওম বা সিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় সুব্হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যাত সহকারে পানাহার এবং যৌনাচার থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোযা বলা হয়।[১] বস্তুত রোযা রাখার নিয়ম সর্বযুগেই প্রচলিত ছিল। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আখিরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত নবী-রাসূলগণ সকলেই সিয়াম পালন করেছেন। আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাছীর (র) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিন দিন রোযা রাখার বিধান ছিল। পরে রমযানের রোযা ফরয হলে তা রহিত হয়ে যায়।[২]

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করে দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা আশূরার দিন সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার ? তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন ? তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেছেন। তাই হযরত মূসা (আ) এ দিনে সাওম পালন করেছেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিন সাওম পালন করেন এবং সকলকে সাওম পালনের নির্দেশ দেন।[৩]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রেক্ষিতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁদের উম্মাতগণ সকলেই সাওম পালন করেছেন। যদিও ধরন ও প্রক্রিয়াগতভাবে তাদের সাওম আমাদের থেকে কিছুটা ভিন্নতর ছিল।

নবীগণের মধ্যে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সব সময় রোযা রাখ এবং রাতভর নামায আদায় করে থাক ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি এরূপ করলে চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। যে সারা বছর রোযা রাখল সে যেন রোযাই রাখল না। যে ব্যক্তি মাসে তিন দিন করে রোযা রাখে সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি 'সাওমে দাউদী' পালন কর। তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন। (ফলে তিনি দুর্বল হতেন না) এবং যখন তিনি শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না।[৪]

মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (র) তাঁর সুবিখ্যাত সীরাত গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'র বরাত দিয়ে লিখেছেন, প্রাচীন মিসরীয়দের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেও রোযার প্রচলন পাওয়া যায়। গ্রীক ও পারসিক ধর্মেও সাওমের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সারকথা ইসলাম-পূর্ব ধর্মসমূহে রোযার প্রচলন ছিল। তবে কোন কোন ধর্মে রোযার ব্যাপারে বেশ স্বাধীনতা ছিল। এ অবাধ স্বাধীনতা রোযার ভাবমূর্তি ও প্রাণশক্তি সম্পূর্ণরূপে খতম করে দিয়েছিল। চারিত্রিক মহত্ত্ব, নৈতিক পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, আত্মিক পবিত্রতা এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম এ রোযা কালক্রমে অন্তঃসারশূন্য নিছক এক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে পড়েছিল।

এহেন অবস্থা হতে রোযাকে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং একে আত্মিক, নৈতিক কল্যাণের ধারক বানানোর নিমিত্তে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রোযাকে উম্মাতের উপর ফরয করেন। ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা তাক্ওয়া হাসিল করতে সক্ষম হও। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .

রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫)

উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় রোযার মধ্যেও বেশকিছু মৌলিক সংস্কার সাধন করেছে। সমাজের সর্বস্তরে এর সুদূর প্রসারী সংস্কারের প্রভাব সুস্পষ্ট।

রোযা ব্যাপারে ইসলামের প্রধানতম সংস্কার হল, ধারণাগত পরিবর্তন। অর্থাৎ ইয়াহূদীদের দৃষ্টিতে রোযা ছিল বেদনা ও শোকের প্রতীক। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে রোযা হল, এমন এক সর্বজনীন ইবাদত যা রোযাদারকে দান করে সজীবতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও চিন্তাধারার বিশুদ্ধতা। এ রোযার মাধ্যমে বান্দা লাভ করে এক রূহানী তৃপ্তি, নতুন উদ্যম ও প্রেরণা। রোযার উপর আল্লাহ্ তা'আলা যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তা এক মুহূর্তে মানুষকে করে তোলে ভোগে বিতৃষ্ণ, ত্যাগ উদ্বুদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। হাদীসে কুদ্সীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

"রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার দান করবো।"[৫]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : রোযাদার ব্যক্তি দু'টি আনন্দ লাভ করবে। একটি আনন্দ হল ইফ্‌তারের মুহূর্তে আর অপরটি হবে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে।[৬]

রোযাদার ব্যক্তির যেন সাধ্যাতীত কোন কষ্ট না হয় এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহ্‌রীকে সুন্নাত এবং বিলম্ব সাহ্‌রী গ্রহণ করাকে মুস্তাহাব ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে ইফ্‌তারের সময় অযথা বিলম্ব না করে সময় হওয়ার সাথে সাথেই ইফ্‌তার করার হুকুম দিয়েছেন।[৭]

কোন কোন প্রাচীন ধর্মমতে রোযা এক বিশেষ শ্রেণীর জন্য পালনীয় ছিল। কিন্তু ইসলাম রোযাকে সকল সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে এক সর্বজনীন রূপ দান করেছে। ইসলামী বিধান মতে, প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য রোযা আবশ্যক। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ٠

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫)

প্রাচীন ধর্মসমূহে রোযার ব্যাপারে প্রচুর সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন ওযরবশত কাউকে রোযা রাখা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নিয়ম ছিল না। ইসলাম এ ক্ষেত্রেও উদারতার পরিচয় দিয়েছে। মা'যূর ও অক্ষম ব্যক্তিদের রোযার বিষয়টি বিবেচনায় এনে ওযর দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান করেছে। ইরশাদ হয়েছে ;

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ٠

তোমাদের কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫)

রোযার ক্ষেত্রে কোন কোন ধর্মে এত বাড়াবাড়ি ছিল যে, একটানা চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। আবার কোন কোন ধর্মে এমন শিথিলতা ছিল যে, কেবল গোশ্‌ত জাতীয় খাদ্য বর্জনকেই রোযার জন্য যথেষ্ট মনে করা হতো। এ ছাড়া অন্য যে কোন প্রকার খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু ইসলাম মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উদারতা কোনটাকেই সমর্থন করেনি। এখানে যেমন অধিকার নেই আত্মাকে অমানবিক কষ্ট দেওয়ার, তেমনি অবকাশ নেই অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার।

ইয়াহূদী সম্প্রদায় ইফ্‌তারের সময়ই শুধু খাদ্যগ্রহণ করত। এরপর খাদ্য পানীয় কোন কিছু গ্রহণ করাই তাদের ধর্মে বৈধ ছিল না। ফলে রাতভর পানাহার সহ যাবতীয় বৈধ কাজ থেকে বিরত থাকতে হত তাদের। এসব রীতিনীতি রহিত করে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা হয়েছে :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ٠

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্ররেখা তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮)

সকল প্রাচীন ধর্মেই সৌরমাস হিসাবে রোযা রাখার বিধান ছিল। তাই দিন তারিখ এবং মাসের হিসাব রাখার জন্য সৌর বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ছিল। এছাড়াও সৌরবর্ষের কারণে প্রতি বছর একই সময় নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখতে হত। এতে কোন রদবদল হত না। এতে লোকেরা কিছুটা একঘেঁয়েমি অনুভব করত। কিন্তু সৌরমাসের পরিবর্তে চান্দ্রমাসের হিসাবে রোযা ফরয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ·

"চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে তা শেষ করবে।"[৮]

রোযাকে চান্দ্রমাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেওয়ার সুফল এই যে, এর ফলে পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন মানুষ অতি সহজেই রোযা রাখতে সক্ষম হয়। এমনকি গভীর অরণ্যে, পর্বত-চূড়ায় অথবা জনমানবহীন কোন দ্বীপে আটকা পড়া ব্যক্তিও অনায়াসে রোযা রাখতে পারে। এর জন্য তাকে সৌর বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন হয় না। এর আরেকটি সুফল হলো, চান্দ্রমাসের কারণে ধীরে ধীরে রমযানের মৌসুম পরিবর্তন হয়ে থাকে। কখনও রমযান আসে গরমে আবার কখনো বা শীতে। মৌসুমের এ পরিবর্তনের ফলে নতুনত্বের একটা স্বাদ পাওয়া যায়। এতে শীত ও গরম মৌসুমের সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ সময়কালীন রোযায় অভ্যস্ত হয়ে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ ও শোকর আদায়ের তাওফীক লাভ করে মুসলিমগণ।[৯]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَوٰةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ·

তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করবে এবং তোমাদের শাসকদের আনুগত্য করবে, তাহলেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১০]

রোযার ফরযিয়াতের ব্যাপারে উম্মাতের ইজ্‌মা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি এর ফরযিয়াত অস্বীকার করে তবে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে।

কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি ওযর না থাকা সত্ত্বেও রোযা না রাখে তবে সে গুনাগার হবে। হাদীসে এরূপ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ ·

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কেউ যদি শরঈ কোন ওযর এবং অসুস্থতা না থাকা সত্ত্বেও রমযানের কোন একটি রোযা না রাখে, তবে সারাজীবন রোযা রাখলেও তা পূরণ হবে না।[১১]

রোযার প্রকৃত হাকীকত এবং তাৎপর্য হচ্ছে তাক্‌ওয়া ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "যাতে তোমরা তাক্‌ওয়া অর্জন করতে পার।"

তাক্ওয়া হচ্ছে হৃদয়ের এক বিশেষ অবস্থার নাম। ঐ অবস্থা হাসিল হওয়ার পর মানুষের হৃদয় আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। এ কারণেই ইসলাম রোযার যাহিরি বিধি-বিধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতিও বিশেষ তাকীদ করেছে।

রোযা যাতে অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয় এবং যেন একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পালন হয় এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযার সাথে ঈমান ও ইহ্তিসাব তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং উত্তম বিনিময় লাভের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

مَنْ صَامَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ·

যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।[১২]

বস্তুত যে রোযা তাক্ওয়া তথা আল্লাহ্র ভয় ও হৃদয়ের পবিত্রতাশূন্য, সে রোযা যেন প্রকৃত অর্থে কোন রোযাই নয়। আল্লাহ্র নিকট এরূপ রোযার গুরুত্ব নেই। হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ·

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই।[১৩]

হযরত আবূ উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : রোযা ঢাল স্বরূপ, যদি না সে নিজেই তা বিদীর্ণ করে দেয়।[১৪] মিথ্যা কথা ও গীবত দ্বারা রোযার বরকত বিনষ্ট হয়ে যায়।

যে কাজ রোযার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, রোযা অবস্থায় এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাকীদ করেছেন। তিনি বলেন : রোযা অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয় তবে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।[১৫]

রোযাকে প্রাণবন্ত করতে হলে যেমনিভাবে জিহ্বার হিফাযত জারুরী, অনুরূপভাবে চোখ, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাযতও তেমনি জরুরী। হারাম জিনিস দেখা, নিষিদ্ধ কথা শ্রবণ করা এবং হারাম কাজ করা ইত্যাদি থেকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে। তবেই রোযার স্বাদ অনুভূত হবে এবং রোযাও প্রাণবন্ত হবে।

রোযার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করার জন্য অন্যতম শর্ত হল, হালাল বস্তুদ্বারা আহার করা। পক্ষান্তরে হারাম বস্তু খেয়ে রোযা রাখলে এতে নফ্সের পাশবিকতা অবদমিত হওয়ার পরিবর্তে তা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠবে। রোযা অবস্থায় সাহ্রী ও ইফ্তারের সময় পরিমিত আহার করাও আবশ্যক। রোযার কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হাসিল করতে হলে নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিত্যাগ

করার সাথে সাথে অন্যান্য নেক আমলের প্রতিও বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। তাই রোযাদার ব্যক্তিকে ইবাদত, তিলাওয়াত, যিক্‌র ও তাসবীহে মগ্ন থেকে সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতার মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণ ও কামিয়াবীর পথ প্রশস্ত করে নেওয়ার প্রতি বিশেষ তাকীদ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

"আল্লাহ্ তা'আলা রমযানের সিয়াম পালন করাকে ফরয এবং রাতে তারাবীহ্ পড়াকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের নিমিত্তে রমযানে কোন নফল আমল করলে সে রমযানের বাইরে একটি ফরয আদায় করার সমান সাওয়াব লাভ করবে। আর রমযানে কোন ফরয আদায় করলে রমযানের বাইরে সত্তরটি ফরয আদায়ের সমান সাওয়াব লাভ করবে। বস্তুত রমযান হল ধৈর্যের মাস এবং এ ধৈর্যের মাস এবং এ ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। আর এ মাস মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের মাস।"[১৬]

এ কারণেই বলা হয় যে, রমযান হচ্ছে তিলাওয়াত, যিক্‌র এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের এক বিশেষ মৌসুম। আত্মিক উৎকর্ষ ও পরকালীন কল্যাণ লাভের এক বেহেশতী সওগাত এই রমযান মাস। রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানকে রহমত, বরকত ও কল্যাণের মাস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রোযার ফযীলত ও উপকারিতা

রোযার ফযীলত ও উপকারিতা অনেক। হাদীসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَاِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ اَوْشَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِىْ - اَلصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِئُ بِهٖ وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرِ اَمْثَالِهَا ٠

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযা অবস্থায় যেন অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে এবং অজ্ঞ মূর্খের মত কোন কাজ না করে। কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করতে চায়, অথবা গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে, আমি রোযাদার। ঐ সত্তার শপথ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, অবশ্যই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিশ্‌কের ঘ্রাণের চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট। সে আমারই জন্য পানাহার এবং কাম প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে। রোযা আমারই জন্য, তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেককাজের বিনিময় দশগুণ।[১৭]

অপর এক হাদীস আছে :

عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدُ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ ٠

হযরত সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা) বলেন, জান্নাতের মধ্যে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কেবলমাত্র কিয়ামতের দিন রোযাদার লোকেরা প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, রোযাদার লোকেরা কোথায়, তখন তারা দাঁড়াবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।[১৮]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার রব ! আমি তাকে দিনের বেলা পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছি। তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবূল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবূল করুন। তখন এদের সুপারিশ কবূল করা হবে।[১৯]

রোযার মধ্যে অনেক উপকারিতা নিহিত আছে। এগুলো সম্বন্ধে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) "আহকামে ইসলাম আকল কী নযর মেঁ" নামক গ্রন্থে দীর্ঘ আলোকপাত করেছেন। এর মধ্য থেকে কতিপয় বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. রোযাদ্বারা প্রবৃত্তির উপর আক্লের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এরদ্বারা মানুষের পাশবিক শক্তি অবদমিত হয় এবং রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। কেননা ক্ষুধা ও পিপাসার কারণে মানুষের জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছা হ্রাস পায়। এতে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় এবং অন্তর বিগলিত হয় মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়।

২. রোযার দ্বারা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয়-ভীতি এবং তাক্ওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "যাতে তোমরা তাক্ওয়ার গুণ অর্জন করতে সক্ষম হও।"

৩. রোযার-দ্বারা মানুষের স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয় এবং মানব মনে আল্লাহ্র আযমত ও মহানত্বের ধারণা জাগ্রত হয়।

৪. মানুষের দূরদর্শিতা আরো প্রখর হয়।

৫. রোযার দ্বারা মানব মনে এমন এক নূরানী শক্তি সৃষ্টি হয়, যারদ্বারা মানুষ সৃষ্টির এবং বস্তুর গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হয়।

৬. রোযার বরকতে মানুষ ফিরিশ্তা চরিত্রের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে।

৭. রোযার বরকতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা যে ব্যক্তি কোনদিনও ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকেনি, সে কখনো ক্ষুধার্ত মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারে না। অপরদিকে কোন ব্যক্তি যখন রোযা রাখে এবং উপবাস থাকে, তখন সে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, যারা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, তারা যে কত দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছে। আর তখনই অনাহারক্লিষ্ট মানুষের প্রতি তার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

৮. রোযা পালন করা আল্লাহ্র প্রতি গভীর মহব্বতের অন্যতম নিদর্শন। কেননা কারো প্রতি মহব্বত জন্মালে, তাকে লাভ করার জন্য প্রয়োজনে প্রেমিক পানাহার বর্জন করে এবং সব

কিছুকে ভুলে যায়, ঠিক তেমনিভাবে রোযাদার ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র মহব্বতে দিওয়ানা হয়ে সবকিছু ছেড়ে দেয়। এমনকি পানাহার পর্যন্ত ভুলে যায়। তাই রোযা হল, আল্লাহ্‌র মহব্বতের অন্যতম নিদর্শন।[২০]

৯. রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। তাই রোযা মানুষকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হিফাযত করে।

১০. রোযার দ্বারা মানুষের শারীরিক সুস্থতা হাসিল হয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে, প্রত্যেক মানুষের জন্য বছরে কয়েক দিন উপবাস থাকা আবশ্যক। তাঁদের মতে, স্বল্প খাদ্যগ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। সূফী-সাধকদের মতে, হৃদয়ের স্বচ্ছতা হাসিলে স্বল্প খাদ্যগ্রহণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রোযা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর কারণে শরীরে চর্বি জমতে পারে না। পক্ষান্তরে মাত্রাতিরিক্ত পানাহারের ফলে শরীরে অধিকাংশ রোগব্যাধি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ছাড়াও রোযার মধ্যে বহু উপকারিতা রয়েছে।

যাদের উপর রোযা ফরয

ওযরবিহীন প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۔

তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫)

এখানে মাস বলতে নির্দিষ্ট মাস অর্থাৎ রমযান বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য রমযান মাসের উপস্থিতি একটি শর্ত। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি পূর্ণ রমযান মাস পাবে, তার উপর রমযান মাসের রোযা ফরয হবে। যে ব্যক্তি এর থেকে কিছু কম সময় পাবে, ততদিনের রোযাই ফরয হবে। (মা'আরেফুল কোরআন, [বঙ্গানুবাদ সংক্ষিপ্ত] পৃ. ৯৪)।

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার শর্তাদি নিম্নরূপ : ১. মুসলমান হওয়া, ২. আকিল-সজ্ঞানে থাকা, উন্মাদ বা পাগল না হওয়া, ৩. বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

রোযা আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হল : ১. রোগমুক্ত থাকা, ২. মুকীম থাকা অর্থাৎ শরী'আতের বিধানমতে সফরে না থাকা, ৩. হায়িয অবস্থায় না থাকা, ৪. নিফাস অবস্থায় না থাকা। তবে রোগ, সফর এবং হায়িয ও নিফাসের ওযরের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে রোযা ফরয হবে না। কিন্তু পরে তার কাযা করতে হবে।[২১]

রোযা না রাখার অপকারিতা

রোযা ইসলামের একটি অন্যতম রুকন। আলিমগণের সর্বসম্মত মত হল রমযানের রোযা ফরযে আইন। যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়া অস্বীকার করবে সে কাফির।[২২] এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি বিনা ওযরে ইচ্ছাপূর্বক রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করে, অন্য সময়ের সারা জীবনের রোযা তার সমকক্ষ হবে না।[২৩]

কেউ রোযার প্রতি উপহাস বা বিদ্রূপমূলক আচরণ করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[২৪]

চাঁদ দেখার মাসাইল

শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখের সন্ধ্যা বেলায় রমযানের চাঁদ তালাশ করা মুসলমানগণের উপর ওয়াজিব। যদি চাঁদ দেখা যায় তবে পরবর্তী দিন রোযা রাখবে। আকাশ-মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে শাবান মাসকে ত্রিশ দিন গণনা করবে।[২৫]

এ ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ .

চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় তবে শাবান মাসকে ত্রিশদিন পূর্ণ করবে।[২৬]

চাঁদ না দেখা গেলে এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্যোতির্বিদের গণনাভিত্তিক অভিমত গৃহীত হবে না। এটি বিশুদ্ধতম সিদ্ধান্ত।[২৭]

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হল, সাক্ষ্যদানকারী যেন সত্যবাদী, ধর্মভীরু ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান হয়। চাই সে মহিলা হোক কিংবা পুরুষ হোক।[২৮]

এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তারা উভয়ে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা।[২৯]

রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানকালে শাহাদাত (সাক্ষ্যদান) শব্দটির উচ্চারণ শর্ত নয়। অনুরূপভাবে চাঁদ দেখার দাবি করা এবং এ ব্যাপারে কাযীর হুকুম প্রদান করাও শর্ত নয়।

যে ব্যক্তি চাঁদ দেখেছে তার নিকট চাঁদ দেখার ব্যাখ্যা তলব করার প্রয়োজন নেই। একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যখন রমযানের চাঁদ দেখবে তখন তার উপর জরুরী হবে এ রাতেই চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করা। সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা।[৩০]

যদি গ্রামাঞ্চলে কোন নির্ভরযোগ্য লোক চাঁদ দেখে তবে গ্রামের মসজিদে সে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের উপর তার কথামত রোযা রাখা ওয়াজিব।

কোন ব্যক্তি একা রমযানের চাঁদ দেখে সাক্ষ্য প্রদান করলে, তার সাক্ষ্য যদি গৃহীত না হয় তবুও তার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব। যদি সে ঐ দিন রোযা না রাখে, তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

চাঁদ দেখার পর যার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সে লোকটির ত্রিশটি রোযা পূর্ণ হয়ে গেলেও যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে সে একা রোযা রাখা পরিহার করবে না; বরং সকলের সাথে রোযা রাখবে ও ঈদ করবে।

আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তবে চাঁদ দেখার ব্যাপারে এমন সংখ্যক লোকের সাক্ষ্য প্রদান আবশ্যক হবে যাদের সংবাদের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা লাভ করা যায়। তাদের সংখ্যা কত হবে এর ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই।[৩১]

এই হুকুম রমযান, শাওয়াল ও যিলহজ্জের চাঁদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। শাওয়ালের চাঁদ রমযানের উনত্রিশতম দিনের সন্ধ্যায় তালাশ করবে।

শাওয়ালের চাঁদ দেখার সময় যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় কিংবা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে তবে চাঁদ দেখার ব্যাপারে দুইজন নির্ভরযোগ্য পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলার সাক্ষ্যগ্রহণ করা যাবে। সাক্ষীদানের সময় 'শাহাদাত' শব্দের উচ্চারণ করা শর্ত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় যদি এমন একটি গ্রামে দুইজন লোক শাওয়ালের চাঁদ দেখার সংবাদ দেয়, যেখানে কোন শাসক এবং কাযী নেই, তবে সেখানকার লোকজনের রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তবে দু'চারজনের সাক্ষ্যে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে না। অবশ্য যদি এত বেশি লোক চাঁদ দেখার প্রমাণ দেয় যে, যাদের সাক্ষ্য সত্য বলে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, তবে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে।

ঈদুল আযহার চাঁদের হুকুম ঈদুল ফিত্‌রের চাঁদের অনুরূপ। অন্যান্য চাঁদের ব্যাপারেও হুকুম অনুরূপ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় যদি দুইজন লোক রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষী প্রদান করে, আর কাযী বা প্রশাসক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ত্রিশটি রোযা রাখার পরও যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকুক অথবা পরিষ্কার থাকুক, সহীহ্ মতে উভয় অবস্থাতেই রোযা রাখা বন্ধ করবে।[৩২]

চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতার কোন মূল্য নেই। সুতরাং এক অঞ্চলের লোকজন যদি রমযানের চাঁদ দেখে, তাহলে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর রোযা রাখা সম্পর্কে ফয়সালা এই যে, যদি তা গ্রহণ করার ফলে মাস ২৮ বা ৩১ দিনের হয়ে যায় তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। যে সকল স্থানে চাঁদ একদিনে উদিত হওয়া সম্ভব সেখানে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সে এলাকার সব লোকের তা অনুসরণ করতে হবে, তবে এমন দূরাঞ্চলের বাসিন্দাদের উপর তা প্রযোজ্য হবে না যেখানে সেদিন চাঁদ দেখা বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব নয়।[৩৩]

একদল যদি এ কথার সাক্ষ্য দান করে যে, অমুক শহরের কাযীর নিকট দুই ব্যক্তি অমুক রাতে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করায় কাযী তাদের সাক্ষ্যের উপর চাঁদ দেখার ফায়সালা দান করেছেন। তাহলে ফায়সালা গ্রহণযোগ্য হবে।

কোন শহরবাসী রমযানের চাঁদ না দেখে রোযা রাখতে আরম্ভ করে তারপর আটাশ দিন রোযা রাখার পর শাওয়ালের চাঁদ দেখতে পায় তাহলে তার হুকুম হল, যদি তারা শাবানের চাঁদ ত্রিশ দিন গণনা করার পরও রমযানের চাঁদ দেখতে না পায় তবে তারা একটি রোযা কাযা করবে।

শুধুমাত্র তারযন্ত্রের সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে যদি তারযন্ত্রের সংবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয় তবে সেমতে আমল করা জায়িয আছে।[৩৪]

রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে চিঠিপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের সংবাদ এ শর্তে গ্রহণযোগ্য হয় যে, সংবাদদাতার লেখা অথবা কণ্ঠস্বর পূর্ণভাবে চেনা যায়। সংবাদদাতা লোকটি নির্ভরযোগ্য হতে হবে এবং সে নিজে চাঁদ দেখেছে বলে ঘোষণা করতে হবে। অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গিয়েছে অথবা রোযা রাখা হয়েছে এরূপ অস্পষ্ট সংবাদের কোন মূল্য নেই।

হ্যাঁ, রেডিও, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সংবাদ মাধ্যমে যদি এমন কোন নির্দিষ্ট সংস্থার অধীন থাকে যে, এসব মাধ্যম দ্বারা কোন ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য (আদিল) মুসলমানের অনুমতি ছাড়া সংবাদ প্রচার করতে পারে না। তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

শাবানের উনত্রিশতম দিবসে আকাশে মেঘ বা কুয়াশার কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায় তবে পরবর্তী দিন শাবানের ত্রিশ তারিখ, না রমযানের প্রথম তারিখ এরূপ সিদ্ধান্তহীনতাকে সন্দেহের দিন বলে।[৩৫]

এরূপ অনিশ্চিত দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে আলিমগণ ব্যতীত সাধারণ লোকের জন্য রোযা রাখা নিষিদ্ধ। সাধারণ লোকদের ব্যাপারে ফাতওয়া হল যে, তারা দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত রোযাদারদের মত খানাপিনা হতে বিরত থাকবে। চাঁদ দেখার সংবাদ পেলে তখনই রোযার নিয়্যাত করবে, অন্যথায় পানাহার করবে।

কিসের রোযা রাখছে, নির্দিষ্ট রোযার নিয়্যাত না করে সন্দেহের দিন রোযা রাখলে তা মাকরূহ হবে। অবশ্য ঐ দিন রমযান প্রমাণিত হলে রমযানের রোযা আদায় হবে। অন্যথায় নফল আদায় হবে।

যদি এরূপ নিয়্যাত করে যে, আগামীকাল রমযান হলে রোযা রাখব আর শাবান হলে রোযা রাখব না, তবে এরূপ নিয়্যাতকারী আদৌ রোযাদার হবে না।[৩৬]

সাহ্‌রী ও ইফ্‌তার

সাহ্‌রী খাওয়া সুন্নাত। সাহ্‌রী খাওয়াতে বরকত রয়েছে। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমরা সাহ্‌রী খাও। কারণ সাহ্‌রীর মধ্যে বরকত নিহিত রয়েছে।[৩৭]

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : আমাদের ও আহলে কিতাবের রোযার মধ্যে তফাৎ হল সাহ্‌রী খাওয়া।[৩৮]

সাহ্‌রীর সময় হল শেষরাত। ফকীহ্ আবুল লাইস (র) বলেন, সাহ্‌রীর সময় হল রাতের শেষ ষষ্ঠাংশ।

সাহ্‌রী বিলম্বে খাওয়া সুন্নাত। তবে সন্দেহের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ। অর্থাৎ এমন সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা যে সময় সাহ্‌রীর সময় আছে কিনা তাতে সন্দেহ জাগে। কোন কোন মানুষ মনে করে আযান না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া জায়িয। এটি একটি ভুল ধারণা। সুব্‌হে সাদিক হয়ে গেলে পানাহার জায়িয নয়, আযান হোক বা না হোক। এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত।[৩৯]

রমযান শরীফে সাহ্‌রী খাওয়ার পর সুব্‌হে সাদিকের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করা জায়িয। গোসল সুব্‌হে সাদিকের পরেও করা যায়। এতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না।[৪০]

কারো কারো ধারণা রোযার নিয়্যাত করার পর সাহ্‌রীর সময় বাকি থাকলেও আর কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়। এটি ভুল ধারণা। সুব্‌হে সাদিক হবার পূর্বে পানাহার ইত্যাদি জায়িয আছে, পূর্বে নিয়্যাত করুক বা না করুক।[৪১]

ইফ্‌তারের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফ্‌তার করা উত্তম। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : 'আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ বান্দাগণ যারা বিলম্ব না করে ইফ্‌তার করে।'

অন্য হাদীসে আছে, সে পর্যন্ত দীন ইসলাম বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ শীঘ্র ইফ্‌তার করবে। কেননা ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানরা বিলম্বে ইফ্‌তার করতো।[৪২] মাগরিব নামাযের পূর্বে ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব।

ইফ্‌তারের সময় এ দু'আ পড়া সুন্নাত :

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ۔

হে আল্লাহ্! আপনার জন্য আমি রোযা রেখেছি এবং আপনার রিয্‌কের দ্বারা ইফ্‌তার করছি।

রোযাদারকে ইফ্‌তার করানোর ফযীলত

হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফ্‌তার করাবে তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। ঐ রোযাদারের সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব সে লাভ করবে। তবে ঐ রোযাদারের সাওয়াবে কোন কম করা হবে না। (সাহাবায়ে কিরাম এ কথা শুনে বলেন) আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা সবাই রোযাদারকে ইফ্‌তার করাতে সক্ষম নই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : পানি মিশ্রিত এক চুমুক দুধ বা একটি শুকনো খেজুর অথবা একঢোক পানিদ্বারাও যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফ্‌তার করাবে, আল্লাহ্ তাকে এ পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পরিতৃপ্তভাবে খানা খাওয়াবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আমার হাউয (হাউযে কাউসার) হতে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে তৃষ্ণার্ত হবে না।[৪৩]

সাহ্‌রী ও ইফ্‌তার সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা

ক্ষুধা না থাকলেও সামান্য কিছু খেয়ে নিলে তাতে সাহ্‌রীর ফযীলত হাসিল হবে। কোন কারণে সাহ্‌রী না খেতে পারলেও রোযা রাখতে হবে। সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে গেলে বিলম্ব না করে ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব। বিলম্ব করা মাকরূহ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে কিছু বিলম্বে ইফ্‌তার করবে। যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় নিশ্চিত হবে তখন ইফ্‌তার করবে। খেজুরদ্বারা ইফ্‌তার করা উত্তম। তা না থাকলে কোন মিষ্টি জিনিসদ্বারা ইফ্‌তার করবে। তাও না থাকলে পানি বা অন্য কিছু দিয়ে ইফ্‌তার করবে।[৪৪]

রোযার প্রকারভেদ

রোযা আট প্রকার : ১. নির্দিষ্ট ফরয, ২. অনির্দিষ্ট ফরয, ৩. নির্দিষ্ট ওয়াজিব, ৪. অনির্দিষ্ট ওয়াজিব, ৫. সুন্নাত, ৬. মুস্তাহাব, ৭. মাকরূহ তানযিহী, ৮. মাকরূহ তাহ্‌রীমী।[৪৫]

১. রমযানের রোযা হল নির্দিষ্ট ফরয।

২. অনির্দিষ্ট ফরয রোযা হল, রমযানের কাযা রোযা এবং সর্বপ্রকার কাফ্‌ফারার রোযা। কারণ এসব রোযা কোন বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। কাফ্‌ফারার রোযা আমল হিসাবে ফরয।[৪৬]

এমনভাবে বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়নি যে, তার ফরযিয়াত অস্বীকার করলে কাফির হবে; যেভাবে অন্যান্য ফরযসমূহের বেলায় প্রমাণিত আছে, যেমন রমযান ইত্যাদি। সুতরাং কাফ্ফারার রোযাকে ওয়াজিব রোযার শ্রেণীভুক্ত করা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। (শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২)

৩. নির্দিষ্ট ওয়াজিব রোযা : যথা নির্ধারিত দিনের মানতের রোযা। যেমন : কেউ মানত করল যে, বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখবে।

৪. অনির্দিষ্ট ওয়াজিব রোযা : যথা নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ না করে রোযা রাখার মানত করা। নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলার পর তা কাযা করা এবং মানত ই'তিকাফের রোযা রাখাও ওয়াজিব রোযার অন্তর্ভুক্ত।

৫. সুন্নাত রোযা : যেমন আশূরার রোযা। তবে শুধু আশূরার দিন রোযা না রেখে এর সাথে নয় বা এগার তারিখে রোযা রাখা উত্তম।

৬. মুস্তাহাব রোযা : যেমন প্রতি মাসে আইয়ামে বীযের রোযা অর্থাৎ প্রতি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা, জুমু'আর দিনের রোযা এবং আরাফার দিনের রোযা ইত্যাদি।

৭. মাকরূহ তাহ্রীমী যা কার্যত হারাম রোযা : যেমন দুই ঈদের দিন ও আইয়ামের তাশরীকের (যিলহজ্জের ১১, ১২, ১৩ তারিখে) রোযা রাখা।

৮. মাকরূহে তানযীহী রোযা : যেমন, কেবলমাত্র আশূরার দিন রোযা রাখা। কারণ এতে ইয়াহূদীদের সাথে সামঞ্জস্য হয়। শুধুমাত্র শনিবার রোযা রাখা। কারণ তাতেও ইয়াহূদীদের সাথে মিল হয়ে যায়। শুধুমাত্র সৌরবর্ষের প্রথম দিনে (নওরোয) রোযা রাখা। পারসিকগণের উৎসবের দিন রোযা রাখা ইত্যাদি।[৪৭]

রোযার নিয়্যাত

রমযানের রোযার নিয়্যাত রাত হতে দুপুরের ঘন্টাখানেক পূর্বে যে কোন সময়ে করে নিলে তা সহীহ্ হবে। তবে রাতে করাই উত্তম। সুব্হে সাদিক হতে দুপুরের একঘন্টা পূর্বে এ নিয়্যাত সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হল, সুব্হে সাদিকের পর সর্বপ্রকার পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।[৪৮]

কোন মুকীম ব্যক্তি রমযানের দিন যদি নফল রোযা বা অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যাত করে তবে তার রমযানের রোযাই আদায় হবে। কারণ তা শরী'আতের পক্ষ হতে নির্ধারিত। অবশ্য কোন মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তি রমযানের দিনে অন্য কোন রোযার নিয়্যাত করলে তা আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তি যদি কেবল রোযারই নিয়্যাত করে কোন ওয়াজিব বা কাযার নিয়্যাত না করে অথবা নফল রোযার নিয়্যাত করে, তবে রমযানের রোযাই আদায় হবে।[৪৯]

কারো উপর পূর্ববর্তী রমযানের কাযা ওয়াজিব থাকা অবস্থায় পরবর্তী রমযানে এসে গেলে সে এই রমযানের রোযাই রাখবে। এ ক্ষেত্রে কাযার নিয়্যাত করলেও রমযানের রোযাই আদায় হবে। ঈদের পরে পূর্ববর্তী রোযার কাযা করবে।[৫০]

কাযা রোযার জন্য রাতে নিয়্যাত করা এবং তখনই তা নির্দিষ্ট করা শর্ত। কেউ কাযা রোযার নিয়্যাত দিনের বেলা করলে তার রোযা নফল হয়ে যাবে। এরূপ নফলকে পূর্ণ করা

মুস্তাহাব। ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা করতে হবে না।[৫১] ওযরের কারণে যে সকল রোযা রাখা সম্ভব হয়নি, রমযানের পর যত শীঘ্র সম্ভব তার কাযা আদায় করতে হবে, বিনা কারণে বিলম্ব করা গুনাহ্। রোযা কাযার বেলায় এরূপ দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে কাযা করা জরুরী নয় যে, আমি অমুক তারিখের রোযা রাখছি। যত সংখ্যক রোযা কাযা হয়েছে, ততটি আদায় করলেই হয়ে যাবে। অবশ্য দু'বছরের রোযা কাযা হলে বছর এভাবে নির্দিষ্ট করা জরুরী যে, আমি অমুক বছরের রোযার কাযা করছি।

যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে, তা একসাথে বা ভিন্ন ভিন্নভাবেও রাখা যায়। কাফ্ফারার রোযার নিয়্যাতও রাতে করা জরুরী। দিনে কাফ্ফারার রোযার নিয়্যাত করলে কাফ্ফারার রোযা আদায় হবে না।[৫২]

নির্দিষ্ট দিনের মানতের রোযার নিয়্যাত রাতে করা শর্ত নয়, বরং দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা খানেক পূর্বে নিয়্যাত করলেই তা জায়িয হবে।[৫৩]

নির্দিষ্ট মানতের রোযা কোন কারণবশত সেদিনে আদায় করতে না পারলে এর কাযা আদায় করার সময় রাতেই নিয়্যাত করা শর্ত।[৫৪]

অনির্দিষ্ট মানতের রোযা, নফল রোযা, কাযা রোযা এসবের নিয়্যাত রাতেই করা শর্ত এবং নির্দিষ্টভাবে নিয়্যাত করতে হবে যে, সে কিসের রোযা রাখছে।[৫৫]

রোযা বা অন্য কোন ইবাদতের মানত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।[৫৬]

মানত পূর্ণ না করলে গুনাহ্গার হবে। কেউ যদি জুমু'আর দিনে রোযা রাখার মানত করে ঐ দিনের শুধু রোযা রাখার নিয়্যাত করে কিন্তু নির্দিষ্ট না করে যে, এটি মানতের রোযা, না নফল রোযা, অথবা শুধু নফল রোযার নিয়্যাত করে, তাহলে তার মানতের রোযা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি এদিন মানতের রোযার কথা স্মরণ না থাকায় অথবা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা করে কাযা রোযার নিয়্যাত করে, তবে এ কাযা রোযাই আদায় হবে। পরবর্তীতে মানতের রোযা আদায় করবে।[৫৭]

ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া সুন্নাত, নফল ও মানদূব রোযা নফল রোযার অন্তর্ভুক্ত। নফল রোযার নিয়্যাত রাত হতে দুপুরের এক ঘণ্টার পূর্ব পর্যন্ত করা জায়িয। সুব্হে সাদিকের পূর্বে নিয়্যাত করা শর্ত নয়। শুধুমাত্র একটুকু নিয়্যাত করলে নফল রোযা আদায় হয়ে যাবে যে, আমি রোযা রাখছি। নফল রোযা রাখছি বলে নিয়্যাতকে নির্দিষ্ট করার দরকার নেই।[৫৮]

নফল রোযা কোন কারণে ভঙ্গ হয়ে গেলে তার কাযা আদায় করার সময় নিয়্যাত নির্দিষ্ট করা ও রাতে নিয়্যাত করা শর্ত।[৫৯] নফল রোযা রাখার পর কেউ যদি তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর এ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে।

নিষিদ্ধ পাঁচ দিনে রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা ওয়াজিব হবে না। নফল রোযা শুরু করে বিনা ওযরে ভেঙ্গে ফেলা ঠিক নয়। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। রমযানের কাযা রোযার মত সকল প্রকার কাফ্ফারার রোযার বেলায়ও রাত থাকতেই নিয়্যাত করা ও নির্দিষ্ট করা শর্ত।[৬০]

কাফ্ফারা একমাত্র ওয়াজিব হয় রমযানের আদায় রোযা ইচ্ছাপূর্বকভাবে ভঙ্গ করলে। রমযানের কাযা রোযা বা অন্য রোযা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না। রমযানের রোযার

কাফ্‌ফারা হল একাধারে দুই মাস রোযা রাখা। কোন কারণে মধ্য হতে দু'এক রোযা না রাখতে পারলে আবার পুনরায় দুই মাস রোযা রাখতে হবে। মহিলাগণের হায়িযের কারণে কিছু রোযা ছুটে গেলে এ কারণে কাফ্‌ফারার রোযা আদায়ে ব্যাঘাত ঘটবে না। তবে পবিত্রতা লাভের পরপরই বাকি রোযা পূর্ণ করে নিতে হবে। নিফাসের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ ক্ষেত্রে নতুনভাবে আবার ষাটটি রোযা রাখতে হবে।

কাফ্‌ফারার রোযা আদায়কালে রমযান মাস এসে গেলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। রোযা রাখতে কেউ সক্ষম না হলে ষাটজন মিস্‌কীনকে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা পেটভরে খাওয়াবে। আহার না করিয়ে ষাটজন মিস্‌কীনকে সাদাকায়ে ফিত্‌র পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দিয়ে দিলেও তাও জায়িয। এমনিভাবে এর সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে দেওয়া জায়িয।[৬১]

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ দুই প্রকার : ১. যেসব কারণে শুধুমাত্র কাযা ওয়াজিব হয়; ২. যে সব কারণে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

যেসব কারণে রোযার কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয় ওয়াজিব হয়

রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক সহবাস করলে তার উপর কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়। এতে বীর্য নির্গত হওয়া শর্ত নয়। এ ব্যাপারে মহিলাও যদি ইচ্ছুক ও অনুগত থাকে, তবে তার উপরও কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। অনিচ্ছুক মহিলার সাথে জোরপূর্বক সহবাস করা হলে এরূপ মহিলার উপর কেবল কাযা ওয়াজিব হবে।

রোযাদার ব্যক্তি যদি খাদ্যদ্রব্য বা ঔষুধ ইচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করে তবে তার উপর কাফফারা ও কাযা ওয়াজিব হবে। অনিচ্ছাপূর্বক খাদ্য বা ঔষধ গ্রহণ করলে তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। সুতরাং রোযাদার ব্যক্তিটি যদি রুটি, খাদ্যজাত দ্রব্যাদি, ফল-ফলাদি, পানি ও পানীয় বস্তু, তেল, দুধ, মিশ্‌ক, জাফরান বা কর্পূর খেয়ে ফেলে, তবে তার উপর কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।[৬২]

কেউ রক্ত পান করলে যাহিরী রিওয়ায়াত মতে, কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু রক্ত পানে অভ্যস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।[৬৩]

সুব্‌হে সাদিক না হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাসের উপর কেউ সাহ্‌রী খেল অথচ তখন সুব্‌হে সাদিক হয়ে গিয়েছে অথবা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাসের উপর ইফ্‌তার করল কিন্তু আসলে তখন সূর্য অস্ত যায়নি। এ অবস্থায় ঐ লোকের উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। সুব্‌হে সাদিক হওয়ার প্রবল ধারণা সত্ত্বেও কেউ সাহ্‌রী খেয়ে নিলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। আর সূর্য অস্ত না যাওয়ার প্রবল ধারণা সত্ত্বেও কেউ ইফ্‌তার করে ফেললে তার উপর কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

একটি রোযা ভেঙ্গে ফেলার পর কেউ যদি এর কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বে আরেকটি রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবুও তার উপর একটিমাত্র কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। কেউ যদি দুই রমযানে দু'টি রোযা ভঙ্গ করে, তবে তার উপর প্রতি রোযা ভঙ্গের জন্য একটি করে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।[৬৪]

যেসব কারণে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

কামভাবের সাথে কোন মহিলাকে চুম্বন অথবা স্পর্শ করার পর বীর্য নির্গত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কেবলমাত্র ঐ পুরুষের উপর কাযা ওয়াজিব হবে। জোরপূর্বক কেউ খাইয়ে দিলে কিংবা সাবধানতা সত্ত্বেও হঠাৎ কিছু খেয়ে ফেললে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে এবং এতে কাযা ওয়াজিব হবে। পানীয়ের ব্যাপারে একই হুকুম।

ঘুমন্ত বা পাগল মহিলার সাথে তার স্বামী সহবাস করলে তাদের উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।[৬৪]

মুখে পান নিয়ে ঘুমিয়ে সুব্হে সাদিকের পর জাগ্রত হলে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে এবং তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে।[৬৫]

মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঔষধ ঢুকালে কিংবা কান দিয়ে ঔষধ ঢাললে রোযার কাযা ওয়াজিব হবে।[৬৭] কানের ভিতর তেলের ফোঁটা ঢাললে রোযা ভঙ্গ হয় আর পানির ফোঁটা ঢাললে রোযা ভঙ্গ হয় না।[৬৮]

পেটে বা মাথার ক্ষতস্থানে ঔষধ ঢাললে তা পেটে বা মাথায় পৌঁছে গেলে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে এবং এর কাযা ওয়াজিব হবে।[৬৯]

অনিচ্ছাকৃত মুখভরে বমি হলেও তাতে রোযা ফাসিদ হয় না। মুখভরে বমি হলে তা যদি পুনঃ পেটে ঢুকানো হয় তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এমনিতেই ঢুকে যায় তবে রোযা ফাসিদ হবে না। আর যদি তা ইচ্ছা করে ফিরানো হয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না, এটাই শুদ্ধ মত। যদি ইচ্ছা করে কেউ বমি করে এবং তা মুখভরে হয়, তবে তার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। ইচ্ছা করে মুখমভরে বমি না করলেও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না।[৭০]

লোবান ইত্যাদির ধোঁয়া শুকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। হুক্কা পান করলেও রোযা ভঙ্গ হয়। আতর গোলাপ ইত্যাদি যেগুলোর মধ্যে ধোঁয়া নেই সেগুলোর সুগন্ধি শুকলে রোযা ভঙ্গ হয় না।[৭১]

কোন লোক যদি রোযাদারের প্রতি কিছু নিক্ষেপ করে আর তা গলায় প্রবেশ করে তবে এতে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। অনুরূপ গোসলের সময় যদি গলায় পানি ঢোকে এতেও রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে।

দাঁতের ভিতর আটকে থাকা জিনিস খেয়ে ফেললে যদি তা বুট পরিমাণ হয় তবে রোযা ফাসিদ হবে আর এ চেয়ে ছোট হলে রোযা ফাসিদ হবে না। তবে যদি তা বের করে আবার খেয়ে ফেলে, তবে ফাসিদ হয়ে যাবে।[৭২]

রোগের কারণে কোন লোকের মুখ হতে পানি বের হয়ে আবার তা মুখের ভিতর প্রবেশ করে গলায় চলে গেলে তার রোযা ফাসিদ হয় না।

দাঁত হতে রক্ত বের হয়ে গলায় চলে গেলে যদি রক্ত হতে থুথু বেশি হয় তবে রোযার কোন ক্ষতি নেই, আর যদি রক্তের পরিমাণ বেশি বা সমান হয় তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে।

বৃষ্টির পানি ও বরফ গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ফাসিদ হয়। এক-দুই ফোঁটা চোখের পানি মুখের ভিতর প্রবেশ করলে রোযা ফাসিদ হয় না। অনেকগুলো মুখের ভিতর জমে গেলে যদি সারা মুখে লবণাক্ততা অনুভব হয় আর তা জমা করে গিলে ফেলে, তবে রোযা ফাসিদ হবে।

ইস্‌তিনজার সময় যদি অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ফলে যদি পানি পায়খানার রাস্তা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে।[৭৩]

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

রোযার কথা ভুলে গিয়ে রোযাদার ব্যক্তি যদি পানাহার করে বা সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না, রোযা নফল হোক আর ফরয হোক।

এক ব্যক্তি দেখতে পেল এক রোযাদার ব্যক্তি ভুলক্রমে খানা খাচ্ছে। লোকটি যদি এরূপ সবল হয় যে রাত পর্যন্ত তার পক্ষে রোযা পূর্ণ করা সম্ভব, তবে ঐ রোযাদারকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে না দেয়া মাকরূহ্। বয়োঃবৃদ্ধতার ফলে লোকটি যদি দুর্বল হয়, তবে তাকে স্মরণ করিয়ে না দেয়ার অনুমতি আছে।

কুলি করার ও নাকে পানি দেয়ার সময় যদি পানি পেটের ভিতর চলে যায় এমতাবস্থায় যদি রোযার কথা স্মরণ না থাকে তবে ফাসিদ হয় না। আর যদি রোযার কথা স্মরণ থাকে তবে রোযা ফাসিদ হয়।

দাঁতের ফাঁকে বুটের চেয়ে ছোট কিছু থাকলে তা গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হয় না। গমের একটি দানা চিবালে রোযা ফাসিদ হয় না। কুলি করার পর পানির আর্দ্রতা মুখে বাকি থাকলে তা থুথুর সাথে গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হয় না। যে জিনিস খাদ্যদ্রব্য নয় আর তা হতে সাধারণত বেঁচে থাকা যায় না, যেমন মশা-মাছি ইত্যাদি গলার ভিতরে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না। ধুলোবালি এবং ধোঁয়া গলার ভিতর চলে গেল তাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। এক-দুই ফোঁটা চোখের পানি মুখে প্রবেশ করলে, মুখমণ্ডলের ঘাম মুখে প্রবেশ করলে অথবা লোমকূপ দিয়ে তেল শরীরের ভেতর প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। চোখে ঔষধের ফোঁটা ঢাললে তার স্বাদ গলায় চলে গেলেও রোযা ফাসিদ হয় না। থুথু ফেলার সময় থুথুতে সুরমার লক্ষণ এবং তার রঙ দেখা গেলে রোযা ফাসিদ হয় না।

কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অথবা সহবাসের ধ্যান করার ফলে বীর্য নির্গত হলে রোযা ফাসিদ হবে না। স্ত্রীকে স্পর্শ করার পর তার শরীরে উষ্ণতা অনুভব করার ফলে বীর্য নির্গত হলে রোযা ফাসিদ হবে। শরীরের উষ্ণতা অনুভব না করলে ফাসিদ হবে না।

পানিতে ডুব দেয়ার ফলে কানে পানি প্রবেশ করলে রোযা ফাসিদ হয় না।[৭৪]

তীর পেটের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে গেলে রোযা ফাসিদ হয় না।

কেউ পান খেয়ে ভালভাবে কুলি গরগরা করে মুখ পরিষ্কার করা সত্ত্বেও থুথু লাল থেকে গেলে এতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না।

রাতে গোসলের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও দিনে গোসল করলে রোযার ক্ষতি হবে না। সারা দিনের মধ্যে গোসল না করলেও রোযা ভঙ্গ হবে না, তবে গুনাহ্‌গার হবে।[৭৫] শরীরে ইনজেক্‌শন নিলে রোযা ফাসিদ হয় না।[৭৬]

যেসব কারণে রোযা মাকরূহ হয় এবং যেসব কারণে মাকরূহ হয় না

বিনা ওযরে কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা ও চিবানো মাকরূহ। স্বামী যদি বদমেজাজী হয় তাহলে স্ত্রীর জন্য খাদ্যের স্বাদ জিহ্‌বাদ্বারা পরীক্ষা করে নেওয়া মাকরূহ নয়। অনুরূপভাবে অনন্যোপায় হয়ে শিশুর খাদ্য চিবিয়ে দিলে রোযা মাকরূহ হবে না।[৭৭]

ইস্‌তিন্‌জার সময় অধিক মাত্রায় পানির ব্যবহার রোযাদারের জন্য মাকরূহ।

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় এমনভাবে পানি ব্যবহার করা যে, পানি ভিতরে প্রবেশ করার আশঙ্কা হয় এভাবে করা মাকরূহ।[৭৮]

পানিতে বায়ু নিঃসরণ করা মাকরূহ। রোযা অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক মুখে থুথু জমা করে তা গিলে ফেলা মাকরূহ। রোযাদার ব্যক্তির জন্য দিনের যে কোন সময় মিস্‌ওয়াক করা জায়িয এতে রোযার কোন ক্ষতি নেই।

চোখে সুরমা লাগানো এবং গোঁফে তেল মাখা রোযাদারের জন্য মাকরূহ নয়। তবে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য এরূপ করা রোযাদার-অরোযাদার সবার জন্যই মাকরূহ।[৭৯]

এমনভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার যদি আশঙ্কা না হয় যার ফলে রোযা ভঙ্গ করতে হয়, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য শরীরে শিঙ্গা লাগানো জায়িয। রোযা ভঙ্গ করার মত দুর্বলতার আশঙ্কা হলে শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ।[৮০]

যদি কোন রোযাদার নিজের উপর এরূপ আত্মবিশ্বাসী হয় যে, চুম্বন করলে বীর্য নির্গত হবে না বা সহবাসের প্রতি আসক্ত হবে না, তবে এরূপ রোযাদারের জন্য চুম্বন করা মাকরূহ নয়; অন্যথায় মাকরূহ। অনুরূপ হুকুম হল স্পর্শ করার। দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে কোন ক্ষতি নেই। সন্দেহের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে সাহ্‌রী খাওয়া মাকরূহ। সাওমে বিসাল মাকরূহ। সাওমে বিসাল হল, সাহ্‌রী ও ইফ্‌তার গ্রহণ ছাড়া একাধিক দিনের রোযা রাখা। তবে সাওমে দাউদী অর্থাৎ একদিন বিরতি দিয়ে একদিন রোযা রাখা উত্তম।

রোযা রেখে কথাবার্তা পরিত্যাগ করা মাকরূহ। স্বামী অসুস্থ, রোযাদার বা অনুপস্থিত না থাকলে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা মাকরূহ। রোযায় কষ্ট হলে মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা মাকরূহ। কষ্ট না হলে রোযা রাখা উত্তম। হজ্জব্রত পালনকারী ব্যক্তি রোযা রাখলে দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা হলে আরাফা ও তার পূর্বের দিনে রোযা রাখা মাকরূহ।[৮১]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এ মতে, রোযা অবস্থায় মুখে পানি নিয়ে বারবার কুলি করা, মাথায় পানি ঢালা এবং ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা মাকরূহ।[৮২]

কয়লা ও মাজনদ্বারা দাঁত মাজা মাকরূহ। মাজনের সামান্য কিছু অংশ গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ফাসিদ হয়ে যায়।[৮৩]

যেসব অবস্থায় রোযা না রাখা জায়িয

অসুস্থ ব্যক্তি যদি রোযা রাখার কারণে কোন শারীরিক গুরুতর ক্ষতি বা মৃত্যুর আশঙ্কা বোধ করে, তবে এ অবস্থায় রোযা রাখবে না। সুস্থ হওয়ার পর কাযা করবে। তবে শুধু মনের ধারণায় রোযা রাখা ত্যাগ করা দুরস্ত নয়; বরং যখন কোন দীনদার ডাক্তার বলবে রোযা রাখলে

ক্ষতি হবে অথবা নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা কোন লক্ষণদ্বারা প্রবল ধারণা জন্মে যে, রোযা রাখলে ক্ষতি হবে, তখন রোযা রাখা ত্যাগ করা যাবে।[৮৪]

সফর অবস্থায় রোযা না রাখা জায়িয। মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখা কষ্টকর না হলে সফরের অবস্থায় রোযা রাখা উত্তম। অন্যথায় রোযা না রাখা উত্তম। তবে পরে কাযা করতে হবে।

গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মহিলা যদি নিজের প্রাণের কিংবা সন্তানের প্রাণের ব্যাপারে শংকিত হয় তাহলে রোযা না রাখা জায়িয, তবে পরে কাযা করে নিবে।[৮৫]

মহিলাদের হায়িয ও নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা জায়িয নয়। রাতে হায়িয ও নিফাস হতে পবিত্রতা লাভ করলে গোসল না করলেও পরবর্তী দিনের রোযা রাখবে। সুব্হে সাদিকের পর ঋতু বন্ধ হলে ঐ দিনের রোযা রাখবে না। তবে পানাহার থেকে বিরত থাকবে।

কেউ দিনের বেলায় মুসলমান হলে কিংবা বালিগ হলে তার উপর ঐ দিনের রোযা ফরয নয়। তবে দিনের বেলা পানাহার করা থেকে তারা বিরত থাকবে।[৮৬]

অতিবৃদ্ধ হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি রোযা রাখতে অক্ষম তার জন্য রোযা না রাখা জায়িয। প্রতিটি রোযার বিনিময়ে সে একজন মিসকীনকে সাদাকায়ে ফিত্‌র পরিমাণ খাদ্য প্রদান করবে অথবা দু'বেলা পেটভরে খানা খাওয়াবে। খাদ্য দেওয়ার পরিবর্তে এর মূল্য দেয়াও জায়িয।[৮৭]

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয

হঠাৎ কেউ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, রোযা রাখলে প্রাণের আশঙ্কা কিংবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়িয।

অনুরূপ সাপে দংশন করলে ঔষধ সেবনের জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়িয।[৮৮]

গর্ভবতী মহিলা রোযা রাখলে যদি তার নিজের অথবা পেটের বাচ্চার মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা করে তবে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়িয।[৮৯]

রোযার ফিদ্‌ইয়া

যে ব্যক্তি বার্ধক্যের এই পর্যায়ে চলে গেছে যে, তার রোযা রাখার ক্ষমতা নেই কিংবা এরূপ অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, তা হতে আরোগ্য লাভের আশা নেই, রোযা রাখারও সামর্থ্য নেই; এরূপ ব্যক্তি রোযা না রেখে প্রতিটি রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীনকে সাদাকায়ে ফিত্‌রের সমান খাবার দেবে অথবা সকাল-সন্ধ্যা পেটভরে তাকে খানা খাওয়াবে, শরী'আতে একে ফিদ্‌ইয়া বলা হয়। খাদ্যের বদলে এ পরিমাণ খাদ্যের মূল্য দিয়ে দেয়াও জায়িয আছে।[৯০]

কেউ যদি সারা জীবন রোযা রোখার মানত করে, তারপর যদি সে অতি দুর্বল হয়ে পড়ে তবে সেও ফিদ্‌ইয়া দিবে।[৯১] ফিদ্‌ইয়া রমযানের শুরুতে একবারে বা রমযানের শেষে একসঙ্গে উভয় পদ্ধতিতে দেওয়া যায়। ফিদ্‌ইয়া দেওয়ার পর যদি রোযা রাখতে সক্ষম হয়ে যায় তবে আদায়কৃত ফিদ্‌ইয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তির উপর কাযা রোযা রাখা ওয়াজিব হবে।

অসুস্থতা বা সফরের কারণে যদি কেউ রমযানের রোযা রাখতে না পারে এবং ঐ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার উপর এ রোযাগুলোর কাযা ওয়াজিব হবে না। এতদসত্ত্বেও যদি সে

ফিদ্ইয়া আদায়ের অসিয়্যাত করে যায় তবে এ অসিয়্যাত জায়িয হবে। ওয়ারিসগণ তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হতে তা আদায় করবে।

অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা মুসাফির বাড়ি ফিরে এলে যদি এই পরিমাণ সময় পায় যাতে সে কাযা রোযা রাখতে পারে, তাহলে তার উপর এ রোযাগুলোর কাযা করা ওয়াজিব হবে। যদি তার কাযা আদায়ের পূর্বেই মারা যাওয়ার উপক্রম হয় তবে তার উপর ওয়াজিব হল ফিদ্ইয়া দানের অসিয়্যাত করে যাওয়া।

অসিয়্যাত না করে মারা গেলে এ অবস্থায় ওয়ারিসগণ যদি তার পক্ষে নফল হিসেবে ফিদ্ইয়া আদায় করে দেয়, তাহলে তা জায়িয হবে। কিন্তু অসিয়্যাত করা ছাড়া তাদের জন্য তা আদায় করা ওয়াজিব নয়।[৯২]

নামাযের ফিদ্ইয়াও রোযার ফিদ্ইয়ার অনুরূপ। বিত্র নামাযের ফিদ্ইয়াও আদায় করতে হয়।

ই'তিকাফ

ই'তিকাফের শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। শরী'আতের পরিভাষায় 'ই'তিকাফ' বলা হয়, পুরুষের জন্য নিয়্যাতসহ এমন মসজিদে অবস্থান করা যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। আর মহিলাদের জন্য ই'তিকাফ হল, নিয়্যাতসহ ঘরের ভিতর নামাযের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থানে অবস্থান করা।[৯৩]

ই'তিকাফ তিন প্রকার। যথা : ১. ওয়াজিব, ২. সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্, ৩. মুস্তাহাব।

ই'তিকাফের শর্তাবলী

নিয়্যাত করা : বিনা নিয়্যাতে ই'তিকাফ করলে সহীহ্ হবে না। এমন মসজিদে ই'তিকাফ করা যেখানে নামাযের জামা'আত হয়। ই'তিকাফের জন্য সর্বোচ্চ স্থান হল মসজিদুল হারাম অতঃপর মসজিদে নববী (সা)। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাসে, তারপর জামে মসজিদ এবং এরপর যে মসজিদের মুসল্লী সংখ্যা বেশি। মহিলা তার গৃহে নামাযের স্থানে ই'তিকাফ করবে।

মানতের ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। নফল ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। নফল ই'তিকাফের জন্য নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ নেই। অল্প সময়ের জন্যও নফল ই'তিকাফ করা যায়। মসজিদে ই'তিকাফের নিয়্যাতের সাথে অবস্থান করাই উত্তম। কেউ যদি রমযানের ই'তিকাফের মানত করে তাহলে তার এ মানত সহীহ্ হবে। মানত করার পর যদি সে শুধু রমযানের রোযা রাখে, ই'তিকাফ না করে, তবে তার উপর অন্য এক মাসে রোযাসহ লাগাতার ই'তিকাফের কাযা করা ওয়াজিব। পরবর্তী রমযানে ঐ ই'তিকাফের কাযা করলে তা আদায় হবে না।[৯৪]

ই'তিকাফ সহীহ্ হওয়ার শর্ত হল, মুসলমান হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, জানাবাত এবং হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া। বালিগ হওয়া ই'তিকাফ সহীহ্ হওয়ার জন্য কোন শর্ত নয়। তাই জ্ঞানবান নাবালিগের জন্যও ই'তিকাফ সহীহ্ হবে। মহিলাদের জন্য স্বামীর অনুমতি নিয়ে ই'তিকাফ করা জায়িয। অনুমতি দেওয়ার পর স্বামী তাকে ই'তিকাফ থেকে বারণ করতে পারবে না।[৯৫] মহিলাদের জন্য মসজিদের ই'তিকাফ করা নাজায়িয। (বুখারী ১ : ২৭২ পৃ.)

ই'তিকাফের আদব

ই'তিকাফের অবস্থায় নেকের কথা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা। শ্রেষ্ঠ মসজিদকে ই'তিকাফের জন্য নির্বাচন করা। যেমন : মাসজিদুল হারাম, জামে মসজিদ ইত্যাদি।

ই'তিকাফের অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা, হাদীস পাঠ করা, ইল্‌ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া, রাসূলুল্লাহ (সা) ও অন্যান্য নবীর সীরাত পাঠ করা ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি লেখা।[৯৬]

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের নিমিত্ত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইবাদতে নিয়োজিত রাখবে এবং দুনিয়াদারী কাজ-কর্ম থেকে দূরে থাকবে।

ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণসমূহ

বিনা ওযরে মসজিদ হতে বের হওয়া। বিনা ওযরে দিনে বা রাতে সামান্য সময়ের জন্য মসজিদ হতে বের হলেও ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যায়, ইচ্ছা করে বের হোক কিংবা ভুলক্রমে। অনুরূপভাবে মহিলা তার ঘরের নির্ধারিত স্থান থেকে বের হবে না। পেশাব-পায়খানা ও জুমু'আর নামায আদায় ইত্যাদি ওযরের কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয। ই'তিকাফের স্থানেই ঘুমাবে ও পানাহার করবে। এর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই।[৯৭]

মসজিদ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে অথবা জোরপূর্বক বের করে দেওয়ার কারণে ই'তিকাফকারী ব্যক্তি যদি মসজিদ হতে বের হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য মসজিদে চলে যায়, তবে এতে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না।

জান বা মালের আশঙ্কা হলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার জন্য মসজিদ হতে বের হবে না। কোন মৃত ব্যক্তিকে দেখার উদ্দেশ্যে বা তার জানাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে ই'তিকাফ হতে বের হলে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। পানিতে ডুবন্ত বা আগুনে পড়া কোন মানুষকে রক্ষা করার জন্য মসজিদ থেকে বের হলেও ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে অসুস্থতার কারণে সামান্য সময়ের জন্য মসজিদ হতে বের হলেও ই'তিকাফ ফাসিদ হবে। অবশ্য ই'তিকাফের মানতের সময় যদি রোগীর সেবা, জানাযার নামায ও ইলমের মজলিসে যাওয়ার শর্ত করে, তা হলে এসব তার জন্য জায়িয।

ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মুয়ায্‌যিন হোক বা অন্য কেউ হোক, মিনারে আরোহণ করলে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। মিনার মসজিদের বাইরে হলেও। ই'তিকাফ ফাসিদ হওয়ার একটি কারণ হল, সহবাস্‌ বা সহবাসের দিকে আকৃষ্টকারী কাজ, তা দিনেই হোক বা রাতেই হোক। স্বপ্নদোষে ই'তিকাফ ফাসিদ হয় না। কয়েক দিন পাগল বা বেহুঁশ থাকার ফলে লাগাতার ই'তিকাফ করতে না পারলে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যায়।

ই'তিকাফে নিষিদ্ধ কাজসমূহ

চুপ থাকাকে ইবাদত মনে করে চুপ থাকলে ই'তিকাফ মাকরূহ হয়। অন্যথায় মুখের গুনাহ্‌সমূহ হতে চুপ থাকা বড় ইবাদত।

ই'তিকাফকারী লোক দিনের বেলা ভুলক্রমে পানাহার করলে কোন ক্ষতি নেই। ই'তিকাফের স্থানকে ব্যবসাস্থল বানানো মাকরূহ্‌। ওয়াজিব ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে গেলে তার কাযা করা

ওয়াজিব। ফাসিদ সে নিজে করুক কিংবা হায়িয-নিফাস ইত্যাদির কারণে ফাসিদ্ হোক। নিজের উপর ই'তিকাফ ওয়াজিব করতে মুখে উচ্চারণ করা উচিত। মনে মনে সংকল্প করলে চলে না।[১৮]

লাইলাতুল কাদ্‌র

কাদ্‌রের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। রমযান শরীফে বিশেষ এক রাতকে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' বলা হয়। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' বলা হয়।

কাদ্‌রের আরেক অর্থ তাক্‌দীর। এ রাতে পরবর্তী এক বছরের নির্ধারিত লিপি ব্যবস্থাপক ও ফিরিশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের হায়াত, মউত, রিয্‌ক ইত্যাদির বিবরণ থাকে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, 'শব-ই-কাদ্‌র' সারা বছরে অনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায়। অধিকাংশ আলিমের মতে রমযানের শেষ দশদিনের মধ্যে বেজোড় রাতগুলোতে রয়েছে 'লাইলাতুল কাদ্‌র। বিশেষত সাতাশে রাতে এর সম্ভাবনা অধিক।

'লাইলাতুল কাদ্‌র' খুবই ফযীলতপূর্ণ রাত। একে সন্ধান করা মুস্তাহাব। তা বছরের সর্বোত্তম রাত। এ রাত অন্য সময়ের এক হাজার মাস থেকেও উত্তম।

সাদাকাতুল ফিত্‌র

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' ওয়াজিব।

এরূপ সম্পত্তি বর্ধনশীল হওয়া জরুরী নয়। গম, গমের আটা, যব, যবের আটা এবং খেজুর ও কিসমিসদ্বারা ফিত্‌রা আদায় করা যায়। গম বা গমের আটাদ্বারা ফিত্‌রা আদায় করলে গম অর্ধ সা' (১ কেজি ৬৫০ গ্রাম) এবং যব বা যবের আটা কিংবা খেজুর দিয়ে সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করলে এক সা' (৩ কেজি ৩২৫ গ্রাম) দিতে হবে। রুটি, চাউল বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিত্‌রা দিতে হলে মূল্য হিসেবে দিতে হবে।

কিসমিস দিয়ে ফিত্‌রা আদায় করলেও এক সা' দিতে হবে। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিত্‌রা আদায় করা উত্তম। আর অন্য সময় মূল্য দিয়ে ফিত্‌রা আদায় করা উত্তম।

সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার সময় ঈদুল ফিত্‌রের দিন সুব্‌হে সাদিক হওয়ার পর। সুব্‌হে সাদিকের পূর্বে কেউ মারা গেলে তার উপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হবে না। সুব্‌হে সাদিকের পর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কিংবা কেউ মুসলমান হলে তার উপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হবে। অনুরূপ কোন দরিদ্র ব্যক্তি সুব্‌হে সাদিকের পূর্বে বিত্তশালী হলে তার উপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হবে। ধনী ব্যক্তি এর পূর্বে দরিদ্র হয়ে গেলে তার উপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হবে না। ঈদুল ফিত্‌রের দিনের পূর্বে ফিত্‌রা আদায় করা জায়িয। ঈদুল ফিত্‌রের দিন আদায় না করলেও পরে তা আদায় করতে হবে। ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বে ফিত্‌রা আদায় করা মুস্তাহাব। নিজের এবং নিজের নাবালিগ সন্তানের পক্ষ হতে সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব।

স্ত্রী এবং বালিগ সন্তানগণ ফিত্‌রা নিজেরাই আদায় করবে। স্বামী এবং পিতার উপর তাদের ফিত্‌রা আদায় করা ওয়াজিব নয়। অবশ্য দিয়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে। নিজ পরিবারভুক্ত নয় এমন লোকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিত্‌রা দিলে আদায় হবে না। কোন ব্যক্তির উপর তার পিতামাতার এবং ছোট ভাইবোন ও নিকটাত্মীয়ের পক্ষ হতে ফিত্‌রা আদায় করা ওয়াজিব নয়। এক ব্যক্তির ফিত্‌রা এক মিস্‌কীনকে দেওয়া উত্তম। তবে একাধিক মিসকীনকে দেওয়াও জায়িয। একদল লোকের উপর যে ফিত্‌রা ওয়াজিব তা এক মিসকীনকে দেওয়াও জায়িয।

গ্রন্থপঞ্জি

১. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২।
২. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২।
৩. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫।
৪. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫।
৫. বেহেশ্‌তি জেওর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮।
৬. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫।
৭. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫।
৮. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।
৯. বেহেশ্‌তি জেওর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫।
১০. আলমগীরী, ১ম খণ্ড।
১১. কাযীখান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।
১২. কাযীখান, হাশিয়া আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩-২১৫।
১৩. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯, ৩১০।
১৪. বেহেশ্‌তি জেওর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১।
১৫. কাযীখান, হাশিয়া আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯-২১০।
১৬. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।
১৭. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।
১৮. কাযীখান, হাশিয়া আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২।
১৯. বেহেশ্‌তি জেওর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০।
২০. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২।
২১. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৩০৪।
২২. কাযীখান, হাশিয়া আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯।
২৩. বেহেশ্‌তি জেওর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০।
২৪. আহসানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩২।
২৫. আলমগীরী, ১ম খণ্ড।
২৬. মারাকিল ফালাহ্‌, পৃ. ৫৫।
২৭. মারাকিল ফালাহ্‌, পৃ. ৫৬১।
২৮. মারাকিল ফালাহ্‌, পৃ. ৫৬১।

২৯. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০২।
৩০. কাযীখান, হাশিয়া আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫।
৩১. বেহেশ্তি জেওর (উর্দু), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২।
৩২. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।
৩৩. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।
৩৪. বেহেশ্তি জেওর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫-১৭।
৩৫. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।
৩৬. কাযীখান, হাশিয়া শামী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২।
৩৭. বেহেশ্তি জেওর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫।
৩৮. বেহেশ্তি জেওর (উর্দু), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭।
৩৯. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯।
৪০. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।
৪১. কাওয়াইদুল ফিক্হ, পৃ. ১৮৪।
৪২. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১১।
৪৩. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১১।
৪৪. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২।
৪৫. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২।
৪৬. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০-২১৩।

সপ্তম অধ্যায়

যাকাত

যাকাতের পরিচিতি

যাকাত ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মৌল ভিত্তি (বুনিয়াদ) ও অবশ্য পালনীয় (ফরয) ইবাদত। ইসলামের বুনিয়াদের মধ্যে ঈমান, নামায ও রোযা সকল মুসলমানের জন্যই অবশ্য পালনীয়, কিন্তু হজ্জ ও যাকাত শুধুমাত্র অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর ফরয। আর্থিক সামর্থ্যবান বলতে যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক হওয়াকে বুঝায়।

'যাকাত' আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে, যাকাত বলতে ধনীদের ধনমালে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অবশ্য দেয় অংশকে বুঝায়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সম্পদশালীদের সম্পদ থেকে নির্ধারিত ৮টি খাতে যাকাত ব্যয়বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বস্তুত যাকাত হচ্ছে সম্পদশালীদের সম্পদে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সেই ফরয অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র রহমত লাভের আশায় নির্ধারিত খাতে ব্যয়বন্টন করার জন্য দেওয়া হয়।

যাকাত একদিকে যাকাতদাতার ধন-সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে, এর প্রবৃদ্ধি সাধন করে, অন্যদিকে দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। যাকাতের এই প্রবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধনমালের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং যাকাত দানকারীর মনমানসিকতা ও ধ্যাণ-ধারণা পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত হয়।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হল যাকাত। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সম্পদের সুষম বন্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উপরন্তু সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্যও ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে তাকীদ প্রদান করে। সম্পদের এ সুষম বন্টনের জন্য ইসলাম যে সকল ব্যবস্থা মানুষকে উপহার দিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে যাকাত। মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়লে সামজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। ফলে মানুষের অভাব অনটন বেড়ে যায়, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিপর্যয় ঘটে। এসব সমস্যা থেকে মানব জাতিকে রক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ধনী মুসলমান ব্যক্তির উপর যাকাত অবশ্য পালনীয় তথা ফরযরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকুক আল্লাহ্ তা'আলা তা পসন্দ করেন না। তিনি চান এটি মানুষের কল্যাণে ব্যয় হোক, সমাজের অর্থনীতির চাকা গতিশীল থাকুক। ইসলামী সমাজে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা যাবে না। এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটি গরীবদের অধিকার, তাদের প্রতি করুণা নয়। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে এ হক আদায় করা হয়।

যাকাতের ফযীলত ও গুরুত্ব

যাকাত ও সাদাকা যে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ·

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এরদ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। (সূরা তাওবা, ৯ : ১০৩)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি নবী কারীম (সা)-এর খিদমতে এসে বললেন, আমাকে একটি আমল বাত্লিয়ে দিন যা করলে আমি জান্নাতে দাখিল হতে পারবো। নবী কারীম (সা) বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের সাওম পালন করবে। তিনি বললেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, আমি এ থেকে কিছু বৃদ্ধি করব না, কমও করব না।' তখন ঐ ব্যক্তি ফিরে যাওয়ার কালে নবী কারীম (সা) বললেন : জান্নাতী কোন ব্যক্তিকে দেখে কেউ যদি আনন্দিত হতে চায় তবে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়।[১]

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যাকাতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বত্রিশ জায়গায় যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে আটাশ জায়গায় নামায ও যাকাতের উল্লেখ একত্রে করা হয়েছে।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ·

তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে আল্লাহ্র নিকট তা পাবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। (সূরা বাকারা, ২ : ১১০)

বস্তুত ইসলামে নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোন অবকাশ নেই। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) বলেছেন, নামায ও যাকাত উভয়ই ফরয করা হয়েছে, এ দু'টির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি। এ কারণে ইসলামে যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : 'কেউ যদি আল্লাহ্র পুরস্কারের আশায় যাকাত দেয় তা হলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু যে যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তার কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যাকাত আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী তার অর্ধেক সম্পত্তিও নিয়ে নেয়া হবে।' (বুখারী, নাসাঈ ও বায়হাকী)

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফাতকালে আরবের কিছু গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, যদিও তারা নামায পড়ত। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত না দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন : আমি অবশ্যই সেসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। আল্লাহ্র কসম, ওরা যদি একটা উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় তারা দিত, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই অস্ত্রধারণ

করব। সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

কুরআন শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে :

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ٠

দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত দেয় না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। (সূরা হা-মীম আস-সাজ্দা, ৪১ : ৬-৭)

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের ভ্রাতৃত্বের সীমার মধ্যে শামিল হওয়ার জন্য যাকাত প্রদানকে অন্যতম শর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ٠

যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই। (সূরা তাওবা, ৯ : ১১)

যেসব কাজ করলে আল্লাহ্ মানুষের উপর রহমত নাযিল করেন তার মধ্যে অন্যতম কাজ হচ্ছে যাকাত দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের উপর আল্লাহ্ রহম করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা, ৯ : ৭১)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

"আমার রহমত সবকিছু পরিব্যপ্ত করে আছে, সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনের প্রতি ঈমান রাখে।" (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) যাকাতের জন্য বলিষ্ঠভাবে তাকীদ করেছেন এবং যাকাত না দেয়ার দুনিয়া-আখিরাতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : "আমি আদিষ্ট হয়েছি এজন্যে যে, আমি যুদ্ধ করব লোকদের সাথে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ও মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে।"[২]

আল্লামা ইউসুফ কারযাভী (র) যাকাত সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, "যাকাত না দিলে কোন লোকই কল্যাণ পেতে পারে না, যাকাত না দিয়ে কেউ আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার যোগ্য অধিকারীও হতে পারে না।"

যাদের উপর যাকাত ফরয

ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাত কেবলমাত্র স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক ও সম্পদশালী মুসলমানের উপর ফরয। সম্পদশালী কথাটি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কারও সম্পশালী হওয়ার জন্য নিম্নের শর্তগুলো পূরণ হওয়া জরুরী :

সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া জরুরী। সম্পদের উপর অন্য কারো অধিকার না থাকা এবং নিজের ইচ্ছামত তা ভোগ ও

ব্যবহার করতে পারাই হলো মালিকানার বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে 'সুনির্দিষ্ট' ও 'পূর্ণাঙ্গ' কথা দু'টো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেসব সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট নয়, তার উপর কোন যাকাত নেই। যেমন : সরকারি মালিকানাধীন ধন-সম্পদ। তেমনি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ওয়াক্ফকৃত মালের উপরও যাকাত ধার্য হবে না। তবে ওয়াক্ফ যদি কোন ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য হয় তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে। যে ঋণ ফেরত পাবার আদৌ আশা নেই, তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে যদি ফেরত পাওয়া যায়, তাহলে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এর যাকাত দিতে হবে।

সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া

যাকাতের জন্য সম্পদ অবশ্যই বর্ধনশীল তথা উৎপাদনক্ষম বা প্রবৃদ্ধিমান হতে হবে। সম্পদের বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট; বৃদ্ধি পাওয়া জরুরী নয়। এই শর্তের আলোকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের মাল-সম্পদ এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, যেমন : কাপড়-চোপর, আসবাবপত্র, বাসন-কোসন, বাড়িঘর, বইপুস্তক, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি মালামাল নিজের প্রবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম নয়; তাই এসবের উপর যাকাত নেই। কিন্তু গরু-ছাগল, কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ, ব্যবসার পণ্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রীত মালামাল বর্ধনশীল; তাই এগুলোর উপর যাকাত ধার্য হবে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা

যাকাত ধার্য হওয়ার জন্য তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা। 'নিসাব' বলা হয় শরী'আত নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে। এই পরিমাণ নির্ধারণে ব্যক্তির সর্বমোট আয় থেকে যাবতীয় ব্যয় বাদ দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত অর্থ এবং তার পূর্বের সঞ্চয় ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যুক্ত হবে। প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) বা সাড়ে সাত তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) বা এর সমমূল্যের সম্পদকে 'নিসাব' বলা হয়। কারো কাছে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকলে বা উভয়টি মিলে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান অথবা সব সম্পদ মিলে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গরীবের জন্য যা অধিকতর লাভজনক তার মূল্য ধরতে হবে। গরুর ক্ষেত্রে ৩০টি, ছাগলের ক্ষেত্রে ৪০টি এবং উট ৫টিকে নিসাব ধরা হয়েছে।

ঋণমুক্ত হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ঋণ বাদে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা একটি জরুরী শর্ত। যদি সম্পদের মালিক ঋণগ্রস্ত হয় এবং ঋণ পরিশোধের পর বা ঋণের সমপরিমাণ সম্পদ বাদ দেওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে যে সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

সম্পদের মালিকানা এক বছর থাকা

কারো কাছে কমপক্ষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকলেই সে সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। তবে কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি উৎপাদনের যাকাত

(উশর) প্রতিটি ফসল তোলার সময়েই দিতে হবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে মালিকানার বছর শেষে হিসাব অনুসারে যাকাত দিতে হবে।

কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র

কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে যাকাত কার উপর ধার্য হবে সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাত

যদি যৌথভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন সম্পদের মালিক হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকেই সম্পদের নিজ নিজ অংশের যাকাত পরিশোধ করতে হবে, যদি প্রত্যেকের অংশ নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশি হয়। সম্পদের এই অংশ তার অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে যোগ করে যদি নিসাবের শর্ত পূরণ হয় তাহলেও তাকে তার সম্পদের যাকাত দিতে হবে। আর যদি নিসাবের শর্ত পূরণ না হয় তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে না।

মৃত ব্যক্তির যাকাত

নির্ধারিত যাকাত পরিশোধ করার পূর্বে যদি সম্পদের মালিক মারা যায়, তাহলে তার অসীয়্যাত অনুযায়ী উত্তরাধিকারীগণ অথবা স্ত্রী কিংবা তত্ত্বাবধায়ক তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে যাকাত বাবদ পাওনা আদায় করবেন, কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করবেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করবেন।

তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত সম্পদের যাকাত

মালিকের পক্ষ থেকে সম্পদের দেখাশোনা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কোন আইনানুগ তত্ত্বাবধায়কের কাছে সম্পদ ন্যস্ত করা হয়ে থাকলে, সে সম্পদের যাকাত মালিকের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধানকারী প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

বিদেশে অবস্থিত সম্পদের যাকাত

কারো সম্পদ যদি বিদেশে থাকে এবং সে সম্পদ যদি যাকাতযোগ্য হয় তাহলে তার উপরও তাকে যাকাত দিতে হবে। তবে সে দেশের সরকার যদি ইসলামী হয় এবং উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করে, তাহলে দেশে আর সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। সম্পদ দেশে আর সম্পদের মালিক দেশের বাইরে থাকলে মালিকের প্রতিনিধি মালিকের পক্ষ থেকে যাকাত দিবেন।

যাকাতযোগ্য সম্পদ ও তার ব্যবহার

কুরআন মাজীদে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে তার ব্যাখ্যা ও বাস্তব কর্মরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস থেকে জানা যায়—সোনা, রূপা, ব্যবসার পণ্য, কৃষিপণ্য, নগদ অর্থ, পশু সম্পদ ইত্যাদিতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এগুলোর পরিমাণ যেমন বিভিন্ন, তেমনি এসবের যাকাতের হারও বিভিন্ন।

নিম্নলিখিত সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয় : ১. সোনা-রূপা ও নগদ অর্থ; ২. ব্যবসা পণ্য; ৩. কৃষি পণ্য; ৪. পশু সম্পদ; ৫. খনিজ সম্পদ; ৬. অন্যান্য সম্পদ।

সোনা-রূপা ও নগদ অর্থ

সোনা বিশ মিছকাল, আমাদের দেশের হিসেবে সাড়ে সাত তোলা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) এবং রূপা দুইশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) হলো যাকাতের নিসাব। এ পরিমাণ সোনা-রূপা বা এর অধিক হলে তার যাকাত দিতে হবে। উল্লিখিত সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। এক বছর পূর্ণ না হলে অথবা নিসাবের কিছু কম হলে যাকাত ফরয হবে না।

প্রচলিত মুদ্রা যেমন, টাকা, ডলার, পাউন্ড ইত্যাদি বিনিময়ের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং সোনা-রূপার পরিবর্তে এসব ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই প্রচলিত মুদ্রারও চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। যদি তা সোনা বা রূপার নিসাবের মূল্যের সমান হয়।

হাতে এবং ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ ছাড়াও সঞ্চয়পত্র, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদি নগদ অর্থ বলে গণ্য হবে। এছাড়া পূর্বের বকেয়া পাওনা ঋণ, চলতি বছরে দেয়া ঋণ, এসবকেও নগদ অর্থের মধ্যে ধরে যাকাত হিসাব করতে হবে। তবে যেসব ঋণ ফেরত পাবার আশা নেই সেগুলো বাদ-দেয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে যদি ফেরত পাওয়া যায় তখন থেকে বছর পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসা পণ্য

ব্যবসায়ের মালামালের যাকাত নিরূপণকালে মালিকানার বছর সমাপ্তি দিবসে যে সম্পদ থাকবে তাই সারা বছর ছিল ধরে নিয়ে তার উপর যাকাত দিতে হবে। সমাপ্তি দিবসে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর যে স্থিতিপত্র তৈরি করা হয়, এতে সাকূল্য দেনা-পাওনা, যেমন মূলধন সম্পদ, চলতি মূলধন, অর্জিত মুনাফা, ক্যাশে এবং ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ, দোকানে এবং গুদামে রক্ষিত মালামাল, কাঁচামাল, প্রক্রিয়ায় অবস্থিত মাল, প্রস্তুতকৃত মাল, ঋণ, দেনা ও পাওনা ইত্যাদি যাবতীয় হিসাব আনতে হবে। এসবের মধ্য থেকে স্থায়ী মূলধন সামগ্রী যেমন, মেশিন, দালান, জমিসহ ব্যাংক ঋণ, ক্রেডিটে ক্রীত মাল এবং অন্যান্য ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রীত জমি, মেশিন বা অন্যান্য সম্পদেরও যাকাত দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তির একাধিক ব্যবসা থাকলে এবং তারপরও সোনা-রূপা, মূল্যবান পাথর, নগদ অর্থ, ব্যাংক ব্যালান্স ইত্যাদি থাকলে এইসব সম্পদের হিসাবের যোগফলের ভিত্তিতে যাকাত নিরূপণ করতে হবে।

কৃষি সম্পদ

কৃষি সম্পদের যাকাতকে 'উশ্‌র' নামে অভিহিত করা হয়। একে ফল ও ফসলের যাকাতও বলা যায়।

এ যাকাত অন্যান্য গবাদি পশু, নগদ সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্য ইত্যাদি মালের যাকাত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর হিসেবও আলাদা। এতে এক বছর পূর্ণভাবে অতিবাহিত হওয়ার কোন শর্ত নেই; বরং শুধু তা অর্জিত হলেই এ যাকাত দিতে হয়। কেননা তা জমির প্রবৃদ্ধি। ফসল উৎপাদনের প্রেক্ষিতে জমি সাধারণত দু'প্রকারের হয়ে থাকে :

ক. ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সেচ দিতে হয় এমন জমি। এরূপ জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর ২০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত (উশর) দিতে হয়।

খ. ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সেচ দিতে হয় না এমন জমি। এরূপ জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর ১০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত (উশর) দিতে হবে।

পশু সম্পদ

সাধারণভাবে মাঠে ময়দানে চরে বেড়ানো গৃহপালিত পশু বংশবৃদ্ধি ও দুধের জন্যে প্রতিপালিত হলে তাকে পরিভাষায় 'সায়েমা' বলে। এসব পশুর যাকাত দিতে হয়। যেসব পশু গোশত খাওয়ার জন্যে পালা হয় এবং বন্য পশু যেমন, হরিণ, নীল গাই প্রভৃতির উপর যাকাত নেই। তবে এ বন্য পশু যদি ব্যবসার জন্যে হয়, তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে, যেমন ব্যবসায়ের মালের উপর যাকাত হয়।

ভেড়া-ছাগলের নিসাব ও যাকাতের হার

যাকাতের ব্যাপারে ভেড়া-ছাগল-দুম্বা সকলের একই হুকুম। সকলের একই নিসাব এবং যাকাতের হার একই। যদি কারো কাছে দুম্বাও থাকে এবং ছাগলও থাকে এবং উভয়ের নিসাব পূর্ণ হয়, তাহলে উভয়ের পৃথক পৃথক যাকাত দিতে হবে। আর যদি উভয়ের একত্র করলে নিসাব পূর্ণ হয়, তাহলে যার সংখ্যা বেশি হবে যাকাতে সেই পশুই দিতে হবে। উভয়ের সংখ্যা সমান হলে যেটা ইচ্ছা দেওয়া যায়।

ভেড়া/ ছাগলের সংখ্যা ৪০ এর কম হলে কোন যাকাত দিতে হবে না।

ভেড়া/ছাগলের সংখ্যা ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে যাকাতের পরিমাণ হবে= ১টি ভেড়া/ছাগল।

ভেড়া/ছাগলের সংখ্যা ২০০ পর্যন্ত হলে যাকাতের পরিমাণ হবে = ২টি ভেড়া/ছাগল।

ভেড়া/ছাগলের সংখ্যা ৩০০ পর্যন্ত হলে যাকাতের পরিমাণ হবে = ৩টি ভেড়া/ছাগল।

ভেড়া/ছাগলের সংখ্যা ৪০০ পর্যন্ত হলে যাকাতের পরিমাণ হবে = ৪টি ভেড়া/ছাগল।

৪০০ এর পরের প্রতি ১০০ পূর্ণ হলে প্রতি শতের জন্য একটি করে ছাগল বা ভেড়া যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ শতকরা একটি করে। ভেড়া-ছাগলের ক্ষেত্রে এক বছর বা তার বেশি বয়সের একটি বাচ্চা যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গরু-মহিষের নিসাব ও যাকাতের হার

যাকাতের ব্যাপারে গরু ও মহিষের একই হুকুম। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) মহিষকে গরু হিসেবে ধরে তার উপর ঐ ধরনের যাকাত আরোপ করেন যা নবী কারীম (সা) গরুর জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। উভয়ের নিসাব ও যাকাতের হার এক। কারো কাছে উভয় ধরনের পশু থাকলে উভয়কে মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত ফরয হবে। যার সংখ্যা বেশি হবে তার মধ্য থেকে যাকাত দিতে হবে। উভয়ের সংখ্যা সমান হলে যে কোন একটি যাকাত দেওয়া যাবে।

যে ব্যক্তি ৩০টি গরু-মহিষের মালিক হবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। এর কম হলে যাকাত নেই।

৩০টি গরু-মহিষের মধ্যে গরু বা মহিষের একটি বাচ্চা দিতে হবে, যার বয়স পূর্ণ এক বছর হয়েছে।

৩১টি থেকে ৩৯টি পর্যন্ত অতিরিক্ত কোন যাকাত নেই। ৪০টি গরু-মহিষ হলে এমন একটি বাচ্চা যাকাত দিতে হবে যার বয়স পূর্ণ দু'বছর।

৪১টি থেকে ৫৯ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোন যাকাত নেই। ৬০টি গরু-মহিষ হলে এক বছরের দু'টি বাচ্চা যাকাত দিতে হবে। ৬০ এর পরে প্রতি ৩০টি গরু-মহিষের জন্য এক বছরের একটি বাচ্চা এবং প্রতি ৪০টি গরু-মহিষের জন্য দু'বছরের একটি বাচ্চা যাকাত দিতে হবে।

উটের নিসাব ও যাকাতের হার

যে ব্যক্তি পাঁচটি উটের মালিক হবে সে 'সাহিবে নিসাব' হবে। তার উপর যাকাত ফরয। এর কম উটের যাকাত নেই।

৫টি থেকে ৯টি পর্যন্ত উটের জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

১০টি উট হলে ২টি ছাগল এবং ১৪টি পর্যন্ত ঐ ২টিই দিতে হবে।

১৫টি উট হলে ৩টি ছাগল এবং ১৯টি পর্যন্ত ঐ একই।

২০টি উটের ৪টি ছাগল এবং ২৪টি পর্যন্ত ঐ একই।

২৫টি উটের উপর এমন এক উটনী যার বয়স দ্বিতীয় বছর শুরু হয়েছে।

২৬টি থেকে ৩৫টি পর্যন্ত অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে না। ৩৬টি উট হলে এমন এক উটনী দিতে হবে যার বয়স তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে।

৩৭টি থেকে ৪৫টি পর্যন্ত অতিরিক্ত কোন যাকাত নেই।

৪৬টি উট হলে এমন এক উট্‌নী দিতে হবে যার বয়স চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে।

৪৭টি থেকে ৬০টি পর্যন্ত অতিরিক্ত কোন যাকাত নেই।

৬১টি হলে এমন এক উট্‌নী দিতে হবে যার বয়স পঞ্চম বছর শুরু হয়েছে।

৬২টি থেকে ৭৫টি পর্যন্ত অতিরিক্ত কোন যাকাত নেই।

৭৬টি হলে দু'টি উট্‌নী যাদের বয়স তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে।

৭৭টি থেকে ৯০টি পর্যন্ত অতিরিক্ত কোন যাকাত নেই।

৯১টি হলে দু'টি এমন উট্‌নী যার বয়স চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে।

১২০টি পর্যন্ত উপরোক্ত দু'টি উট্‌নী।

তারপর পুনরায় সেই হিসাব শুরু হবে অর্থাৎ ৫টির উপর এক ছাগল, ১০টির উপর দুই ছাগল ইত্যাদি।

খনিজ সম্পদ

জমিনে গচ্ছিত গুপ্তধনকে 'কানয' বলে। খনিতে প্রাপ্ত সম্পদ যেমন, সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্রব্যকে 'মা'আদিন' বলে। উভয় সম্পদকে একসাথে 'রিকায' বলে। এ সকল সম্পদের যাকাত খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ।

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : তাবি'ঈ হযরত রাবীয়া ইব্‌ন আবদুর রহমান একাধিক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাল ইব্‌ন হারিস মুযানিকে 'ফুর' অঞ্চলের দিকে কাবালিয়্যা নামক স্থানে খনিসমূহ জায়গীর হিসেবে দান করেছিলেন। সে সকল খনির যাকাত (খুমুস) ছাড়া আজ পর্যন্ত কিছুই আদায় করা হয়নি।[৩]

ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে খনির যাকাত কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায় উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করা উচিত। এক বছর সমাপ্তির কোন প্রয়োজন নেই। খনিজ সম্পদের যাকাত আদায়ের ব্যাপারে সম্পদ অথবা সমপরিমাণের মূল্য দেওয়া যেতে পারে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেছেন : 'এভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও সীসা, দস্তা প্রভৃতি যাবতীয় খনিজ সম্পদ হতে এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) যাকাত আদায় করতে হবে।'

এমনিভাবে ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত সম্পদ হতেও যাকাত আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'এ ক্ষেত্রে রিকাযে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করতে হবে।'

প্রভিডেন্ট ফান্ড

সরকারি চাকুরিসহ অন্যান্য চাকুরেদের মাসিক বেতনের একটি অংশ কেটে নিয়ে তার সঙ্গে চাকুরিদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুদানসহ বা অনুদান ছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা প্রায় চাকুরিতেই আছে। যাকাতযোগ্য হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ মালিকানার যে পূর্বশর্ত তা প্রভিডেন্ট ফান্ডের বেলায় নিশ্চিত নয় বলে চাকুরি শেষে তা হস্তগত হওয়ার পূর্বে এ ফান্ডের ওপর যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে কেউ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রতি বছরই ব্যালেন্স জেনে তার ওপর যাকাত দিলে তিনি নিশ্চয়ই তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান পাবেন।

যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ

যৌথ মালিকানাধীন কোন সম্পদের যাকাতযোগ্য পরিমাণ নির্ভর করবে প্রত্যেক অংশীদারের অংশের উপর অর্থাৎ এরূপ সম্পদে যাকাত নির্ধারণ করতে হলে প্রত্যেকের অংশের সম্পদ অন্তত নিসাবের সমপরিমাণ হতে হবে এবং প্রত্যেক অংশীদারদের অংশের যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। অতএব, কোন একজন অংশীদারের অংশ যদি নিসাব অপেক্ষা কম হয় তাহলে তা স্বভাবতই যাকাতমুক্ত থাকবে যদিও যৌথ সম্পদ নিসাব অপেক্ষা বেশি হয়। আবার কোন একজনের অংশ তার অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে যোগ করে যদি নিসাবের শর্ত পূরণ হয় তাহলেও তাকে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

যেসব সম্পদে যাকাত ফরয নয়

নিম্নের সম্পদসমূহের উপর যাকাত নেই :

১. বসবাসের বাড়িঘরের উপর যাকাত নেই; তা যত মূল্যবান হোক না কেন।

২. যে কোন প্রকারের মণিমুক্তা ইত্যাদির উপর যাকাত নেই।

৩. কৃষি ও সেচকাজের জন্যে যে পশু, যেমন গরু, মহিষ, উট, প্রতিপালন করা হয় তার উপর যাকাত নেই। এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, এক ব্যক্তি তার কারবারে উৎপাদনের জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করে তা যাকাত বহির্ভূত। যেসব পশু দিয়ে কৃষিকাজ করা হয় তার উপর যাকাত নেই, কারণ তার যাকাত যমীন থেকে উৎপন্ন ফসল থেকে আদায় করা হয়। অনুরূপ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির উপর যাকাত নেই।

৪. কলকারখানা, মেশিন ও যন্ত্রপাতির উপর যাকাত নেই। উপরন্তু কারখানার দালান-কোঠা, ব্যবসায়ে ব্যবহৃত ফার্নিচার, দোকান ঘর, এসবের উপর যাকাত নেই।

৫. ডেইরী ফার্মের পশু সায়েমার অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এর উপর যাকাত নেই। কারণ সেগুলো তো উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে পড়ে। অবশ্যি ডেইরী থেকে উৎপাদিত পণ্যের বা মূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে।

৬. মূল্যবান কোন দুষ্পাপ্য জিনিস কেউ যদি শখ করে রাখে, তার উপর যাকাত নেই। তবে যদি এর ব্যবসা করা হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে।

৭. কেউ যদি চৌবাচ্চায় বা পুকুরে সৌখিন মাছ পোষে অথবা শখ করে কোন পশু বা পাখি পোষে তাহলে তার উপর যাকাত নেই। কিন্তু এর ব্যবসা করলে যাকাত দিতে হবে।

৮. গৃহপালিত পশু যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাখা হয়, যেমন দুধপানের জন্য গাভী, বোঝা বহনের জন্য গরু-মহিষ, যানবাহনের জন্যে ঘোড়া, হাতী, উট, তাহলে তার সংখ্যা যতোই হোক, কোন যাকাত দিতে হবে না।

৯. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য মটর সাইকেল, কার, বাস থাকলে তার উপর যাকাত নেই।

১০. ডিম বিক্রির জন্যে হাঁস-মুরগীর ফার্ম করলে হাঁস-মুরগীর উপর যাকাত নেই। তবে বিক্রির হাঁস-মুরগী ও ডিমের মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে যেমন অন্যান্য ব্যবসার পণ্যের উপর যাকাত হয়।

১১. যেসব জিনিস ভাড়ায় খাটানো হয়, যেমন সাইকেল, রিকশা, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, ফার্ণিচার, ক্রোকারীজ ইত্যাদি অথবা যেসব দোকান ও বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় তার উপর কোন যাকাত নেই। তবে এসব থেকে যে আয় হবে তা যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছর অতীত হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে। ঐসব জিনিসের মূল্যের উপর কোন যাকাত নেই।

১২. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ক্যালকুলেটর, ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার ইত্যাদির উপর যাকাত নেই।

১৩. গাধা, খচ্চর, ঘোড়ার উপর যাকাত নেই যদি তা ব্যবসার জন্যে না হয়।

১৪. ওয়াক্ফের পশুর উপরও যাকাত নেই। যেসব ঘোড়া জিহাদের জন্যে পোষা হয় এবং যেসব অস্ত্রশস্ত্র জিহাদ ও দীনের খেদমতের জন্যে, তার উপরও যাকাত নেই।

১৫. দাতব্য বা সমাজ-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত, তার উপর যাকাত নেই।

১৬. সরকারি মালিকানাভুক্ত নগদ অর্থ, সোনা-রূপা এবং অন্যান্য সম্পদের উপর যাকাত নেই।

যাকাতের হক্দার

পবিত্র কুরআন মাজীদে আট প্রকারের লোক যাকাত পাবার যোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

সাদাকা তো কেবল ফকীর ও মিস্কীনদের জন্য এবং সাদাকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকদের জন্য, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য,

আল্লাহ্‌র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা, ৯ : ৬০)

যাকাতের এসব হক্‌দারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হল :

১. ফকীর : ফকীরকে বাংলায় গরীব বলা হয়। জনগোষ্ঠীর সেই অংশ যাদের কাছে কিছু ধন-সম্পদ আছে; কিন্তু তারদ্বারা তাদের প্রয়োজন পূরণ হয় না। অন্য কথায় যাদের কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই তারাই গরীব।

২. মিস্‌কীন : যারা নিঃস্ব, নিজের পেটের অন্নও যোগাড় করতে পারে না এবং অভাবের তাড়নায় অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়, সেই সব অসহায় মানব সন্তানদের বলা হয় মিস্‌কীন। যারা কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য এবং মানবেতর জীবন যাপন করে, হযরত উমর (রা) তাদেরকেও মিস্‌কীনদের মধ্যে গণ্য করতেন।

৩. আমিলুন : 'আমিলুনা আলাইহা' বলতে যাকাতের কাজে নিযুক্ত লোকদের বুঝানো হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র যাকাতসমূহ আদায়, বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি করার জন্য যাদের নিযোগ করবে, তাদের বেতন-ভাতা যাকাত তহবিল থেকে দেওয়া যাবে।

৪. মন জয় করার জন্য : নও-মুসলিমদের সমস্যা দূর করার জন্য এবং ইসলামের উপর অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে। এমনকি নও-মুসলিমগণ ধনী হলেও তাদের যাকাত দেওয়া যাবে।

৫. দাস মুক্তি (মুক্তিপণ ধার্যকৃত দাস) : দাস মুক্তি বলতে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ লোক এবং বন্দীদের মুক্ত করাকে বুঝানো হয়েছে। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব করবে, অন্য কারো দাসত্ব করবে না, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র মৌলিক নির্দেশ। এ জন্য ইসলাম দাসমুক্ত করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে যাঁদের অর্থ ছিল তাঁরা মুকাতব পর্যায়ের দাসমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করতেন।

৬. ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ : ঋণভারে জর্জরিত লোকেরা মানসিকভাবে সর্বদাই ক্লিষ্ট থাকে এবং কখনও কখনও জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের জীবনী শক্তির ক্ষয় সাধিত হয়। অনেক সময় তারা অন্যায় ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং যথার্থ প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করা ইসলামী সমাজের দায়িত্ব। এ খাতেও আল্লাহ্‌ যাকাতের অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সমাজকে সুস্থ রাখা যায়। তবে কোন কোন ফকীহ্‌ ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। কোন পাপকাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে, মদ কিংবা বিয়ে-শাদির নাজায়িয প্রথা-অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না। (মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃ. ৭৯)

৭. আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় : কুরআনের ভাষায় এ খাতের নাম বলা হয়েছে, 'ফী সাবীলিল্লাহ্‌', যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে। আল্লাহ্‌র পথে কথাটি খুব ব্যাপক। মুসলমানদের সকল নেক কাজ আল্লাহ্‌র পথেরই কাজ। তবে এখানে আল্লাহ্‌র পথে কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেসব গাযী ও মুজাহিদ যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে কিন্তু এখন আর তার এমন অর্থ নেই যাতে সে

ফরয হজ্জ আদায় করতে পারে। ফকীহ্গণের মতে দীনী ইল্‌ম শিক্ষার্থী কিংবা অন্যান্য সৎকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে, যদি তারা গরীব হয়।

৮. মুসাফির : মুসাফির বা প্রবাসী লোকের বাড়িতে যত ধন-সম্পদই থাকুক না কেন, পথে বা প্রবাসে সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে যাকাত তহবিল হতে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া যাবে।

যাকাত প্রদানের নিয়ম

যাকাত আদায়ের নির্ধারিত কোন মাস নেই। সাহিবে নিসাবের সম্পদের মালিকানার এক বছর পূর্ণ হলে তখনি যাকাত আদায় করবে। তবে পবিত্র মাহে রমযানে দেয়া ভাল।

যাকাত সংগ্রহ ও ব্যয়বন্টন ব্যবস্থা

যেহেতু যাকাত ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ এবং ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রাণশক্তি, তাই এর যথার্থ সংগ্রহ ও ব্যয়বন্টন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের স্পষ্ট ঘোষণা হলো :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ٠

হে নবী, তাদের সম্পদ হতে যাকাত উসূল করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন। (সূরা তাওবা, ৯ : ১০৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ٠

আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে, তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪১)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ٠

তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে বঞ্চিতের হক (প্রাপ্য)। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৯)

এ সকল আয়াতের আলোকে নবী কারীম (সা) যাকাতের বিধান জারী করেছেন এবং যাকাত বন্টনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিমাম ইব্‌ন সা'লাবা (রা) নবী কারীম (সা)-কে বললেন, আপনার প্রতিনিধি বলেছেন যে, আমাদের সম্পদের যাকাত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সে সত্য বলেছে। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, যে আল্লাহ্ আপনাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন ? নবী কারীম (সা) বললেন : হ্যাঁ।[৪]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, 'হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় নবী কারীম (সা) তাঁকে বললেন : তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'

এ সাক্ষ্য দানের জন্য দাওয়াত দিবে। তারা যদি তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানাবে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তারা এ কথা মেনে নিলে তাদের ধন-মালের উত্তম অংশ গ্রহণ করা থেকে তুমি সতর্কতা অবলম্বন করবে। আর মযলূমের ফরিয়াদকে অবশ্যই ভয় করবে। কেননা তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা নেই।"[৫]

বস্তুত নবী কারীম (সা) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় যাকাত উসূল করার জন্য লোক নিয়োগ করতেন। তাঁরা নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় ধনীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করতেন এবং তা যথারীতি বন্টন করতেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলেও যাকাত আদায়ের এ পদ্ধতি কার্যকর ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের বিশেষত্ব হচ্ছে তা আদায় করে নিতে হয়, সংগ্রহ করতে হয়; যাকাত প্রদান শুধু দাতাদের উপর ছেড়ে দেয়া হয় না।

খিলাফাতে রাশিদার পর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে। কিন্তু বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ আজও আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর ধন-সম্পদ যাকাত হিসেবে দরিদ্র ও অভাবীদের দান করে আসছেন। এতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে, কিন্তু এতে যাকাতের প্রকৃত গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। কেননা ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দানে একদিকে যেমন দাতার মনে শ্রেষ্ঠত্বের ভাব প্রকাশের আশঙ্কা রয়েছে, তেমনি এতে ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তেমনি অধিকার পাওয়ার চেয়ে দান গ্রহণের হীনমন্যতাবোধ প্রবল হয়ে উঠছে। এছাড়া যাকাতে সামাজিক নিরাপত্তার যে নিশ্চয়তা ছিল তাও বহাল থাকছে না।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে উসূল ও ব্যয়-বন্টন করা বিধেয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা আমাদের দেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশেই অনুপস্থিত। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থা যাতে আবার চালু হয় তার জন্য সকল মুসলমানেরই আন্তরিকতার সাথে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, আর এজন্য রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থার ইসলামীকরণও জরুরী। যতদিন তা না হয় ততদিন যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের জন্য নিম্নের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি তথা সংস্থা বা সংগঠন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী শরী'আতের বিধানাবলী বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাতে পারে এবং যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে এ ব্যবস্থা একটি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের সাথে সাথে যাকাত উসূল ও বন্টনের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকবে।

খ. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে শরী'আতসম্মতভাবে পরিচালিত ব্যাংক বা অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমেও যাকাত উসূল ও বন্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে ব্যাংকে একটি করে যাকাত বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। উক্ত বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ব্যাংক যাকাত দানকারী সাহিবে নিসাবগণের নিকট হতে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। নিজ গ্রাহকদের একাউন্ট হতেও তাদের অনুমতি সাপেক্ষে যাকাত সংগ্রহ করে যাকাত ফান্ডে জমা করতে পারে এবং যাকাত বোর্ডের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে হক্দারদের মধ্যে তা বন্টন করতে পারবে।

গ. ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত উসূল ও বন্টন : উপরের বর্ণনামতে অথবা অনুরূপ কোন ব্যবস্থায় যদি যাকাত উসূল ও বন্টন করা সম্ভব না হয়, তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়েই যাকাত উসূল ও বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাহিবে নিসাবগণ নিজ উদ্যোগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বীয় ধন-সম্পদের হিসাব করে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন এবং শরী'আত নির্ধারিত খাতসমূহে তা ব্যয়-বন্টনের ব্যবস্থা করবেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে য, যাকাত আদায়ের নির্ধারিত কোন মাস নেই। সম্পদ মালিকানার চান্দ্রবছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই সাহিবে নিসাবকে হিসাব করে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব তা আদায় করতে হবে। যাকাতদাতাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যাকাত কোন দান নয়।

যাকাত হিসাব করার বাস্তব নমুনা

সাহিবে নিসাবগণ নিজ সম্পদের হিসাব করে যাতে সহজেই যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন সেজন্য নিম্নে একটি নমুনা হিসাবে পেশ করা হলো। যাকাত দানকারীগণ এ নমুনা অনুসরণ করে নিজেই নিজ নিজ যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবেন :

সম্পদ	সর্বমোট মূল্য টাকার অংকে	যাকাত বহির্ভূত মূল্য (টাকায়)	যাকাতযোগ্য মূল্য (টাকায়)
১. বাড়ি	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	
২. আসবাবপত্র (বাড়ি ও অফিসে)	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	
৩. মূলধন সামগ্রী (জমি, দালান, মেশিন)	১,০০,০০,০০০/-	১,০০,০০,০০০/-	
৪. ব্যবহারের গাড়ি ও যানবাহন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	
৫. সোনা	২০,০০০/-		২০,০০০/-
৬. রূপা	১০,০০০/-		১০,০০০/-
৭. অলংকার (সোনা, রূপা, পাথর)	১,০০,০০০/-		১,০০,০০০/-
৮. নগদ অর্থ (ব্যাংকে ও হাতে)	৭০,০০০/-		৭০,০০০/-
৯. পাওনা অর্থ	৪০,০০/-		৪০,০০০/-
১০. প্রদত্ত ঋণ (পাওনা)	৩০,০০০/-		৩০,০০০/-
১১. বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার (বাজার মূল্য হিসাবে)	৫০,০০০/-		৫০,০০০/-
১২. ব্যবসায়ের ক্রীত মওজুদ কাঁচামাল	১,৩০,০০০/-		১,৩০,০০০/-
১৩. ব্যবসায়ের জন্য ক্রীত মালের স্টক (ক্রয় মূল্যে)	৩,০০,০০০/-		৩,০০,০০০/-
১৪. ব্যবসায়ের জন্য তৈরি মওজুদ মাল (বাজার দামে)	৫,০০,০০০/-		৫,০০,০০০/-
মোট	১,২১,০০,০০০/-	১,০৮,৫০,০০০/-	১২,৫০,০০০/-

দায়-দেনা	সর্বমোট দায়-দেনা	যাকাত বহির্ভূত দায়-দেনা	যাকাত প্রদেয় দায়-দেনা
১. মর্টগেজ ও বন্ড	১,০০,০০০/-		১,০০,০০০/-
২. ব্যাংক ঋণ ও ব্যবসায়ের মালামাল ক্রয় বাবদ ঋণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	
৩. ব্যবসায়ের দেয়	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	
৪. কিস্তিতে কেনার জন্য দেনা	২,০০,০০০/-		২,০০,০০০/-
৫. অন্যান্য দেয়	১,০০,০০০/-		১,০০,০০০/-
মোট	৭,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-

যাকাত নিরূপণ ঃ

১. যাকাত প্রদান যোগ্য সম্পদ	=টাঃ ১২,৫০,০০০/-
২. যাকাত প্রদেয় দায়-দেনা	=টাঃ ৪,০০,০০০/-
মোট যাকাত প্রদানযোগ্য সম্পদ	=টাঃ ১৬,৫০,০০০/-
২.৫% হারে যাকাত হবে	=টাঃ ৪১, ২৫০/-

যাকাত না দেওয়ার পরিণাম

ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা আল্লাহ্‌র হুকুম ও জনগণের হক। তাই যাকাত না দেওয়া শরী'আতের দৃষ্টিতেই অপরাধ নয়, বরং এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ বটে। যাকাত না দিলে সমাজে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য ও অসাম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যেহেতু সালাতের ন্যায় যাকাতও ইসলামের অন্যতম রুকন ও মৌলিক ভিত্তি, সেহেতু যাকাত আদায় না করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতো জঘন্য অপরাধ তা সহজেই অনুমেয়। যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয সে যাকাত না দিলে আখিরাতে তাকে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। কুরআন মাজীদে যাকাত না দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না (এখানে যাকাত অর্থে) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন, যেদিন জহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর। (সূরা তাওবা, ৯ : ৩৪-৩৫)

যাকাত না দেওয়ার ইহকালীন পরিণতি সম্পর্কে নবী কারীম (সা) বলেছেন : 'যেসব লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাদের কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করে দেবেন।'[৬]

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'যাকাত যে মালের সাথে মিশ্রিত হয় সে মালকে যাকাত অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়।'[৭] অপর একটি হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, 'স্থল ও জলভাগে ধন-মাল বিনষ্ট হয়, শুধু মাল জমা রাখার দরুন।'

যাকাত আদায় না করে কৃপণতা প্রদর্শনের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔

আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল এ যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে। (সূরা, আলে ইমরান, ৩ : ১৮০)

হাদীস শরীফেও যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : 'আল্লাহ্ যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে তা হলে কিয়ামাতের দিন তা একটি বিষধর অজগরের রূপ ধারণ করবে যার দু'চোখের উপর দু'টি কালো চিহ্ন থাকবে। কিয়ামতের দিন তার গলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পাশে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে, আমিই তোমার সম্পদ, আমিই তোমার পুঞ্জীভূত ধন।'[৮] তারপর নবী কারীম (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : (অর্থ) 'আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল এ যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে।' (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮০)

নবী কারীম (সা) যাকাত অবহেলা করার ভয়ানক পরিণাম থেকে সাবধান করে বলেছেন : 'কিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আমার কাছে এ অবস্থায় না আসে যে, তার ছাগল তার ঘাড়ের উপর চাপানো থাকবে এবং তা ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে এবং সে (সাহায্যের জান্যে) আমাকে ডাকবে। আমি তখন বলবো, আজ তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারবো না। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। আর সেদিন তোমাদের কেউ যেন তার উট তার ঘাড়ের উপর বহন করা অবস্থায় আমার নিকট না আসে, যা আওয়াজ করতে থাকবে। তখন সে (সাহায্যের জন্য) আমাকে ডাকবে। আমি বলবো, আজ তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারবো না। আমি তো আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।'[৯]

একদিন নবী কারীম (সা) দেখলেন যে, দু'জন মহিলা তাদের হাতে সোনার কংকন পরিধান করে আছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা এর যাকাত দাও কিনা। তারা না বললে, নবী কারীম (সা) বললেন : তোমরা কি তাহলে এটা চাও যে, এসবের পরিবর্তে তোমাদের আগুনের কংকন পরানো হবে ? তারা বললো, না, না, কখনই নয়। তখন নবী (সা) বললেন : এসবের যাকাত দিতে থাকো। (তিরমিযী)

যাকাত যে ফরয তা কুরআন মজীদ ও হাদীসে রাসূলের মাধ্যমে আমরা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি। ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে ফরযকে অস্বীকারকারী হল কাফির। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত আদায় না করাকে মুশরিকদের কাজ বলেছেন। "ধ্বংস অনিবার্য, ঐ সকল মুশরিকের জন্যে যারা যাকাত আদায় করে না।" (সূরা হামীম-আস্ সাজ্দা, ৪১ : ৬-৭)

কুরআন ও সুন্নাতের এ সব সাবধান বাণীর ফলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) যাকাত-সাদাকার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। অনেকের অনুভূতি এতটা তীব্র ছিল যে, তাঁরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কপর্দকও কাছে রাখা সমীচীন মনে করতেন না। হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর তো অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি একত্রে কিছু লোক দেখতেন তখনই যাকাতের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।
২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১২।
৩. আবূ দাঊদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৬০।
৪. মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।
৫. তাবারানী ও বায়হাকী, সূত্র : ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১।
৬. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫৭।
৭. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫৫।
৮. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮।
৯. প্রাগুক্ত।

অষ্টম অধ্যায়

হজ্জ

পরিচিতি

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম ভিত্তি। হজ্জ-এর আভিধানিক অর্থ, সংকল্প করা। পারিভাষিক অর্থে হজ্জের মাসে নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ্ শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত ও বিশেষ কার্যাদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করাকে হজ্জ বলা হয়।[১]

হজ্জের পটভূমি ও পবিত্র স্থানসমূহ

হজ্জের রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস ও দীর্ঘ পটভূমি। এর প্রতিটি কাজ ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত ও তাৎপর্যপূর্ণ। জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আসার পর হযরত আদম ও হাওয়া (আ) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তাঁরা একে অপরকে খুঁজতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ্র রহমতে তাঁরা আরাফাতের ময়দানে পরস্পর মিলিত হন। তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আদম সন্তানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছর আরাফাতের মহামিলন প্রান্তরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করেন। তারা তাদের হৃদয়-মন দিয়ে আল্লাহ্কে উপলব্ধি করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

এভাবে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ, মীনায় শয়তানকে কংকর মারা এবং কুরবানীর প্রেক্ষাপট, যা হযরত ইব্রাহীম (আ) ও বিবি হাজেরা এবং তাঁদের পুণ্যবান সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ)-এরদ্বারা রচিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে। এভাবে হযরত আদম (আ) থেকে আজ পর্যন্ত সর্বযুগের আল্লাহ্ প্রেমিক, আল্লাহ্তে নিবেদিতপ্রাণ নবী-রাসূল, ওলী-আবদাল তথা আল্লাহ্র নেক্কার, সত্যপ্রাণ ও মাকবূল বান্দাগণের পরম ব্যাকুলতার সাথে আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফের মাধ্যমে হাজার হাজার বছরের আত্মনিবেদনের মাধ্যমে রচিত হয়েছে হজ্জ ও যিয়ারতের সুবিশাল প্রেক্ষাপট।

সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ আদায় করেছেন। এরপর হযরত নূহ্ (আ) সহ অন্যান্য নবী-রাসূলগণ সকলেই বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত ও তাওয়াফ করেছেন।[২]

হাদীসে বর্ণিত আছে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের পুনঃনির্মাণের কাজ সমাধা করার পর হযরত জিব্রাঈল (আ) হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে এই পবিত্র গৃহের তাওয়াফ ও হজ্জ করার জন্য বললেন। এ নির্দেশ পেয়ে হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ) উভয়েই তাওয়াফ সহ হজ্জের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমাধা করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম করলেন, হে ইব্রাহীম! তুমি গোটা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা ছড়িয়ে দাও। এ মর্মে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَّ عَلىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۔

এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, তারা আসবে দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৭)

তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ) একটি উঁচুস্থানে আরোহণ করলেন এবং ডানে-বামে, পূর্ব-পশ্চিমে ফিরে হজ্জের ঘোষণা করলেন। বললেন :

اَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَاَجِيْبُوْا رَبَّكُمْ ۔

"হে লোক সকল! বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও।" এ আহবান শুনে পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত যাদের হজ্জ নসীব হবে তারা সকলেই لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ 'হাযির হে প্রভু ! আমরা সকলেই হাযির' বলেছে। কেউ সাড়া দিয়েছে একবার, আবার কেউ সাড়া দিয়েছে একাধিকবার। যারা একবার সাড়া দিয়েছে, তাদের একবার হজ্জ নসীব হয়। আর যারা একাধিকবার সাড়া দিয়েছে, তাদের একাধিকবার হজ্জ নসীব হয়। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পর যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাঁরা সকলেই বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারত করেছেন, হজ্জব্রত পালন করেছেন।[৩]

জাহিলিয়্যাতের যুগেও লোকেরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং যিয়ারত করতো। কিন্তু তারা তা করতো নিজেদের মনগড়া পন্থায়। নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার আলোকে জাহিলী বহু কর্ম তারা হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, হজ্জের মৌসুমে কুরাইশগণ অন্যান্য হাজীদের ন্যায় আরাফায় না গিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। তারা বলতো, আমরা হুম্‌স। আমাদের একটা স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য রয়েছে। তাই অন্যান্যদের মত আমরা সেখানে যেতে পারি না।

বস্তুত কালের বিবর্তনে হজ্জ তার আপন পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্য খেল-তামাশা এবং অশ্লীল চিত্তবিনোদনের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল তখন। তখন তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতো।[৪] ইসলাম জাহিলী যুগের এসব কুসংস্কার চিরতরে বন্ধ করার লক্ষ্যে নতুনভাবে হজ্জের ফরযিয়াতের বিধান প্রবর্তন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৭)

ইসলামী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সকল মুসলমান সমান। কাজেই অন্যান্য লোকেরা যেমন আরাফা পর্যন্ত যায়, তেমনিভাবে কুরাইশগণকেও আরাফা পর্যন্ত যেতে হবে।

ইরশাদ হয়েছে :

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৯)

হজ্জকে জাহিলী যুগের বাকযুদ্ধ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۔

তারপর তোমরা যখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে। (সূরা বাকারা, ২ : ২০০)

ইরশাদ হয়েছে :

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۔

হজ্জ অবস্থায় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৭)

জাহিলী যুগের মুশরিক লোকেরা উপাস্য দেব-দেবীর নামে পশু বলি দিত এবং গোশ্ত দেব-দেবীর সামনে রেখে দিত আর গায়ে রক্ত ছিটিয়ে দিত। বস্তুত এ ধরনের কার্যকলাপ বোকামী বৈ কিছু নয়।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۔

আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না তাদের গোশ্ত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাক্ওয়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৭)

জাহিলী যুগের আরেকটি হাস্যকর রেওয়াজ ছিল এই যে, হজ্জের নিয়্যাত করার পর দরজা পথে ঘরে প্রবেশ করাকে তারা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করত। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল হজ্জ নষ্ট করে দেওয়ার নামান্তর। কুরআন মাজীদে এ সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

এবং পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে তাক্ওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৯)

মুশরিক লোকদের আরেকটি বাড়াবাড়ি এই ছিল যে, তারা হজ্জের সফরে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নিয়ে যাওয়া তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করতো। তাদের যুক্তি ছিল, আমরা আল্লাহ্‌র মেহমান। সাথে করে কিছু নিয়ে যাওয়া মেযবানের অপমানেরই নামান্তর। এদিকে তারা আবার অন্যের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করতেও কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হতো না; বরং এটাকে তারা অহংকার দমনের সাধনা বলে চালিয়ে দিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ চতুরতার পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে ঘোষণা করলেন :

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ٠

এবং তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। তবে মনে রাখবে তাক্ওয়াই উত্তম পাথেয়। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৭)

হজ্জের সময় মুশরিক লোকেরা আরেকটি নির্লজ্জ কাজ করতো। তা হলো, তারা উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করতো। তাদের যুক্তি ছিল যে, এই পোশাক পরিধান করে বছর ভর আল্লাহ্র নাফরমানী করেছি। সুতরাং এ পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ করতে পারি না। বস্তুত এটা ছিল রুচিবিরোধী অশ্লীল কাজ। তাই কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে সম্বোধন করে বলেন :

يٰبَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ٠

হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বিদায় হজ্জের এক বছর পূর্বে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, আগামী বছর থেকে কোন মুশ্রিক ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে পারবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায়ও কেউ তাওয়াফ করতে পারবে না। মোটকথা, এই সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আত হজ্জকে আবার সুন্নাতে ইব্রাহীমীর দিকে ফিরিয়ে আনল। ফলে যাবতীয় শিরক, বিদ্'আত ও জাহিলী কর্ম হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে হজ্জ আবার তাওহীদের প্রতীক হিসাবে প্রতিবিম্বিত হলো।[৫]

মক্কা শরীফ

মু'মিনের অন্তরে পবিত্র মক্কা নগরীর প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। যার ফলে এ নগরীর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে-শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশেষণ। তাই মক্কা কেবল মক্কাই নয়, মক্কা হলো মুকার্রমা, মক্কা শরীফ। কুরআন মাজীদেও এ নগরের বিভিন্ন বিশেষণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ٠

আর এভাবে আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন নগরসমূহের মাতা মক্কা ও তার চতুর্দিকের লোকজনকে। (সূরা শূরা, ৪২ : ৭)

উক্ত আয়াতে মক্কা শরীফকে 'উম্মুল কুরা'—'নগরসমূহের মা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে এ নগরীকে 'নিরাপদ নগরী' বলে অভিহিত করে এর শপথ করেছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। ইরশাদ হয়েছে :

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ٠

তীন, যায়তূন, সিনাই পর্বত এবং এ নিরাপদ নগরীর শপথ! (সূরা তীন, ৯৫ : ১-৩)

এককভাবে মক্কা নগরীর শপথও উচ্চারিত কুরআনুল কারীমে :

لاَ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۔

শপথ এ নগরীর, আর আপনি এ নগরীর অধিকারী। (সূরা বালাদ, ৯০ : ১-২)

কুরআন মাজীদে এ নগরীকে 'বাক্কা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔

নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়) ইহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ৯৬)

এ নগরীকে নবী কারীম (সা) প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তাই হিজরতের সময় মক্কা ত্যাগ কালে তিনি আফসোস করে বলেছিলেন :

مَا اَطْيَبُ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبُّكَ اِلَىَّ وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمِىْ اَخْرَجُوْنِىْ مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ ۔

তুমি কতই না উত্তম নগরী এবং আমার নিকট কতই না প্রিয় নগরী, আমার সম্প্রদায় যদি আমাকে বের করে না দিত, তাহলে তোমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও আমি বসবাস করতাম না।[৩]

এ সেই পূতপবিত্র নগরী, যার জন্য আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইব্‌রাহীম (আ) দু'আ করেছিলেন :

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ ۔

স্মরণ কর, যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলেছিলেন, হে আমার পরওয়ারদিগার ! একে তুমি নিরাপদ নগরী কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকা দান কর। (সূরা বাকারা, ২ : ১২৬)

এ সেই নগরী, যেখানে মহানবী (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন, জীবনের তেপ্পান্ন বছর এ নগরীতেই কাটিয়েছেন। এখানেই তিনি ওহী ও নুবূওয়াত লাভ করেছেন। এখান থেকেই তিনি মি'রাজে গমন করেছেন। আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর কা'বা শরীফ এ পবিত্র মক্কা নগরীতেই অবস্থিত, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের ঘর বলে অভিহিত করে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ও ইসমাঈল (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন :

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۔

তোমরা দু'জনে পবিত্র কর আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ'-সিজ্‌দাকারীদের জন্যে। (সূরা বাকারা, ২ : ১২৫)

উপরন্তু আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۔

নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো বাক্কায়, তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্যে পথের দিশারী। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন)

মাকামে ইব্‌রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৬-৯৭)

বায়হাকীর উদ্ধৃত এক হাদীসের বরাতে আল্লামা ইবৃন কাছীর (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্ তা'আলা জিব্‌রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তাঁদেরকে কা'বা ঘর নির্মাণের আদেশ দেন। সে মতে তা নির্মিত হওয়ার পর তাঁদেরকে তা তাওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি এবং এ ঘরটি সর্বপ্রথম ঘর, যা আদম জাতির জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোন কোন বর্ণনার দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ্ (আ)-এর যুগের মহাপ্লাবন পর্যন্ত এ ঘরটি অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর হযরত ইব্‌রাহীম (আ) পুরাতন ভিতের উপর তা পুনর্নির্মাণ করেন।[৭]

এরূপ মর্যাদার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাকে সম্মানিত ঘর এবং মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৯৭)

কুরআনে কারীমে এ ঘরের মর্যাদা প্রসঙ্গে এসেছে :

اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا ۔

আমি আদিষ্ট সেই ঘরের প্রভুর ইবাদত করতে, যাকে তিনি হরম (সম্মানিত) সাব্যস্ত করেছেন। (সূরা নামল, ২৭ : ৯১)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেন :

لاَ تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوْا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهٖ فَاِذَا ضَيَّعُوْا ذٰلِكَ هَلَكُوْا ۔

আমার উম্মাত ততদিন পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তারা মক্কার যথার্থ সম্মান করবে। যখন তারা এর অন্যথা করবে, তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।[৮]

মক্কা শরীফের আদব

মক্কা শরীফ ও কা'বা ঘরের সম্মান করা এবং এ ব্যাপারে সম্ভ্রমপূর্ণ আচার-আচরণ অবলম্বন করা মুসলমানমাত্রেরই কর্তব্য। তাই ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে 'মক্কা প্রবেশের পূর্বে গোসল' শিরোনামে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে :

كَانَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مَكَّةَ اِلاَّ بَاتَ بِذِىْ طُوًى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّىْ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ ۔

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) যখন মক্কা শরীফে আসতেন, তখন যী-তুওয়া নামক স্থানে রাত্রি যাপন করতেন। ভোরে গোসল করতেন এবং সেখানে ফজরের নামায আদায় করতেন। পরে মক্কা শরীফে প্রবেশ করতেন এবং এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, নবী কারীম (সা) এরূপই করতেন।[১০]

'হরম' সীমানায় শিকার করা এমনকি শিকারীকে শিকারের ব্যাপারে পথপ্রদর্শন বা কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা করা যে হারাম, তা এই হরম শরীফের সম্মানের কারণেই। আবহমানকাল থেকেই 'হরম' নিরাপদ ও সম্মানিত স্থান বলেই গণ্য হয়ে আসছে। যুদ্ধরত আরব গোত্রসমূহ সেই জাহিলিয়্যাতের যুগেও শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও 'হরম' সীমায় বধ করতো না বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতো না। 'হরম' এর এই সম্মান কিয়ামাতকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে। নবী কারীম (সা) বলেন :

فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ٠

কিয়ামাত অবধি ইহা আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্মানের ভিত্তিতে সম্মানিত। সুতরাং 'হরম' এলাকায় কাঁটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং তার শিকার জন্তুকে হাঁকানো হবে না।[১১]

. মক্কা মুয়ায্যামায় প্রবেশকালে গোসল করা যে সুন্নাত, তা জিদ্দায় সেরে আসলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। [আহ্কামুল হাজ্জ ওয়াল উমরা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)]

বিশ্বখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থে আছে :

وَاِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ ٠

যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফ নযরে আসবে তখন 'আল্লাহু আক্বার' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করবে। হযরত ইব্ন উমর (রা) ঐ সময় বলতেন بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ('বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আক্বার)।

'বাবুস সালাম' দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করা উত্তম।

নবী কারীম (সা) মসজিদুল হারাম দর্শনকালে দু'হাত উর্ধ্বে তুলে এরূপ দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَعْظِيْمًا وَتَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا ٠

হে আল্লাহ্! এ ঘরের মান-মর্যাদা সম্ভ্রম বৃদ্ধি করুন এবং যারা এ ঘরে হজ্জ বা উমরা করে, তাদের মান-মর্যাদা, সম্ভ্রমও বৃদ্ধি করুন।[১২]

পবিত্র কা'বার দরজায় প্রবেশের সময় ডান পা প্রথমে রাখবে এবং দুরূদ শরীফ পাঠ করে এ দু'আ করবে :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا اَبْوَابَ رِزْقِكَ ٠

হে আল্লাহ্! আমার জন্যে আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন এবং রিয্কের দরজাসমূহ আমার জন্যে সহজ করে দিন।

মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কাজ হলো তাওয়াফ। এখানে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নফল নামায পড়তে হয় না।[১৩]

হজ্জের ফযীলত ও গুরুত্ব

হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি বিশেষ স্তম্ভ। এর ফরযিয়াত অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে

প্রমাণিত। এর ফরযিয়াত অস্বীকার করা কুফরী। জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। বিশুদ্ধমতে হজ্জ ফরয হওয়ার পর বিলম্ব না করে আদায় করা অবশ্য কর্তব্য।[১৪]

হজ্জই হচ্ছে এমন ইবাদত যা সম্পাদন করতে জান-মাল উভয়ই প্রয়োজন হয়। হাদীসে হজ্জের ফযীলতের কথা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ·

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী কারীম (সা)-কে প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম আমল কোনটি ? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। প্রশ্ন করা হল, তারপর কোন্‌টি ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করা হল, এরপর কোন্‌টি ? উত্তরে তিনি বললেন, হজ্জে মাব্‌রূর অর্থাৎ মাকবূল হজ্জ।[১৫]

অন্য হাদীসে আছে :

اَلْحَجُّ مَبْرُوْرٌ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ ·

মাকবূল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।[১৬]

অপর এক হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ ·

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ করল, হজ্জের কার্যাবলী আদায়কালে স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকল ও গুনাহের কাজ করল না, সে মাতৃগর্ভ হতে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।[১৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন : বাহ্যিক কোন কারণ, যালিম বাদশাহ কিংবা অসুস্থতা হজ্জ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি হজ্জ আদায় না করে মারা যায়, তবে সে ইয়াহূদী হয়ে মৃত্যুবরণ করুক কিংবা খ্রীস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক (তাতে কিছু আসে যায় না)।[১৮]

হজ্জের হাকীকাত ও তাৎপর্য

আল্লাহ্ তা'আলা হাকীম ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কাজই হিক্‌মাত ও রহস্য থেকে খালি নয়। গবেষক আলিমগণ অনেকেই হজ্জের হাকীকাত ও তাৎপর্যের কথা আলোচনা করে কিতাব লিখেছেন। বস্তুত হজ্জের মধ্যে মৌলিকভাবে দু'টি বিষয়ই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। হজ্জের প্রতিটি আমলের মধ্যে এ দু'টি দৃশ্যের প্রকাশ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, ১. হজ্জ আখিরাতের সফরের এক বিশেষ নিদর্শন এবং ২. হজ্জ আল্লাহ্‌র ইশ্‌ক ও মহব্বত প্রকাশের এক অনুপম বিধান।

মুহাক্কিক আলিমগণ হজ্জের সফরকে আখিরাতের সফরের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা মানুষ যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়; তখন আত্মীয়-স্বজন, বাড়ি-ঘর, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে তারা যেন পরকালের সফরে বের হয়। মৃত্যুর সময় যেমন বাড়ি-ঘর, দোকান-মাকান ত্যাগ করতে হয়, অনুরূপভাবে হজ্জের সময়ও এ জাতীয় সবকিছু বর্জন করতে হয়। যানবাহনে আরোহণ হাজীকে খাটিয়ায় সাওয়ার হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইহ্রামের দু'টুক্রা শ্বেত-শুভ্র কাপড় তীর্থপথের যাত্রীর মনে কাফনের কাপড়ের কথা জাগরূক করে দেয়। ইহ্রামের পর 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলা কিয়ামাতের দিন আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়ার সমতুল্য। সাফা-মারওয়ার সাঈ হাশরের ময়দানে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করার মত। সেদিন যেমন মানুষ দিশেহারা হয়ে নবী-রাসূলগণের নিকট দৌড়াদৌড়ি করবে, অনুরূপভাবে হাজীরাও সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝামাঝি স্থানে দৌড়াদৌড়ি করে থাকে। আরাফার ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থান হাশরের ময়দানের নমুনা বলে বোধ হয়। সূর্যের প্রচণ্ড তাপের মধ্যে আশা ও ভয়ের এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয় এই ময়দানে। এক কথায়, হজ্জের প্রতিটি আমল থেকেই আখিরাতের সফরের কথা ভেসে ওঠে হজ্জযাত্রীর হৃদয়ে। এটাই হলো হজ্জের প্রধানতম তাৎপর্য ও রহস্য।

দ্বিতীয়ত, হজ্জ হল আল্লাহ্‌র ইশক্ ও মহব্বত প্রকাশ করার এক অপরূপ বিধান। অর্থাৎ প্রেমাস্পদের আকর্ষণে মতোয়ারা হয়ে প্রেমিক ছুটে চলে যিয়ারাতে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। কখনো মক্কায়, কখনো মদীনায়, কখনো আরাফায়, আবার কখনো মুযদালিফায় উপস্থিত হয়ে হাজী কান্নাকাটি ও গড়াগড়ি করছে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে। দাঁড়াবার সুযোগ নেই তার কোথাও। এভাবে ছুটাছুটি করে উত্তপ্ত হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করতেই সদা সে সচেষ্ট। হজ্জের প্রতিটি আমলেই আমরা দেখতে পাই প্রেমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেননা বন্ধু-বান্ধব, বাড়ি-ঘর এবং আত্মীয়-স্বজনের মায়া ছেড়ে দিয়ে প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া এবং তাঁরই তালাশে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত এবং সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পবিত্র মক্কা ও মদীনার অলিতে-গলিতে দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করা এ একমাত্র প্রেমিকেরই কাজ।

ইহ্রাম বাঁধা প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। না আছে মাথায় টুপি, না শরীরে জামা, না সুন্দর পোশাক, না আছে সুগন্ধি; বরং ফকীরের বেশে সদা চঞ্চল ও উদাসীন মনে সেলাইবিহীন শ্বেত ও শুভ্র কাপড়ে আচ্ছাদিত মুহ্রিমের সে কি এক অপূর্ব দৃশ্য! 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলতে বলতে ছুটে চলছে তারা মক্কা ও মদীনার পানে। 'প্রভু, বান্দা হাযির, হাযির আমি তোমার দরবারে'-এই বলে কান্নাকাটি করে হাজী মক্কা ও মদীনায় পৌঁছে মনে করে আমি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছি। কারণ বিচ্ছেদের অনলে দগ্ধ একটি অন্তর যখন প্রিয়তমের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়, তখন তার আবেগ সমুদ্র কত যে তরঙ্গায়িত হতে থাকে, তা প্রেম পাগল ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো বোঝা বড়ই দায়। এমনিভাবে হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া, মুলতাযাম জড়িয়ে ধরা, কা'বার চৌকাঠ ধরে কান্নাকাটি করা এবং মধু মক্ষিকার মত বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করা সবই ইশ্‌কে ইলাহীর অনুপম দৃশ্য। প্রেম ও ভালবাসার চরম বিকাশ ঘটে জামরাতে কংকর নিক্ষেপের সময়। কেননা প্রেমিকের

আবেগ যখন চরমে পৌঁছে তখন প্রেমাস্পদকে লাভ করার পথে যে-ই বাধা হয় তাকেই সে এলোপাথাড়ি পাথর নিক্ষেপ করে। অনুরূপভাবে, জামরাতে এসে হাজীও তা-ই করে থাকে।

এরপর পশু কুরবানী করে প্রেমানুরাগের শেষ মঞ্জিল অতিক্রম করে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে আসে হাজী স্বীয় মুসাফিরখানায়। তখনও মাহবুবের দেশে ফের যাওয়ার অনির্বাণ শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে তার হৃদয়ের কোণে কোণে। সারকথা, আল্লাহ্ প্রেমিক মানুষ আল্লাহ্ পাকের মহব্বতেই পবিত্র বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে বের হয় এবং এটাও হজ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য।[১৯]

হজ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

হজ্জ একান্তই ব্যক্তিগত আমল। ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই হাজী হজ্জ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হজ্জের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুত হজ্জের মৌসুম এমন এক বসন্ত মৌসুম, যার আগমনে নতুন প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মুসলিম উম্মাহ্। এ কারণেই হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ মানুষ হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে ছুটে আসে। যারা হজ্জে গমন করেন তারা তো ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত থাকেনই, অনুরূপভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজন যারা হাজীদের বিদায় সম্ভাষণ এবং ফেরার পর অভ্যর্থনা জানায় এবং হাজীদের কাছ থেকে হজ্জের বিস্তারিত অবস্থা শোনে, তাদের মধ্যেও ধর্মীয় নবচেতানার উন্মেষ ঘটে।

এমনিভাবে হাজীদের কাফেলা যে স্থান দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে তাদের দেখে এবং তাঁদের লাব্বাইক আওয়াজ শুনে সেখানকার কতো মানুষের দিল ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে এবং কত মানুষের অচেতন আত্মায় হজ্জ করার উৎসাহ জেগে উঠে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন দেশ হতে আগত হজ্জ যাত্রীদের শারীরিক কাঠামো ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, কিন্তু মীকাতের নিকটে এসে তারা নিজেদের পোশাক খুলে একই ধরনের কাপড় পরিধান করে, তখন তাদের মধ্যে একই ইলাহ্-এর বান্দা হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সকলের মুখে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। তারপর মক্কা ও মদীনার পবিত্র ভূমিতে কাফেলা একত্রিত হয় এবং সকলে একই পদ্ধতিতে একই ইমামের পেছনে নামায আদায় করেন। এইভাবে সমবেত মুসলিম জনতা ভাষা, জাতি এবং দেশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের বিরাট সুযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে, হজ্জের এ বিশ্ব সম্মিলন হল, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই"-এর বাস্তব নমুনা। হজ্জের মৌসুমে এ চেতনা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণ যদি সমষ্টিগত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চান, তবে হজ্জের মৌসুমই এর জন্য উৎকৃষ্ট সময়।

হজ্জের মৌসুমে আলিম-উলামা এবং সূফী ও সংস্কারকগণ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় একত্রিত হয়ে থাকেন। তাই এ সময় উম্মাহ্র সঠিক অবস্থা পর্যালোচনা করা, তাদেরকে শির্ক ও

বিদ্'আতের অভিশাপ হতে মুক্ত করা এবং মুসলিম বিশ্বে তা'লীম ও তাবলীগী মিশন প্রেরণের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

হজ্জ যেহেতু মুসলিম উম্মাহ্র এমন এক বিশ্ব সম্মিলন, যেখানে সব শ্রেণীর মানুষই এসে সমবেত হয়, তাই এই সময়ে বিশ্বশান্তি স্থাপনে এবং জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ মিটিয়ে, লড়াই-ঝগড়ার পরিবর্তে ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

হজ্জ সম্মিলন মুসলিম উম্মাহ্র এক বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র শান-শওকতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলো সংহত হয়। দিকে দিকে উম্মাহ্র সুখ্যাতি ও গৌরব ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও বহু কল্যাণ, উপকারিতা এবং হিক্‌মাত হজ্জের মধ্যে নিহিত রয়েছে।[২০]

হজ্জের সময়

হজ্জ-এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। এর বাইরে হজ্জ আদায় করা জায়িয নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۔

হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ اَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُوالْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ ۔

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, হজ্জের মাসসমূহ হচ্ছে শাওয়াল, যিলক্বদ এবং যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন।[২১]

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, হজ্জের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এর পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা জায়িয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলে হজ্জ আদায়ই হবে না। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অবশ্য হজ্জ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহ্ হবে।[২২]

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুসলমান হওয়া।
২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।
৩. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া।
৪. আযাদ হওয়া।
৫. হজ্জ পালনের দৈহিক ও আর্থিক সঙ্গতি থাকা।
৬. হজ্জের সময় হওয়া।
৭. হজ্জ যাত্রাপথের নিরাপত্তা।
৮. বিধর্মী শত্রু'রাষ্ট্রের নও-মুসলিমের পক্ষে হজ্জ ফরয হওয়ার জ্ঞান থাকা।

হজ্জের প্রস্তুতি

হজ্জ যাত্রার প্রস্তুতির দু'টি দিক রয়েছে, একটি ধর্মীয় ও মানসিক প্রস্তুতি, অপরটি দুনিয়াদারী বা বাহ্যিক প্রস্তুতি। একে আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতিও বলা যেতে পারে।

ক. মানসিক ও ধর্মীয় প্রস্তুতি

১. পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে তাক্ওয়া অবলম্বন তথা ইসলামী জীবন যাপনের উপদেশ দান।

২. কারো সাথে কোন লেনদেন থাকলে তা যথাসাধ্য চুকিয়ে ফেলা এবং পুরাপুরি চুকানো সম্ভব না হলে তা লিখে রাখা এবং কয়েকজন সাক্ষী রাখা।

৩. অতীতের গুনাহরাশির জন্যে আল্লাহ্র দরবারে তাওবা করে নেওয়া। তাওবার মর্ম হচ্ছে :

ক. গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়া।

খ. গুনাহের জন্য অনুশোচনা করা ও লজ্জিত হওয়া এবং

গ. ভবিষ্যতে আর গুনাহ্ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

৪. কারো ধন-সম্পদ জমি-জিরাত বা অন্য কোন হক্ নিজের জিম্মায় থাকলে তা আদায় করা। উপরন্তু কারো কোনরূপ মনোকষ্টের কারণ ঘটিয়ে থাকলে তার জন্যেও ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দায়মুক্ত হওয়া।

৫. হালালভাবে অর্জিত মালের সংস্থান। কেননা নবী কারীম (সা) বলেছেন :

انَّ اللّٰهَ تَعَالىٰ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ الاَّ طَيِّبًا ‏.

আল্লাহ্ তা'আলা নিজে পবিত্র, পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু তিনি কবূল করেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার হালালভাবে অর্জিত সম্পদ নিয়ে হজ্জে বের হয়, বাহনে চড়ে, সে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়ে আল্লাহ্র দরবারে হাযিরা দেয়। 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'—হাযির প্রভু তোমার দরবারে হাযির। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার জবাবে বলেন : 'লাব্বাইক ও সা'দায়িক'—আমিও হাযির, তোমার অনুকূলে আমি আছি, তুমি সৌভাগ্যের অধিকারী। কেননা তোমার পথ খরচা, তোমার বাহন সবকিছু হালাল উপায়ে অর্জিত। পক্ষান্তরে যে হারাম মাল নিয়ে হজ্জে বের হয়, তার লাব্বাইক উচ্চারণের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : 'লা লাব্বাইক ওয়া লা সা'দাইক'-আমি তোমার জন্যে হাযির নই, তোমার অনুকূলেও নই, তোমার সৌভাগ্য নেই। কেননা তোমার হজ্জ উপলক্ষে ব্যয়িত সম্পদ হালালভাবে অর্জিত নয়।[২৩]

৬. যাচ্ঞা করা থেকে বিরত থাকা। অনেকে হজ্জকে উপলক্ষ করে যাচ্ঞা করতে থাকে, এটা খুবই নিন্দনীয়।

৭. নিয়্যাত বিশুদ্ধকরণ—হজ্জ হবে একান্তই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে, নামধাম ও জৌলুস প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়।

৮. হজ্জ ও উমরার মাস'আলাসমূহ শিক্ষা করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ .

আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও।

৯. উত্তম সফরসঙ্গী নির্বাচন, কেননা উত্তম সফরসঙ্গী ইবাদাত-বন্দেগীর সহায়ক হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিদেশ-বিভূঁয়ে আপদে-বিপদে সংযমী, সহানুভূতিশীল বিবেকবান সফরসাথী ছাড়া বিশেষ অসুবিধা হয়। হজ্জের মাস'আলা জানা অভিজ্ঞ আলিম ও সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী সাথী মাকবূল হজ্জ হাসিলের বিশেষ সহায়ক।

১০. নিজকে সর্বতোভাবে গুনাহের কাজসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। কেননা অশ্লীল কার্যাদি ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে হজ্জ পালনকারীর জন্যেই কবূলিয়ত ও জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে।[২৪]

১১. মাতাপিতা জীবিত থাকলে এবং তাঁদের সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন থাকলে বা পথ বিপজ্জনক হলে তাদের অনুমতি নেওয়া।

খ. আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি

১. হজ্জের নিয়ন্ত্রণ যেহেতু ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হাতে, তাই তাদের জারীকৃত নির্দেশাদি ও তাদের বিলিকৃত পুস্তিকা ও ইশতেহারাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে সেমতে কাজ করা।

২. যথাসময়ে হাজী ক্যাম্পে পৌঁছে স্বাস্থ্যগত আনুষ্ঠানিক বিষয়, ইনজেকশন ও স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট ইত্যাদি গ্রহণ করা।

৩. ইহ্রামের কাপড় (এক জোড়ার স্থলে দুই জোড়া নেওয়াই উত্তম), প্রয়োজনীয় দু'আ-দুরূদ ও অযীফা পুস্তক, হজ্জের মাস'আলা সংক্রান্ত পুস্তক ও প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি, কাপড়-চোপর ও হাল্কা বিছানাপত্র (মশারী সহ), রঙিন চশমা, খাতা, কাগজ, অভঙ্গুর ও হাল্কা বাসনপত্র, মিস্ওয়াক্, কুলূখের কাপড় বা টয়লেট পেপার, ক্ষৌর সামগ্রী ও আয়না, সুতলী, দড়ি, ছাতা সর্বোপরি তালা-চাবিসহ একটি মজবুত সুটকেস বা ব্যাগ, জরুরী কাগজপত্র ও টাকা-পয়সা রাখার মত একটি প্রশস্ত কোমরবন্ধ সাথে নেওয়া। খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে না নেওয়া।

৪. বাক্স ও ব্যাগে নিজের নাম-ঠিকানা ও নম্বর পরিষ্কারভাবে লিখে বা লিখিয়ে নেওয়া যাতে হারিয়ে গেলে সহজে পাওয়া যায়।

৫. পাসপোর্ট, সার্টিফিকেট ও বিমানের টিকিট ইত্যাদি সাবধানে রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন।

৬. মহিলাদের বোরকা সাথে নেওয়া, অলংকারাদি যতদূর সম্ভব কম নেওয়া উত্তম। কেননা অনেক সময় তা বিপদের ও পেরেশানীর কারণ হয়ে যায়।

৭. প্রয়োজনীয় আরবী কথোপকথন শিখে নেওয়া, যাতে টুকটাক কথা বলা ও বোঝা যায়।

৮. মক্কা, মদীনা, আরাফাত ও মীনায় বাংলাদেশ দূতাবাস ও হজ্জ মিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকার :

১. ইফরাদ—হজ্জের মাসে উমরা ছাড়া কেবল হজ্জ করা। এরূপ হাজীকেক 'মুফরিদ' বলা হয়ে থাকে।

২. তামাত্তু'—হজ্জের মাসে প্রথমে উমরা এবং পরে হজ্জ করা। এরূপ হাজীকে 'মুতামাত্তে' বলা হয়ে থাকে।

৩. কিরান—হজ্জ ও উমরা এক সাথে মিলিয়ে করা। এরূপ হাজীকে 'কারিন' বলা হয়ে থাকে।

৪. কিরান হজ্জই উত্তম। কেননা এতে এক ইহ্রামে দীর্ঘদিন থাকতে হয় বলে কষ্ট বেশি হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিদায় হজ্জ কিরান হজ্জই ছিল।[২৫]

হজ্জের আহ্কাম

হজ্জের ফরয তিনটি :

১. ইহ্রাম বাঁধা বা আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জের নিয়্যাত করা।

২. আরাফাতে অবস্থান (উকূফ), ৯ই যিলহজ্জের সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ১০ই যিলহজ্জের ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত, ১০ই যিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন দিন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা।

এ তিনটি ফরযের একটি ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছরে তার কাযা আদায় করা ফরয হয়ে যাবে।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাতের আগেই ইহ্রাম বাঁধা।

২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে উকূফ করা।

৩. কিরান বা তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির কুরবানী আদায় করা এবং তা রমী ও মাথা মুণ্ডানোর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা।

৪. সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা এবং সাফা থেকে সাঈ আরম্ভ করা।

৫. মুযদালিফায় উকূফ করা।

৬. তাওয়াফে যিয়ারত আইয়্যামে নহরের মধ্যে সম্পাদন করা।

৭. রমী বা শয়তানকে কংকর মারা।

৮. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা। আগে রমী ও পরে মাথা মুণ্ডানো।

৯. মীকাতের বাইরে লোকদের জন্য—তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এগুলোর কোন একটিও ছুটে গেলে হজ্জ হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কাফ্ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হবে।

এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ে।[২৬]

হজ্জের সুন্নাতসমূহ

১. মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্যে যারা ইফ্রাদ বা কিরান হজ্জ করেন তাদের জন্যে তাওয়াফে কুদূম করা।

২. তাওয়াফে কুদূমে রমল করা। এ তাওয়াফে রমল না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়ী তাওয়াফে তা করে নিতে হবে।

৩. ইমামের জন্য তিন স্থানে খুত্‌বা প্রদান করা। অর্থাৎ ৭ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমায়, ৮ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে এবং ৯ই যিলহজ্জ মিনায়।

৪. ৮ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান।

৫. ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় যাওয়া।

৬. আরাফাতের ময়দান থেকে ইমামের রওনা হওয়ার পর রওনা হওয়া।

৭. আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

৮. আরাফাতে গোসল করা।

৯. মিনার কাজকর্ম সম্পাদনকালে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

১০. মিনা থেকে ফেরার পথে মুহাসসাব নামক স্থানে স্বল্পক্ষণের জন্যে হলেও উকূফ করা।[২৭]

মীকাত

হজ্জের মীকাত বিভিন্ন দেশের হাজীদের জন্যে বিভিন্ন। তাই এক-একদিক থেকে আগত হাজীদেরকে এক-একটি মীকাতে পৌঁছে ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়।

মীকাত সীমার বাইরের লোকদের জন্য মীকাত পাঁচটি :

১. যুল হুলায়ফা বা বীরে আলী—মদীনাবাসী ও মদীনার পথে হজ্জে আগমনকারীদের জন্য।

২. যাতে ইর্‌ক—ইরাকবাসীদের এবং সেদিক থেকে আগমনকারীদের জন্য।

৩. জুহ্‌ফা—সিরিয়াবাসীদের এবং সেদিক থেকে আগতদের জন্য।

৪. কারন্—নজ্‌দবাসী এবং নজ্‌দের দিক থেকে আগমনকারীদের জন্যে।

৫. ইয়ালামলাম—ইয়ামনবাসী এবং বাংলাদেশ, পাক-ভারত উপমহাদেশ তথা প্রাচ্য থেকে সাগর পথে আগত হজ্জযাত্রীদের জন্যে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসে এ মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। (হিদায়া : কিতাবুল হাজ্জ)

মীকাতের ভিতরে অথচ 'হরম' এলাকার বাইরে বসবাসকারীদের জন্য সমগ্র 'হিল' এলাকাই মীকাত স্বরূপ। অর্থাৎ 'হরম' এলাকার চৌহদ্দীর বাইরের যে কোন স্থান থেকে তাদের ইহ্‌রাম বাঁধা চলে। তবে তাদের নিজেদের ঘর থেকে ইহ্‌রাম বাঁধাই উত্তম। এমন এলাকার লোকদের প্রত্যেকবারই হরম প্রবেশের জন্যে ইহ্‌রাম বাঁধা জরুরী নয়। কেবল হজ্জ ও উমরার জন্যেই তাদের ইহ্‌রাম বাঁধা জরুরী। আর যারা হারাম শরীফের সীমানার মধ্যেই অবস্থান করেন তারা হজ্জের জন্যে হরম এলাকার যে কোন স্থানেই ইহ্‌রাম বাঁধতে পারেন। তবে উমরার জন্য তাঁদেরকে হরম সীমার বাইরে হিল এলাকার যে কোন স্থান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে আসত হবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহ্‌মানকে উমরার জন্যে 'তানঈম' থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মীকাতের বাইরে বসবাসকারী হজ্জ, উমরা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে হরম শরীফে গেলে তার জন্য মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে আসা ওয়াজিব।

ইহ্‌রাম

নামাযের উদ্দেশ্যে যেমন তাহ্‌রীমা বাঁধা হয়, হজ্জের জন্য ঠিক তেমনি ইহ্‌রাম বাঁধা হয়। এটি হজ্জের আনুষ্ঠানিক নিয়্যাত। তাহ্‌রীমা ও ইহ্‌রাম একই ধাতু থেকে নির্গত একই অর্থবোধক শব্দ। এ দু'টি শব্দের অর্থই হচ্ছে হারাম করা। নামাযী যেমন তার নিয়্যাতের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থার হালাল অনেক ব্যাপারেই নিজের জন্য হারাম করে নেয়, ঠিক তেমনি একজন হজ্জযাত্রীও ইহ্‌রাম বাঁধার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় যা তার জন্য বৈধ যেগুলো হজ্জ পালনকালে বা ইহ্‌রাম অবস্থায় নিজের জন্য হারাম করে নেন।

ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বেই গোঁফ, বগল ও নাভীর নিচের ক্ষৌর কার্যাদি সম্পন্ন করে, নখ কেটে, গোসল করে পাক সাফ হয়ে যেতে হয়। এমন কি ঋতুবতী মহিলাদেরও এ সময় গোসল করা মুস্তাহাব। (হিদায়া)। ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে তাঁকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

গোসল করা সম্ভব না হলে উযূ করে নিলেও হবে। অনুরূপ চুল কাটার দরকার না থাকলে চিরুণী করে চুল বিন্যস্ত করে নিতে হয়। তারপর দুই রাকা'আত নামায ইহ্‌রামের নিয়্যাতে পড়তে হয়। এতে প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখ্‌লাস মিলানো মুস্তাহাব। ইহ্‌রামের দুই প্রস্ত সেলাইবিহীন কাপড় একটি লুঙ্গির মত এবং অপরটি চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে নিতে হয়। কাপড়গুলো নতুন হওয়া উত্তম। (হিদায়া)

কিব্‌লামুখী হয়ে বসা অবস্থায় এ ইহ্‌রামের কাপড় দু'টি পরতে হয় এবং ইফরাদ, তামাত্তু' বা কিরান অথবা উমরা করার জন্য এ ইহ্‌রাম বাঁধা হচ্ছে, তার নিয়্যাত করতে হয়। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কাছে এ দু'আও করতে হয় যে, তিনি তা পালন করা সহজ করে দেন এবং কবূল করেন। মুখে নিয়্যাতের কথা বলা উত্তম তবে জরুরী নয়। কেননা নিয়্যাত একান্তই অন্তরের ব্যাপার। নিয়্যাতের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ করলেই ইহ্‌রাম সম্পন্ন হয়।

যদি ইহ্‌রাম ইফরাদ হজ্জের জন্য হয় তাহলে তিনি বলবেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ হে আল্লাহ্! আমি হজ্জের নিয়্যাত করলাম, তুমি তা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে কবূল কর।

যদি কিরান হজ্জ হয় অর্থাৎ হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে নিয়্যাত করা হয় তাহলে হজ্জযাত্রী বলবেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ হে আল্লাহ্ ! আমি হজ্জ ও উমরার নিয়্যাত করছি, তুমি আমার জন্য এগুলো সহজসাধ্য করে দাও এবং কবূল কর।

কেবল উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধলে নিয়্যাতে কেবল হজ্জের নিয়্যাতে উক্ত اُرِيْدُ الْحَجَّ -এর স্থলে اُرِيْدُ وَالْعُمْرَةَ বলতে হবে। তামাত্তু'কারী একবার উমরার জন্যে এবং পরে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধবেন। একাধিক উমরার ক্ষেত্রে হরম শরীফ থেকে নিকটবর্তী মীকাত হচ্ছে তানঈম। হরম শরীফের বাইরে অন্যত্র থেকেও ইহ্‌রাম বাঁধা চলে। তবে মক্কা শরীফের অধিবাসীগণ বা বহিরাগত হাজীগণ সাধারণত তানঈমে গিয়েই ইহ্‌রাম বেঁধে আসেন। ইহ্‌রাম

বদলী হজ্জের উদ্দেশ্যে হলে দু'আন্তে تَقَبَّلْ مِنِّى না বলে ... تَقَبَّلْ مِنْ বলে যার বদলে হজ্জ করছেন তার নাম বলতে হয়।

ইহ্‌রামকারীর করণীয়

ইহ্‌রামকারী ইহ্‌রাম বাঁধার সাথে সাথেই সশব্দে তিনবার তালবিয়া পাঠ করবেন এভাবে :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ·

হাযির হে আল্লাহ্, তোমার সমীপে হাযির। আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই। তারপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিজের ইচ্ছেমত দু'আ করবেন। ইহ্‌রাম বাঁধার পর এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ ·

হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশা করছি এবং তোমার অসুন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

ইহ্‌রামকারীর জন্য নিষিদ্ধ বা বর্জনীয় কাজসমূহ

নিম্নোক্ত কার্যাদি ইহ্‌রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ :

১. যৌন সম্ভোগ ও সে সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করা।

২. পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরা, তবে স্ত্রীলোকের জন্য তা নিষিদ্ধ নয়।

৩. মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা, তাঁবু ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। স্ত্রীলোকগণ মাথা ঢাকতে পারেন তবে মুখ অনাবৃতই রাখবেন।

৪, সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৫. চুল বা পশম কাটা বা উপড়ানো।

৬. নখ কাটা, তবে ভাঙ্গা নখ ভেঙ্গে ফেলায় ক্ষতি নেই।

৭. কোন স্থলজ পশু শিকার করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ·

হে ঈমানদারগণ ! ইহ্‌রামরত অবস্থায় শিকার করো না। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৯৫)

অনুরূপভাবে শিকারকে হাঁকানো বা কাউকে দেখিয়ে শিকারের কাজে সহযোগিতা করা বা যবেহ্ করাও নিষিদ্ধ।

৮. নিজের শরীর বা মাথা থেকে উকুন বা উকুনজাতীয় প্রাণী বধ করা। তবে সাপ, মশা-মাছি, ডাশ, গিরগিটি, ইঁদুর, পাগলা কুকুর ইত্যাদি মারা জায়িয আছে।

ইহ্‌রামের মাকরূহ্ বিষয়সমূহ

১. শরীর থেকে ময়লা দূর করা, মাথা অথবা দাড়ি ও দেহ সাবানদ্বারা ধোয়া।

২. মাথায় চুল বা দাড়ি চিরুণীর দ্বারা আঁচড়ানো। এমনভাবে ওগুলো চুলকানোও মাকরূহ্ যাতে উকুন পড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

৩. দাড়ি খিলাল করাও মাকরূহ্, তবে দাড়ি পড়ে যায় না এমনভাবে খিলাল করায় কোন ক্ষতি নেই।
৪. লুঙ্গি অর্থাৎ নিম্নাঙ্গের কাপড়ের সামনের দিক থেকে সেলাই করা। তবে কেউ সতর ঢাকার নিয়্যাতে এরূপ করলে দম ওয়াজিব হয় না।
৫. গিরা দিয়ে চাদর অথবা লুঙ্গি পরা, সুঁই পিন ইত্যাদি লাগানো বা সূতা ও দড়ি দিয়ে তা বাঁধা।
৬. সুগন্ধি স্পর্শ করা অথবা ঘ্রাণ নেওয়া, সুগন্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানে বসা, সুগন্ধিযুক্ত ফল অথবা ঘাসের ঘ্রাণ নেওয়া।
৭. মাথা ও মুখ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশে বিনা প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা। প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা মাকরূহ্ নয়।
৮. কা'বা শরীফের পর্দার নিচে এমনভাবে দাঁড়ান যে তা মাথায় বা মুখে লেগে যায়।
৯. লুঙ্গিকে ফিতা লাগাবার মত ভাঁজ করে তা সূতা বা দড়ি দিয়ে বাঁধা।
১০. নাক, থুতনী ও গাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। হাত দিয়ে ঢাকা জায়িয।
১১. বালিশের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া। মাথা বা গাল বালিশে রাখায় ক্ষতি নেই।
১২. রান্নাবিহীন সুগন্ধি খাবার খাওয়া। তবে রান্না করা সুগন্ধি খাবার মাকরূহ্ নয়।

তাওয়াফ ও তার ফযীলত

হজ্জের অন্যতম আমল হল বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করা। তাওয়াফ শব্দের অর্থ প্রদক্ষিণ করা বা চতুর্দিকে চক্কর দেওয়া। হজ্জের কার্যাদির মধ্যে যদিও উকূফ-আরাফা বা আরাফায় অবস্থান করা প্রধানতম রুক্‌ন কিন্তু সে তো মাত্র একদিনের ব্যাপার। হজ্জে সবচাইতে বেশি যে কাজটি করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে এই তাওয়াফ। তাই এ তাওয়াফ সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। এর নিয়ম-কানুন, প্রকারভেদ এবং মাস'আলা-মাসাইল প্রত্যেক হজ্জযাত্রীর জেনে রাখা উচিত।

তাওয়াফের ফযীলত অনেক। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর প্রতিদিন একশ বিশটি রহমত নাযিল করেন, তন্মধ্যে ষাটটি কেবল তাওয়াফকারীদের উপর, চল্লিশটি সেখানে নামায আদায়কারীদের উপর এবং অবশিষ্ট বিশটি ঐ সব লোকের উপর যারা বায়তুল্লাহ্ দর্শনে রত থাকে। অন্য এক হাদীসে তাওয়াফের প্রতি কদমে একটি গুনাহ মাফ হওয়া, একটি নেকী লাভ করা ও একটি মর্যাদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ রয়েছে।

নামায বা অন্যান্য ইবাদত পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে আদায় করা যায়, কিন্তু তাওয়াফ এমনি একটি ইবাদত যা বায়তুল্লাহ্ শরীফে উপস্থিত হয়েই আদায় করতে হয়ে। এ হিসাবে আমলটির এক ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

তাওয়াফের নিয়ম পদ্ধতি

হাজরে আসওয়াদকে ডানদিকে রেখে ডান কাঁধ হাজরে আসওয়াদের পশ্চিম প্রান্তের কাছে

রেখে সেইমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নামাযের তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা উচ্চারণকালীন অবস্থার মত দু'হাত তুলে এ দু'আটি পড়তে হয় :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًابِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

তাওয়াফকালে কা'বা শরীফের সম্মুখস্থ ঘেরাও দেওয়া 'হাতীম' নামক অংশটিও প্রদক্ষিণ করতে হয়। এর ফাঁক দিয়ে মানে ভিতর দিয়ে গেলে তাওয়াফ পূর্ণ হবে না, কেননা এ অংশটিও মূলত কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্ত।

তাওয়াফকালে কোন নির্দিষ্ট দু'আ পড়ার কথা নেই। তবে এ সময়টি দু'আ ও যিকিরের প্রকৃষ্ট সময়। এ সময় দু'আ কবূল হয়। তবে হাদীসে দু'টি দু'আর কথা উল্লেখ রয়েছে। একটি হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীয় মধ্যপথ অতিক্রমকালে। আর তা হলো :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।" অপর দু'আটি হাজরে আসওয়াদ ও হাতীমের মধ্যখানে পড়তে হয়। আর তা হলো :

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِىْ بِخَيْرٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

হে আল্লাহ্ ! আমাকে যা দান করেছেন তাতে আমাকে তুষ্ট রাখুন এবং তাতে বরকত দিন। আমার সন্তান-সন্তুতি ও ধন-সম্পদ যা আমার সম্মুখে নেই, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে আপনিই আমার স্থলবর্তী হোন, একক লা-শারীক আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন ইলাহ্ বা উপাস্য নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সকল স্তুতিও তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে শক্তিমান।

বিশ্বখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর 'মাবসূত'-এর বরাতে লিখিত হয়েছে যে, হজ্জের বিভিন্ন স্থানে কোন দু'আকে সুনির্দিষ্ট করা ভাল নয়। হাজী তার প্রয়োজন ও রুচি মুতাবিক যা ভাল মনে করেন তাই দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করবেন। গতানুগতিক দু'আ-কালামের মধ্যে অনেক সময়ই অন্তরের আকুতির অভিব্যক্তি ঘটে না। তবে তাওয়াফের দু'আরূপে প্রচারিত দু'আগুলোর অধিকাংশই রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত মাসূরা দু'আ যদিও সেগুলো তাওয়াফের জন্যেই কেবল নির্ধারিত নয়। যদি কারো দু'আগুলো মুখস্থ থাকে এবং এগুলোর অর্থ বুঝে বুঝে তিনি পড়েন তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাওয়াফের মধ্যে বই খুলে বা কোন মু'আল্লিমের সাহায্যে তা আওড়াতেই হবে তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উপমহাদেশের মুফ্‌তীয়ে আযম মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র) বলেন, তার চাইতে নিজের ভাষায় নিজের মনের আকুতি প্রকাশই বরং উত্তম।[২৮]

তাওয়াফের পর দু'রাকা'আত নামায আদায় করা ওয়াজিব। (হিদায়া)

তাওয়াফ নফল হলেও ঐ দু'রাকা'আত নামায ওয়াজিব। এ দু'রাকা'আত মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে আদায় করা সুন্নাত ও উত্তম।[২৯]

মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে নামায আদায় করার এ নির্দেশটি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে দিয়েছেন :*

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ‏.

তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর। (সূরা বাক্বারা, ২ : ১২৫)

এ আয়াতের নির্দেশ অনুসারে মাকামে ইব্‌রাহীমের যত নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করা যায় ততই উত্তম। তবে ভিড়ের কারণে কিছু দূরবর্তী স্থানে নামায আদায় করলেও ক্ষতি নেই। তবে হারাম ওয়াক্তসমূহে (সূর্যোদয়, সূর্যাস্তকাল এবং ঠিক মাথার উপর যখন সূর্য থাকে) নামায আদায় করা যায় না। কিন্তু তাওয়াফ তখনো জায়িয থাকে। তাই কয়েক তাওয়াফ করে প্রতি তাওয়াফের জন্যে দুই রাকা'আত করে নামায আদায় করতে হয়।

তাওয়াফের দু'রাকা'আতের নামায মাকামে ইব্‌রাহীমের কাছে আদায় করা কোনমতেই সম্ভব না হলে হাতীম বা হরম শরীফের যে কোন স্থানে তা আদায় করে নিবে। এতে ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু হরমের বাইরে তা আদায় করা মাকরূহ্।[৩০]

পূর্বেই হজ্জের সুন্নাতসমূহের আলোচনায় বলা হয়েছে, তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাত। তাওয়াফে কুদূমে তা করা না হলে তাওয়াফে যিয়ায়তে অথবা বিদায়ী তাওয়াফে তা করে নিতে হবে। রমল করাকালে ইযতিবা করাও সুন্নাত।

তাওয়াফ শেষে যমযম কূপের নিকট গিয়ে বায়তুল্লাহ্‌মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করা মুস্তাহাব। পানি পানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' এবং শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলাও মুস্তাহাব।

ইযতিবা ও রমল

বিখ্যাত ফিকহ্ গ্রন্থ 'হিদায়া'-এ ইযতিবা ও রমল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ইযতিবা হচ্ছে চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখা। অর্থাৎ চাদরের দুই পাশই বাম কাঁধের উপর থাকবে এবং ডান কাঁধে খোলা থাকবে।

আর রমল হচ্ছে চলার সময় মুজাহিদের মত বীরদর্পে দুই কাঁধ দুলিয়ে দ্রুত চলা।

আর এর পটভূমি হচ্ছে মক্কার মুশ্‌রিকরা যখন বলাবলি করছিল যে, ইয়াস্‌রিবের (মদীনার) আবহাওয়া মুসলমানদেরকে দুর্বল ও রুগ্ন করে ফেলেছে। মুশ্‌রিকদের এই অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্দেশ দেন। তারপর নবী কারীম (সা)-এর যুগে এবং পরেও এ বিধান অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। নফল তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা নেই। (হিদায়া)

তাওয়াফের আহ্‌কামসমূহ

তাওয়াফের আরকান ৩টি :

১. তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর পূর্ণ করা।

২. তাওয়াফ বায়তুল্লাহ্ শরীফের বাইরে মাসজিদুল হারামের ভিতরে করা।

৩. নিজে তাওয়াফ করা, কোন কিছুর উপরে সওয়ার হয়ে হলেও।

তাওয়াফের শর্ত ৬টি :

এ শর্ত সমূহের মধ্যে তিনটি সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। সেগুলো হচ্ছে : ১. মুসলমান হওয়া; ২. নিয়্যাত করা ও ৩. তাওয়াফ মাসজিদুল হারামের ভিতরে হওয়া।

অপর তিনটি শর্ত কেবল হজ্জের মধ্যে তাওয়াফে যিয়ারতের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। সেগুলো হচ্ছে : ১. নির্দিষ্ট সময় হওয়া; ২. তাওয়াফ ইহ্রামের পরে হওয়া ও ৩. আর উকূফে আরাফার পর হওয়া।

তাওয়াফের ওয়াজিব ৮টি :

১. পাক-পবিত্র হওয়া অর্থাৎ হাদাসে আসগার ও হাদাসে আকবার হতে পবিত্র হওয়া।
২. সতর ঢাকা—যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনাবৃত থাকা নিষিদ্ধ সেগুলো আবৃত রাখা।
৩. সক্ষম ব্যক্তিদের পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা।
৪. নিজের ডানদিকে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ থেকে বায়তুল্লাহ্র দরজার দিকে অগ্রসর হওয়া।
৫. হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা অর্থাৎ হাতীমকে তাওয়াফের ভিতরে শামিল রাখা।
৬. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা। তবে অধিকাংশ আলিম একে সুন্নাত বলেছেন।
৭. তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করা। অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করলেই ফরয আদায় হয়ে যায়। কিন্তু সাত চক্কর পূর্ণ করা ওয়াজিব।
৮. তাওয়াফের পর দুই রাকা'আত নামায আদায় করা।

উপরোক্ত ওয়াজিবসমূহের কোন একটি ছুটে গেলে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে, নতুবা দম বা কুরবানী ওয়াজিব হবে। (মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ)

তাওয়াফের সুন্নাত ১০টি :

১. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা। ভিড়ের কারণে চুম্বন দেওয়া সম্ভব না হলে উভয় হাত উঠিয়ে ইশারা করা ও 'বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা।
২. ইযতিবা করা।
৩. প্রথম তিন চক্করে রমল করা।
৪. পরবর্তী চক্করগুলোতে রমল না করে ধীরেসুস্থে তাওয়াফ করা।
৫. সাঈ শুরুর পূর্বে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন (ইসতিলাম) করা।
৬. হাজরে আসওয়াদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার সময় উভয় হাত তাক্বীরে তাহ্রীমা বলার সময়ের মত উপরে উঠানো।
৭. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা।
৮. তাওয়াফ শুরু করার প্রাক্কালে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা।
৯. বিরতি না দিয়ে তাওয়াফের চক্করগুলো সম্পন্ন করা।
১০. শরীর এবং পরিধেয় বস্ত্র নাজাসাতে হাকীকী থেকে পবিত্র হওয়া।

তাওয়াফের মুস্তাহাব ১২টি :

১. তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদের ডানদিক থেকে এমনভাবে শুরু করা যাতে তাওয়াফকারীর গোটা দেহ হাজরে আসওয়াদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকালে তার বরাবর হয়ে যায়।
২. হাজরে আসওয়াদকে তিনবার চুম্বন করা এবং তার উপর তিনবার কপাল ঠেকিয়ে নিজের আকুতি প্রকাশ করা।
৩. তাওয়াফকালে হাদীসে বর্ণিত দু'আয়ে মাসূরাসমূহ পাঠ করা।
৪. ভিড় না থাকলে এবং কারো কষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে পুরষদের জন্য বায়তুল্লাহ্র পাশ ঘেঁষে তাওয়াফ করা।
৫. মহিলাদের জন্য রাতে তাওয়াফ করা।
৬. তাওয়াফকালে বায়তুল্লাহ্র দেওয়ালের নিম্নভাগকেও এতে শামিল করা।
৭. যদি কেউ মাঝপথে তাওয়াফ ছেড়ে দেয় বা মাকরূহ্ পন্থায় তাওয়াফ সম্পন্ন করে তাহলে পুনরায় প্রথম থেকে তাওয়াফ শুরু করা।
৮. মুবাহ্ বা বৈধ কথাবার্তাও না বলা।
৯. একাগ্রতার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ না করা।
১০. দু'আ ও যিকির-আয্কার আস্তে আস্তে করা।
১১. রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম (স্পর্শ করা) করা।
১২. আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রীর দিকে তাকানো থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা।

তাওয়াফে মুবাহ্ কাজসমূহ

১. সালাম করা।
২. হাঁচি দেওয়ার সময় 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলা।
৩. শরী'আত সংক্রান্ত মাস'আলা জানতে চাওয়া বা কাউকে জানিয়ে দেওয়া।
৪. প্রয়োজনবশত কথা বলা।
৫. কোন কিছু পান করা।
৬. নির্দোষ কবিতা আবৃত্তি।
৭. পাক সাফ জুতা পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফ করা।
৮. ওযরবশত তাওয়াফে সওয়ারীর সাহায্য গ্রহণ।
৯. নিঃশব্দে কুরআন তিলাওয়াত করা।

তাওয়াফে নিষিদ্ধ কাজসমূহ

১. গোসল ফরয অবস্থায় বা হায়িয ও নিফাসের অবস্থায় তাওয়াফ করা।
২. বিনা ওযরে কারো কাঁধে চড়ে বা সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা।
৩. বিনা উযূতে তাওয়াফ করা।
৪. বিনা ওযরে হাঁটুতে ভর দিয়ে বা উল্টোভাবে তাওয়াফ করা।
৫. হাতীমকে বাদ দিয়ে তাওয়াফ করা অর্থাৎ হাতীমের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যাওয়া।

৬. তাওয়াফের কোন এক চক্কর বা তার একাংশ ত্যাগ করা।
৭. হাজরে আসওয়াদ ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে তাওয়াফ শুরু করা।
৮. তাওয়াফকালে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করা। অবশ্য শুরুতে হাজরে আসওয়াদকে সম্মুখে রেখে দাঁড়ানো কথা স্বতন্ত্র।
৯. তাওয়াফের কোন ওয়াজিব তরক করা।

তাওয়াফের মাকরূহ্ বিষয়াদি

১. অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ।
২. ক্রয়-বিক্রয় বা সে সংক্রান্ত বাক্যালাপ।
৩. হামদ-না'তবিহীন কবিতা আবৃত্তি, কোন কোন আলিম সাধারণভাবে কবিতা আবৃত্তিকেই মাকরূহ্ বলেন।
৪. দু'আ অথবা কুরআন তিলাওয়াত এত উচ্চস্বরে করা যাতে অন্যদের নামাযে বা তাওয়াফে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
৫. নাপাক কাপড় পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফ করা।
৬. রমল অথবা ইযতিবা বিনা ওযরে ছেড়ে দেওয়া।
৭. হাজরে আসওয়াদের চুম্বন না করা।
৮. তাওয়াফের চক্করসমূহের মধ্যে অধিক বিরতি।
৯. নামাযের মাকরূহ্ সময় ছাড়া অন্য সময় দুই তাওয়াফের মধ্যে নামায আদায় না করে দুই তাওয়াফের নামায একত্রে আদায় করা।
১০. তাওয়াফের নিয়্যাতকালে তাক্বীর না বলেই দুই হাত উপরে উঠানো।
১১. খুত্বা বা ফরয নামাযের জামা'আত শুরুর সময় তাওয়াফ করা।
১২. কোন কিছু আহার করা।
১৩. পেশাব-পায়খানার বেগ হওয়া সত্ত্বেও তাওয়াফ অব্যাহত রাখা।
১৪. ক্ষুধার্ত ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় তাওয়াফ করা।
১৫. তাওয়াফকালে নামাযের মত হাত বেঁধে রাখা বা কাঁধে হাত তুলে রাখা।

তাওয়াফের প্রকারভেদ

তাওয়াফ ৭ প্রকার এর মধ্যে প্রথম ৩ প্রকার হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত।

১. তাওয়াফে কুদূম—মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী লোকদের থেকে যারা ইফরাদ বা শুধু হজ্জ অথবা কিরান আদায় করবে, তাদের জন্যে এই তাওয়াফ সুন্নাত। মক্কা শরীফে প্রবেশ মাত্রই এ তাওয়াফ করতে হয়।

২. তাওয়াফে যিয়ারত—এ তাওয়াফ ফরয। আর তা ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক থেকে ১২ই যিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা ওয়াজিব। এতে রমল ও ইযতিবা আছে। তবে ইহ্রাম খুলে ফেললে ইযতিবা লাগবে না। এ তাওয়াফের পর সাঈ করতে হয়। তবে তাওয়াফে কুদূমে রমল ও সাঈ করে থাকলে পুনরায় রমল ও সাঈ করবে না।

৩. বিদায়ী তাওয়াফ বা তাওয়াফে সদর—মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী হাজীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এ তাওয়াফ করা ওয়াজিব। একে তাওয়াফ সদরও বলা হয়ে থাকে। এ তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা বা এরপর সাঈ নেই।

অপর ৪ প্রকার তাওয়াফ হচ্ছে :

৪. উমরার তাওয়াফ—এ তাওয়াফ উমরার বেলায় রুকন ও ফরয। এতে ইযতিবা ও রমল এবং পরে সাঈ করতে হয়।

৫. মানতের তাওয়াফ—এ তাওয়াফ মানত হজ্জ পালনকারীদের মধ্যে ওয়াজিব।

৬. তাওয়াফে তাহিয়্যা—মাসজিদুল হারামে প্রবেশকারীর জন্যে এ তাওয়াফ মুস্তাহাব, তবে কেউ যদি অন্য কোন প্রকার তাওয়াফ করে থাকেন তবে সেটিই তার জন্য উক্ত তাওয়াফের স্থলাভিষিক্ত হবে।

৭. নফল তাওয়াফ—এ তাওয়াফ যখন ইচ্ছা আদায় করা যায়। এ তাওয়াফে রমল ইযতিবা নেই এবং সাঈও নেই।

সাঈ

'সাঈ' শব্দের আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। হজ্জের পরিভাষায় সাঈ হচ্ছে, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাত চক্কর দৌড়ানো। এটা হজ্জের অন্যতম ওয়াজিব। সাঈ পায়ে হেঁটে করতে হয়। ওযরবশত বাহনের সাহায্যও নেওয়া যায়। তবে বিনা ওযরে বাহন ব্যবহার করলে দম দেওয়া ওয়াজিব হবে।

সাঈ-র রুকন্

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করাই সাঈ-এর রুকন। যদি কেউ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করে এদিক ওদিক করে, তবে সাঈ সহীহ্ হবে না।[৩১]

সাঈ-র শর্তসমূহ

সাঈ-র শর্ত ৬টি :

১. নিজেই সাঈ করা। অবশ্য কারো কাঁধে চড়ে অথবা কোন পশুর উপর সওয়ার হয়ে অথবা অন্য কোন বাহনে আরোহণ করে সাঈ করলেও শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে। সাঈর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব জায়িয নেই। তবে যদি কেউ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় এবং সাঈর সময় পর্যন্ত সংজ্ঞা ফিরে না পায়, তাহলে তার পক্ষ হতে অপর কোন ব্যক্তি সাঈ করতে পারবে।

২. পূর্ণ তাওয়াফ অথবা তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন করার পর সাঈ করা। কেউ তাওয়াফের চার চক্কর পূর্ণ করার পূর্বে সাঈ করলে সাঈ সহীহ্ হবে না।

৩. সাঈ-এর পূর্বে হজ্জ অথবা উমরার ইহ্রাম বাঁধতে হবে। যদি কেউ ইহ্রামের পূর্বে সাঈ করে নেয়, তবে তা তাওয়াফের পরে হলেও সহীহ্ হবে না।

৪. সাঈ সাফা হতে আরম্ভ করে মারওয়াতে শেষ করতে হবে। যদি কেউ মারওয়া হতে আরম্ভ করে, তবে প্রথম চক্কর সাঈ হিসেবে গণ্য হবে না।

৫. সাঈ-এর অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন করা। যদি কেউ অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন না করে, তবে সাঈ আদায় হবে না।

৬. সাঈ-এর নির্ধারিত সময়ে সাঈ সম্পন্ন করা। এটি হজ্জের সাঈ-এর জন্য শর্ত।

এটি উমরার সাঈ-এর জন্য শর্ত নয়। অবশ্য যদি হজ্জে কিরান বা তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি উমরা পালন করে, তবে তার উমরার সাঈ-এর জন্যও নির্ধারিত সময় হওয়া শর্ত। হজ্জের সাঈ-এর সময় হচ্ছে হজ্জের মাসসমূহ আরম্ভ হওয়া।

সাঈ-এর ওয়াজিবসমূহ

সাঈ-এর ওয়াজিব ৬টি :

১. এমন তাওয়াফের পর সাঈ করা যা জানাবাত অথবা হায়িয ও নিফাস হতে পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. সাঈ সাফা হতে আরম্ভ করা এবং মারওয়াতে শেষ করা।

৩. যদি কোন ওযর না থাকে, তবে পায়ে হেঁটে সাঈ করা। বিনা ওযরে সওয়াব অবস্থায় সাঈ করলে দম ওয়াজিব হবে।

৪. সাত চক্কর পূর্ণ করা। অর্থাৎ ফরয চার চক্করের পর আরো তিন চক্কর পূর্ণ করা। যদি কেউ এই তিন চক্কর ছেড়ে দেয়, তবে সাঈ সহীহ্ হবে, কিন্তু প্রতি চক্করের পরিবর্তে পৌনে দুই সের গম অথবা এর মূল্য সাদাকা করা ওয়াজিব।

৫. উমরা সাঈ-এর ক্ষেত্রে উমরার ইহ্রাম সাঈ সমাপ্ত করা পর্যন্ত বহাল থাকা।

৬. সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা।

সাঈ-র সুন্নাতসমূহ

সাঈ-র সুন্নাত ৯টি :

১. হাজরে আসওয়াদের ইস্তিলাম করে সাঈ-এর উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া।

২. তাওয়াফের পরপরই সাঈ করা।

৩. সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহণ করা।

৪. সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহণ করে কিব্লামুখী হওয়া।

৫. সাঈ-এর চক্কর পরপর সমাপন করা।

৬. জানাবত এবং হায়িয থেকে পবিত্র হওয়া।

৭. এমন তাওয়াফের পরে সাঈ করা যা পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাপড়, শরীর ও তাওয়াফের জায়গাও পবিত্র ছিল আর উযূও বহাল ছিল।

৮. সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলা।

৯. সতর ঢাকা।

সাঈ-র মুস্তাহাবসমূহ

সাঈ-র মুস্তাহাব ৫টি :

১. নিয়্যাত করা।

২. সাফা ও মারওয়া-এর উপরে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা।

৩. বিনয় ও নম্রতা সহকারে তিন-তিনবার করে যিকির ও দু'আ পাঠ করা।
৪. সাঈ-এর চক্করসমূহের মধ্যে যদি বিনা ওযরে বেশি ব্যবধানে হয়ে যায় অথবা কোন চক্করে বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে সাঈ আরম্ভ করা।
৫. সাঈ সমাপ্ত করার পরে মসজিদে গিয়ে দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করা।

সাঈ-র মাকরূহ কাজসমূহ

১. সাঈ-এর অবস্থায় এমন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এবং কথাবার্তা বলা যার দরুন মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দু'আ-কালাম পাঠ করতে অসুবিধা হয় অথবা সাঈ-এর চক্করসমূহ লাগাতার সমাপন করা সম্ভব হয় না।
২. সাফা ও মারওয়া-এর উপর আরোহণ না করা
৩. বিনা ওযরে সাঈকে তাওয়াফ হতে অথবা কুরবানীর দিনসমূহ হতে বিলম্বিত করা।
৪. সতর খোলা অবস্থায় সাঈ করা।
৫. সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যখানে দ্রুত না চলা।
৬. চক্করসমূহের মধ্যে অধিক ব্যবধান করা।[৩২]

সাঈ-এর সুন্নাত তরীকা

যে তাওয়াফের পর সাঈ করতে হয় তা শেষ করে অষ্টমবারের মতো 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করে তাওয়াফ শেষ করে নবমবার সাঈ-এর জন্যে চুম্বন করা মুস্তহাব। তারপর 'বাবুস সাফা' দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে প্রথমে সাফা পাহাড়ের নিকটে পৌঁছে—

أَبْدَءُ بِمَا بَدَءَ اللّٰهُ بِهِ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ۔

(আল্লাহ্ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়েই শুরু করছি। সাফা ও মারওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম) বলে সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে তিনবার হামদ ও সানা পাঠ করে উচ্চস্বরে তিনবার তাক্বীর ও তাহ্লীল (আল্লাহু আক্বার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) উচ্চারণ করবে। তারপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর নিজের জন্য সকলের জন্য দু'আ পাঠ করবে। নিম্নরূপে দু'আ করলে একত্রে সবগুলো আদায় হয়ে যেতে পারে :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَدَّيْنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَسْئَلُكَ اَلَّا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ ۔

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ لاتِّبَاعِهِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ
وَلِمَشَائِخِىْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٠

এ ছাড়া প্রয়োজনীয় অন্যান্য দু'আ ও তালবিয়া পাঠ করা যায়। পঁচিশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময় সেখানে দাঁড়াবে। তারপর দু'আ-দুরূদ করতে করতে স্বাভাবিক গতিতে সাফার দিকে অগ্রসর হবে। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছে গতি দ্রুত করবে এবং এ দু'আটি পাঠ করবে :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ وَالْاَكْرَمُ ٠

তবে মহিলাদের জন্যে এখানে দ্রুতগতিতে দৌড়ের মত অতিক্রম করার এ বিধান প্রযোজ্য নয়। সবুজ চিহ্নিত স্থানটুকু অতিক্রম করার পর পুনরায় স্বাভাবিক গতিতে অবশিষ্ট স্থান অতিক্রম করে মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছবে। তারপর পাহাড়ের উপর আরোহণ করে একটু ডান দিকে ঝুঁকে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং সেখানেও সাফা পাহাড়ের কার্যাদির ন্যায় করবে। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গমনে একটি চক্কর তারপর পুনরায় সাফায়, পুনরায় মারওয়ায় এরূপ সাতবার সম্পন্ন করার পর মসজিদুল হারামে গিয়ে দু'রাকা'আত নামায আদায় করবে।

এ নামায মাতাফ বা তাওয়াফের স্থানের নিকটে আদায় করা মুস্তাহাব।

জ্ঞাতব্য

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণকালে একেবারে শীর্ষ দেওয়াল পর্যন্ত উঠা মাকরূহ। হজ্জের সা'ঈ তাওয়াফে কুদূমের পরে এবং তামাত্তুর সা'ঈতে তালবিয়া পাঠ করবে না। সাত চক্করের প্রথম চারটি ফরয এবং বাকীগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। পরবর্তী তিন চক্কর আদায় না করলে প্রতি চক্করের বদলে পৌণে দুই সের করে গম বা উহার মূল্য সাদাকা করা ওয়াজিব।

সা'ঈ চলাকালে নামাযের জামা'আত বা জানাযা শুরু হলে সা'ঈ অপূর্ণ রেখেই তাতে যোগ দিতে হবে। অসম্পূর্ণ সা'ঈ পরে পূর্ণ করবে। সা'ঈসমূহের মধ্যে তেমন ব্যবধান সৃষ্টি করে না এমন পানাহার বা একাগ্রতা নষ্ট করে না তেমন প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ মুবাহ বা বৈধ।

সা'ঈ যদি হজ্জের হয় আর তা উকূফে আরাফাতের পূর্বে হয়, তাহলে তা ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় হবে। উকূফে আরাফার পরে হলে ইহ্‌রাম না থাকাই মুস্তাহাব। সা'ঈ তাওয়াফের অধীন, তাই তাওয়াফের পরেই করতে হয়। (হিদায়া)

রমী করা

'রমী' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, নিক্ষেপ করা বা কোন কিছু ছুঁড়ে মারা। হজ্জের পরিভাষায় রমী হচ্ছে, মিনায় শয়তানের উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপ করা। এটি ১০ই যিলহাজ্জে মিনায় প্রথম করণীয় ওয়াজিব।

হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) যখন তাঁর প্রাণাধিক শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈলকে নিয়ে তাঁকে কুরবানী করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন, যখন শয়তান মিনার তিনটি স্থানে তাঁকে কুপ্ররোচনা দিয়ে পিতার কুরবানীর মহৎ উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ঐ তিনটি স্থানেই শয়তানকে তাড়ানো হয়েছিল। হজ্জের রমীর বিধানের দ্বারা সেই পবিত্র স্মৃতিকে জাগরূক রাখা হয়েছে।

আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুযদালিফা থেকে ১ম দিন অর্থাৎ ১০ তারিখে শয়তানকে নিক্ষেপের কাঁকর কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। অন্য স্থান থেকে এ কাঁকর নিলেও চলে। তবে জামারা বা কংকর নিক্ষেপের স্থান থেকে নেওয়া অনুচিত। কেননা হাদীসে আছে, জামারায় পড়ে থাকা কাঁকরগুলো হচ্ছে ঐসব কাঁকর যেগুলো কবূল হয় নি। কবূল হওয়াগুলো ফিরিশ্‌তাগণ উঠিয়ে নেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের নিক্ষেপের পাথর মুযদালিফা থেকে নেওয়া সুন্নাত নয়। (যুবদাহ্‌-এর বরাতে আহকামুল হাজ্জ ওয়াল উমরা)

জামারা বা কংকর নিক্ষেপের স্থান ৩টি :

১. জামারাতুল আকাবা : মক্কার দিকে মাসজিদুল খাইফের সর্ব নিকটবর্তী কংকর নিক্ষেপ স্থল। একে জামারাতুল উখরা এবং জামারাতুল কুবরাও বলা হয়। ১০ই যিলহজ্জ এখানে সাতবার কংকর নিক্ষেপ করে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতে হয়। অন্য দুই জামারায় ঐ দিন কংকর নিক্ষেপ করতে নেই। করলে তা বিদ'আত হবে।

২. জামারাতুল উস্তা বা মধ্যম জামারা।

৩. জামারাতুল উলা বা প্রথম জামারা।

১১ ও ১২ই যিলহজ্জ তারিখে প্রতিটি জামারায়ই ৭টি করে কংকর মারতে হয়। তারপর মিনা ত্যাগ করা চলে। কিন্তু ১৩ তারিখ পর্যন্ত মিনায় রয়ে গেলে ১৩ তারিখেও তিন জামারায়ই কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। ১০ তারিখে মিনায় আসার পর সর্বপ্রথম 'রমী' করাই মুস্তাহাব। ১১ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক পর্যন্ত জামারাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা না হলে 'দম' ওয়াজিব হয়ে যায়।

জামারার অন্তত পাঁচ হাত দূর থেকে হাত উঁচু করে যতটুকু উঁচু করলে বগল অনাবৃত হয়ে যায়, কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। পাঁচ হাতের কম দূরত্বে দাঁড়িয়ে কংকর নিক্ষেপ করা মাকরূহ। বেশি দূরত্বে ক্ষতি নেই। কংকর খেজুর বীচি বা ছোলার আকারের হওয়া চাই। মুযদালিফা থেকে ৭০টি কংকর কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। বড় পাথর ভেঙ্গে ছোট করা মাকরূহ।

বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বারা ধরে কংকর মারা মুস্তাহাব। শরী'আতগ্রাহ্য ওযরের কারণে একজনের রমী অন্যজনেও করতে পারেন। তবে নিজের 'রমী' শেষ করে অন্যেরটা করতে হয়। একই সময়ে নিজের পক্ষ থেকে একটি এবং অন্যের পক্ষ থেকে আরেকটি কংকর নিক্ষেপ করা মাকরূহ। মিনাকে বামদিকে ও কা'বা শরীফকে ডানদিকে রেখে কংকর নিক্ষেপ করতে হয় এবং সাথে সাথে এরূপ বলা মুস্তাহাব :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ رِضًى لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَشْكُوْرًا ·

কুরবানী

কিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীগণের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। ইফ্‌রাদ হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির জন্য তা মুস্তাহাব।

মিনায় জামারাতুল আকাবায় ১০ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের পর এ কুরবানী আদায় করতে হয়। কিরান বা তামাত্তুকারী হাজীর যদি কুরবানী দেওয়ার সঙ্গতি না থাকে, তাহলে আরাফার দিনের পূর্বেই তিনটি রোযা এবং পরে দেশে ফিরে আরও সাতটি রোযা নিজের সুবিধামত সময়ে রাখবে। আরাফাতের দিন পর্যন্ত তিনটি রোযা রাখতে না পারলে কুরবানী দেওয়াই ওয়াজিব হবে এবং সে কুরবানী না দিয়েই কস্‌র বা হল্‌ক করে ফেরলে আরেকটি কুরবানী--মোট দু'টি কুরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে। (আহ্‌কামুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, সূত্র : যুবদাতুল মানাসিক)

হল্‌ক ও কস্‌র

হল্‌ক ও হচ্ছে মাথা মুণ্ডানো এবং কস্‌র হচ্ছে চুল ছাঁটা। হল্‌ক কেবল পুরুষের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডন করা হারাম। চুল ছাঁটা নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই বৈধ। সম্পূর্ণ মাথার চুল আঙ্গুল পরিমাণ ছাঁটতে হয়। এক-চতুর্থাংশ চুল ছাঁটলেও ছাঁটা হয়ে যায়। হাল্‌ক করাতে যেহেতু পূর্ণ বিনয় প্রকাশ পায়, তাই 'দুররুল মুখ্‌তার' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, পুরুষের জন্য পূর্ণ মাথায় হল্‌ক করা উত্তম।

তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীগণ তাওয়াফে কুদূমের পর সাঈ অন্তে মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছেঁটে ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে যাবে।

৮ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর ১০ই যিলহজ্জে জামারাতুল আকাবায় শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ ও কুরবানী আদায়ের পর পুনরায় মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছেঁটে ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়া বিধেয়। কুরবানী না দিয়ে হল্‌ক করা বা চুল ছাঁটা জায়িয নেই। হল্‌ক করা বা চুল ছাঁটা ১২ তারিখ পর্যন্ত বিলম্বিত করাও জায়িয। কুরবানী ও হল্‌ক বা কসর করে ইহ্‌রামমুক্ত হলেও ১২ তারিখ তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত যৌন সম্ভোগ করা জায়িয নেই। কুরবানীর পর ১২ তারিখ পর্যন্ত হল্‌ক, কস্‌র, ক্ষৌর কার্যাদি করা ওয়াজিব, না করলে দম ওয়াজিব হবে।

হজ্জের ব্যস্ততম ৫ দিন (৮ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জ)

৭ই যিলহজ্জ যুহরের সালাতের পরে মাসজিদুল হারামের ইমামের হজ্জের আহ্‌কাম অর্থাৎ পরবর্তী পাঁচ দিনের করণীয় সম্পর্কে খুত্‌বা প্রদান সুন্নাত। হাজীদের তা মনোযোগ সহকারে শোনা এবং সেভাবে আমল করা উচিত।

অনুরূপ বর্ণনা সংক্রান্ত খুত্‌বা ইমাম আরাফাতের ময়দানে মসজিদে নামিরায় ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এবং মিনার মাসজিদুল খায়ফে ১১ই যিলহজ্জ তারিখে দিবেন।

তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীগণ যারা ইতিপূর্বে তাওয়াফ সাঈ ইত্যাদি সম্পন্ন করে ইহ্রাম খুলে ফেলেছিলেন, তারা এবং মক্কা শরীফের অধিবাসীগণ ৮ই যিলহজ্জ তারিখে উযূ গোসল করে দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করে ইহ্রাম বাঁধবেন এবং তালবিয়া পাঠ শুরু করবেন। এ ইহ্রাম মাসজিদুল হারামে বাঁধা মুস্তাহাব। হরম সীমানার অন্য কোথাও বেঁধে নেওয়াও জায়িয আছে। ৮ তারিখের পূর্বেও কেউ ইহ্রাম বাঁধতে চাইলে তাতে আপত্তি নেই।

এ তারিখে যিনি ইহ্রাম বাঁধবেন তিনি যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বেই হজ্জের সাঈ সেরে নিতে চান তাহলে তাঁকে ইযতিবা ও রমল সহ একটি নফল তাওয়াফ করেই সাঈ করতে হবে। পরে আর তাওয়াফে যিয়ারতের পর তার সাঈ করতে হবে না। তবে সাঈ তাওয়াফে যিয়ারতের পরে করাই উত্তম।

৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনায় যেতে হবে। সুন্নাত অনুযায়ী গোসল করে ইহ্রামের চাদর পরে মসজিদুল হারামে আসবে। মুস্তাহাব হলো যে, এক তাওয়াফ করবে এবং দ্বিতীয় তাওয়াফ আদায়ের পর ইহ্রামের জন্য দু'রাকা'আত নামায পড়ে এভাবে হজ্জের নিয়্যাত করবে : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ইফরাদ ও কিরান হজ্জের জন্যে নতুন ইহ্রামের প্রয়োজন নেই।

ইহ্রাম ও নিয়্যাতের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কা শরীফ থেকে তিন মাইল দূরবর্তী মিনায় চলে যেতে হবে। পরবর্তী দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সুন্নাত। ৮ই যিলহজ্জের দিবাগত রাত মক্কা শরীফে অবস্থান বা সরাসরি আরাফাতে গিয়ে পৌঁছা মাকরূহ।[৩৩]

৮ই যিলহজ্জ তারিখটি যদি শুক্রবারে হয়, তাহলে দুপুরের আগেও মিনায় যাওয়া চলে। তবে দুপুর পর্যন্ত না গেলে মক্কা শরীফেই জুমু'আ আদায় করা ওয়াজিব এবং জুমু'আর নামায আদায় না করে মিনায় যাওয়া নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য, হজ্জের দিনগুলোতে মিনায় জুমু'আর নামায আদায় করা যায়। মিনায় মাজদিুল খায়ফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করা মুস্তাহাব।[৩৪]

৯ই যিলহজ্জ হচ্ছে আরাফাত দিবস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ। "হজ্জ হচ্ছে আরাফাত।" ঐ দিন সকালেই হজ্জের সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন 'উকূফে আরাফা'-এর উদ্দেশ্যে মিনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হয়।

দুপুরের পূর্বে গোসল বা অন্তত উযূ করে ময়দানে যাওয়া মুস্তাহাব। সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ার সাথেই মসজিদে নামিরায় ইমাম মুযাযযিনের আযান শেষে খুত্বা শুরু করবেন। সে খুত্বায় হজ্জ, কুরবানী, হল্ক, কস্র, মিনায় কংকর নিক্ষপ, তাওয়াফে যিয়ারত প্রভৃতি করণীয় সহ বিশ্ব মুসলিমের করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করবেন। বিশ্ব মুসলিমের কল্যাণ কামনায় দু'আ করবেন। তারপর ঐ একই আযানে এবং দুই ইকামতে পর পর যুহর ও আসরের জামা'আত সম্পন্ন হবে। ঐ একটি ক্ষেত্রে যুহরের নামাযের সাথে যুহরের সময়সীমার মধ্যেই আসরের নামাযও জামা'আতে একত্রে আদায় করার বিধান। ইমাম মুকীম হলে উভয় নামাযই পূর্ণ চার রাকা'আত করে আদায় করবেন। তবে মুকীম ইমাম যদি মুসাফিরের মত কসররূপে দুই রাকা'আত করে আদায় করেন, তাহলে হানাফী মতে ঐ নামায ইমামের পেছনে

আদায় করা জায়িয হবে না। তাই নিজেদের তাঁবুতে যুহর ও আসরের সময় ভিন্ন ভিন্নভাবে এ নামায আদায় করতে হবে। উভয় নামায একত্রে আদায়ের ক্ষেত্রে মাঝখানে বা যুহরের সুন্নাত পড়ার বিধান নেই।

নামায আদায়ের পর মাগরিব পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানের যে কোন স্থানে অবস্থান করা এবং যতদূর সম্ভব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিব্‌লামুখী হয়ে দু'আ-দুরূদ ও কান্নাকাটি করা মুস্তাহাব। তবে বসা অবস্থায় বা অন্য যে কোন অবস্থান জায়িয। এ সময় সশব্দে তাক্‌বীর, তাহ্‌লীল ও তালবিয়া ঘন ঘন পাঠ করবে। আরফাতের ময়দানের দু'আ কবূল হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সর্বোত্তম হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেন : "সর্বোত্তম হজ্জ হচ্ছে জোরে জোরে তালবিয়া বা অন্যান্য দু'আ করা এবং কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করা।"[৩৫]

হাদীস শরীফে আছে :

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَا زَالَ يُلَبِّيْ حَتّٰى اَتٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ·

নবী কারীম (সা) জামারাতুল আকাবায় যাওয়া পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকতেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)

উকূফ বা আরাফাতে অবস্থানকালে দু'আ দাঁড়িয়ে ও হাত ইঠিয়ে করা সুন্নাত। ক্লান্ত হয়ে পড়লে বসে যাবেন এবং হাত নামিয়েই দু'আয় রত থাকবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হাত উঠিয়ে তিনবার 'আল্লাহু আক্‌বার ওয়া লিল্লাহিল হামদ' উচ্চারণ করে এ দু'আটি পাঠ করেছেন :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِيْ بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْلِيْ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ·

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তিনি একক, লা শরীক। রাজ্য তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন কর এবং তাক্‌ওয়া দ্বারা আমাকে পরিচ্ছন্ন কর এবং আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা কর।" এ দু'আ পাঠের পর আলহামদু সূরা পাঠের পরিমাণ সময়ের জন্য হাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় হাত তুলে বারবার এ দু'আ করতে হয়। (যুবদাহ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আরাফাতের দিন যেসব দু'আ আমি পাঠ করি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ পাঠ করেছেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম দু'আ হচ্ছে :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ·

এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি আরাফাতের দিন উকূফকালে কিব্‌লামুখী হয়ে উক্ত দু'আ একশতবার, একশতবার সূরা ইখলাস এবং একশতবার দুরূদ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّعَلَيْنَا مَعَهُمْ ·

পাঠ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, হে আমার ফিরিশতাকুল! আমার এ বান্দার কী প্রতিদান হতে পারে যে তাসবীহ্, তাহ্লীল ও তামজীদ তথা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে, আমার হামদ ও সানা পাঠ করেছে ও আমার নবীর প্রতি দুরূদ পড়েছে ? জেনে রেখো, আমি তাকে মাফ করে দিলাম। তার নিজের ব্যাপারে প্রার্থিত সবকিছু তাকে দিয়ে দিলাম, তার দু'আসমূহ কবূল করলাম। আর আমার বান্দা যদি সমগ্র আরাফাতে অবস্থানকারীদের জন্যও সুপারিশ করে, তাহলেও আমি তা কবূল করব।

মোটকথা, আরাফাতের ময়দানে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় মঙ্গলের জন্যে নিজের, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, গোটা মুসলিম জাতি তথা গোটা বিশ্ববাসীর হিদায়াত ও রহমতের জন্যে প্রাণ খুলে দু'আ করা উচিত।

দু'আ কবূলের এমন সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে। মাগরিবের পূর্বে আরাফাত ত্যাগ করলে 'দম' ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্)

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন

সূর্যোস্তের পর ইমামের আরাফাত ত্যাগের পর মুযদালিফার পথে রওয়ানা হতে হবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَاذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ٠

আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'মাশ'আরুল হারাম'-এর নিকট তথা মুযদালিফায় পৌঁছে তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ করবে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৮)

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, মুযদালিফাতে রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব—যা বিনা ওযরে তরক করলে 'দম' ওয়াজিব হবে। কিন্তু অসুস্থতা বা কোন ওযরবশত তথায় অবস্থান না করে মিনায় চলে গেলে কোন দম দিতে হবে না। (বযলুল মাজহূদ)

মুযদালিফা থেকে জামারাতসমূহে রমী করার জন্য ৭০টি কংকর কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

হলক বা কস্রের সাথে সাথে বগলের লোম, নাভির নিচ ও নখ ইত্যাদি পরিষ্কার করাও মুস্তাহাব।

তাওয়াফে যিয়ারত—যা হজ্জের অন্যতম রুকন।

ইফরাদকারীর কুরবানী ওয়াজিব নয় বিধায় কুরবানীর পূর্বেই হল্ক করলেও দম ওয়াজিব হয় না। অন্যদের তারতীব বা ক্রমের অন্যথা করলে দম ওয়াজিব হবে।[৩৬]

তাওয়াফে যিয়ারত ১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়িয আছে।

১১ ও ১২ই যিলহজ্জ তিন জামারায়-ই ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। ১৩ তারিখ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করলে ১৩ তারিখেও অনুরূপ কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। তবে সাধারণত হাজী সাহেবগণ ১২ তারিখেই মক্কা শরীফে চলে যান।

যে তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে যেতে চায়, তাতে তার গুনাহ্ হবে না। আর যে বিলম্বিত করবে, তারও কোন গুনাহ্ হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১০ তারিখেই তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করে পুনরায় মিনায় চলে যান এবং ১১ ও ১২ তারিখে তিন জামারায়-ই কংকর মারেন।

১১ ও ১২ তারিখে বা ১৩ তারিখে কংকর নিক্ষেপ করবে সূর্য ঢলে পড়ার পর। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহরের পর তিন জামারায়ই ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করেন এবং জামারাতুল 'আকাবা' ছাড়া অপর দুই জামারায়ই দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে তাক্‌বীর-তাহ্‌লীল ও দু'আ-দুরূদ পড়েছেন, কিন্তু জামারাতুল 'আকাবায়' অবস্থান করেন নি। (হিদায়া)

তারপর মক্কা শরীফে গিয়ে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করলে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে বর্তমানে মোটর গাড়িতে চলতে হয় এবং ভিড়ের মধ্যে ইচ্ছেমত আসা বা যাওয়ার সুযোগ খুব কমই থাকে। এ অক্ষমতার জন্যে যেতে না পারলেও কোন অসুবিধা নেই। (যুবদাহ, সূত্র : আহ্‌কামুল হাজ্জ ওয়াল উমরা)

মক্কা শরীফে ফেরার পথে 'মুহাস্‌সাব' নামক স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করা মুস্তাহাব।

তাওয়াফে বিদা

তাওয়াফে বিদা বহিরাগতদের জন্যে ওয়াজিব। বিদায়ী তাওয়াফের পরও যদি কোন কারণে মক্কা শরীফে অবস্থান করতে হয়, তাহলে বিদায়কালে পুনরায় তাওয়াফ করা মুস্তাহাব। (যুবদাহ্)

বিদায়ী তাওয়াফকালে কোন মহিলা ঋতুবতী বা নিফাসগ্রস্ত হলে তার উপর এ তাওয়াফ ওয়াজিব নয়। তার উচিত মসজিদে প্রবেশ না করে দরজার নিকট দাঁড়িয়ে দু'আ করে রওয়ানা হয়ে যাওয়া। (হায়াতুল কুলূব)

বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে মক্কা শরীফ অবস্থানকালে অধিকবার তাওয়াফ উত্তম নাকি পুনরায় উমরা করা উত্তম এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে প্রখ্যাত ফকীহ্ মোল্লা আলী কারী (র) অধিক তাওয়াফকে অধিকতর সাওয়াবের কাজ বলেছেন। তবে কেউ উমরা করতে চাইলে নিকটবর্তী মীকাতে গিয়ে ইহ্‌রাম বেঁধে আসতে হবে। (আহ্‌কামুল হাজ্জ ওয়াল উমরা)

বদলী হজ্জ

বিখ্যাত ফিকহ্ গ্রন্থ হিদায়া-র ভাষামতে, ইবাদতসমূহ বিভিন্ন প্রকারের :

১. একান্তভাবে আর্থিক—যেমন যাকাত,

২. একান্তভাবে দৈহিক—যেমন নামায-রোযা,

৩. দৈহিক ও আর্থিক উভয়ের মিশ্রণ—যেমন হজ্জ।

ইচ্ছাকৃতভাবে বা ওযরবশত প্রয়োজনে উভয় অবস্থায়ই প্রথম ধরনের ইবাদতে প্রতিনিধিত্ব চলে। কেননা প্রতিনিধি দ্বারা কার্য সম্পাদনে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের ইবাদতে প্রতিনিধিত্ব চলে না। কেননা এ জাতীয় ইবাদতের উদ্দেশ্য দৈহিক ক্লেশবরণ, অতএব এতে প্রতিনিধি দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

তৃতীয় প্রকারে সামর্থ্য থাকলে প্রতিনিধিত্ব চলে না। কেননা তাতে দৈহিক ক্লেশবরণ অনুপস্থিত। তবে অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব চলে। কিন্তু তার জন্য শর্ত হচ্ছে আমৃত্যু স্থায়ী অসমর্থ্য।

মুসলিম শরীফের হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে :

اِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَشْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ عَلَيْهِ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَسْتَوِىَ عَلٰى ظَهْرِ بَعِيْرِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحُجِّىْ عَنْهُ ·

খাশ'আম গোত্রীয় জনৈক মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তার উপর আল্লাহ্র ফরযকৃত হজ্জ অনাদায় অবস্থায় রয়েছে। অথচ তিনি তাঁর উটের উপর সোজা হয়ে বসতেও অক্ষম। তখন নবী কারীম (সা) বললেন : তাহলে তুমিই তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে নাও।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও হজ্জ আদায়ের বিধান রয়েছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে :

اِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَائَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ أُمِّىْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتّٰى مَاتَتْ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّىْ عَنْهَا رَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَةً اَقْضُوْا اللّٰهَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ·

জুহায়না গোত্রীয় জনৈক মহিলা নবী কারীম (সা)-এর নিকট এসে বলল, আমার মা হজ্জের মানত করেছিলেন, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো ? জবাবে নবী কারীম (সা) বললেন : হ্যাঁ। তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ করবে। আচ্ছা, যদি তার কোন ঋণ থাকতো, তাহলে কি তুমি তার ঋণ পরিশোধ করতে না? সুতরাং আল্লাহ্র ঋণ পরিশোধ কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলাই পাওনা পাওয়ার সর্বাধিক হক্দার।[৩৬]

বলা বাহুল্য, মানতের হজ্জের ক্ষেত্রে যেখানে বদলী হজ্জ করার আদেশ রাসূল (সা) দিয়েছেন, সেখানে ফরয হজ্জের ব্যাপারটির গুরুত্ব যে কত বেশি, তা সহজেই অনুমেয়।

যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করেনি, তারদ্বারা বদলী হজ্জ করানো মাকরূহ তানযিহী। এমন ব্যক্তি যদি হজ্জের সামর্থ্য থাকা এবং তার উপর হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে থাকে, তবে তারদ্বারা বদলী হজ্জ করানো মাকরূহ তাহ্রীমী অর্থাৎ হারামের কাছাকাছি পর্যায়ের।[৩৭]

উত্তম হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করেছে এমন ব্যক্তির দ্বারা বদলী হজ্জ করানো।[৩৮]

যে সমস্ত কারণে বদলী হজ্জ করানোর প্রয়োজন হয়, সেগুলো হচ্ছে :

১. মৃত্যু, ২. বন্দিত্ব, ৩. জীবনে আরোগ্য লাভের আশা নেই এমন পীড়া, যেমন পক্ষাঘাত, অন্ধত্ব, ৪. খোঁড়া হয়ে যাওয়া, ৫. এত বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া যাতে বাহনের উপর বসারও ক্ষমতা থাকে না, ৬. মহিলাদের জন্যে সাথে মাহ্রাম না থাকা, ৭. পথের নিরাপত্তা না থাকা।

উপরোক্ত ওযরসমূহ আমৃত্যু থাকা অক্ষমতা নিশ্চিত হওয়ার শর্ত। চোখে ছানি পড়া, পা মচকে যাওয়া ইত্যাদি অস্থায়ী বা সাময়িক ওযর বদলী হজ্জের জন্য যথেষ্ট নয়। ওযর মৃত্যুর পূর্বে দূর হয়ে গিয়ে হজ্জ পালনের সক্ষমতা ফিরে পেলে নিজে হজ্জ করা ওয়াজিব হবে। অবশ্য

যদি এমন রোগের কারণে বদলী হজ্জ করানো যায়, যা সচরাচর ভাল হয় না, যেমন অন্ধত্ব, তাহলে ওযর অবস্থা প্রকৃতিগতভাবে দূরীভূত হয়ে গেলে পুনরায় হজ্জ করা ওয়াজিব হবে না। হজ্জ করতে রওয়ানা হয়ে কেউ মারা গেলে তার বদলী হজ্জেরও দরকার নেই। হাদীস শরীফে আছে, এমন ব্যক্তির আমলনামায় কিয়ামাত পর্যন্ত প্রতি বছরই হজ্জের সাওয়াব লিখিত হতে থাকবে।

ওযরবশত যিনি আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে যেতে পারেন নি, তার উচিত মৃত্যুর পূর্বে ওয়ারিসদেরকে বদলী হজ্জের জন্য অসিয়্যাত করে যাওয়া। অসিয়্যাত না করে গেলে ওয়ারিসদের উপর তার জন্যে বদলী হজ্জ করানো ওয়াজিব হবে না বটে, তবে এমতাবস্থায় তার আওলাদ বা ওয়ারিসগণ বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করলে তার হজ্জ আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করে নিবেন বলে আশা করা যায়।[৩৯]

হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হলে

কুরআন শরীফের সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে :

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ٠

হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী আদায় করবে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৬)

এ বাধাগ্রস্ত হওয়া (ইহ্সার) দুই প্রকারের হতে পারে। একটি হলো রোগ জাতীয় বাধা। আরেকটি শত্রু বা প্রতিপক্ষ শক্তির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র)-এর মতে উভয় বাধাই 'ইহ্সার' এর মধ্যে গণ্য।[৪০]

মুফ্তী আযম মুহাম্মাদ শফী (র) উক্ত আয়াতের প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেন, এ আয়াতটি হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীগণ তখন ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফিররা তাঁদেরকে হরম সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা উমরা আদায় করতে পারেন নি। তখন আদেশ হলো ইহ্রামের ফিদইয়া স্বরূপ একটি করে কুরবানী কর। কুরবানী করে ইহ্রাম ভেঙ্গে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত :

وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ٠

"যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার নির্ধারিত স্থানে না পৌঁছে, তোমরা মাথা মুণ্ডন করবে না।" (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৬) বলে দেওয়া হয়েছে যে, মাথা মুণ্ডন করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানীর পশু যথাস্থানে না পৌঁছবে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কুরবানীর নির্ধারিত স্থান হচ্ছে হরমের সীমানা। নিজে সেখানে পৌঁছতে না পারলে অন্যের সাহায্যে কুরবানীর পশু পৌঁছাতে হবে ও যবেহ করাতে হবে। এ আয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শত্রু কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশংকা থাকা। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) অসুস্থতা জনিত অপারগতাকেও এর আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজ আমলদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানী

করেই ইহ্রাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ্জ বা উমরা কাযা করা ওয়াজিব। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীগণ পরবর্তী বছর উল্লিখিত উমরার কাযা আদায় করেছিলেন।[৪১]

বুখারী শরীফের এক হাদীসে হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ وَقَصَرَ اَصْحَابُهُ ·

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে উমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন কুরাইশরা হুদায়বিয়াতে আল্লাহ্র ঘরের ও আমাদের মধ্যে অন্তরাল হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং তিনি সেখানেই আপন কুরবানীসমূহ যবেহ্ করলেন ও মাথা মুড়ালেন এবং তাঁর সাহাবীগণ চুল ছাঁটলেন।[৪২]

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, কুরাইশদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হল্ক ও কুরবানী করার সাথে সাথে যোগ করেছেন অর্থাৎ এ সময় নবী কারীম (সা) তাঁর বিবিগণের সাথে সহবাসও করেন।

হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে এর বিধানটি আরো বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে :

اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيَهْدِىْ اَوْ يَصُوْمُ اِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ·

তোমাদের কেউ হজ্জ থেকে বাধাগ্রস্ত হলে সে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করবে। তারপর সে সবকিছু থেকে হালাল হয়ে পরবর্তী বছর হজ্জ করবে। (সাঈর পর) সে কুরবানীর পশু যবেহ্ করবে অথবা রোযা রাখবে যদি কুরবানীর পশু না পায়।[৪৩]

অর্থাৎ আরাফাতে গিয়ে হজ্জ করতে বাধাগ্রস্ত হলে সে তাওয়াফ ও সাঈ করে একে উমরার রূপদান করবে।[৪৪]

জিনায়াত বা হজ্জের ত্রুটি-বিচ্যুতি

হজ্জ পালনকালে অনিচ্ছায়ও অনেক সময় ত্রুটি-বিচ্যুতি বা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে যায়। এগুলোকে হজ্জের পরিভাষায় 'জিনায়াত' বলা হয়। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি কোনটি গুরুতর আবার কোনটি একান্তই মামুলি পর্যায়ের। এই ত্রুটির গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে এগুলো প্রতিবিধানেও তারতম্য রয়েছে। তাই কোন কোন ত্রুটির জন্যে পূর্ণ একটি গরু বা উট কাফ্ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হয়। একে হজ্জের পরিভাষায় 'বুদ্না' বলা হয়। বুদনা কেবল দু'টি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—

১. জানাবত (গোসল ফরয) অবস্থায় অথবা ঋতুবতী ও নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় তাওয়াফ করলে।

২. উকূফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডনের পূর্বে সহবাস করলে।

কোন কোন ত্রুটির ক্ষেত্রে প্রতিবিধান স্বরূপ সাধারণভাবে 'দম' দিতে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে একটি বক্রী, ভেড়া বা দুম্বা কুরবানী করা। উট বা গরুর এক-সপ্তমাংশও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক দমও দিতে হয়। যেমন ইহ্‌রাম অবস্থায় কিরান পালনকারী হাজীকে তার ত্রুটির জন্য হজ্জ ও উমরা উভয়টির নিয়্যাতের কারণে উমরার পূর্বেই দু'টি দম দিতে হয়।

সাধারণভাবে ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো বা হরম এলাকায় নিষিদ্ধ কোন কাজ করলে প্রতিবিধান স্বরূপ 'দম' আবার কোন কোন্ ক্ষেত্রে 'সাদাকা' দিতে হয়। সাদাকারও আবার তিনটি পর্যায় রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য দিতে হয়। তা এক-দু'মুষ্টি গমদ্বারাও আদায় হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পৌনে দুই সের (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) গম বা আটা, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাড়ে তিন সের (৩ কেজি ৫০০ গ্রাম) গম বা আটা সাদাকা দিতে হয়।

জিনায়াত-এর প্রতিবিধান

১. কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক ইহ্‌রামকারী যদি কোন বড় অঙ্গ যেমন মাথা, উরু, দাড়ি, হাত, হাতের তালু প্রভৃতি কোন একটিতে পূর্ণাঙ্গভাবে বা এক অঙ্গের কিছু বেশি স্থানে সুগন্ধি লাগালো, তবে 'দম' ওয়াজিব হবে। আর যদি কোন পূর্ণ অঙ্গে আংশিকভাবে লাগালো অথবা কোন ছোট অঙ্গে যেমন নাক, কান, ঘাড়, আঙ্গুল বা কব্জায় লাগালো, তাহলে 'সাদাকা' ওয়াজিব হবে। ফুল বা কোন সুগন্ধিযুক্ত ফল শোঁকার কারণে কোন কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। তবে এরূপ করাটা মাকরূহ। অঙ্গ ছোট-বড় হওয়ার কারণে পার্থক্য তখনই হবে যখন সুগন্ধির পরিমাণ বা তীব্রতা কম হবে। কিন্তু কস্তুরীর মত তীব্র সুগন্ধি যে কোন অঙ্গে সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করলেও 'দম' ওয়াজিব হবে। ওযরের ক্ষেত্রে তিনটি রোযা রাখা অথবা ছয়টি ফিত্‌রা পরিমাণ সাদাকাও দেওয়া যেতে পারে। (যুবদাহ্)

বিভিন্ন অঙ্গে মাখা সুগন্ধির পরিমাণ একটি বড় অঙ্গের সমপরিমাণ হয়ে গেলে দম ওয়াজিব হবে। (মু'আলিমুল হুজ্জাজ)

২. যদি অসুস্থতার কারণে সেলাই করা কাপড় পরে অথবা চুল কেটে বা মাথা অথবা চেহারা আবৃত করে অথবা মহিলা কাপড়দ্বারা তার চেহারা এমনভাবে ঢাকে যে, কাপড় তার চেহারা স্পর্শ করে, এসব অবস্থায় পূর্ণ ত্রুটির ক্ষেত্রে 'দম' দিবে অথবা তিনটি রোযা রাখবে অথবা ছয়জন মিস্‌কীনকে ফিত্‌রা পরিমাণ সাদাকা দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মিস্‌কীনকে পৌনে দুই সের (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) করে গম বা এর মূল্য দিবে।

পূর্ণ ত্রুটি না হওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি রোযা রাখবে অথবা ছয়জন মিস্‌কীনকে ফিত্‌রা পরিমাণ সাদাকা দিবে। তিন অথবা দু'টি বিষয়ে শুধু ওযরের অবস্থায় এ সুযোগ রয়েছে। বিনা ওযরে করা হলে পূর্ণ ত্রুটির ক্ষেত্রে 'দম' এবং আংশিক ত্রুটির সময় সাদাকা নির্ধারিত রয়েছে। রোযাদ্বারা কাফ্‌ফারা হবে না। শায়িত অবস্থায় মাথা ঢেকে গেলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। এক-চতুর্থাংশ মাথা বা চেহারা ঢাকা সমস্ত মাথা বা চেহারা ঢাকার শামিল। (যুবদাহ্)

৩. সুগন্ধি মিশ্রিত কাপড় পরলে সুগন্ধির পরিমাণ যদি অধিক হয় আর তা বিঘত দুই বিঘতের বেশি পরিমাণ স্থানে লেগে থাকে এবং সে কাপড় সারা দিন বা সারা রাত পরে থাকে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি সুগন্ধির পরিমাণ সামান্য হয় যা এক-দুই বিঘতের কম স্থানে

লেগেছে এরূপ ক্ষেত্রে সাদাকা ওয়াজিব হবে। একদিনের কম সময় ধরে পরার ক্ষেত্রেও সাদাকা প্রযোজ্য। (যুবদাহ)

৪. সুগন্ধি মিশ্রিত করে রান্না করা খাবার গ্রহণে কিছুই ওয়াজিব হয় না। অবশ্য খাদ্য গ্রহণকালে সুগন্ধি আসলে তা মাকরূহ হবে। কিন্তু অরান্নাকৃত সুগন্ধি যেমন চাট্‌নী, আচার ইত্যাদিতে যদি অধিক পরিমাণ সুগন্ধি থাকে, তাহলে তা খেলে 'দম' ওয়াজিব হবে। আহার্যের পরিমাণ যদি অধিক হয় এবং তা থেকে সামান্য পরিমাণ খেয়ে থাকে, তাহলে সাদাকা দিতে হবে, যদি সুগন্ধি না আসে। কিন্তু যদি এ ধরনের খাবার কয়েকবার খায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু রন্ধন ব্যতীত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যদি সুগন্ধি মিশ্রিত করে এবং ঐ খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণও হয়, তাহলে অধিক পরিমাণ খেলেও কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি সুগন্ধি আসে তাহলে মাকরূহ হবে। (আহকামুল হাজ্জ ওয়াল উমরা)

৫. বোতলে সামান্য সুগন্ধি মিশ্রিত পানীয় এক-আধবার পানে সাদাকা ওয়াজিব হবে। কিন্তু তা কয়েকবার পান করলে দম ওয়াজিব হবে।

৬. হাজরে আসওয়াদে যদি সুগন্ধি লাগানো থাকে আর তাতে চুমু দিতে গিয়ে অধিক পরিমাণ সুগন্ধি মুখে বা হাতে লেগে যায়, তাহলে ইহ্‌রামকারীর উপর দম ওয়াজিব হবে। পরিমাণ কম হলে সাদাকা ওয়াজিব হবে।

৭. ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা, হাত অথবা দাড়িতে মেহদী লাগান নিষিদ্ধ। যদি পূর্ণ মাথা, সম্পূর্ণ দাড়ি অথবা এক-চতুর্থাংশ মাথা অথবা এক-চতুর্থাংশ দাড়িতে মেহদী লাগান হয়, তাহলে মেহদী খুব গাঢ় না হয়ে হালকা হলে 'দম' ওয়াজিব হবে। গাঢ়ভাবে লাগান হলে দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি সুগন্ধির কারণে, অপরটি মাথা অথবা চেহারা ঢাকার কারণে। কিন্তু মহিলাদের জন্যে একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা তার জন্যে মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ নয়। সম্পূর্ণ হাতের উপর মেহদী লাগান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দম ওয়াজিব হবে।

ইহ্‌রাম অবস্থায় ফুলের মালা গলায় দেওয়া মাকরূহ। কিন্তু এতে কিছু ওয়াজিব হবে না।

৮. পায়ের উপরে মধ্যভাগ পর্যন্ত ঢেকে ফেলে এমন জুতো বা এরূপ মোজা পূর্ণ একদিন বা পূর্ণ একরাত পরে থাকা একটি পূর্ণ ত্রুটিরূপে গণ্য বিধায় এ জন্য একটি দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম হলে সাদাকা ওয়াজিব হবে। সেলাইকৃত কাপড় পরে ইহ্‌রাম বেঁধে বা ইহ্‌রাম অবস্থায় পরে একদিন অথবা একরাত থাকলে দম ওয়াজিব হবে, কম সময় হলে সাদাকা ওয়াজিব হবে।

৯. এক-চতুর্থাশ মাথা বা এক-চতুর্থাংশ দাড়ি অথবা এর চেয়ে বেশি অংশের চুল হল্‌ক বা কস্‌র (মুণ্ডন বা ছাঁটা) করলে অথবা কোন লোমনাশক ঔষধের দ্বারা তুলে ফেললে পূর্ণ ত্রুটিরূপে গণ্য হবে এবং দম ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে বগলের লোম পুরোপুরি পরিষ্কার করে ফেললে অথবা নাভির নিচের সমগ্র পশম পরিষ্কার করে ফেললে অথবা সমগ্র গর্দানের চুল কেটে ফেললে দম ওয়াজিব হবে।

১০. যদি দুই হাত বা দুই পায়ের নখ এক বৈঠকে কাটে অথবা এক পা ও দুই হাতের নখ কাটে, তাহলে পূর্ণ ত্রুটি হবে এবং দম ওয়াজিব হবে। পাঁচ আঙুলের কমে নখ কাটলে প্রতি

নখের জন্য সাদাকা ওয়াজিব হবে। হাত-পায়ের মিলিয়ে পাঁচটি নখ কাটলেও ঐ হুকুম। (হিদায়া)

১১. মুহ্‌রিম ব্যক্তি অন্যের এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক মাথা মুড়িয়ে দিলে তার উপর সাদাকা এবং যার মাথা মুড়িয়েছে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। (হিদায়া)

যদি দু'তিনটি চুল মুণ্ডন করে বা কর্তন করে তবে প্রতিটি চুলের জন্য এক মুঠো গম বা এক টুক্‌রা রুটি সাদাকা করবে এবং তিনটি চুলের অধিক হলে একটি ফিত্‌রা পরিমাণ সাদাকা ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ)

১২. ইহ্‌রামের অবস্থায় স্থলজ শিকার, শিকার জন্তুকে আহত করা, তার দুধ বের করা, শিকার করার জন্যে ইঙ্গিত করা বা অন্যকে দেখিয়ে দেওয়া, হরমের ঘাস বা গাছ কাটা ইত্যাদি সবকিছুই নিষিদ্ধ। এ সকল অবস্থায় দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু এ অবস্থায় গৃহপালিত জন্তু যবেহ্‌ করা ও খাওয়া জায়িয আছে। মিনা ও মুযদালিফা হরম সীমানার অন্তর্ভুক্ত বিধায় এসব স্থানে গাছ বা ঘাস কাটলেও দম দিতে হবে।

১৩. ইহ্‌রাম বেঁধে মীকাত অতিক্রম করলে পুনরায় মীকাতে গিয়ে ইহ্‌রাম বেঁধে আসা ওয়াজিব হবে। মীকাতে ফিরে না গিয়েই ইহ্‌রাম বেঁধে নিলে দম ওয়াজিব হবে।

১৪. উযুবিহীন অবস্থায় সমস্ত বা অধিকাংশ তাওয়াফ করলে দম ওয়াজিব হবে। যদি তাওয়াফে কুদূম অথবা তাওয়াফে বিদা অথবা নফল তাওয়াফ অথবা অর্ধেকের কম তাওয়াফ উযূবিহীন অবস্থায় থাকে, তাহলে প্রতিটি তাওয়াফের জন্য সাদাকাতুল ফিত্‌র পরিমাণ সাদাকা ওয়াজিব হবে। উযূ করে পুনরায় সেসব তাওয়াফ করে নিলে কাফ্‌ফারা ও দম লাগবে না। (আলমগীরী)

১৫. কোন ব্যক্তি যদি কামভাব সহকারে স্ত্রীকে চুমু দেয় বা স্পর্শ করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। উকূফে আরাফার পূর্বে সাহবাস করলে হজ্জ ফাসিদ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও একটি ছাগল কুরবানী করতে হয় এবং অন্যান্য হাজীদের মত সবকিছু করে যেতে হয় এবং পরবর্তী বছরে হজ্জের কাযা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। (হিদায়া)

চুল মুণ্ডানোর পর স্ত্রী সহবাসে একটি ছাগল কুরবানী দিতে হয়। কেননা, স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে তার ইহ্‌রাম তখনো বাকী থাকে, যদিও সেলাইযুক্ত কাপড় ইত্যাদির ব্যাপারে তার উপর কোন বাধা থাকে না।

১৬. তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফে তিন চক্কর বা তার কম চক্কর উযূ ছাড়া থাকলে সাদাকাদ্বারা আর তাওয়াফে যিয়ারতে তিন চক্কর বা তার চাইতে কম ছেড়ে দিলে বক্‌রী কুরবানীদ্বারা তার প্রতিনিধান করতে হবে। (হিদায়া)

যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফ বা তার চার চক্কর ছেড়ে দেবে, ওয়াজিব তরকের কারণে তাকে বক্‌রী কুরবানী দিতে হবে।

১৭. উমরার জন্য তাওয়াফ শেষে সাঈ যদি বিনা উযূতে করে থাকে এবং হালাল হয়ে গিয়ে থাকে (ইহ্‌রাম ত্যাগ করে), তাহলে মক্কা থাকাকালে ওগুলো পুনরায় করে নিবে। ফলে

কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ওগুলো পুনরায় না করে দেশে গেলে সাঈ তরকের জন্য দম ওয়াজিব হবে।

১৮. সাফা ও মারওয়ার সাঈ বা উকূফে মুযদালিফা তরক করলে তরকের কারণে দম ওয়াজিব হবে।

১৯. কংকর মারার দিনসমূহে কংকর মারা তরক করলেও দম ওয়াজিব হবে।

২০. ইমামের পূর্বে আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করলে দম ওয়াজিব হবে। সূর্যাস্তের পর পুনরায় সে ব্যক্তি আরাফাত ফিরে গেলেও দম থেকে অব্যাহতি পাবে না। অবশ্য মাগরিবের পূর্বেই ফিরে গেলে তার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। (হিদায়া)

২১. এক দিনের কংকর নিক্ষেপ না করলেও দম ওয়াজিব হবে। আর তিন জামারার কোন একটিতে কংকর নিক্ষেপ ছেড়ে দিলে সাদাকা ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে কুরবানীর দিন (১০ তারিখ) জামারাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ ত্যাগেও দম ওয়াজিব হবে। একটি, দু'টি বা তিনটি কংকর নিক্ষেপ ত্যাগের জন্য প্রতিটি কংকরের বিনিময়ে পৌনে দুই সের গম বা আটা (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম) সাদাকা করা ওয়াজিব হবে।

২২. স্থলজ প্রাণী শিকার করলে বা তার শিকারে অন্যকে পথ দেখালে বা প্ররোচিত করলে ঐ প্রাণীর মূল্যের সমপরিমাণ সাদাকা করা ওয়াজিব।

উমরার ফযীলত ও আহ্কাম

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে ;

"এক উমরা থেকে অপর উমরা পর্যন্ত কৃত পাপরাশির কাফ্ফারা উমরাদ্বারা হয়ে যায়।"

কুরআন শরীফে হজ্জ ও উমরার উল্লেখ পাশাপাশি করা হয়েছে। যেমন :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ـ

এবং আল্লাহ্রই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করবে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৬)

রমযান মাসে উমরা পালন মুস্তাহাব। এতে এক হজ্জের সাওয়াব মিলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : রমযানের উমরা এক হজ্জের তুল্য যা আমার সাথে সমাপন করা হয়েছে। 'উমরা' শব্দের অর্থ যিয়ারত বা দর্শন। শরী'আতের পরিভাষায় কতক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের সাথে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতকে 'উমরা' বলা হয়ে থাকে।

হজ্জ ও উমরাকে একই পর্যায়ে রেখে কুরআন শরীফে বর্ণনা করায় ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র)-এর মতে উমরাও হজ্জের মতই ফরয। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উমরা সুন্নাত। তিনি বলেন, কুরআন শরীফে উমরা শুরু করার পর তা পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই শুরু করা উমরা পূর্ণ করা ফরয। তাঁর মতের সপক্ষে তিরমিযী শরীফের একটি সহীহ্ হাদীস রয়েছে, যাতে আছে হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উমরা কি ফরয ? জবাবে তিনি বললেন : না। তবে উমরা করা উত্তম। [মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (র) অনূদিত মিশ্কাত শরীফ, হজ্জ পর্বের ভূমিকায়]

উমরা আদায়ের পদ্ধতি

মীকাত থেকে হজ্জের ইহ্রামের মত ইহ্রাম বেঁধে ইহ্রামের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে বিরত থেকে আদব-কায়দার দিকে পূর্ণ খেয়াল রেখে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করতে হয়। বাবুস সালাম মতান্তরে বাবুল উমরা ধরে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে রমল ও ইযতিবাসহ তাওয়াফ করতে হয়। হাজরে আসওয়াদে প্রথম চুম্বনের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করে দিতে হয়। তাওয়াফ অন্তে দুই রাকা'আত নামায আদায় করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে বাবুস সাফার পথে সাঈ-এর জন্যে বের হয়ে এসে যথানিয়মে সাঈ সম্পন্ন করতে হয়। সাঈ-এর পর পুনরায় মাতাফে এসে দুই রাকা'আত নামায আদায় করে মারওয়ায় ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করে ইহরাম ছেড়ে হালাল হয়ে যেতে হয়। এভাবে উমরা আদায় করতে হয়। মক্কা মুহাররামা থেকে ইহ্রাম পালনকারীদের জন্য 'হিল' এলাকা মীকাত হলেও তানঈম ও জি'রানা থেকে ইহ্রাম বাঁধা উত্তম।

উমরার ইহ্রাম, শর্তাবলী ও আহ্কাম হজ্জের মতই। তবে হজ্জ ও উমরার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে হজ্জের সময় সুনির্ধারিত। উমরা বছরের যে কোন সময় করা যায়। কেবল ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ এই পাঁচদিন উমরা নিষিদ্ধ, মাকরূহ তাহ্রীমী।

উমরায় আরাফাতে বা মুযদালিফায় অবস্থান, দুই ওয়াক্তের নামাযের একত্রীকরণ, তাওয়াফে কুদূম, তাওয়াফে বিদা, কংকর নিক্ষেপ প্রভৃতি নেই। এ ছাড়া উমরার মীকাত পর্বত এলাকা মানে হরম শরীফের সীমানার বাইরে থেকেই ইহ্রাম বেঁধে উমরা করা চলে কিন্তু হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট মীকাত রয়েছে। উমরাতে তাওয়াফ করার সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রে কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া অব্যাহত রাখতে হয়।

উমরার মাসাইল

উমরার ফরয দু'টি : ইহ্রাম ও তাওয়াফ। ইহরামের মধ্যে তালবিয়া ও নিয়্যাত উভয়ই ফরয। পক্ষান্তরে তাওয়াফের জন্যে কেবল নিয়্যাত ফরয।

উমরার ওয়াজিব দু'টি : ১. সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা, ২. মাথার চুল মুণ্ডন করা বা ছাঁটা।

আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত পাঁচ দিন যেহেতু উমরা পালন মাকরূহ তাহরীমী, তাই সময় উমরার নিয়্যাতে ইহ্রাম বাঁধলেও তা তরক করা ওয়াজিব। কিন্তু এ দিনগুলোর পর উমরা ও দম উভয়টাই ওয়াজিব হবে। আর যদি উমরা ঐ সময়ে করেও ফেলেন, তবুও মাকরূহ কাজ করার কারণে একটি দম ওয়াজিব হবে।

অধিক সংখ্যক উমরা পালনের চেয়ে অধিক সংখ্যক তাওয়াফ পালনেই সওয়াব বেশি।

মদীনা শরীফ যিয়ারত

মদীনাতুন্নবী (সা) বা নবীর শহর সোনার মদীনা বিশ্ব মুসলিমের আবেগ-উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রস্থল। মক্কার কুরাইশরা যখন সাইয়্যেদুল মুরসালীন ও খাতামুন্-নাবিয়্যীন তথা মানবকুল শিরোমণি

মুহাম্মাদ (সা)-কে নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণ করে দেশছাড়া করেছিল, তখন যে পবিত্র ভূমি তাঁকে তার কোলে আশ্রয় দিয়ে চিরধন্য হয়েছিল, সেই পবিত্র নগরী হচ্ছে এই মদীনা মুনাওয়ারা। তাঁর পবিত্র দেহকে ধারন করে এ নগরী লাভ করেছে পৃথিবীর বুকে জান্নাতের মর্যাদা।

কুরআন শরীফে এ নগরীকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'আরদুল্লাহ্' (আল্লাহ্র ভূমি) 'আরদুল হিজর' (হিজরতের ভূমি), আদ্দার--বিশিষ্ট বাড়ি এবং বিশ্বাস ভূমি বলে। এ কারণেই ইমাম মালিক (র) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহরের সেরা ও সর্বোত্তম শহর বলতেন। (কুরতুবী)

ভূপৃষ্ঠে মদীনা তাইয়্যেবার মত এত অধিক নামবিশিষ্ট জনপদ আর একটিও নেই। কোন কোন আলিম সযত্ন প্রয়াস চালিয়ে এ পবিত্র নগরীর প্রায় একশ'টি নাম উদ্ধার করেছেন। [জায়ফুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবূব : মাওলানা আবদুল হক দেহলবী (র)]

মহানবী (সা)-এর পবিত্র চরণস্পর্শে ধন্য হয়েছে এর প্রতিটি অলিগলি; এর আকাশে-বাতাসে মিশে রয়েছে তাঁর পবিত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবাস। তাই আরবী প্রেমিক কবি বলেন : (বঙ্গানুবাদ)

নূর নবীর সুবাস নিয়ে সুবাসিত ইহার পবন,
কস্তুরী ও কর্পূর সুবাস পরাজিত সুবাস চন্দন।

মদীনার প্রতি নবী কারীম (সা)-এর এ পরিমাণ আকর্ষণ ছিল যে, কোন সফর থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে তিনি উটের গতি বাড়িয়ে দিতেন। কারণ তখন তিনি মদীনায় প্রবেশের জন্য ব্যাকুল থাকতেন। মদীনায় পৌছে তাঁর হৃদয়মন জুড়াতো এবং তিনি চাদর না খুলতেই বলতেন, আহ্ ! কী মনোরম এ বাতাস!

মদীনার যে ধুলোবালি তাঁর মুখমণ্ডলে এসে পড়তো তা তিনি পরিষ্কার করতেন না। কোন সাহাবী ধুলোবালি থেকে রক্ষার জন্য মুখ আবৃত্ত করলে তিনি তাঁদেরকে নিষেধ করতেন এবং বলতেন : মদীনার মাটিতে শিফা বা নিরাময় রয়েছে।

সহীহ্ হাদীসে আছে :

اَلْمَدِيْنَةُ تَنْفِىْ خُبْثَ الرِّجَالِ كَمَا تَنْفِىْ الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ ·

মদীনা মানুষের পঙ্কিলতা বিনাশ করে যেমনটি বিনাশ করে কর্মকারের হাঁপর লোহার মরিচা।

বুখারী শরীফে আছে :

اِنَّمَا طَيِّبَةُ تَنْفِى الذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبْثَ الْحَدِيْدِ ·

এ শহর পবিত্র, এটা গুনাহ্সমূহকে বিদূরিত করে যেমনটা বিদূরিত করে হাঁপর লোহার মরিচাকে।

হযরত আলী (রা)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াতে আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ অবস্থায় কিব্লামুখী দাঁড়িয়ে এরূপ দু'আ করেছিলেন : হে আল্লাহ্ ! ইব্রাহীম তোমার বান্দা ও খলীল, তিনি মক্কার কল্যাণ ও বরকত নাযিলের দু'আ করেছিলেন। আমিও তোমার বান্দা ও রাসূল,

আমি মদীনাবাসীদের জন্য দু'আ করছি। হে আল্লাহ্! তাঁদের মুদ ও সা'তে বরকত দাও যেমনটি মক্কাবাসীদের দিয়েছ। বরং মদীনাবাসীদেরকে মক্কাবাসীদের তুলনায় দ্বিগুণ দাও।

বর্ণিত আছে, মদীনায় জ্বরের খুব প্রকোপ ছিল। প্রথমদিকে মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ জ্বরে আক্রান্ত হতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আর বরকতে তা জুহফায় স্থানান্তরিত হয়। সেখানে সেকালে সেরা মুশরিকদের নিবাস ছিল।

মদীনার মাটিতে রোগ নিরাময়ের গুণ রয়েছে। এর ফলমূল খেয়ে রোগ নিরাময়ের কথা বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে।

যে ব্যক্তি মদীনার সাতটি আজওয়া খেজুর খালি পেটে খাবে, যাদু ও বিষের ক্রিয়া তার মধ্যে হবে না। (বুখারী) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মাথাঘোরা রোগে তা খেতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণিত রিওয়ায়াতে আছে :

كَانَ اَحَبُّ التَّمَرِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الاَجْوَةُ ۔

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বাধিক প্রিয় খেজুর ছিল আজওয়া।

ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ কুবার মসজিদ, পয়গাম্বরগণের সর্বশেষ মসজিদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বর ও কবরের মধ্যবর্তী রিয়াযুল জান্নাত বা বেহেশতের বাগান, জান্নাতের পাহাড় ওহুদ পাহাড়, হযরত হামযা (রা)-এর কবর, নবী পরিবারের বিশিষ্ট সদস্যবর্গ ও বিশিষ্ট সাহাবীগণের কবর সম্বলিত 'জান্নাতুল বাকী' প্রভৃতি এই মদীনা শরীফেই অবস্থিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

اَلْمَدِيْنَةُ مُهَاجِرِىْ وَفِيْهَا مَضْجَعِىْ وَفِيْهَا مَبْعَثِىْ حَقِيْقٌ عَلٰى اُمَّتِىْ حِفْظُ جِيْرَانِىْ مَا اجْتَنَبُوْا الْكَبَائِرَ مَنْ حَفِظَهُمْ كُنْتُ لَهٗ شَهِيْدًا وَشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ سُقِىَ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ ۔

মদীনা আমার হিজরতস্থল, এখানে আমার শয়ান স্থল, এখানে থেকেই আমার পুনরুত্থান হবে। আমার উম্মাতের কর্তব্য আমার পড়শীদের হিফাযত ও সম্মান করা, যাবৎ তারা কবীরা গুনাহ্ থেকে দূরে থাকে। আমি তাদের সম্মান, হিফাযত ও সুপারিশকারী হবো। যে তাদের হিফাযত ও সম্মান করবে না, তাকে দোযখের চৌবাচ্চা 'তীনাতুল খাবাল' থেকে রক্ত ও পুঁজ পান করানো হবে।

সহীহ্ মুসলিমে আছে :

مَنْ اَرَادَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ ۔

যে কেউ মদীনাবাসীদের অনিষ্ট প্রয়াসী হবে, আল্লাহ্ তাকে দোযখের আগুনে ঠিক তেমনটি দ্রবীভূত করবেন যেমনটি লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে থাকে।

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, একদা নবী কারীম (সা) উভয় হাত আকাশের পানে উঠিয়ে দু'আ করেছেন :

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَرَادَنِىْ وَاَهْلَ بَلَدِىْ بِسُوْءٍ فَعَجِّلْ هَلَاكَهُ ・

হে আল্লাহ্! যে আমার ও আমার নগরীর অনিষ্ট সাধন করতে চায়, তুমি তার ধ্বংস ত্বরান্বিত কর।

তাই কেউ মদীনার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমনকি আখেরী যামানার কানা দাজ্জালও মদীনার সীমানায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হবে বলে হাদীসে এসেছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে আছে :

اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَازِرُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْزِرُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا ・

ঈমান মদীনায় এসে নিজেকে গুটিয়ে নেবে যেমনিভাবে সাপ নিজেকে গুটিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা শরীফ যিয়ারত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা মুবারক যিয়ারত যে পরম সৌভাগ্য ও শ্রেষ্ঠ সাওয়াবের কাজ এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই কোন কোন আলিম সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওযা যিয়ারতে যাওয়াকে ওয়াজিবরূপে গণ্য করেছেন। (মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ)

স্বয়ং নবী কারীম (সা) ফরমান :

مَنْ زَارَنِىْ مُعْتَمِدًا كَانَ فِىْ جِوَارِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ・

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার আশেপাশে থাকবে।[৪৫]

তিনি আরো বলেন :

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَانِىْ فِىْ حَيَاتِىْ ・

যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাত করল।[৪৬]

সুতরাং এ পরম সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত। একটি হাদীসে আছে, রাসূল (সা) বলেন :

مَنْ حَجَّ اِلٰى مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنِىْ فِىْ مَسْجِدِىْ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّتَانِ مَبْرُوْرَتَانِ ・

যে ব্যক্তি মক্কায় হজ্জ সমাপন করে আমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আমার মসজিদে আসে, তার জন্য দু'টি মাকবূল হজ্জের সাওয়াব লিখিত হয়।[৪৭]

যিয়ারতের আদব

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ جَاءَنِىْ زَائِرًا لَا تَعْمَلُهُ حَاجَتَهُ اِلَّا زِيَارَتِىْ كَانَ حَقًّا عَلَىَّ اَنْ اَكُنْ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ・

যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসে, তার অন্য কোন প্রয়োজন না থাকে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী হব।

খালিস নিয়্যাতে একান্তই যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দরবারে নববীতে হাযিরা দিতে হবে। রাসূলে কারীম (সা)-এর য়িয়ারতের সাথে মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়্যাত থাকা মুস্তাহাব বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা, মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের জন্য স্বয়ং নবী কারীম (সা) উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন :

صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ ـ

আমার এ মাসজিদে এক নামায মাসজিদুল হরম ব্যতীত অন্যান্য মাসজিদে এক হাজার নামায আদায়ের চাইতেও উত্তম।[৪৮]

ইব্‌ন মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, মাসজিদে নববীতে এক নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের চাইতেও উত্তম।

এমতাবস্থায় রাসূলে কারীম (সা)-এর যিয়ারত সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে পৃথকভাবে মসজিদে নববীর য়িয়ারতের নিয়্যাত করে নেওয়া উত্তম এবং মসজিদের নিয়্যাতকে যিয়ারতের নিয়্যাতের পরিপূরক বলা চলে।

যিয়ারতের সফরে অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠে অতিবাহিত করা উচিত। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা একদল ফিরিশ্‌তা সৃষ্টি করেছেন যাঁরা যিয়ারতে ইচ্ছুকদের সালাত ও সালাম নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে আরয করেন, অমুকের পুত্র অমুক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছে এবং সে এ সালাম প্রেরণ করেছে। নবী কারীম (সা)-এর নিকট তার ও তার পিতার নাম উচ্চারিত হবে, এর চাইতে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে ?

মদীনায় পৌঁছার পর দুরূদ-সালাম ও আবেগের মাত্রা বাড়িয়ে দিবেন। হাদীস শরীফে আছে, যিয়ারতকারী মদীনার নিকটবর্তী হলে রহমতের ফিরিশ্‌তাগণ তাকে অভ্যর্থনার জন্যে এগিয়ে আসেন। এ সময় যিয়ারতকারীর কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি বা শোরগোল করা উচিত নয়। 'যুল-হুলায়ফা' বা বীরে আলী নামক স্থানে পৌছলে সম্ভব হলে দু'রাকা'আত নামায আদায় করবেন। মদীনায় নগরপ্রাচীর চোখে পড়ামাত্র দুরূদ পাঠ করে পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِىْ وِقَايَةً مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ ـ

হে আল্লাহ্! এ যে তোমার নবীর হরম, একে আমার জন্যে দোযখ থেকে রক্ষার উপকরণ এবং আযাব ও হিসাব-নিকাশের কঠোরতা থেকে নিরাপত্তার হেতু বানিয়ে দিন।

নগরীতে প্রবেশের পূর্বে সম্ভব হলে গোসল বা উযূ করে নিবেন। তারপর নতুন কাপড় পরবেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবেন কিন্তু সাবধান অতিভক্তি দেখিয়ে ইহ্‌রাম পরবেন না বা তার অনুকরণ করবেন না। কেননা এটা কেবল বায়তুল্লাহ্ শরীফের জন্যই খাস। নগর তোরণে উপস্থিত হয়ে পড়বেন :

بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَارْزُقْنِىْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ وَاَهْلَ طَاعَتِكَ وَاَنْقِذْنِىْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ يَاخَيْرَ مَسْئُوْلٍ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِيْهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا ـ

নগরে প্রবেশের পর সর্বপ্রথম মাসজিদে নববীতে প্রথমে ডান পা রেখে অত্যন্ত বিনয় সহকারে প্রবেশ করবেন এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

মসজিদে প্রবেশ করে নিষিদ্ধ সময় না হয়ে থাকলে মিম্বরে ও কবর শরীফের মধ্যবর্তী 'রিয়াযুল জান্নাত' অংশে দু'রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায আদায় করবেন। এ নামায নবী কারীম (সা)-এর মিহরাবে আদায় করা উত্তম, নতুবা পার্শ্ববর্তী যে কোন স্থানে আদায় করে নিবেন। তারপর শুকরিয়া স্বরূপ আরও দু'রাকা'আত আদায় করবেন এবং উত্তমরূপে যিয়ারতের তাওফীকের জন্য দু'আ করবেন।

যিয়ারতের পূর্বে কিছু দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব। ভাবগম্ভীর পরিবেশে অত্যন্ত আদবের সাথে মধ্যম আওয়াজে নবী কারীম (সা)-কে এভাবে সালাম পেশ করবেন :

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللّٰهِ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِ اللّٰهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرًا وَجَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ جَزٰى نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامَ الْمَحْمُوْدِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ اِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

যদি কোন মুসলমান নবীজীকে সালাম পৌঁছানোর জন্য বলে থাকেন, তবে তাদের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো জায়িয আছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সালাম পাঠ করার পর ডানদিকে একহাত পরিমাণ সরে এসে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কবর বরাবর দাঁড়িয়ে এইভাবে সালাম দিবেন :

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَثَانِيَهٗ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقَهٗ فِى الْاَسْفَارِ اَمِيْنَهٗ عَلَى الْاَسْرَارِ اَبَا بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا ـ

তারপর আরো ডানদিকে সরে এসে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর কবর সোজা দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম দিবেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقَ الَّذِىْ اَعَزَّ اللّٰهُ بِهِ الْاِسْلَامَ اِمَامَ مُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَمَيِّتًا جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-কে সালাম জানানোর পর পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা মুবারকের সামনে এসে দাঁড়াবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাম ও দুরূদ পাঠ করে তাঁর উসীলা দিয়ে নিজের জন্য এবং সকল আত্মীয়-স্বজনের জন্য দু'আ করবেন।

মদীনা শরীফে করণীয় ও দর্শনীয়

মদীনা শরীফ হচ্ছে নবী কারীম (সা)-এর কর্মস্থল, জীবনের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত নগরী। এখানকার অলিতে গলিতে তাঁর হাজারো স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। তাই যিয়ারত ছাড়াও এখানে অনেক করণীয় রয়েছে।

সর্বাধিক স্মৃতি বিজড়িত স্থানটি হচ্ছে মসজিদে নববী যা ছিল তাঁর ধর্ম-কর্ম, ইবাদত-বন্দেগী, শাসন-শৃংখলা সংক্রান্ত আদেশ-নিষেধ জারী, বিভিন্ন গোত্রে মু'আল্লিম ও মুবাল্লিগ প্রেরণ, বিশ্বের সেরা রাজ-রাজড়ার কাছে দূত প্রেরণ ও বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর বাহিনীসমূহ প্রেরণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র। এ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রদত্ত তাঁর খুত্বাসমূজ বিশ্ব মুসলিম তথা বিশ্বমানবের পথের দিশারী হয়ে রয়েছে। এ সমস্ত স্মৃতি ও শিক্ষাবলীকে অন্তরে জাগরুক করে তোলা হচ্ছে মদীনা শরীফের অন্যতম করণীয়।

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার মসজিদে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে তার জন্যে দু'টি মুক্তি রয়েছে। একটি দোযখ থেকে তার মুক্তি এবং অপরটি আযাব ও নিফাক (মুনাফিকী) থেকে মুক্তি। এ জন্য মসজিদে নববীতে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় মদীনা শরীফে বিশেষ করণীয়।

'রিয়াযুল জান্নাত' বা বেহেশ্তের বাগিচা বলে রওয়া শরীফ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বরের মধ্যবর্তী অংশে দুই রাকা'আত নামায সকলেই আদায় করতে চান, তাই ওখানে সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করে অন্যদের জন্যে স্থান করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কুবার মসজিদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি শনিবার কুবার সেই ঐতিহাসিক মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন যা মদীনায় হিজরতের পরেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (রা) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, যাতে তিনি বলেন :

اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِىْ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْهِ كُلَّ سَبْتٍ .

হযরত ইব্ন উমর (রা) প্রতি শনিবার কুবায় যেতেন এবং তিনি বলতেন, আমি প্রতি শনিবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুবায় যেতে দেখেছি।[৪৯]

অপর হাদীসে আছে, কুবার মসজিদে নামায আদায়ে উমরা তুল্য সাওয়াব মিলে।[৫০]

কুরআন শরীফে কুবার মসজিদকে أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى 'তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত' মসজিদ এবং আদি মুসল্লীগণের শানে فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا 'যেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে পসন্দ করে' বলে প্রশংসা করা হয়েছে।

মসজিদে জুমু'আ

কুবার নতুন রাস্তার পূর্বদিকে রানুনা উপত্যকার বুৎওয়ানুল জাযা-এর নিকট এ মসজিদের নিকট বনী সলিমা গোত্রের বসবাস ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম জুমু'আর নামায এ মসজিদেই আদায় করেছিলেন বলে এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

মসজিদ গামামা

এর অপর নাম মসজিদে মুসাল্লা। এ স্থানটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় ঈদের নামায আদায় করতেন।

মসজিদে সুরাইয়া

বাবে আম্বিয়ার নিকট রেল স্টেশনের ভিতরে একটি গম্বুজ রয়েছে, এ গম্বুজটিকে 'কুব্বাতুর রাউস' বলা হয়ে থাকে। এখানে 'সুফাইয়া' নামক একটি কূপও রয়েছে। বদর যুদ্ধে গমনকালে নবী কারীম (সা) এখানে নামায আদায় করে মদীনাবাসীদের জন্যে বরকতের দু'আ করেছিলেন।

মসজিদে ফাতহ্

সালা পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এ স্থানটিতে খন্দক যুদ্ধের সময় পরিখা খনন করা হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সমস্ত কাফির গোত্রের অবরোধের মুখে এখানে অবস্থান করে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বিজয়ের দু'আ করেন। মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়ী হন। এ জন্য এ মসজিদকে 'মসজিদে ফাতহ্' বা বিজয়ের মসজিদও বলা হয়ে থাকে।

মসজিদে যুবাব

ওহুদ যাবার পথে সানিয়াতুল বিদা থেকে অবতরণ করে রাস্তার বামপাশে যুবাব পাহাড়ের উপরে এ মসজিদটি অবস্থিত। খন্দকের যুদ্ধকালে এখানে নবী কারীম (সা)-এর তাঁবু টানানো হয়েছিল এবং এখানে তিনি নামায আদায় করেছিলেন।

মসজিদে কিব্লাতাইন

কিব্লা পরিবর্তনের সংবাদ শুনে নামাযরত অবস্থায়ই মুসলমানগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল যে মসজিদে, তা মদীনা শরীফের উত্তর-পশ্চিমস্থিত আকাল উপত্যকার নিকটবর্তী একটি টিলার উপর অবস্থিত। এখনও তাতে বায়তুল মুকাদ্দাস ও মক্কা শরীফ অভিমুখী দু'টি মিহ্রাব রয়েছে। এ জন্য এ মসজিদটিকে 'মস্জিদে কিব্লাতাইন' বা দুই কিব্লার মসজিদ বলা হয়ে থাকে।

মসজিদুল কাযীহ্

মদীনার উঁচু এলাকার উত্তরদিকে অবস্থিত এ মসজিদে নবী কারীম (সা) ইয়াহূদী বনূ নযীর গোত্রকে অবরোধকালে নামায আদায় করেছিলেন। কাযীহ্ হচ্ছে খেজুর থেকে তৈরি মদ। হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ এখানে কাযীহ্ পানরত অবস্থায় মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলে তাঁরা সমস্ত পানপাত্র ও মদের মটকা ভেঙ্গে ফেলে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করেন। এ স্মৃতির সাথে জড়িত বলে এ মসজিদটির এরূপ নামকরণ করা হয়। উঁচুস্থানে অবস্থিত বিধায় এ মসজিদে সূর্যোদয় সর্বাগ্রে দৃশ্যমান হয় বলে এ মসজিদটিকে 'মাসজিদুল শামস' বা সূর্যের মসজিদও বলা হয়ে থাকে।

মসজিদে বনূ কুরায়যা

ইয়াহূদী বনূ কুরায়যা গোত্রকে অবরোধকালে নবী কারীম (সা) এখানে অবস্থান করেন। ইয়াহূদীরা হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে সালিশরূপে মেনে নিলে তিনি এখানে বসেই তাঁর রায় ঘোষণা করেন। এ মসজিদটি কাযীহ্ থেকে সামান্য উত্তরে অবস্থিত।

মসজিদুল ইজাবা

জান্নাতুল বাকী-এর উত্তরদিকে 'বুস্তানুল সাম্মাম'-এর নিকটে অবস্থিত এ মসজিদটিতে অবস্থানকালে একদা নবী কারীম (সা) উম্মাতের জন্যে তিনটি দু'আ করেছিলেন যার দু'টি কবূল হয়েছিল। এজন্য একে মসজিদুল ইজাবা বা দু'আ কবূলের মসজিদ বলা হয়ে থাকে। ঐ দু'আ দু'টি ছিল, গোটা উম্মাত যেন দুর্ভিক্ষে এবং পানিতে ডুবে ধ্বংস না হয়। তৃতীয় যে দু'আটি কবূল হয়নি তা হল, তারা যেন আত্মকলহে লিপ্ত না হয়।

এছাড়াও মসজিদে সাজ্দ, মসজিদে উবাই, মসজিদে বারাখ, মসজিদে মুসাল্লার নিকটবর্তী মসজিদে আবূ বকর ও মসজিদে আলী এবং মসজিদে ইব্রাহীম প্রভৃতি স্থানেও নবী কারীম (সা) নামায আদায় করেছেন।

এছাড়াও রয়েছে নবী কারীম (সা)-এর স্মৃতিধন্য অনেকগুলো কূপ। যতদূর জানা যায় নবী কারীম (সা)-এর আমলে মদীনার ১৭টি কূপ ছিল। সে সব কূপের মধ্যে বীরে আবস, বীরে জুমা'আ, আবূ তালহা (রা)-এর স্মৃতিধন্য বীরে রুযাহ (বর্তমানে নাম বীরে উসমান) প্রভৃতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। মদীনাবাসীদের সহিত সম্মানজনক ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নবী কারীম (সা) ও তাঁর প্রতিবেশীদের হক আদায় করা উচিত। তাঁদের কোন আচার-ব্যবহারে কোনরূপ ফাঁক-ফোকর থাকলেও ধৈর্যধারণ করা উচিত।

কেননা নবী কারীম (সা)-কে আশ্রয়দানকারী নবী প্রেমিক সাহাবীদের বংশধর ও উত্তরাধিকারীরূপে গোটা উম্মাত তাঁদের কাছে ঋণী রয়েছে।

হজ্জ থেকে ফেরা ও করণীয়

মদীনা শরীফ থেকে বাড়ি ফেরার পূর্বে মসজিদে নববীতে হাযির হয়ে মিহ্রাবে নববীতে বা নিকটবর্তী স্থানে দু'রাকা'আত নামায আদায় করে রওয়া মুবারকে হাযির হয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে যিয়ারত সম্পন্ন করে দু'আ করবেন :

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ بِنَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْلِىْ الْعَوْدَ اِلَيْهِ وَالْعُكُوْفَ لَدَيْهِ وَارْزُقْنِى الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ اٰتِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ·

বিরহ্ বিধুর মনে কান্নাকাটি করবেন। দেশে ফিরে বাড়িঘর বা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হলে নিম্নের দু'আ পড়বেন :

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ·

সম্ভব হলে দিনের বেলা বাড়ি ফেরা উত্তম। নিজ গ্রামে বা জনপদে প্রবেশ করে ঘরে প্রবেশের পূর্বেই সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করবেন। ঘরে প্রবেশ করেও সর্বপ্রথম দু'রাকা'আত নামায আদায় করে দু'আ করবেন :

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لاَيُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ·

হাজীদের বাড়ি প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদের সাথে মুসাফাহা ও মু'আনাকাদ্বারা গুনাহ্ মাফ হয় বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই যথাসম্ভব সকলের সাথে মুসাফাহা ও মু'আনাকা করবেন। হাজী সাহেব হজ্জের পবিত্র স্মৃতি বুকে ধারণ করে অবশিষ্ট জীবন একজন পরিশুদ্ধ মুসলমানের গুণাবলীসহ কাটাবার চেষ্টা করবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কাওয়াইদুল ফিক্হ, সাইয়্যেদ মুফ্তী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান (র)।
২. আখবারে মক্কা, আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ 'ইব্ন আহমাদ আযরুকী।
৩. আখ্বারে মক্কা, পৃ. ৬৭-৬৮।
৪. বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।
৫. আরকানে আরবা'আ : মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ৩৯৯-৪০৪।
৬. তিরমিযী, ইব্ন আব্বাস সূত্রে।
৭. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন।
৮. বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।
৯. মিশকাত।
১০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২২৬।
১১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ. ২২৬।
১২. পার্শ্বটিকা, হিদায়া।
১৩. আহ্কামুল হাজ্জ ওয়াল উমরা।
১৪. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।
১৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ. ২২১।
১৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত শরীফ, পৃ. ২২২।
১৯. ফাযাইলে হজ্জ, মাওলানা যাকারিয়া (র) আরকানে আরবা'আ।

২০. ফাযাইলে হজ্জ, মাওলানা যাকারিয়া (র) আরকানে আরবা'আ।
২১. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১।
২২. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড।
২৩. তাবারানী।
২৪. মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ।
২৫. মিশকাত শরীফ (বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩।
২৬. মারাকিল ফালাহ্, পৃ. ৫৯৯।
১৭. মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ।
২৮. আহ্কামুল হাজ্জ ওয়াল উমরা।
২৯. বুখারী ও মুসলিম।
৩০. যুবদাতুল মান্সিক।
৩১. মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ।
৩২. প্রাগুক্ত।
৩৩. আহ্কামুল হাজ্জ ওয়াল উমরা।
৩৪. তিরমিযী, পৃ. ১০২।
৩৫. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হজ্জ (ব্যাখ্যা), পৃ. ১৪২।
৩৬. বুখারী শরীফ।
৩৭. বাজলুল মাজহুদ।
৩৮. ফাতহুল মুলহিম, শারহে মুসলিম।
৩৯. মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ।
৪০. মিশকাত (বঙ্গানুবাদ), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২।
৪১. মা'আরিফুল কুরআন।
৪২. মিশকাত।
৪৩. বুখারী শরীফ।
৪৪. মিশকাত (বঙ্গানুবাদ), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪।
৪৫. মিশকাত, পৃ. ২৪০।
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।
৪৭. জায়ফুল কুলূব ইলা দীয়ারে রাসূল।
৪৮. বুখারী শরীফ।
৪৯. মুসলিম শরীফ, পৃ. ৪৪৮।
৫০. ফাতহুল মুলহিম, শারহে মুসলিম।

নবম অধ্যায়

পারিবারিক জীবন

সূচনা

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, পিতামাতা, ভাইবোন প্রভৃতি একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংক্ষিপ্ত মানব পরিমণ্ডলকে পরিবার বলে। সমাজ জীবনের প্রথম ভিত্তি ও বুনিয়াদ হলো পরিবার। মানব জীবনের যাত্রা থেকেই এই পরিবার সূত্রের শুভ সূচনা। আদি পিতা হযরত আদম (আ) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ)-এর মাধ্যমেই এর প্রথম বিকাশ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَيَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۔

হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু এই গাছের কাছেও যেও না। তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯)

এতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মানবজীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল পারিবারিক সূত্রের পথ ধরেই। যে পরিবারের প্রথম বিন্যাস ছিল স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে। তারপর তা ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক আদম (আ)-এর পরিবার থেকে উৎসারিত হয়েছে অগণন বনূ আদমের বিন্যস্ত সংসার। তাই প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়, পরিবারই সমাজ জীবনের ভিত্তি প্রস্তর। পারিবারিক পবিত্রতা ও সুস্থতার উপরই নির্ভর করে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বময় মানব জাতির পবিত্রতা ও সুস্থতা।

মানব বংশের সম্প্রসারণ মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ

পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টি এক আদম (আ) থেকে। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۔

হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়েছেন; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা

কর এবং সতর্ক থাক জাতি বন্ধন সম্পর্কে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১)

এই আয়াতটিতে মানব বংশে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আয়াতটিতে তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে : ১. পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সৃষ্টি এক আদম (আ) থেকে; ২. হযরত হাওয়া (আ)-কেও হযরত আদম (আ) থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে (তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে) এবং ৩. তারপর এই আদম ও হাওয়া থেকেই পৃথিবীর সকল নর-নারীর সৃষ্টি।[১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۔

হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি। বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, আজকের বিশ্বময় সম্প্রসারিত আগণন মানব প্রজন্ম, অভিনব আবিষ্কার, রহস্যময় শত শিল্পে সজ্জিত, বলিষ্ঠ সমাজ বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত এই সৃষ্টি সৌন্দর্য দয়াময় প্রভুর এক অপার অনুগ্রহ। তিনি দয়াপরাবশ হয়ে হযরত আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন এই বিশাল মানব সংসার। এ তাঁর অসীম কুদ্‌রতের বিন্দুবিকাশ। তারপর এক পিতা ও এক মাতার রেহেম সূত্রে গেঁথে দিয়ে সকল মানুষকে করেছেন পরস্পরে অনুগ্রহশীল।

বিয়ে-শাদী : পরিচিতি ও তাৎপর্য

আরবী 'নিকাহ্' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিয়ে-শাদী, বিবাহ। আভিধানিক অর্থ দলিত করা, সংযুক্ত করা। ইসলামী পরিভাষায় ইচ্ছাকৃতভাবে একজন নারীর সারা শরীরদ্বারা আস্বাদিত হওয়ার 'আক্‌দ'-কে বিয়ে-শাদী বলা হয়।[২]

বিয়ে সংঘটিত হয় ঈজাব ও কবূলদ্বারা। এ দু'টি বিবাহের রুকন এবং উভয়টি ক্রিয়াপদ হতে হবে এবং উভয়টি অতীতকাল প্রকাশক হবে অথবা একটি অতীতকাল ও অপরটি ভবিষ্যতকাল হলেও চলবে। বিয়ে, বিয়ে দান, উপহার দান, মালিক বানানো ইত্যাদি শব্দদ্বারাও বিবাহ্ সংঘটিত হতে পারে। অনুরূপ বিবাহ্ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে শর্ত হলো দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষীর উপস্থিতিতে আক্‌দ সংঘটিত হতে হবে। সাক্ষীদেরকে আযাদ, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলমান হতে হবে।[৩]

পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বেঁধে দিয়েছেন দয়া ও মায়ার বাঁধনে। ইরশাদ হয়েছে :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۔

আর মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যেই তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও দয়া। (সূরা রূম, ৩০ : ২১)

এ আবাদ প্রক্রিয়া যেন অব্যাহত গতিতে বহমান থাকে সে ব্যবস্থাও করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানব প্রজন্মের অবিরাম আগমনধারা সুনিশ্চিত করার জন্যেই মানবের রক্তমাংসে দিয়েছেন কাম-ক্ষুধা। সেই কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত করার বৈধপন্থা নির্দেশ করে আহ্বান করেছেন সে পথে পরিতৃপ্ত হতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিয়ের প্রভূত ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

تَزَوَّجُوا الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ فَانِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ ـ

তোমরা প্রেমময়ী, অধিক সন্তানসম্ভবা নারীকে বিয়ে করবে। কারণ আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করবো।[৪]

মানুষের মধ্যে যে যৌনক্ষমতা রয়েছে এর সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়, বরং মানব বংশের বৃদ্ধিই এর লক্ষ্য। আর সে জন্যই সৃষ্টি হয়েছে নারীর। ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নারীকে গর্ভধারণের, সন্তান প্রসবের। আর মানুষ যেহেতু পশু নয় তাই উচ্ছৃংখলভাবে যত্রতত্র যৌনক্ষুধা নিবারণের অনুমতি দেওয়া হয়নি তাকে; বরং নিয়ম-নীতির আলোকে সুশৃঙ্গল পদ্ধতিতে সম্মানজনক পন্থায় কাম-চাহিদা পূরণ ও তা ফলপ্রদ করার পুণ্যময় রীতি প্রণয়ন করেছে শরী'আত। আর তারই নাম বিয়ে-শাদী। যার অবর্তমানে যেভাবে মানুষ-পশুতে ভেদাভেদ থাকে না, বিয়ের লক্ষ্য (সন্তান জন্ম দেওয়া) সাধিত না হলেও থাকে না মানব বংশের অস্তিত্ব। সুতরাং মানব জীবনের কল্যাণ ও স্থিতিশীলতার জন্যে বিয়ে এক গভীর তাৎপর্যময় সত্য।

বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত

সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, বিয়ে একজন সুস্থ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক ভারসাম্যতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার অন্যতম উপায় বিবাহ। এ কারণেই অনিন্দ্য সুখের বাসর জান্নাতে বসেও যখন হযরত আদম (আ) অতৃপ্তিতে ভুগছিলেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা মা হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করলেন তাঁর জীবন সঙ্গিনীরূপে। নর ও নারীর যুগল বাঁধনে শুরু হলো মানব জীবন। রক্তমাংসে সৃষ্ট এই মানুষের মধ্যে যে প্রভূত যৌনক্ষুধা জমে ওঠে বয়সের পরতে পরতে, তা একান্তই বাস্তব। সুতরাং ক্ষুধা যিনি দিয়েছেন সে ক্ষুধা নিবারণের পথও দেখাবেন তিনিই। আর তা হল বিয়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে দৃষ্টি আনত রাখতে ও গুপ্তাঙ্গের হিফাযতে অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌনক্ষুধাকে অবদমিত করে।[৫]

মানুষ যে খাবার গ্রহণ করে তা থেকে উৎপাদিত শক্তির নির্যাস হলো যৌনক্ষমতা। বিবাহের মাধ্যমে যা যথার্থ প্রবাহিত হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বিবাহ করার, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করার ক্ষমতা না রাখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে রোযা রেখে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করার আদেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনেও অনুরূপ আদেশ দিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামীন। ইরশাদ হয়েছে ;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ .

তোমাদের মধ্যে যেসব ছেলেদের স্ত্রী নেই এবং যেসব মেয়েদের স্বামী নেই তাদের এবং তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরকেও বিয়ে দিয়ে দাও! তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর, ২৪ : ৩২)

যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না তাদেরকে দিয়েছেন ধৈর্যধারণের বিকল্প উপদেশ। ইরশাদ হয়েছে :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ .

যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। (সূরা নূর, ২৪ : ৩৩)

সারকথা খানাপিনা যেভাবে মানব জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন, আহার-নিবাসের প্রয়োজনীয়তা যেভাবে যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে, একজন যৌবনদীপ্ত মানুষের সুস্থ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে বিয়ের প্রয়োজনীয়তাও তেমনই। আর এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে নির্দেশসূচক শব্দে উৎকীর্ণ করা হয়েছে বিবাহের আহবানকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে-শাদীর ফযীলতও অসামান্য। বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ .

যে ব্যক্তি পূতপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে চায়, সে যেন আযাদ নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়।[৬]

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ .

হযরত আবূ আইউব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : নবী-রাসূলগণের সুন্নাত চারটি—লজ্জাবোধ, সুগন্ধি ব্যবহার, মিস্ওয়াক করা এবং বিয়ে-শাদী করা।[৭]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সাহাবী হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কয়েকজন সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন সঙ্গিনীগণের খিদমতে এসে তাঁর ইবাদত

সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তা শুনে তাঁরা যেন একটু কম কম মনে করলেন। সাথে সাথেই তাঁরা বলে উঠলেন, কোথায় তিনি আর আমরা কোথায় ? তাঁর তো আগ-পর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের একজন বললেন, আমি কোন নারীকে বিয়ে করবো না। অন্যজন বললেন, আমি কখনো গোশত খাবো না। আরেকজন বললেন, আমি আর শয্যা গ্রহণ করে ঘুমাবো না। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : লোকদের কি হলো ! তারা এই এই বলে? অথচ আমি নামায আদায় করি, ঘুমাইও, রোযা রাখি আবার ইফ্তারও করি এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার দলভুক্ত নয়।[৮]

সারকথা হলো :

১. বিবাহের মাধ্যমে একজন মু'মিন বান্দা আল্লাহ্র সমীপে পবিত্র হয়ে ওঠার পথ পায়।

২. বিবাহ করা সকল রাসূলের সুন্নাত।

৩. বিয়ে করা নবীজী (সা)-এর আদর্শ।

এক কথায়, বিবাহের পবিত্র ছোঁয়ায় পরিচ্ছন্ন জীবন লাভ করে বিবাহিত মর্দে মু'মিন। নবীজীর আদর্শের রৌশনীতে আলোকিত হয়ে ওঠে তার কর্মময় জীবন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ . .

সাহাবী হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন তো সে দীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে।[৯]

মানবিক প্রাকৃতিক চাহিদার কারণেই মানুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অথচ শরী'আত এটাকে পুরো দীনের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ ও পবিত্রতা নির্ভর করে এর উপর। কেননা সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে অবশ্য কাম্য যে মানসিক ও চারিত্রিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন, তার অধিকাংশটাই উৎসারিত হয় বৈধ যৌনমিলনের মাধ্যমে, যার ভিত্তি হলো শুধুমাত্র বিবাহ।

যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

জীবন ও যৌনতার অকাট্য বাস্তবতাকে ইসলাম অকপটে স্বীকার করে। তবে পাশবিক বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেয় না। বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে তুলে আনার মহান লক্ষ্যেই হয়েছিল আমাদের প্রিয় নবী (সা)-এর আবির্ভাব। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন, চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র সকল ক্ষেত্রেই তিনি অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন। যে যৌনক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব বংশের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ, সে ক্ষমতা যেন যথার্থ স্থানে প্রবাহিত হয় অধিকন্তু সে তাড়নায় যেন মানুষ উন্মাদনার শিকার না হয়; সে জন্যই বিবাহ প্রথার প্রতি এতটা জোর দিয়েছে ইসলাম। শুধু তাই নয়, যেসব কারণে যৌনস্খলনের সৃষ্টি হয়

সেসবেরও প্রতিবিধান করেছে অত্যন্ত কঠোরভাবে। এক কথায় ইসলাম যৌন চাহিদা পূরণের বৈধ আয়োজনকে করেছে একান্ত সহজ। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন :

إنَّ أعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أيْسَرُهُ مُؤْنَةً .

যে বিবাহে খরচ কম ও সহজ, সে বিবাহই অধিক বরকতপূর্ণ।[১০]

যুবক সম্প্রদায়কে সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করার আহ্বান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'এতে করে দৃষ্টি আনত থাকবে আর গুপ্তাঙ্গ থাকবে পবিত্র। যে যৌন ক্ষমতার যথার্থ প্রবাহের উপর নির্ভরশীল মানব অস্তিত্ব ও তার পবিত্রতা, সে যৌনতার ব্যাপারে স্খলনের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইসলাম। লোভাতুর দৃষ্টি ও অবাধ মেলামেশা যেহেতু যৌনাপরাধের মূল উৎস, তাই এগুলো ইসলাম পরিষ্কারভাবে নিষেধ করে দিয়েছে।

সুশৃঙ্খল ও সুনির্ধারিত পথে যৌনকামনা পূরণের মাধ্যমে মানব বংশ বৃদ্ধির কল্যাণময় বিষয়ে অংশ নেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

ثَلٰثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্র কর্তব্য : ১. আযাদী চুক্তিবদ্ধ গোলাম—যে তার রক্তমূল্য আদায় করতে চায়; ২. পবিত্রতার মানসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি; এবং ৩. আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ।[১১]

সারকথা, ইসলাম মানুষের যৌনক্ষমতা ও তার কামনাকে স্বীকার করে। তবে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে পোষণ করে স্বচ্ছ, পবিত্র ও সুশৃঙ্খল ধারণা। ইসলাম বিশ্বাস করে, মানুষ সকল সৃষ্টির সেরা। তাই তার যৌন ক্ষুধা নিবারণ পদ্ধতি ও যৌন সম্পর্ক সকল কিছুই হবে অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা। যে পথে যৌন কামনাও পূরণ হবে আবার সভ্যতা ভূলুণ্ঠিত হবে না।

পর্দার গুরুত্ব ও উপকারিতা

পর্দা মুসলিম নারীর সৌন্দর্য। নারীর মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ পর্দা। 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশ্ত' ঘোষণার মাধ্যমে নারীকে মহিমান্বিত করেছে যে ইসলাম, নারীর মহামহিম মর্যাদা রক্ষায় পর্দার অপরিহার্যতাকেও অনিবার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে সেই ইসলামই।

হযরত মাওলানা থানবী (র) পর্দাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :

১. সর্বনিম্ন পর্দা—মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি ব্যতীত নারীর সমুদয় দেহ পর্দাবৃত রাখা। ভিন্ন মতে টাখ্নুর গিরা পর্যন্ত পায়ের পাতা ব্যতীত গোটা দেহ আবৃত রাখা ফরয।

২. মাধ্যমিক স্তর—মুখমণ্ডল, হাত এবং পা সহ সবকিছুই বোরকাদ্বারা আবৃত রাখা।

৩. মহিলার শরীর পর্দায় আবৃত করার সাথে সাথে তার পরিধেয় বস্ত্রও আবৃত রাখা। এটা হলো পর্দার সর্বোচ্চ স্তর।

পর্দার এ স্তরগুলোও কুরআন ও হাদীসদ্বারা প্রমাণিত। প্রথম স্তরের পর্দার আবশ্যকতা সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَو اِخْوَاتِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٠

মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড়দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র সমীপে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর, ২৪ : ৩১)

مَا ظَهَرَ مِنْهَا -এর মর্ম হচ্ছে, মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত। ফিকহ্ বিজ্ঞান কিয়াস করে 'পা'-কেও এই দুই অঙ্গের মধ্যে শামিল করেছেন। অর্থাৎ কোন মহিলার জন্যেই মুখমণ্ডল, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত এবং উভয় পা ব্যতীত কোন অঙ্গ গায়রে মাহরামের (যাদের সাথে বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম নয়) সামনে খোলা বৈধ নয়। যুবতী ও বৃদ্ধা সকলেই এই হুকুমের মধ্যে শামিল। চিকিৎসা বা এই জাতীয় শরী'আত সমর্থিত ওযর ছাড়া কারও সামনেই সতর খোলা জায়িয নেই।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এখানে مَا اَظْهَرْنَ (যা তারা প্রকাশ করে) বলা হয়নি, বরং مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'যা তাদের থেকে প্রকাশিত হয়ে যায়' বলা হয়েছে অর্থাৎ কর্মব্যস্ততার কারণে যদি কোন মহিলার উপরোক্ত অঙ্গগুলো থেকে কাপড় সরে যায়, তাহলে এতে কোন গুনাহ্ নেই। সুতরাং এই অনুমতির অর্থ যে এ কথা নয়, এসব অঙ্গ প্রদর্শনী করে বেড়াবে—এটা সহজেই অনুমেয়।[১২]

রাসূল কারীম (সা) ইরশাদ করেন :

يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنْ يَّصْلُحَ اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ ٠

হে আসমা ! কোন মহিলা বালিগ হলে তখন তার এই এই অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ দেখা জায়িয নেই।[১৩]

দ্বিতীয় স্তরের পর্দা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ۔

তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। (সূরা আহ্যাব, ৩৩ : ৫৯)

جَلاَبِيْبُ - جِلْبَابُ -এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, এই চাদর ওড়নার উপর পরিধান করা হয়। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, আমি হযরত উবায়দা সালমানী (র)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং 'জিলবাব'-এর আকার-আকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মস্তকের উপরদিক থেকে চাদর টেনে মুখমণ্ডলের উপর ঝুলিয়ে দিলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং শুধু চোখ খোলা রেখে اِدْنَاءُ এর ব্যাখ্যা বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন।

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয়, নারীগণ প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সারা শরীর আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপর দিক থেকে ঝুলিয়ে মুখমণ্ডলও আবৃত করে ফেলবে। প্রচলিত বোরখাও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।[১৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

تُرْخِي الْمَرْأَةُ الْاِزَارَ شِبْرًا فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِذًا تَكْشِفُ اَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَ زِرَاعًا ۔

মহিলারা তাদের পায়ের ইযার তথা চাদর (পায়ের নালার) এক বিঘত নিচে ঝুলিয়ে পরবে। পরে উম্মে সালামা (রা) বললেন, তাহলে তো তাদের পা অনাবৃত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, তাহলে একহাত ঝুলিয়ে পরবে।

দ্বিতীয় স্তরের পর্দা সম্পর্কে وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রকাশ না করে) আয়াতটিও আলিমগণ পেশ করে থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থ মহিলাদের গায়ের কাপড় ও জিলবাব তথা বড় চাদর। অর্থাৎ এরদ্বারা সেই সব কাপড়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলো শরীরের সাধারণ পোশাকের উপর পর্দার জন্যে অতিরিক্তরূপে ব্যবহার করা হয়।[১৫]

তৃতীয় স্তরের পর্দা সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ۔

এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না। (সূরা আহ্যাব, ৩৩ : ৩৩)

বক্ষ্যমাণ আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, আল্লাহ্র দরবারে নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াটাই কাম্য। গৃহকর্ম সম্পাদনের জন্যেই তাদের সৃষ্টি। এ নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকবে। মূলত শরী'আতের কাম্য প্রকৃত পর্দা হলো গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা। শরী'আত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া তাদের জন্য হারাম।[১৬]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ۔

তোমরা তার (অন্যের) পত্নীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। (সূরা আহ্যাব, ৩৩ : ৫৩)

এ জাতীয় পর্দা সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে :

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ اِذْ اَقْبَلَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَا يَبْصُرُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَعَمْيَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تَبْصُرَانِهِ ۔

হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি ও মায়মূনা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে ছিলাম। এমতাবস্থায় (দৃষ্টিহীন সাহাবী) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন : তোমরা পর্দার অন্তরালে চলে যাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইনি কি দৃষ্টিহীন নন ? ইতি তো আমাদেরকে দেখছেন না। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা কি তাকে দেখছো না ?[১৭]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে :

اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ۔

নারী গোপনযোগ্য। যখন সে ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে তাকাতে থাকে।[১৮]

হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য, পর্দার ভিতর থাকাটিই নারীর জন্যে শোভনীয়। যদি কোন নারী বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান পুরুষের মনের মধ্যে প্রলোভন সৃষ্টি করে যেন সে নারীর রূপ-লাবণ্যের প্রতি কু-দৃষ্টিতে তাকায় এবং তার দেহ সৌন্দর্য ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে উপভোগ করে।

ফিকহের দৃষ্টিতে ফিতনার আশংকা থাকলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারের পর্দা ওয়াজিব। ফিতনার আশংকা না থাকলে ওয়াজিব নয়। কিন্তু কোথায় ফিতনার আশংকা আছে আর কোথায় নেই তা আল্লাহ্ তা'আলাই বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔

বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্যে অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বর্হিবাস খোলে, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর, ২৪ : ৬০)

অর্থাৎ যেসব নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে তারাই এই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়। তারা যদি তাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপরের চাদর খুলে ফেলে, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু যুবতী কিংবা মধ্যবয়সী নারীরা এমনটি করতে পারবে না। কারণ, তাদের ক্ষেত্রে ফিতনার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।[১৯]

কুরআন-হাদীসের আলোকে উপরিউক্ত পর্দা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান থেকে অনুমান করা যায় ইসলামে পর্দার গুরুত্ব কতখানি। মূলত কোন পুরুষ যখন কোন নারীর প্রতি তাকায়, তার সৌন্দর্য অবলোকন করে এবং তার শরীরের কামোত্তেজক অঙ্গগুলো প্রত্যক্ষ করে, তখন সেই পুরুষের হৃদয়ে জ্বলে ওঠে কামনার প্রাকৃতিক শিখা। সে শিখার দহনে অবিরাম দগ্ধিভূত হতে থাকে সে। নিরাশায় ভাবতে থাকে কল্পনার স্বচ্ছ দর্পণে অঙ্কিত সেই নারীর দেহ সৌন্দর্য নিয়ে। কত ঘুম নষ্ট হয় সেই ভাবনার আঘাতে। কত রজনী কাটে বিনিদ্র কল্পনার জাল বুনতে বুনতে। কল্পনার সেই ছোট ছোট ঢেউ এক সময় বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের সৃষ্টি করে তার যৌবন দরিয়ায়। সে তরঙ্গে অনাথের মত হারিয়ে যায় সমাজ সভ্যতা নামের সকল বেড়ি-বন্ধন। স্বপ্নের নীল আকাশে সে তখন উড়তে থাকে কল্পনার পাখায় গা এলিয়ে বিলাসী বিহঙ্গের মত। তার স্বপ্নের নারীকে একান্তে পাবার ক্ষীপ্র বাসনায় ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হয়ে ওঠে সে। তারপর যা ঘটে তা আমরা নিয়মিত প্রত্যক্ষ করি চোখের সামনে। অথচ ভেবে দেখি না এর উৎসটা কোথায়।

শরী'আত সেই উৎসটাই সমূলে উপড়ে ফেলতে চায়। যেই কামময় দেহদর্শন শত অনিষ্টের জননী, শরী'আত সেই দেহ সৌন্দর্যকেই ঢেকে রাখতে হুকুম করেছে। কঠোর নির্দেশ দিয়েছে, শরী'আত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া নারী ঘরের বাইরে যেতেই পারবে না। প্রযোজনে বের হলে বের হবে দবিজ পর্দার আড়াল ধরে, যেন তার উপস্থিতি কোন পুরুষের কামচেতনায় অযথা ঝড় না তোলে। বলা বাহুল্য, নারীর সতীত্ব, সম্ভ্রম ও নাজুক মর্যাদার সুরক্ষায় পর্দা বিকল্প আশ্রয়। এর গুরুত্ব বাস্তবসিদ্ধ ও প্রশ্নাতীত। এর লংঘন শরী'আত বিরোধী ও সামাজিক মর্যাদার পরিপন্থী।

পর্দার উপকারিতা অনেক। যে সমাজের নারীরা পর্দায় থাকে সে সমাজ আশা করতে পারে একটি নিষ্কলঙ্ক পবিত্র বিধৌত আলোকিত মা জাতির। যে জাতি সমাজকে উপহার দিবে একটি পরিচ্ছন্ন আলোকময় নতুন প্রজন্ম। যাদের পরশে সোনা হয়ে উঠবে সমাজ, সভ্যতা ও দেশ। গোলাপ বিলায় মদির সুরভি, গোবর ছড়ায় ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। এতো বাস্তবতা। সভ্য সতী নারী যে সমাজে নেই, সভ্য প্রজন্ম সে সমাজ পাবে কোথায়? তাছাড়া সভ্য প্রজন্ম ছাড়া কি কোন সমাজ সভ্য হতে পারে?

বিয়ে না করার অপকারিতা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে না করার অপকারিতা প্রচুর। প্রথমেই যাদের সামর্থ্য আছে, বিয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিয়ে করার আদেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : বিবাহ রাসূলগণের সুন্নাত।

হযরত মাওলানা থানভী (র) লিখেছেন, 'বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী।' (আহকামুল ইসলাম আকল কী নযর মেঁ, ৩য় খণ্ড)। সুতরাং প্রয়োজন সত্ত্বেও বিবাহ না করাটা স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর।

কারো কারো পক্ষে যৌন তাড়নাকে রোযা কিংবা অন্য কোন সাধনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তখন চারিত্রিক স্খলন ঘটতে পারে।

ব্যভিচার : কুফল ও বিধান

ব্যভিচার ধর্মীয়, সামাজিক ও আদর্শিক সকল মাপকাঠিতেই একটি জঘন্য অপরাধ। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই সকল ধর্ম ও সকল দেশেই এটি অন্যায় বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে। ইসলাম এ অপরাধকে সর্বাধিক ঘৃণিত বিবেচনা করে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, নারীর সতীত্বের হিফাযত ও খিয়ানতের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত প্রজন্মের পবিত্রতা। নারীর গর্ভেই জন্ম নেয় রাজা-রাণী, গবেষক-পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে যুগ শ্রেষ্ঠ সকল মনীষী। অনাগত প্রজন্ম যেন একটি সুরক্ষিত পরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে সে জন্যই বিয়ের ব্যবস্থা। এতে সুনির্ধারিত পিতামাতার শাসন-স্নেহে সন্তান মানুষ হওয়ার সুযোগ লাভ করবে; মানব বংশের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্যে এ এক কুদরতি ব্যবস্থাপনা।

পক্ষান্তরে, ব্যভিচার নারীকে মর্যাদার আসন থেকে পতিত করে। বিয়ে বহির্ভূত সন্তানরা পৃথিবীতে পা রাখে পিতৃপরিচয়হীন ঘৃণার পাত্র হয়ে। ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই এর কঠিন শাস্তি বিধান করেছে ইসলাম। এ অপরাধ কাজটি যেমন জঘন্য, শাস্তিও ঠিক তেমন কঠোর। ব্যভিচারী নারী-পুরুষের একশ'টি বেত্রাঘাত, অবস্থাভেদে পাথর মেরে প্রাণনাশের শাস্তির বিধান করেছে ইসলামী শরী'আত। এর মূল উদ্দেশ্য হল, পাপের উৎসমূল চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া। ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত আযাদ ব্যক্তি হয়, তাহলে তার শাস্তি বিধান সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۔

ব্যভিচারিনী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়—যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। (সূরা নূর, ২৪ : ২)

বিবাহিত নারী-পুরুষ যদি ব্যভিচার করে তাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাত করে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।[২০]

অবশ্য এই শাস্তি প্রয়োগ হওয়ার জন্য, উপযুক্ত সাক্ষী অথবা অপরাধীর স্বীকারোক্তিমূলক স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যাওয়া শর্ত। সাক্ষী কমপক্ষে চারজন হতে হবে। স্পষ্টভাষায় ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। কোথায় কখন কার সাথে কীভাবে ব্যভিচার হতে দেখেছে তা পরিষ্কার করে বলতে হবে। 'সুরমাদানীর কাঠি সুরমাদানীর মধ্যে যেভাবে প্রবিষ্ট করে সেভাবে প্রবিষ্ট করতে দেখেছি'

এই জাতীয় স্পষ্ট বক্তব্য দিতে হবে সকল সাক্ষীকে। অনুরূপ স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রেও চারবার স্পষ্টভাষায় অপরাধের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি দিতে হবে। বিচারক এ ক্ষেত্রে বরং এইভাবে টলাতে চেষ্টা করবেন, 'তুমি হয় তো ব্যভিচার করনি। চুমু খেয়েছ, ধরেছ ইত্যাদি।' তাতেও যদি না দমে, বরং নিজের অপরাধ অকপটে স্বীকার করে, তবেই তাকে উপরোক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬)

এই বিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া খোলা ময়দানে নারী হলে আবক্ষ গর্ত করে আর পুরুষ হলে এভাবেই মাটিতে ফেলে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে। প্রথমে সাক্ষীদেরকে পাথর মারতে বলা হবে। তারা অস্বীকার করলে পুরো শাস্তিই রদ বলে বিবেচিত হবে। সাক্ষীর পর বিচারক, তারপর অন্যান্য মানুষ পাথর মারবে।

উল্লেখ্য, স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যদানের পর শাস্তি কার্যকর হওয়ার পূর্বে যদি বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। শাস্তিটি অত্যন্ত কঠিন বিধায়ই তার বাস্তবায়নে এতটা সতর্কতা ও শর্তসাপেক্ষে তা অবলম্বন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার জন্যে বিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আরও কিছু গুণ থাকাও আবশ্যক। যেমন : বিবেকবান হওয়া, আযাদ হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলমান হওয়া, অন্যের বিবাহিত স্ত্রীর সাথে যৌনমিলনে আস্বাদিত হওয়া।[২১]

ইসলামী হুকুমত এসব শাস্তি কার্যকর করবে; কোন ব্যক্তি নয়। এসব শর্ত এ জন্যে আরোপ করা হয়েছে, এগুলো সবই আল্লাহ্র বিশেষ নিয়ামত। এগুলো এমন মহান বৈশিষ্ট্য যার পরশে একটি মানুষ এমনিতেই সুস্থ হয়ে যায়। অধিকন্তু যে যৌন শৃংখলার সে শিকার তা চরিতার্থ করার উপযুক্ত পাত্রও তার রয়েছে। এরপরও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ্র আইনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা ও বিদ্রোহের শামিল। তাই এর শাস্তিও বিধান করা হয়েছে অত্যন্ত কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক।[২২]

বিয়ে সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম

বিয়ের হুকুম নির্ভর করে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থার উপর। তাই বিয়ের হুকুম সকলের ক্ষেত্রে একই রকম নয়; বরং বিয়ে-শাদী ব্যক্তিভেদে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ্ বলে বিবেচিত।

ফরয : বিয়ে করা ফরয হয় চার শর্তে—১. যদি কেউ বিয়ে না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে বলে নিশ্চিত আশংকা থাকে, ২. ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্যে রোযা রাখতেও সে অক্ষম, ৩. বাঁদী গ্রহণেরও সুযোগ নেই এবং ৪. সে বৈধ পন্থায় স্ত্রীর মোহর ও ভরণ-পোষণ করতেও সক্ষম, এমন ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা ফরয।

ওয়াজিব : বিয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে, ব্যভিচারে আক্রান্ত হওয়ারও ভয় আছে কিন্তু ব্যভিচারে পড়েই যাবে এমন বিশ্বাস নেই, অধিকন্তু হালাল অর্থে স্ত্রীর মোহর ও ভরণ-পোষণ করতে সক্ষম, এমন ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা ওয়াজিব।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা : বিয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে, তবে এ কারণে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা নেই এমন ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

হারাম : যদি ইয়াকীন ও বদ্ধমূল বিশ্বাস থাকে যে, বিয়ে করলে তাকে অন্যায়ভাবে অন্যের প্রতি যুলুম ও নিপীড়ন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিবাহ করা হারাম। কেননা বিবাহের উদ্দেশ্য হলো রিপুকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও পুণ্য অর্জন করা।

মাকরূহ : যদি বিবাহের কারণে অন্যের প্রতি যুলুম অত্যাচার করবে বলে ভয় হয় (ইয়াকীনের পর্যায়ে না হয়) তাহলে বিয়ে করা মাকরূহে তাহ্‌রীমী।

মুবাহ্ : বিয়ের প্রতি ঝোঁক আছে, তবে না করলে ব্যভিচারী হয়ে পড়বে এমন আশংকা নেই, এটাই মুবাহ। এ ক্ষেত্রে যদি নিজেকে পাপমুক্ত রাখা কিংবা মানব বংশ বৃদ্ধির নিয়্যাত করে, তাহলে বিয়ে করা সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে। এখানে মুবাহ ও সুন্নাতের পার্থক্য নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।[২৩]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন বিয়ে-শাদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দাম্পত্য জীবনের পরিধি যেমন খুবই ব্যাপক, এর সমস্যাও অতি বিস্তৃত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি স্পষ্ট বাহ্যিক-সামাজিক দৃষ্টিতে প্রকট কোন ব্যবধান ও অসামঞ্জস্য থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই তা আর কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় না। যে কারণে, বিয়ের পূর্বেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় এসব বিষয় বিবেচনা করা উচিত। হাদীস শরীফে আছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِىْ اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا ۔

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল, আমি একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : মেয়েটিকে দেখে নাও। আনসারীদের চোখে আবার সমস্যা থাকে।[২৪]

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাত্রী নির্বাচনের পূর্বে তাকে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, যেন পরবর্তীতে সমস্যা না হয়। অধিকন্তু পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ে লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয় সে কথাও অন্য হাদীসে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ ۔

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : সাধারণত চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। তবে তোমরা ধর্মপরায়ণতাকেই অগ্রাধিকার দিবে।[২৫]

এই হাদীসে নারীর সম্পদ, বংশ গৌরব, রূপ সৌন্দর্য ও ধর্মানুরাগকে এমন বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে যার আলোকে তাকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তবে ধর্মানুরাগই সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়।

যাদের সাথে বিবাহ বৈধ ও যাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয়

শরী'আত নির্ধারিত কিছু মহিলা ছাড়া যেহেতু সকল নারীর সাথেই বিবাহ বৈধ, তাই

আমরা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয় তাদের বিবরণ এখানে পেশ করছি। সে আলোকেই প্রতিভাত হয়ে যাবে কাদের সাথে বিবাহ বৈধ। যাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয় তাদের সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুপু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনয়ী, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে মিলিত হয়েছ তার পূর্বস্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাক তাতে কোন অপরাধ নেই। এবং তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নিকে একত্র করা। পূর্বে যা হয়েছে তাতো হয়েই গেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (সূরা নিসা, ৪ : ২৩)

এছাড়াও সধবা মহিলাকে বিবাহ করাও হারাম। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ .

এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ। (সূরা নিসা ৪ : ২৪)

উল্লেখ্য, এখানে যে চৌদ্দ প্রকার নারীর সাথে বিবাহ অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি বিধান ও প্রকৃতি সর্বাঙ্গীনভাবে এক নয়। কোনটি স্থায়ীভাবে আজীবনের জন্যে হারাম, আবার কোনটি হারাম সাময়িক সময়ের জন্যে। চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম প্রমাণিত হওয়ার কারণ তিনটি। আত্মীয়তা, বিবাহ বন্ধন ও দুধপান।

আত্মীয়তার কারণে বিবাহ হারাম :

এর স্তর তিনটি :

১. ব্যক্তির উসূল ও ফুরূ' : উসূল অর্থ মূল। অর্থাৎ মা, মায়ের মা, নানীর মা; অনুরূপ দাদী, পিতার দাদী, দাদীর দাদী থেকে তদূর্ধ মহিলাগণ। আর ফুরূ' বলতে নিজের কন্যা, কন্যার কন্যা, নিজের ছেলের কন্যাসমূহ ও তদনিম্ন মহিলাগণ।

২. বাবা-মার ফুরূ' : অর্থাৎ বোন। নিজের আপন বোন কিংবা শুধু বাপের ঔরসজাত অথবা শুধু মায়ের গর্ভজাত বোন। অনুরূপ ভ্রাতৃকন্যা ও তদনিম্ন কন্যাগণ।

৩. দাদা-দাদী ও নানা-নানীর ফুরূ' : খালা-ফুপু ইত্যাদি।

বিবাহ বন্ধনের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম :

১. যে স্ত্রীর সাথে মিলন হয়েছে তার কন্যা। তবে যে নারীর সাথে শুধু বিবাহ হয়েছে মিলন হয়নি, এমন নারীর কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ।

২. স্ত্রীর উসূল : অর্থাৎ শাশুড়ি, শাশুড়ির মা ইত্যাদি।

৩. পিতা যে নারীর সাথে মিলিত হয়েছেন।

রাযা'আত বা দুগ্ধপানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সূত্রও এ ক্ষেত্রে জন্মসূত্রের মতই। জন্মসূত্রে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, এই সূত্রেও তাদের সাথে বিবাহ হারাম। যেমন : দুধবোন, দুধমা, দুধকন্যার সাথে দুগ্ধপিতা ইত্যাদি।

পাঁচটি কারণে সাময়িকভাবে বিবাহ হারাম বলে বিবেচিত হয়

১. একই সাথে দুই বোনকে বিবাহ করা হারাম। যদি প্রথমজন কোন কারণে ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে অবশ্য স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করাতে কোন নিষেধ নেই।

২. মালিকানা : নিজের দাসের সাথে কোন মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

৩. শিরক : অর্থাৎ মুশরিকের সাথে মুসলিমের বিবাহ অবৈধ।

৪. তিন তালাক : অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলে অন্যত্র বিবাহ সম্পাদনপূর্বক তালাকপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর সাথে পুনঃ বিবাহ হারাম।

৫. যে নারী অন্য কারও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ : এই বন্ধন থাকাকালীন অন্য কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ।

বলাবাহুল্য, স্থায়ী ও অস্থায়ী বিবাহ হারাম হওয়ার যেসব কারণ এখানে আলোচিত হয়েছে এসব কারণ নেই এমন যে কোন মহিলার সাথে বিবাহ বৈধ।[২৬]

অমুসলিমদের সাথে বিবাহ

বিবাহের ক্ষেত্রে অমুসলিমগণ দুইভাগে বিভক্ত। আহলে কিতাব এবং যারা আহলে কিতাব নয়। আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ 'আহলে কিতাব' হিসাবে গণ্য। যেমন ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান। কুরআন শরীফে এই দুই সম্প্রদায়কে 'আহলে কিতাব' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা, আন'আম, ৬ : ১৫৬)

মহান আল্লাহ্ মুসলিম পুরুষদেরকে কেবল 'আহলে কিতাব' নারী বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ .

এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৫)

কোন মুসলিম নারীর কোন 'আহলে কিতাব' পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। মুসলমানদের জন্য আহলে কিতাব নারী বিবাহ করা বৈধ হলেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তা অপসন্দনীয় বলে ফকীহ্গণ মত প্রকাশ করেছেন।

যারা আহলে কিতাব নয় তারা মুশরিক এবং কাফির—তা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক। এই পর্যায়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, অগ্নিউপাসক সকলেই এক পর্যায়ভুক্ত। কাদিয়ানীরা মুশরিক না হলেও মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্য অনুযায়ী কাফির। তাদের সাথে মুসলিম নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন আল্লাহ্ তা'আলা চিরতরে, সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۔

মুশরিক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করবে না। মুশরিক নারী তোমাদেরে মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তার চেয়ে উত্তম। মুশরিক পুরুষরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমরা (তোমাদের নারীদেরে) বিবাহ দিবে না। মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। (সূরা বাকারা, ২ : ২২১)

কুফূ (পাত্র-পাত্রীদের সমতা)

ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে এমন দুইজন নারী-পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হোক যাদের দাম্পত্য জীবনে প্রেম-ভালবাসার পরিবেশ গড়ে উঠার আশা করা যায়। এমন দু'জন নারী-পুরুষকে কুফূ (সমকক্ষ) বলে যারা মুসলমান, বংশ মর্যাদায় সমান, স্বাধীন এবং পেশা, দীনদারী, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি পরস্পর সমপর্যায়ের। বিবাহের ব্যাপারে ইসলামী শরী'আত কুফূর প্রতি লক্ষ্য রাখা ভালো বিবেচনা করেছে, কিন্তু একে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ব সময়ই কুফূ বিবেচনার বিষয় হতে পারে, বিবাহের পরে এর বিবেচনা অনাবশ্যক।

বিবাহের রুকন্

বিবাহের রুকন দুইটি : ঈজাব (প্রস্তাব) ও কবূল (গ্রহণ)। বিবাহের পক্ষদ্বয়, নারী ও পুরুষের বা তাদের অভিভাবক অথবা প্রতিনিধিদের ঈজাব-কবূলের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। (কুদূরী, কিতাবুন নিকাহ্) ঈজাব অথবা কবূল যে কোন পক্ষ থেকে হতে পারে। ঈজাব-কবূল মৌখিক অথবা লিখিত আকারে হতে পারে। ঈজাব-কবূলের শব্দাবলী সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক হতে হবে। এই ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ অতীতকালের হতে হবে। যেমন প্রথম পক্ষ বলল, আমি নিজেকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য 'আমি কবূল করলাম।' উল্লেখ্য যে, বালিগ ও বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন নারী-পুরুষের স্বেচ্ছাসম্মতি ব্যতীত বিবাহ বৈধ হয় না।[২৭]

বিবাহের শর্তাবলী

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য পাত্র ও পাত্রীকে —

১. মুসলমান, বালিগ ও বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

২. তাদের স্বেচ্ছাসম্মতিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং ঈজাব-কবূল নিজ কানে শুনতে হবে। তবে অভিভাবক বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে তা নিজ কানে শোনা আবশ্যক নয়।

৩. বিবাহে অন্তত দুইজন বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম পুরুষ অথবা একজন বালিগ ও বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ এবং দুইজন বালিগা ও বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম নারীকে সাক্ষী থাকতে হবে।

বিবাহের শ্রেণীবিভাগ

শরী'আতের দৃষ্টিতে বিবাহ তিন প্রকার : ১. সহীহ্ বিবাহ, ২. ফাসিদ বিবাহ, ৩. বাতিল বিবাহ।

সহীহ্ বিবাহ : বিবাহের রুকন ও শর্তাবলী পূর্ণরূপে পালন করে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাকে সহীহ্ বিবাহ বলে। সহীহ্ বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য বিবাহের বিধানাবলীর অনুসরণ বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এবং পরস্পরের প্রতি যেসব আধিকার ও কর্তব্য বর্তায়, তাও পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ফাসিদ বিবাহ : বিবাহ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিবাহের রুকন ও শর্তাবলীর কোন একটি অপূর্ণ থাকলে উক্ত বিবাহ ফাসিদ বিবাহ হিসাবে গণ্য হয়। যেমন সাক্ষীহীন বিবাহ। ফাসিদ বিবাহের ত্রুটি সংশোধন করে নিলে তা সহীহ্ বিবাহে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন সাক্ষীহীন বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহ-পরবর্তীকালে সাক্ষী নিয়োগ করা হলে উক্ত বিবাহ সহীহ্ বিবাহে পরিণত হয়।

বাতিল বিবাহ : বিবাহ অনুষ্ঠানকালে বিবাহের এমন কোন শর্ত বাদ পড়লে যা পরে সংশোধনযোগ্য নয়, সেইরূপ বিবাহকে বাতিল বিবাহ বলে। যেমন দুই মাহ্‌রাম আত্মীয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহ, কোন নারীর স্বামী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাকে বিবাহ করা, তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে তাহ্‌লীল ব্যতীত পুনরায় বিবাহ করা ইত্যাদি বাতিল বিবাহের অন্তর্ভুক্ত। কোন বিবাহ বাতিল প্রমাণিত হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তৎক্ষণাৎ পৃথক হয়ে যাবে। বাতিল বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কোনরূপ অধিকার এবং শর্ত সৃষ্টি হয় না।

টেলিফোন, ট্যালেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বিবাহ

পাত্র-পাত্রী বিবাহ অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত না হয়ে নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এ অবস্থায় নিয়োগকর্তা প্রতিনিধিকে মৌখিকভাবে নিয়োগ করতে পারেন অথবা পত্র মাধ্যমেও নিয়োগ করতে পারেন। টেলিফোন, ট্যালেক্স, ফ্যাক্স হল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম। এগুলো সরাসরি মানুষের প্রতিনিধি হতে পারে না। অতএব উক্ত মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বিবাহ ফাসিদ বিবাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি পাত্র-পাত্রী তাদের পক্ষ থেকে কাউকে টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং ঐ প্রতিনিধি যদি সশরীরে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষীর সামনে বিবাহের কাজ সম্পাদন করে, তাহলে তা সহীহ্ বিবাহে পরিণত হবে।[২৮]

ছেলেমেয়েকে নাবালিগ অবস্থায় বিবাহ্ দেওয়ার প্রয়োজন হলেই ওলীর প্রয়োজন হয়। পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ নাবালিগের বিবাহের ক্ষেত্রে ওলী হবেন : ১. পিতা, ২. দাদা ও তদূর্ধগণ, ৩. সহোদর ভাই, ৪. বৈমাত্রেয় ভাই, ৫. আপন ভ্রাতুষ্পুত্র, ৬. সৎ ভ্রাতুষ্পুত্র, ৭. আপন চাচা, ৮. আপন চাচাতো ভাই, ৯. সৎ চাচাতো ভাই প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, প্রথম ওলীর অবর্তমানে দ্বিতীয়জন ওলী হতে পারেন। দূরতর ওলী নিকটতর ওলীর বর্তমানে নাবালিগাকে বিবাহ দিলে উক্ত বিবাহ নিকটতম ওলীর সম্মতির উপর নির্ভরশীল হবে। নাবালিগ পাত্র-পাত্রী বালিগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বিবাহ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তার

এই আইনগত ইখতিয়ারকে 'খিয়ারুল বুলূগ' বলে। তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত ইখ্তিয়ার বা অধিকার প্রয়োগদ্বারা সরাসরি বিবাহ বাতিল হয় না, বরং আদালতের নির্দেশেই বিবাহ বাতিল হয়।[২৯]

দেনমহর

বিবাহবন্ধন উপলক্ষে স্বামী বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীকে নগদ অর্থ, সোনা-রূপা বা স্থাবর সম্পত্তির আকারে যে মাল প্রদান করে, সেই মালকে মহর বলে। দেনমহর স্বামীর একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে পুরুষকে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন :

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ·

তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারীদেরকে তাদের মহর প্রদান কর। (সূরা নিসা, ৪ : ৪)

মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। মহানবী (সা) বলেন :

لاَ مَهْرَ دُوْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ·

দশ দিরহামের কম মহর হতে পারে না।[৩০]

মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণের সীমা নির্ধারিত নেই। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ·

তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না। (সূরা নিসা, ৪ : ২০)

মহর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা : ১. মহরে মুসাম্মা (নির্ধারিত), ২. মহরে মিসাল।

বিবাহ সম্পাদনকালে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মহরকে 'মহরে মুসাম্মা' বলে। বিবাহের সময় মহরের উল্লেখ না থাকলে অথবা মহর আদৌ নির্ধারণ করা না হয়ে থাকলে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর পিতৃকুলের অন্যান্য মহিলার মহরের পরিমাণ বিবেচনায় রেখে তার জন্য যে পরিমাণ মহর নির্ধারণ করা হয়, তাকে 'মহরে মিসাল' বলে।

পরিশোধের সময়সীমার দিক থেকে 'মহরে মুসাম্মা' দুইভাগে বিভক্ত : ১. মহরে মু'আজ্জাল (معجل) অর্থ বিবাহের সময় যে মহর নগদ আদায় করা হয় তাকে 'মহরে মু'আজ্জাল' বলে। ২. মহরে মু'য়াজ্জাল (موجل) অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা তাদের কোন একজনের মৃত্যুর কারণে যে মহর পরিশোধ তৎক্ষণাৎ বাধ্যতামূলক হয়, তাকে 'মহরে মু'য়াজ্জাল' বলে। মহর কখন পরিশোধযোগ্য হবে সে সম্পর্কে বিবাহকালে কিছু উল্লেখ না করা হলে সম্পূর্ণ মহর দাবি করামাত্র আদায়যোগ্য হবে।[৩১]

মহর না দেওয়ার শর্তে বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে শর্তটি বাতিল গণ্য হবে এবং মহরে মিসাল প্রদান অপরিহার্য হবে।

বিবাহ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী একত্রে নির্জনে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক সংঘটিত হলে এবং মহর পূর্বে নির্ধারিত হয়ে থাকলে স্ত্রী অর্ধেক মহর প্রাপ্য হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ٠

তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ তাদের মহর ধার্য করেছ, তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৭)

উপরোক্ত অবস্থায় মহর ধার্য হয়ে না থাকলে স্ত্রী মহর প্রাপ্য হবে না। বরং সে মুতয়া স্বরূপ পরিধেয় বস্ত্র পাবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ ٠

যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করেছ এবং তাদের জন্য মহর ধার্য করেছ, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। তোমরা তাদেরকে মাতা' (কিছু উপহার সামগ্রী) প্রদান করবে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৬)

এখানে 'নির্জনে মিলন' (খালওয়াতে সাহীহা) বলে স্বামী ও স্ত্রীর এমন স্থানে একত্র হওয়া বুঝায় যেখানে তাদের সহবাসে লিপ্ত হতে দৈহিক, প্রাকৃতিক ও আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান নেই।

মহর মূলত দেনা স্বরূপ, তা অনাদায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর এই অধিকার রহিত হয় না। সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিজের মহর উসূল করে নিতে পারে। এমনকি সে তা আদায় করার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিজ দখলে রাখতে পারে। মৃতের ওয়ারিসগণের উপর নিজ নিজ অংশ মুতাবিক দায় বর্তাবে।

বিবাহের মাসনূন তরীকা

ইসলামী আইনে বিবাহকার্য ও বিবাহ অনুষ্ঠান একটি পবিত্র ও ইবাদতের অনুষ্ঠান। বিবাহেচ্ছু পক্ষদ্বয় সম্মত হওয়ার পর প্রকাশ্য মজলিসে আক্দ অনুষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহানবী (সা) বলেন :

اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ ٠

তোমরা বিবাহের প্রচার করবে, বিবাহকার্য মসজিদে সম্পন্ন করবে।[৩২]

আক্দ অনুষ্ঠানের সময় একটি খুত্বা পাঠ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল বিবাহে খুত্বা পাঠ করা হয়েছে। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি খুতবা উল্লেখিত আছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে সামর্থ্য অনুযায়ী খুরমা বিতরণ সুন্নাত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাদী মুবারক

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মোট এগারজন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা 'উম্মুল মু'মিনীন' হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। চার-এর অধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যেই রাখা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা নবী কারীম (সা)-এর সহধর্মিণীগণের মর্যাদা ঘোষণা করে বলেন :

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ ٠

নবী মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। (সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ : ৬)

মহানবী (সা) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এসব বিবাহ করেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেন : আমি জিব্‌রাঈল (আ) কর্তৃক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আনীত ওহীর দ্বারা আদিষ্ট হয়েই সমস্ত বিবাহ করেছি এবং আমার কন্যাগণকে বিবাহ দিয়েছি।[৩৩]

হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম স্ত্রী এবং তিনিই প্রথম মহিলা মুসলমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন পঁচিশ বছর এবং হযরত খাদীজা (রা)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তখন মহানবী (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের মধ্যস্থতায় তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আবূ তালিব বিবাহের খুতবা পাঠ করেন। বিবাহের মহর নির্ধারিত হয় পাঁচ দিরহাম। খাদীজা (রা)-এর পক্ষ থেকে একটি গরু যবেহ্ করে ওলীমা (বিবাহভোজ)-এর ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চার কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয় দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় মারা যান। রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত খাদীজা (রা)-এর দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুখকর এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। দু'জনের মধ্যে পারিবারিক বিষয়ে কখনো সামান্য বিরোধ হয়েছে বলেও ইতিহাসে কোন নযীর নেই। তাঁর ইনতিকালের পরও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আজীবন তাঁকে স্মরণ করে আবেগাপ্লুত হতেন।

তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুর্দিনের সঙ্গী। নুবূওয়াত প্রাপ্তির পর ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি যে অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হন, সেই করুণ মুহূর্তগুলিতে হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন তাঁর আশ্রয়, সান্ত্বনা লাভের কেন্দ্র। তিনি তাঁর অঢেল সম্পদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাওয়াত প্রচারের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দেন। নুবূওয়াতের দশম বর্ষে অর্থাৎ হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা)—খাদীজা (রা)-এর ইন্‌তিকালের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুবই মর্মাহত অবস্থায় দিন কাটান। তাঁর কন্যাগণ ছিলেন ছোট। তাঁদের পরিচর্যা ও লালন-পালন তাঁর জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেহেতু সাওদা বিনৃত যাম'আ (রা)-কে বিবাহ করেন। তাঁর মহর ছিল ৪০০ দিরহাম।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)—নুবূওয়াতের দশম বর্ষে শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর মহর ছিল ৪০০ দিরহাম। মদীনায় হিজরতের পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গৃহে আগমন করেন। তখন তাঁর বয়স নয় বছরের কিছু বেশি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জ্ঞানের ধারক ও বাহক। যে সাতজন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। আজীবন তিনি হাদীসের শিক্ষাদানে রত থাকেন। তাঁর ঘরখানা একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)—নুবূওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তৃতীয় হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর কন্যা। তাঁরও মহর ছিল ৪০০ দিরহাম।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা)—তিনি অত্যন্ত দানশীলা হওয়ায় তাঁর উপাধি হয় 'উম্মুল মাসাকীন' (নিঃস্বদের মাতা)। তৃতীয় হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর মহর ছিল ৫০০ দিরহাম।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)—প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী আবূ সালামা (রা) ইন্‌তিকাল করলে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর চেয়েও উত্তম স্বামী কামনা করেন। আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবূল করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বামী হিসাবে লাভ করেন। চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মহরানা হিসাবে দশ দিরহাম মূল্যের মাল দান করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)—আবদুল মুত্তালিবের কন্যা উমায়মার কন্যা ছিলেন। পরমা সুন্দরী এই মহিলার প্রথম বিবাহ হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পালক পুত্র যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর সাথে। একজন মুক্তদাসের সাথে কুরাইশ বংশীয়া এই সম্ভ্রান্ত মহিলার বিবাহে দাম্পত্য জীবনে জটিলতার সৃষ্টি হয়। হযরত যায়দ (রা) ও যয়নবের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর মহর ছিল ৪০০ দিরহাম।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা)—আবূ সুফিয়ানের কন্যা, মূল নাম রামলা। স্বামী সহ তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে মুর্‌তাদ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্‌ন উমাইয়্যা আদ-দামরী (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে হাবশায় পাঠান এবং তাঁকে উকীল নিয়োগ করেন। হাবশারাজ নাজ্জাশী সকল মুসলমানকে একত্র করে বিবাহের খুত্‌বা দেন, ৪০০ দীনার মহর প্রদান করেন এবং বিবাহ ভোজের আয়োজন করেন। তিনি অতঃপর মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মিলিত হন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা)—মুস্‌তালিক গোত্রের নেতা আল-হারিসের কন্যা। ৫ম হিজরী শাওয়াল মাসে এই গোত্রের বিরুদ্ধে মহানবী (সা) যে যুদ্ধাভিযান চালান তাতে তিনি গোত্রের অন্যান্যদের সাথে বন্দী হন। আযাদ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর মহর ৪০০ দিরহাম প্রদান করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা)—তিনি ছিলেন ইয়াহূদী বনী নাযীর গোত্রপতি হুওয়াই ইব্‌ন আখ্‌তাবের কন্যা এবং হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর। ষষ্ঠ হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধে তাঁর স্বামী নিহত হয় এবং তিনি মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তাঁকে মুক্তিদান করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহ করেন এবং বন্দীত্ব মুক্তিই তাঁর মহর হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। যুদ্ধশেষে পনির ও খেজুর সহকারে বিবাহভোজের আয়োজন করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা)—সপ্তম হিজরীতে উমরাতুল কাযা পালনকালে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র মধ্যস্থতায় এবং ৫০০ দিরহাম মহর নির্ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-র খালা। ঐতিহাসিক ইব্‌ন সা'দের মতে তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশেষ স্ত্রী। অতঃপর তিনি আর কাউকে বিবাহ করেননি।

এছাড়া মিসর রাজ কর্তৃক উপঢৌকন স্বরূপ প্রদত্ত দাসী মারিয়া কিব্‌তিয়ার গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল ইব্‌রাহীম। যিনি শিশু বয়সেই ইন্‌তিকাল করেন।[৩৪]

হযরত ফাতিমা (রা)-এর শাদী মুবারক

হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয় কন্যা, কলিজার টুকরা। দ্বিতীয় হিজরীর যুলকাদায় হযরত আলী মুর্তাযা (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। মহানবী (সা) বলেন : ফাতিমাকে আলীর সাথে বিবাহ দিতে আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৫]

এই সময় তাঁর বয়স ছিল পনের। বিবাহের মহর ছিল ৪৮০ (মহান্তরে ৫০০) দিরহাম। বদর যুদ্ধে হযরত আলী (রা) যে লৌহবর্মটি পেয়েছিলেন তা বিক্রয় করে তিনি এই অর্থ সংগ্রহ করে মহানবী (সা)-এর হাতে তুলে দেন। তিনি তা থেকে কিছু অর্থ বিবাহের পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়ের জন্য হযরত আলী (রা)-কে ফেরত দেন। মসজিদে নববীতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত লোকদেরকে খেজুরদ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। মহানবী (সা) খুত্‌বা পড়ে বিবাহের আক্‌দ সম্পন্ন করেন। তিনি বিবাহের উপঢৌকন হিসাবে নবদম্পতিকে একটি খাট, দু'টি তোষক, একটি কম্বল, ইয়ামনী চাদর, একটি বালিশ, পানির মশক, একটি কলস ও একটি যাঁতা দান করেন। হযরত ফাতিমা (রা) উহুদ যুদ্ধের পর স্বামীগৃহে যান। তাঁদের দাম্পত্য জীবন পরিপূর্ণ সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হয়।[৩৬]

ওলীমা বা বিবাহ ভোজনের আয়োজন

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দাওয়াত দিয়ে পানাহার করানো সুন্নাত। তবে বাহুল্য ব্যয় অবশ্যই বর্জনীয় এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তা করতে হবে। ধারকর্জ করে বিবাহ ভোজের আয়োজন করা অন্যায় এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে উক্ত অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ। বিবাহ ভোজের আয়োজন করার জন্য কাউকে চাপ প্রয়োগ করা বা বাধ্য করা গুনাহের কাজ।

রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় বিবাহে ওলীমা অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি হযরত যয়নব (রা)-কে বিবাহ করে বক্‌রীর গোশ্‌ত ও রুটিদ্বারা মেহমানদের তৃপ্তি সহকারে আহার করান।[৩৭] হযরত সাফিয়া (রা)-র বিবাহে তিনি হায়স নামক এক প্রকার খাদ্য মেহমানদের সামনে পেশ করেন।[৩৮] তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা)-র বিবাহে বার্লিদ্বারা ওলীমা অনুষ্ঠান করেন।[৩৯] রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে বলেন, একটি বক্‌রী দিয়ে হলেও ওলীমা অনুষ্ঠান কর।

ওলীমা অনুষ্ঠানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে দাওয়াত দিতে হবে। কেবল বেছে বেছে ধনীদের দাওয়াত করা গর্হিত কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ۔

যে ওলীমা অনুষ্ঠানে কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদেরকে উপেক্ষা করা হয় সেই ওলীমা খাদ্য সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য।[৪০]

বিবাহ ভোজের দাওয়াত কবূল করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে ব্যক্তি দাওয়াত কবূল করা ত্যাগ করেছে, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করেছে।[৪১] তবে দাওয়াত না পেয়েও ভোজ অনুষ্ঠানে যোগদান করা গর্হিত কাজ। মহানবী (সা) বলেন :

مَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَّخَرَجَ مُغِيْرًا ۔

যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে ভোজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, সে চোররূপে প্রবেশ করে এবং লুণ্ঠনকারীরূপে প্রত্যাবর্তন করে।[৪২]

দাওয়াতী বাড়িতে শরী'আত বিরোধী কোন অনুষ্ঠান হতে দেখলে তা থেকে বিরত থাকার জন্য বলা উচিত। উপদেশে কর্ণপাত না করা হলে তথায় অবস্থান করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাসিক ব্যক্তির দাওয়াত কবূল করতে নিষেধ করেছেন।[৪৩]

বিবাহ্-শাদীতে প্রচলিত কুপ্রথা

বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপদেশমূলক ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা আবৃত্তি, গযল পরিবেশন ও আমোদ-স্ফূর্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানকালে ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে আনন্দ অনুষ্ঠান নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও পাপানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। হিন্দুদের দেখাদেখি স্ত্রীকে মহরানা প্রদানের পরিবর্তে পাত্রপক্ষ যৌতুকের নামে মোটা অঙ্কের টাকা, জিনিসপত্র পাত্রীপক্ষ থেকে আদায় করে। এটা শরী'আতে জায়িয নয়। অনন্তর অর্থের অপচয় করে জাঁকজমকপূর্ণ খানা-পিনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাইক বাজিয়ে অবৈধ ও নির্লজ্জ গান-বাজনা, নর্তন-কুর্দন, যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার কারণে একটি সুন্নাত কাজ পাপানুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। স্থানভেদে বিবাহ উপলক্ষে আরও নানারূপ কুসংস্কার দেখা যায়। এসব কুসংস্কার অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে একের উপর রয়েছে অন্যের বিশেষ অধিকার।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের উপর অধিকার আছে। আর তোমাদের স্ত্রীদেরও অধিকার আছে তোমাদের উপর। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যে অধিকার আছে তা হলো এই, তোমরা যাদের অপসন্দ কর তারা তোমাদের শয্যা মাড়াবে না। অনুরূপভাবে তোমরা যাদের পসন্দ কর না তাদেরকে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিবে না। আর জেনে রেখ, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হল, তাদের খাওয়া ও পরার ব্যাপারে তাদের প্রতি তোমরা মহানুভবতা ও অনুগ্রহমূলক আচরণ করবে।[৪৪]

মহানবী (সা) এ পর্যায়ে আরো বলেছেন : তোমরা স্ত্রীদের প্রতি কল্যাণকামী হও।[৪৫]

এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۔

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা আছে। (সূরা বাকারা, ২ : ২২৮)

স্বামীর অধিকার

নবী কারীম (সা) বলেছেন, আমি যদি কাউকে সিজ্‌দা করার হুকুম করতাম, তবে স্ত্রীদের তাদের স্বামীকে সিজ্‌দা করতে বলতাম। কেননা, আল্লাহ্ তাদের উপর স্বামীদের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৪৬]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী কারীম (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তি আরয করল, কোন মহিলা উত্তম ? তিনি বললেন, সেই নারী যার প্রতি স্বামী নযর করলে সে খুশি হয়ে যায়। যে স্বামীর কথামত চলে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং স্বামীর মতের বিরুদ্ধে তার সম্পদ খরচ করে না।[৪৭]

হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন : কোন মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করে ও স্বামীর কথা মান্য করে, তবে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।[৪৮]

নবী কারীম (সা) বলেছেন, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে সহবাসের জন্য ডাকে, তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত, যদিও সে চুলায় কাজ করতে থাকে।[৪৯]

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত সহজাত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার কারণে স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়, আবার স্ত্রীরাও অনেক সময় সম্পূর্ণ অকেজো ও স্থবির হয়ে পড়ে, আর তখন সে অপরের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব, স্তন্যদান, শিশু লালন-পালন প্রভৃতি বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয় স্ত্রীদেরকেই।

বিশ্বখ্যাত ইসলামী মনীষী শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী (র) নারীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য সম্পর্কে লিখেছেন, স্বামীকে তার স্ত্রীর উপর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। আর স্ত্রীর উপর এ প্রাধান্য স্বভাবসম্মতও বটে। কেননা পুরুষ জ্ঞান-বুদ্ধিতে অধিক সুদক্ষ এবং প্রতিরোধের কাজে সুদৃঢ়। বাসস্থানের ব্যবস্থা করে বলে স্ত্রীর উপর পুরুষের এ নেতৃত্ব ও প্রাধান্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খণ্ড)

আল্লামা বায়হাকী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের দু'টো কারণে প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। একটি আল্লাহ্‌র দান, অপরটি অর্জিত। আল্লাহ্‌র দান এই যে, আল্লাহ্ স্বভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও গুরুতর কার্য সম্পাদন, বিপুল কর্মশক্তি প্রভৃতি গুণাবলী পুরুষদেরকে দান করেছেন। এজন্যে সামাজিক নেতৃত্ব, শাসন ক্ষমতা, জিহাদ, বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দায়িত্ব কেবল পুরুষদের উপরই অর্পিত হয়েছে।

আর অর্জিত কারণটি হল, মহরানা দান, ভরণ-পোষণ ও পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের যাবতীয় দায়িত্ব পুরুষকেই পালন করতে হয়।[৫০] তবে স্বামী শরী'আত বিরোধী কোন কাজের আদেশ করলে তা পালন করতে স্ত্রী বাধ্য নয়।

স্ত্রীর অধিকার

স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন অধিকার স্বীকৃত, তদ্রুপ স্বামীর উপরও স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত। হযরত মু'আবিয়া কুশাইরী (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি অধিকার রয়েছে ? জবাবে নবী কারীম (সা) বলেছেন : তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খেতে দিবে। তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরতে দিবে। আর মুখের উপর প্রহার করবে না; তাকে অশ্লীল কথা বলবে না এবং ঘরের ভিতরে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবে না।[৫১]

স্ত্রীর অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর কর্তব্য। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ٠

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৩)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ٠

বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থ্যনুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৬)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهُ ٠

বিত্তবান নিজ সামর্থ্যানুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। (সূরা তালাক, ৬৫ : ৭)

স্ত্রী থেকে স্বামী আনুগত্য না পেলে তাকে আল্লাহ্‌র বিধানের কথা বুঝাবে। যদি সে এতেও এগিয়ে না আসে, তবে 'রাত্রিকালীন শয্যা গ্রহণে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর' পদ্ধতি অবলম্বন করবে। তাতেও ঠিক না হলে তাকে হাল্‌কা প্রহার করবে। তবে মুখের উপর প্রহার করবে না।[৫২]

ফিক্‌হবিদগণ বলেছেন, চারটি কারণে স্ত্রীকে প্রহার করার স্বামীর অধিকার আছে—১. স্ত্রীর সাজসজ্জা পরিহার করা অথচ স্বামী তা চায়; ২. সহবাসে আহবান করার পর বিনা কারণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন; ৩. নামায না আদায় করা এবং ৪. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে যাতায়াত করা। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নামায তরক করলে কিংবা হায়িযের গোসল না করলে স্ত্রীকে স্বামীর প্রহারের অধিকার নেই।[৫৩]

হাদীসে চতুর্থ কথা হচ্ছে, স্ত্রীকে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করবে না। এ ধরনের কথাবার্তা পারিবারিক জীবনের মাধুর্যকে বিনষ্ট করে। কাজেই ইসলাম এ ধরনের কথাবার্তা পসন্দ করে না।[৫৪]

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর অভিভাবক ও পরিচালক বানিয়ে দেয়। সুতরাং অভিভাবক, পরিচালক ও কর্তা হিসেবে স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি তার প্রতি রয়েছে তার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। যথা :

১. মহর : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সন্তুষ্ট চিত্তে তার মহর পরিশোধ করে দেয়া। মহর হচ্ছে বিয়ের অন্যতম শর্ত। মহর ছাড়া বিয়ে হয় না। ইসলাম মহর পরিশোধ করাকে স্বামীর উপর ফরয করে দিয়েছে।

২. ভরণ-পোষণ : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ। ইরশাদ হচ্ছে :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۔

পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (সূরা নিসা, ৪ : ৩৪)

৩. সদ্ব্যবহার : স্বামীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। বস্তুত সদ্ব্যবহার পাওয়া স্বামীর উপর স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকার বটে। কারণ বৈবাহিক সম্পর্কটাই হচ্ছে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক। স্বামী স্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ভালবাসবে, চমৎকার সান্নিধ্যে স্ত্রীকে করে তুলবে একান্ত আপন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۔

তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে। (সূরা নিসা : ৪ : ১৯)

নবী কারীম (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।[৫৫]

৪. স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা : যদি কোন মু'মিন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে তবে তার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۔

তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না। (সূরা নিসা, ৪ : ১২৯)

ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব না হলে কেবলমাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে।

ইমাম ইব্ন কুদামা আল-মাক্দিসী (র) 'মিহাজুল কাসেদীন' গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিম্নোক্ত কর্তব্যসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন :

১. স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা।

২. স্ত্রীর সাথে হাসিখুশি ও খোলামেলা আচরণ করা।

৩. লজ্জাশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৪. সন্দেহজনক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

৫. ভরণ-পোষণের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

৬. স্ত্রীকে দীনী শিক্ষা দেওয়া।

৭. একাধিক স্ত্রী হলে তাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা।

৮. স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতা দেখা দিলে তাকে উপদেশ প্রদান করা। এতে সংশোধন না হলে হাল্কা প্রহার করা, তবে মুখমণ্ডলে নয়।[৫৬]

স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তেমনি স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু স্বামীকে স্ত্রীর উপর মর্যাদা দান করেছেন, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সর্বোপরি স্ত্রীর উপর তাকে পরিচালক নিযুক্ত করেছেন, সেজন্য স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

তার অন্যতম দায়িত্ব হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার হক রক্ষা করা। এর দু'টি দিক আছে। একটি হল, সে নিজেকে সর্ববিধ অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে হিফাযত করবে। দ্বিতীয়টি হল, স্বামীর অর্থ-সম্পদের আমানত রক্ষা।

স্বামীর খিদমত করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য কাজ। স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান স্ত্রীর দায়িত্ব। স্ত্রীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব যেভাবে পুরুষের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর উপর স্বামীর খিদ্‌মত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

মহিলা সাহাবীগণ পরম আনন্দে ও ধৈর্য সহকারে স্বামীদের খিদ্‌মত করতেন এবং নিজ হাতে ঘরের যাবতীয় কাজ করতেন। হযরত আসমা বিনত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি আমার স্বামী যুবায়রের খিদ্‌মত করতাম। হযরত ফাতিমা (রা) নিজ হাতে যাঁতা চালিয়ে গম পিষতেন। ইসলাম মূলত স্ত্রীকে স্বামীর ঘরের পরিচালিকা ও দায়িত্বশীলা বানিয়েছে। কাজেই স্বামীর খিদ্‌মত এবং ঘরের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা স্ত্রীর জন্য বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে, স্বামীর যৌন দাবি পূরণ করা। একমাত্র শরঈ ওযর ব্যতীত স্বামীর আহবান প্রত্যাখ্যান করা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। নবী কারীম (সা) বলেছেন : স্বামী যখন স্ত্রীকে শয্যাগ্রহণের আহবান করে তখন সে যদি স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয়, তবে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফিরিশ্‌তাগণ তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।[৫৭] নবী কারীম (সা) আরো বলেছেন : স্বামী যখন (যৌন) প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকবে, তখন সে চুলায় রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত।[৫৮]

একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা ও শর্তাবলী

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, নর-নারীর নৈতিক পবিত্রতা সংরক্ষণ। আর এ জন্যে যেমন বিয়ে করার আদেশ করা হয়েছে, তেমনি পুরুষের জন্যে এ অনুমতিও দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ কোন কারণে যদি একসাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সে তা করতে পারে। তবে তার শেষ সীমা হচ্ছে চারজন পর্যন্ত। একত্রে চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ٠

তবে তোমরা বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চারজন। (সূরা নিসা, ৪ : ৩)

কখনও কখনও এমন বহু ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে, যার দরুন এক-একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে এক স্ত্রীই যে উত্তম, অধিকতর স্বভাবসুলভ, পরিবারকে অধিকতর টেকসই করতে সহায়ক, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ জন্য বুদ্ধিমান বিবাহিত লোকেরা অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া একাধিক বিয়ের কথা চিন্তাই করেন না। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী বহু বিবাহের যৌক্তিকতা বিচার করা যেতে পারে।

বহু বিবাহের যৌক্তিকতা

১. কোন কারণে মানব সমাজে যদি নারীর সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অধিক হয়ে যায়, যেমন উত্তর ইউরোপে বর্তমানে রয়েছে। ফিনল্যান্ডের জনৈক চিকিৎসক বলেছেন, সেখানে

প্রতিটি চারটি সন্তানের মধ্যে একটি হয় পুরুষ আর বাকী তিনটি হয় নারী। এরূপ অবস্থায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এক নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য হয়ে পড়ে। কেননা, এক স্ত্রী গ্রহণের রীতিতে সেখানে এমন বহু মেয়ে থেকে যাবে, যাদের কোনদিন বিয়ে হবে না। তাদের কোন আশ্রয়স্থল বা কোন বৈধ সন্তান থাকবে না। তারা আগাছা-পরগাছার ন্যায় লাঞ্ছিত জীবন যাপনে বাধ্য হবে। তাদের এ রকমের উপেক্ষিতা জীবনের চেয়ে একজন নির্দিষ্ট স্বামীর অধীন অপর নারীর সাথে একত্রে ও সমান মর্যাদায় জীবন যাপন কি অধিকতর কল্যাণকর নয়?[৫৯]

মনীষী টমাস এ মহারোগের ঔষধ নির্দেশ করে বলেন, প্রত্যেক সামর্থ্যবান পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিতে হবে। এর ফলেই বিপদ কেটে যাবে এবং আমাদের মেয়েরা ঘর পাবে, স্বামী পাবে।[৬০]

২. সর্বধ্বংসী যুদ্ধের ফলে কোন দেশে যদি পুরুষ সংখ্যা কমে যায় আর নারীরা থেকে যায় অনেক বেশি, তখনও যদি সমাজের পুরুষদের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি না থাকে, তাহলে বেশির ভাগ মেয়ের জীবনে কখনও স্বামী জুটবে না। ইউরোপ বিগত দু'টো বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ যুবক হারিয়েছে, এ কারণে যুবতী মেয়েদের মধ্যে খুব কমই বিবাহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ফলে এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যে, হয় বিবাহিত পুরুষেরা আরও এক, দুই, তিনজন করে স্ত্রী গ্রহণ করবে, নয় বিবাহিত যুবকরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এ স্বামীহীনা মেয়েদের যৌন পরিতৃপ্তি দানের জন্য প্রস্তুত হবে।[৬১]

৩. মানব প্রকৃতিতে বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রবণতা অনেক বেশি এবং তীব্র। তবে কেউ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে অথবা কারো যদি দুই, তিন কিংবা চারজন স্ত্রী থাকে, তবে স্ত্রীদের যা কিছু অধিকার, স্বামী তার সবকিছুই পূর্ণ সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও পূর্ণ সমতা সহকারে যথারীতি আদায় করবে। পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, খাদ্য, সঙ্গদান ইত্যাদি সব বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রেই সমতা রক্ষা করে সকল স্ত্রীর অধিকার আদায় করা স্বামীর জন্য কর্তব্য। যে আয়াতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সে আয়াতেই উল্লেখ রয়েছে :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ‎.

তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে। (সূরা নিসা, ৪ : ৩)

সুবিচারপূর্ণ বন্টনের পর্যায়ে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, সংখ্যা ও পরিমাণ ইত্যাদির দিক দিয়ে ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করার কথা এখানে বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, প্রত্যেক স্ত্রীর অধিকার সাম্য ও প্রয়োজনানুপাতে দরকারী জিনিস পরিবেশনের কথা। কেননা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের প্রয়োজন, রুচি ও পসন্দ যে একই ধরনের হবে এমন কোন কথা নেই। কেউ হয়ত রুটি খায়, তার প্রয়োজন রুটির। আর কেউ ভাত খায়, তার প্রয়োজন চালের। কেউ যদি মোটাসোটা হয়, তার জামা ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্যে বেশি কাপড় দরকার। আর কেউ হাল্কা-পাতলা, শীর্ণ দেহবিশিষ্ট হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই 'আদল' সুবিচার ও সমতার অর্থ হল, সকলের প্রতি সমান খেয়াল

রাখা, যত্ন নেওয়া এবং প্রত্যেকের দাবি যথাযথভাবে পূরণ করা। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের উপরোক্ত শর্ত পূরণ করতে পারবে না বলে যদি আশংকা করে, তাহলে তার উচিত আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী একজনমাত্র স্ত্রী গ্রহণ করে ক্ষান্ত হওয়া। কুরআন মজীদ এ কথা বলা হয়েছে :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً .

আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে। (সূরা নিসা, ৪ : ৩)

স্ত্রী যদি এমন কোন দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক বা স্বাভাবিক ঘৃণার উদ্রেককারী রোগে আক্রান্ত হয়, যার দরুন স্বামী তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে অক্ষম হয়, এ ক্ষেত্রে স্বামীর সামনে দু'টো বিকল্প থাকে, হয় সে তার স্ত্রীকে তালাক দেবে। এতে না থাকে কোন সৌজন্যবোধ ও মানবিকতা, আর না থাকে এতো দিনের প্রেম-ভালবাসার কোন মূল্য। বরঞ্চ একজন রুগ্না নারীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয় অমানবিকভাবে। দ্বিতীয় বিকল্পটি হলো, সে আরেকটি বিয়ে করে পূর্বতন স্ত্রীর স্বামী ও অভিভাবক হিসেবে বহাল থাকতে পারে। সে তাকে স্ত্রীর অধিকারও দিবে এবং চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যয়ভারও বহন করবে। রুগ্না স্ত্রী ও তার স্বামী উভয়ের জন্যই যে এই শেষোক্ত বিকল্পটিই অধিক সম্মানজনক, মহানুভবতার পরিচায়ক ও সুখশান্তির নিশ্চয়তা বিধায়ক, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

স্ত্রী যদি এত বেশি বিরাগভাজন হয় যে, তালাকের পূর্বে দুই পক্ষের সালিশদের সমঝোতা প্রচেষ্টা, প্রথম তালাক, দ্বিতীয় তালাক এমনকি ইদ্দতের বিরতিও সেই বিরাগ নিরসনে সফল হয় না, তখনও স্বামীর সামনে দু'টি মাত্র বিকল্প অবশিষ্ট থাকে। প্রথমত, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন নারীকে বিয়ে করা, দ্বিতীয়ত, সকল আইনানুগ অধিকার সহ তাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখা এবং আরেকটি বিয়ে করা। এখানেও দ্বিতীয় বিকল্পটিই প্রথম স্ত্রীর জন্য অধিকতর সম্মানজনক, স্ত্রীর প্রতি নৈতিক মহানুভবতার প্রতীক এবং বিশেষত একাধিক সন্তানের জননীর কল্যাণের জন্য অধিকতর নিরাপত্তা দানকারী, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কাজেই শর্তসাপেক্ষে ও প্রয়োজনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যায়।

তালাক-বিবাহ বিচ্ছেদ

'তালাক' (طلاق) শব্দের আভিধানিক অর্থ বন্ধন খুলে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, বিচ্ছিন্ন করা। শরী'আতের পরিভাষায়, 'তালাক' মানে বিয়ের বন্ধন খুলে দেওয়া। স্বামী কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্দিষ্ট বাক্যে অথবা ইঙ্গিতে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করাকে তালাক বলে।

ইমামুল হারামাইন (র) বলেছেন, 'তালাক' শব্দটি ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগে ব্যবহৃত পরিভাষা। ইসলামও এক্ষেত্রে এ শব্দটিই ব্যবহার করেছে।[৬২]

তালাক বিধানের উদ্দেশ্য

ইসলামে তালাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যখন এতদূর খারাপ হয়ে যায় যে, তারা পরস্পরিক মিলেমিশে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সহকারে জীবন যাপন করার কোন সম্ভবনাই দেখতে পায় না, এমনকি এরূপ অবস্থার সংশোধন বা পরিবর্তনের শেষ আশাও

বিলীন হয়ে যায়, যার ফলে বিয়ের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন উভয়ের ভবিষ্যত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও তিক্ততা-বিরক্তির বিষাক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক কোন পসন্দনীয় কাজ নয়। এ কাজকে কোন দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহিতও করা হয়নি; বরং এ হচ্ছে নিরুপায়ের উপায়। দাম্পত্য জীবনে মিলমিশ রাখার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন এ ব্যবস্থার সাহায্যে উভয়ের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। তালাক যে ইসলামের কোন পসন্দনীয় কাজ নয়, এ কথা হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণা থেকেই প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তালাকের চেয়ে অধিক ঘৃণ্য কোন জিনিস হালাল করেননি।[৬৩]

অন্য হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক অপসন্দনীয় কাজ হচ্ছে তালাক।[৬৪]

হযরত আলী মুরতাযা (রা) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে তালাক যে অপসন্দনীয় কাজ তার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন : তোমরা বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিয়ো না। কেননা তালাক দিলে তার দরুন আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে ওঠে।[৬৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন : তোমরা বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিয়ো না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সে সব স্বামী-স্ত্রীকে পসন্দ করেন না, যারা নিত্য নতুন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত।[৬৬]

তালাকের প্রকারভেদ

পদ্ধতিগত দিক থেকে তালাক দুই প্রকার—১. সুন্নাত তালাক ও ২. বিদ্ঈ তালাক। ফলাফলের দিক থেকেও তালাক দুই প্রকার—১. রাজঈ তালাক ও ২. বাইন তালাক।

সুন্নাত তালাক আবার দুই প্রকার—১. আহসান তালাক ও ২. হাসান তালাক। বাইন তালাকও দুই প্রকার—১. বাইন তালাক সুগরা ও ২. বাইন তালাক কুব্‌রা বা মুগাল্লাযা তালাক।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার তালাকের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

সুন্নাত তালাক : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঠিক যে সময় এবং যে পদ্ধতিতে তালাক দিতে শিক্ষা দিয়েছেন, তদনুরূপ তালাককে সুন্নাত তালাক বলে। তবে সুন্নাত তালাকের অর্থ এই নয় যে, এ ধরনের তালাকদানে সাওয়াব রয়েছে। কারণ তালাক স্বয়ং কোন ইবাদত নয়; বরং এর অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবাগণ সুন্নাত নিয়মে তালাক দেওয়া পসন্দ করেছেন। এর বিপরীত পন্থায় তালাক দিলে গুনাহ হবে।

বিদ্ঈ তালাক : স্বামী তার স্ত্রীকে একই তুহরে এক বা একাধিক শব্দে একাধিক তালাক দিলে অথবা সহবাসকৃত তুহরে এক তালাক দিলে তাকে বিদ্ঈ তালাক বলে।[৬৭]

অনুরূপভাবে, যে তুহরে সহবাস হয়েছে সে তুহরে একত্রে দুই বা তিন তালাক দিলে তাও বিদ্ঈ তালাকের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা একবাক্যে দেওয়া হোক কি পৃথক বাক্যে।[৬৮]

রাজঈ তালাক : তালাক শব্দ উচ্চারণ পূর্বক স্বামী স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দিলে এবং তার সাথে বাইন শব্দ যোগ না করলে তাকে রাজঈ তালাক বলে। উল্লেখ্য, স্ত্রীকে ইদ্দাতের ভিতরে ফিরিয়ে না নিলে ইদ্দাত শেষে তা বাইন তালাকে পরিণত হয়।

বাইন তালাক : তালাক শব্দের সাথে 'বাইন' শব্দ যোগ করে স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দিলে তাকে বাইন তালাক বলে। এ ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং সহবাসও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য ইদ্দাত চলাকালে বা ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পর পারস্পরিক সম্মতিতে 'তাহ্‌লীল' ব্যতীত সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়।

আহ্‌সান তালাক : যে তুহরে সহবাস হয়নি এবং এর পূর্ববর্তী তুহরেও তালাক দেওয়া হয়নি সেই অবস্থায় স্ত্রীকে একটি রাজঈ তালাক প্রদানের পর ইদ্দাত পূর্ণ হতে অথবা গর্ভ খালাস হতে দিলে তাকে আহ্‌সান তালাক বলে।[৬৯]

হাসান তালাক : সহবাস বর্জিত তুহরে স্ত্রীকে একটি রাজঈ তালাক দেওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তুহরে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক প্রদানকে হাসান তালাক বলে।[৭০]

নিম্নোক্ত দলীলের ভিত্তিতে এটি সুন্নাত তালাকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ·

তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে। (সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ : ১)

নবী কারীম (সা) বলেছেন : সুন্নাত তালাক এই যে, তুমি তুহরকে সামনে রেখে প্রতি তুহরে একটি করে তালাক দাও।[৭১]

বাইন তালাক সুগ্‌রা : তালাক শব্দের সাথে বাইন শব্দ যোগ করে স্ত্রীকে এক অথবা দুই তালাক প্রদান করলে তাকে বাইন তালাক সুগ্‌রা বলে।

বাইন তালাক কুব্‌রা (মুগাল্লাযা তালাক) : একই সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক শব্দে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলে তাকে বাইন তালাকে কুব্‌রা বা মুগাল্লাযা তালাক বলে। অর্থাৎ তিন তালাক দেওয়ার ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। তদ্রূপ উভয়ের একত্রে বসবাস করাও হারাম হয়ে যায়। ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর স্বামী তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিতে পারে না এবং উভয়ে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারে না। তবে তালাকপ্রাপ্তা যদি অন্য কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং কোন কারণে আবার বিচ্ছেদ ঘটে যায় অথবা শেষোক্ত স্বামী মারা যায়, তবে উভয়ে পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে এই শর্তে যে, তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ... ·

অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য কোন স্বামীর সাথে সঙ্গত হবে। অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় এবং তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করতে পারবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারও কোন অপরাধ হবে না। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩০)

ইদ্দাত

তালাক অথবা মৃত্যুজনিত কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর যে সময়সীমার মধ্যে কোন নারী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না, তাকে ইদ্দাত বলে।

যেসব ক্ষেত্রে ইদ্দাত পালন বাধ্যতামূলক :

ক. সহীহ্ বিবাহের ক্ষেত্রে সহবাস অথবা নির্জনে মিলনের পর বিবাহ বিচ্ছেদ হলে।

খ. ফাসিদ বিবাহের ক্ষেত্রে সহবাস বা নির্জনে মিলনের পর বিবাহ্ বিচ্ছেদ হলে।

গ. সহীহ্ অথবা ফাসিদ বিবাহের পর স্বামীর মৃত্যু হলে।

তবে শর্ত হচ্ছে, নির্জনে মিলন বা সহবাসের পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে ইদ্দাত পালন করতে হবে না।

ইদ্দাতের সময়সীমা

১. বালিগা নারী যার নিয়মিত হায়িয হয়, তার ইদ্দাতকাল তিন হায়িয। হায়িয অবস্থায় তালাক দেওয়া হলে ইদ্দাতকাল তারপরের তিনটি পূর্ণ হায়িয।

২. অল্প বয়স, বার্ধক্য, রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোন কারণে কোন নারীর হায়িয না হলে তার ইদ্দাত হবে পূর্ণ তিন মাস।

৩. কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার ইদ্দাতকাল হবে চার মাস দশ দিন।

৪. কোন নারীকে রাজঈ তালাক দেওয়ার পর তার ইদ্দাতকাল চলাকালে স্বামী যদি মারা যায়, তবে স্বামীর মৃত্যুর তারিখ থেকে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করতে হবে।

৫. গর্ভবতী নারীর ইদ্দাতকাল গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত এবং বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভ প্রকাশ পেলে তার ইদ্দাতকাল হবে গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত।

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার পুনঃবিবাহ

'তালাক' শব্দের সাথে 'বাইন' শব্দ যোগ করে স্ত্রীকে এক অথবা দুই তালাক দিলে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

ইদ্দাত চলাকালে অথবা ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পর পারস্পরিক সম্মতিতে তাহ্লীল ব্যতীত সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়।

কিন্তু কেউ যদি একই সাথে অথবা বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক শব্দে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তাকে 'বাইন তালাকে কুব্রা' বলে। তিন তালাক দেওয়ার পর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়। ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর স্বামী তাকে স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নিতে পারে না এবং উভয়ে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারে না। তবে তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি অন্য কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং কোন কারণে আবার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় অথবা শেষোক্ত স্বামী যদি মারা যায়, তবে উভয়ে পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে যদি তারা মনে করে যে, উভয়ে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۔

অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সঙ্গত না হবে। অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় এবং তারা উভয়ে মনে করে

যে, তার আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করতে পারবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারও অপরাধ হবে না। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ এ বিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩০)

খুলা'

খুলা' (خُلْع) শব্দের আভিধানিক অর্থ খুলে ফেলা, ছিন্ন করা। শরী'আতের পরিভাষায়, স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদের বিনিময়ে সমঝোতার মাধ্যমে স্বামী খুলা' বা অনুরূপ অর্থবোধক শব্দের প্রয়োগে স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত করলে তাকে খুলা' বলে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۔

যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্ সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারও কোন অপরাধ নেই। (সূরা বাকারা, ২ : ২২৯)

এ আয়াত থেকে খুলা' তালাক প্রমাণিত হয় এবং এ প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি টাকা-পয়সার বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে তালাক গ্রহণ করে এবং স্বামী যদি সে অর্থ গ্রহণ করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না।

ইমাম আবূ বকর আহ্‌মাদ আল-জাস্‌সাস (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা খুলা' তালাক সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۔

আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করেই থাক, তবে তাকে এক স্তূপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিবে না। তোমরা কি দোষারোপ করে ও সুস্পষ্ট যুলুম করে তা ফেরত নিবে ? (সূরা নিসা, ৪ : ২০)

আরও ইরশাদ হয়েছে :

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۔

তোমরা স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ, তা থেকে বিন্দু পরিমাণও ফেরত নেওয়া তোমাদের জন্য হালাল হবে না। তবে তারা দু'জনই যদি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় করে, তবে ....। (সূরা বাকারা, ২ : ২২৯)

মহরের সমপরিমাণ অথবা তার কম বেশি পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে স্বামী তার স্ত্রীকে খুলা' তালাক দিতে পারে। বিভেদ-বিসম্বাদ স্বামীর পক্ষ থেকে হলে খুলা'র বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা তার জন্য মাকরূহ। (হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৪)

আর যদি বিভেদ-বিসম্বাদ স্ত্রীর পক্ষ থেকে ঘটে থাকে, তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত মালের অধিক পরিমাণ গ্রহণ করাও মাকরূহ। (বাদায়েউস সানায়ে', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫১)

স্বামী ইচ্ছা করলে বিনিময় ছাড়াও খুলা' প্রদান করতে পারে। নবী কারীম (সা) বলেছেন : খুলা' প্রার্থিণী স্ত্রীর নিকট থেকে তাকে তোমার প্রদত্ত মালের সমপরিমাণ গ্রহণ করতে পার, তার অধিক নয়। (বায়হাকীর সুনানুল কুব্‌রা, ৭ খণ্ড, পৃ. ৩১৪)

খুলা'র বিনিময়ের ধরন

যে সব বস্তু মহর হিসেবে প্রদান করা যায় তা খুলা'র বিনিময় হিসেবেও প্রদান করা যাবে। খুলা' প্রদানকারী স্বামীকে বালিগ ও সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে।

খুলা'র হুকুম

খুলা'র মাধ্যমে একটি বাইন তালাক সংঘটিত হয়, এমনকি দুই তালাকের নিয়্যাত করলেও। কিন্তু তিন তালাকের নিয়্যাত করলে তিন তালাকই সংঘটিত হবে। খুলা'প্রাপ্তা নারী ইদ্দাতকালীন খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে যদি ভিন্নতর কোন চুক্তি না হয়ে থাকে, তবে সে উপহার সামগ্রী পাবে না। খুলা' মূলত একটি বাইন তালাকের অন্তর্ভুক্ত। (হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৪; আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮)

তবে তিন তালাকের নিয়্যাত করলে তিন তালাকই কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮)

যিহার

আরবী ভাষায় 'যিহার' (ظِهَار) শব্দটি ظَهْرٌ (যাহরুন) থেকে নির্গত। এর প্রচলিত অর্থ সওয়ারী, যার উপর সওয়ার হওয়া যায়। তাই জন্তুযানকে আরবীতে ظَهْرٌ বলা হয়। জাহিলী যুগে আরবদেশে এই ধরনের বাক্য তালাকে পরিগণিত হতো। কেননা তাদের নিকট এর অর্থ ছিল, স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে শুধু বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করছে না, বরং তাকে মায়ের মতই নিজের জন্য হারাম বানিয়ে নিচ্ছে। আরব সামাজে তালাক দেওয়ার পরও স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার একটা উপায় থাকত। কিন্তু 'যিহার' করার পর আর কোন পথই থাকত না।

স্বামী যদি স্ত্রীকে অথবা তার এমন কোন অঙ্গ যারদ্বারা সর্বাঙ্গ বোঝায়, তার সাথে তার মায়ের কিংবা চিরস্থায়ী মাহ্‌রাম, চাই তা বংশীয় কারণে হোক কি দুধপানের কারণে, তার সাথে তুলনা করে, তবে এ কথা দ্বারা 'যিহার' হবে।[৭২]

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ٠

যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসমুক্ত করতে হবে। এই নির্দেশ তোমাদের দেওয়া হলো। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। কিন্তু যার এই সামর্থ্য থাকবে না, তাকে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। যে তাতেও অসমর্থ্য হবে সে ষাটজন মিস্‌কীনকে খানা খাওয়াবে। (সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৩-৪)

যিহারের রুক্ন

কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে أَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّىْ 'তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের ন্যায়' অথবা তদনুরূপ কোন বাক্য বলে, তবে যিহার হবে। যদি কেউ বলে, তোমার মাথা আমার উপর আমার মায়ের পেটের ন্যায় অথবা তোমার চোহারা বা গ্রীবা বা তোমার লজ্জাস্থান, তবে যিহার কার্যকর হবে।[৭৩]

যিহারের কাফ্ফারা

যিহার করার পর যিহারকারী যখনই যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করে, তখন যিহারকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যদি যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদি সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করে, তবে তার সাথে মিলনের পূর্বেই কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং স্বামীকে কাফ্ফারা আদায়ের ব্যাপারে বাধ্য করা হবে। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না।[৭৪]

যিহারের কাফ্ফারা হল, অধীনস্থ দাস মুক্ত করা। কাফ্ফারার নিয়্যাতে কোন বিনিময় ব্যতিরেকে তাকে মুক্ত করে দিতে হবে। দাস মুসলিম হোক কি কাফির, নারী হোক কি পুরুষ, ছোট হোক কি বড়, সর্বক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।[৭৫]

কেউ যদি যিহারের কাফ্ফারা বাবদ দাসমুক্ত করতে অপারগ হয়, তবে সে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোযা রাখবে। তবে তাতে যেন রমযান মাস, দুই ঈদের দিন এবং তাশরীকের দিনগুলো না আসে। কেউ যদি যিহারের কাফ্ফারার রোযা রাখতে শুরু করে ভুলবশত দিনে যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হয়ে পড়ে অথবা রাতে স্বেচ্ছায় জেনেশুনে কিংবা ভুলক্রমে সহবাসে মিলিত হয়, তবে ইমাম আযম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, তার পরের দিন হতে নতুন করে রোযা শুরু করতে হবে। আর যদি দিনে স্বেচ্ছায় সহবাস করে, তবে সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী তার পরের দিন হতে রোযা রাখতে হবে।[৭৬]

কেউ যদি যিহারের কাফ্ফারা বাবদ ধারাবাহিক দুই মাস রোযা রাখতে অপারগ হয়, তবে ষাটজন মিস্কীনকে দুই বেলা খাওয়াবে। এ খাদ্য মধ্যম মানের হতে হবে। এ খাদ্য দান চলাকালে যদি কেউ যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে নতুন করে খাদ্য দান করতে হবে না। কেউ যদি একজন মিসকীনকে ষাট দিন দুই বেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়ায়, তবে কাফ্ফারা আদায় হবে।[৭৭]

যিহারের হুকুম

কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত পরিপূর্ণ সহবাস অথবা সহবাস সংঘটিত হতে পারে, এমন কাজ করাও নিষিদ্ধ।[৭৮] যদি কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে যিহারকারী সহবাস করে, তবে ইস্তিগফার করবে এবং তার উপর প্রথম কাফ্ফারা ব্যতীত অন্য কিছু বর্তাবে না।[৭৯]

স্বামী যদি যিহারকৃত স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তারপর স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, তারপর সে যদি প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে প্রথম কাফ্ফারা আদায় ব্যতীত তার সাথে সহবাস করা জায়িয হবে না।[৮০] আর যদি তারা উভয়ে মুরতাদ হয়ে যায়, তারপর উভয়ে

ইসলামে দীক্ষিত হয়, তবে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, তারা যিহারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[৮১] উপরিউক্ত হুকুমসমূহ যিহারে মুতলাক বা যিহারে মিয়াদী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ঈলা

ইমাম আবূ বকর আহমাদ আল-জাস্সাস (র) বলেন, ঈলা (إِيْلَاءٌ) শব্দের আভিধানিক 'হলফ' বা কস্ম করা। আরবী ভাষায় : آلى - يُوْلِى - إِيْلَاءً

শরী'আতের পরিভাষায় ঈলা হচ্ছে, যৌন সঙ্গম না করার হল্ফ করা, যার পরিণতিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় স্ত্রী আপনা আপনি তালাক হয়ে যায়। এমনকি যখন বলা হবে, অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে, বোঝা যাবে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। [আহ্কামুল কুরআন, জাস্সাস (বাংলা অনুবাদ), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫৫]

যদি কোন স্বামী শপথ করে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে চার মাস বা তার অধিককাল সহবাস করবে না এবং সে যদি সহবাস হতে বিরত থাকে, তবে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তা একটি বাইন তালাকে পরিণত হবে। [বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, (ইফা), পৃ. ৫৮৪]

যে কাজ করলে ঈলাকারী হয়

হযরত আলী ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে হাসান ও আতা (র) বর্ণনা করেন যে, ঈলাকারী হবে তখন, যদি সে শপথ করে বলে, সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না ক্ষতি হওয়ার আশংকায়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যে শপথ স্ত্রী সঙ্গমের প্রতিবন্ধক হবে তাই ঈলা। সন্তুষ্টি বা ক্রোধের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি। ইবরাহীম ইব্ন সীরীন ও শা'বী (র) একই অভিমত দিয়েছেন।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) বলেন, ঈলা সঙ্গমকে কেন্দ্র করেই হয়। যেমন, যদি কেউ শপথ করে, সে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না, তবে সে ঈলাকারী হলো। [আহ্কামুল কুরআন, জাস্সাস (বাংলা অনুবাদ), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫৫]

যে লোক চার মাসের শপথ করল, ঈমাম আযম আবূ হানীফা, যুফার, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও সুফিয়ান সাওরী (র) বলেছেন, সে ঈলাকারী হবে। অতঃপর মেয়াদের মধ্যে তার স্ত্রীর নিকট না গেলে এবং ইতোমধ্যে ইদ্দাত শেষ হয়ে গেলে ঈলার কারণে স্ত্রী বাইন তালাক হয়ে যাবে।

কাফ্ফারা :

দাসমুক্ত করতে হবে। এতে অপারগ হলে দশজন মিসকীনকে দুইবেলা মধ্যমমানের খাদ্য দিতে হবে। এতে অপারগ হলে পরপর তিনটি রোযা রাখতে হবে। (শারহ্ বিকায়া)

হুকুম :

ঈলা করার পর চার মাসের ভিতরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না আনলে সময়সীমা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বাইন তালাক সংঘটিত হয়ে যায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতের নির্দেশের প্রয়োজন হয় না।[৮২]

লি'আন

লি'আন (لِعَانٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ, তাড়িয়ে দেওয়া, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করা, পারস্পরিক অভিসম্পাত করা ইত্যাদি।

লি'আন-এর পারিভাষিক অর্থ, আল্লাহ্র নামে শপথদ্বারা এমন কতিপয় বাক্যকে লি'আন বলে যেগুলো অভিসম্পাতযুক্ত হয় এবং যা স্বামীর ক্ষেত্রে অপবাদের শাস্তি এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত হয়। (শারহ্ বিকায়া গ্রন্থের প্রান্তটিকা, অনুচ্ছেদ লি'আন)

ইনায়া গ্রন্থকার বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অভিশাপ ও গযব শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে শপথ অনুষ্ঠানকে লি'আন বলে। মোদ্দাকথা, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত করা হলে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী বিচারক স্বামীকে চারবার শপথ এবং পঞ্চমবারে নিজের উপর অভিশাপ দেওয়ার নির্দেশ দেবেন। তারপর স্ত্রীকে চারবার শপথ এবং পঞ্চমবারে মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপ দেওয়ার নির্দেশ দেবেন। শরী'আতের পরিভাষায় একে বলা হয় লি'আন। কুরআন মজীদে এ বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔

যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয় অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষী এরূপ হবে, সে (স্বামী) আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ হবে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে, যদি সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলে তার স্বামী সত্যবাদী হলে নিজের উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হবে। (সূরা নূর, ২৪ : ৬-৯)

লি'আন করার পদ্ধতি

স্বামী নিম্নোক্ত বাক্যে চারবার শপথ করবে—'আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এই নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই সত্যবাদী; পঞ্চমবার অভিযুক্ত নারীর প্রতি ইশারা করে বলবে, আমি এই নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি সে ব্যাপারে আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ পতিত হোক।'

স্ত্রীও নিম্নোক্ত বাক্যে চারবার শপথ করবে—'আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই ব্যক্তি আমার প্রতি ব্যভিচারের যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চমবারে বলবে, এই ব্যক্তি আমার প্রতি ব্যভিচারের যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে সে ব্যাপারে সে সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হোক।'

স্বামী যদি শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে হাজতবাসে আটক রাখা হবে যতক্ষণ সে শপথ না করে অথবা তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে।

স্বামী যদি তার অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে, তবে তার অভিযোগ 'কাযফ' (কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ) হিসেবে গণ্য হবে এবং অভিযোগকারীর দণ্ড হবে আশি বেত্রাঘাত।

স্ত্রী শপথ করতে অস্বীকার করলে তাকেও হাজতবাসে আটক রাখা হবে, যতক্ষণ সে শপথ না করে অথবা তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে।

উভয়ে লি'আন করার পর আদালত তাদের বিবাহ বাতিল করে দেবে এবং তারা আর কখনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। তবে এই শর্তে পারবে যে, স্বামী তার মিথ্যার অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করলে কাযাফের শাস্তি আশি বেত্রঘাত ভোগের পর তারা পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে।[৮৩]

লি'আনের শর্ত :

স্ত্রী লি'আন চাইবে। স্বামী যদি তা অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাকে গ্রেফতার করবে যতক্ষণ না সে লি'আন করে অথবা নিজকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে। যদি সে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে, তবে তাকে অপরাধের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রঘাত করা হবে। যদি স্বামী লি'আন করে, তবে স্ত্রীর উপরও লি'আন ওয়াজিব হবে। স্ত্রী যদি লি'আন করতে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাকে গ্রেফতার করবে যতক্ষণ না সে লি'আন করে কিংবা স্বামীর কথা সত্য বলে স্বীকার করে।

লি'আনের হুকুম :

স্বামী স্ত্রী যখন লি'আন হতে ফারিগ হয়ে যায়, তখন পরস্পরের মধ্যে সহবাস হারাম হয়ে যায়। কিন্তু লি'আনদ্বারা উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় না, যতক্ষণে স্বামী স্ত্রীকে বাইন তালাক না দেয়। আর যদি স্বামী নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে নেয়, তবে বিবাহ নবায়ন ব্যতীতই সহবাস হালাল হয়ে যায়।[৮৪]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, লি'আনদ্বারা উভয়ের মধ্যে বিবাহ ভেঙ্গে যায় এবং তা এক তালাকে বাইন হয়ে যায়।[৮৫]

পিতামাতা ও মুরুব্বীদের হক

ইসলামে মানবাধিকারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে পিতামাতার প্রতি সন্তানের যেমন অধিকার রয়েছে, তদ্রূপ সন্তানের প্রতিও রয়েছে পিতামাতার বিশেষ অধিকার। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْاۤ اِلاَّۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ

كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ·

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের 'উফ্' বলো না এবং তাদের ধমক দিবে না, তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩)

এ আয়াতে প্রথম তাওহীদ আল্লাহ্‌কে সর্বতোভাবে এক ও লা-শরীক বলে স্বীকার করার নির্দেশ এবং এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই ইবাদত করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার। এ দু'টো নির্দেশ একসঙ্গে ও পর পর দেওয়ার মানে এই যে, প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও পিতামাতা দু'জনেরই বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহ্। তাই বান্দার উপর সর্বপ্রথম হক তাঁরই ধার্য হবে। কিন্তু আল্লাহ্ যেহেতু এ কাজ সরাসরি নিজে করেন না, করেন পিতামাতার মাধ্যমে, কাজেই বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হকের পরেই পিতামাতার হক ধার্য হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন : মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী পুত্র যখন রহমতের দৃষ্টিতে তার পিতামাতার দিকে তাকায়, তখন আল্লাহ্ তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবূল হজ্জের সাওয়াব লিখিয়ে দেন। সাহাবাগণ আরয করেন, যদি সে প্রতিদিন একশতবার তাকায় ? বললেন : যদি সে ইচ্ছা করে একশতবার তাকাতে পারে। আল্লাহ্ সর্বপেক্ষা বড় এবং পূতপবিত্র।[৮৬]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : ধূলায় অবলুণ্ঠিত হোক তার নাক, ধূলায় অবলুণ্ঠিত হোক তার নাক, ধূলায় অবলুণ্ঠিত হোক তার নাক। জিজ্ঞেস করা হলো, কার হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বললেন : সেই ব্যক্তির যে তার পিতামাতার একজনকে কিংবা উভয়কে বার্ধক্যে উপনীত অবস্থায় পেয়েছে। অতঃপর তাদের খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে লোক পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অনুগত হয় তার জন্যে জান্নাতের দু'টি দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।, একজন হলে একটি দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর কেউ যদি পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নাফরমান হয়ে যায়, তবে তার জন্যে জাহান্নামের দু'টি দরজাই খুলে যাবে, আর একজন হলে একটি দরজা খুলে যাবে। অতঃপর এক সাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পিতামাতা যদি সন্তানের উপর যুলুম করে আর তার ফলে সন্তান যদি তাদের নাফরমানী করে বা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তবুও কি সন্তানকে জাহান্নামে যেতে হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পিতামাতা যদি সন্তানের উপর যুলুমও করে, তবুও তাদের নাফরমানী করলে জাহান্নামে যেতে হবে।

পিতামাতার অধিকার সন্তানের উপর এত বেশি যে, তাঁদের অনুমতি ছাড়া জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যোগদান করা জায়িয নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে জিহাদে যোগদানের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন : তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি ? লোকটি বলল, জ্বি হ্যাঁ, তাঁরা দু'জনই জীবিত আছেন। তখন তিনি বলেন, তাঁদের দু'জনের খিদমতে নিযুক্ত থাক।[৮৭]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর্ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল, আমি আপনার নিকট বায়'আত হওয়ার জন্য এসেছি। আমি আমার পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি। এ কথা শুনে তিনি বলেন : তুমি তাঁদের কাছে চলে যাও এবং তুমি যেভাবে তাঁদের কাঁদিয়ে এসেছ, তেমনি গিয়ে থামাও। আর তিনি তাকে বায়'আত করাতে অস্বীকার করেন।[৮৮]

পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়া ও তাঁদের নাফরমানী করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বড় গুনাহ্। শুধু তাই নয়, যারা তা করে তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হতে থাকে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ـ

তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ এদেরই লা'নত করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২২-২৩)

হযরত আবূ বাক্‌রা (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে যত গুনাহ্ এবং যে কোন গুনাহ্ই ক্ষমা করে দিবেন, তবে পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাঁদের নাফরমানী করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। কেননা এর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই এ দুনিয়ায়ই সত্বর দেওয়া হবে।[৮৯]

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পিতামাতা উভয়েই কষ্ট করেন। তথাপি পিতার তুলনায় মাতার হক অনেক বেশি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম (সা)-এর কাছে এসে বলল, মানুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী ? তিনি বলেন : তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে ? তিনি বলেন : তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে ? তিনি বলেন : তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে ? তিনি বলেন : তোমার পিতা। (মুসলিম)

উপরিউক্ত হাদীসে মায়ের খিদমতের বিষয়টি হয়েছে তিনবার, আর পিতার কথা বলা হয়েছে একবার।

আল্লামা কাযী আয়ায (র) লিখেছেন, অধিকাংশ মনীষীর মতে, সন্তানের কাছে মা পিতার চেয়ে অধিক ভাল ব্যবহার পাওয়ার অধিকারিণী। কাজেই মা ও বাবার হক যখন পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে, যখন একসঙ্গে দু'জনের হক আদায় করা সম্ভব হবে না, তখন মায়ের হকই হবে অগ্রবর্তী।[৯০]

ইসলামে পিতার তুলনায় মাতার গুরুত্ব বেশি হলেও পিতার খিদ্‌মতের গুরুত্বও বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন : পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিহিত।[৯১]

নবী কারীম (সা) বলেন, পিতা জান্নাতের দরজাসমূহের উত্তম দরজা।[৯২]

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ـ

লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতার জন্য। (সূরা বাকারা, ২ : ২১৫)

এ আয়াতে সন্তানের ধন-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পিতামাতার হকের কথা বলা হয়েছে।

এক ব্যক্তি নবী কারীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমার ধন-সম্পদও আছে এবং আছে সন্তান-সন্তুতিও। কিন্তু এমতাবস্থায় আমার পিতা আমার সম্পদ নিতে চায়। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? নবী কারীম (সা) বললেন : তুমি আর তোমার ধন-সম্পদ সবই তোমার পিতার।[৯৩]

আল্লামা শাওকানী (র) বলেছেন, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পিতামাতার জন্যে অর্থ ব্যয় করা সচ্ছল সন্তানের উপর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে আলিমগণের ইজমা-ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৯৪]

পিতামাতার জন্য দু'আ করা সন্তানের অন্যতম কর্তব্য।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পরেই পিতামাতার হক আদায় করা সন্তানের জন্য অপরিহার্য। এমনকি অমুসলিম পিতামাতার সাথেও সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ :

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ

তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ

তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মান্য করো না। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৫)

হযরত আসমা বিন্‌তে আবূ বকর (রা) বলেন, নবী কারীম (সা)-এর জীবদ্দশায় একবার আমার মুশরিক মা তশরীফ আনেন। আমি নবী কারীম (সা)-এর কাছে আরয করলাম, আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছেন। আমি কি তাঁর খিদমত করব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। করতে পার।[৯৫]

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আরো একটি উত্তম উপায় হচ্ছে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা। নবী কারীম (সা) পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মুরুব্বী-আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, সকলের সাথেই সুন্দর ব্যবহার করা কর্তব্য।

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ইসলামের অন্যতম মহান শিক্ষা। তাই বড়দের প্রতি ছোটদের যেমন শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তদ্রূপ ছোটদের প্রতি বড়দের স্নেহশীল হওয়া একান্ত কর্তব্য।

নবী কারীম (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না যে মানুষের প্রতি দয়া করে না।[৯৬]

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন একদা এক বেদুঈন নবী কারীম (সা)-এর খিদ্‌মতে এলো। সে বলল, আপনারা কি শিশুদের চুম্বন করেন ? আমরা তো শিশুদের চুম্বন করি না। নবী কারীম (সা) তখন বললেন : আল্লাহ্ যদি তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি বারণ করার সামর্থ্য রাখি ?[৯৭]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) বলেন নবী কারীম (সা) বলেছেন : দয়ালু ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করেন। অতএব তোমরা বিশ্ববাসীর প্রতি দয়া কর। আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[৯৮]

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন : যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের আদেশ দেয় না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৯৯]

হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন : মু'মিন একে অপরকে ভালবাসার ক্ষেত্রে স্নেহ ও দয়ায় ভরপুর একটি দেহের মতো। যখন তার কোন অঙ্গ কষ্টে পড়ে তখন সমগ্র দেহ যন্ত্রণায় সমানভাবে ভাগী হয়।[১০০]

মোটকথা হল, বড়দের কর্তব্য হল, ছোটদের আদর-স্নেহ করা, আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা, আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। আর ছোটদের কর্তব্য হচ্ছে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের কথা মান্য করা, সালাম দেওয়া এবং বসা থাকলে উঠে তাঁদের বসার ব্যবস্থা করা। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পরকালে বিশেষ সাওয়াব অর্জিত হবে এবং জান্নাত নসীব হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলবী (র), মাআরেফুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩-৪; আমীন ইহ্সান ইসলাহী, তাদাব্বুরে কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬।
২. আল-ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১।
৩. হিদায়া : কিতাবুন নিকাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।
৪. আবূ দাঊদ শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬।
৫. মিশকাত শরীফ, কিতাবুন নিকাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৭।
৬. ইব্ন মাজাহ, পৃ. ১৩৫।
৭. তিরমিযী শরীফ, পৃ. ১২৮।
৮. মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯।
৯. মিশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮।
১০. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৬৮।
১১. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৬৭।
১২. পর্দা কে শরঈ আহকাম।
১৩. আবূ দাঊদ, সূত্র : পর্দা কে শরঈ আহ্কাম, পৃ. ১০।
১৪. মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃ. ১০৯৭ ও ১০৯৮।
১৫. শরী'আতের দৃষ্টিতে পর্দা, পৃ. ৪৮।
১৬. মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃ. ১১৭৭।
১৭. আবূ দাঊদ, আহ্মাদ ও তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৬৯।
১৮. তাবারানী, তারগীব, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৬৯।
১৯. পর্দা কে শরঈ আহ্কাম, পৃ. ১৫-২০।
২০. হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯।
২১. হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯।
২২. আহ্কামুল ইসলাম আক্ল কি নযর মেঁ।

২৩. আল-ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬।
২৪. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৬৮।
২৫. মিশকাত শরীফ, পৃ. ২৬৭।
২৬. আল-ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১-৬২।
২৭. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭।
২৮. জাদীদ ফিকাহী মাসাইল (খুলাসাতুল ফাতাওয়া), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯।
২৯. ফাতাওয়া কাযীখান, কিতাবুন নিকাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬; আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।
৩০. দারা কুত্নী, সূত্র : হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪।
৩১. বাদায়েউস সানায়ে (মিসরীয় সং), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮।
৩২. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৭২।
৩৩. উয়ূনুল আসার, সূত্র : সীরাতুল মুস্তাফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০।
৩৪. সীরাতুল মুস্তাফা (উর্দু) : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলবী।
৩৫. তাবারানীর আল-মু'জাম।
৩৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৫৬৫-৬৬।
৩৭. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
৩৮. প্রাগুক্ত।
৩৯. বুখারী শরীফ।
৪০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত।
৪১. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
৪২. আবূ দাউদ শরীফ।
৪৩. হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল কারাহিয়াত।
৪৪. তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্।
৪৫. বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ।
৪৬. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮১।
৪৭. নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮৩।
৪৮. আবূ নু'আয়ম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮১।
৪৯. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮১।
৫০. তাফসীরে বায়যাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫।
৫১. আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ ও মুসনাদে আহ্মাদ।
৫২. তাফসীরে কুরতুবী।
৫৩. ফাতাওয়ায়ে কাযীখান।
৫৪. মা'আলিমুস সুনান, বযলুল মাজহূদ ও মিরকাত।
৫৫. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮১।
৫৬. ইসলামের পারিবারিক বিধান, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ৫৭-৫৮।
৫৭. বুখারী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮০।
৫৮. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮১।
৫৯. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ২৫০-২৫১।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

৬২. সুবুলুস্ সালাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭।
৬৩. আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১২।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।
৬৫. তাফসীরে কুরতুবী, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ১৪৯।
৬৬. আহকামুল কুরআন, ৩৯তম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
৬৭. মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ২৯২।
৬৮. বাদায়েউস্ সানায়ে, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪।
৬৯. বাদায়েউস্ সানায়ে, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৮।
৭০. বাহরুর রাইক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮; বাদায়েউস্ সানায়ে, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।
৭১. বায়হাকী, কিতাবুস্ সুনান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।
৭২. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫।
৭৩. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬।
৭৪. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৯।
৭৫. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৯।
৭৬. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১২।
৭৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৪।
৭৮. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬।
৭৯. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬।
৮০. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৭।
৮১. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৭।
৮২. মু'আত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (বাংলা অনুবাদ), তালাক অনুচ্ছেদ ১৪, পৃ. ৩৪৬-৩৪৮।
৮৩. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৪।
৮৪. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৫।
৮৫. আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৫-৫১৬।
৮৬. মিশকাত, পৃ. ৫২১।
৮৭. বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহ্মাদ।
৮৮. মুসনাদে আহ্মাদ।
৮৯. মিশকাত, পৃ. ৪২১।
৯০. সুবুলুস সালাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৪।
৯১. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪১৯।
৯২. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২০।
৯৩. ইব্‌ন মাজাহ।
৯৪. নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৭।
৯৫. বুখারী শরীফ।
৯৬. বুখারী শরীফ।
৯৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২১।
৯৮. আবু দাউদ ও তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
৯৯. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
১০০. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২২।

দশম অধ্যায়

সামাজিক জীবন

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক বন্ধন

মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। বিচ্ছিন্ন মানব জীবনের কল্পনা করাও অসম্ভব। সমাজ ছাড়া মানুষ কখনো চলতে পারে না। বস্তুত সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত ব্যাপার।

পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে একা থাকতে দেওয়া হয়নি; বরং মা হাওয়া (আ)-কেও সৃষ্টি করে তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করতে দেওয়া হয়েছিল। হযরত আদম (আ)-এর জোড় সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলেছিলেন :

يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ٠

হে আদম ! তুমি তোমার জোড়সহ জান্নাতে বসবাস কর। (সূরা বাকারা, ২ : ৩৫)

মানব ইতিহাসের শুরুতেই সমাজের মূলভিত্তি পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, যখন তামাদ্দুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি, তখনো মানুষ পরিবারবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বাস করতো। পরবর্তী পর্যায়ে এই পারিবারিক এককসমূহ গোত্রে এবং গোত্রসমূহ সমাজে পরিণত হয়। মানব জাতির আরবী প্রতিশব্দ اَلْاِنْسَانُ আর এর মূলধাতু اُنْسٌ মানে মনের আকর্ষণ, ঝোঁক-প্রবণতা, ভালবাসা, মেলামেশা। অর্থাৎ মানব স্বভাব হলো অন্য মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা—তথা সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। এর দু'টো কারণ দেখা যায়—এক. স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ; দুই. জীবন ধারণের জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন।

'স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ', এর অর্থ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্বজাতির প্রতি বিশেষ অনুরাগের অধিকারী। স্বজাতির সঙ্গসুখে সে আত্মিক ও মানসিক শান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে, স্বজাতির সাথে পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন হলে তার মনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। আর নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘকালীন নির্জনতা তাকে আতংকগ্রস্ত করে তোলে।

জীবন ধারণের জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন, এর অর্থ মানুষের একক ব্যক্তিগত শক্তি একেবারেই সীমাবদ্ধ। অথচ সে তুলনায় তার পার্থিব প্রয়োজন বিপুল ও ব্যাপক। সুতরাং তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তার ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। সেজন্য তাকে সহযোগিতা নিতে হয় অন্য মানুষের। সে অন্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না এক মুহূর্তের জন্যও।

নিজের, নিজ পরিবার-পরিজনের, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা ও কল্যাণ সাধন প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। ইসলামে 'হুকূকুল ইবাদ' তথা অপরের প্রতি কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বস্ততার সাথে 'হুকূকুল ইবাদ' আদায় করা ইসলামী সমাজ জীবন যাপনের অপরিহার্য শর্তবিশেষ। শুধু নিজের বা নিজ পরিবারের আরাম আয়েশ করার অধিকার

কোন মুসলিম দেওয়া হয়নি; বরং তার আনন্দ-বেদনা, সুখানুভূতি ও সম্পদে রয়েছে তার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-দুঃখী মানুষের অংশ ও অধিকার। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ‎.

তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম, ৩০ : ২১)

এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মানুষকে মূলত সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমাজবদ্ধতা মানব-প্রকৃতির এমন একটি চাহিদা যা থেকে শুধু এই পার্থিব জীবনেই নয়; বরং আখিরাতের জীবনেও সে পৃথক থাকতে পারে না। জান্নাতেও মানুষ কেবল তখনই মানসিক স্বস্তি ও পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করবে, যখন সে স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য লাভ করবে।

মানব জীবনের বহুমুখী কার্যক্রম সম্পাদনে প্রয়োজন সমাজের সাথে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক ও বহুবিধ সম্পৃক্ততা। যার যার প্রয়োজন পূরণ ছাড়াও তাদের মাঝে বিরাজ করে এক প্রকার মধুর সম্পর্ক। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা তাই স্বাভাবিক, আবার ধর্মেরও দাবি। অধিকন্তু, আখিরাতের কামিয়াবীর জন্যও আবশ্যক দুনিয়ার জীবনে সুন্দর-সুষ্ঠু সামাজিক বন্ধনের।

কুরআন মজীদের বিধানসমূহ মানব কল্যাণের জন্য এবং মানব সমাজকে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে। এমনকি কুরআনের যেসব আয়াতে ব্যক্তি গঠন ও ব্যক্তি সংশোধন বিষয়াদির উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়; বরং সমাজের সাথে তা সম্পৃক্ত।

সালাত, যাকাত ও হজ্জ সহ যাবতীয় মৌলিক ইবাদত যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সমাজ-জীবনই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। সালাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুক্ন এই সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করাই শরী'আতের বিধান। ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদত যাকাত, যা সমাজের ধনীদের থেকে সংগ্রহ করে গরীব-অসহায়দের মাঝে বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের আরেকটি স্তম্ভ হজ্জ আদায় করা এবং হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা একা কোন ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয় ব্যাপার।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে :

لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْا تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ‎.

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার পরস্পরকে ভালবাসতে না পারা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের খবর দেব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে সক্ষম হবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে।

এই হাদীসে দেখা যায়, বেহেশ্তী হওয়ার জন্য ঈমানদার হওয়া শর্ত, আবার ঈমানদার হওয়ার জন্য সামাজিক সৌহার্দ্য থাকা অপরিহার্য। আল্লামা ইব্ন খালদূন (র) বলেন, একসাথে মিলেমিশে থাকা মানুষের জন্য অপরিহার্য। এ সত্যটিকেই পণ্ডিত ব্যক্তি ও জ্ঞানীগণ এভাবে বিবৃত করে থাকেন যে, 'জন্মগতভাবেই মানুষ সামাজিক জীব।' (মুকদ্দমায়ে ইব্ন খালদূন)

দার্শনিক এরিস্টটল বলেছিলেন, 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক জীব। যে লোক সমাজ-সভ্য নয়, সে হয়ত দেবতা নয়ত পশু।' কথাটি সর্বজন স্বীকৃত।

সামাজিক বন্ধনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

ইসলামে সামাজিক বন্ধনের গুরুত্বের প্রতি দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত ইসলাম যেহেতু কিয়ামাত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, সেহেতু এতে মানুষের যথার্থ কল্যাণের সার্বিক বিধানাবলী বিবৃত হয়েছে। সমাজত্যাগী জীবন মূলত ইসলামী জীবন নয়। আল-কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে :

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ـ

আর বৈরাগ্যবাদ তো তাদেরই আবিষ্কৃত, আমি তো তাদের এ বিধান দেইনি! (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৭)

হাদীস শরীফে কথাটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

لاَ رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلاَمِ ـ

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই।

ইসলাম নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকে বিশেষ মৌলিক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক ও মূলবাণী ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই। ব্যক্তি একাই দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে। আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা ব্যক্তিরই দায়িত্ব। আর দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ তাকেই দিতে হবে। কিন্তু ইসলাম এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, মানুষ যে পথে চললে জীবনের সফলতা লাভ করতে পারে, তা সমাজকে পাশ কাটিয়ে নয়; বরং একটি সুসংগঠিত, সুষ্ঠু সমাজ-জীবন-যাপনের মাধ্যমেই তাকে সাফল্যের চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছতে হবে। আল-কুরআনের নির্দেশ হলো :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا ـ

তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২)

ইসলাম একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। ইরশাদ হয়েছে :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ـ

এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে গড়েছি, যাতে করে তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষ্যদানকারী হতে পার। (সূরা বাকারা, ২ : ১৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

তোমরা উত্তম জাতি, মানুষের (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে আর বিরত রাখবে মন্দকাজ থেকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১০)

পৃথিবীর মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা, মানুষের মঙ্গলের জন্যে ভাল কাজের প্রতিষ্ঠা ও মন্দকাজের প্রতিরোধ করা, সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া আর দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র বিধান বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মানব জাতির সত্যিকার কল্যাণ সাধন করাই ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্য। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সুষ্ঠু পরিবেশ কায়েম হয় না। তাছাড়া সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা ও বিরত রাখা ইসলামী সমাজেরই একটি বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সমাজে মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড হচ্ছে তাক্‌ওয়া। তাকওয়ামূলক কাজে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হওয়া ও পরস্পরের সাহায্য-সহানুভূতি থাকা সে সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

ইয়াতীম, দুঃস্থ ও মযলূম মানুষের প্রতি কর্তব্য

ইসলামী জীবন বিধানে মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ۔

মু'মিনগণ একে অন্যের ভাই। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

كُلُّ مُسْلِمٍ اِخْوَةٌ ۔

প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই।

তিনি আরও বলেছেন :

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ ۔

সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিজন। আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় সৃষ্টি হলো যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে।

ইসলাম সকল মানুষের সাথে সদাচারের শিক্ষা দেয়। বিশেষ করে সমাজের ইয়াতীম, দুঃস্থ, অসহায় ও মযলূম মানুষকে সহায়তা দানের প্রতি ইসলাম অধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সমাজের সকল মানুষকে ইয়াতীম, দুঃস্থ ও মযলূম মানুষের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্নভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। ইয়াতীমের হক্ আদায় না করা ও মিসকীনদের খাবার না দেওয়ার প্রতি ভর্ৎসনা করে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۔

তুমি কি এমন লোককে দেখেছ, যে দীনকে অস্বীকার করে ? সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর সে মিস্‌কীনদের খাবারদানে মানুষকে উৎসাহিত করে না। (সূরা মাউন, ১০৭ : ১-৩)

আল-কুরআনে ইয়াতীমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

كَلاَّ بَلْ لاَ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ وَلاَ تَحٰضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ٠

কখনও এরূপ নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমের সম্মান কর না, আর মিসকীনদের খাদ্যদানে উৎসাহিত কর না। (সূরা ফাজর, ৮৯ : ১৭-১৮)

ইয়াতীমদের সম্মান না করার অর্থ তাদের প্রাপ্য আদায় না করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন না করা।

যারা দুনিয়ার জীবনে ইয়াতীম, মিস্‌কীন ও বন্দিদের উপকার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আখিরাতে জান্নাত ও জান্নাতের বহু নিয়ামত দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ইয়াতীম ও মিস্‌কীনদের প্রতি সহায়তা দান জান্নাতী মানুষের স্বভাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ٠

তারা দুনিয়ার জীবনে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি নিজেদের প্রয়োজন আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিস্‌কীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদের আহার প্রদান করে। (সূরা দাহ্‌র, ৭৬ : ৮)

ইসলাম অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। প্রত্যেক মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয় পরস্পরকে ভালবাসতে। অন্তত কেউ যেন অন্যকে কোনভাবে কষ্ট না দেয় এবং কারো প্রতি যুলুম-অত্যাচার না করে, সেই মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলে। আল-কুরআন আজকের মুসলিম উম্মাহ্‌কে লক্ষ্য করে বলেছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ٠

তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি! তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১১০)

মুসলমানগণ আবির্ভূত হয়েছে সকল মানুষের সঠিক ও প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য। এ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক দায়িত্ব। আর প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিগত পর্যায়েও মানুষের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করবে। কমপক্ষে অন্তত কেউ যেন কষ্ট না পায়; অথবা কারো প্রতি যেন কোন যুলুম না হয়, তার প্রতি সচেতন থাকা মুসলিমমাত্রেরই কর্তব্য।

মযলূমকে সাহায্য করা এবং যালিমকে বাধা দেওয়া ঈমানী দায়িত্ব। কোন মুসলিম যদি এর বিপরীত করে অর্থাৎ মযলূমকে যালিমের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা না করে, অথবা যালিমকে বাধা না দেয়; তবে সে ব্যক্তি ইসলামের অবারিত নি'আমত থেকে বঞ্চিত হবে। হযরত আউস ইব্‌ন শুরাহ্‌বীল (রা) থেকে এক হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ ٠

যে ব্যক্তি যালিমের সাথে থেকে শক্তি যোগায় অথচ তার জানা আছে যে, লোকটি যালিম; তবে সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।[১]

নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন :

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا ٠

তুমি তোমার মু'মিন ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালিম হোক অথবা হোক মযলূম।

উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম যালিমকে সাহায্য করার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলে, নবী কারীম (সা) বলেন, যালিমকে যুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।[২]

বস্তুত ইসলাম মানব সমাজে যুলুম-অত্যাচার বন্ধের কার্যকর বিধান দিয়েছে। এর অনুকরণ আমাদের সকলের জন্য কর্তব্য।

সমাজের প্রবীণদের কাছে নবীনদের জানার ও শিক্ষা নেয়ার অনেক কিছু থাকে। প্রবীণদের কাছ থেকে তারা ঈমান-আমলসহ জাতীয় পরিচিতি, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে। পক্ষান্তরে, প্রবীণরা নবীনদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই ছোটদের উচিত বড়দের সম্মান করা ও তাদের কথা মেনে চলা। জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের সার্বিক উন্নতির জন্য ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অপরিহার্য।

রাব্বুল আলামীন সন্তান-সন্তুতির শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা শিক্ষাদানে ও চরিত্র গঠনে পিতামাতা ও অভিভাবকদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ছোটরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বড়দের থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হাসিল করে থাকে। একটি সমাজ সুন্দর-সুখী হয়ে গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন ঐ সমাজের ছোটদের প্রতি বড়দের মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালবাসা রাখা এবং ছোটরাও বড়দের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান করা। নবী কারীম (সা) বলেছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا ·

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না আর আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৩]

কোমলমতি বালক-বালিকারা অনুকরণপ্রিয়। বড়দের তারা যে যে কাজ করতে দেখে নিজেরাও তা করতে অভ্যস্ত হয়। কাজেই ছোটদের উন্নত চরিত্র ও সুষ্ঠু মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা এবং তাদের সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করার ব্যাপারে বড়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পক্ষান্তরে, বড়দের আদেশ মেনে নিয়ে জীবন পরিচালনা করা ও তাদের যথাযথ সম্মান দেখানো ছোটদের কর্তব্য। বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করা উচিত। পক্ষান্তরে বড়দের দায়িত্ব হল ছোটদের ভুলক্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া এবং আন্তরিকতা সহকারে তাদের চরিত্র গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

মুসলমানগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ

ইসলাম সকল মানুষের সাথে সুসম্পর্ক ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ·

প্রত্যেক মুসলিম ভাই ভাই। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১০)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيَشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِأٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ·

মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার প্রতি অত্যাচার করবে না। তিনি বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, তাক্ওয়া এখানে। নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করা অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম।[৪]

কোন মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট ও সংকট নিরসনে এগিয়ে গেলে আল্লাহ্ তার বিপদ সংকটে সাহায্য করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَاءَ نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَهُ عَلٰى مُعَسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ ـ

যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ তার কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ্ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ্ দুনিয়া-আখিরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।[৫]

একজন মু'মিন নিজের জন্যে যা পসন্দ করে অন্যের জন্যও তা-ই পসন্দ করবে। নবী কারীম (সা) বলেছেন :

لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ـ

কোন লোকই মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ করবে যা তার নিজের জন্য পসন্দ করে।[৬]

তিন দিনের বেশি মুসলিম ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلٰثَ لَيَالٍ ـ

কোন মুসলিমের জন্য জায়িয নেই যে, সে তার কোন মু'মিন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকে।[৭]

কোন কারণে মুসলমানদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটলেও তা যেন তিন দিনের বেশি স্থায়ী না হয়। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি প্রথমে রাগ প্রশমিত করে মিলনের হাত প্রসারিত করবে, আল্লাহ্র নবী (সা) তাকে উত্তম ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রতিবেশীর সাথে আচরণ

প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের চাইতেও অধিক কাজে আসে। আত্মীয়-স্বজন তো সবাই কাছে থাকে না। প্রতিবেশীরাই বিপদে-আপদে, দুঃখ-দুর্দশায় প্রথমে এগিয়ে আসে। বিপদের সময় প্রতিবেশীরা খোঁজ-খবর নেয় ও সেবাযত্ন করে থাকে। বিয়ে-শাদী এবং অনুরূপ সামাজিক কাজকর্মে প্রতিবেশীর ভূমিকা থাকে উল্লেখযোগ্য। কুরআন মজীদে সকল প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সদাচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ·

নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা নিসা, ৪ : ৩৬)

হাদীস শরীফে 'হক্' বা অধিকার অনুসারে প্রতিবেশীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—

১. এক হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী—যারা আত্মীয় নয়, মুসলিমও নয়।

২. দুই হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী—যারা আত্মীয় নয়, কিন্তু মুসলিম।

৩. তিন হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী—যারা আত্মীয় ও মুসলিম।[৮]

প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকা, তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ্ সকল প্রকারের ও সকল পর্যায়ের প্রতিবেশীর সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ঈমানের পরিপন্থী কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُوْذُجَارَهُ ·

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। (মিশকাত)

তিনি আরও বলেছেন :

وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ لاَ يَاْمَنُ جَارُهُ بِوَائِقِهِ ·

আল্লাহ্র কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল ! কে সেই ব্যক্তি ? জবাবে তিনি বললেন : যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। (মিশকাত)

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের কোন প্রকার কষ্ট-যন্ত্রণা না দেওয়া, তাদের উপকার করা, গরীব প্রতিবেশীকে দান করা এবং অভুক্ত প্রতিবেশীকে খাবার দেওয়া প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। নবী কারীম (সা) বলেছেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ ·

ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তিসহকারে খানা খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে পড়ে থাকে অভুক্ত অবস্থায়।[৯]

প্রতিবেশীর হক্ সম্পর্কে আল্লাহ্র নবী (সা) মু'মিনদের দয়া প্রদর্শনের তাগিদ দিয়েছেন। এমন কি সামর্থ্যানুসারে তাদের জন্যও কিছু অংশ নির্ধারণ করার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি হুকুম করেছেন :

اِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَاكْثِرْ مَائَهَا وَتَهَدْ جِيْرَانَكَ ·

যখন তুমি তরকারি পাকাবে তখন তাতে কিছু পানি অতিরিক্ত দিবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে।[১০]

মহানবী (সা) বলেছেন :

مَازَلَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

জিব্রাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে (এত বেশি) তাকিদ দিচ্ছেলেন, আমার মনে হচ্ছিল তিনি তাদেরকে আমার ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।[১১]

প্রতিবেশী যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের এবং যে কোন আদর্শের অনুসারীই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি ইসলাম প্রত্যেক মু'মিনকে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামেরই শিক্ষা। আল্লাহ্‌র বান্দাদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সকল প্রতিবেশীর সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ ঈমানদারগণের ঈমানের দাবি।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা

পৃথিবীর মানুষ জন্মসূত্রে ও বৈবাহিক সূত্রে পরস্পরের আত্মীয়। মাতাপিতার হক আদায় করার পর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখা ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। ইসলামী জীবন বিধানে আত্মীয়তার হক আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ ·

আত্মীয়দের হক্ আদায় কর। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬)

আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদের সম্পর্কে বলেন :

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى ·

তারা ধন-সম্পদের প্রতি নিজেদের প্রয়োজন ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনদের দান করে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৭৭)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা ঈমানদারের ঈমানের দাবি। আত্মীয়তা ছিন্ন করা মুসলিম সমাজের জন্য চরম ক্ষতিকর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ·

কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সাক্ষাত পরিত্যাগ করে থাকা হালাল নয়। কেউ যদি তিন দিনের বেশি ভাইয়ের সাক্ষাত ত্যাগ করে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।[১২]

ভাই বলতে সহোদর, বৈমাত্রেয় এবং মুসলিম ভাই সবাইকে বুঝায়। তিন দিনের বেশি সময় সম্পর্ক বিচ্ছেদ অবস্থায় থাকা জায়িয নয়। কখনো কোন কারণে মনোমালিন্য হলে সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত রাগ থাকতে পারে। তিন দিনের মধ্যে মু'মিনগণের পরস্পরের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেবে। সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় রাখার ক্ষেত্রে ইসলামের কী চমৎকার ব্যবস্থা।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীতে ইসলামই নারীদের অধিকার সত্যিকারভাবে নিশ্চিত করেছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণতা দানকারী আখিরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পূর্ব পর্যন্ত নারীকে তুচ্ছ মনে করা হতো। এমনকি নারীদের আত্মা আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা হতো। আজকের পৃথিবীতে এখনও কোন কোন সমাজে নারীর উত্তরাধিকারিত্বের স্বীকৃতি নেই।

জাহেলী যুগের সমাজচিত্র অবলোকন করলে ইসলামী সমাজ ও অনৈসলামী সমাজে নারীর অধিকার সম্পর্কিত পার্থক্য ধরা পড়ে। কন্যা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবরে ওদের মনমানসিকতা হয়ে যেতো ভারাক্রান্ত, চেহারা হয়ে পড়তো বিবর্ণ। আল-কুরআনে সেই চিত্রের বর্ণনা রয়েছে এভাবে :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ .

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ দেয়া হতো, তখন তার চেহারা হয়ে যেতো কাল, আর সে হয়ে পড়তো ক্লিষ্ট মানসিকতাসম্পন্ন। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৫৮)

কন্যা সন্তানের বাঁচার অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, এমনকি সার্বিক মানবিক অধিকার ইসলামই প্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি কন্যা সন্তানের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তার যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার উপর ন্যাস্ত থাকে। বিয়ের সাথে সাথে সেই দায়িত্ব অর্পিত হয় স্বামীর উপর। অধিকন্তু মোহরানা স্বরূপ প্রাপ্ত সম্পদের তো প্রথম দিনেই সে মালিক হয়ে যায়।

এই সম্পদে স্বামীর বা অন্য কারো মালিকানা নেই। আবার স্ত্রীর আয়-উপার্জনের সমস্ত অর্থ তার নিজের, তাতে স্বামীর মালিকানা থাকবে না। অন্যদিকে নারীগণ ওয়ারিস সূত্রে পিতা, মাতা, স্বামী, ভাই সবাইর সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে। এভাবে ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

নারীর সার্বিক অধিকার সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশ হলো :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

তাদেরও তেমনই অধিকার আছে, যেমন তোমাদের আছে তাদের উপর। (সূরা বাকারা, ২ : ২২৮)

অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে। অবশ্য সৃষ্টিগত পার্থক্যের কারণে উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যে রয়েছে তারতম্য। এ তারতম্য নিরূপিত হয়েছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৌশল ও দুনিয়ার জীবনের শৃংখলা ও ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে। কর্তৃত্বের এতটুকু তারতম্য না থাকলে বিশ্বশান্তি ব্যাহত হতো আর দুনিয়ার শৃংখলা হয়ে পড়তো লণ্ডভণ্ড। কুরআনে সেই তারতম্যের কথা বলা হয়েছে এভাবে :

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .

আর পুরুষদের জন্য রয়েছে নারীদের উপর মর্যাদা। (সূরা বাকারা, ২ : ২২৮)

এ হচ্ছে কর্তৃত্বের পার্থক্য বা সার্বিক কর্মপরিচালনার তারতম্যভিত্তিক মর্যাদা।

তারপরও কতিপয় বিশেষ পর্যায়ে ইসলামী শরী'আত নারীর মর্যাদার ঘোষণা করেছে। নবী কারীম (সা) বলেছেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِه ٠

তোমাদের মধ্যে উত্তম তারা, যারা নিজেদের স্ত্রীদের জন্য উত্তম।[১৩]

স্ত্রীদের সাথে সদাচার ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ٠

তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবন যাপন করবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১৯)

অধীনস্থদের প্রতি সদ্ব্যবহার

পৃথিবীতে কোন মানুষ তার সকল কাজ একা আঞ্জাম দিতে পারে না, বিশেষত এই জটিল শিল্পায়নের যুগে জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। বিভিন্ন স্তরে এক ব্যক্তির অধীনে একাধিক ব্যক্তি কাজকর্ম আঞ্জাম দিয়ে থাকে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সকল দায়িত্বশীল ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের উপর কোন প্রকার যুলুম-অত্যাচার না হয়।

ইসলামী জীবন বিধানে মর্যাদার পার্থক্য হয় কেবল তাক্ওয়ার ভিত্তিতে। তাই উর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তা নিম্ন পদস্থদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম ও বেইনসাফী করতে পারবে না।

আজকের সমাজে ক্রীতদাস প্রথা নেই সত্য, তবে অধীনস্থদের প্রতি যুলুম-অত্যাচার চলতে থাকে বিভিন্নভাবে। তাই নবী কারীম (সা)-এর নির্দেশ এ যুগের সকল প্রকার শ্রমিক ও অধীনস্থদের বেলায়ও একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

هُمْ اَخُ لَكُمْ جَعَلَ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدِه فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَالْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْ عَلَيْه ٠

তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ্ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিত তাকে তাই খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরে থাকে। আর তাকে এমন কর্মভার দিবে না, যা তার সাধ্যাতীত। যদি কখনো তার উপর অধিক কর্মভার চাপানো হয় তবে যেন তাকে সাহায্য করে।[১৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদেম হযরত আনাস (রা)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমার সম্পর্কে কখনো 'উহ্' শব্দটি বলেননি এবং কোন দিন বলেননি, এটা করো নি কেন ? ওটা করো নি কেন ? আমার বহু কাজ তিনি নিজে করে দিতেন। (মিশকাত)

হযরত উমর (রা) জেরুজালেম সফরে উটে চড়া ও উট টেনে নেয়ার ব্যাপারে সাম্য ও মানবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের ও ভৃত্যের মধ্যে পালাক্রম ঠিক করে। এর নযীর ইতিহাসে বিরল।

একজন ভৃত্যকে দৈনিক কয়বার ক্ষমা করা যেতে পারে ? বিদায় হজ্জে এ প্রশ্নের জবাবে নবীয়ে রহমত (সা) ঘোষণা করেছিলেন : فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً প্রত্যহ সত্তরবার।

সহাবস্থান ও সম্প্রীতি

সমাজে বসবাসকারী মানুষের সাথে সহাবস্থান করে পরস্পর সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকলের সাথে সমঝোতা ও সুসম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন :

لَاخَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۔

তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি মহা পুরস্কার দিব। (সূরা নিসা, ৪ : ১১৪)

এ আয়াতে তিনটি কাজকে উত্তম বলে অভিহিত করা হয়েছে, ১. দান-খয়রাত, ২. সৎ কাজ, ৩. পারস্পরিক শান্তি স্থাপন। শেষোক্তটি আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকলে সমাজে শান্তিতে বসবাস করা যায় না। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের বিষয়টি 'আম্র বিল মারূফ'-এর অন্তর্ভুক্ত হলেও গুরুত্ব বুঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য যারা চেষ্টা-তদ্‌বীর করবে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে বিরাট পুরস্কার। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (সা) বলেন : 'তোমরা মুসলিমগণকে পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে, তা হলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর ও নিদ্রাহীনতা সহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে।'[১৫]

এরূপ সম্পর্ক মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার যে কোন স্থানের ও যে কোন বর্ণের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও একাত্ববোধ বিরাজমান থাকা বাঞ্ছনীয়। মুসলমানগণ যদি বিচ্ছিন্ন থাকে তবে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শত্রু তাদের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। মোটকথা পারস্পরিক দৃঢ় সম্পর্ক ও একাত্ববোধের মধ্যে মুসলমানদের শক্তি নিহিত রয়েছে।

পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি

সহাবস্থান ও সম্প্রীতি শুরু হয় পরিবার থেকে। যে পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও সহানুভূতিশীল, সেই পরিবারে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী মিলিত হয়ে একটি পরিবার গঠন করে। সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য এদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষ সহাবস্থান করা সম্ভব হবে না এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতিও গড়ে উঠবে না।

মানুষ হিসাবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কিছু দোষত্রুটি থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে সৎভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছে :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا .

তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে; তোমরা যদি তাদেরকে অপসন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপসন্দ করছো। (সূরা নিসা, ৪ : ১৯)

পারস্পরিক সহাবস্থানের জন্য আল-কুরআনের এ আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অন্যের ছোট-খাট দোষত্রুটি উপেক্ষা করাই কল্যাণকর।

একজন নারী স্বামীগৃহে এসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখতে পান। নিজের পিতামাতা ও ভাইবোনকে ছেড়ে এসে তাকে এখানে নতুন করে শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদের সাথে সম্পর্ক গড়তে হয়। এ অপরিচিত মানুষগুলোর মেজাজ-মর্জি তাকে জানতে ও বুঝতে হয়। অপর পক্ষে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকে ভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত নতুন সদস্যকে সাদরে গ্রহণ করতে হয়। পারিবারিক সমঝোতার খাতিরে আগন্তুকের ছোট-খাট ভুলত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখতে হয়। উভয় পক্ষ থেকে কিছু ছাড় না দিলে ভবিষ্যতে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি ছেলেমেয়েরা কেমন ব্যবহার করবে আল-কুরআন তা শিক্ষা দেয়। অক্ষম অবস্থায় পিতামাতাকে পরিবারের বোঝা মনে না করে তাদের সাথে সদয় ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا .

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উহ্' বলবে না এবং তাদেরকে ধমকও দিবে না। তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩-২৪)

প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক

সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে সহাবস্থান করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। একটি আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো সেখানকার লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, একে অন্যের কল্যাণ কামনা করবে, আপদে-বিপদে পরস্পর সাহায্য করবে এবং সুখ-দুঃখের

ভাগী হবে। পাশাপাশি বসবাস করতে গেলে অনেক সময় প্রতিবেশীর সাথে ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে। কিন্তু এগুলোকে স্থায়ীভাবে মনে না রেখে প্রতিবেশীর ছোট-খাট ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۙ

তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে। (সূরা নিসা, ৪ : ৩৬)

উক্ত আয়াতে পিতামাতা সহ আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিজেকে বড় ও প্রতিবেশীকে ছোট মনে করলে এবং প্রতিবেশীর স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখলে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব রাখা সম্ভব নয়। এ জন্য দাম্ভিকতা ও অহংকার পরিত্যাগ করে প্রতিবেশীর সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে বলা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্র শপথ, সে মু'মিন নয়, আল্লাহ্র শপথ, সে মু'মিন নয়, আল্লাহ্র শপথ, সে মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে সে ব্যক্তি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।[১৬]

সামাজিক সহাবস্থান

মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যকে একে অন্যের সাথে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অভাব পূরণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোন বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।[১৭]

এই হাদীসে মুসলিম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সম্পর্ক হবে এক ভাইয়ের সাথে অন্য ভাইয়ের সম্পর্কের মত। একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের প্রয়োজন পূরণ করবে। বিপদে আপদে সাহায্য করবে এবং কেউ কারো প্রতি যুলুম নির্যাতন করবে না। এভাবে মুসলমানকে অন্য মুসলমানের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করে সহাবস্থান করার জন্য নবী কারীম (সা) নির্দেশ দিয়েছেন।

অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থান

ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম বাস করে, তাদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। মুসলমানদের মত তারাও নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : 'মনে রেখ, যে ব্যক্তি কোন মু'আহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানি করে অথবা তার কোন সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তা হলে কিয়ামাতের দিন আমি তার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করবো।'[১৮]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্র নবী (সা) অমুসলিম নাগরিকদের উপর অত্যাচার করা এবং মাল-সম্পদ কেড়ে নেওয়াকে কত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। অমুসলিমদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না, তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে।

এমনকি কোন অমুসলিম রাষ্ট্র সেখানকার মুসলিম নাগরিকদের উপর যতই অবিচার অত্যাচার করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তার কোন অমুসলিম নাগরিকের প্রতি প্রতিশোধ নিতে পারবে না। সারকথা, বর্তমান মুসলিম সমাজে যে বিবাদ-বিসংবাদ ও কলহ-দ্বন্দ্ব চলছে, তা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রতিটি মুসলমানকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে সামাজিক সম্প্রীতি অর্জন করতে হবে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করতে হবে। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে সবাইকে বসবাস করতে হবে।

আদর্শ সমাজ গঠনে ঐক্যের গুরুত্ব

আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাতীয় ঐক্যের উপর ইসলাম প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۔

তোমরা সবাই আল্লাহ্র রজ্জু (কুরআন) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৩)

এ আয়াতে ঐক্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সাথে সাথে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۔

তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আনফাল, ৮ : ৪৬)

এ আয়াতের আলোকে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদ পরিহার করে ঐক্যবদ্ধভাবে ধৈর্যধারণ করে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।

আদর্শ সমাজ :

আদর্শ সমাজ বলতে এমন সমাজকে বুঝায়, যেখানে নাগরিকবৃন্দ আল্লাহ্র প্রতি প্রগাঢ় ঈমান এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সৎকাজে উদ্যোগী হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এরূপ দ্বন্দ্ব-কলহ, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাবী, হিংসা-বিদ্বেষ,

পরনিন্দা, অভাব-অভিযোগ ও অপসংস্কৃতি থাকবে না। মানুষ পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে। একে অন্যের বিপদে-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং সুখে-দুঃখে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করবে, সব মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে। আদর্শ সমাজে উপরিউক্ত নেতিবাচক দিকগুলো সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো সর্বোচ্চ স্তরে পরিলক্ষিত হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে চুরি-ডাকাতি, খুনখারাবী সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছিল এবং মুসলমানদের মানবীয় গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। এরূপ সমাজ গড়তে হলে সমাজের সদস্যবৃন্দকে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রশিকে মজবূতভাবে ধরে রাখতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া দীন বা জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।

ঐক্যের ভিত্তি

ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন মত পোষণ করে। সাধারণত বংশ, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদিকে ঐক্যের ভিত্তি মনে করা হয়ে থাকে।

কিন্তু ইসলাম ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছে—

ক. এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য,

খ. আল্লাহ্র রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ,

গ. কুরআন ও সুন্নাহ্কে জীবন পথের একমাত্র দিশারী হিসাবে গ্রহণ।

মুসলমান যে ভাষায় কথা বলুক, বংশ বা বর্ণে যতই পার্থক্য থাকুক, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার একমাত্র ইলাহ্। কোন অবস্থাতেই সে এই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয় না। এই বিশ্বাস বা ঈমান সকল মুসলমানের ঐক্যের প্রথম ভিত্তি।

মুসলমানের ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শের অনুসরণ। তিনি আল্লাহ্র বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, কলহরত একটা জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এক আল্লাহ্র দাসে পরিণত করেছেন। সমগ্র মানব জাতির জন্য তিনিই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ। অতএব আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা সব মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

ঐক্যের আরেকটি ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ্। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যার বিশ্বাস রয়েছে, তাকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ্কে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে হবে। আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমেই আমরা তা পেয়েছি। মহানবী (সা)-এর উপর যেভাবে কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছিল, আজও ঠিক সেইভাবে বিদ্যমান। একতাবদ্ধ হওয়ার মূলনীতি হিসাবে কুরআন শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ·

মু'মিনগণ একে অন্যের ভাই। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১০)

সুতরাং বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চল মানুষের মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করে না। পার্থক্যের একমাত্র মাপকাঠি হলো আদর্শ। যেহেতু সব মুসলমান এক আদর্শে বিশ্বাসী, এক আল্লাহ্র অনুগত, এক রাসূল (সা) এবং এক কুরআনের অনুসারী, সেহেতু তারা পরস্পর ভাই ভাই এবং এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তাদের ঐক্যের ভিত্তি।

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপায়

পারিবারিক হিংসা-বিদ্বেষ, কুৎসা রটনা ও শত্রতামূলক আচরণ ইত্যাদি ঐক্য বিনষ্টকারী দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে কথায় ও ব্যবহারে সম্প্রীতিমূলক আচরণ করতে হবে। তাহলে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এরপর ঐক্য সৃষ্টির জন্য আরো কিছু কাজ করতে হবে। যেমন :

সংঘবদ্ধ হওয়া—ইসলাম সংঘবদ্ধ যিন্দেগীর উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তিন ব্যক্তি যদি সফরে থাকে তারা যেন তাদের একজনকে আমীর (নেতা) বানিয়ে নেয়।[১৯]

ইসলাম দৈনিক পাঁচবার জামা'আতে নামায ও শুক্রবারে জুমু'আর নামায জামা'আতে আদয়ের বিধান দিয়েছে। হজ্জের মাধ্যমে বাৎসরিক বিশ্ব জামা'আতের ব্যবস্থা রেখেছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, মুসলমানকে একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে হবে।

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা—এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে বিপদে-আপদে সাহায্য করবে। এ সাহায্য যে কোন ধরনের দীনি ও দুনিয়াবী বৈধ প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে হতে পারে। রাসূলে কারীম (সা) বলেন : আল্লাহ্ তাঁর বান্দার সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।[২০]

পরস্পর সদুপদেশ দান—প্রত্যেক মুসলমান নিজে নেক আমল করার সাথে সাথে অপর মুসলমান ভাইয়ের কাজকর্মের প্রতি নজর রাখবে এবং তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেখলে উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : এক মু'মিন অন্য মু'মিনের আয়না স্বরূপ এবং এক মু'মিন অন্য মু'মিনের ভাই। সে তার ভাইকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং পিছন থেকে তাকে হিফাযত করে।[২১]

এরূপ উপদেশদানের মধ্যে কল্যাণ কামনা, সহানুভূতি ও ভালবাসার মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। যাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সে যেন মানসিকভাবে আহত না হয়।

সালাম আদান-প্রদান ও দু'আ করা

সালাম আদান-প্রদানের রীতি মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক উত্তম উপায়। এর মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের জন্য দু'আ করা এবং মনের মিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যখন তোমাদের কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। তবে সালামের মধ্যে অপর ভাইয়ের শান্তির জন্য দু'আ ও শুভাকাঙ্ক্ষার মনোভাব থাকতে হবে।

আপোস মীমাংসা

কোন কারণবশত দু'জন বা দু'দল মুসলমানের মধ্যে কলহ-বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসা করে দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : 'নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।' (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১০)

এমনকি এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রমকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে কলহ-দ্বন্দ্ব মিটিয়ে সমাজে ঐক্য স্থাপন করার জন্য বারবার তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তৌফিক চাওয়া

সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট দু'আ চাইতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি করে দিতে পারেন।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : 'তিনি তাদের অন্তরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আনফাল, ৮ : ৬৩)

নবী কারীম (সা) মানুষের নৈতিক গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে তদানীন্তন সমাজের চেহারা পাল্টে দিয়েছিলেন। দ্বন্দ্ব-কলহ ছিল যাদের নিত্য দিনের সঙ্গী, সামান্য কারণে যারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো, তাদের তিনি একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি আদর্শ সমাজ গড়েছিলেন। এই অসাধারণ কাজের জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল মানুষের মনের মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি অবিচল আস্থা সৃষ্টি এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী চরিত্র গঠন।

অতএব একটি সুসংবদ্ধ আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

হাদিয়া আদান-প্রদান

ভালবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্যদের যে উপহার ও উপঢৌকন আদান প্রদান করা হয়, তাকে 'হাদিয়া' বলা হয়। নবী কারীম (সা) বলেন : 'একে অন্যকে হাদিয়া দিবে, হাদিয়া অন্তরের কলুষ দূর করে। এক পড়শি অপর পড়শিকে হাদিয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ যেন সামান্য মনে না করে, যদিও তা এক টুক্‌রা বকরীর খুরও হয়।'[২২] রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে হাদিয়া দিতেন এবং সাহাবীগণও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাদিয়া দিতেন।

কেউ হাদিয়া দিলে তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর হয়। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : 'যাকে দান করা হয়েছে তার সামর্থ্য থাকলে সে যেন এর প্রতিদান দেয়, আর যার সামর্থ্য নাই, সে যেন প্রশংসা করে। কেননা যে প্রশংসা করল সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, আর যে তা গোপন করে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।'[২৩]

হাদিয়ার প্রতিদানে সমপরিমাণের জিনিস হতে হবে এমন কোন কথা নেই, বরং নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিদান দিতে চেষ্টা করা উচিত। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া আদান প্রদান করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সহধর্মিণীগণকে হাদিয়া দিতেন। প্রকৃতপক্ষে হাদিয়া দাম্পত্য জীবনে আন্তরিকতা বৃদ্ধির এক মূল্যবান উপাদান। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয় এবং মনের গ্লানি দূর হয়ে যায়।

কেউ হাদিয়া দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়, কেননা তাতে হাদিয়াদাতার মনে কষ্ট হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : 'যাকে সুগন্ধি দান করা হয়, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা এটি হাল্‌কা জিনিস অথচ সুগন্ধযুক্ত।'[২৪]

হাদিয়া সামান্য হলেও তা ফিরিয়ে না দিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা উচিত। অনুরূপভাবে হাদিয়া দেওয়ার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া শোভনীয় নয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : 'যে দান করে তা প্রত্যাহার করে নেয়, তার দৃষ্টান্ত এমন কুকুরের মত যে বমি করে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করে নেয়।'[২৫]

নবী কারীম (সা)-এর জীবন থেকে হাদিয়ার ব্যাপারে যে দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়, তা হলো :

ক. হাদিয়া নিজ সামর্থ্যানুযায়ী দেওয়া উচিত (এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো দাতার আন্তরিকতা ও ভালবাসা, প্রদত্ত বস্তুর মূল্য নয়)।

খ. হাদিয়া যাই হোক না কেন, তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

গ. হাদিয়ার পরিবর্তে হাদিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

ঘ. হাদিয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পসন্দীয় বস্তুর মধ্যে খুশবু ছিল অন্যতম।

ঙ. হাদিয়া দেওয়ার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া অশোভনীয়।

হাদিয়া ও ঘুষ

হাদিয়া ও ঘুষ এক নয়, হাদিয়া ও ঘুষের মধ্যে পার্থক্য বিরাট। হাদিয়া দেওয়ার নিয়্যাতের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত ছাড়া পার্থিব কোন স্বার্থ হাসিল বা কোনরূপ সাহায্য পাওয়ার আশা থাকে না। অপরপক্ষে ঘুষ দেওয়ার উদ্দেশ্য হয় কোন স্বার্থ হাসিল করা বা সাহায্য পাওয়া। সাধারণত কর্তব্যরত কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়া ঘুষের পর্যায়ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, নবী কারীম (সা) আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন। তার নাম ছিল ইব্ন লুতবিয়্যা। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে নবী কারীম (সা) ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও প্রশংসা বর্ণনা করে বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালনের জন্য আমি তোমাদের মধ্য থেকে কোন কোন লোককে নিয়োজিত করি। তাদের মধ্য থেকে কেউ এসে বলে, 'এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' সে তার পিতা বা মাতার ঘরে বসে থাকেনি কেন, তখন দেখতে পেত, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এ ক্ষেত্রে কেউ যদি কিছু গ্রহণ করে তবে সে তা তার ঘাড়ে বহন করে কিয়ামাতের ময়দানে উপস্থিত হবে।[২৬]

ঘুষকে হাদিয়া বা অন্য কোন নামে আখ্যায়িত করলেও তা ঘুষ বলেই গণ্য হবে। হাদিয়া আদান-প্রদানের মাধ্যমে আন্তরিকতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং পরস্পর হাদিয়া আদান-প্রদান একটি উত্তম রীতি। তবে এর মাধ্যমে দুনিয়ার কোন স্বার্থ লাভের আশা করা অনুচিত। কেবলমাত্র পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য হাদিয়া আদান-প্রদান বাঞ্ছনীয়।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ

মানবমণ্ডলীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সমাজে এমন কিছু লোক থাকা উচিত যারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ٠

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১০)

আল-কুরআনের এ নির্দেশদ্বারা বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের পথ দেখানো। হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা) বলেন : 'যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, তোমরা অবশ্য অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবশ্যই আযাব নাযিল করবেন। এরপর তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না।'[২৭]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : 'তোমাদের মধ্যে শরী'আত বিরোধী কাজ হতে দেখলে সে তা শক্তিদ্বারা পরিবর্তন করবে। যদি সে এর শক্তি না রাখে তবে মুখদ্বারা, আর যদি এর শক্তিও না রাখে তবে অন্তরদ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর।'[২৮]

নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল আল্লাহ্‌র দীন কায়েম করা। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হয়েছে। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী ও রাসূল এ কাজ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি পথভ্রষ্ট জাতিকে তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত জাতিতে পরিণত করেন। তাঁর পরে আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না। এ অবস্থায় কারা এ দায়িত্ব পালন করবেন। সে প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٠

আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকবে যারা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে, তারাই সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৪)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, মুসলিম জাতির অন্ততপক্ষে একদলকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন। যে কেউ এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে, তাকে অমানুষিক নির্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। এ কাজ করতে গিয়ে বিশ্বনবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে চরম কুরবানী দিতে হয়েছে। বিরোধীদের নির্যাতন ও অত্যাচারে তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে যাঁরাই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁদেরকে অপরিসীম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সৎকাজের আদেশ নিজ পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে : 'হে মু'মিনগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি থেকে।' (সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ : ৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে নিজ পরিবারের হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত যায়দ ইব্‌ন হারীসা (রা)-কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সৎকাজের আদেশদাতা নিজেও সৎকাজে নিয়োজিত থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : 'তোমরা মানুষকে সৎকাজে নির্দেশ দাও, আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও! (সূরা বাকারা, ২ : ৮৪)

হযরত শুয়াইব (আ) নিজ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি তার বিরুদ্ধাচরণ কর আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না।' (সূরা হূদ, ১১ : ৮)

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আহবানকারীকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে নিজেও সৎকর্মশীল হবে।

সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকারীর পক্ষে বিপরীত কাজ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : 'তোমাদিগকে সৎকাজের দীক্ষা দিতাম ঠিকই, কিন্তু আমি তার ধারেকাছেও যেতাম না এবং পাপকাজ হতে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম।' (বুখারী, মুসলিম) এ সম্পর্কে আনাস (রা) থেকে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : 'আমি মি'রাজের রাতে এমন কিছু ব্যক্তিকে দেখেছি যাদের ঠোঁটগুলো আগুনের কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হচ্ছে। আমি জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এসব লোক কারা ? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মাতের উপদেশদাতা (বক্তা) যারা মানুষকে নেককাজের নির্দেশ দিত আর নিজেদের ব্যাপারে উদাসীন থাকতো; অর্থাৎ বাস্তব জীবনে নিজেরা তা পালন করতো না।' (মিশকাত)

ভাল কাজের উপদেশ দান একটি মহৎ কাজ। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, অর্থাৎ 'যারা সৎকাজের প্রতি আহবান জানাবে এবং মানুষকে অসৎকাজে নিষেধ করবে, তারাই হবে সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৪)

কোন পদ্ধতিতে ভাল কাজের উপদেশ দিতে হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ আল-কুরআনে ইরশাদ করেন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ·

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিক্‌মাত ও সদুপদেশদ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর উত্তমভাবে। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ১২৫)

এখানে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে আহবান করার জন্য তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা : হিক্‌মাত, সদুপদেশ ও সদ্ভাবে বিতর্ক করা। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى فَقُوْلاَ لَهٗ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ·

(হে মূসা ও হারূন) তোমরা দু'জন ফির'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (সূরা ত্বাহা, ২০ : ৪৩-৪৪)

এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারকদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : 'তারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতো আর আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতো না।' (সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ : ৩৯) অর্থাৎ অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে হবে নির্ভীক চিত্তে এবং দাওয়াতদাতার কথা হবে যুক্তিসঙ্গত ও উপদেশপূর্ণ।

সাধারণভাবে এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। পরিবারের কর্তা পরিবারস্থ অন্যান্য সদস্যদের আমল সংশোধনের জন্য দায়ী থাকবেন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সমাজের অন্যান্য লোকদের সৎকাজের আদেশ দিবেন ও তাদেরকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। আলিম সমাজ বিশেষভাবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। সর্বোপরি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ভাল কাজ করতে ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিবে, এটাই ইসলামী বিধান।

উপহাস, দোষারোপ, মন্দ নামে ডাকা ও অহেতুক ধারণা করা

কোন ব্যক্তিকে উপহাস বা তিরস্কার করা কিংবা মন্দ নামে ডাকা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের জন্য মুসলমানকে অবশ্যই এসব মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ·

হে মু'মিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরের মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা তাওবা না করে তারা যালিম। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১)

এ আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে তিনটি কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যথা : ১. কোন মুসলমানকে বিদ্রূপ বা উপহাস করা, ২. কাউকে দোষারোপ করা এবং ৩. কাউকে অবমাননাকর বা মন্দ নামে ডাকা।

উপহাস

কোন মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক হয়। একে বলে উপহাস। এ কাজ কথায়, ভাব-ভঙ্গিতে বা আকার-ইঙ্গিতে হতে পারে। এরূপ কাজে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ও অন্যজন্যকে অপমান, লাঞ্ছনা ও হেয় প্রতিপন্ন করার মনোভাব বিদ্যমান থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি নিঃসন্দেহে ঘৃণ্য অপরাধ। এরূপ কাজের দ্বারা অন্য ব্যক্তির মনে আঘাত দেয়া হয়। ফলে সমাজে বিপর্যয় ঘটে। এ জন্য আল-কুরআনে কাজটিকে হারাম বলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এ আয়াতে পুরুষ ও নারীদের পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। উভয়ের প্রতি কুরআনের নির্দেশ হলো, এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে এবং এক নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হচ্ছে সে উপহাসকারী বা উপহাসকারিণীর চেয়ে উত্তম হতে পারে।

এ আয়াতের সারমর্ম হলো, কোন ব্যক্তির দেহে, আকৃতিতে বা আচার-আচরণে কোন দোষক্রটি দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে উপহাস বা বিদ্রূপ করা উচিত নয়। কেননা সে ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদি বিষয়ে উপহাসকারীর তুলনায় আল্লাহ্‌র নিকট শ্রেষ্ঠতর হতে পারে।[২৯] কোন মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভাল বা মন্দ বলা যায় না। কারণ, যে ব্যক্তির বাহ্যিক কাজকর্মকে আমরা ভাল মনে করছি, আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে সে নিন্দনীয় হতে পারে। যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার কাজ ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয় হলেও তাকে হেয় মনে করা যায় না। কেননা তাওবার মাধ্যমে তার অপরাধের কাফ্‌ফারা হয়ে যেতে পারে। কাজেই এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে উপহাস বা বিদ্রূপ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

মন্দ নামে ডাকা

কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে মন্দনামে ডাকা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। হযরত আবূ যুবায়র আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আসেন, তখন আমাদের অনেকের একাধিক নাম ছিল। এর মধ্যে কোন কোন নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে লোকেরা ব্যবহার করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তা জানা ছিল না। সেজন্য কখনও কখনও তিনি ঐ মন্দ নাম ধরে সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ! ঐ ব্যক্তি এ নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৩০]

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতে, এ আয়াতের অর্থ হলো, কেউ কোন মন্দকাজ করে তাওবা করার পরও তাকে সেই মন্দকাজের নামে সম্বোধন করা। যেমন কাউকে চোর, ব্যভিচারী অথবা শরাবী বলে ডাকা। কোন ব্যক্তি চুরি, যিনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তাওবা করার পর তাকে অতীত মন্দকাজের দ্বারা লজ্জা দেয়া ও হেয় করা হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গুনাহ্‌দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তাওবা করেছে, আল্লাহ্ তাকে সে গুনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করবেন।'

তবে যদি কোন লোকের এমন নাম প্রচলিত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এই নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না, এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সে নামে ডাকা যায়। যেমন কোন কোন মুহাদ্দিসের নামের সাথে أَعْرَجُ ، أَحْدَبُ (খোঁড়া, ট্যারা) ইত্যাদি যুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লম্বা হাতবিশিষ্ট জনৈক সাহাবীকে ذُوالْيَدَيْنِ নামে ডেকেছেন এবং আবূ হুরায়রা (রা)-কে 'আবূ হুরায়রা' নামে অভিহিত করেছেন। এরূপ নামে স্নেহ ও ভালবাসার ইশারা রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিজেরাও তা অপসন্দ করেননি।

মানুষকে তার ভাল নামে ডাকা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : 'মু'মিনের হক অপর মু'মিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পসন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে আরব দেশে ডাক নামের প্রচলন ছিল। তিনি কোন কোন সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে 'আতীক', হযরত উমর (রা)-কে 'ফারূক', হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে 'সাইফুল্লাহ' এবং হযরত হামযা (রা)-কে 'আসাদুল্লাহ' ইত্যাদি।[৩১]

অহেতুক ধারণা করা

প্রমাণ ব্যতীত কোন মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা বা অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ٠

'হে মু'মিনগণ ! তোমরা অধিকাংশ (অহেতুক) অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ (অহেতুক) অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

وَاِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ٠

তোমরা অহেতুক ধারণা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা অহেতুক ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা।[৩২]

গীবত, অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণ পরিহার

গীবত, অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণ করা কাবীরা গুনাহ্। সুতরাং মুসলমানকে অবশ্যই এগুলো পরিহার করতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ٠

আর তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। আল্লাহ্ তা'আলা তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।[৩৩] (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২)

গীবত :

'গীবত' আরবী শব্দ। বাংলায় একে 'পরনিন্দা' বলা যায়। কোন মানুষের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাকে বলা হয় গীবত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : 'গীবত কী, তা কি তোমরা জান ? লোকেরা উত্তরে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : গীবত হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপসন্দ করে। জিজ্ঞাসা করা হল, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, এটাও কি গীবত হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলেই সেটা হবে গীবত। আর তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে না থাকে, সে ক্ষেত্রে সেটা হবে 'বুহতান' বা অপবাদ।[৩৩]

অবশ্য শুভাকাঙ্ক্ষীর দৃষ্টি নিয়ে কোন মুসলমানকে তার দোষত্রুটির কথা বললে স্বভাবত একে সে খারাপ মনে করে না। কেননা এরূপ বলার উদ্দেশ্য থাকে সংশোধন। কিন্তু যদি কাউকে সমাজের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তার অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি বর্ণনা করা হয়, তাহলে এটা হবে তার মনোকষ্টের কারণ। তাই কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা করা জায়িয নেই। এ থেকে এ কথা ধারণা করা ঠিক হবে না যে, উপস্থিতিতে কাউকে নিন্দা বা দোষরোপ করা জায়িয আছে। কেননা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে কাউকে কষ্টদায়ক কথা বলাকে দোষারোপ বলা হয় এবং তা জায়িয নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশদ করেন :

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (সূরা হুমাযা, ১০৪ : ১)

গীবত কোন অবস্থায় জায়িয নেই। উপস্থিতিতে কাউকে দোষারোপ করার চেয়ে কারো অনুপস্থিতিতে তার গীবত করা অধিকতর দূষণীয়। কেননা অনুপস্থিতিতে কারো দোষের কথা বললে তার জবাব দেয়ার কেউ থাকে না। ফলে যে দোষ বা ত্রুটির কথা বলা হচ্ছে, তা সত্য না মিথ্যা বোঝার আর উপায় থাকে না। গীবত করার মত গীবত শোনাও পাপের কাজ। কোন ব্যক্তি যখন কারো গীবত করতে থাকে, তখন শ্রোতাদের উচিত গীবতকারীকে গীবত থেকে বিরত রাখা। এ ক্ষেত্রে গীবতের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তাহলে পরনিন্দার চর্চা সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়ে যাবে।

গীবত ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : গীবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! গীবত কীভাবে ব্যভিচার থেকে গুরুতর অপরাধ হতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ব্যভিচার করার পর মানুষ আল্লাহ্র নিকট তাওবা করলে আল্লাহ্ তা কবূল করেন। কিন্তু গীবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত সে ব্যক্তি (যার গীবত করা হয়েছে) ক্ষমা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক তাকে মাফ করবেন না।'[৩৪]

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গীবত করা কোন অবস্থাতেই জায়িয নেই। অবশ্য কারো দ্বারা এরূপ গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি জীবিত থাকলে এবং তার নিকট থেকে মাফ করিয়ে নেয়া সম্ভব হলে ক্ষমা চেয়ে নিতে। কিন্তু যদি সে মারা গিয়ে থাকে কিংবা দূর এলাকায় চলে যাওয়ার কারণে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহ্র নিকট তার গুনাহ্ মাফের জন্য দু'আ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : 'নিঃসন্দেহে গীবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গীবত বা কুৎসা রটনা করছো তার জন্য এভাবে দু'আ করবে—হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার ও তার গুনাহ্ মাফ করে দাও।'[৩৫]

মৃত ব্যক্তির কুৎসা রটনা করাও পাপ। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : 'তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করো না। কেননা তারা তাদের কৃতকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'[৩৬] (বাখারী)

আল-কুরআনে 'গীবত' করাকে মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়ার সমতুল্য বলা হয়েছে। গীবত কত বড় অপরাধ তা এর থেকে প্রতীয়মান হয়। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : 'যখন আমার প্রতিপালক আমাকে মি'রাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মত। যা দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিব্‌রীল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, এরা সেইসব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশ্‌ত খেতো এবং তাদের ইয্‌যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো।'[৩৭] এখানে মানুষের গোশ্‌ত খাওয়ার অর্থ হলো অন্যের গীবত করা ও তাদের সুনাম ও খ্যাতি নষ্ট করার চেষ্টায় রত থাকা।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গীবত জায়িয আছে। যেমন : ১. মযলূম কর্তৃক যালিমের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করা, ২. মুফতীর নিকট ফাতোয়া চাওয়ার সময় ঘটনার বিবরণ দিতে কারো দোষক্রটি বলার প্রয়োজন হলে তা বলা, ৩. প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি যাতে গোটা সমাজকে মন্দকাজে জড়িত করতে না পারে, সেজন্য তার পাপাচারের কথা প্রকাশ করা, ৪. সাধারণ মানুষকে কোন অনিষ্টকর লোকের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তার সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া।

এসব ক্ষেত্র ব্যতীত গীবত বা পরনিন্দা করা থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে বিরত থাকতে হবে।

অপবাদ :

'অপবাদ' গীবতের চেয়ে গুরুতর অপরাধ। কোন লোকের মধ্যে যে দোষ নেই, তার প্রতি সে দোষ আরোপ করাকে অপবাদ বলা হয়। আরবীতে একে 'বুহ্‌তান' বলা হয়। সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা ভয়ানক ধরনের অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : 'যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।' (সূরা নূর, ২৪ : ২৩)

এই আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোন সতী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার ও অশ্লীলকাজে লিপ্ত হওয়ার অপবাদদানকারী দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এই দুনিয়ায় তার শাস্তি হল ৮০টি বেত্রাঘাত। আর তার সাক্ষ্য কোন সময় গ্রহণ করা হবে না। আখিরাতের জীবনেও তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৭টি কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। যার একটি হলো সতী সাধ্বী রমণীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।[৩৮]

ছিদ্রান্বেষণ :

মানুষের দোষক্রটি খুঁজে বের করাকে 'ছিদ্রান্বেষণ' বলা হয়। এটা কাবীরা গুনাহ্। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না, যার কোন দোষ নেই। কোন সমাজের মানুষ যদি পরস্পরের দোষক্রটি অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত হয় এবং তা প্রচার করতে থাকে, তবে সে সমাজে শান্তি থাকতে পারে না। আল-কুরআনের নির্দেশ হলো : "তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।" (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২) এ নির্দেশের তাৎপর্য হলো, পরস্পরের গোপনীয় দোষক্রটি খুঁজে বের করা নিষিদ্ধ।

মহানবী (সা) মুসলমানগণকে পরস্পরের দোষত্রুটি ফাঁস করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরের উপর উপবেশন করে উচ্চস্বরে বললেন : 'হে লোক সকল ! যারা মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ কিন্তু ঈমান এখনো অন্তর পর্যন্ত পৌছায়নি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না এবং তাদের গোপনীয় দোষত্রুটির পিছনে লেগে থেকো না। কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের গোপনীয় দোষত্রুটি উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে পিছনে লেগে থাকে, আল্লাহ্ তার গোপনীয় দোষ প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ সে ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করে দেন, তাকে লজ্জিত ও অপমানিত করেন, যদিও সে নিজের ঘরের মধ্যে অবস্থান করে।'[৩৯]

উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের দোষত্রুটি খুঁজে বের করা অতীব নিন্দনীয় কাজ। তবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজে সুস্পষ্ট ক্ষতিকর নিদর্শন দেখা গেলে এবং সে বা তারা কোন অপরাধজনক কাজে লিপ্ত হতে পারে এরূপ আশংকা হলে, প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। অথবা কারো সাথে যৌথ কারবার করার ইচ্ছা করলে বা বিয়ের প্রস্তাব দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের সঠিক অবস্থা যাচাই করা যেতে পারে।

মোটকথা, কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত মুসলমান গীবত, অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণের মত গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে পরে না।

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও বিপর্যয়কারী কার্যকলাপ

চুরি :

আভিধানিক অর্থে চুরি বলতে অন্যের মাল-সম্পদ গোপনে নিয়ে যাওয়া বুঝায়। শরী'আতের বিধানে এর অর্থ হলো, অন্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ সুরক্ষিত মাল গোপনে নিয়ে যাওয়া। চুরির শাস্তি হল চোরের হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : 'পুরুষ চোর এবং নারী চোর তাদের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দণ্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৮)

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত, 'ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে (পূর্ণ) মু'মিন থাকে না এবং চোর যখন চুরি করে তখন সেও (পূর্ণ) মু'মিন থাকে না।'[৪০]

চুরি করা জঘন্য অপরাধ। যে সমাজে চুরি ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়, সেখানে শান্তি থাকতে পারে না।

কি পরিমাণ জিনিস চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে, এ ব্যাপারে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। ইমাম মালিক, ইমাম আহ্‌মাদ ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে এক-চতুর্থাংশ দিনার বা তিন দিরহামের কম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, দশ দিরহামের কম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, বনূ মাখযূম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিল। এতে কুরাইশগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা বলাবলি করে, কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ ব্যাপারে

উত্থাপন করবে? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ব্যতীত আর কে এ সাহস করবে? তারপর উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তুমি কি আল্লাহ্র দণ্ডবিধিসমূহ থেকে এক দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বেকার লোকদের নীতিও ছিল যে, যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদ (সা)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করে, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিব।'[৪১] পরে ঐ মহিলার হাত কেটে দেওয়া হল। এরদ্বারা বোঝা যায়, চুরি করা কতবড় অপরাধ এবং এর শাস্তি যত কঠিন হোক তা রদ করা যাবে না।

ডাকাতি ও ছিনতাই :

ডাকাতি, ছিনতাই, লুট ইত্যাদি চুরি অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। চুরি হয় গোপনে, আর ডাকাতি, ছিনতাই, লুটপাট হয় প্রকাশ্যে। এর সাথে কখনও কখনও খুন-জখমও হয়ে যায়। এর শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন : 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।' (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৩)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হওয়ার অর্থ হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ানোর অর্থ বুঝতে হবে সম্পদ নিয়ে যাওয়া ও হত্যার মাধ্যমে অরাজকতা সৃষ্টি করা। এ আয়াতে ডাকাতি, ছিনতাই ও অন্যান্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

এখানে হত্যা করা, শূলে চড়ানো, হাত ও পা কাটা এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করা এ চার প্রকার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বিচারক অপরাধের মাত্রানুযায়ী তা প্রয়োগ করবেন। যে ডাকাত হত্যা ও সম্পদ হরণ এই দুই অপরাধ করবে, তাকে হত্যা করা হবে; তারপর শূলে চড়ানো হবে। হত্যা না করে কেবল সম্পদ নিয়ে গেলে ডাকাতের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে। যে ডাকাত শুধু হত্যা করে কিন্তু মাল না নেয়, তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি হত্যা ও সম্পদ হরণ কোনটাই করে না, কিন্তু অস্ত্র বা অন্য কোন মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।

ছিনতাই, লুট ও আত্মসাতের জন্য হাত কাটা যাবে না। হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[৪২] এ হাদীস অনুযায়ী ছিনতাইকারীর হাত না কেটে বিচারক সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অন্য যে কোন শাস্তি দিতে পারেন।

বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ :

সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপের পরিধি ব্যাপক। যেমন : হত্যা, ষড়যন্ত্র, সম্পত্তি আত্মসাৎ, গোলমাল, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা। যে সমাজে এসব কার্যকলাপ

অবাধে চলতে থাকে, সেখানে শান্তির আশা করা যায় না। মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র এমন গর্হিত কাজের প্রশ্রয় দিতে পারে না। ইসলামে এ সবকিছুর কোন অবকাশ নেই।

সামাজিক অপরাধ দমনে ইসলামী বিধান

প্রতিটি মানুষ সমাজে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। সমাজের কোন মানুষ যেন অপরাধ করে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট না করে এটাই সকলের কাম্য। তবুও সমাজের কিছু মানুষ অন্যের অধিকার খর্ব করে অপরাধ করে বসে। ফলে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। সমাজে যাতে অপরাধ সংঘটিত না হয় সে লক্ষ্যে ইসলাম সমাজকে কলুষমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়। সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল, যে সব পরিস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা। যেমন সম্পদের ইনসাফসম্মত বন্টন, যাতে অভাবের তাড়নায় কাউকে চুরি-ডাকাতি করতে না হয়। প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজ পরিশ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে নারী-পুরুষের অবাধ মিলন ও যৌন প্রবৃত্তি উদ্দীপক সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার রোধ করে ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করা প্রয়োজন। খুনখারাবি রোধে সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান ঘটাতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ধারা জারী রাখতে হবে। পরনিন্দা, পরচর্চা বন্ধ করার লক্ষ্যে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন করতে হবে।

অপরপক্ষে ইসলাম ব্যক্তির মন-মানসিকতায় আল্লাহ্‌র প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পরকালের জবাবদিহিতার প্রত্যয় সৃষ্টি করে। তাকে এ কথা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করার সুযোগ দেয় যে, যত সংগোপনেই সে অপরাধ করুক না কেন, আল্লাহ্ তা দেখেন। পরকালে আল্লাহ্‌র নিকট এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং পরকালের শাস্তি ইহকালের শাস্তি অপেক্ষা অনেক কঠিন ও স্থায়ী। এই বোধ সৃষ্টি করার মাধ্যমেই কেবল অপরাধের মাত্রা ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব। একাধারে সমাজ থেকে অপরাধ সংঘটনের সকল সম্ভাবনা দূরীভূত ও ব্যক্তি-চরিত্রের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমেই অপরাধ দমন করা যেতে পারে। এতসব ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করে বসে, তবে ইসলাম তাকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দেয়ার পক্ষপাতী।

অপরাধ দমনে ইসলামী বিধানের বৈশিষ্ট্য

অপরাধ দমনে ইসলামী বিধানের কতকগুলো অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন :

১. প্রতিরোধমূলক : ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পথ খোলা রেখে মানুষকে অপরাধ করার সুযোগ দেয় না, বরং অপরাধের কারণসমূহ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২. ইনসাফভিত্তিক : ইসলাম বিচারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে। অপরাধী ও যে সমাজের বিরুদ্ধে সে অপরাধ করেছে, এ উভয়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে। ইসলাম চোরের হাত কেটে দিতে বলে কিন্তু যেখানে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকে যে, চোর ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করেছিল, সেখানে কিছুতেই এ শাস্তি দেয়া হয় না। সামান্য জিনিস চুরির জন্য চোরের হাত কাটা হয় না। অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা লাঘব করা হয়।

৩. আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান : ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো সকলের জন্য ইসলাম একই শাস্তির বিধান দেয়। দেশের কোন ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নয়।

৪. সংশোধনমূলক : আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত অপরাধের জন্য ইসলাম অপরাধীকে তাওবা করার সুযোগ দেয়। খালিস নিয়্যাতে তাওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন। ফলে সে নিজে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পায়।

৫. কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক : ইসলাম অপরাধের ক্ষেত্রভেদে বেত্রাঘাত, রজম ও শিরশ্ছেদের বিধান দেয়। এগুলো কঠোর ও কঠিন শাস্তি। কিন্তু এ শাস্তি জনসমক্ষে দিতে হবে, যেন সাধারণভাবে মানুষ শাস্তির কঠোরতা দেখে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। সামাজিক শান্তি রক্ষার জন্যে এরূপ শাস্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ইসলামী বিধানে শাস্তির শ্রেণীবিভাগ

ইসলামী শরী'আতে শাস্তি তিন প্রকার। যথা :

১. যে শাস্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু কার্যকর করার দায়িত্ব অপরাধীর নিজের উপর ন্যস্ত করেছেন। যেমন, বিভিন্ন ধরনের কাফ্ফারা।

২. ঐ সমস্ত শাস্তি যা আল্লাহ্‌র কিতাব বা রাসূল (সা)-এর হাদীসদ্বারা নির্দিষ্ট এবং এগুলো কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে বিচারক বা সরকারের নিজস্ব মতামতের কোন সুযোগ নেই। এ শাস্তির দু'ধরনের : হদ্দ ও কিসাস (বিধিবদ্ধ শাস্তি)। এ অপরাধে একদিকে যেমন সৃষ্টজীবের প্রতি অন্যায় করা হয়, অন্যদিকে তেমনি স্রষ্টার নাফরমানীও করা হয়। ফলে অপরাধী আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দা উভয়ের নিকট দোষী বলে বিবেচিত হয়। যে অপরাধে আল্লাহ্‌র হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, তার শাস্তিকে 'হদ্দ' আর যে অপরাধে বান্দার হককে শরী'আতের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, তার শাস্তিকে 'কিসাস' বলে। হদ্দ ও কিসাসের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য এই যে, হদ্দকে আল্লাহ্‌র হক্ হিসাবে প্রয়োগ করা হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও হদ্দ অব্যবহার্য হবে না। যেমন, যার সম্পদ চুরি যায় সে ক্ষমা করলেও চোরকে নির্ধারিত শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু 'কিসাস' এর বিপরীত। কিসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণ হওয়ার পর হত্যাকারীর বিষয়টি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর ইখ্‌তিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে বিচার বিভাগের মাধ্যমে কিসাস হিসাবে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে কিংবা দিয়াত বা রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে কিংবা ক্ষমা করে দিতে পারে।

৩. ইসলামী শরী'আতে সেসব অপরাধের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে, তাকে বলে তা'যীর বা দণ্ডবিধি। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপররাধ দমনের জন্য যেমন ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করেন, ততটুকুই দিবেন। এক্ষেত্রে সরকার নিজস্ব আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং বিচারককে তা মেনে চলতে বাধ্য করতে পারেন। অবস্থানুযায়ী তা'যীরকে লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। তা'যীরের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু হদ্দের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শোনা উভয়ই নাজায়িয।

হদ্দের শাস্তি

ইসলামী শরী'আতে হুদূদ পাঁচটি : চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ। এ

চারটি শাস্তি আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ্দ, এটি সাহাবায়ে কিরামের ইজ্‌মা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। হুদূদ কার্যকর করার ইখ্‌তিয়ার বিচার বিভাগের। এ শাস্তি কোন শাসক বা বিচারক ক্ষমা করতে পারে না। খাঁটি তাওবাদ্বারা আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি রহিত হয় না। এর মধ্যে কেবল ডাকাতির শাস্তির বেলায় কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা করলে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারা তাওবার বিষয়টি নিশ্চিত হলে সে হদ্দ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করলৈ তা ধর্তব্য নয়। হুদূদের শাস্তি এবং তার প্রয়োগ প্রণালীও কঠোর। অপরপক্ষে, ন্যায়বিচারের খাতিরে অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকলে বা অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এ ব্যাপারে শরী'আতের স্বীকৃত নীতি হলো, হুদূদ সামান্যতম সন্দেহের কারণে অকেজো হয়ে পড়ে।

কোন কারণে হদ্দ অপ্রযোজ্য হওয়ার ফলে অপরাধী বে-কসুর খালাস পেয়ে যাবে এবং সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারক অবস্থার প্রেক্ষিতে অপরাধীকে 'তা'যীরের' শাস্তি দিতে পারেন। তা'যীরের শাস্তি সাধারণত দৈহিক ও আর্থিক হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ব্যভিচার প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় চারজন সাক্ষীর স্থলে মাত্র তিনজন পাওয়া গেলে এ ক্ষেত্রে হদ্দ জারী করা যাবে না। কিন্তু বিচারক অবস্থানুযায়ী অপরাধীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে পারেন কিংবা জরিমানা করতে পারেন। অপরাধের মাত্রানুযায়ী বিচারক এর মধ্যে যে কোন শাস্তি দিতে পারেন। (ক) চুরি এবং (খ) ডাকাতি—এ দু'টি অপরাধের শাস্তির কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। (গ) ব্যভিচার : ব্যভিচারকারী বা ব্যভিচারকারিণী বিবাহিত বা বিবাহিতা হলে রযম-পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু এরা অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। (ঘ) ব্যভিচারের অপবাদ : ব্যভিচারের অপবাদের জন্য আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই চারজন সাক্ষী না পাওয়া গেলে কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করা অনুচিত। (ঙ) মদ্যপান : কুরআন মাজীদে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে একে 'উম্মুল খাবায়িস' বা 'অপকর্মের মূল' বলে আখ্যায়িত কারা হয়েছে। মদ্যপানের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। এ শাস্তি প্রয়োগের জন্য দু'জন সাক্ষী বা নিজের স্বীকারোক্তি প্রয়োজন।

কিসাস

সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা বা আঘাত করলে তার বদলে তাকে হত্যা বা আঘাত করার বিধানকে ইসলামী পরিভাষায় কিসাস বলে। কিসাসের শাব্দিক অর্থ হলো সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা। আল-কুরআনের সূরা বাকারার ১৭৮ ও ১৭৯ নম্বর আয়াতে কিসাসের বিধান বর্ণিত হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বেআইনী হত্যার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যাকারীকে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে হত্যা করা হবে। তবে এ বিধান প্রয়োগ করার অধিকার বিচার বিভাগের।

১. নিহত ব্যক্তির জীবন শরী'আত কর্তৃক রক্ষিত হওয়া অর্থাৎ হত্যাযোগ্য অপরাধী না হওয়া।

২. নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর বংশধর না হওয়া।

৩. হত্যাকাণ্ডের সময় অপরাধী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

অপরাধীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে কিসাস প্রয়োগ স্থগিত থাকবে। 'কিসাস' গ্রহণের পূর্বে হত্যাকারী মারা গেলে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বদলা গ্রহণ করার দাবি রহিত হয়ে যাবে। 'কিসাস' গ্রহণ ওলীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সে ইচ্ছা করলে কিসাস গ্রহণ করবে, রক্তপণ নিবে অথবা বিনা রক্তপণে ক্ষমা করে দিবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেওয়া হলে হত্যাকারীর উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস দুই পুত্র। তারা উভয়ে হত্যাকারীকে মাফ করে দিলে হত্যাকারী মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি একজন মাফ করে এবং অন্যজন মাফ না করে, তবে হত্যাকারী মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবে বটে কিন্তু তাকে অর্ধেক 'দিয়াত' (রক্তপণ) দিতে হবে। কিসাসের আংশিক দাবি মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোস নিষ্পত্তি করলে সে ক্ষেত্রেও 'কিসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

শরী'আতের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে একশত উট বা এক হাজার দিনার বা দশ হাজার দিরহাম। দিয়াত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হবে। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ নিজেরা কিসাসের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। এ অধিকার আদায়ের জন্য আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। কারণ কোন্ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় বা কোন্ অবস্থায় হয় না, তা নির্ধারণ করা কষ্টকর। তাছাড়া, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলতে পারে। এ জন্য কিসাসের হক আদায় করতে আদালতের শরাণাপন্ন হতে হবে।

পাশ্চাত্যের কোন কোন লেখক মনে করেন, সামাজিক অপরাধ দমনের জন্য ইসলাম যেসব বিধান দিয়েছে, তা অত্যন্ত কঠোর। আধুনিক সভ্য জগতে এ শাস্তি প্রয়োগ করা চলে না। তাদের প্রভাবে কিছু কিছু মুসলিম তরুণও এরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং তারা ইসলামী বিধানের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ইসলামী বিধান মুতাবিক সমাজ বিনির্মাণ করে নাগরিকদের নৈতিকতার মান উন্নত করতে পারলে শাস্তির বিধান ন্যূনতম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হবে। সে ক্ষেত্রে কেবল তারাই এ শাস্তির যোগ্য হবে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে সমাজে ফিতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে অপরাধ করে থাকে। অপরাধ করার মত কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও অপরাধ প্রবণতা যাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসবে, তাদের মন-মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য ইসলাম এসব বিধান জারী করছে। মনে রাখতে হবে, ইসলামী সমাজ তথা সুষ্ঠু সমাজ গঠনের সঠিক বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে অপরাধ দমনের বিধানকে পৃথক করে দেখলে ইসলামের প্রতি সুবিচার করা হবে না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩৬।

২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২২।

৩. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
৪. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২২।
৫. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২।
৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২২।
৭. আবু দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৮।
৮. ইব্‌ন কাছীর, সূত্র : মা'আরেফুল কোরআন।
৯. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৪।
১০. মুসলিম শরীফ।
১১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২২।
১২. আবু দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৮।
১৩. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮১।
১৪. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
১৫. মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২২।
১৬. মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২২।
১৭. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩।
১৮. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৮২।
১৯. মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৯।
২০. মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।
২১. মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৪।
২২. মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১।
২৩. মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১।
২৪. মিশকাত, ঐ পৃ. ২৬০।
২৫. মিশকাত, পৃ. ২৬০।
২৬. মিশকাত, পৃ. ১৫৬।
২৭. মিশকাত, পৃ. ৪৩৬।
২৮. মিশকাত, পৃ. ৪৩৬।
২৯. মা'আরেফুল কোরআন (বাংলা), পৃ. ১২৮।
৩০. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।
৩১. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৬।
৩২. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৮।
৩৩. মিশকাত, পৃ. ৪১২।
৩৪. মিশকাত, পৃ. ৪১৫।
৩৫. মিশকাত, পৃ. ৪১৫।
৩৬. রাহে আমল ২য় খণ্ড, পৃ. ২০।
৩৭. মিশকাত, পৃ. ১৭।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।
৩৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৭।
৪০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১৪।
৪১. আবু দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১৩।

একাদশ অধ্যায়

ইসলামী অর্থনীতি

ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দীন। মানুষের ঈমান-আকীদা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক মূলনীতিসমূহ পরিপূর্ণভাবে ইসলামে পেশ করা হয়েছে। ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলা আবশ্যক, অনুরূপভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিধান মেনে চলা আবশ্যক। অর্থনৈতিক জীবনে যাতে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন না হয় এর জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। শ্রমিকের মজুরী নিশ্চিত করা হয়েছে। গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায় সেজন্য যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছে। এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মওজুদদারী ইত্যাদি উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কোনরূপ যুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে এর বাস্তব প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়। যে আরবের অধিবাসীরা একদিন বৈষম্য ও দারিদ্র্যের শিকার ছিল, ইসলামী অর্থনীতির স্পর্শে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁদের আর্থ-সমাজিক অবস্থাতে এমন পরিবর্তন সাধিত হল যে, যাকাতের টাকা নেওয়ার মতও কাউকে পাওয়া যেত না।

ইসলামী অর্থনীতি : সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

অর্থনীতির একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে। স্যার জেমস স্টুয়ার্ট-এর মতে, অর্থনীতি এমন এক শাস্ত্র যা এক ব্যক্তি সমাজের একজন হওয়ার দিক দিয়ে কিরূপ দূরদৃষ্টি ও মিতব্যয়িতার সাথে নিজ ঘরের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে তা আমাদেরকে বলে দেয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেন, অর্থনীতি মানুষের জীবনের সাধারণ কার্যাবলীর পর্যালোচনা মাত্র। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রম-এর মতে, সমাজের সাধারণ মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজন অনুসারে পণ্যের উৎপাদন, উৎপন্ন পণ্যের সুবিচারপূর্ণ বন্টন এবং উৎপাদনের উপায় ও এর সঠিক বন্টনের ন্যায়নীতি সম্পন্ন প্রণালী নির্ধারণ করাই হচ্ছে অর্থনীতির কাজ।[১]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো হচ্ছে সাধারণ অর্থনীতির সংজ্ঞা। ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা এর থেকে ভিন্নতর। মাওলানা হিফযুর রহমান (র) বলেন, শরী'আতের পরিভাষায় যে বিদ্যা বা জ্ঞানের মাধ্যমে এমন সব উপায় সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায় যারদ্বারা ধন-সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ের উপযুক্ত ও সঠিক পন্থা এবং বিনষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা হয়, তাকে 'ইসলামী অর্থনীতি' ('ইলমুল ইক্‌তিসাদ) বলা হয়।[২]

ইসলামী অর্থনীতির মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

বর্তমান বিশ্বে যেসব অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এগুলোর কোনটিতেই মানুষের প্রকৃত মুক্তি ও পূর্ণ সফলতা নেই; বরং সব ক'টিতেই রয়েছে চরম প্রান্তিকতা। মূলত অর্থনৈতিক মুক্তি, উন্নতি এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণ আল্লাহ্র বিধান ও মহানবী (সা)-এর আনীত আদর্শের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। বিষয়টি বিভিন্ন মতবাদের আদর্শিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। তবেই আমরা ইসলামী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হবো। বস্তুত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা নিম্নোক্ত মূলনীতির উপর নির্ভরশীল :

১. পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে, ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার। এতে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজ মালিকানায় রাখারই কেবল সুযোগ রয়েছে তা নয়; বরং এতে সকল প্রকার উৎপাদন উপায় এবং যন্ত্রপাতি ইচ্ছামত ব্যবহার ও প্রয়োগেরও পূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান আছে। নিজ ইচ্ছামত অবলম্বিত যে কোন পন্থা ও উপায়ে অর্থ উপার্জন করা এবং যে কোন পথে তা ব্যয় এবং ব্যবহার করার, এমনকি সম্পদ ধ্বংস করার সুযোগ রয়েছে। এমনিভাবে যেখানে ইচ্ছা কল-কারখানা স্থাপন করা এবং যথেচ্ছ মুনাফা হাসিল করারও এতে অবাধ ব্যবস্থা রয়েছে। এতে যেমন শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ রয়েছে, অনুরূপভাবে তাদেরকে শোষণ করে যতদূর ইচ্ছা মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে।

২. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটা কেবল বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের মধ্যেই নয়, বরং একই শ্রেণী এবং একই দলের বিভিন্ন লোকদের মধ্যেও তা কার্যকর রয়েছে। মূলত এটা বাঁচার লড়াই নামক দার্শনিক শ্লোগান হতেই উদ্ভূত।

৩. মালিক ও শ্রমিকের অধিকারে পার্থক্যকরণ এই ব্যবস্থার তৃতীয় মূলনীতি।

৪. চতুর্থ মূলনীতি হচ্ছে, রাষ্ট্র জনগণের অর্থনৈতিক লেনদেন এবং আয়-উৎপাদনের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না; বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল, জনগণের অর্থ উপার্জনের জন্য অবাধ সুযোগ করে দেওয়া। জনগণ যেন শান্তিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে, এর বাস্তব ব্যবস্থা করে দেওয়াই রাষ্ট্রের দায়িত্ব কর্তব্য।

৫. সুদ, জুয়া এবং প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি। বিনাসুদে কাউকে কিছুদিনের জন্য কোন অর্থ দেওয়া পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে নির্বুদ্ধিতা। ব্যক্তিগত প্রয়োজন হোক কিংবা অভাব-অনটন দূর করার জন্য সাময়িক ঋণ হোক কিংবা অর্থ উপার্জনের উপায় স্বরূপ মূলধন ব্যবহারের জন্য হোক, কোন প্রকারের লেনদেন বিনাসুদে সম্পন্ন করা পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে মানবতার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর কোন কোন নীতি কল্যাণজনক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে রয়েছে মানবতার অকল্যাণ। এ কারণেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে তা মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে বটে কিন্তু এর প্রথম অধ্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পরই এর অভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও ক্ষতিকর

দিকগুলি মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের উপার্জিত ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক। এতে অন্য কারো অধিকার নেই। নিজের উপর্জিত সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে মজুদদারীও করতে পারে। এতে প্রতিবাদ করার কারো অধিকার নেই। আর এই মতবাদের ফলে সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল লোক গোটা সমাজ ও জাতির যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদান গ্রাস করে নিয়ে রাতারাতি ধনকুবের হয়ে বসে। অপরদিকে দেশের কোটি কোট অসহায় মেহনতী মানুষ শ্রম দিয়ে কোনমতে জীবন যাপন করতে থাকে। এরূপ অর্থব্যবস্থা প্রচলিত সমাজে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, মায়া-মমতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলী কোনভাবেই বাকি থাকে না। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার যাঁতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। যারা এ মতবাদের আবিষ্কারক ছিল তারা পুঁজিবাদী সমাজের মযলূম-শোষিত মানুষকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, ব্যক্তি-মালিকানাই সর্বপ্রকার বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এই ব্যক্তি-মালিকানাকে উচ্ছেদ করতে পারলেই সকল অশান্তি এবং শোষণ-নির্যাতনের অবসান ঘটবে। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম ব্যক্তি-মালিকানাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপাদান ও যন্ত্রপাতি জাতীয় মালিকানা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯১৭ সনে রাশিয়ায় এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাতে আর্থ-সামাজিক উন্নতির পরিবর্তে দেশে এক ভয়াবহ অবস্থার সূত্রপাত ঘটায়। সমাজতন্ত্রের নামে রাশিয়ার জনসাধারণের ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করে নেওয়া হয়। বস্তুত এ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সামষ্টিক যন্ত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র। ব্যক্তির স্বাধীনতা সেখানে স্বীকৃত নয়। মোদ্দাকথা, পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র কোনটিই মানুষের প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিতে সক্ষম হয়নি; বরং উভয়বিধ ব্যবস্থায় মানব জীবনকে আরো অধিকতর জটিল করে তুলেছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম এই দুই পরস্পর বিরোধী অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানাকে স্বীকার করে। তবে এ মালিকানা অবাধ এবং শর্তহীন নয়, বরং শর্তযুক্ত। আর সেই শর্ত হল, ব্যক্তি-মালিকানা সর্বদা সামাজিক স্বার্থের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তির আয়ের খাতসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনিভাবে ব্যয়ের খাতসমূহকেও নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে। ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রাম কিংবা ধনবৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার কোন অবকাশ নেই। এরই ফলে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অল্প কয়েক বছরের মধ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হল যে, যাকাতের অর্থ গ্রহণ করার জন্য কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না।[৩]

ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ক. এটি স্বভাবানুকূল অর্থব্যবস্থা। বস্তুত ইসলাম হল মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম—দীনে ফিত্‌রত। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ

আল্লাহ্‌র ফিত্‌রত-প্রকৃতির অনুসরণ কর ; যে ফিত্‌রত-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম, ৩০ : ৩০)

ইসলামের প্রতিটি আমলের মত অর্থনীতিতেও মানুষের স্বভাবের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে ও মধ্যবস্থায় প্রয়োগযোগ্য এক সুষম অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

খ. মালিকানা : সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۔

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৪)

অবশ্য বান্দাকে তিনি তা তাঁর নির্দেশমত ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন। এটাও এক ধরনের মালিকানা। একে 'আমানাতী মালিকানা বলা যায়। এখানেই পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামী অর্থনীতির ব্যবধান। ইসলাম একদিকে পুঁজিবাদের মত সম্পদে ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানাকে স্বীকার করে না, আবার সমাজতন্ত্রের মত সম্পদে ব্যক্তি-মালিকানাকে অস্বীকারও করে না; বরং ইসলাম উভয়বিধ ব্যবস্থার এক মধ্যবর্তী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

গ. সম্পদের সুষম বন্দন ও আবর্তন : ইসলামী অর্থব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এক স্থানে বা গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে সমাজের মধ্যে সুষম আবর্তন ঘটতে থাকা। ইসলামে অবৈধভাবে সম্পদ কুক্ষিগত এবং পুঞ্জীভূতকরণের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۔

আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে ইহাই তা, যা তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করতে, এর স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা তাওবা, ৯ : ৩৪-৩৫)

পক্ষান্তরে ইসলাম চায় সম্পদ যেন একহাতে কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۔

যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। (সূরা হাশ্‌র, ৫৯ : ৭)

ঘ: অর্থ উপার্জনে ভোগ-লিপ্সার অপনোদন : ইসলামী অর্থব্যবস্থার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল এখানে ভোগ-লিপ্সাই অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য হয় না; পরকালীন সাফল্যই এখানে বড় কথা। সুতরাং পরকালীন সফলতা অর্জনই হল সব ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। এই মানসিকতাই

মানুষকে তার কাজ যথাযথ এবং সুচারুরূপে করতে প্রেরণা যোগায়। অবহেলা, উদাসীনতা এবং আলস্য থেকে মুক্তি দেয়। পক্ষান্তরে ভোগ-লিপ্সা মানুষকে ক্রমান্বয়ে নির্জীব ও উদ্যমহীন করে তোলে। ভোগের মানসিকতা বর্জন করে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ ٠

আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন, এরদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৭)

ঙ. ইসলামে জাগতিক লাভালাভের স্থান : ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে আখিরাত অর্জনের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু জাগতিক প্রয়োজন ও লাভলাভকে উপেক্ষা করা হয়নি। সন্ন্যাসবাদকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ ٠

কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এতো তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল। আমি তাদের উপর তা ফরয করিনি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৭)

হাদীসেও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে :

لاَ رُهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلاَمِ ٠

ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই।[৪]

ইসলামের অর্থব্যবস্থায় জাগতিক বস্তুসমূহকে আল্লাহ্র নি'আমত হিসাবে গ্রহণ করে তা শরী'আত নির্ধারিত পন্থায় ভোগ করে শোক্র আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ٠

এবং তোমার জাগতিক হিস্যাকে তুমি ভুলে যেও না। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৭)

এই অর্থব্যবস্থায় জাগতিক ভোগকে অস্বীকার নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ٠

তোমরা আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অমিতাচার করবে না। তিনি অমিতাচারীকে পসন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)

চ. হালাল-হারামের পার্থক্য : ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল হালাল-হারাম তত্ত্ব। হালাল-হারামের ধারণা ইসলামের একটি অন্যতম বিষয়। ইবাদত থেকে রাজনীতি সর্বত্র এ নীতি পরিব্যাপ্ত। কিছু বিষয় ও প্রক্রিয়াকে ইসলাম মানুষের জন্য হালাল করেছে আর কিছু বিষয় ও প্রক্রিয়াকে হারাম করেছে। এ ক্ষেত্রেও মানুষের কল্যাণের প্রতিই মূলত লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেসব বিষয় বা প্রক্রিয়ায় মানুষের আত্মিক ও বৈষয়িক কল্যাণ রয়েছে, সেগুলোকে ইসলাম হালাল ঘোষণা করেছে। আর যেসব বিষয় ও প্রক্রিয়ায় মানুষের আত্মিক ও বৈষয়িক বা দৈহিক অকল্যাণ ও অমঙ্গল নিহিত আছে, সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। ইসলামের অর্থনীতিও

এর ব্যতিক্রম নয়। এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, হাউজী, প্রতারণা এবং বস্তুর দোষ গোপন করার কোন অবকাশ নেই।

ছ. অর্থনীতিতে আযীমত ও রুখ্সত : ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল আযীমত ও রুখসতের ধারণা। হালালের সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় আযীমত এবং জায়িযের সর্বনিম্ন স্তরকে বলা হয় রুখসত। কেউ যদি তার অর্থ-সম্পদের বছরে শতকরা আড়াই ভাগ শরী'আত নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় তবে তার ফরয তথা যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলাম মু'মিনকে এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। তাকে আরো উন্নীত করতে চায়। আর তা হল, সে যেন প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছুই তার কাছে না রাখে। রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আবূ বকর, উমর (রা)-সহ উচ্চ পর্যায়ের সাহাবীগণ সকলেই এর উপর আমল করে গিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার অবস্থাই সৃষ্টি হতে দেননি।

জ. নিয়ন্ত্রিত আয় ও ব্যয় : ইসলামী অর্থব্যবস্থার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল, আয় ও ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ। ইসলাম মানুষকে অবাধ ও যথেচ্ছভাবে সম্পদ অর্জনের সুযোগ দেয় না। তেমনি হালালভাবে উপার্জিত অর্থ-সম্পদও যথেচ্ছ ব্যয় করার কাউকে অধিকার দেয় না। ফলে একদিকে যেমন আয়ের ব্যবস্থা হয় বহুমাত্রিক, অপরদিকে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সব ধরনের অপচয় রোধ হয়।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ٠

আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৭)

একই আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ٠

যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৭)

ঝ. কর্মসংস্থানের অধিকার সংরক্ষণ : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকারের প্রতি কেবল স্বীকৃতিই দেওয়া হয়নি, বরং তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এখানে প্রতিটি সক্ষম নাগরিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ভিক্ষুকের জন্য কুঠারের ব্যবস্থা করে জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতের আমলে জনৈক ব্যক্তিকে জিহাদে যাওয়ার জন্য মসজিদে নববীতে ভিক্ষা করতে দেখে নিজে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দিয়ে জনৈক ব্যক্তির খামারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

ঞ. শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ : ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ। অনেক সময় শ্রমিক শ্রেণীর অভাব এবং অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ন্যায্য পারিশ্রমিকের চেয়ে কম মজুরী দিয়ে তাদেরকে নিয়োগ করা হয়। কোন কোন সময় তাদেরকে পারিশ্রমিক থেকেও বঞ্চিত করা হয়। ইসলামে এই জাতীয় প্রতারণা এবং

প্রবঞ্চনার কোন সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিবে।'

ট. জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠা : ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই জবাবদিহিতার মনোভাব গড়ে তুলতে চায়। ইসলামের অর্থব্যবস্থাও এর বাইরে নয়। হাদীসে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে : তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সারকথা, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল, সমাজে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার প্রচলন।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শোষণ, নিপীড়ন, দুর্বলকে খতম করার জঘন্য প্রবণতা নেই। কাজেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।[৫]

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

কুরআন ও হাদীসে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে এ সবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। নিম্নে ইসলামী অর্থব্যবস্থার কিছু মূলনীতি পেশ করা হল :

১. আল্লাহ তা'আলা যেমন এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, তেমনি তিনি এর পালনকর্তাও বটে। কুরআন মাজীদের শুরুতেই তিনি নিজেকে 'জগতসমূহের প্রতিপালক' বলে ঘোষণা করেছেন। রিযিক দান করা আল্লাহ্‌র কাজ আর রিযিক অনুসন্ধান করা মানুষের কাজ। সমস্ত জীবের রিযিকের দায়িত্ব তাঁরই। ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ۔

ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। (সূরা হূদ, ১১ : ৬)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রিযিক ভাণ্ডার থেকে রিযিক তালাশ করার দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۔

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট রিযিক অন্বেষণ কর এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ১৭)

২. ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ, চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

৩. জীবিকার ক্ষেত্রে যদিও সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে, কিন্তু সৃষ্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধিকার সমান নয়। আর এই পার্থক্য একটি পর্যায় পর্যন্ত প্রকৃতিগত স্বভাবজাত। অর্থাৎ সকল মানুষের জন্য একই ধরনের জীবন উপকরণ হওয়া আবশ্যক নয় কিন্তু তা সবার জন্য থাকা আবশ্যক। জীবিকার ক্ষেত্রে পার্থক্য সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۔

আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩২)

৪. ধন-সম্পদ অবৈধভাবে কুক্ষিগত করা নিষিদ্ধ।

৫. মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মওজুত রাখা নিষিদ্ধ, বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্যতার সময়। একে শরী'আতে 'ইহ্তিকার' বলে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন।

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ۔

যে ব্যক্তি ইহ্তিকার (অন্যায়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করা) করে সে পাপী।[৬]

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ ۔

মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেউ যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যবস্তু মজুদ রাখে তবে সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ ও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[৭]

৬. স্বাভাবিক অবস্থায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা ইসলাম সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলাই মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সংকোচনকারী এবং রিযিক সম্প্রদারণকারী।[৮] কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতাগণ যদি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে, তখন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে।

৭. ইসলামে আয়-ব্যয়ের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার কোন অবকাশ নেই। ইসলাম মিতব্যয়িতাকে অপরিহার্য এবং অতিরিক্ত ব্যয় করাকে হারাম করে দিয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۔

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৭)

৮. ইসলাম মানুষের জন্য হালাল উপায়ে উপার্জন করতে নির্দেশ করেছে এবং অবৈধ উপায়ে উপার্জন করাকে হারাম করেছে। অধিকন্তু মানুষকে উপার্জন করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۔

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে। (সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৭০)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : 'হালাল রুজি সন্ধান করা ফরযের পর ফরয।'[৯]

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : 'নিজের হাতে উপার্জিত খাদ্যের ন্যায় উত্তম খাদ্য কখনো কেউ আহার করেনি। আল্লাহ্র নবী হযরত দাঊদ (আ) নিজের হাতে উপার্জিত খাদ্য থেকে আহার করতেন।'[১০]

৯. টাকা-পয়সা বিনিয়োগ না করে ঘরে ফেলে রাখা ইসলাম পসন্দ না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : 'কোন ব্যক্তি যদি মালদার কোন ইয়াতীমের অভিভাবক হয়, তবে সে যেন তা দ্বারা ব্যবসা করে।'[১১]

অনুরূপভাবে চাষাবাদ না করে কোন ভূমি ফেলে রাখাও ইসলামে জায়িয নেই। নবী কারীম (সা) কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি চাষাবাদ না করে ফেলে রাখায় সাহাবী হযরত হারিস মুযানী (রা) হতে খলীফা হযরত উমর (রা) তা ফেরত নিয়ে নেন।[১২]

১০. কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর নিকট জাতীয় সম্পদ সীমাবদ্ধ থাকুক ইসলাম তা সমর্থন করে না।

১১. ইসলাম সোনা-রূপাদ্বারা তৈজসপত্র তৈরি করাকে এবং পুরুষের জন্য সোনা-রূপা ও রেশম ব্যবহার করাকে হারাম ও অপব্যয় বলে ঘোষণা করেছে।

১২. ইসলামে উপার্জিত অর্থ-সম্পদের পুরোটাই ভোগ করার অধিকার ব্যক্তির নেই; বরং গরীব, দুঃখী এবং অসহায় লোকদেরও তাতে অধিকার রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে :

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ·

এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৯)

যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদি সবই এর অর্ন্তভুক্ত।

১৩. সুদযুক্ত সকল কাজ-কারবার, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার জুয়া এবং সর্বপ্রকার মজুতদারী ও কালোবাজারী ইসলামে নিষিদ্ধ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْاۤ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ·

হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ। (সূরা নিসা, ৪ : ২৯)

১৪. কোন ব্যক্তি উপার্জনের সম্ভাব্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বনের পরও যখন জীবনধারণের পক্ষে ন্যূনতম আবশ্যক তথা পেটের ভাত, পরনের কাপড় এবং বসবাসের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করতে না পারে, তখন তার উপরোক্ত বিষয়াদির ব্যবস্থা করে দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

১৫. অনাবাদী জমির মালিকানা রাষ্ট্রের। নবী (সা) বলেছেন : যে সকল অনাবাদী জমির সঙ্গত কোন মালিক নেই, তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের। তারপর তা তোমাদের।[১৩] অনাবাদী জমি রাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে কেউ আবাদ করলে সে-ই তার মালিক বলে বিবেচিত হবে।[১৪]

জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনে জীবিকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা-তদ্‌বীর করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা হলেন রিযিকদাতা। তবে রিযিক অন্বেষণ করার দায়িত্ব তিনি বান্দার উপর অর্পণ করেছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ·

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করবে। (সূরা জুমু'আ, ৬২ : ১০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۔

তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর আর তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ১৭)

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, তোমাদের কেউ যেন জীবিকার অন্বেষণ ছেড়ে অলসভাবে বসে না থাকে।[১৫] অর্থাৎ বৈধ জীবিকার কোন একটি অবলম্বন করা প্রতিটি মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের অপকারিতা

ইসলামে উপার্জনের গুরুত্ব অনেক। তবে তা হালাল উপায়ে হওয়া আবশ্যক। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে বিশেষ তাকীদ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۔

হে মানব জাতি ! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারা, ২ : ১৬৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

طَلَبُ كَسَبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ۔

হালাল রুজি সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরয।[১৬]

তিনি আরো ইরশাদ করেন : 'আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবূল করেন না।" আহারের ব্যাপারে তিনি নবী-রাসূলগণকে যেরূপ হুকুম করেছেন মু'মিনদেরকেও অনুরূপ হুকুম করেছেন। তিনি নবী-রাসূলগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন :

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۔

হে রাসূলগণ ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর ; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ৫১)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ۔

হে মু'মিনগণ ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযিক দান করেছি তা থেকে আহার কর। (সূরা বাকারা, ২ : ১৭২)

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন : এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে উস্‌কো খুসকো অবস্থায় উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে মুনাজাত করে বলল, হে আমার রব ! হে আমার প্রতিপালক ! হে আমার প্রভু ! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় বস্তু হারাম, তার লেবাস-পোশাক হারাম এবং হারাম মালের দ্বারাই তার জীবন লালিত পালিত। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির দু'আ কেমন করে কবূল হবে।[১৭]

অন্য হাদীসে আছে : 'যে দেহ হারাম মালদ্বারা লালিত-পালিত, তা কখনো জান্নাতে যাবে না এবং জাহান্নামই এর জন্য উপযুক্ত ঠিকানা।'[১৮]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের অপকারিতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

উৎপাদনের উৎস ও উপকরণ

মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যাবতীয় অপরিহার্য উপায়-উপাদান বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হতেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ٠

তিনিই পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাকারা, ২ : ২৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ٠

তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন। (সূরা লুক্মান, ৩১ : ২০)

মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মুক্ত ও নির্মল বায়ু প্রকৃতির বুকে সতত প্রবহমান। পানের প্রয়োজন পূরণের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পানি। আলো ও উত্তাপও অনুরূপ সহজলভ্য। আলো, বাতাস ও পানি এই তিনটি প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সাধারণত মানুষকে বিশেষ কোন শ্রম, মেহনত বা সাধনা করতে হয় না। কিন্তু এগুলো ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনই মেহনত ছাড়া হয় না। মানুষের খাদ্য ও লেবাস-পোশাকের চাহিদা পূর্ণ করার জন্য যে সকল উপাদানের আবশ্যক তা যদিও এ পৃথিবীতে অফুরন্তভাবে ছড়িয়ে আছে কিন্তু এগুলো সবই উপার্জন সাপেক্ষ। জীবিকার জন্য অর্থ-সম্পদ আহরণের মূল উপাদান ও উপকরণ প্রধানত নিম্নরূপ :

১. ভূমি বা কৃষি, ২. ব্যবসা-বাণিজ্য, ৩. শিল্প, ৪. মূলধন, ৫. শ্রম, ৬. হেবা ও অসিয়্যাত, ৭. উত্তরাধিকার, ৮. বায়তুলমাল।[১৯]

ভূমি ব্যবস্থা : ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমির গুরুত্ব

মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্য, শিল্পপণ্যের কাঁচামাল ভূমি হতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই মানুষের জীবনে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ ٠

আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১০)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ٠

তিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর। (সূরা মূল্ক, ৬৭ : ১৫)

মাটির পরতে পরতে জীবিকার যে অশেষ সম্ভাবনাময় ভাণ্ডার লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে, তা খুঁজে বের কর এবং জমি থেকে অধিক ফলনের উদ্যোগ গ্রহণের ইঙ্গিত এ আয়াতে নিহিত রয়েছে।

ভূমির মালিকানা

আল্লাহ্ তা'আলা এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এবং একচ্ছত্র মালিক। সৃষ্ট জগতের এই অফুরন্ত দ্রব্যসামগ্রীর কোন একটিও তাঁর ভোগ-ব্যবহারের দরকার হয় না। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। তিনি এসব কিছু মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষেরই ভোগ-ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধানও দিয়েছেন। এই বিধি-বিধানের আওতায় ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানাকেও ইসলামে স্বীকার করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ٠

তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করবে। (সূরা তাওবা, ৯ : ১০৩)

এখানে 'তাদের সম্পদ' বলে ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ ও শর্তধীন মালিকানার কথা স্বীকার করা হয়েছে।

ভূমির প্রকারভেদ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভূমির বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে :

১. অনাবাদী ভূমি, এখনো যার উপর কারো মালিকানা অর্পিত হয়নি। যেমন : নতুন চর, বন-জঙ্গল বা পরিত্যক্ত ভূমি কিংবা যার মালিক মৃত অথচ তার কোন উত্তরাধিকারী নেই।

২. মুসলমানদের ভোগাধিকারভুক্ত জমি।

৩. অমুসলিমদের ভোগাধিকারভুক্ত জমি।

৪. যেসব জমি-জায়গাকে পূর্বেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রথম প্রকার জায়গা-জমি আবাদ ও চাষোপযোগী করে তাতে ফসল উৎপাদনের জন্য ভূমিহীন লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বন্টনযোগ্য।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

وَلِلْاَمَامِ اَنْ يُقْطِعَ كُلَّ مَوَاتٍ وَكُلَّ مَا كَانَ لَيْسَ لِاَحَدٍ فِيْهِ مِلْكٌ وَلَيْسَ اَحَدٌ يَعْمَلُ فِيْ ذٰلِكَ بِالَّذِيْ يَرَى اَنَّهُ خَيْرٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَاَعَمُّ نَفْعًا ٠

অনাবাদী, মালিকানাহীন এবং উত্তরাধিকারহীন জায়গা-জমি এবং যে জমিতে কেউ চাষাবাদ করে না, তা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হক্দার মুসলমানদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতে পারেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) মদীনায় হিজরত করে আসার পর এখানকার অনাবাদী ও পড়ে থাকা জমি ন্যায়ানুগভাবে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন। অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ عَمَّرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا ٠

যে ব্যক্তি কোন মালিকানাহীন অনাবাদী জমি আবাদ করবে, সে-ই এর ভোগাধিকার ও মালিকানা লাভ করবে।[২০]

অপর এক হাদীসে আছে :

مَنْ أَحْيَ مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ ‏.

যে ব্যক্তি অনাবাদী মৃত জমি আবাদ করবে, সে-ই এর মালিক হবে।[২১]

মুসলমানদের ভোগাধিকারে যে জমি ছিল তা তাদের দখলেই থাকবে এবং তারাই তা ভোগ করবে। চতুর্থ প্রকার জমি ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পরও পূর্বানুরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনই থাকবে। রাষ্ট্র এসব সম্পদ নিজস্ব কাজে ব্যবহার করবে। অথবা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করাবে।

আর তৃতীয় প্রকার জমি অর্থাৎ অমুসলিমদের অধিকারভুক্ত জমির ব্যবস্থা সাধারণত তিন প্রকার হতে পারে :

ক. অমুসলিম বাসিন্দারা যদি যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট পরাজিত হয় অথবা চুক্তিভঙ্গ করার পর মুসলমানগণ বল প্রয়োগ করে তাদেরকে পরাভূত করে, তবে তারা 'যিম্মী' হিসাবে গণ্য হবে। তাদের ধন-সম্পদ এবং জায়গা-জমি গনীমতের মালরূপে পরিগণিত হবে এবং এর বিলি-ব্যবস্থা, চাষাবাদ ও বন্দোবস্তের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। ইচ্ছা করলে শর্তসাপেক্ষে পূর্বের চাষীদের মধ্যেও তা চাষাবাদের জন্য বন্টন করে দিতে পারবে। তবে তারা তাদের মালিকানা আর ফিরে পাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের ইয়াহূদীদের সাথে এই নীতিই প্রয়োগ করেছিলেন।

বস্তুত ইসলামের ভূমিনীতি নির্ধারণের ব্যাপারে খায়বারের ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সপ্তম হিজরী সনে খায়বারবাসীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের সমস্ত জমি ও খেজুরগাছ এই শর্তে বন্দোবস্ত দেন যে, তারা এর অর্ধেক ফলন বা ফসল প্রদান করবে।[২২]

খ. যে সব অমুসলিম জাতি কোন জোরজবরদস্তি ব্যতীত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করবে। ইসলামী রাষ্ট্র চুক্তি অনুসারেই তাদের সকল অধিকার রক্ষা করবে। তাদের নিজস্ব জায়গা-জমি তাদের ভোগ-দখলেই থাকবে। আর চুক্তি অনুসারে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের দেয় কর আদায় করতে থাকবে। খায়বার বিজয়ের পর ফাদাক নামক স্থানের অধিবাসীগণ নবী কারীম (সা)-এর সাথে সন্ধি করার জন্য নিজেদের পক্ষ হতে উদ্যোগী হয়েছিল এবং তাদের জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ইসলামী রাষ্ট্রকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। নবী কারীম (সা) তাদের আবেদনক্রমে তাদের সাথে সন্ধি করেন। ফাদাকের জমি লোকদের মধ্যে বন্টন করা হয়নি; বরং তা এর অধিবাসীদের হাতেই রেখে দেওয়া হয়।[২৩] ফাদাক অঞ্চল হতে যা আয় হতো, তা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যয় করা হতো।[২৪]

গ. যে সব অমুসলিম ভূমি মালিক মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র হতে পালিয়ে অন্যত্র চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এর মালিক বা উত্তরাধিকারী কেউই অবশিষ্ট থাকে না, এসব জায়গা-জমি বিজয়ী মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র তা জনগণের মধ্যে পুনর্বন্টন করবে। হযরত উমর (রা) এই নীতি অবলম্বন

করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যে সব জমি পারস্য সম্রাটগণ তাদের বংশধর কিংবা যুদ্ধে নিহত কিংবা পালিয়ে দেশত্যাগকারী লোকদের মালিকানাভুক্ত ছিল, হযরত উমর (রা) তা সবই রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করে নিয়েছিলেন।[২৫]

চাষাবাদ

মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশই কৃষিকার্যের সাহায্যে লাভ করা যায়। এ জন্য অর্থনীতির দৃষ্টিতে ভূমি কর্ষণ ও চাষাবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন লোক নিজে জমি চাষ করতে না পারলে কিংবা নিজে চাষ করতে না চাইলে সে অন্যের দ্বারাও তা চাষ করাতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُوْلُ أَرْضِيْنَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَخَاهُ ـ

যার অতিরিক্ত জমি আছে, সে হয়তো নিজে চাষ করবে অথবা তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে।[২৬] এ পর্যায়ে হযরত রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন :

انَّمَا يَزْرَعُ ثَلٰثٌ رَجُلٌ لَهُ اَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مَنَحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرٰى اَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ ـ

সাধারণত তিন প্রকার মানুষ কৃষিকাজ করে থাকে। এক. যার নিজের জমি আছে, সে নিজে তা চাষাবাদ করবে। দুই. যাকে চাষ করার জন্য জমি দান করা হবে, সে তা চাষাবাদ করবে—যা তাকে দান করা হয়েছে। তিন. যে লোক স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা নিয়েছে, সে তা চাষাবাদ করবে।[২৭]

অনাবাদী জমি সরকারের আদেশক্রমে যদি কেউ আবাদ করে, তবে সে-ই এর মালিক হবে। এইরূপ জমি চাষ না করে কেবল সীমানা চিহ্নিত করে রাখলে তিন বছর পর এতে তার কোন অধিকার থাকবে না। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন :

"যে ব্যক্তি জমির সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে, কিন্তু চাষ করেনি, তিন বছর পর তাতে তার কোন অধিকার থাকবে না।"[২৮]

এ জাতীয় ভূমি সরকার উক্ত ব্যক্তি থেকে বাজেয়াপ্ত করে অন্য কারো হাওয়ালা করবে। যেন ভূমি আবাদ করে উক্ত ব্যক্তি নিজে উপকৃত হয় এবং মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করতেও সক্ষম হয়। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর শাসনামলে কোন জমি তিন বছর অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখলে তা বেদখল হয়ে যেতো। এ কথা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) 'উমদাতুল কারী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

বর্গাচাষ

বর্গাচাষের বিষয়টি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরবীতে একে 'মুযারা'আ' (مُزَارَعَةُ) বলে। শরী'আতের পরিভাষায় :

هِيَ عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ ـ

যমীনের উৎপাদিত ফসলের কিয়দাংশের বিনিময়ের উপর সম্পাদিত চুক্তিকে 'মুযারা'আ' বলে"।[২৯]

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে আট শর্তে বর্গাচাষ জায়িয। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার বিজয়ের পর তথাকার অধিবাসীদের সাথে মুযারা'আ বা বর্গাচাষ পদ্ধতির কারবার করেছেন। বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে :

عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَّعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا .

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে সেখানকার ভূমি বন্দোবস্ত দিয়েছেন এই শর্তে যে, তারা তা চাষাবাদ করবে এবং এর থেকে যা উৎপাদিত হবে তার অর্ধেক প্রদান করবে।[৩০]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যেমনিভাবে মুযারা'আতের পন্থায় শ্রম বিনিয়োগ বৈধ, তেমনিভাবে আমার মতে মুযারা'আ বা বর্গাচাষও বৈধ। এতে একজন ভূমির যোগান দেয় এবং অন্যজন তার শ্রম বিনিয়োগ করে। আর লাভে অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলে উভয়ই অংশীদার হয়।[৩১] বর্গাচাষ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত আটটি :

১. ভূমি উৎপাদন উপযোগী হওয়া।

২. ভূমির মালিক এবং চাষী উভয়ই আকদ সম্পাদন করার উপযুক্ত হওয়া অর্থাৎ জ্ঞানবান ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া।

৩. বর্গাচাষের মেয়াদ উল্লেখ থাকা।

৪. বীজ কে দিবে তা উল্লেখ থাকা।

৫. যে ব্যক্তি বীজ সরবরাহ করবে না তার অংশ কতটুকু হবে তা সুস্পষ্ট বলে দেওয়া।

৬. চাষীর জন্য ভূমি মালিক কর্তৃক ভূমি সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত করে দেওয়া। তার পক্ষ থেকে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকা।

৭. ফসল উৎপাদনের পর মালিক ও চাষী উভয়ই ফসলের মধ্যে অংশীদার হওয়া।

৮. কী জাতীয় বীজ বপন করা হবে তা পরিষ্কারভাবে আলোচিত হওয়া।[৩২]

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে নিম্নলিখিত চারভাবে বর্গাচাষ হতে পারে : (ক) জমি ও বীজ একজনের এবং গরু, কৃষিযন্ত্র ও শ্রম অন্যজনের, (খ) জমি একজনের আর শ্রম, গরু, কৃষিযন্ত্র ও বীজ অপরজনের, (গ) জমি, বীজ, গরু ও কৃষিযন্ত্র একজনের এবং শ্রম অপরজনের। উপরোক্ত নীতিতে বর্গাচাষ করা হলে তা সর্বসম্মতভাবে জায়িয। (ঘ) জমি, গরু ও কৃষিযন্ত্র একজনের আর বীজ এবং শ্রম অপরজনের। শেষোক্ত পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন কোন ফিক্‌হ্‌বিদ আপত্তি করলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এভাবেও বর্গাচাষ বৈধ।[৩৩]

ভূমি উন্নয়ন ও সেচ ব্যবস্থা

মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর শতকরা অন্তত নব্বই ভাগ ভূমি হতেই লাভ হয়। কাজেই কৃষিকার্যকে সুষ্ঠু ও দোষত্রুটিমুক্ত করে তোলা প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

কৃষিকার্য ও ভূমি উন্নয়নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং উন্নত প্রণালীতে এই কাজ সম্পাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। কৃষিদ্বারা একদিকে যেমন ধান, গম, আলু ইত্যাদি

খাদ্যশস্য লাভ করা যায়, অন্যদিকে পাট, রাবার, তুলা ইত্যাদি অর্থকরী শৈল্পিক উপাদানও তা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। শাকসবজিও এই কৃষির মাধ্যমেই অর্জন করা হয়। এমনিভাবে মানুষের গৃহপালিত পশুর খাদ্যের মূল উৎস এই কৃষিই। কৃষিকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হওয়ার পথে যেসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর করা আবশ্যক। অন্যথায় কৃষিকার্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। অনুন্নত ধরনের জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করলে, সার প্রয়োগের মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি করলে এবং অন্যান্য দিক দিয়ে জমির অপচয় ও ক্ষয় প্রতিরোধ করলে শস্যোৎপাদন প্রচেষ্টা বিপুলভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে। কৃষির অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের সবচাইতে বড় মাধ্যম হলো সেচের উপকরণ সহজলভ্য ও সম্প্রসারিত করা। এর জন্য স্থানে স্থানে খাল-নালা খনন করা এবং পানির পাম্প স্থাপন করা খুবই জরুরী। সেচকাজে ব্যবহৃত খাল-বিল, নদী-নালা, কূপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে—

১. পুকুর, ঝিল, কূপ ও ঝরণা যদি ব্যক্তিমালিকানাধীন না হয়, তবে এসব থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِىْ ثَلٰثٍ فِى الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ .

সকল মুসলমান তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে সম অংশীদার : (ক) পানি, (খ) ঘাস ও (গ) আগুন।[৩৪]

২. যদি এই পানি কারো মালিকানাধীন হয়, তবুও স্বাভাবিক অবস্থায় এ পানি অন্য মানুষও ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে তাদের অধিকার রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই পানি কেনাবেচা বৈধ নয়। অবশ্য মানুষ ও গবাদিপশুর পান ও গোসল করার মতো প্রয়োজন ছাড়া সেচকাজে ব্যবহার করার জন্য জমির মালিকের অনুমতি নেয়া আবশ্যক। আর মালিকের নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে অনুমতি দান করা। কিন্তু অনুমতি দিলে যদি মালিকের নিজের সেচকার্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, তবে সে অন্য লোকদেরকে এ পানি হতে সেচকার্য করা থেকে বিরত রাখতে পারবে।[৩৫]

৩. সেচকার্যের জন্য প্রয়োজনে অধিক পরিমাণে খাল খনন করতে হবে। আর এ সকল ব্যয় বায়তুলমাল তথা সরকারি কোষাগার বহন করবে। বায়তুলমাল সম্পূর্ণ বহন করতে না পারলে সরকার এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বিত্তবানদের বাধ্য করবে।[৩৬]

৪. পানি সেচের খাল ও কূপ খনন করা জনগণের স্বার্থে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হতে হবে; কর বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়। কাজেই সরকার কর্তৃক খাল ও কূপ খননের বিনিময়ে কর নেয়া উচিত নয়। যদি নিতেই হয়, তবে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, ঐ পরিমাণ নিবে; এর বেশি নয়। ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ব্যয় বায়তুলমাল থেকেই সরবরাহ করতে হবে।[৩৭]

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লিখিত নীতিমালার প্রেক্ষিতে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তাঁর খিলাফতকালে অনেক খাল খনন করা হয়, বাঁধ নির্মাণ করা হয়, পুকুর পাকা, কূপ ও ছোট ছোট খাল খনন করা হয়। এমনিভাবে তিনি পানি সমস্যার সমাধান করে কৃষি ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। এ পর্যায়ে দজলা

নদী থেকে কাটা বসরার নহরে আবূ মূসা, কূফার আতবার এলাকার নহরে সান্দান এবং মিসরের নহরে আমীরুল মু'মিনীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর পরবর্তীকালে নহরে হার, নহরে দাবীস, নহরে উসাবিরা, নহরে আমর, নহরে হারব প্রভৃতির উল্লেখ আজও ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজিতে দেখতে পাওয়া যায়। এ সব নহর ও খালের সংখ্যা লক্ষাধিক।[৩৮]

সরকারি পর্যায়ে ভূমি বন্টন ব্যবস্থা

সরকারি পর্যায়ে কেবলমাত্র সেসব ভূমি বন্টন করা যেতে পারে, যা কারো মালিকানাধীন নয়। আর এসব ভূমি ঐসব ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমির মালিক লোকদের মধ্যে বন্টন করা হবে, যারা এসব ভূমি আবাদ ও চাষোপযোগী করে তুলতে এবং তা হতে ফসল ফলাতে ইচ্ছুক ও সক্ষম। এই ভূমিসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে আবাদ করার শর্তে তাদেরকে দেওয়া হবে। তারা যদি এই নির্দিষ্ট মেয়াদ তথা তিন বছর মেয়াদের মধ্যে আবাদ করে, তবে এই জমি তাদের অধিকারেই থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবাদ না করলে তা সরকারের নিকট প্রত্যার্পিত হবে এবং সরকার তা অপর লোকদের মধ্যে তা পুনর্বন্টন করবে। এই ভূমি বন্টনের ব্যাপারে জরুরী শর্ত হলো : (ক) ঐ জমি কোন নাগরিকের মালিকানাভুক্ত হবে না, (খ) ঐ ভূমি সাধারণ মানুষের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত হবে না এবং (গ) এমন ভূমিও হবে না, যা দেশের সাধারণ নাগরিকদের জন্য অপরিহার্য। যেমন ধাতু বা সম্পদের খনি ইত্যাদি। এই জাতীয় ভূমি হলে তা কারো ব্যক্তিগত মালিকানায় দেওয়া জায়িয হবে না। এই তিন প্রকার ভূমি ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার ভূমি সরকার যাকে ইচ্ছা বন্টন করে দিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, ঘুষ কিংবা কোন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না।

ইসলামের আবির্ভাবকালে আরব দেশের জায়গা-জমির তিন অবস্থা ছিল :

১. বহু ভূমি ছিল ব্যক্তি-মালিকানাভুক্ত।

২. বেশ কিছু ভূমি ছিল, যা কারো মালিকানাধীন ছিল না।

৩. গৃহপালিত পশুর সাধারণ চারণভূমিরূপে নির্দিষ্ট ছিল বেশ কিছু ভূমি।

নবী করীম (সা) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর সর্বপ্রথম মালিকানাবিহীন অনাবাদী ভূমি আবাদ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন : এই মৃতভূমি যে আবাদ করবে, সে-ই এর মালিক হবে।[৩৯] এ ঘোষণার পর সাহাবীগণ সাধ্যানুসারে ভূমি আবাদ করা এবং এর মালিক হওয়ার কাজে ব্রতী হলেন। এভাবে বহু ভূমি সাহাবীদের মধ্যে বন্টন হয়ে যায়।

ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমি বন্টনের এটাই মূলনীতি। অনাবাদী ভূমি আবাদ করা অথবা ভূমিহীন কৃষক বা মুহাজিরদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ হতে কাউকে ভূমি দান করা ইসলামে জায়িয। একে আরবীতে 'ইক্তা' বলে। নবী কারীম (সা) ইক্তারূপে হযরত আবূ বকর, উমর, আলী, বিলাল, যুবায়র (রা) প্রমূখ সাহাবীগণকে ভূমি দান করেছিলেন।[৪০] এভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনও একাধিক ব্যক্তিকে ইকতারূপে ভূমি দান করেছেন। 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে :

'যদি ইক্তার উদ্দেশ্য হাসিল না হয় অথবা যদি অন্যায়রূপে বা অসদুদ্দেশ্যে ইক্তা প্রদান করা হয়, তবে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। হযরত উমর (রা) নবী কারীম (সা) কর্তৃক প্রদত্ত হযরত বিলাল ইব্ন হারিস মুযানীর ইক্তার একাংশ এ জন্যই ফেরত নিয়েছিলেন যে, তিনি এই ভূমি যথাযথভাবে আবাদ করতে সক্ষম হননি। অনুরূপভাবে খলীফা হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রা) আপন পরিবারের সমস্ত জায়গীর এ জন্য বাজেয়াপ্ত করেছিলেন যে, এগুলো উমাইয়া শাসনবর্গ স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে প্রদান করেছিলেন।

এমনিভাবে রাওহ ইব্ন ওয়ালীদের জায়গীর তিনি এ জন্য বাজেয়াপ্ত করেছিলেন যে, তাকে অন্যের ভূমি অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়েছে।[৪১]

এ পর্যায়ে এ কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, সরকারিভাবে যে ভূমি জনগণের মধ্যে বন্টন করা হবে এরদ্বারা কোনরূপ সামন্তবাদী বা জায়গীরদারী প্রথা চালু করা যাবে না। যার পক্ষে যে পরিমাণ ভূমি চাষাবাদ, উৎপাদন করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব, তাকে ঐ পরিমাণ ভূমিই দেওয়া হবে।

সরকারি মালিকানা ছাড়া ক্রয়কৃত ভূমির মালিকগণ যদি বেশির ভাগ আবাদী ভূমি হস্তগত করে বসে এবং গরীব কৃষকের যদি ভূমির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান দুই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে : (১) লা-ওয়ারিস, পতিত ও অনাবাদী কৃষি ভূমি কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বন্টন করে দেওয়া। (২) ভূমির মালিকদের নিকট কৃষিকার্যের অপ্রয়োজনীয় ভূমি থাকলে এসব ভূমি তাদের দখলমুক্ত করে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দিবে।[৪২]

ভূমির ভোগ-নীতিমালা

ভূমি মালিক নিম্নলিখিত পন্থায় ভূমি ভোগ ও ব্যবহার করতে পারে :

ক. ভূমি মালিক নিজে তার ভূমি চাষ করবে।

খ. নিজে চাষ করতে না পারলে বা না করলে কিংবা নিজে যে পরিমাণ চাষ করতে পারে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ ভূমি থাকলে, তা অন্যের দ্বারা চাষ করাবে। অথবা চাষের কাজে অন্য লোকের সাহায্য গ্রহণ করবে। অপরের দ্বারা চাষ করালে এর তিনটি প্রক্রিয়া হতে পারে :

১. কোন দিনমজুরের দ্বারা নিজের তত্ত্বাবধানে ভূমি চাষ করাবে, ২. উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের শর্তে কাউকে তা চাষ করতে দিবে, ৩. অথবা প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থের বিনিময়ে কাউকে এক বছরের জন্য এর ভোগাধিকার দান করবে।

গ. নিজের ভোগ ও ব্যবহারের প্রয়োজন না হলে, অন্য কথায় কারো প্রয়োজনাতিরিক্ত ভূমি থাকলে তা অন্য কোন ভূমিহীনকে চাষাবাদ ও ভোগ-দখল করতে দিবে। ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের প্রয়োগ উল্লিখিত যে কোন পন্থায়ই সঙ্গত বলে প্রমাণিত।[৪৩]

ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও ফযীলত

জীবনোপকরণের মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ব্যবসা। এজন্য মাধ্যমটির সম্প্রসারণ করা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অতীব জরুরী। আর এটা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইসলামী ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন :

فَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مِنْ اَكْبَرِ الْوَسَائِلِ الْمَبَاعَثَهِ عَلَى الْعَمَلِ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاَصْلُ اَسْبَابِ الْحَضَارَةِ وَالْعِمْرَانِ ـ

এই পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যবসা হচ্ছে সবচাইতে বড় জীবনোপায়ের মাধ্যম এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির উপকরণাদির মধ্যে সবচেয়ে হালাল এবং পূতপবিত্র উপকরণ।[৪৪]

সুতরাং ইসলামও তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে একে দু'ভাগে ভাগ করেছে। একটি হলো, সহীহ্ ব্যবসার নীতিমালা এবং অপরটি হলো ফাসিদ ব্যবসার নীতিমালা। প্রথমটির ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে ইসলাম দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবসার প্রতি নিন্দাবাদ ব্যক্ত করেছে এবং সেসব প্রতিরোধ করার জন্য বিধি-বিধানও প্রণয়ন করেছে।

বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত বেশি মনোযোগ দেয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে জাতি তত বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি বা দেশের অধিবাসীদের আগ্রহ নেই, তারা সর্বদা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ধরেই এক জাতির তাহযীব, তামাদ্দুন, রাজনীতি এমনকি ধর্মের উপরও আধিপত্য বিস্তার করে। তাদেরকে নিজেদের দাসে পরিণত করে একনায়ক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথেই এই উপমহাদেশ ইংরেজ বেনিয়াদের হস্তগত হয়। এই ইজারাদারীর ছদ্মবরণেই মিসর দখল করা হয়েছিল। এমনিভাবে আরো বহুদেশ এই ব্যবসার পথেই অন্য দেশের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

এইজন্যই ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করেছে। এর ফযীলত ও বরকতের কথাও শুনিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ـ

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে। (সূরা জুমু'আ, ৬২ : ১০)

এখানে 'ফযল' বা অনুগ্রহের অর্থ জীবিকা ও সম্পদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ـ

হে মু'মিনগণ ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর। (সূরা বাকারা, ২ : ২৬৭)

প্রখ্যাত তাবিঈ মুজাহিদ (র) (مَا كَسَبْتُمْ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে كَسَبَ (উপার্জন) অর্থ হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য।[৪৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ـ

সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী হাশরের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথী হবে।[৪৬]

কানযুল উম্মাল গ্রন্থের এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : 'যে ব্যক্তি ব্যবসা করে, তার ঘরে প্রাচুর্য ও কল্যাণ সৃষ্টি হয়।'

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ ·

কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে পাপী হিসাবে উঠানো হবে। অবশ্য যারা পরহেযগারী, ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার সাথে ব্যবসা করেছে, তাদের কথা ভিন্ন।[৪৭]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে। তবে তা হালাল পন্থায় হতে হবে; হারাম তরীকায় নয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেনদেনের স্বচ্ছতা, বৈধতা ও সুষ্ঠুতা নিম্নোক্ত নীতিমালার উপর নির্ভরশীল :

১. ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতা যেহেতু পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই বাণিজ্যিক ব্যাপারে উভয় পক্ষের সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে। মুনাফার ক্ষেত্রে একজনের বেশি মুনাফা আর অপরজনের বেশি লোকসান, এমনটি যেন না হয় এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয় উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ·

সৎকর্ম ও তাক্ওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। (সূরা মায়িদা, ৫ : ২)

২. কারবারে উভয় পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি থাকা আবশ্যক। জোরপূর্বক সম্মতি আদায় করার অবকাশ নেই। এ ধরনের সম্মতি বৈধ বলে গণ্য হবে না। ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ·

হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে না কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হলে ব্যবসা করা বৈধ। (সূরা নিসা, ৪ : ২৯)

৩. চুক্তি সম্পাদনকারীদের মধ্যে ব্যবসার যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ও আযাদ হতে হবে। অবুঝ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগল হলে ব্যবসার চুক্তি সম্পাদন সহীহ হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلْثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ حَتّٰى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ ·

তিন ব্যক্তির উপর শরী'আতের নির্দেশ আরোপিত হবে না—পাগল, যতক্ষণ না স্বাভাবিক হয়; ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয় ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয়।[৪৮]

৪. ব্যবসায় কোন প্রকার প্রতারণা, আত্মসাৎ, ক্ষতি ও পাপাচার উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না অর্থাৎ ইসলামী শরী'আতে যেসব বস্তুর কারবার হারাম, সেসবের ব্যবসা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ عَلَى الرَّجُلِ بِيَدِهِ ۔

উত্তম উপার্জন হচ্ছে যা কল্যাণকর বেচাকেনা (বায়-এ মাবরূর) এবং তার নিজ হাতের উপার্জন।[৪৯] আর 'মাবরূর' বেচাকেনা হচ্ছে, যাতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণ নিহিত থাকে। তাতে প্রতারণা, আত্মসাৎ ও আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী থাকবে না।[৫০]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ۔

(নিজে) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং (অন্যকে) ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয় (অবৈধ)।

যেসব কর্মকাণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্যকে বাতিল করে দেয়

১. সম্পদ বাড়ানো এবং মুনাফা অর্জনের জন্য এরূপ লেনদেন করা, যাতে একজনের নির্ঘাত লোকসানের মাধ্যমে অপরের মুনাফা অর্জিত হয়। যেমন জুয়া ও লটারী। কুরআন মাজীদে জুয়া, লটারী সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু—শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৯০)

২. মুনাফা অর্জন ও সম্পদ বৃদ্ধির যেসব ব্যবসায় উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পাওয়া যায় নি; বরং জবরদস্তিমূলক সম্মতিকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির স্থলাভিষিক্ত ধরে নেওয়া হয়েছে, যেমন সুদের ব্যবসা বা শ্রমিককে তার শ্রমের তুলনায় কম পারিশ্রমিক প্রদান করা[৫১] এ রূপ করা হারাম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۔

আল্লাহ্ তা'আলা বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। (সূরা বাকারা, ২ : ২৭৫)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ ۔

রাসূলুল্লাহ (সা) নিরূপায় ব্যক্তি থেকে কোন বস্তু খরিদ করতে নিষেধ করেছেন।[৫২] অর্থাৎ তার অনন্যোপায় অবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা গ্রহণ করা জায়িয নেই। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (র) জবরদস্তি সম্মতিকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫৩]

৩. এমন ব্যবসা করা যা ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ অথবা এমন বস্তু ক্রয় করা যা মূলগত দিক থেকে অপবিত্র। যেমন : শরাব, মৃত বস্তু, প্রতিমা, শূকর ইত্যাদির ব্যবসা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ ۔

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকর মাংস। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩)

এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ ٠

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : 'আল্লাহ্ তা'আলা মদ ও মাদক দ্রব্য, মৃত, শূকর ও প্রতিমার বেচাকেনাকে হারাম করে দিয়েছেন।'[৫৪]

৪. উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও যেসব লেনদেনে কলহ-বিবাদের আশংকা থাকে এবং যেসব লেনদেনে কোন এক পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সেসব লেনদেন জায়িয নয়। যেমন পণ্য কিংবা মূল্য অথবা উভয়টি অস্পষ্ট রাখা। অথবা একটি লেনদেনকে দু'টো লেনদেনে পরিণত করা। যেমন বলা হল, যদি এটি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় তবে এর মূল্য একশত টাকা আর বাকীতে কিনলে দুইশত টাকা। অথবা বেচাকেনার মধ্যে এমন শর্ত আরোপ করা যা উক্ত লেনদেনের অংশ বা রুকন নয়। এসব লেনদেনে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে কলহ-বিবাদেরই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ ٠

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক বেচাকেনাকে দুই বেচাকেনায় রূপান্তরিত করতে নিষেধ করেছেন।[৫৫]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে :

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعٍ وَّشَرْطٍ ٠

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেচাকেনার সাথে (বাইয়ের) শর্ত আরোপ করতে নিষেধ করেছেন।[৫৬]

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে :

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِىْ ٠

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে পণ্য আমার নিকট নেই তা বেচাকেনা করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন।[৫৭]

৫. যেসব লেনদেনে ধোঁকা ও প্রতারণা নিহিত আছে, এ জাতীয় প্রতারণামূলক লেনদেন করতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন। যেমন পাথরের টুকরা মিশিয়ে কোন বস্তু বেচাকেনা করা ইত্যাদি।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে :

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ٠

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাথর নিক্ষেপ করে বেচাকেনা করতে এবং প্রতারণামূলক লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।[৫৮]

অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে :

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ٠

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন বস্তু ছুঁয়ে অথবা ছুঁড়ে দিয়ে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।[৫৯]

হাদীসে আরো উল্লেখ রয়েছে :

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّجَشِ ·

রাসূলুল্লাহ্ (সা) লেনদেনে জালিয়াতি ও ফটকাবাজারী করতে নিষেধ করেছেন।[৬০]

এসব লেনদেনের মধ্যে যেহেতু জুয়া অথবা ক্রেতা বা বিক্রেতার যে কোন একজনের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিংবা তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে, এজন্য এ জাতীয় লেনদেনকে ইসলাম বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।

হাদীসে আরো উল্লেখ রয়েছে :

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ ·

রাসূলুল্লাহ্ (সা) (শহরবাসী লোকদের) শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাত করে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।[৬১]

এ জাতীয় বেচাকেনার উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরের লোকদের থেকে চড়া মূল্য আদায় করা বা গ্রামের কৃষকদের থেকে সস্তা দামে খাদ্যশস্য খরিদ করা। লক্ষ্য হলো, অধিক মুনাফাখোরী। এ কারণে ইসলামে এ জাতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ।

বৈধ ও অবৈধ ব্যবসা

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধের বিষয়টি ইসলামে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করা এবং বৈধ পন্থায় ব্যবসা করা অপরিহার্য। যারা অবৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ ·

কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে পাপী হিসাবে উঠানো হবে। অবশ্য যারা পরহেযগারী, ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার সাথে ব্যবসা করেছে তাদের কথা ভিন্ন।[৬২]

শিল্পের গুরুত্ব ও মূলনীতি

মানুষের জীবনোপকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো শিল্প কারখানা। ব্যবসার উন্নতি শিল্প কারখানার উন্নতির উপর অনেকটা নির্ভরশীল। বস্তুত শিল্প প্রধানত দুই প্রকার : ১. কুটির শিল্প ও ২. যন্ত্র শিল্প। এই উভয় প্রকারের শিল্পের উল্লেখ কুরআন মাজীদে পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে :

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ·

তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি (যা তৎকালীন শরী'আতের জায়িয ছিল ইসলামী শরী'আতে তা বৈধ নয়) হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (সূরা সাবা, ৩৪ : ১৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ·

তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে এসো। তারপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন সে বললো, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন তা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো, তখন সে বললো, তোমরা গলিত তাম্র আন। আমি তা ঢেলে দেই এর উপর। (সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ৯৬)

এই আয়াতে লোহা ও তামার ব্যবহার এবং এর শিল্প গড়ে তোলার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۔

হে বনী আদম ! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৬)

এই পোশাকই মানুষকে শীত-গ্রীষ্মের প্রবল আক্রমণ ও শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে। ইরশাদ হয়েছে :

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ ۔

এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৮১)

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

... وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ۔

... যারা মানুষের উপকার সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌ-যানসমূহে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৬৪)

মুস্তাদরাকে হাকেম গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ) বর্ম তৈরি করতেন। হযরত আদম (আ) কৃষিকাজ করতেন। হযরত নূহ (আ) কাঠমিস্ত্রীর কাজ করতেন। হযরত ইদরীস (আ) দর্জির কাজ করতেন এবং মূসা (আ) মেষ চরাতেন।[৬৩]

চামড়া শিল্প বা ট্যানারী

গরু, ছাগল, উট ও অন্যান্য পশুর চামড়ায় ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে ব্যবহার্য বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত জন্তুর চামড়া দাবাগাত করে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করেছেন। অনুরূপভাবে যবাই করা পশুর চামড়াও ব্যবহার করার বৈধতা ইসলামে রয়েছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত এক দাসীকে একটি ছাগল সাদাকা করা হল। পরে তা মারা যাওয়ার পর ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি মরা ছাগলটি দেখে বললেন : তোমরা এর চামড়া খসিয়ে নিচ্ছো না কেন ? তাহলে তো দাবাগতের পর তোমরা এরদ্বারা উপকৃত হতে পারতে। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, এতো মৃত জানোয়ার ! এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এর গোশত খাওয়া হারাম কিন্তু চামড়া ব্যবহার করা হারাম নয়।[৬৪]

পরিবহন ও যানবাহন

পণ্যসামগ্রী আমদানি ও রফতানি করার জন্য মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করে বিভিন্ন জীব-জানোয়ার ব্যবহার করতে পারে এবং পারে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীর মাধ্যমে ভারবাহী যানবাহন আবিষ্কার করতে। পণ্যসামগ্রী আনা-নেয়া করার জন্য মৌলিকভাবে দু'টি পথ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি জলপথ, অপরটি হচ্ছে স্থলপথ। জলযান সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ .

মানুষের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী দ্রব্যসামগ্রী সহ যত জলযান সমুদ্রে বিচরণ করে (তাতে জনগণ ও জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে)। (সূরা বাকারা, ২ : ১৬৪)

স্থলপথে আমদানি ও রফতানির কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রাচীনকালে চতুষ্পদ জন্তুই অধিকতর ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

তিনি আন'আম (গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু) সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো। এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি থেকে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা এর সৌন্দর্য উপভোগ কর। তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশ, যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, ১৬ : ৫-৭)

মোটকথা, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিল্প ও কারখানার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়নি; বরং এসবের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহিতও করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলামে যে মূলনীতি রয়েছে, শিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ মূলনীতিই অনুসরণীয়। বস্তুত প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করার জন্য একদিকে যেমন শ্রমের প্রয়োজন, অন্যদিকে এর জন্য আবশ্যক পরিমাণ মূলধনও একান্ত অপরিহার্য। কাজেই প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের শ্রম ও মূলধন—এই তিনটিই হলো শিল্পের বুনিয়াদ। ইসলামের দৃষ্টিতে শিল্পোৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অত্যধিক মুনাফা অর্জন করা নয়; নিরীহ শ্রমিক ও মজুরদেরকে শোষণ করাও নয়; বরং জনগণের প্রয়োজন পূর্ণ করা, জীবন-যাপনের চাহিদা মিটানো, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য।

কাজেই শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লক্ষ্য দিতে হবে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার দিকে এবং মানুষের চাহিদা মিটানোর দিকে। যেসব পণ্যের উৎপাদনে মানুষের অপরিহার্য

প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে, ইসলামী সমাজে সেসব শিল্পের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যাতে কোন মানুষই জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো থেকে বঞ্চিত না হয়।

শিল্প ও জাতীয় উন্নয়ন

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের উপরই জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়ন নির্ভরশীল। যে জাতি শিল্পে যত বেশি অগ্রগতি লাভ করবে, জাগতিক দিক থেকে তারা তত বেশি সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর হতে পারবে। যে জাতির মধ্যে শিল্পের দক্ষতা নেই, তারা একদিন না একদিন পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হবে। কাজেই শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতা হাসিলের জন্য সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। জাতীয় উন্নয়ন যেহেতু শিল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল, তাই দেশে অধিক পরিমাণে শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা গড়ে তোলা আবশ্যক। এ পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও আবশ্যক। অনুরূপভাবে বৈদেশিক অনুদানের মাধ্যমেও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। অবশ্য শিল্পের মাধ্যমে দেশের পূর্ণাঙ্গ সমৃদ্ধি হাসিল করতে হলে সরকারিভাবে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান, কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এতদসম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন প্রকার শিল্পের জন্য রকমারী যন্ত্রপাতিও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মিল, কলকারখানার ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে—যাতে লভ্যাংশ নির্ধারিত গুটিকয়েক মানুষের হাতে কুক্ষিগত না হয়ে যায়। তাহলে অভিশপ্ত পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ ঘটবে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ও যুলুমের শিকার হবে। আর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসবে চরম অশান্তি ও নৈরাজ্য।

মূলধন সংগ্রহ ও যৌথ কারবার

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, কোন শিল্পই মূলধন সংগ্রহ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তবে এ মূলধন নিজেও যোগান দিতে পারে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকেও পুঁজি সংগ্রহ করে যৌথভাবে কোন মিল-কারখানা ও কোম্পানী গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।

বস্তুত যৌথ কারবার মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। মানব সমাজে চিরদিনই এই যৌথ কারবার প্রচলিত ছিল। বিরাট কোন ব্যবসা বা শিল্পকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও মূলধন সংগ্রহ করা এক ব্যক্তির পক্ষে একা সম্ভব নয়। একাধিক লোকের মিলিত পুঁজি ও শ্রমের সমন্বয়ে এ কাজ খুবই সহজভাবে সম্পাদন করা যায়। এতে সকলেই লাভ-লোকসানের ভাগী হয়ে থাকে। এই জাতীয় ব্যবসা ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

যৌথ কারবার আরম্ভ করার পূর্বে কার শরীকানা কতটুকু এবং লভ্যাংশ কিভাবে বন্টন করা হবে এ বিষয়ে একটি লিখিত চুক্তিনামা সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে পরস্পরের ঝগড়া, মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। যৌথ কারবার কেবল নগদ টাকার মূলধনের ভিত্তিতেই করতে হবে এমন নয়; বরং শ্রম ও মেহনতকে কেন্দ্র করেও একাধিক লোক যৌথ নীতিতে কারবার করে অর্থ উপার্জনের কাজ করতে পারে।

যৌথ নীতিতে খনিজ সম্পদ উদ্ধার, পরিবহন বা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ইত্যাদি গঠন করাও বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে যৌথ কোম্পানির যারা শরীক বা অংশীদার হবে, তাদের মুনাফার হার পূর্ব

নির্ধারিত করা যাবে না; বরং এ কোম্পানি পরিচালিত হবে ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান অনুসারে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরী'আতে সুদ দেওয়া-নেওয়া উভয়ই হারাম। কাজেই সুদের ভিত্তিতে যৌথ কোম্পানি গড়ে তোলাও হারাম।

বড় ধরনের কোন শিল্প গড়ে তোলার জন্য ইসলামী শরী'আতের আলোকে গঠিত ব্যাংক থেকেও মূলধন সংগ্রহ করা যায়। ব্যাংক নির্দিষ্ট শিল্পে এই শর্তে অর্থ বিনিয়োগ করবে যে, লাভ-লোকসান ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হবে। এমনিভাবে বিদেশী কোম্পানি থেকেও মূলধন সংগ্রহ করা যেতে পারে, যদি এর কোন ধারা বা চুক্তির কোন শর্ত ইসলামী শরী'আতের সাথে সংঘর্ষিক না হয়।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগের সুসভ্য মানব সমাজের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা যে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, তা অনস্বীকার্য। বড় বড় ব্যবসা সহজকরণ, সঞ্চিত ধন-সম্পদ হিফাযাত করা এবং এসব থেকে আরো অর্থ উপার্জন করার জন্য বর্তমান যুগে ব্যাংকের অস্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। কাজেই নিশ্চিতরূপে এ কথা বলা যায় যে, ব্যাংক একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। অনেক বড় বড় অর্থনৈতিক এমন কাজও রয়েছে যা ব্যাংকের সাহায্যেই সুসম্পন্ন করা সম্ভব। ব্যাংকের সাহায্যে অনেক এজেন্সি সার্ভিসও সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। সমাজের অসংখ্য লোকের হাতে কম-বেশি পরিমাণের যে পুঁজি বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, এই ব্যাংকের মারফতেই তা একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে সামষ্টিক কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ হতে পারে। কিন্তু এ সব অসংখ্য কল্যাণজনক কাজ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র সুদ প্রথার কারণে। কাজেই এই সুদ প্রথাকে ব্যাংক থেকে অপসারণ করা একান্ত অপরিহার্য।

ব্যাংকিং-এর মূলনীতি

ইসলাম মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতিকে হালাল এবং সুদভিত্তিক অর্থনীতিকে হারাম ঘোষণা করেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا .

আল্লাহ্ তা'আলা বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। (সূরা বাকারা, ২ : ২৭৫)

সুদ এবং বেচাকেনা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও টাকা-পয়সা ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করা বৈধ মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বেচাকেনা এবং সুদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

১. বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদকে ব্যবসার মত মনে হলেও পরিণামের দিক থেকে তা এক নয়। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের বুনিয়াদ হল পারস্পরিক সহযোগিতার উপর। আর সুদের বুনিয়াদ হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার উপর। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সুদী লেনদেন একরকম হতে পারে না।

২. ব্যবসার মধ্যে বিনিময় হয়। ক্রেতা টাকা দেয় আর বিক্রেতা তাকে মাল দেয়। পক্ষান্তরে সুদের মধ্যে যে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তা শুধু মেয়াদের বিনিময়ে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বস্তুত এ মেয়াদ কোন মাল নয়।

৩. বেচাকেনার মধ্যে মাল ও মূল্য হস্তান্তরের সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সুদের অংশ একবার পরিশোধ করেও ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি এর থেকে অব্যাহতি পায় না, বরং প্রত্যেক কিস্তিতেই সুদের বোঝা বহন করে যেতে হয় তাকে। এমন করে অবশেষে সুদের পরিমাণ মূলধন থেকেও বেড়ে যায়।

৪. ক্রয়-বিক্রয়ের ফায়দা হচ্ছে ব্যাপক। সকলেই তা লাভ করতে সক্ষম। কিন্তু সুদের ফায়দা মুষ্টিমেয় লোকই কেবল ভোগ করতে পারে। ফলে সাধারণ মানুষ দরিদ্রতার কষাঘাতে ধুকে ধুকে মরতে থাকে। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে সুদভিত্তিক অর্থনীতিকে হারাম এবং মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্লেখ যে, বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে এবং সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বর্তমানকালে অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। ফলে এতে ধ্বংস হচ্ছে সমাজ, অর্থনীতি, নৈতিকতা ও মানবতা। সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতি সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে ভেঙ্গে তা ইসলামী বুনিয়াদের উপর গড়ে তোলার নির্দেশ দেয়। সুদের অভিশাপ হতে বাঁচতে হলে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তবেই শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে।

শরীয়াহ্ ব্যাংকের পরিকল্পনা

সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে এবং আর্থ-সামাজিকভাবে স্বনির্ভর হতে হলে ইসলামী শরী'আতের আলোকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যেই বিভিন্ন দেশে সুদবিহীন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ শরী'আত মুতাবিক সুদবিহীন ব্যাংক গঠন করতে হলে এতদুদ্দেশ্যে একটি 'Promoters Company' (প্রবর্তক কোম্পানি) গঠন করে অংশীদার হতে ইচ্ছুক লোকদের প্রতি 'Share Capital' (শেয়ার ক্যাপিটাল) সংগ্রহ করার আবেদনপত্র প্রচার করতে হবে। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা ব্যবসার অংশীদার হিসাবে 'Subscription' (চাঁদা) প্রদান করবেন, তারা প্রত্যেকেই ব্যাংক ব্যবসার অংশীদাররূপে গণ্য হবেন এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এ ব্যবস্থায় পরিচালকবৃন্দ, অংশীদারবৃন্দ, কর্মচারি ও গ্রাহকবৃন্দ সকলেই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় গভীর বিশ্বাস এবং এর বাস্তবায়নে কঠোর হতে হবে। ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকাণ্ড শরী'আতমত পরিচালনা করার জন্য দেশের প্রখ্যাত আলিম, ফকীহ, ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞ ব্যাংকারদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। তারা ব্যাংকের যাবতীয় নীতিমালা যাচাই করে দেখবেন এবং খুব লক্ষ্য রাখবেন, যাতে কোনভাবেই এতে সুদের সংমিশ্রণ না ঘটে এবং শরী'আত বিরোধী কোন কাজ না হয়। ইসলাম যেহেতু অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবসা ও মূলধন বিনিয়োগ সমর্থন করে, তাই প্রস্তাবিত ব্যাংকের অংশীদারগণ প্রতি অর্থবছররর শেষে নিজ নিজ অংশের মুকাবিলায় শরী'আত স্বীকৃত নির্ধারিত শর্তানুসারে লভ্যাংশ পেতে থাকবেন।

মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ

উপরোক্ত মূলনীতিতে যখন ব্যাংকের কর্মকাণ্ড আরম্ভ হবে তখন জনসাধারণ তাদের উদ্বৃত্ত টাকা এতে জমা রাখতে শুরু করবে। ব্যাংক এমন সব জমাও গ্রহণ করবে যা পূর্ব অবগতি

—৬২

ব্যতীতও ফেরত চাওয়া যাবে। এ জমাকে পরিভাষায় 'ডিমান্ড ডিপোজিট' বলে। এ টাকা ব্যাংকে রাখা হয় শুধু সংরক্ষণ ও হিফাযাতের উদ্দেশ্যে। ব্যাংক এরূপ লোকদের নামেও একাউন্ট খুলবে এবং আমানতকারীদের চাহিদা অনুসারে লেনদেন করবে। এরূপ জমায় ব্যাংক জমাকারীদের নিকট থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারবে। এ ব্যাংকে এমন টাকাও জমা করা হবে, যা হবে দীর্ঘমেয়াদী এবং কোনরূপ পূর্ব অবগতি ব্যতীত উত্তোলন করা যাবে না। ব্যাংকে এ ধরনের টাকাই জমা হয়ে থাকে বেশি। এসব টাকা ব্যাংক সার্টিফিকেট ডিপোজিট হিসাবে গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে 'ডিপোজিট সার্টিফিকেট' ইস্যু করবে। এসব সার্টিফিকেট তিন মাস হতে বার মাসের জন্য ইস্যু করা যেতে পারে। এ নিয়মে যারা ব্যাংকে টাকা জমা দিবে তারা কোন সার্ভিস চার্জ দিবে না; বরং ব্যাংকের আর্থিক বছরান্তে উপার্জিত মুনাফার বিশেষ অংশের তারাও অধিকারী হবে।

ইসলামী শরী'আতের আলোকে গঠিত ব্যাংক মূলধন সংগ্রহ করার জন্য 'ডিবেঞ্চার' (ঋণপত্র) ইস্যু করবে না। কেননা এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা প্রদান করার বিষয় রয়েছে। তাই ইসলামী শরী'আতের আলোকে গঠিত ব্যাংক প্রয়োজন অনুযায়ী মূলধন পাওয়ার জন্য জনগণকে নির্দিষ্ট মেয়াদ এবং নির্দিষ্ট উৎপাদনশীল কাজে মুনাফার ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের আহবান জানাতে পারবে। ব্যাংক এসব কাজ হতে লব্ধ মুনাফার অংশ বিনিয়োগকারীগণের মধ্যে তাদের মূলধন অনুপাতে ভাগ করে দিবে। তাদের নামে বিনিয়োগ সনদ বিতরণ করা যাবে এবং তা এক বছর হতে পাঁচ বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যারা নিজেদের উদ্বৃত্ত মূলধন সংরক্ষণ করতে চায় এবং মুনাফাসম্পন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ করার উপায় সন্ধান করে। প্রস্তাবিত ব্যাংক যেহেতু জনগণের নিকট খুবই বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন হবে, তাই তা এই শ্রেণীর লোকদের মূলধন রাখা এবং ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হতে পারবে। এসব মূলধন পেয়ে ব্যাংক এর সুষ্ঠু ব্যবহার ও নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট লোকদের কল্যাণ সাধন করতে পারবে। এ দেখে আরো বহু বিত্তশালী ব্যক্তি নিজেদের পুঁজি আমানত রাখতে বা বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে। ব্যাংক এসব ব্যক্তির নামে ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। বিনিয়োগ দীর্ঘয়োদী হতে পারে। হতে পারে পাঁচ-দশ বা আরো অধিক বছর মেয়াদের জন্য। এ সনদধারী লোকেরা ব্যাংকের মূল মুনাফার আনুপাতিক হারে অংশীদার হবে। অবশ্য সময় ও কার্যকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে মূল অংশীদার, আমানতকারী এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মুনাফার হার বন্টন করা হবে। ব্যাংকের মূলধন সংগ্রহের জন্য এটা একটা কার্যকর ও বাস্তবসম্মত পন্থা।

বর্তমান যুগে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঋণ বা অগ্রিম মূলধন পাওয়ার গুরুত্ব অত্যধিক। কয়েকটি অনুন্নত দেশে শিল্প ও ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা কল্যাণকর উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক সুফল পাওয়া গেছে। কাজেই ইসলামী অর্থব্যবস্থার এ সুবিধা ও সুযোগ জনগণের জন্য নিশ্চিত করা যায়। উল্লেখ্য, ইসলাম সুদ হারাম করেছে কিন্তু অগ্রিম ভিত্তিতে ব্যবসা বা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগকে নিষেধ করেনি। উপরোক্ত সকল বিনিয়োগ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হবে। মুনাফা হলে উভয় পক্ষই তা পাবে এবং লোকসান হলেও এর বোঝা সকলকেই বহন করতে হবে। মন্দা অবস্থার ঝুঁকি কেবল একপক্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়া বৈধ নয়। অংশীদারদের অংশের টাকা, আমানতকারীদের জমা এবং বিনিয়োগকারীদের দেওয়া

মূলধন হস্তগত হওয়া এবং ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ এর সাথে যোগ হওয়ার পর এসব অর্থসম্পদ নির্ভরযোগ্য মুনাফা সম্ভব শিল্পকর্মে, ব্যবসায় বা কৃষিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

ক. ব্যাংক এসব বিনিয়োগ করবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। এ বিনিয়োগের পূর্বে ব্যাংক শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট শিল্পের একটি পরিকল্পনা তলব করবে। তারপর পরিকল্পনাটি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে যাচাই করবে। পরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর সংশ্লিষ্ট শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের উপযুক্ত বিবেচিত হলে এবং ব্যাংকের মূলধন এখানে সংরক্ষিত থাকবে বলে মনে হলে ব্যাংক এ শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত হতে পারে। ব্যাংক এ শিল্পকর্মে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে লব্ধ মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টন করার শতকরা একটি হার নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে। তারপর তারা পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন করে মুনাফার অংশ নিজেরা বন্টন করে নিবে।

খ. শিল্পের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্যেও অনুরূপভাবে মূলধন বিনিয়োগ করা যেতে পারে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবসার মালিক মূলধন, সময়কাল এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পাদন করে নিবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রথমে বিষয়টিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখবে এবং পরে ব্যবসায়ীদের অর্থ লেনদেন করবে। ব্যাংক বাজারের অবস্থা এবং মুনাফার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে খবরাখবর রেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে ব্যবসাকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর বছরান্তে লভ্যাংশ হিসাব করে আনুপাতিক হারে ব্যাংক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে তা বন্টন করবে।

গ. ইসলামী শরী'আতের আলোকে গঠিত কৃষি ব্যাংক কৃষিখাতেও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। ব্যাংক কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করবে এবং 'বাইয়ে সালাম' (অগ্রিম টাকা দিয়ে বাকী পণ্যসামগ্রী খরিদ করা)-এর ভিত্তিতে নির্ধারিত ফসল অথবা মুনাফা হতে চুক্তি অনুসারে লভ্যাংশ গ্রহণ করবে। আর এ সময় মূলধনও ফেরত নিয়ে নেবে।

সুদবিহীন ব্যাংক টাকা জমা, গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ছাড়াও আধুনিক ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্বও (সুদবিহীন) যথাযথভাবে পালন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, ঋণ উসূল করার জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে 'রাহ্ন' (বন্ধক) গ্রহণ করতে পারবে। এমনিভাবে জমাকৃত টাকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঘ. ইসলামী শরী'আতের আলোকে গঠিত ব্যাংক কেবল বাণিজ্যিক লেনদেনই করবে না, বরং মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্যও এ ব্যাংক বিনাসুদে ঋণ প্রদান করবে। প্রথমে ঋণ গ্রহীতাকে এর জন্য ব্যাংকে একটি একাউন্ট খুলতে হবে এবং পরে উক্ত ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা হবে। ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করা হবে এবং ঋণ উসূলের সুবিধার্থে গ্রহীতা থেকে কিছু বস্তু বন্ধক হিসাবে রাখা হবে।

ইসলামী ব্যাংক ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়

বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি জটিল প্রশ্ন হলো, বিশ্বে অধিকাংশই সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত। তবে বৈদেশিক পুঁজি বিনিময়ের কাজটি ইসলামী ব্যাংক আঞ্জাম দিতে সক্ষম। এ জন্য ব্যাংক পরিচালকদের এমন একটি মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে, যার ফলে দেশীয় মুদ্রা

সরাসরিভাবে সকল দেশে, বিশেষ করে শিল্পপ্রধান দেশসমূহে অবাধে চলতে পারে। এরূপ নীতি অবলম্বন একান্তই অসম্ভব হলে ইসলামী ব্যাংক শিল্পপ্রধান দেশে ব্যাংকের একটি শাখা খুলবে। এ ব্যাংক নিজ দেশীয় সকল প্রকার বৈদেশিক প্রয়োজন পূরণ করবে। কোন ব্যবসায়ী ফার্ম বিদেশ হতে পণ্য আমদানি করার ইচ্ছা করলে ফার্ম কর্মকর্তা স্থানীয় ব্যাংকে পণ্যের মূল্য আদায় করবে। আর স্থানীয় ব্যাংক বিদেশে অবস্থিত দেশের শাখা ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট ফার্মে উক্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেওয়ার নির্দেশ পাঠাবে। কিন্তু এজন্য কোন সুদ গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য খরচ বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জ আদায় করা ব্যাংকের পক্ষে বৈধ। দেশের অভ্যন্তরে সুদবিহীন ব্যাংক স্থাপিত হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক বিনিময়কার্যও বিনাসুদে নির্বিঘ্নে এবং সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হতে পারবে।

বৈদেশিক মুদ্রা ও হুণ্ডির লেনদেন

বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় ব্যবসায়ী পদ্ধতিতে চলছে। যাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় তারা বিনিময় ব্যবসায়ীদের (মানি এক্সচেঞ্জার) নিকট হতে তা গ্রহণ করে এবং সে জন্য তাদেরকে রীতিমত বাট্টা দিতে হয়। প্রাচীনকালে এ কাজই হুণ্ডির মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়া হতো। মহাজনদের পরিভাষায় একে 'সুদ বাট্টা' বলা হতো। বর্তমান বিশ্বে যদিও অধিক পরিমাণে ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তথাপিও হুণ্ডির লেনদেন এখনো বন্ধ হয়নি। হুণ্ডির প্রভাব আজও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদ্যমান। হুণ্ডির মাধ্যমে বিনিময়ে এবং বাট্টা দিয়ে মুদ্রার বিনিময় যেহেতু সুদ, কাজেই এইভাবে টাকা একচেঞ্জ করাও হারাম। ইসলামী শরী'আতে এ পদ্ধতিতে টাকা এক্সচেঞ্জ করা জায়িয নেই। টাকা এক্সচেঞ্জ করার ক্ষেত্রে টাকার মান হতে কোন প্রকার কমবেশি করা হলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ الاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ الاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ۔

স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করবে না। এরূপ করা জায়িয নেই। অবশ্য উভয়দিকে সমপরিমাণ হলে জায়িয হবে। বিক্রয়ের সময় একদিকে বেশি অপরদিকে কম এরূপও করবে না। রূপা রূপার বিনিময়ে বিক্রি করবে না। অবশ্য সমান সমান হলে বিনিময় কাজ জায়িয হবে। বিনিময়ের সময় একদিকে বেশি এবং অপরদিকে কম, এরূপও করবে না। উপস্থিত মাল অনুপস্থিত মালের বিনিময়েও বিক্রয় করবে না।[৬৫]

উল্লেখ্য যে, ইসলামী অর্থনীতি সমগ্র দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক মুদ্রার প্রচলনের পক্ষপাতী। বর্তমান আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের সমস্যার সমাধানের জন্য এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর কোনটাই হতে পারে না। কাজেই বর্তমানে সকল রাষ্ট্র যদি নিজ নিজ স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা ওজন কমিয়ে এক সমান করে নেয় এবং বাট্টা দেওয়া ও নেওয়ার প্রথা রহিত করে দেয়, তবে বিশ্বের মানব সমাজ সুদের এ অভিশাপ হতে রক্ষা পেতো এবং ব্যবসায়িক জটিলতা হতেও মুক্তি পেতো। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য অবাধ হতো এবং প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পেতো।[৬৬]

বীমা ও স্টক এক্সচেঞ্জ

সুদখোর মহাজনরা যখন বুঝতে পারল যে, আল-কুরআনের বাণী : "আল্লাহ্ তা'আলা

সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন" অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তখন তারা সুদের অবক্ষয় রোধকল্পে আরো দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। একটি বীমা আর অপরটি স্টক এক্সচেঞ্জ। কেননা সাধারণত দুই কারণে ব্যবসায় ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে—একটি দৈব-দুর্বিপাকে, যেমন জাহাজডুবি, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি ঘটে যাওয়া। আর অপরটি হচ্ছে পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রয়মূল্যের নিচে নেমে আসা। সাধারণত বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু ব্যবসায়ীদের নিজস্ব পুঁজি নয়, জাতির যৌথ সম্পদ, তাই উভয় অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি অনেক কম এবং দেশ ও জাতির ক্ষতি অনেক বেশি। এতদসত্ত্বেও এ স্বল্প ক্ষতির বোঝা দেশ ও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একদিকে বীমা কোম্পানি খুলেছে, যাতে ব্যাংকের ন্যায় সমগ্র জাতির পুঁজি এতে নিয়োজিত থাকে। দৈব-দুর্বিপাকে সুদখোরদের কোন ক্ষতি হয়ে গেলে তারা বীমার মাধ্যমে সমস্ত ক্ষতিপূরণ জাতির যৌথ পুঁজি হতে উদ্ধার করে নেয়। বস্তুত বীমা এবং ইনস্যুরেন্স কোম্পানির মধ্যেও যেহেতু সুদভিত্তিক লেনদেন হয়ে থাকে, তাই অন্যান্য সুদী কারবারের মতো এগুলোও হারাম ও নিষিদ্ধ।

অজ্ঞতাবশত সাধারণ মানুষ মনে করে বীমা কোম্পানিগুলো আল্লাহর রহমত এবং ডুবন্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানেও প্রতারণা রয়েছে। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে এতে জনসাধারণের পুঁজি সঞ্চয় করা হয়। কিন্তু এর মোটা অংকের দ্বারা পুঁজিপতিরাই আসলে লাভবান হয়। অনেক সময় তারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজেরাই নিজেদের ক্ষয়প্রাপ্ত যানবাহনে বা কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ করে নিজেদের বিত্ত-সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। এরপর বীমা কোম্পানি থেকে টাকা আদায় করে নতুন যানবাহন ক্রয় করে বা নতুন কারখানা গড়ে তোলে। কিন্তু গরীব জনসাধারণের তো এসব কিছুই নেই। তাই বীমা কোম্পানির টাকাও তাদের নসীব হয় না।

অপরদিক পণ্যসামগ্রীর দাম কমে যাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তারা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার গরম করে। এটাও একপ্রকার জুয়া। এর উদ্দেশ্য হলো, নিজের ক্ষয়ক্ষতির দায়-দায়িত্ব দেশের সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। অতএব বীমা কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জ বাহ্যত কল্যাণকর মনে হলেও প্রকারান্তরে এগুলোর পরিণাম যেহেতু অকল্যাণকর, তাই এর সর্বগ্রাসী ছোবল থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।[৬৭]

প্রভিডেন্ট ফান্ড

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হলো ঐ টাকা, যা সরকার বা কোন কোম্পানি তার কর্মচারিদের বেতন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কেটে রাখে। এরপর কর্মচারিদের চাকরি শেষে বা মৃত্যুর পর সরকার বা কোম্পানির পক্ষ হতে জমাকৃত টাকার সাথে আরো টাকা সহ তা কর্মচারিদেরকে প্রদান করা হয়ে থাকে। এ টাকার প্রকৃত মালিক স্বয়ং কর্মচারিই। তবে চাকরিতে থাকা অবস্থায় সে নিজে ইচ্ছামতো এ টাকা খরচ করার কোন অধিকার রাখে না। এ টাকা তাঁর ইখতিয়ারে নয় বিধায় এ টাকা সরকার বা কোম্পানির নিকট ঋণ হিসাবে গণ্য হবে।[৬৮]

শেয়ার ব্যবসা

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। এর নাম হচ্ছে শেয়ার ব্যবসা। প্রাচীনকালে কয়েক ব্যক্তির সমন্বয়ে শিরকত বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে

ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম প্রচলিত ছিল। একে বর্তমানকালের পরিভাষা অনুসারে 'পার্টনারশিপ ব্যবসা' বলা হয়। বিগত দু'তিন শতাব্দী হতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নামে শরীকানা ব্যবসার আরেকটি পদ্ধতি চালু হয়েছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। শেয়ার বেচাকেনা চালু হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে স্টক মার্কেটিং-এর ব্যবসা শুরু হয়েছে পৃথিবীব্যাপী।

উল্লেখ্য যে, কোম্পানির এ শেয়ারকে আরবীতে 'সাহম' বলা হয়। সাহম অর্থ অংশ। বস্তুত শেয়ার ও কোম্পানির মালের শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানাধীন এক অংশবিশেষেরই নাম। কেউ যদি কোন কোম্পানির শেয়ার খরিদ করে, তবে শেয়ার সার্টিফিকেটের কাগজটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, উক্ত ব্যক্তি এ কোম্পানির বিশেষ একটি অংশের মালিক।

আগের যুগে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি ছিল ছোট। দু'চারজন মিলে কিছু পুঁজি সংগ্রহ করে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে দিতো। কিন্তু বড় ধরনের কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে অথবা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে অনেক সময় এ গুটি কয়েক মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই অনিবার্য কারণেই বড় ধরনের ব্যবসা করার জন্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কোম্পানি গঠন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে নিয়ম হলো, যখন কোন কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে, তখন প্রথমে এর উদ্যোক্তাগণ এর গঠন কাঠামো এবং পরিচালনা পদ্ধতি প্রকাশ করে। বাজারে শেয়ার ছাড়ে অর্থাৎ লোকদেরকে এ কোম্পানির অংশীদার হওয়ার জন্য আহবান জানায়। তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে যারা এ শেয়ার খরিদ করে, তারা এ কোম্পানির অংশীদার হিসাবে গণ্য হয়। নবগঠিত কোম্পানির শেয়ার এক শর্তে খরিদ করা জায়িয। তা হচ্ছে, হারাম কাজের উদ্দেশ্য সে কোম্পানি গঠিত হবে না। হারাম কাজের উদ্দেশ্যে কোন কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলে এ কোম্পানির শেয়ার খরিদ করা কোনক্রমেই জায়িয হবে না। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্টক মার্কেট হতে শেয়ার খরিদ করে, তবে তাকে চারটি শর্তের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে :

১. কোম্পানির যাবতীয় কারবার হালাল হতে হবে। কোম্পানি কোনরূপ হারাম কাজে জড়িত হতে পারবে না। যেমন সুদী ব্যাংক না হওয়া, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি না হওয়া এবং মদ উৎপাদনের কোম্পানি না হওয়া ইত্যাদি। কোম্পানি হারাম কারবারে লিপ্ত হলে এর শেয়ার খরিদ করা কোন অবস্থাতেই জায়িয হবে না। প্রথমত শেয়ার ছাড়ার অবস্থায়ও জায়িয হবে না এবং পরবর্তীতে স্টক মার্কেট হতেও খরিদ করা জায়িয হবে না।

২. কোম্পানির গোটা অর্থ লিকুইড এ্যাসেট্স—নগদ টাকা হবে না; বরং কোম্পানির কিছু অর্থ-সম্পদ ফিক্সড এ্যাসেটস বা স্থাবর সম্পত্তি থাকা আবশ্যক। কোম্পানির যদি কোন স্থাবর সম্পত্তি না থাকে, তবে শেয়ারসমূহ-এর মূল দাম থেকে কম বা বেশিদামে বিক্রি করা জায়িয হবে না; বরং এ অবস্থায় তা মূল দামেই বিক্রি হবে। মূল দামের কম বা বেশিতে বিক্রি করা হলে তা সুদে পরিণত হবে। অর্থাৎ দশ টাকা দামের শেয়ার এগার টাকাতে বিক্রি করা জায়িয হবে না।

৩. কোম্পানি যদি নিজেদের ফাণ্ড বাড়ানোর জন্য ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে অথবা অতিরিক্ত অর্থ যদি সুদী একাউন্টে জমা রাখে, তবে এমতাবস্থায় কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা জায়িয হবে কিনা, এ সম্বন্ধে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ

আলিমের মতে, এ অবস্থায় এ কোম্পানির শেয়ার খরিদ করা জায়িয হবে না। কিন্তু উলামায়ে কিরামের মতে, কোন শেয়ার হোল্ডার যদি এ সুদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, বিশেষভাবে বার্ষিক মিটিংয়ে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করে, তবে তার জন্য এ শেয়ার খরিদ করা জায়িয হবে এবং সে দায়িত্বমুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৪. মনে রাখতে হবে, কোম্পানির মূল ব্যবসা যদি হালাল হয় এবং পরবর্তীতে এর মধ্যে যদি কোন সুদী অর্থ এসে যায়, তবে লভ্যাংশ বন্টনের ইনকাম স্টেটমেন্ট-এর মাধ্যমে এ কথা জেনে নিতে হবে যে, লভ্যাংশের মাঝে কত পারসেন্ট সুদের অংশ রয়েছে ? যে পরিমাণ সুদের অংশ থাকবে ঐ পরিমাণ টাকা হিসাব করে গরীব ও দুঃস্থ মানুষের মধ্যে তা বিতরণ করে দিবে। অন্যাথায় সুদ গ্রহণের গুনাহে গুনাহ্গার হতে হবে।

মোটকথা হচ্ছে, শেয়ার ক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য চারটি শর্ত লক্ষণীয় :

১. ব্যবসা হালাল হতে হবে।
২. কোম্পানির কিছু স্থাবর সম্পত্তি থাকতে হবে। সমস্ত সম্পদ নগদ টাকায় না হওয়া অবশ্যক।
৩. কোম্পানি সুদী কারবারে জড়িত হলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।
৪. লভ্যাংশ বন্টনের সময় এতে সুদী টাকা থাকলে হিসাব করে তা গরীব-দুঃস্থ মানুষকে দিয়ে দিতে হবে।[৬৯]

বন্ড-এর হুকুম

আধুনিক অর্থনীতিতে এক নতুন ধরনের মূলধনের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি 'বন্ড' নামে পরিচিত। বিশ্ব বাজারে ও ব্যবসায়ী লেনদেনে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অর্থনীতিবিদগণ একে অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে থাকেন।

বস্তুত বন্ড হচ্ছে ব্যাংক বা সরকার প্রদত্ত লিখিত এক ধরনের প্রতিশ্রুতি, যার মালিক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ পাওয়ার অধিকারী হয়ে থাকে। বন্ড ব্যাংক বা সরকারকে প্রদত্ত ঋণের একটি অংশবিশেষ। এর ধারক ঋণদাতারূপে গণ্য। বন্ড ইস্যু করার সময় যে মূল্য ধরে দেওয়া হয়, তা-ই হল এর আসল মূল। আর একটা আছে এর বাজার মূল্য, যা বাজার দর অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং এ মূল্য বাজারের সাথে উঠানামাও করে। বহু লোক মুনাফালাভের আশায় এর ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসাও করে।

প্রকৃতপক্ষে বন্ডের গোটা কারবারই সুদভিত্তিক। কাজেই তা বেচাকেনা করা জায়িয নয়। তদুপরি কেউ যদি তা খরিদ করে, তবে যেমনিভাবে মুদ্রা বিনিময়কালে মূল্য থেকে কমবেশি করা যায় না, এ ক্ষেত্রেও করা যাবে না। এমনকি বন্ড একপ্রকার লটারীও বটে। কাজেই লটারীর মত এটিও হারাম।[৭০]

ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা

জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম। এ কারণেই মহানবী (সা) শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা এক আনসারী সাহাবী নবী কারীম (সা)-এর নিকট এসে কিছু চাইলেন। তখন তিনি তাকে বললেন : তোমার ঘরে কি

কোন কিছু নেই ? উত্তরে সাহাবী বললেন, হ্যাঁ আছে। একখানা কম্বল আছে, যার একাংশ আমি পরিধান করি এবং অপর অংশ শয্যারূপে ব্যবহার করি। তাছাড়া পানিপান করার জন্য একটি পানপাত্রও আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তাহলে এ দু'টো জিনিসই আমার নিকট নিয়ে এসো। সাহাবী তাঁর উক্ত দু'টো জিনিস আনলে নবী (সা) তা নিজ হাতে নিয়ে উপস্থিত লোকদের মধ্যে এর নিলাম ডাকলেন এবং বললেন, এগুলো খরিদ করবে কে ? এক সাহাবী বললেন, আমি এগুলো এক দিরহাম দিয়ে নিতে রাযী আছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এক দিরহামের চেয়ে অধিক দিয়ে নেওয়ার জন্য কে রাযী ? এ কথাটি তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন। তখন এক সাহাবী বললেন, দুই দিরহাম দিয়ে নেওয়ার জন্য আমি রাযী আছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বস্তু দু'টি দিয়ে তাঁর থেকে দুই দিরহাম গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি এ দিরহাম দু'টি আনসারী সাহাবীকে দিয়ে বললেন, এর একটি দিয়ে তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য ক্রয় করে তাদেরকে দিয়ে এসো। আর অপরটি দিয়ে একটি কুড়াল খরিদ করে এনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দিলে তিনি নিজ হাতে এতে হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন : জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে তা বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে থাক। আর আমি যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে না দেখি। নবী (সা)-এর নির্দেশে সাহাবী জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা বাজারে এনে বিক্রি করতে রাগলেন। তারপর দশ দিরহাম উপার্জন করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এলেন এবং এর কিছু দিয়ে কাপড় খরিদ করলেন এবং বাকী দিরহাম দিয়ে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : অপরের নিকট ভিক্ষার দরুন কিয়ামতের দিনে তোমার চেহারায় দাগ নিয়ে আসা অপেক্ষা জীবিকার্জনের এটা অনেক বেশি উত্তম পন্থা।[৭১]

এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত সাহাবীকে ভিক্ষার পরিবর্তে পরিশ্রম করে কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তদুপরি তিনি শ্রম বিনিয়োগের কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে সমাজের বেকার সমস্যা সমাধানেও রাসূলুল্লাহ (সা) বাস্তব ভূমিকা রেখেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল কাজে ও হালাল পথে শ্রম বিনিয়োগ কিছুমাত্রও লজ্জার ব্যাপার নয়; বরং এ হচ্ছে নবীগণের সুন্নাত। প্রত্যেক নবীই দৈহিক পরিশ্রম করে উপার্জন করেছেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। মুসতাদরাকে হাকেম গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ) বর্ম তৈরি করতেন। হযরত আদম (আ) কৃষিকাজ করতেন। হযরত নূহ্ (আ) কাঠমিস্ত্রীর কাজ করতেন। হযরত ইদ্রীস (আ) সেলাই কাজ করতেন এবং হযরত মূসা (আ) রাখালের কাজ করতেন।[৭২]

উপরোক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। শ্রম যদি নিচু ধরনের বিষয় হতো, তাহলে নবীগণের মাধমে আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় কাজ সম্পাদন করাতেন না।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

هُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ·

তারা (অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কারো (দীনী) ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিলে সে যা খাবে তাকে তা থেকে খাওয়াবে এবং সে যা পরিধান করবে তাকে তা থেকে পরিধান করতে দিবে। আর যে কাজ তার জন্য কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তা করার জন্যে তাকে বাধ্য করবে না। আর সেই কাজ যদি তারদ্বারাই সম্পন্ন করতে হয়, তবে সে তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে।[৬৩]

উপরোক্ত হাদীস থেকে নিম্ন বর্ণিত মূলনীতিসমূহ প্রতীয়মান হয় :

১. মুসলমান পরস্পর একে অন্যের ভাই। শ্রমিক হলে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য। সুতরাং দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ থাকে, মালিক ও শ্রমিকের মাঝেও অনুরূপ সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

২. খাওয়া-পরা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মান মালিক ও শ্রমিকের উভয়ের সমান হতে হবে। মালিক যা খাবে ও পরবে, শ্রমিককেও তা থেকে খেতে ও পরতে দিবে অথবা অনুরূপ মানের ও অনুরূপ পরিমাণের অর্থ মজুরী স্বরূপ প্রদান করবে।

৩. সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়েই যা সাধ্যাতীত এমন দায়িত্ব শ্রমিকের উপর চাপানো যাবে না। এমনিভাবে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্তও একাধারে কাজ করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না, যা করতে শ্রমিক অক্ষম। বস্তুত সময় ও মজুরীর বিষয়ে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং মতবৈষম্য বর্তমান পৃথিবীকে বিড়ম্বিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, এর সঠিক সমাধান এবং উভয়ের মধ্যে ইন্‌সাফপূর্ণ সমন্বয় একমাত্র ইসলামই করতে পারে।

৪. শ্রমিকের পক্ষে কষ্টকর এমন কাজ শ্রমিকের দ্বারা সম্ভব করতে হলে প্রয়োজন অনুপাতে তাকে সাহায্য করতে হবে। অধিক সময়ের প্রয়োজন হলে সেজন্য তাকে যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি অধিক মজুরীর প্রয়োজন হলে তাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে প্রদান করতে হবে।

কুরআন মাজীদে দুই নবী হযরত শু'আয়ব ও হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। শু'আয়ব (আ) বলেছেন :

وَمَا أُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ·

আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৭)

এতেও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। নবী কারীম (সা) শ্রমিকদের প্রতি সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা তিনি মহত্ত্বের লক্ষণ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি নিজেও তাদের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করেছেন এবং ছায়ার মতো তাঁর পাশে থেকেছেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁর নিকট কোন কৈফিয়ত তলব করেননি এবং কোন কাজের দরুন তাঁকে কখনো ভর্ৎসনাও করেননি।

—৬৩

মোটকথা, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক হবে ভাইয়ের মত। শ্রমিক মালিক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ভাই হিসাবে আঞ্জাম দিবে। আর মালিক থাকবে তার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়াবান ও দরদী। মালিক শ্রমিককে শোষণ করবে না এবং সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্বও তার উপর চাপিয়ে দিবে না। এমনিভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করে তাদেরকে অসহায়ত্বের দিকেও ঠেলে দিবে না।

মালিকের অধিকার ও কর্তব্য

শ্রমিক ও মালিকের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান পৃথিবীতে মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক ছাঁটাই ও আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে এবং অবস্থা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

বস্তুত এসব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মালিকের প্রধান কর্তব্য হলো, কর্মক্ষম, সুদক্ষ ও শক্তিমান এবং আমানতদার বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা। কর্মক্ষম ও আমানতদারী এ দুই গুণ ব্যতীত কোন কাজে বা শিল্পে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ـ

তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৬)

মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরী নির্ধারণ করে শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা। অন্যথায় শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে :

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اِسْتِيْجَارِ الْاَجِيْرِ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهٗ اَجْرَهٗ ـ

মজুরের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন।[৭৪]

ইসলামী অর্থনীতির মজুরী নির্ধারণ সূত্র হলো, ন্যূনতম মজুরী প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে হবে, যেন সে এরদ্বারা ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক চাহিদা মিটাতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে হবে।[৭৫]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা বোঝা যায় যে, মালিক শ্রমিকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিবে অথবা এমন মজুরী দিবে, যাতে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়। প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করতে হবে। আর এগুলো যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই শ্রমিকের মজুরীর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

মালিক শ্রমিক থেকে কি ধরনের কাজ নিতে চায় তাও পূর্বে আলোচনা করে নেওয়া মালিকের কর্তব্য। কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য নিয়োগ করে তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োজিত করা জায়িয নেই।[৭৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ করামাত্রই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তবে অগ্রিম বা অন্য কোন রকম কোন শর্ত থাকলে তা ভিন্ন কথা। বস্তুত মজুর সম্প্রদায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কাজ করে থাকে। তারা তাদের নিজেদের এবং পরিবারবর্গের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য এ পরিশ্রম করে এবং এই মজুরীই তাদের একমাত্র উপায়। এমতাবস্থায় তারা যদি পরিশ্রম করে মজুরী না পায় কিংবা প্রয়োজন অপেক্ষা কম পায় অথবা নির্দিষ্ট সময়মত প্রাপ্য না পায়, তবে তাদের দুঃখের কোন অন্ত থাকে না। দুঃখ ও হতাশায় তাদের হৃদয়-মন চূর্ণ ও ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এমনকি তাদের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ না হওয়ার কারণে জীবন ও সমাজের প্রতি তাদের মনে বীতশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি হয়। আর এটাই স্বাভাবিক। এ সব অচল অবস্থার সমাধানকল্পে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শ্রমিকের মজুরী সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন :

أَعْطُوا الْأَجْرَةَ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ٠

শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।[৭৭]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ উত্থাপন করবেন। তন্মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে :

رَجُلٌ اِسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ ٠

যে ব্যক্তি কাউকে মজুর হিসাবে খাটিয়ে ও তারদ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা সত্ত্বেও শ্রমিকের মজুরী দেয় না।[৭৮]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন :

مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ٠

শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও ঋণ পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের টালবাহানা করা যুলুম।[৭৯]

শ্রমিকের ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। চুক্তি মুতাবিক শ্রমিক থেকে কাজ উসূল করে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার মুনিবের থাকবে এবং শ্রমিক মালিকের নিকট কাজের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে বাধ্য থাকবে। এ ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য ও উদাসীনতা গ্রহণযোগ্য হবে না।

শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য

ইসলাম যেমনিভাবে মালিকদের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তেমনিভাবে শ্রমিক ও মজুরদের উপরও বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপ করেছে। কারণ সুসম্পর্ক কোনদিনই একতরফাভাবে কায়েম হতে পারে না। এর জন্য উভয় পক্ষের সদিচ্ছার প্রয়োজন। পারস্পরিক সমঝোতা ব্যতিরেকে তা কোনক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক নিজের উপর মালিকের কাজের দায়িত্ব নিয়ে এমন এক নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, এরপর সে এ কাজ শুধু পেটের জন্য করে না; বরং করবে আখিরাতের সফলতার আশায়। কেননা চুক্তি পূর্ণ করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ۔

তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে। প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়াত তলব করা হবে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৪)

শ্রমিকের দায়িত্ব হচ্ছে চুক্তি মুতাবিক মালিকের দেওয়া যিম্মাদারী অত্যন্ত আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ۔

মজুর হিসাবে সেই ব্যক্তি উত্তম হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৬)

মজুর বা শ্রমিক দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজে কোনরূপ গাফলতি করতে পারবে না; ইসলামের দৃষ্টিতে এ এক মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۔

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য—যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ : ১-২-৩)

মুফাস্‌সিরগণের মতে আয়াতের মধ্যে মাপে কম-বেশি করার ভাবার্থে ঐ সব মজুরও শামিল করা হয়েছে, যারা নির্ধারিত পারিশ্রমিক পুরোপুরি উসূল করে এবং কাজে গাফলতি প্রদর্শন করে।[৮০]

যে কাজ যেভাবে করা উচিত সে কাজ সেভাবে আঞ্জাম দেওয়া শ্রমিকের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "যখন কোন বান্দা কাজ করে তখন আল্লাহ্ চান সে যেন সে কাজ যেভাবে করা দরকার ঠিক সেভাবেই আঞ্জাম দেয়।[৮১]

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা এবং নিজ মালিকের হক্ আদায় করতে থাকে, সে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : "তিন প্রকারের লোকদেরকে দ্বিগুণ সাওয়াব প্রদান করা হবে। তাদের একজন সেই ব্যক্তি যে নিজের মালিকের হক্‌ও আদায় করে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্‌র হক্‌ও আদায় করে।"[৮২]

যেমনিভাবে শ্রমিকের উপর কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, এমনিভাবে তার কিছু অধিকারও রয়েছে। ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা হল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে; কোনরূপ টালবাহানা করা যাবে না। তার প্রতি তার ক্ষমতার অধিক কোন দায়িত্ব চাপানো যাবে না। শ্রমিক সম্প্রদায় উৎপাদনে শরীক থাকলেও মুনাফায় তাদেরকে অংশীদার করা হয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় লাভের মধ্যেও তাদেরকে অংশীদার করার বিধান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ (লভ্যাংশ) হতেও অংশ দিবে। কারণ আল্লাহ্‌র মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না।"[৮৩]

এ জন্যেই ইসলামে মুদারাবাত (অংশীদারী ব্যবসা) এবং মুযারা'আত (বর্গাচাষ)-এর বিধান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদি শ্রমিকদেরও মৌলিক

অধিকার। এই অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা মালিক বা সরকার পক্ষের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলাম শ্রমিকের স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদ করেছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ইব্‌ন হাযম (র) বলেন, "মালিকের জন্য উচিত শ্রমিকের কাছ থেকে এতটুকু কাজ নেওয়া যতটুকু সে অনায়াসে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, তার সামর্থ্য কুলায়। এমন কিছু তারদ্বারা করাতে পারবে না ; যার ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।"[৮৪]

নবী কারীম (সা) নিজে ভৃত্য-কর্মচারিদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। হযরত উমর (রা)-ও অসুস্থ কর্মচারিদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হচ্ছে কিনা এর খোঁজ-খবর নিতেন। কেউ এ কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে তাকে পদচ্যুত করতেন।[৮৫]

শ্রমিক সম্প্রদায় ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। এমনিভাবে তাদের বাসস্থানের বিষয়টিরও নিশ্চয়তা বিধান করা মালিক বা সরকার পক্ষের কর্তব্য। শ্রমিকদের চাকরির অধিকারে কোনরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না। নানা ছল-ছুতা, মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করা গুরুতর অন্যায়। এরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ ইসলামে বৈধ নয়। কোন কারণে শ্রমিকের চাকরি চলে গেলে তার কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে।[৮৬]

উৎপাদনে কোন ঘাটতি দেখা দিলে বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হলে এ ক্ষেত্রেও ইসলাম ন্যায়ানুগ বিধান দিয়েছে। ইবন হায্‌ম (র) লিখেন, "যাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তার হাতে যদি ক্ষতি বা কোনকিছু নষ্ট হয়ে যায়, তবে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব শ্রমিকের উপর বর্তাবে না; বরং ঘাটতির লোকসান মালিককেই বহন করতে হবে। অবশ্য সে যদি ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়ে তা করে, তবে অন্য কথা। আর এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী না থাকলে কসমসহ মজুরের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।"[৮৭]

ইসলাম মূলত এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সবার অধিকারই সংরক্ষিত থাকে এবং চাওয়ার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সকলেই উদ্বুদ্ধ থাকে। ইসলামী সমাজে কোন দাবি পেশের দরকার হয় না। যদি কাউকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে দাবি পেশ করার অধিকারও তার রয়েছে। অধিকার আদায়ের দাবি এ কারো কাছে যাচ্‌না করা বা প্রার্থনা করা নয় বা কারো অনুকম্পার বিষয় নয়; বরং এ হচ্ছে তার বাঁচার অধিকার।

বৃদ্ধ ও অসুস্থতার জন্য ভাতা লাভ শ্রমিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইসলাম এ অধিকারের কথাও স্বীকার করে। কেননা শ্রমিকের একমাত্র পুঁজিই হল শ্রম। কিন্তু সে বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বেঁচে থাকার আর কোন পুঁজিই থাকে না, যা দিয়ে সে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। তাই বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, অসহায়, বিধবা ও দুর্বল লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সরকারের। সরকার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ভাতা নির্ধারণ করবে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِه وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَعَلَيْنَا ٠

কেউ মাল রেখে মারা গেলে তার ওয়ারিসগণ এই মালের অধিকারী হবে। আর তাদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব আমার অর্থাৎ সরকারের উপর।[৮৮]

সাহাবায়ে কিরামের স্বর্ণযুগে এ মূলনীতির উপরই তাঁরা আমল করেছেন।

শ্রম বিনিয়োগের বৈধ উপায়সমূহ

শ্রমিক যদি তার শ্রম বিনিয়োগ করার মত পর্যাপ্ত সুযোগ না পায়, তবে সে বেকারত্বের এক অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে সমসাময়িক অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। সারা দেশে হাহাকার পড়ে যায়। তখন যুবশক্তি তাদের কর্মক্ষমতা অন্যায় ও অহিতকর কাজ তথা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন-খারাবি ইত্যাদিতে ব্যবহার করতে শুরু করে। অরাজকতা সমস্ত দেশকে গ্রাস করে ফেলে। তাই সকল কল্যাণমুখী রাষ্ট্রেরই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্মাণ করা পবিত্রতম দায়িত্ব। এ কারণেই ইসলাম শ্রমিকের সামনে অফুরন্ত সুযোগের দুয়ার খুলে দিয়েছে। শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে মুদারাবাত, মুযারা'আত, মুসাকাত, শিরকতে সানায়ে, শিরকতে উজুহ, ইহ্ইয়াতে মাওয়াত ইজারার বিষয়গুলো অন্যতম।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম বিনিয়োগের অন্যতম পন্থা হলো মুদারাবাত। এই পন্থায় একজন তার পুঁজি বিনিয়োগ করে আর অন্যজন স্বীয় শ্রম বা মেহনত দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে এবং উভয়ই লাভ-লোকসানের অংশীদার হয়। মালিক পুঁজি ও অর্থের যোগান দিয়েছে বলেই সে সমস্ত মুনাফার মালিক হয়ে যাবে, আর মেহনতি জন পুঁজিহীনতার কারণে জীবনভরই পুঁজি মালিকের দয়ার উপর নির্ভর করে শরীর খাটিয়ে চাকরি করে কাটাবে, ইসলাম এটা চায় না। এ কারণে ইসলাম মুদারাবাতের মাধ্যমে শ্রমিককেও লাভের অংশীদার হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। শ্রমিকের হাতে আর্থিক পুঁজি নেই কিন্তু তার শ্রমই তার শ্রেষ্ঠ পুঁজি। এ হিসাবে শ্রমিক শুধু নয়, বরং সে শিল্পমালিকও বটে। পুঁজির অধিকারী পুঁজির যোগান দিয়ে মালিক হয়েছে। আর শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রম বিনিয়োগ করে এর মালিক হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নুবূওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে হযরত খাদীজার ব্যবসায় এই পন্থায়ই আপন শ্রম নিয়োগ করেছিলেন।[৮৯]

মুদারাবার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, "পরস্পর সহযোগিতার যে কতগুলো পন্থা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে মুদারাবা হল অন্যতম। এতে পুঁজি একজনের এবং মেহনত অন্যজনের। আর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে উভয়ই এর মুনাফার মালিক হয়।"

ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাঈদিয়্যাত'-এ এ পন্থার অংশীদারী ব্যবসার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, মুদারাবা মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজনের খাতিরেই বৈধ রাখা হয়েছে। কারণ সমাজে অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি রয়েছেন, যারা পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসা করতে দক্ষ নন। আবার এমন বিত্তহীন লোকও রয়েছে যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার যোগ্যতা রয়েছে কিন্তু পুঁজির অভাবের কারণে নিজেদের কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারছে না। তাই ইসলাম উক্ত পন্থাকে বৈধ রেখেছে, যাতে পুঁজি পুঞ্জীভূত হয়ে বেকার

পড়ে না থাকে; বরং বাজারে খাটতে থাকে ও সমাজের প্রতিটি স্তরে আবর্তিত হতে থাকে। আর এমনিভাবে পুঁজিপতি ও পুঁজিহীন উভয়ই এর ফল ভোগ করতে পারে। একে মঙ্গলজনক দেখেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৈধ রখেছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম এর উপর আমল করেছেন।

এ পন্থায় ব্যবসায় শ্রমিকদের অধিকতর সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং শ্রমিক শোষণের দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমানতদার ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী একজন মেহনতী ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণে মুদারাবার চেয়ে শ্রেয়, সম্মানজনক ও উৎসাহব্যঞ্জক পন্থা আর কোনটাই হতে পারে না। এ পন্থা ব্যাপকভাবে কার্যকরী হলে অতি শীঘ্র দেশ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

উল্লেখ্য যে, মুদারাবা পন্থায় পুঁজি মালিকের বিনিয়োগকৃত অর্থ ও জিনিসপত্র শ্রমিকের হাতে আমানত হিসাবে থাকে। তাই সে অর্থ যদি নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ শ্রমিক নষ্ট না করে কিন্তু তার সতর্কতা সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[১০]

শ্রম বিনিয়োগের অন্যতম পন্থা হচ্ছে মুযারা'আত ও মুসাকাত। কৃষিভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শ্রম বিনিয়োগ করার নাম মুযারা'আত। আর ফলফলাদির বাগানে উপরোক্ত শ্রম বিনিয়োগ হলে তাকে 'মুসাকাত' বলা হয়। মুসাকাতের বিষয়টি 'মুযারা'আত-এর মতই। এ পর্যায়ে শিরকতে সানায়ে' ও শিরকতে উজূহ-এর বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দু'টো বিষয়ের আলোচনা অংশীদারী ব্যবসা সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রম বিনিয়োগের আরেকটি উপায় হল, ইহইয়ায়ে মাওয়াত অর্থাৎ অনাবাদী ভূমি আবাদ করতে শ্রম বিনিয়োগ করা। এ পন্থায় মেহনতী ব্যক্তি সরাসরি সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সরকারের অনুমতি নিয়ে যে বা যারা অনাবাদী ভূমি আবাদ করতে স্বীয় শ্রম বিনিয়োগ করবে, সে বা তারাই এর মালিক হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "যে ব্যক্তি মালিকানাবিহীন ভূমি আবাদ করে, সে-ই এর অধিকারী হবে।"[১১]

শ্রম বিনিয়োগের অন্যতম উপায় হচ্ছে ইজারা। সুনির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কারখানা বা শিল্পকর্মে অথবা কোন কারবারে শ্রম বিনিয়োগ করাকে ইজারা বলা হয়। আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় এ ধরনের শ্রম বিনিয়োগকারীকেই শ্রমিক বলা হয়। এভাবে শ্রম বিনিয়োগ করা ইসলামে বৈধ। এ ক্ষেত্রে বুনিয়াদী কথা হল, যেসব কর্মকাণ্ড মানুষের মানবিকতায় খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার মানসিকতায় অশুভ প্রভাব বিস্তার করে এবং নৈতিক মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে; সর্বোপরি, সমাজ ও সামাজিক পরিবেশকে বিষিয়ে তোলে, সেসব কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত শ্রমশক্তিকে ব্যয় করা এক মারাত্মক রকমের খিয়ানাত। এ জাতীয় কাজে শ্রম বিনিয়োগ হারাম। আলোচ্য পন্থাসমূহে শ্রম বিনিয়োগ করা হলে যুলুম-শোষণের অবসান ঘটবে এবং বেকারত্ব খতম হয়ে এক অনাবিল শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে বস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতি শ্রম বিনিয়োগের উপরোক্ত সহজতর পন্থাগুলোকে জটিল করে মানুষকে অসহায় করে তুলেছে। সমাজে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ায় ঘৃণ্যতম সুদী কারবার চালু করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আজকের পৃথিবী মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয়েছে।

বায়তুলমাল

'বায়তুলমাল' শব্দটি সাধারণত রাষ্ট্রীয় কোষাগার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। বায়তুলমালের সম্পদ মুসলমানদের সম্মিলিত সম্পদ। এতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত। বায়তুলমালের সম্পদে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারি কর্মচারি-কর্মকর্তা ও সাধারণ নাগরিক কারোই একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত নয়। হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন :

وَاللّٰهِ مَا اَحَدٌ اَحَقَّ بِهٰذَا الْمَالِ مِنْ اَحَدٍ وَمَا اَنَا بِاَحَقَّ بِهِ مِنْ اَحَدٍ وَاللّٰهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ وَلَهُ فِىْ هٰذَا الْمَالِ نَصِيْبٌ وَلَئِنْ بَقِيْتُ لَكُمْ لَيَاْتِيَنَّ لِرَاعِىْ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعٰى مَكَانَهُ ٠

আল্লাহর শপথ! এই রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর কেউ কারো তুলনায় অধিক হকদার নয়। আমি নিজেও অন্য কারো অপেক্ষা অধিক হকদার নই। আল্লাহ্র শপথ ! এই সম্পদে প্রত্যেক মুসলমানেরই নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে 'সানআ' পর্বতের রাখাল নিজস্থানে পশু চরানোর কাজে ব্যস্ত থেকেও এই মাল থেকে তার ন্যায্য অংশ লাভ করতে পারবে।[১২]

পক্ষান্তরে 'বায়তুলমাল' যদিও রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তবুও তিনি এ জাতীয় সম্পদ নিজের খেয়াল-খুশিমত ব্যবহারের অধিকার রাখেন না। তাবাকাতে ইব্ন সা'দ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে :

اِنَّ الْمَالَ كَانَ بِيَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيْعَةِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ٠

বায়তুলমালের সম্পদ মুসলিম জনসাধারণের পক্ষ হতে খলীফার নিকট আমানত স্বরূপ।[১৩]

বায়তুলমালের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ

রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আয় যেমনিভাবে বায়তুলমালে জমা হয়, তেমনিভাবে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ব্যয়ও এটা থেকেই নির্বাহ করতে হয়। কাজেই রাষ্ট্র পরিচালনা ও অর্থনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যাপারে বায়তুলমালের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ কারণে ইসলাম এর আয়-ব্যয়ের খাতসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

আয়ের উৎস :

১. উশ্র, ২. খারাজ, ৩. জিয্য়া, ৪. যাকাত, ৫. সাদাকা, ৬. ফায় (বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ), ৭. খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ), ৮. যারাইব (ضَرَائِبُ), ৯. খাস জমির লগ্নি বাবদ আয়, ১০. আশূর (عَشُوْرٌ = শুল্ক), ১১. ওয়াক্ফ্ সম্পদ, ১২. বনজ সম্পদ, ১৩. আমওয়ালে ফাযিলা ও ১৪. ঋণ গ্রহণ।

ব্যয়ের খাতসমূহ :

১. বেতন-ভাতা, ২. শিক্ষা, চিকিৎসা, সামরিক ও ব্যক্তিগত ভাতা, ৩. যাকাতের ৮টি খাত, ৪. প্রশাসনিক ব্যয়, ৫. জনকল্যাণ ও ৬ বিনা সুদে ঋণদান।

আয়ের উৎসসমূহের ব্যাখ্যা

১. উশ্‌র : বায়তুলমালের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে উশ্‌র। মুসলিম মালিকানাধীন ভূমির একটি বিরাট অংশের বার্ষিক রাজস্বকে উশ্‌র বলা হয়। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاٰتُوا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ·

আর ফসল তোলার দিনে এর দেয় প্রদান করবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৪১)

হাদীসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عُشْرِيًّا اَلْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ لِنِصْفُ الْعُشْرِ ·

আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা) বলেন : যে ভূমির পানি সরবরাহ বৃষ্টি, ঝরণা কিংবা নদী থেকে হয়ে থাকে, তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ উশ্‌র হিসাবে গ্রহণ করা হবে। আর যে জমিতে (কূপ খনন করে) পানি সেচ করা হয়, তার ফসলের বিশ ভাগের একভাগ গ্রহণ করা হবে।[১৪]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উশরী থেকে ফসল, ফল-ফলাদি, শাকসব্জি, মধু ইত্যাদি সবকিছুতেই উশ্‌র ওয়াজিব।

২. খারাজ : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগাধিকৃত ভূমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয়, তাকে খারাজ বলা হয়। খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ভূমি জরিপ করিয়ে ও এর গুণাগুণ নির্ণয় করে এ রাজস্ব নির্ধারণ করতে হবে।

৩. জিয্‌য়া : কিতাবী এবং অনারব মুশরিক লোকেরা যদি পরাজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং নিজেদের জান-মাল ও ইয্‌যত-সম্মান রক্ষার শর্তে বার্ষিক কিছু কর প্রদান করে, তাকে জিয্‌য়া বলা হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ·

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোকে হারাম জানে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্‌য়া দেয়। (সূরা তাওবা, ৯ : ২৯)

৪. যাকাত : সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) বা সাড়ে সাত তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) বা এর সমমূল্যের টাকা কিংবা ব্যবসার পণ্য এক বছর পর্যন্ত কারো মালিকানায় থাকলে এবং তা তার ঋণ এবং প্রয়োজনীয় আসবাব সামগ্রীর অতিরিক্ত হলে এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বের করে দেওয়াকে যাকাত বলে। যাকাত ইসলামের অন্যতম রুক্‌ন। যাকাত ফরয হওয়ার কথা কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে উল্লেখ রয়েছে,

ইরশাদ হয়েছে, وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। (সূরা বাকারা, ২ : ৪৩) গবাদি পশু যদি চারণভূমিতে চরে লালিত-পালিত হয়, তবে এসবের উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির নিসাব ভিন্ন ভিন্ন। এসবের যাকাতও বায়তুলমালে জমা করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত যাকাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

৫. সাদাকা : যাকাত ছাড়াও আরো কিছু সামাজিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। এসব দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেও ইসলাম লোকদেরকে উৎসাহিত করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব দায়িত্ব পালন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মুস্তাহাব বা উত্তম। এসব আর্থিক সহযোগিতার নামই হচ্ছে সাদাকা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۔

এবং তাদের সম্পদে ভিখারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৯)

সাদাকা ব্যক্তিগতভাবেও দেওয়া যায় এবং বায়তুলমালেও জমা করা যায়। বায়তুলমালে জমা করা হলে খলীফা তা হক্‌দারদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন।

৬. ফায় বা বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ : বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ যদি মুসলমানদের হস্তগত হয়, তবে এসব সম্পদকে 'ফায়' বলা হবে। এসব সম্পদ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কেননা এসব সম্পদ বিনাযুদ্ধেই হাসিল হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করো নি ; আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা হাশ্‌র, ৫৯ : ৬)

৭. খুমুস : গনীমতের মাল, খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদ প্রভৃতির প্রত্যেকটি হতে খুমুস তথা এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা করা হবে। وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ রিকায (মাটির নিচে প্রোথিত ও খনি থেকে আহরিত সম্পদ) এ খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ওয়াজিব।[৩৫]

৮. যারাইব (ضَرَائِبُ) : যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষের অবস্থায় কিংবা বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে জনগণের কল্যাণের জন্য যাকাত ব্যতীত সরকারের পক্ষ থেকে বিত্তবানদের উপর যে কর (আর্থিক সাহায্য) আরোপ করা হয়, একে 'যারাইব' বলা হয়।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যাকাত, খারাজ, উশ্‌র, জিযয়া, শুল্ক, ফায়, খুমুস ইত্যাদি জাতীয় কর আরোপ করার উদ্দেশ্য হলো, জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ সাধন করা। এজন্যই অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করা ইসলামে জায়িয নেই। অবশ্য বায়তুলমালের উল্লিখিত খাতসমূহ থেকে জমাকৃত অর্থ-সম্পদ যদি প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট না হয় কিংবা আকস্মিক কোন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধান যদি অতিরিক্ত করারোপ ব্যতীত সম্ভব না হয়, তাহলে দেশের বিত্তবানদের উপর জরুরী ভিত্তিতে কর ধার্য করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে কারো প্রতি কোনরূপ যুলুম করা যাবে না। আল্লামা ইব্‌ন হায্‌ম (র) 'মুহাল্লা'

নামক গ্রন্থে ফকীর-মিস্‌কীনদের সাহায্য দান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "বায়তুলমাল ও ফায়-এর সম্পদদ্বারা যদি ফকীর-মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের চাহিদা মিটানো সম্ভব না হয়, খলীফা দেশের বিত্তবান সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করতে পারবেন। এমনকি বিত্তবান লোকেরা যদি কর প্রদান করতে অস্বীকার করে, তবে খলীফা তাদেরকে কর প্রদানের ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবেন। وَيُجْبِرُهُمُ السُّلْطَانُ عَلَىٰ ذٰلِكَ "এবং এ বিষয়ে সুলতান তথা রাষ্ট্রপ্রধান বিত্তবানদেরকে বাধ্য করতে পারবেন।" তিনি আরো বলেন, নিম্নলিখিত আয়াতটিও ব্যাপক অর্থে এরূপ কর ধার্যের অনুকূলে প্রমাণ হিসাব গ্রহণ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে :

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ٠

আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬)

হযরত আলী মুরতাযা (রা) বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ عَلَى الْاَغْنِيَاءِ فِىْ اَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِى لِفُقَرَاءِهِمْ فَاِنْ جَاعُوْا اَوْعَرُوْا اَوْ جُهِدُوْا فَيَمْنَعُ الْاَغْنِيَاءِ ٠

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বিত্তবানদের উপর ফরয করেছেন, তারা যেন তাদের ধন-সম্পদ থেকে বিত্তহীনদের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটানো পরিমাণ সম্পদ দান করে। সুতরাং বিত্তহীনরা যদি ভুখা, নাঙ্গা ও দুরবস্থায় থাকে, তবে এর কারণ এটাই হবে যে, বিত্তবানরা তাদের এই ফরয বিধান বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে।[৯৬]

অনুরূপভাবে জিহাদ এবং এই জাতীয় প্রয়োজন পূরণার্থেও কর ধার্য করা জায়িয। ইয়ারমূকের যুদ্ধের সময় এ ধরনের সাহায্য প্রদানের জন্য সাহাবীগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সাহাবীগণও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এ কাজে অংশ নিয়েছেন।[৯৭]

৯. কিরাউল আরদ : খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান যেসব সরকারি জমি বার্ষিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে চাষাবাদ করার জন্য প্রদান করেন, এ জাতীয় জমি থেকে আদায়কৃত রাজস্বকে 'কিরাউল আরদ' বলা হয়। উত্তরাধিকারী না থাকার দরুন যেসব জমি বায়তুলমালে জমা হয় এবং বিজিত এলাকার যেসব ভূমি মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে, এসব ভূমি বার্ষিক বন্দোবস্তের ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর আয়ও বায়তুলমালে জমা হয়।[৯৮]

১০. আশূর বা শুল্ক : ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যের বিধান ছিল, যখন কোন মুসলিম ব্যবসায়ী ব্যবসার পণ্য নিয়ে তাদের দেশে যেতো, তখন তারা তাদের থেকে নির্ধারিত হারে কাস্টমস বা শুল্ক আদায় করতো। বছরে তারা যতবার যাতায়াত করতো, ততবারই এই শুল্ক প্রদান করতে হতো। কিন্তু অমুসলিম বণিকেরা মুসলিম রাষ্ট্রে ব্যবসার পণ্য নিয়ে আসলে তাদের এ মালের কাস্টমস দিতে হতো না। এতে মুসলমানদের ঘাটতি এবং অমুসলিমদের লাভ ছিল। তদানীন্তন খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সামনে বিষয়টি উত্থাপিত হলে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত অবগত হয়ে প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট এ মর্মে পত্র লিখলেন : "অমুসলিমদের ন্যায় আপনারাও বাণিজ্যিক শুল্ক আদায় করুন। এই ট্যাক্স মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ী যারা মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্য করবে,

তাদের প্রত্যেকের থেকে উসূল করা হবে। তবে একবার কোন ব্যবসায়ীর নিকট থেকে শুল্ক আদায় করা হলে সারা বছর সে যতবারই যাতায়াত করবে, তাতে পুনরায় তাকে শুল্ক প্রদান করতে হবে না। মুসলিম, যিম্মী ও হরবী কাফিরদের থেকে শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে পরিমাণগত কিছুটা পার্থক্য থাকবে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, দুইশত দিরহাম বা বিশ মিসকাল (সাড়ে সাত তোলা সোনা)-এর কম মালে শুল্ক ওয়াজিব হবে না। এ পরিমাণ হলে ওয়াজিব হবে।"

উপরোক্ত নিয়মে উসূলকৃত শুল্ককে 'আশূর' (عُشُوْرٌ) বলা হয়। এই শুল্ক আদায়ের পরিমাণ হলো, মুসলিম ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য পণ্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, যিম্মীদের বিশ ভাগের এক ভাগ এবং হরবী তথা বিধর্মী রাষ্ট্রের অমুসলিম বণিকদের ব্যবসায়ী পণ্যের দশ ভাগের এক ভাগ।[৯৯]

১১. ওয়াক্ফ সম্পদ : যেসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ব্যক্তি-মালিকানা থেকে বের করে আল্লাহ্‌র পথে দিয়ে দেওয়া হয়, পরিভাষায় একে 'ওয়াক্ফ' বলা হয়। ওয়াক্ফ খাতের সমুদয় আয় বায়তুলমালের সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

১২. বনজ সম্পদ : ইসলামী রাষ্ট্রের বনজ সম্পদ বায়তুলমালের আমদানির একটি বিশেষ উপায়। বনজ সম্পদের আমদানি রাষ্টের কর্তৃত্বাধীন থাকবে এবং এর আয় বায়তুলমালে জমা হবে।

১৩. আমওয়ালে ফাযিলা : উপরে উল্লিখিত আয়ের উৎসসমূহ ছাড়া আরো বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ-সম্পদ বায়তুলমালে জমা হতে পারে। এগুলোকে 'আমওয়ালে ফাযিলা' (অতিরিক্ত সম্পদ) বলা হয়। যেমন কোন যিম্মী যদি বিদ্রোহ করে কিংবা কোন মুসলমান যদি ধর্মত্যাগ করে বিধর্মী রাষ্ট্রে পালিয়ে যায়, তবে তাদের যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বায়তুলমালে জমা করা হবে।[১০০]

১৪.ঋণ গ্রহণ : সাধারণত রাষ্ট্রের যে পরিমাণ আয় হবে, সে অনুপাতে ব্যয় করাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য জরুরী পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীআতের বিধান মুতাবিক প্রয়োজন পরিমাণ করও ধার্য করা যায়। কিন্তু তাতে যদি প্রয়োজন পূর্ণ না হয়, তাহলে সরকারের জন্য ঋণ গ্রহণ করাও জায়িয আছে। এ ঋণ বায়তুলমালের দায়িত্বে গ্রহণ করা হবে, বায়তুলমালেই তা জমা হবে এবং এখান থেকেই খরচ করা হবে।[১০১]

বায়তুলমালের ব্যয়ের খাত

ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে যেমন আয়ের উৎসগুলো সুনির্দিষ্ট, অনুরূপ ব্যয়ের খাতগুলোও সুনির্দিষ্ট। অবশ্য আয়-ব্যয়ের কতকগুলো খাত এমনও রয়েছে, যা মজলিসে শূরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারণ করার ইখ্‌তিয়ার রাখে। ফকীহ্‌গণ বলেন, বায়তুলমালে জমাকৃত অর্থসম্পদকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক চারটি শাখা বায়তুলমাল স্থাপন করতে হবে। অবশ্য এগুলো কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এই চারটি বিভাগ হলো নিম্নরূপ :

ক. গনীমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, খনিজ সম্পদ এবং ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত প্রাচীন সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ। এর ব্যয়ের খাত কুরআন মাজীদে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ـ

জেনে রাখ ! যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর, এর এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের জন্য। (সূরা আনফাল, ৮ : ৪১)

কুরআন মাজীদের এই নির্দেশের অনুসরণে নবী কারীম (সা) গনীমতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং এর এক-পঞ্চমাংশ উল্লিখিত খাতসমূহে ব্যয়ের জন্য বায়তুলমালে জমা করেছিলেন।

খ. এ বিভাগে থাকবে যাকাত, উশ্‌র এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে আদায়কৃত আশূর বা শুল্ক। এ সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٠

সাদাকা (যাকাত) তো কেবল ফকীর, মিসকীন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা, ৯ : ৬০)

এ আয়াত থেকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যাকাত ও উশ্‌রের অর্থ ব্যয়ের খাত আটটি :

১. ফকীর : যাদের স্বল্প পরিমাণ সম্পদ আছে, তবে তা নিসাব পরিমাণ হয় না, এ ধরনের ব্যক্তিকে ফকীর বলা হয়।

২. মিস্‌কীন : যাদের কোন সম্পদই নেই, তাদেরকে মিস্‌কীন বলা হয়।

৩. যাকাত উসূলকারী কর্মচারি : বস্তুত যাকাত বিভাগের কর্মচারিগণ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ যারা যাকাত উসূল করবে। অপর ভাগ যারা যাকাত বন্টন করবে। উভয় ধরনের কর্মচারিদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়িয।

৪. যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য : কুরআনের ভাষায় তাদেরকে اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ বলা হয়েছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, এ খাতটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হানাফী মাযহাবের বিদগ্ধ একদল আলিমের মতে প্রকৃতপক্ষে 'মুআল্লাফাতে কুলূবুহুম' চার প্রকার :

ক. দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমান : তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা ইসলামের উপর মজবূত করার জন্য।

খ. খাঁটি মুসলমান : তাকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা, যাতে তার মতো লোকেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

গ. এমন কোন মুসলমানকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যে সে মুসলিম সৈন্যদেরকে সহায়তা করবে।

ঘ. এমন কোন মুসলমানকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা, যাতে সে আশেপাশের গোত্রসমূহ থেকে যাকাতের অর্থ উসূল করার সময় সাহায্য-সহায়তা করবে। তারা যদি গরীব হয়, তবে তাদের প্রত্যেককেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়িয।

কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তাফসীরে মাযহারীতে এবং আল্লামা কুরতবী (র) 'আল-জামি' লি আহ্কামিল কুরআন' গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১০২]

৫. ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য : 'গারিম' মানে এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যার নিকট ঋণের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ কোন মাল নেই।

৬. দাস মুক্তির জন্য : অর্থাৎ মুকাতাব গোলামকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্যে যাকাতের অর্থ দান করা।

৭. আল্লাহ্র পথে : ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, এর অর্থ হচ্ছে টাকা-পয়সার অভাবে জিহাদে শরীক হতে পারছে না এমন মুজাহিদ। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে হজ্জে যেতে ইচ্ছুক অথচ টাকা-পয়সার অভাবে যেতে পারছে না এমন লোক।

৮. মুসাফিরদের জন্য : অর্থাৎ এমন মুসাফির ব্যক্তি যার বাড়িতে অর্থসম্পদ আছে বটে, তবে সে এমন স্থানে আছে যেখানে তার নিকট কোন অর্থসম্পদ নেই।[১০৩]

উপরোক্ত ৮টি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়িয। প্রতি খাতে যাকাত দেওয়াও জায়িয এবং যে কোন এক খাতে দেওয়াও জায়িয। যাকাতের অর্থদ্বারা মাসজিদ বানানো, মৃতকে কাফন দেওয়া, মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা এবং পুল ইত্যাদি নির্মাণ করা জায়িয নেই।[১০৪]

শ্রমজীবী ও রুজিহীনদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান : মজুর-শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং অক্ষম লোকদের নিরাপত্তা বিধান করাও এই যাকাতের অর্থ দিয়ে করা যাবে।

গ. এ বিভাগে থাকবে খারাজ, জিয্য়া, অমুসলিম বণিকদের নিকট থেকে আদায়কৃত আশূর বা শুল্ক, বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ, খাস জমির লগ্নি বাবদ আয় ও জরুরী অবস্থায় আদায়কৃত কর। এ খাতে জমাকৃত অর্থসম্পদ সকল প্রকার বেতন-ভাতা এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যয়িত হবে।

ঘ. এ বিভাগে থাকবে আমওয়ালে ফাযিলা তথা অতিরিক্ত আমদানি, উত্তরাধিকারবিহীন সম্পদ, উত্তরাধিকারবিহীন মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পত্তি ও হারানো প্রাপ্তি সম্পদ ইত্যাদি। এ খাতের টাকা-পয়সা জনকল্যাণমূলক কাজ তথা লা-ওয়ারিস সন্তানাদির লালন-পালন এবং আরো অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হবে।[১০৫] যেমন গরীব জনসাধারণকে বিনাসুদে ঋণ প্রদান করা ইত্যাদি।

ফকীহ্গণ বলেন, খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে প্রয়োজনে বায়তুলমালের এক শাখা থেকে অন্য শাখার জন্য ঋণও গ্রহণ করতে পারবেন। শামী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে :

وَعَلَى الْاِمَامِ اَنْ يَّجْعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ بَيْتًا يَخُصُّهُ وَلَهُ اَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْ اَحَدِهَا لِيَصْرِفَهُ لِلْاٰخَرِ ‐

বিভিন্ন ধরনের ব্যয় খাতের জন্য বায়তুলমালের পৃথক পৃথক শাখা কায়েম করা ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের উপর অপরিহার্য কর্তব্য এবং তাঁর জন্য জায়িয আছে এক শাখা থেকে ঋণ নিয়ে অন্য শাখায় খরচ করা।

ইসলামী ফিক্হ গ্রন্থে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, বাধ্যতামূলক সাদাকা যেমন যাকাত, উশ্র ইত্যাদি ছাড়া বায়তুলমালের অর্থসম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিমদের ন্যায়

অমুসলিমদের জন্যও প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রা) ফকীর, মিসকীন ও অভাবীদের তালিকায় অমুসলিম যিম্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।[১০৬]

ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যেন অনাহারে অর্ধাহারে না থাকে এবং অভুক্ত না থাকে, এ বিষয়ে সতর্ক নজর রাখা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। শুধু তাই নয়; বরং কোন জীব-জন্তু যেন না খেয়ে মারা না যায়, এদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। হযরত উমর (রা) বলেছেন :

لَوْهَلَكَ وَلَدُ الضَّأْنِ عَلَى شَاطِئِ دَجْلَةَ اَخَافُ اَنْ يَسْئَلَنِيْ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ .

যদি সুদূর দজলার তীরে একটি বক্রীর বাচ্চাও না খেয়ে মারা যায়, তবে আমার আশংকা হয়, না জানি এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

'শারহে শির'আতুল ইসলাম' গ্রন্থে সাইয়িদ আলীযাদা হানাফী (র) খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন :

وَلاَ يَدَعُ فَقِيْرًا فِيْ وِلاَيَتِهِ اِلاَّ اَعْطَاهُ وَلاَ مَدْيُوْنًا اِلاَّ قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ وَلاَ ضَعِيْفًا اِلاَّ اَعَانَهُ وَلاَ مَظْلُوْمًا اِلاَّ نَصَرَهُ وَلاَ ظَالِمًا اِلاَّ مَنَعَهُ عَنِ الظُّلْمِ وَلاَ عَارِيًا اِلاَّ كَسَاهُ كِسْوَةً .

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ফকীরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে, মযলূমের প্রতি ন্যায়ানুগ ফায়সালা করবে, যালিমকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে এবং প্রত্যেক বস্ত্রহীন মানুষের বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে।

সারকথা, বায়তুলমালের ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে যাকাত ও উশ্‌রের ব্যয়ের খাত সুনির্দিষ্ট। তাতে রদবদল জায়িয নেই। এ ছাড়া বাকী খাত তথা ফায়, খারাজ ও এ জাতীয় অন্যান্য আয় খলীফা মাজলিসে শূরার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করতে পারেন।[১০৭]

উত্তরাধিকার

আয় ও আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে উত্তরাধিকারের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেও ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ লাভ করতে সক্ষম হয়। এতে সম্পদ আবর্তিত হতে থাকে বংশ পরম্পরায়। ইসলামে তালুকদারী, জমিদারী ও সামন্ত প্রথার কোন অবকাশ নেই। কুরআন ও হাদীসে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا .

পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ ব্যক্তিদের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীগণেরও অংশ আছে। তা অল্প হোক অথবা বেশি হোক, এক নির্ধারিত অংশ। (সূরা নিসা, ৪ : ৭)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ .

কেউ যদি সম্পদ রেখে মারা যায়, তাহলে তার ওয়ারিসগণ এর মালিক হবে।[১০৮]

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে :

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ .

নবী কারীম (সা) বলেন : যাদের হক্ বা পাওনা নির্ধারিত রয়েছে, আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী তাদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ বন্টন করে দাও।[১০৯]

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে ধন-সম্পদ বন্টনের যে পদ্ধতি ফিক্‌হ-এর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, তা অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও সুবিন্যাস্ত। এই পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে সমাজ থেকে জমিদারী, জায়গীরদারী ও সামন্ত প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে এবং মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যও হ্রাস পাবে। কেননা ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে সম্পদ সবসময় আবর্তিত হতে থাকে। সম্পদ এক হাত থেকে অপর হাতে পৌঁছার কারণে এরদ্বারা কম-বেশি সকলেই উপকৃত হতে পারে।

অসিয়্যাত

ব্যক্তিগত উপার্জনের ক্ষেত্রে অসিয়্যাতের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত কোন বস্তু বা তার মুনাফা সম্বন্ধে এরূপ বলে কিংবা লিখে দেওয়া যে, 'আমার মৃত্যুর পর এটা অমুকের হবে।' ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় একেই অসিয়্যাত বলা হয়। যেহেতু মৃত ব্যক্তির ধনসম্পদে উত্তরাধিকারদের অংশ রয়েছে, তাই শরী'আতে শুধু সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে অসিয়্যাত করা জায়িয।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ .

সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের জন্য অসিয়্যাত করবে এবং এক-তৃতীয়াংশই অনেক।[১১০]

অসিয়্যাত এমন একটি আমল যারদ্বারা বিত্তশালী ব্যক্তি তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও গরীব এবং অভাবীদের আর্থিক উপকার করতে পারে। অনেক সময় এর মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সামাজিক কাজও সুসম্পন্ন করা যায়। এ জন্যই কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে অসিয়্যাতের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, অসিয়্যাতের বিষয়টি উত্তরাধিকারের বিষয়ের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকারযোগ্য। ইরশাদ হয়েছে :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ .

তোমরা যা অসিয়্যাত করবে, তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর (উত্তরাধিকারের বিষয়টি কার্যকরী হবে)। (সূরা নিসা, ৪ : ১২)

হেবা

ব্যক্তিগত আয়ের উপায়-উপকরণসমূহের মধ্যে হেবাও একটি কল্যাণকর পদ্ধতি। হেবার কল্যাণকর বিষয় হলো এই যে, কোন বিত্তবান ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের পরও যদি তার অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, তবে তার জন্য সমীচীন হলো, অতিরিক্ত মূলধন কোন অভাবী ব্যক্তির অভাব দূরীকরণে ব্যয় করা। হেবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো, নিজের অর্থসম্পদ কোন ব্যক্তিকে দান করা। ধনী-গরীব সকলকেই হেবা

করা যায়। তবে গরীব মানুষকে হেবা করা উত্তম। হেবা এবং হাদিয়ার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হয়।

বস্তুত বিনা প্রতিদানে কোন বস্তু অন্যের মালিকানায় দিয়ে দেওয়াকে 'হেবা' বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : হেবা জীবনোপকরণের একটি ভিন্ন প্রক্রিয়া। চাওয়া ও প্রতীক্ষা ছাড়া যদি এক ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে আর্থিক কিছু লেনদেন করে, তবে অপরের জন্য তা গ্রহণ করা উচিত; প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। কেননা এ হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্ক, যা তিনি তাকে এর মাধ্যমে দান করেছেন।[১১১]

উপার্জনের অবৈধ উপায়

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জনের প্রক্রিয়া এবং উপার্জিত বস্তু উভয়ই বৈধ ও হালাল হওয়া অপরিহার্য। অনুরূপভাবে, উপার্জনের অবৈধ পন্থা অবলম্বন এবং হারাম বস্তুর উপার্জন থেকে বেঁচে থাকাও আবশ্যক। লেনদেনের এমন প্রক্রিয়া যা পাপ অথবা এমন বস্তুর বেচাকেনা করা যার মূলগত দিক অপবিত্র অথবা যেসব লেনদেনে প্রতারণা বা ধোঁকা রয়েছে বা যাতে অন্যের ক্ষতির আশংকা রয়েছে, উপার্জনের এ জাতীয় প্রক্রিয়া ইসলামের অর্থনীতির দৃষ্টিতে হারাম। যেমন সুদ, ঘুষ, জুয়া, অবৈধ লটারী, প্রতারণা, ওজনে কম দেওয়া ও ভেজাল মিশানো, হারাম বস্তুর ব্যবসা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও জবর-দখল এবং মজুতদারী ও কালোবাজারি ইত্যাদি।

সুদ ও সুদের পরিচিতি

সুদের আরবী হচ্ছে 'রিবা'। রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় মূলধনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাকে রিবা বা সুদ বলা হয়। আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী (র) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে :

اَلرِّبَا فِى اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ فِى الْاٰيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لاَ يُقَابِلُهَا عَوْضٌ ·

'রিবা'-এর আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। কুরআন মাজীদে রিবা বলে ঐ অতিরিক্ত পরিমাণকে বুঝানো হয়েছে, যার মুকাবিলায় কোন বিনিময় নেই।[১১২]

ফকীহ্গণের মতে, রিবা সুদ দুই প্রকার : (১) রিবান্ নাসিয়া (رِبَا النَّسِيْئِ) মেয়াদী সুদ, (২) রিবাল ফায্ল (رِبَا الفضل) মালের সুদ।

কোন ব্যক্তি অপর কারো নিকট হতে কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ফেরত দেওয়ার শর্তে জিনিসের সাথে যে অতিরিক্ত পরিমাণ বস্তু তাকে প্রদান করে, এ অতিরিক্ত পরিমাণকে 'রিবান্ নাসিয়া' (رِبَا النَّسِيْئِ) বলা হয়।[১১৩]

রিবা-এর অনুরূপ সংজ্ঞা হাদীসেও বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّنَفْعًا فَهُوَ رِبَا ·

যে ঋণ কোন মুনাফাকে টেনে আনে তাই রিবা।[১১৪]

অতএব, কোন ব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তিকে এই শর্তে একশত টাকা ঋণ দেয় যে, মেয়াদ শেষে খাতক ঋণদাতাকে একশত বিশ টাকা পরিশোধ করবে। এ ক্ষেত্রে বিশ টাকার

কোন বিনিময় নেই। তাই এ বিশ টাকা সুদ হিসাবে গণ্য হবে। জাহিলী যুগে আরবে এরূপ লেনদেনের প্রচলন খুবই বেশি ছিল। তৎকালে আরবে এরূপ নিয়মও বিদ্যমান ছিল যে, খাতক নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সুদে-মূলে পরিশোধ করতে না পারলে ঋণদাতা তার মূলধনের সাথে অতিরিক্ত পাওনা যোগ করে সম্পূর্ণ টাকার উপর পুনরায় নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করার শর্তে ঋণের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত। এরূপ করাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়। মেয়াদী সুদ ও মেয়াদী সুদের উপর চক্রবৃদ্ধি সুদ উভয়ই ইসলামে হারাম।

বস্তুত একই জাতের দ্রব্য ও মুদ্রার লেনদেনকালে একপক্ষ চুক্তি মুতাবিক অপরপক্ষকে শরী'আতসম্মত বিনিময় ব্যতীত যে বর্ধিত মাল প্রদান করে, তাকে মালের সুদ' (رِبَا الْفَضْلِ) বলা হয়। 'মু'জামুল লুগাতিল ফুকাহা' গ্রন্থে মালের সুদ (رِبَا الْفَضْلِ)-এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে :

بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً ۔

একই শ্রেণীভুক্ত খাদ্যশস্যের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়কালে একপক্ষ অপরপক্ষকে এ মাল হতে যে বর্ধিত অংশ প্রদান করে, তাকে মালের সুদ বলা হয়।

সুতরাং একমণ ধানের বিনিময়ে দেড়মণ ধান গ্রহণ করা হলে যেহেতু অতিরিক্ত অর্ধমণের কোন বিনিময় নেই, তাই এ অতিরিক্ত অংশ সুদ হিসাবে গণ্য হবে।

'রিবা আল-ফায্ল' তথা মালের সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে তা সমান সমান ও নগদ হতে হবে। কেউ যদি অতিরিক্ত কিছু প্রদান করে অথবা অতিরিক্ত দাবি করে, তবে তা সুদ হবে। সুদ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতে উভয়ই সমান পাপী হবে।[১১৫]

এ ছয় প্রকার বস্তুর থেকে প্রত্যেক প্রজাতির বস্তুর পরস্পর অদল-বদলের সময় কম-বেশি করা হলে বা কম-বেশি করে বাকীতে বিক্রি করা হলে তা সুদের আওতাভুক্ত হবে। কিন্তু দুই প্রজাতির বস্তু নগদ লেনদেন করা হলে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, রিবা হারাম হওয়ার হুকুম এই ছয় বস্তুর সাথে খাস নয়; বরং এই ছয় প্রকার বস্তুর ন্যায় আরো যত বস্তু রয়েছে সবগুলোর মধ্যেই এই হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কোন বস্তুর পারস্পরিক লেনদেনে কম-বেশি করা হলে, তখনই তা সুদে পরিণত হবে, যদি উভয়ের মধ্যে যুগপৎভাবে নিম্নোক্ত দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে : ১. বস্তু দু'টি একই প্রজাতির হলে, ২. ওজন বা পরিমাপের দ্বারা এগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে। কোন বস্তুতে উক্ত বৈশিষ্ট্য দু'টির কোন একটি বিদ্যমান না থাকলে লেনদেনে কম-বেশি করা হলেও তাতে সুদ হবে না।

উল্লেখ্য, সুদ, রিবা এবং ইন্টারেস্ট একই জিনিস। এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একান্ত স্থূলবুদ্ধি ও অবিবেকী লোকেরাই কেবল রিবা এবং সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে থাকে।

সুদ সম্পর্কে ইসলামের বিধান

সুদ শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। সুদ প্রথা ধন-সম্পদকে সমাজের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত করে দেয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ·

হে মু'মিনগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩০)

সুদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ পূর্বক আরো ইরশাদ হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ ·

যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আর তা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে, তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড়, তবে জেনে রাখ যে, এ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না। (সূরা বাকারা, ২ : ২৭৫-২৭৮)

সুদ খাওয়া, দেওয়া এবং সুদের লেনদেনে সাহায্য-সহযোগিতা করা সবই হারাম এবং অভিশপ্ত কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে :

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ·

হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাব রক্ষক এবং তার সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন এবং তিনি বলেছেন : তারা সকলেই সমান অপরাধী।[১১৬]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءً اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ ۔

সুদের সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর নিম্নটি হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমপর্যায়ের গুনাহ্।[১১৭]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরী'আতে সুদ হারাম। মেয়াদী সুদ, চক্রবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক সুদ তথা সকল প্রকার সুদই ইসলামে নিষিদ্ধ।

সুদ নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি যুক্তিসম্মতও বটে। কেননা সুদ গ্রহণ করা ও দেওয়াতে যেমন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী রয়েছে, অনুরূপভাবে এতে রয়েছে নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি। বস্তুত সুদ চাই মহাজনী হোক বা বাণিজ্যিক, প্রাচীন কায়দায় হোক কিংবা আধুনিক কায়দায় হোক, সবই মানব চরিত্রে নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা এবং কৃপণতা ইত্যাদি বদ অভ্যাসগুলো জন্ম দেয়। মানবিক গুণাবলীর বিকাশের ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে বিরাট অন্তরায়। সুদভিত্তিক সমাজের লোকদের মধ্যে সাধারণত নির্মমতা বিদ্যমান থাকে বিধায় উক্ত সমাজের গরীব লোকের মনে প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়। শুরু হয় সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি। এতে বিঘ্নিত হয় সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা। এমনিভাবে সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়টিও স্পষ্ট। কেননা মানুষ সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা কিংবা কৃষিকাজে ব্যয় করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে। অভাবী ব্যক্তি সুদভিত্তিক যে ঋণ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কৃষি, ব্যবসা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রেও উক্ত আশংকা প্রযোজ্য। কেননা উক্ত ঋণের কোনটাতেই মুনাফা হওয়ার নিশ্চয়তা নেই কিন্তু সুদের হার নিশ্চিত। এ কারণে কৃষক, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীকে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে স্বীয় কার্য পরিচালনা করতে হয়।

ঘুষ

টাকা-পয়সা বা কোন বস্তু প্রদান করে এমন জিনিস হাসিল করা, যাতে দাতার কোন অধিকার নেই, এ জাতীয় লেনদেন করাকে শরী'আতের পরিভাষায় ঘুষ বলা হয়। ঘুষ আদান-প্রদান করা লা'নতযোগ্য কাজ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ ۔

ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত।[১১৮]

জুয়ার সংজ্ঞা ও পরিচয়

জুয়াকে আরবীতে 'মায়সির' (مَيْسِر) ও 'কিমার' (قِمَار) বলা হয়। বস্তুত মায়সির ও কিমার এমন খেলাকে বলা হয়, যা লাভ ও ক্ষতির মধ্যে আবর্তিত থাকে। অর্থাৎ যার মধ্যে লাভ বা ক্ষতি কোনটাই স্পষ্ট নয়।[১১৯]

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, যে ক্ষেত্রে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। ফলে

এতে লাভ কিংবা লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকে।[১২০] যেমন দুই ব্যক্তি পরস্পর একে অপরকে বাজি ধরে বলল, যদি তুমি দৌড়ে অগ্রগামী হতে পার, তাহলে তোমাকে এক হাজার টাকা দিব। আর যদি আমি অগ্রগামী হই, তবে তুমি আমাকে এক হাজার টাকা প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে লাভ ও লোকসান অস্পষ্ট। জাহিলী আমলে নানা ধরনের জুয়ার প্রচলন ছিল।

বর্তমানকালে প্রাচীন পদ্ধতি ছাড়াও জুয়ার ক্ষেত্রে আরো বহু নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন হাউজী, টাকা বাজি রেখে ঘোড় দৌড় ও তাস খেলা ইত্যাদি। এগুলো সবই হারাম। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, শুধু নাম পরিবর্তনের কারণে বস্তুর হাকীকত (মূল প্রকৃতি) এবং হুকুম পরিবর্তন হয় না। কাজেই প্রাচীনকালে প্রচলিত জুয়া সম্পর্কে যে হুকুম প্রযোজ্য ছিল, আধুনিককালের জুয়ার ক্ষেত্রেও সে হুকুমই প্রযোজ্য হবে।

শরী'আতের দৃষ্টিতে জুয়া

ইসলামী শরী'আতে জুয়া হারাম। একাধিক আয়াত ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

হে মু'মিনগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর,তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়াদ্বারা তোমাদের মধ্যে মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায আদায়ে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৯০-৯১)

এ আয়াতে মদ ও জুয়াকে ঘৃণ্য বস্তু আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। মদ ও জুয়াকে একই পর্যায়ভুক্ত করে মূর্তিপূজার সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতে এগুলো থেকে দূরে থাকার হুকুম করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে,এতে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু এরদ্বারা শয়তান মানুষকে নামায আদায় করা এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ রাখে। কাজেই মদের ন্যায় জুয়াও হারাম। এর হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআন মাজীদের অকাট্য দলীলদ্বারা প্রমাণিত। যদি কেউ এ হুকুমকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।[১২১]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٖ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ ـ

কেউ যদি তার সাথীকে বলে, এসো, জুয়া খেলব। তাহলে (এ কথার অপরাধের কারণে) সাদাকা করা তার উপর অপরিহার্য।[১২২]

অতএব, জুয়াকে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা যেমন কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই, তেমনি একে খেলা, মনের সান্ত্বনা, তৃপ্তি ও অবসর বিনোদনের উপায়রূপে গ্রহণ করাও বৈধ হতে পারে না।

জুয়ার অপকারিতা

জুয়া খেলাতে বহু অপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. জুয়ার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি উভয়বিধ সম্ভাবনা থাকে। এতে বিজয়ী ব্যক্তির কেবল লাভই লাভ। আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। এ খেলায় পরাজিত ব্যক্তির মাল বিজয়ীর হাতে চলে যায়। এতে যে ব্যক্তি লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে ক্রমেই রক্তপিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। জয়লাভকারী ব্যক্তি রাতারাতি টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। আর পরাজিত ব্যক্তি দিন দিন সম্পদহারা হতে থাকে। জুয়াড়ী ব্যক্তির হাতে টাকা-পয়সা না থাকলে সে সম্পদ বিক্রি করে, প্রয়োজনে ঘরের সামানপত্র, এমনকি ঘর বিক্রি করেও এ খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। তাতেও সম্ভব না হলে চুরি-ডাকাতি করে হলেও খেলায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করে থাকে। জুয়া খেলার সাথে চোর-ডাকাতের এবং খারাপ লোকদের সম্পৃক্ততাই সবচেয়ে বেশি। মোটকথা, এই খেলায় যেমন অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, তেমনি এতে মানুষের চারিত্রিক ক্ষতিও রয়েছে চরমভাবে।

২. জুয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে উপার্জনের ব্যাপারে অলস, উদাসীন ও নিস্পৃহ হয়ে যায়। তার একমাত্র চিন্তা থাকে বসে বসে বাজির মাধ্যমে অন্যের মাল হাতিয়ে নেওয়া, যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন না হয়। এমনি করে অলস হয়ে তারা দেশ ও দশের উন্নয়নে আর কোন অবদান রাখতে পারে না।

৩. জুয়ার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে জুয়াও মদের মত পরস্পরের মধ্যে ফাসাদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। কেননা পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। জুয়ার জয়-পরাজয় এক পর্যায়ে মারামারি এমনকি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

৪.জুয়াড়ী ব্যক্তি জুয়ার নেশায় মদখোর ব্যক্তির ন্যায় মাতাল অবস্থায়ই থাকে সর্বদা। এ কারণে সে ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও আত্মীয় কারোর খবর রাখতে পারে না। ফলে জুয়াড়ী ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে না, ছেলেমেয়েদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত বানাতে পারে না; বরং তারাও পিতার দেখাদেখি ঐ সর্বনাশা খেলায় অংশগ্রহণের প্রয়াস পায়। এমনি করেই জুয়াড়ী ব্যক্তির পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। জুয়াড়ী ব্যক্তির মেজাজে সর্বদা রুক্ষতা ও নিষ্ঠুরতা বিরাজমান থাকে। লাভবান ব্যক্তি আরো লাভের নেশায় মাতাল হয়ে উঠে। আর পরাজিত ব্যক্তি প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ হয়ে যায়। তাই স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সাথে তার বিবাদ, ঝগড়া ও অশান্তি সর্বদা লেগেই থাকে। বর্তমানে স্ত্রী কর্তৃক স্বামী হত্যা বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা, এ জাতীয় লোমহর্ষক ঘটনার পেছনে জুয়ার প্রভাবকে খাটো করে দেখা যায় না।

৫. জুয়ার সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতির দিকটি হলো, এ খেলায় মানুষ আল্লাহ্-বিমুখ এবং নামায-রোযা তথা ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে চরমভাবে উদাসীন ও গাফিল হয়ে যায়। কেননা জুয়াড়ী ব্যক্তির একমাত্র ধ্যান-ধারণা, কেমন করে আরো টাকা হাসিল করা যায় অথবা কেমন করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কাজেই জুয়ার এ সর্বনাশা গ্রাস থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

লটারীও একপ্রকার জুয়া

লটারীও একপ্রকার জুয়া। কাজেই লটারীকে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং একে জনকল্যাণমূলক কাজের নিমিত্তে জায়িয মনে করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। যারা লটারীর ব্যবস্থাপনা করে থাকে, তাদেরকে এ সম্বন্ধে শরী'আতের বিধান শোনানো হলে তারা বলে, এতে ক্ষতি কি? এতে তো মানুষের বহু উপকার রয়েছে। তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কোন বস্তুতে সাময়িক কিছু উপকার আছে বলেই তা হালাল হতে পারে না। কেননা, যে বস্তুতে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশি, তাকে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বস্তু স্বীকার করে নেওয়া যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণ সংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সামগ্রিকতার বিচারে এগুলোকে ক্ষতিকর মনে করা হয় এবং এসব থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় অপকার বেশি, শরী'আত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা এমন কি জিনিস আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই। উপকার আছে বলেই এগুলোকে কেউ জায়িয মনে করে না। লটারীর বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এতে কিছুটা উপকার আছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে জুয়া এবং ধোঁকা। কাজেই শরী'আতের দৃষ্টিতে লটারীও হারাম। স্মর্তব্য, কোন মহৎ কাজের জন্য নাজায়িয তরীকা অবলম্বন করা কোনভাবেই বৈধ নয়।

বস্তুত জনকল্যাণের ধূয়া তুলে যারা এসব লটারীর ব্যবস্থা করে থাকে, মূলত জনসেবার পরিবর্তে আত্মসেবাই তাদের সামনে থাকে মূখ্য। সুন্দর চাকচিক্যময় মোড়ক লাগিয়ে মানুষের টাকা হাতিয়ে নেওয়া এবং রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়াই তাদের লক্ষ্য। মুসলমান হিসাবে এসব প্রতারক থেকে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।[১২৩]

প্রতারণা, ওজনে কম দেওয়া ও ভেজাল মিশানো

পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেওয়া কিংবা ওজন করে নেওয়ার সময় বেশি নেওয়া ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ·

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ : ১, ২, ৩)

নিজে গ্রহণের সময় বেশি মাপা এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়ার অশুভ পরিণতি কেবল পারলৌকিক নয়, বরং তা ইহলৌকিকও বটে। আর তা শুধু নৈতিকভাবেই নয়, বরং অর্থনৈতিকও বটে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) ওজনে কম না দিয়ে বেশি দেওয়ার জন্য হুকুম করেছেন। তিনি বলেন, (زِنْ وَاَرْجِحْ) ওজন কর এবং কিছু বেশি দিয়ে দাও।[১২৪]

বেচাকেনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতারণা করা, পণ্যদ্রব্যের পরিচয় দান কিংবা গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা উক্তি করা কিংবা ভুল প্রচারণা করা বা মালে ভেজাল মিশানো হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন খাদ্যস্তূপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপে হাত ঢুকিয়ে ভিতরে খাদ্যবস্তু ভেজা দেখতে পান। তখন তিনি বলেন : হে খাদ্য মালিক! এ কি ? জবাবে সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) ! বৃষ্টির কারণে এরূপ হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন :

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ ٠

যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না।[১২৫]

এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করা হারাম।

অধিক মূল্য লাভের নিমিত্তে পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রেখে তা বিক্রয় করা হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ تَسْتَقْبِلُوْا السُّوْقَ وَلاَ تُحَفِّلُوْا وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ٠

বাজারে পৌঁছার পূর্বেই (স্বল্প মূল্যে) ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সাক্ষাত করবে না; পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না এবং কেউ অন্যের পণ্য চালানোর জন্য প্রতারণার অপচেষ্টা করবে না।[১২৬]

ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়, বরং কেবলমাত্র মূল্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে দর-দাম করা জায়িয নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ تَنَاجَشُوْا ٠

তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।[১২৭] এরূপ করাও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

হারাম বস্তুর ব্যবসা

ইসলামী শরী'আতে যেসব বস্তু হারাম, এর উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুই হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَاَكْلَ ثَمَنِهَا ٠

যে বস্তু পান করা হারাম, তা বেচাকেনা করা এবং বেচাকেনার পর এর মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম।[১২৮]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيْهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةُ اِلَيْهِ ٠

আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন মদের উপর, মদ্যপায়ীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, ক্রয়-বিক্রয়কারীর উপর, প্রস্তুতকারীর উপর, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তার উপর, বহনকারীর উপর এবং যার জন্য বহন করে আনা হয় তার উপর।[১২৯]

ফকীহ্গণের মতে, মুসলিম দেশে হারাম বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করা জায়িয নেই। এমনকি প্রকাশ্যে হলে অমুসলিমদের জন্যও নয়।[১৩০]

অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা এবং অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপার্জন

হালাল উপায়ে উপার্জন করা ফরয এবং হারাম ও অবৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বা উপার্জন করা হারাম। অবৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে অর্থসম্পদ হাসিল করা হয়, তা আহার করে নামায-রোযা আদায় করলে তা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হয় না। তার দু'আও কবূল হয় না। এমনকি এ অবৈধ সম্পদদ্বারা কোন নেককাজ করলে তাও আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। সর্বোপরি উপরোক্ত ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيَقْبَلُ مِنْهُ وَلاَ يَنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلاَّ كَانَ زَادَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمْحُوا السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنَّ يَمْحُوا السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لاَ يَمْحُو الْخَبِيْثَ ·

কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ পন্থায় হারাম মাল লাভ করে সাদাকা করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সে যদি এই মাল থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে, তবে এতে বরকত হবে না। যদি সে হারাম মাল ত্যাজ্য সম্পদ হিসাবে রেখে যায়, তবে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। আল্লাহ্ তা'আলা মন্দকে মন্দের মাধ্যমে দূরীভূত করেন না (অর্থাৎ হারাম মালের সাদাকা কারো পাপ মোচনের কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় না)। কিন্তু তিনি মন্দকে সৎ কর্মের দ্বারা পরিচ্ছন্ন করেন। কেননা কোন নাপাক অপর নাপাককে মেটাতে পারে না।[১৩১]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবূল করেন না।" আহারের ব্যাপারে তিনি নবী-রাসূলগণকে যেরূপ হুকুম করেছেন, মু'মিনদেরকেও অনুরূপ হুকুম করেছেন। তিনি নবী-রাসূলগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন :

يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ·

হে রাসূলগণ ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ৫১)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ·

হে মু'মিনগণ ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিয্ক দান করেছি তা থেকে আহার কর। (সূরা বাকারা, ২ : ১৭২)

একখানা হাদীসের শেষাংশে তিনি জনৈক ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন : এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে উস্কু-খুস্কু অবস্থায় উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে

মুনাজাত করে বলল, হে আমার রব ! হে আমার প্রতিপালক ! হে আমার প্রভু ! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় বস্তু হারাম, তার লেবাস-পোশাক হারাম এবং হারাম মালের দ্বারাই তার জীবন লালিত-পালিত। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির দু'আ কেমন করে কবূল হবে?[১৩২]

অন্য হাদীসে আছে, "যে দেহ হারাম মালদ্বারা লালিত-পালিত, তা কখনো জান্নাতে যাবে না; বরং জাহান্নামই এর উপযুক্ত ঠিকানা।"[১৩৩]

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য জায়িয নেই। অনুরূপভাবে অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপার্জন করাও জায়িয নেই। যেমন গান-বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা জায়িয নেই।

হযরত সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আমর ইব্ন কুররা হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আশ্চর্য রকমের হতভাগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। সকল দিক থেকেই আমার পথ বন্ধ। একটিমাত্র রাস্তাই আমার জন্য খোলা, যার মাধ্যমে আমি জীবিকার্জন করে থাকি। আমি দফ বাজিয়ে গান করে থাকি। বিনিময়ে যা পাই তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি দয়া করে আমাকে গান-বাজনার অনুমতি দানে বাধিত করুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : রে আল্লাহ্র দুশমন ! তুমি মিথ্যা বলছো। আমি এর জন্য তোমাকে কখনো অনুমতি দিব না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য জীবিকার্জনের বহু পথ খোলা রেখেছেন। যেমন খোলা রেখেছেন আল্লাহ্র সৃষ্টি অন্যান্য জীবের জন্য। অবশ্য তুমি হালাল রুজির পরিবর্তে হারাম রুজির পথ বেছে নিয়েছো। আমার মাজলিস থেকে চলে যাও। আল্লাহ্র নিকট তোমার কৃতকর্মের জন্য তাওবা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হও। তুমি যদি অনুরূপ কাজে লিপ্ত হও, তবে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব। তোমাকে প্রহার করবো। তোমার মাথার চুল ন্যাড়া করে দিব। তোমাকে এ শহর থেকে বের করে দিব এবং তোমার ধন-সম্পদ মদীনার যুবকদের জন্য লুট করে নেওয়া হালাল করে দিব। এরপর আমর ইব্ন কুররা লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালো। আল্লাহ্ জানেন তখন তার অবস্থা কী হয়েছিল। সে চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : এরা হচ্ছে নাফরমান। এদের থেকে কেউ যদি তাওবা ছাড়া মারা যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নপুংসক ও উলঙ্গ অবস্থায় হাশর করাবেন। যেমন তারা দুনিয়াতে ছিল। এমনকি অন্যান্য লোকের থেকে পর্দা করার জন্য আঁচলটুকু পর্যন্ত তাদের থাকবে না। যখনই উঠে দাঁড়াবে, আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে।"[১৩৪]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, গান-বাজনাকে জীবিকার্জনের মাধ্যম বলে জ্ঞান করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ। কেননা এতে অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস হয় এবং সাধারণভাবে চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জতা সৃষ্টি হয়। অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِىْ مِثْلِ هٰذَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۰

গায়িকা দাসী বিক্রি করবে না এবং কিনবেও না। তাদেরকে গান শিক্ষা দিবে না। এদের ব্যবসায়ে কোন কল্যাণ নেই। এদের মত লোকদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۰

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওরা তারাই, যাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা লুকমান, ৩১ : ৬)[১৩৫]

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও জবরদখল

মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইসলাম চুরির শাস্তি বিধান করেছে। বস্তুত গোপনভাবে কারো মাল হস্তগত করাকে শরী'আতের পরিভাষায় চুরি বলা হয়। কোন প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি দশ দিরহাম বা তদূর্ধ মূল্যের কোন জিনিস চুরি করে, তবে তার হাত কাটা হবে এবং আদালত কর্তৃক এ শাস্তি বাস্তবায়িত হবে—ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়। চুরি করে নিজে স্বীকার করলে বা সাক্ষ্য-প্রমাণে অপরাধ প্রমাণিত হলে চুরির বিধান প্রযোজ্য হবে। কেউ প্রথমবার চুরি করলে তার ডান হাত কাটা হবে। দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কাটা হবে। তৃতীয়বার চুরি করলে কোন কিছু না কেটে তাকে এ অপকর্মের থেকে তাওবা না করা পর্যন্ত জেলখানায় রাখা হবে। চুরির শাস্তি প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۰

পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৮)

এ দণ্ডাদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে কারো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। একদা মাখযূমী গোত্রের কোন এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়লে তার বিষয়ে কুরাইশী লোকেরা দারুনভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন হযরত উসামা (রা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি বললেন, (اتشفع فى حد من حدود الله) তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর না করার জন্য সুপারিশ করছো? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। বললেন :

اِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ۰

পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গেছে, যখন তাদের অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি করতো, তখন তাকে রেহাই দিতো, আর যখন দুর্বল বা ছোট বংশের লোক চুরি করতো, তখন তার উপর দণ্ডাদেশ জারি করতো। আল্লাহ্র শপথ! আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।[১৩৬]

জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ইসলামে ডাকাতের শাস্তির বিধানও রয়েছে। যেহেতু ডাকাত মানুষের জীবন ও সম্পদ উভয়ের উপর হামলা চালায়, কখনো শুধু জীবনহানি ঘটায়, কখনো শুধু সম্পদ নিয়ে যায়, আবার কখনো শুধু ভয় দেখিয়েও হুমকি দেয়, সেহেতু এর শাস্তিও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবন ও সম্পদ উভয়ের হানির ক্ষেত্রে ডাকাতের শাস্তি শূলদণ্ড, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুধু জীবন হানির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড, তৃতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুধু সম্পদ হানির ক্ষেত্রে শাস্তি পরস্পর উল্টাদিক দিয়ে হাত-পা কেটে দেওয়া অর্থাৎ ডান হাত কাটলে বাম পা এবং বাম হাত কাটলে ডান পা কেটে দিতে হবে। চতুর্থ ক্ষেত্রে অর্থাৎ হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ডাকাতের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা নির্বাসন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মককার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৩)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

وَمَنِ انْتَهَبَ نَهْبَةً مَشْهُوْدَةً فَلَيْسَ مِنَّا ۔

কেউ যদি প্রকাশ্যে লুটপাট করে, তবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্তও নয়।[১৩৭]

অনুরূপভাবে ছিনতাই করার ব্যাপারেও ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এভাবে মাল ছিনিয়ে নিয়ে তা ভক্ষণ করা জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ۔

কারো অর্থসম্পদ তার স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি ব্যতীত ভক্ষণ করা কারো জন্য হালাল নয়।[১৩৮]

কারো সম্পত্তি জবরদখল করাও ইসলামে জায়িয নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ ۔

কেউ যদি কারো জমি থেকে অর্ধ বিঘত পরিমাণ জায়গা জবর-দখল করে নেয়, তবে কিয়ামতের দিন ঐ জায়গা সাত তবক যমীনসহ বেড়ি বানিয়ে তার গলায় লট্‌কিয়ে দেয়া হবে।[১৩৯]

কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্তৃক উপহার গ্রহণ

বেতনভোগী কর্মচারি নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে উপহার গ্রহণ করা জায়িয নেই। বস্তুত এ ধরনের উপহার গ্রহণের মধ্যে হককে বাতিল কিংবা কোন অসদুদ্দেশ্য হাসিলের আশংকা রয়েছে। আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আযদ গোত্রের ইব্‌ন লুত্‌বিয়া নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারি নিযুক্ত করে কোথাও পাঠালেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের অর্থাৎ রাষ্ট্রের, আর এগুলো আমাকে হাদিয়া তথা উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দিয়ে প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং বললেন : আম্মা বা'দু, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যেসব বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করেছেন, এর কোন একটির ব্যাপারে আমি তোমাদের কাউকে কর্মকর্তা নিয়োগ করি। তারপর সে এসে বলে, এগুলো আপনাদের অর্থাৎ রাষ্ট্রের, আর এগুলো আমাকে দেওয়া উপহার। সে তার বাপের ঘরে অথবা মায়ের ঘরে বসে দেখে না কেন, তাকে উপহার দেওয়া হয় কিনা ? আল্লাহ্‌র শপথ ! কেউ যদি অন্যায়ভাবে যাকাতের কোন মাল নিয়ে যায়, তবে সে তা কাঁধে বহন করে কিয়ামাতের ময়দানে উপস্থিত হবে।[১৪০]

উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, বেতনভোগী কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য উপহার গ্রহণ করা জায়িয নেই। কেননা এর পেছনে কোন অসদুদ্দেশ্য থাকাটা স্বাভাবিক।[১৪১]

মজুতদারী ও কালোবাজারি

মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আটকিয়ে রেখে অস্বাভাবিকভাবে মুনাফা হাসিল করাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'ইহ্‌তিকার' বা মজুতদারী বলা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে :

كُلَّمَا أَضَرَّ بِالْعَامَّةِ حَبْسُهُ فَهُوَ احْتِكَارٌ .

যেসব জিনিস আটকিয়ে বা মজুত রাখলে সর্বসাধারণের কষ্ট ও ক্ষতি হয়, তাকে ইহ্‌তিকার বা মজুতদারী বলে।[১৪২]

মজুতদারীর ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ক্ষুন্ন হয়, এজন্য ইসলামী শরী'আতে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজুতদারকে পাপী ও অভিশপ্ত বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ .

পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।[১৪৩]

অপর এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلاَءَ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ .

মূল্য বাড়ার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট।[১৪৪]

তিনি আরো বলেন :

بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَرْخَصَ اللّٰهُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَاِنْ اَغْلَاهَا فَرِحَ ـ

মজুতদার খুবই নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। যদি জিনিসপত্রের দর হ্রাস পায়, তবে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে। আর যদি দর বেড়ে যায়, তবে আনন্দিত হয়।[১৪৫]

তিনি আরো বলেন :

مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالْاِفْلَاسِ ـ

কেউ যদি মুসলমানদের থেকে নিজেদের খাদ্যশস্য আটকিয়ে রাখে (মজুতদারী করে), তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর মহামারী ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন।[১৪৬]

আল্লামা শামী (র) বলেন, দুর্ভিক্ষের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া যদি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে বিচারক বা আদালত মজুতদারকে খাদ্যশস্য বিক্রি করে দেওয়ার জন্য আদেশ জারী করবেন। মজুতদার যদি হুকুম তামিল না করে, তবে বিচারক তার খোরাকী বাবদ প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রেখে বাকীগুলো বিক্রি করে দিবেন। যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার মত টাকা-পয়সা না থাকে, তবে বিচারক ক্রমশ তা বন্টন করে দিবেন। পরে তাদের হাতে খাদ্যশস্য আসলে আদালত তাদের নিকট থেকে তা উসূল করে দাতার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। নিজস্ব জমির খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অবশ্য কেউ যদি নিজের জমির ফসল হতে নিজের ও পরিবারের বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চয় করে রাখে, তবে তাতে কোন দোষ নেই।[১৪৭]

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইসলামের অর্থনীতি, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ১৯-২০।
২. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, মাওলানা হিফযুর রহমান (র), পৃ. ১৭।
৩. ইসলামের অর্থনীতি, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ২৭-৩২; ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, মাওলানা হিফযুর রহমান (র)।
৪. মুসনাদে আহ্মদ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৬।
৫. সীরাত স্মরণিকা, ১৪১৯ হিজরী, (প্রবন্ধ), মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ।
৬. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫০।
৭. রযীন, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫১।
৮. তিরমিযী ও আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫১।
৯. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪২।
১০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪১।
১১. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫৭।
১২. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ২৯৪ নং হাদীস।

১৩. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৬৬।
১৪. মূলনীতি সম্পর্কিত আলোচনাটি মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী (র) কৃত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি থেকে সংগৃহীত।
১৫. কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড।
১৬. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪২।
১৭. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪১।
১৮. আহমাদ, দারিমী ও বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪২।
১৯. ইসলামের অর্থনীতি, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ৩৭।
২০. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫৯।
২১. মিশকাত, পৃ. ২৫৯।
২২. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৮।
২৩. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফ (র), পৃ. ৩৯।
২৪. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৬।
২৫. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফ (র), পৃ. ৭।
২৬. ইব্‌ন মাজাহ, পৃ. ১৭৯।
২৭. ইব্‌ন মাজাহ, পৃ. ১৭৯।
২৮. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩, কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)।
২৯. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৮।
৩০. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫৭।
৩১. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৮-৪০৯ ; কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)।
৩২. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৯।
৩৩. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৯-৪১০।
৩৪. আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫৯।
৩৫. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।
৩৭. মাবসূত, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ১৭৫; কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৯৪-৯৮।
৩৮. ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৫৩।
৩৯. ইসলামের অর্থনীতি, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ১৫৯-৬১; হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬২।
৪০. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফ (র), পৃ. ৬১।
৪১. ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী (র), পৃ. ১৩৫।
৪২. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, মাওলানা হিফ্‌যুর রহমান (র), পৃ. ২৪১।
৪৩. ইসলামের অর্থনীতি, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ১৫০।
৪৪. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, পৃ. ২৪১; কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২।
৪৫. বায়হাকী, কিতাবুল বু'য়ূ, ৫ম খণ্ড; ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, পৃ. ২৪৩।
৪৬. তিরমিযী, দারিমী ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৩।

৪৭. তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ ও বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৪।
৪৮. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, পৃ. ২৪৪; আবূ দাউদ শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮৪।
৪৯. কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০২; আহ্‌মাদ সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪২।
৫০. কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০২।
৫১. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, পৃ. ২৪৫।
৫২. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৮।
৫৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৩।
৫৪. নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড।
৫৫. তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৮।
৫৬. নাসাঈ ও তিরমিযী।
৫৭. তিরমিযী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৮।
৫৮. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৭।
৫৯. বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৭।
৬০. বুখারী শরীফ।
৬১. বুখারী শরীফ।
৬২. তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ ও বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৪।
৬৩. ফাত্‌হুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, বেচাকেনা অধ্যায়, পৃ. ৩০৬।
৬৪. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫২।
৬৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৪।
৬৬. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, পৃ. ২৯৮-২৯৯।
৬৭. মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃ. ১৫৬।
৬৮. জাদীদ ফিক্‌হী মাসাইল, মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী, ১ম খণ্ড,।
৬৯. ফিকহী মাকালাত : মাওলানা তকী উসমানী।
৭০. ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খণ্ড (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ৫৪২-৫৪৩।
৭১. আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৬৩।
৭২. ফাত্‌হুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৬
৭৩. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯৪।
৭৪. বায়হাকী, সূত্র : ইসলামের অর্থনীতি, পৃ. ১১৭।
৭৫. মুসলিম শরীফ, সূত্র : ইসলামে শ্রমিকের অধিকার।
৭৬. হিদায়া ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩।
৭৭. ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : হিদায়া ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩।
৭৮. বুখারী, সূত্র : প্রাগুক্ত।
৭৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫১।
৮০. মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃ. ১৪৪২।
৮১. কানযুল উম্মাল, হায়সামী।
৮২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১২।

৮৩. আহমাদ হায়সামী, সূত্র : ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, পৃ. ১১৬।
৮৪. মুহাল্লা, ইব্‌ন হাযম, সূত্র : ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, পৃ. ১১৬।
৮৫. প্রাগুক্ত।
৮৬. ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, পৃ. ২১৮।
৮৭. ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, পৃ. ১১৮-১১৯।
৮৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৬৩।
৮৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, হাফিয ইব্‌ন কাছীর (র)।
৯০. হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬।
৯১. আবূ দাউদ ও তিরমিযী, সূত্র : হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬২।
৯২. ইসলামের অর্থনীতি, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ২৫৭।
৯৩. তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ, ৩য় খণ্ড।
৯৪. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫৯।
৯৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫৯।
৯৬. মুহাল্লা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
৯৭. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, পৃ. ১২৩।
৯৮. শামী ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩; উশর, খারাজ ও জিয্‌য়া অধ্যায়।
৯৯. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৩২; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ৫৩-৩৩৪।
১০০. বাদায়েউস্ সানায়ে, ৭ম খণ্ড, কিতাবুস সিয়ার, পৃ. ১৩০।
১০১. দরসে তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯-২৯০।
১০২. হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪।
১০৩. হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪।
১০৪. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮-৭৯ ও ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯।
১০৫. শামী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২।
১০৬. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, পৃ. ১৩০।
১০৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৬৩।
১০৮. মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪।
১০৯. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৬৫।
১১০. ইসলাম কা ইক্‌তিসাদী নিযাম, পৃ. ২৬২-২৬৩।
১১১. আহ্‌কামুল কুরআন, মাওলানা জা'ফর আহ্‌মাদ উসমানী (র), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৩।
১১২. সুদ আওর তিজারতী সুদ, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র)।
১১৩. জামে সাগীর, সূত্র : মা'আরেফুল কোরআন, পৃ. ১৫৩।
১১৪. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৪।
১১৫. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৪।
১১৬. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৬।
১১৭. আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস, আল্লামা ইবনুল আছীর (র), ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬।
১১৮. জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।
১১৯. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।

১২০. জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।
১২১. আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল ইসলাম, পৃ. ২৯৫।
১২২. আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল ইসলাম, পৃ. ২৯৫।
১২৩. আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫৩।
১২৪. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৮।
১২৫. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১।
১২৬. তিরমিযী, ১ খণ্ড, পৃ. ২৪৪।
১২৭. আল-ফিক্‌হ আলাল মাযাবিহিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬।
১২৮: আবূ দাউদ, পৃ. ৫১৭।
১২৯. আল-ফিক্‌হ আলাল মাযাবিহিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬।
১৩০. শারহুস সুন্নাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪২।
১৩১. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪১।
১৩২. আহ্‌মাদ, দারিমী ও বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪২।
১৩৩. ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : ফাতহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ১০৭।
১৩৪. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১৪।
১৩৫. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১৩।
১৩৬. বায়হাকী ও দারা কুত্‌নী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫৫।
১৩৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫৪।
১৩৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫৬।
১৩৯. শরহে মিশকাত, সূত্র : মিশকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৮।
১৪০. ফাতহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ১০৫; হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭০।
১৪১. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫০।
১৪২. রযীন, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫১।
১৪৩. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫১।
১৪৪. ইব্‌ন মাজাহ ও বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৫১।
১৪৫. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

দ্বাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় জীবন

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আকীদা-বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে ইবাদত, লেনদেন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনীতি, দাওয়াত, জিহাদ এবং তাসাউফসহ এতে সবকিছুর দিক-দির্দেশনা রয়েছে। প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য যেমনিভাবে সহীহ্ আকীদা ও বিশুদ্ধ আমল জরুরী, অনুরূপ রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা অবশ্যক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঠিক সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্দেশ করা এক দুরূহ ব্যাপার। কেননা রাষ্ট্রবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের একটি অংশ। আর সমাজ বিজ্ঞান হচ্ছে গতিশীল। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কাজেই কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যথার্থ প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তথাপি বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করে এর স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে সচেষ্ট হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাজনীতি এই দুটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীতে পলজানেট, জেলিনিক, সিজউইক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনীতি শব্দটি ব্যবহার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থকে আরো ব্যাপক করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। প্রখ্যাত সুইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লুন্টস্লী বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যা রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত, রাষ্ট্রের মৌলিক অবস্থা, এর অত্যাবশ্যকীয় প্রকৃতি, এর বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ ও অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।" ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পলজানেট বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানের সেই অংশ যা রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করে।" ডব্লিউ ডব্লিউ উইলোবির ভাষায়, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই বিজ্ঞান যার উদ্দেশ্য হল, রাজনৈতিক ঘটনাসমূহকে বিধিবদ্ধভাবে সুসংবদ্ধ করা এবং যে সকল রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে যে যুক্তিসঙ্গত এবং কার্যকারণ সম্পর্ক বিরাজ করে, তা নির্ধারণ করা।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত রাষ্ট্রেরই বিজ্ঞান। রাষ্ট্রই এর মূল-প্রতিপাদ্য বিষয়।[১]

প্রকাশ থাকে যে, দীনি পরিভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'ইলমুস সিয়াসাহ' বলা হয়। আলিমগণ এর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

অভিধানশাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে :

اَلسِّيَاسَةُ اِسْتِصْلاَحُ الْخَلْقِ بِارْشَادِهِمْ اِلَى الطَّرِيْقِ الْمُنْجِىْ فِى الْعَاجِلِ وَالْاَجِلِ ٠

দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির পথ-নির্দেশ করে মানুষের কল্যাণ সাধন করাকে 'সিয়াসাত' বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা হয়।

জামিউর রুমূয গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

اِنَّهَا هُوَ الْقَانُوْنُ الْمَوْضُوْعُ لِرِعَايَةِ الْاٰدَابِ وَالْمَصَالِحِ وَانْتِظَامِ الْاَمْوَالِ ٠

আর্থিক ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠুতা ও জনগণের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত রচিত আইন-কানুন ইত্যাদিকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলে।[২]

কেউ কেউ বলেন :

اَلسِّيَاسَةُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ الرَّوَابِطُ الْعَادِلَةُ الصَّالِحَةُ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَالْمَحْكُوْمِ وَالسُّلْطَانِ الرِّعَايَا وَبَيْنَ الْاُمَمِ الْمُتَشَارِكِيْنَ فِى الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُجَاوَرَةِ ٠

সিয়াসাত তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঐ ইল্‌মের নাম যার মধ্যে শাসক-শাসিতের এবং রাজা-প্রজার ভিতর ইনসাফ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এবং আন্তর্জাতিক জাতি-গোষ্ঠীর ভিতর সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে ইনসাফ তথা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা, যার ফলে তাদের সামগ্রিক জীবনধারা পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত হয়।

কারো কারো মতে :

عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ يَصْلُحُ بِهَا الْحَيَاةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ الْاِنْسَانِيَّةُ ٠

'সিয়াসাত' (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ঐ ইল্‌মের নাম যার মাধ্যমে এমন কতিপয় নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় যারদ্বারা মানুষের সামষ্টিক জীবন সুন্দর, সুষ্ঠু ও পরিশীলিত হয়।[৩]

প্রকাশ থাকে যে, সিয়াসাত-এর প্রথম সংজ্ঞাটি ছাড়া বাকি সবকটি সংজ্ঞাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা। এতে রাষ্ট্রের বিষয়কেই প্রধান্য দেওয়া হয়েছে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কোন উল্লেখ বা নির্দেশনা নেই। এমনিভাবে আখিরাতের বিষয়টিও এতে অস্পষ্ট। কিন্তু সিয়াসাতের প্রথম সংজ্ঞাটি অধিকতর ব্যাপক। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, আভিধানিক অর্থে 'সিয়াসাত' দুই প্রকার : (১) সিয়াসাততে ফারদী অর্থাৎ ব্যক্তিগত সিয়াসাত, (২) সিয়াসাতে ইজতিমায়ী অর্থাৎ সামষ্টিক সিয়াসাত। বস্তুত ব্যক্তি গঠনের পরই রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। ব্যক্তি যদি নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম না হয় তবে তার পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনাও সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাসিলের পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন-কানুন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ হতে হবে। ইমাম রাগিব (র) বলেন :

لاَ يَصْلُحُ لِسِيَاسَةِ غَيْرِهِ مَنْ لاَ يَصْلُحُ لِسِيَاسَةِ نَفْسِهِ ٠

যে ব্যক্তি নিজের সংশোধন ও তত্ত্বাবধান করতেও সক্ষম নয়, সে অন্যের তত্ত্বাবধান করতেও সক্ষম হবে না।

তিনি আরো বলেন :

اِنَّكُمْ لاَ تَصْلَحُوْنَ لِلسِّيَادَةِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الْفِقْهِ وَالسِّيَاسَةِ الْعَامَّةِ ـ

তোমরা ফিক্‌হ্ সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করা এবং আন্তর্জাতিক সিয়াসাত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া পর্যন্ত নেতৃত্ব দিতে সক্ষম বলে বিবেচিত হবে না।[৪]

আল্লামা আবুল বাকা হানাফী (র)-এর মতে, আভিধানিক অর্থে সিয়াসাত তিন প্রকার : ১. সিয়াসাতে মা'আশী (জীবিকা সম্পর্কিত সিয়াসাত) ; ২. সিয়াসাতে বদনী (শরীরের সিয়াসাত) ও ৩. সিয়াসাতে ইজতিমায়ী (সামষ্টিক সিয়াসাত)।

তিনি বলেন, সিয়াসাতে ইজতিমায়ী (সামষ্টিক রাজনীতি)-কেই 'সিয়াসাতে খিলাফত' বলা হয়।[৫]

নিম্নোক্ত হাদীসের মধ্যেও 'সিয়াসাত' শব্দটি এই আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

كَانَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ ـ

তোমাদের পূর্বে বানী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের সিয়াসাত (তত্ত্বাবধান) করতেন। তাদের কোন নবী ইন্‌তিকাল করলে অপর নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নবী আসবেন না। এখন হতে কেবল খলীফা হতে থাকবে।[৬]

উক্ত হাদীসে تَسُوْسُهُمْ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সিয়াসাত-রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির সমার্থবোধক শব্দ নয়; বরং এটি একটি ব্যাপক শব্দ। এর মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে আরম্ভ করে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত সব কিছুই শামিল আছে। অনুরূপভাবে এতে মানুষের ইহ ও পরকালের বিষয়সমূহও আছে। তবে 'সামষ্টিক সিয়াসাত' রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেকটা কাছাকাছি শব্দ। এ পর্যায়ে 'খিলাফাত' এবং 'ইমামাত' শব্দ দু'টোও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামী সিয়াসাতের বিশেষ লক্ষ্য হল 'খিলাফাত' ব্যবস্থা কায়েম করে দেশে শান্তি-শৃংখলা ও ন্যায়ের শাসন কায়েম করা এবং অন্যায়, অবিচার, যুলুম ও শোষণ উৎখাত করা। ইমাম রাগিব ইসপাহানী (র) বলেন :

اِنَّمَا الْخِلاَفَةُ تَسْتَحِقُّ بِالسِّيَاسَةِ ـ

সিয়াসাতের মাধ্যমেই খিলাফাতী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।[৭]

এই হিসাবে খিলাফাত ও ইমামাত-এর সংজ্ঞা নিম্নে তুলে ধরা হল :

আল্লামা আবুল মা'আলী (র) 'মুসামারা' গ্রন্থে খিলাফাত-এর সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক বলেন :

اَلْخِلاَفَةُ هِىَ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا خِلاَفَةُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি হিসাবে দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে ব্যাপক নেতৃত্ব দান এবং সঠিক পথে পরিচালনা করাকে ইসলামের পরিভাষায় 'খিলাফাত' বলা হয়।[৮]

আল্লামা ইব্‌ন খালদূন (র) বলেন :

وَهِيَ النِّيَابَةُ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِيْ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ۔

দীনের হিফাযাত ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধিত্ব করাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'খিলাফাত' বলা হয়।[৯]

খিলাফাতের উদ্দেশ্য হল, দেশের জনসাধারণকে কল্যাণ, কামিয়াবী ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র পথে পরিচালিত করা এবং দেশে ইসলামী সিয়াসাত তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।[১০]

اَلْاِمَامَةُ مَوْضُوْعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِيْ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ۔

দীনের হিফাযাত ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নুবূওয়াতী কাজের প্রতিনিধিত্ব করাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'ইমামাত' বলে।

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, 'খিলাফাত' ও 'ইমামাত' একই জিনিস। খিলাফাত এবং ইমামাতের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে 'খলীফা বা ইমাম' বলা হয়। খলীফাকে 'আমীরুল মু'মিনীন'ও বলা হয়ে থাকে।

ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) বলেন, "খুলাফায়ে রাশিদীন-এর হুকুমাত-রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত।" অর্থাৎ এই নীতিতেই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

কুরআন মাজীদের নির্দেশাবলীর বাস্তবরূপ হচ্ছে নবী কারীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা। 'খিলাফাত আলা মিনহাজিন নুবূওয়াত' তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রদর্শিত নীতির আলোকে পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যাপারে সাহাবীগণের কেউই কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন নি।

এতে একদিকে যেমনিভাবে এই ব্যবস্থার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি প্রতীয়মান হয়, এর পাশাপাশি রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশিদীনের এ নীতিমালা বৈধতার বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ইজ্‌মা—ঐকমত্যও প্রতীয়মান হয়। সারকথা হচ্ছে, ইসলামী হুকুমাত বা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা হল, 'খিলাফাত আলা মিনহাজিন নুবূওয়াহ'।

প্রণিধানযোগ্য যে, আমাদের দেশে ইসলামের নামে যে রাজনীতি চলছে, তা প্রকৃত রাজনীতি ও সিয়াসাত নয়; বরং এ হচ্ছে রাজনীতি ও সিয়াসাতের ভূমিকা। ইসলামের দৃষ্টিতে একে 'আমর বিল-মারূফ ও নাহী আনিল-মুনকার' অথবা تَحْرِيْكُ السِّيَاسَةِ বলা যায়। কেননা প্রচলিত রাজনীতিতে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং রাষ্ট্রের পলিসি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় না; বরং সরকারের বর্তমান বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। কাজেই একে রাজনীতি বা সিয়াসাত নাম না দিয়ে 'সিয়াসাতের ভূমিকা' বা تَحْرِيْكُ السِّيَاسَةِ বলাই সমীচীন।

ইসলামে রাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব

ইসলামের বহু শাখা-প্রশাখার মধ্যে রাষ্ট্রনীতিও এর অন্যতম শাখা। তাওরাতেও এ সম্পর্কে বিধি-বিধান রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۔

আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো, নবীগণ যারা আল্লাহ্র অনুগত ছিল তারা ইয়াহূদীদেরকে সে অনুসারে বিধান দিত; আরো বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করবে না। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۔

আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক; কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۔

ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা ফাসিক। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৭)

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۔

আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে আপনি তাদের বিচার

নিষ্পত্তি করবেন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৮)

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ٠

তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর ? (সূরা মায়িদা, ৫ : ৫০)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আত, হযরত ঈসা (আ)-এর শরী'আত এবং আমাদের শেষনবী সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর শরী'আতের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত তিনটি শরী'আতেরই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এই যে, রাষ্ট্রনীতিসহ সকল বিষয়ে আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধানমতে ফায়সালা করতে হবে। অতএব রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোন ফায়সালা দেওয়ার পূর্বে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান অনুসন্ধান করা শাসকের জন্য অপরিহার্য। কেননা এগুলো জানা ব্যতিরেকে জনগণের মাঝে ন্যায়ের শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধানের অনুসরণ করেন না, তাদের কাফির, যালিম এবং ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও উলামায়ে কিরামের মতে এই কুফরী প্রকৃত কুফরীর সমপর্যায়ের নয় এবং এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইসলামের সীমানা থেকে খারিজ হয়ে যায় না; যদি তার আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি না থাকে।[১১]

ইমারাত, খিলাফাত ও রাজনীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন :

لَا اِسْلَامَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلاَّ بِالطَّاعَةِ ٠

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হবে না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হবে না ইমারাত ছাড়া, আর ইমারাত হবে না আনুগত্য ছাড়া।[১২]

অধিকন্তু কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ-এর গ্রন্থসমূহে এমন বহু বিষয়ের আদেশ করা হয়েছে যেগুলোর বাস্তবায়ন সিয়াসী নিযাম তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ব্যতীত সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যেমন যাকাত আদায় করা, চোরের হাত কাটা, হত্যা-সন্ত্রাস ও যিনার শাস্তির বিধান করা, নামায বর্জনকারী ব্যক্তিকে আটক করা বা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা; কোথাও সেনা অভিযান প্রেরণ করা এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। কাজেই সিয়াসাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্যতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

খিলাফাতের প্রকারভেদ

হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব (র) বলেন, খিলাফাত দুই প্রকার :

১. খিলাফাতুল্লাহ্ (خلافة الله) অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করা। নবী-রাসূলগণ সকলেই হলেন আল্লাহ্র খলীফা। আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম খলীফা হলেন হযরত আদম (আ)। হযরত আদম (আ) সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۔

আমি পৃথিবীতে খলীফা তথা প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। (সূরা বাকারা, ২ : ৩০)

এমনিভাবে অন্যান্য নবীগণও যে আল্লাহ্র খলীফা, এ কথা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত দাঊদ (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۔

হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করবে এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। (সূরা সাদ, ৩৮ : ২৬)

এ ধারার পরিসমাপ্তি হয় আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে। তিনি হলেন কিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ্র সর্বশেষ খলীফা ও সর্বশেষ রাসূল। তাঁর আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই আনুগত্য। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۔

যে রাসূলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা, ৪ : ৮০)

২. খিলাফাতের দ্বিতীয় প্রকার হল خلافة الانبياء অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের প্রতিনিধিত্ব করা। নিম্নের আয়াতে শেষোক্ত খিলাফাতের কথাই বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَّمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۔

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা তো সত্যত্যাগী। (সূরা নূর, ২৪ : ৫৫)

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র)-এর মতে 'খিলাফাতুল আম্বিয়া'-এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধিত্ব আবার দুই প্রকার : ১. খিলাফাতে যাহিরী, ২. খিলাফাতে বাতিনী। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদ, কিতাল, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দীনের নুসরত ও খিদমাত ইত্যাদি যেমনিভাবে খিলাফাতে যাহিরীর কাজ, অনুরূপভাবে দাওয়াত, তাবলীগ, তালীম, তারবিয়াত, ইরশাদ ও সুলূক ইত্যাদি হল খিলাফাতে বাতিনীর কাজ।[১৩]

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

এ্যারিস্টটল তাঁর 'রাজনীতি' গ্রন্থে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লিখেছেন, পরিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন :

প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সনের মতে, রাষ্ট্র হল কোন নির্দিষ্ট ভু-খণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত একটি জনসমষ্টি।

অধ্যাপক বার্জেসের সংজ্ঞা অনুযায়ী, যদি মানব জাতির কোন অংশকে সংঘবদ্ধভাবে দেখা যায়, তবে তাই রাষ্ট্র।

অধ্যাপক গার্নারের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি জনসমাজ যা সংখ্যায় অল্পাধিক-বিপুল; যা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করে, যা কোন বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন অথবা প্রায় স্বাধীন এবং যার এমন একটি সুগঠিত শাসনতন্ত্র আছে—যার প্রতি প্রায় সকলেই স্বভাবত আনুগত্য স্বীকার করে।[১৪]

অধ্যাপক গার্নারের এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের চারটি উপাদান বের হয়ে আসে : ১. জনসমষ্টি, ২. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ৩. সরকার, ৪. সার্বভৌমত্ব। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, যে কোন রাষ্ট্রের জন্য এই চারটি উপাদান অত্যাবশ্যক।[১৫]

পর্যালোচনা

ইসলাম রাষ্ট্রের উপরোক্ত উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তিনটিকে স্বীকার করে। কিন্তু সার্বভৌমত্বের বিষয়টি ইসলাম স্বীকার করে না। কেননা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকলের উপর স্থাপিত এক অপ্রতিহত ক্ষমতা। ইহা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রজা ও প্রত্যেক জনসংঘের উপর শাসন করার ও বশ্যতা আদায় করার সীমাহীন ক্ষমতা। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সেই বিশেষত্ব যার ফলে রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কিছু মেনে নিতে বা অপর কারো নিকট আইনত দায়ী হতে পারে না। এই ক্ষমতার কারণে অন্য কোন শক্তিই রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। সার্বভৌমত্ব থাকার কারণেই রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ সকল ব্যাপারে অগাধ কর্তৃত্ব করার অধিকারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এ কারণেই রাষ্ট্র বাইরের সকল শক্তির অধীনতা বা নিয়ন্ত্রণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে।[১৬]

পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে এই সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর উচ্চতর প্রভুত্ব, একচ্ছত্র মালিকানা এবং নিরংকুশ শাসন-ক্ষমতা সকল দিক থেকেই অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং অংশীদারহীন। সারা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্র একচ্ছত্র প্রভুত্বের অনুগত হয়ে আছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। (সূরা শূরা, ৪২ : ৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ ۔

তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১১১)

শাসন ক্ষমতা ও আইন রচনা এবং প্রভুত্বের নিরংকুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। কোন ব্যক্তি, মানুষ, পার্লামেন্ট বা কোন রাজশক্তি তাঁর অংশীদার হতে পারবে না।

ইরশাদ হয়েছে :

ان الحُكْمُ الاَّ لِلّٰهِ ·

হুকুম তো আল্লাহ্ তা'আলারই। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৭)

চূড়ান্ত হুকুম ও বিধানদাতা একমাত্র তিনিই। এক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বাধীন-সার্বভৌম সত্তার অধিকারী। ইরশাদ হয়েছে :

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ·

তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। (সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১৬)

তাঁর উপর কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। ইরশাদ হয়েছে :

لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ·

তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৩)

মোটকথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তা অখণ্ড, অবিভাজ্য, অংশীদারহীন এবং সর্বাত্মক। এটাই তাওহীদের মূলমন্ত্র। এ আকীদা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক।

রাষ্ট্র ও সরকার

রাষ্ট্র ও সরকার অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত সরকার একটি প্রশাসনিক সংস্থা যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত এবং বাস্তবায়িত করা হয়। সরকার, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সরকার রাষ্ট্র দেহের মস্তিষ্ক স্বরূপ। কিন্তু তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

১. রাষ্ট্র দেশের সমগ্র জনগণের সমন্বয়ে গঠিত হয়; কিন্তু সরকার কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় জনগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা। এই হিসাবে রাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা ব্যাপক।

২. রাষ্ট্র হল একটি রাজনৈতিক সংগঠিত সংস্থা; কিন্তু সরকার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত ও কার্যকর হয়।

৩. রাষ্ট্র বলতে সর্বদাই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে বুঝায়। সরকার গঠিত হয় বাস্তব ক্ষেত্রে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনে জনসমষ্টির প্রত্যেকেই অংশীদার। এই দিক দিয়েও রাষ্ট্রের অর্থ সরকার অপেক্ষা ব্যাপক।

৪. রাষ্ট্র একটি তত্ত্বগত ধারণা। বাস্তবভাবে রাষ্ট্র কোন কার্য সম্পাদন করে না। রাষ্ট্রের ইচ্ছা সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত ও কার্যকরী হয়ে থাকে। সরকারই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করে, যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে।

৫. আইনগতভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের কোন কিছু বলার অধিকার নেই। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল। এ জাতীয় কাজ নাগরিকদের জন্য চরম অপরাধ। কিন্তু

সরকার অন্যায় করলে নাগরিকদের পক্ষ থেকে ঐ দোষক্রটি ধরিয়ে দেওয়া বৈধ। এটা নাগরিকদের বৈধ অধিকার। এ জন্য তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না।[১৭]

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হচ্ছে। যেমন : গণতন্ত্র, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি।

ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতিমালা

ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু বুনিয়াদী নীতিমালা রয়েছে, যার অনুসরণ একান্ত আবশ্যক। কুরআন, সুন্নাহ্ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসৃত আদর্শের আলোকে কিছু মূলনীতি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তিক দীনি রাষ্ট্র। ইসলামী জীবন দর্শনই এই রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস। এটি শুধু জাগতিক কোন সংগঠন নয়; বরং রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. এ রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হলো, এ বিশ্ব আল্লাহ্র এবং সৃষ্টিও তাঁরই। কাজেই শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রবর্তনের অধিকারও তাঁরই। তাঁর শাসন ব্যবস্থা মেনে তাঁরই অনুগত হয়ে জীবন-যাপনের মধ্যেই মানুষের যথার্থ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা এবং বিধানদাতাও তিনিই। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔

আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব (সার্বভৌমত্ব) তাঁরই। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২)

বিধানদাতাও তিনিই। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ۔

হুকুম তো আল্লাহ্ তা'আলারই। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৭)

এ ক্ষেত্রে তার কোন শরীক নেই। ইরশাদ হয়েছে :

لاَ يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖ اَحَدًا ۔

এবং তিনি কাউকে নিজ হুকুমে শরীক করেন না। (সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ২৬)

আল্লাহ্র বিধানের বরখেলাফ করা জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّدُوْا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا ۔

আল্লাহ্ তা'আলা কিছু কিছু বিধান অপরিহার্য করে দিয়েছেন, তোমরা তা নষ্ট করো না; কিছু বিষয় হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তোমরা তা করো না এবং কিছু কিছু বিষয়ে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা লংঘন করো না।[১৮]

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে এমন কোন আইন ও বিধান প্রণয়ন ও রচনা করা যাবে না, যা কুরআন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামের পরিপন্থী।

৩. হুকুমাতের মূল মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তিনিই মানুষের প্রতি রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মানুষের উপর অর্পিত এই দায়িত্ব প্রতিনিধিত্ব মূলক দায়িত্ব। এটি

একটি পবিত্র আমানত। এ কারো উত্তরাধিকারী সম্পদ নয় এবং তা শক্তির মাধ্যমে হাসিল করার মতো বিষয়ও নয়।

৪. খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য পদ প্রার্থনা করা সমীচীন নয়। কেউ যদি তা প্রার্থনা করে তবে তাকে তা দেওয়া হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لاَ تَسْئَلُ الاَمَارَةَ فَانَّكَ انْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ الَيْهَا وَانْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا .

হে আবদুর রহমান! তুমি আমীর হওয়ার জন্য প্রার্থনা করো না। কেননা, যদি তা তোমাকে চাওয়ার পর প্রদান করা হয় তবে এর দায়-দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে। আর যদি না চাওয়া অবস্থায় তোমাকে তা প্রদান করা হয়, তবে এ বিষয়ে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।[১৯]

৫. মা'রূফ তথা ভাল কাজেই খলীফা বা সরকারের আনুগত্য অপরিহার্য। পাপাচারে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কারো নেই। এ মূলনীতির তাৎপর্য হলো, সরকার এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কেবল সেসব নির্দেশই তাদের অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের মেনে চলা ওয়াজিব, যা আইনানুগ। আইনের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার কারো নেই এবং তা মেনে চলা কারো জন্য অপরিহার্যও নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ مَرُوْ كَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ .

একজন মুসলমানের উপর তার আমীরের কথা শোনা এবং মেনে চলা অপরিহার্য। তা তার পসন্দ হোক বা না হোক; যতক্ষণ তাকে কোন পাপচারের নির্দেশ না দেওয়া হয়। পাপাচারের নির্দেশ দেওয়া হলে আর কোন আনুগত্য নেই।[২০]

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ .

আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কাজে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল মা'রূফ তথা ভাল কাজেই।[২১]

৬. ইস্লামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, তা শূরাভিত্তিক পরিচালিত হবে। অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রজ্ঞাবান তাঁদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিতে হবে। পরামর্শ করে কাজ করার প্রতি কুরআন ও হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ .

এবং কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯)

হযরত আলী মুরতাযা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম, আপনার পর যদি আমাদের সামনে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়; যে সম্পর্কে কুরআনে কোন

নির্দেশ নেই এবং আপনার থেকেও সে ব্যাপারে আমরা কিছু না শুনে থাকি; তখন আমরা কি করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

شَاوِرُوْا فِيْهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ وَلاَ تَقْضُوْا فِيْهِ بِرَاىٍ خَاصَّةٍ ·

এ ব্যাপারে দীনের প্রজ্ঞাসম্পন্ন ফকীহ্গণের সাথে এবং ইবাদতগুযার ব্যক্তিগণের সাথে পরামর্শ করবে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি-বিশেষের রায়ের উপর ফায়সালা করবে না।[২২]

৭. ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, সকল মানুষের প্রতি সুবিচার। অর্থাৎ ইসলামী আইন সকলের জন্য সমান। রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলের উপর তা সমভাবে প্রয়োগ করা অপরিহার্য। এতে কারো প্রতি কোন পক্ষপাতমূলক আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَأُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ·

এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৫)

অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার নীতি অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া উচিত নয়। সকল মানুষের সাথে সমান সম্পর্ক রাখতে হবে। অর্থাৎ আদ্ল ও সুবিচারের সম্পর্ক। যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য; যা গুনাহ্ তা সকলের জন্যই গুনাহ্; যা হারাম তা সবার জন্যই হারাম; যা হালাল তা সবার জন্যই হালাল; আর যা ফরয তা সকলের জন্যই ফরয।

আল্লাহ্র আইনের এ সর্বব্যাপী নির্দেশ সকলের জন্য প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখ্যূমী সম্প্রদায়ের জনৈক মহিলা চুরির অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তা কুরাইশ বংশের লোকদেরকে খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। সাহাবীগণ বললেন, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কে কথা বলতে পারবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রিয় পাত্র উসামা (রা) ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা ইব্ন যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এ বিষয়ে কথা বললে তিনি বললেন :

اَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ·

তুমি কি আল্লাহ্র দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করছো? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে খুত্বা প্রদান করলেন এবং বললেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحُدُوْدَ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا ·

হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। কেননা যখন তাদের কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিতো। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো তখন তারা তার উপর শরী'আতের শাস্তি প্রয়োগ করতো। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ (সা)-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সা) তার হাত কেটে দিতেন।[২৩]

৮. আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, যার ফলে উপরোক্ত বিভাগের কর্মকাণ্ডসমূহ বিঘ্নিত হয়।

৯. মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। কাজেই অন্ন. বস্ত্র. বাসস্থান এবং শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এ পর্যায়ে কারো প্রতি স্বজনপ্রীতি প্রদর্শন বা কাউকে অযৌক্তিক অগ্রাধিকার প্রদান এবং কাউকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ۔

মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۔

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَحْمَرَ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلٰى اَسْوَدَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى ۔

হে মানব জাতি! শোন, তোমাদের রব এক। অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের কোন মর্যাদা নেই। লালের উপর কালোর এবং কালোর উপর লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে তাকওয়ার ভিত্তিতে।[২৪]

১০. রাষ্ট্র পরিচালনা খলীফা এবং কর্মকর্তাদের জন্য একটি আমানত। এ আমানত যাদের সোপর্দ করা হবে তারা এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۔

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পণ করতে। যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা নিসা, ৪ : ৫৮)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

الاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ·

জেনে রেখো ! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল, আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং ইমাম বা শাসনকর্তা অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।[২৫]

১১. মানুষ জন্মগতভাবে আযাদ। তাদের এ আযাদী কোনভাবেই খর্ব করা যাবে না। মানুষের ব্যক্তিগত আযাদী, মত প্রকাশের আযাদী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের আযাদী ইত্যাদি বিষয়াদিতে নিশ্চয়তা প্রদান রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতিমালাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, ভৌগোলিক আযাদীও এক ধরনের আযাদী বটে, তবে এটাকে প্রকৃত আযাদী বলা যায় না। বস্তুত মানুষ তখনই প্রকৃত আযাদ বলে গণ্য হবে যদি ভৌগোলিক আযাদীর সাথে সাথে আদর্শিক আযাদীও তাদের হাসিল হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি মানুষের রচিত আইন-শাসনের অধীনে পরিচালিত হয়, তবে ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বে তারা পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন নয়। এ জন্যই কবি বলেছেন :

گرتو خواهی حری ودل زندگی - بندگی کن بندگی کن بندگی ·

তুমি যদি প্রকৃত আযাদী ও স্বাধীনতা চাও, তবে মানুষের গোলামী প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্র গোলামী মেনে নাও।

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে সকল মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের একনিষ্ঠ অনুগামী হবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। এ বিষয় সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ·

তারা এমন লোক যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪১)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুকুমাতের বুনিয়াদী লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. নামায কায়েম করা, ২. যাকাত প্রদান করা, ৩. সৎকাজ তথা ন্যায় ও কল্যাণকর কাজের আদেশ করা ও তা প্রতিষ্ঠা করা, ৪. অসৎকাজে তথা সকল অন্যায় ও পাপকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে নামায কায়েম করার কথা বলে শারীরিক যত ইবাদত আছে এসবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যাকাত প্রদানের কথা বলে সমস্ত আর্থিক

ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব হলো, রাষ্ট্রের সকল জনগণের জন্য শারীরিক ইবাদত আদায়ের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা, যাতে প্রত্যেক নাগরিক নির্বিঘ্নে তা আদায় করতে পারে। অগত্যা কেউ যদি তা পালন না করে তবে তার জন্য প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করা। এমনিভাবে আর্থিক ইবাদতের যত দিক রয়েছে, এগুলো যথাযথভাবে পালন ও কায়েমের সার্বিক ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। আয়াতে উল্লেখিত اَلْمَعْرُوْفُ এবং اَلْمُنْكَرُ শব্দ দু'টো ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সৎ ও কল্যাণজনক কাজের আদেশ দেওয়া এবং তা বাস্তবায়িত করা ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। অনুরূপভাবে সমস্ত পাপ ও অকল্যাণজনক কাজে বাধা দেওয়া এবং তার মূলোৎপাটন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ এবং কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।

ইসলাম ও গণতন্ত্র

বর্তমান বিশ্বে যে কয়টি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে গণতন্ত্র হচ্ছে অন্যতম। গণতন্ত্র ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

ইসলাম : দীনই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে দীন ইসলামকে গ্রহণের আহবান জানায় ইসলামী রাষ্ট্র বিশ্ববাসীকে। তবে ইসলাম অন্য ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে।

ইসলামী রাষ্ট্র খিলাফাত ও শূরা ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। জনসাধারণের অধিকার ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই বিশেষ অনুগ্রহ বা দান। সকল বিধি-বিধানের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এখানে ঐ জনমতই গ্রহণযোগ্য হবে, যা কুরআন-সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতদুভয়ের পরিপন্থী কোন মত ইসলামী রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিক্‌হ গ্রন্থে যে সব জিনিস বৈধ এবং যেসব জিনিস অবৈধ ঘোষিত হয়েছে তা-ই বৈধ বা অবৈধ হিসাবে গণ্য। কারো পক্ষে এর ব্যতিক্রম করার ইখতিয়ার নেই।

ইসলামী রাষ্ট্রে ইমাম বা খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান) শূরার ভিত্তিতে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে পরিচালনা করে থাকেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি প্রধান হবেন, তিনি হবেন সবচেয়ে বড় আইনবেত্তা ও প্রজ্ঞাবান আলিম। আল্লাহ্‌র হুকুমের অনুগত থেকে গণরায়কে সাথে নিয়ে তিনি আজীবন এ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন।[২৬]

গণতন্ত্র : গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মানুষ হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই নীতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় না।

গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। আইন রচনাকারী তারাই। মানুষের ঊর্ধ্বে এমন কোন উচ্চতর সত্তা এখানে স্বীকৃত নয়, যার বিধান পালন করতে মানুষ বাধ্য। গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের সামষ্টিক ইচ্ছা ও বাসনাই হয় আসল লক্ষ্য এবং তা পূর্ণ করার জন্যই রাষ্ট্র একান্তভাবে নিয়োজিত থাকে। এই সামগ্রিক ইচ্ছার উপর কোন বাধা-বন্ধন বা সীমা-নিয়ন্ত্রণ নেই। গণতন্ত্রের মূল থিওরি হচ্ছে, "গভর্নমেন্ট অব দি পিপল, বাই দি পিপল, ফর দি পিপল"—'মানুষের উপর মানুষের দ্বারা পরিচালিত মানুষের শাসন।'

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণেই যেহেতু সমস্ত ক্ষমতার উৎস, কাজেই ভাল-মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণ এমনকি বৈধ ও অবৈধ ইত্যাদি বিষয়াদি সাব্যস্ত করার অধিকার জনগণের।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের ব্যবস্থার অনুসরণে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেহেতু ভোটাধিক্যের বিষয়টিই হলো মূল, এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে। এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আর এ নীতিতে রাষ্ট্রপ্রধানের মেয়াদও থাকে নির্ধারিত। এ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে আর এ পদের অধিকারী থাকতে পারে না।[২৭]

ইসলাম ও কমিউনিজম

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ছাড়াও জড়বাদী যে মতবাদটি অনেককে আকৃষ্ট করেছিল, তা হচ্ছে কমিউনিজম। কমিউনিজম মূলত একটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ হলেও এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। মূলত এর অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই গড়ে উঠেছে এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। কমিউনিজমের মূলদর্শন এখানে আলোচ্য নয়। এখানে আমরা এর রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কেই তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস পাবো মাত্র।

ইসলাম : ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দীন আর রাষ্ট্র এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইসলামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আত্মা। আর বস্তু আত্মারই অনুগত। ইসলামী রাষ্ট্র দীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মই এর মূল চালিকাশক্তি।

ইসলামী রাষ্ট্র শূরাভিত্তিক পরিচালিত হয়ে থাকে এবং এটা ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি। ইসলামে সম্পদে ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকৃত। তবে এ মালিকানা নিরংকুশ মালিকানা নয়; বরং এ হচ্ছে আমানতী মালিকানা। এতে সম্পদ কুক্ষিগত করার অবাধ অধিকার নেই। বস্তুত ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানার মূলনীতি স্বীকার করা সত্ত্বেও এর সীমা নির্ধারণ করে দেয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থবন্টন ব্যবস্থায় কোন এক স্থানে ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত হতে এবং স্থবির হয়ে থাকতে পারে না; বরং সমাজের লোকদের মাঝে সর্বদাই তা আবর্তিত হতে থাকে।[২৮]

কমিউনিজম : কমিউনিজম হচ্ছে একটি দর্শন আর সমাজতন্ত্র হলো এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই দর্শনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজতন্ত্রে বস্তু এবং বস্তুতান্ত্রিকতাই হচ্ছে জীবনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ মতে আত্মার বিষয়টি উপেক্ষিত। রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজতান্ত্রিক দর্শনে ধর্মের বিষয়টি স্বীকৃত নয়। কমিউনিজম ব্যবস্থার রাষ্ট্রে শূরাভিত্তিক পরিচালনার বিষয়টি একেবারেই গৌণ।

কমিউনিজম ব্যবস্থায় সম্পদে ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকৃত নয়। তাদের মতে ধন-সম্পদ রাষ্ট্রের সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে তা দখল করে নিজের ইচ্ছামত তাতে হস্তক্ষেপ করা এবং ব্যক্তিগতভাবে তা থেকে মুনাফা হাসিল করার কারো কোন অধিকার থাকবে না।

তাদের মতে সম্পদে ব্যক্তিসত্তাই হচ্ছে সমস্ত অনিষ্টের মূল কারণ। পুঁজি ও উৎপাদনমাত্রই সম্মিলিত এবং সর্বজনীন সত্তা। যাবতীয় সম্পদ ও উৎপাদন রাষ্ট্রের নিকট গচ্ছিত আমানত মাত্র। এতে সকলের অধিকার ও অংশ সমান।

ইসলাম ও পুঁজিবাদ

বর্তমান বিশ্ব যে সব মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি মৌলিকভাবে একটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রেও এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। নিম্নে ইসলাম ও পুঁজিবাদের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

ইসলাম : ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দীন। আর রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি হচ্ছে এর শাখা-প্রশাখা মাত্র। কাজেই এগুলোর সবই আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ইসলাম বলে, সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা আছে সত্য, তবে তা নিরংকুশ ও লাগামহীন নয়; বরং সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আরোপিত বিধি-বিধান উপার্জনকারী ব্যক্তিকে মেনে চলতে হবে।

ইসলাম অর্থবন্টনের ক্ষেত্রে সম্পদ এককেন্দ্রীকরণের মূলোচ্ছেদ করতে চায়, যাতে সম্পদ এক বিশেষ শ্রেণীর কাছে পুঞ্জীভূত না হয়ে সমাজের প্রতিটি স্তরে আবর্তিত হয়। ইসলাম এ জন্য সাদাকা, যাকাত, উশর ইত্যাদির বিধান প্রবর্তন করে পুঁজিবাদের সমাধি রচনা করেছে এবং সমাজের জীবন যাত্রা ও অর্থনীতির মান উন্নয়নের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে।[২৯]

পুঁজিবাদ : পুঁজিবাদ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মাত্র। ধর্মের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বরং ধর্মের বিষয়টি এখানে উপেক্ষিত। পুঁজিবাদ স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-মালিকানার প্রবক্তা অর্থাৎ এ মতাদর্শীদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক। নিজের উপার্জিত সম্পদ ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে, জমা করতে পারবে এবং পারবে কুক্ষিগত করতে। এতে কারো প্রতিবাদ করার কোন অধিকার নেই এবং করলেও তা গৃহীত হবে না।

পুঁজিবাদী সমাজে গরীব শ্রেণী, ধনিক শ্রেণী কর্তৃক নিপীড়িত হতে থাকে। এ ছাড়া ধনী শ্রেণী দিন দিন ধনী হতে অধিকতর ধনী হয়ে উঠে। ফলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনি করে সমাজের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী যাদের সম্পদ নেই, তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের গুরুত্ব

আল্লামা তাফতাযানী (র) শরহে 'আকাইদে নাসাফী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা নির্বাচন করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা (ঐকমত্য) সংঘটিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, খলীফা নির্বাচন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। ইমাম ও খলীফার আনুগত্যবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার উপর হাদীসে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ٠

ইমামের প্রতি আনুগত্যবিহীন অবস্থায় যে মারা যায়, সে তো জাহিলিয়্যাতের উপর মারা গেল।[৩০]

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর দাফন-কাফনের পূর্বেই সাহাবীগণ খলীফা নির্বাচনের কাজটি প্রথমে সমাধা করেছেন। অনুরূপভাবে পরবর্তী খলীফাদের ইন্তিকালের পরও এ নীতিই অবলম্বন করা হয়েছে।

'শরহে আকাইদ' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মুসলমানদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হলো, এমন একজন ইমাম বা খলীফা নির্বাচন করা যিনি তাদের মধ্যে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করবেন, হুদূদ (দণ্ডবিধি) কায়েম করবেন, সীমান্ত হিফাযতের ব্যবস্থা করবেন; সেনা অভিযান প্রেরণ করবেন, রাষ্ট্রদ্রোহী, সন্ত্রাসী এবং চোর-ডাকাতদের দমন করবেন, জুমু'আ ও জামা'আতের নামাযের ব্যবস্থা করবেন, মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসা করবেন, গনীমাতের মাল বন্টন এবং ওলী বা অভিভাবক নেই এমন ছেলেমেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করবেন।[৩১]

খলীফা নির্বাচন করা যেহেতু ওয়াজিব, কাজেই এর জন্য চেষ্টা-সাধনা করা এবং পরিবেশ তৈরি করাও ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি এর জন্য চেষ্টা-সাধনা না করা হয়, তাহলে এ ওয়াজিব তরকের জন্য সকলকেই গুনাহগার হতে হবে।

খলীফার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

খলীফাই হলেন ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। কাজেই যে কোন ব্যক্তি এ পদের অধিকারী হতে পারবে না। খলীফা হওয়ার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী হওয়া আবশ্যক। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. মুসলমান হওয়া : কাফির ব্যক্তি মুসলমানদের খলীফা ও রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً ٠

এবং আল্লাহ্ কখনো মু'মিনদেনর উপর কাফিরদের কোন কর্তৃত্ব রাখবেন না। (সূরা নিসা, ৪ : ১৪১)

২. আযাদ হওয়া : ক্রীতদাস রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না। কেননা সে তো সর্বদা মনিবের হুকুম পালনে ব্যস্ত। তার পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। অধিকন্তু ক্রীতদাসকে লোকেরা হেয় নযরে দেখে। কাজেই তাদের হাতে শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করা আদৌ সমীচীন নয়।

৩. পুরুষ হওয়া : মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না।[৩২] পারস্যের লোকেরা কিস্রার কন্যাকে সম্রাজ্ঞী মনোনীত করার পর এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেছেন :

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً ٠

যে কওম কোন মহিলাকে তাদের কর্তৃত্ব প্রদান করেছে, তারা কখনো সফলকাম হবে না।[৩৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আজো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

৪. বালিগ হওয়া : কোন নাবালিগ ছেলে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না।

৫. জ্ঞানবান হওয়া : পাগল ব্যক্তি খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং পাগল ব্যক্তি তো নিজের কর্মকাণ্ডই দেখাশোনা করতে পারে না, অন্যের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে কেমন করে?

৬. খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই দীনি বিষয়ে বিজ্ঞ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে প্রজ্ঞাবান রাজনীতিজ্ঞ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হতে হবে।[৩৪]

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۔

আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করেছেন। তারা বললো, আমাদের উপর তার রাজত্ব কিরূপে হবে; যখন আমরা তার অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হক্‌দার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেওয়া হয়নি। নবী বললো, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাবান। (সূরা বাকারা, ২ : ২৪৭)

ইমাম রাগিব ইস্‌পাহানী (র) বলেন :

اِنَّكُمْ لَا تَصْلُحُوْنَ لِلسِّيَادَةِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الْفِقْهِ وَالسِّيَاسَةِ الْعَامَّةِ ۔

তোমরা ফিক্‌হ সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া পর্যন্ত নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে না।[৩৫]

৭. খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান এবং বীরত্বের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। যাতে ইসলামী বিধি-বিধান কার্যকরী করা, সীমান্ত সংরক্ষণ এবং যালিম থেকে মযলূমের প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।[৩৬]

ভীরু ও কাপুরুষ রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না। প্রতিপক্ষের হুমকি-ধমকিতে এবং শত্রুর গুরু-গর্জনে যার বক্ষ দুরু দুরু করে কাঁপে, সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটে, এহেন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করা যায় না। এতে শুধু রাষ্ট্রের উন্নতি ব্যাহত হবে তা-ই নয়; বরং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং মান-মর্যাদাও ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধরনের ব্যক্তি জাতীয় সংকটে বা বিপদে সংকট প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, বরং সংকটকে আরো ঘনীভূত করবে। কাজেই রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য সাহস এবং চিত্তবল একান্ত প্রয়োজন।

৮. খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই আল্লাহ্ ভীরু, নেক এবং চরিত্রবান হতে হবে। যার মধ্যে সততা, চরিত্রবল ও বিশ্বস্ততা নেই, সে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র) বলেন :

لاَ يَصْلُحُ لِخِلاَفَةِ اللهِ تَعَالىٰ الاَّ مَنْ كَانَ طَاهِرَ النَّفْسِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَاهِرَ النَّفْسِ لَمْ يَكُنْ طَاهِرَ الْقَوْلَ وَالْعَمَلِ ·

যার মধ্যে চারিত্রিক পরিশুদ্ধি নেই সে খলীফা হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা যার চারিত্রিক পরিশুদ্ধি নেই তার কথা এবং কাজও পরিশুদ্ধ হবে না।[৩৭]

উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য নিষ্পাপ হওয়া এবং দেশের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক নয়।[৩৮] অনুরূপভাবে কুরাইশ গোত্রীয় হওয়াও সর্বসম্মতিক্রমে আবশ্যক নয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) থেকেও অনুরূপ মতামতের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর অভিমতও তাই। কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী, আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া, শায়খ আবদুল কাহির বাগদাদী (র) প্রমুখ বিশ্বখ্যাত মুহাক্কিক আলিমগণও উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৩৯]

খলীফা নির্বাচনে ইসলামের বিধান

খলীফা নির্বাচনে জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অভিমত ও তাদের স্পষ্ট সমর্থন অপরিহার্য। যে সমস্ত পন্থা বা ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এ বিষয়ে জনমতের যথার্থ প্রকাশ ঘটে, ইসলামে সে সব পন্থা অবলম্বন করা জায়িয। বস্তুত খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ কোন পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়নি। তবে মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসব মূলনীতির অনুসরণ অত্যাবশ্যক। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো :

১. পদপ্রার্থী না হওয়া। কেউ যদি প্রার্থী হয়, তবে তাকে তা দেওয়া হবে না। অবশ্য কোন যোগ্য ব্যক্তি না থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি ন্যায়ের শাসন কায়েমের ব্যাপারে নিজের প্রতি আস্থাশীল হয়, তবে সে নিজেকে এ পদের জন্য পেশ করতে পারবে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর বক্তব্য প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ·

ইউসুফ বললো, আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৫৫)

বস্তুত হযরত ইউসুফ (আ) আসন্ন দুর্ভিক্ষে ন্যায়-নীতির মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করার জন্যই এই পদ চেয়েছিলেন।[৪০]

২. ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করা। আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা দলীয় কারণে কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন না করা। এরূপ করা খিয়ানাতের অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু এ জাতীয় কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের কর্ণধার নির্বাচিত হলে সে যত অন্যায় ও দুর্নীতি করবে, এর মধ্যে নির্বাচনকারীও তার গুনাহে শরীক হবে।

৩. أَصْحَابُ حَلٍّ وَعَقْدٍ তথা জনসাধারণের সামগ্রিক বিষয়ে যাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের কর্তৃক খলীফার নাম প্রস্তাবিত হওয়া। কেননা খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং প্রথমেই এ কাজের দায়িত্ব অবিবেচক ও অনুপযুক্ত লোকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া সমীচীন নয়।[৪১]

৪. সর্বসাধারণের অভিমত গ্রহণ।

৫. নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী কোন পন্থা অবলম্বন না করা।

উপরোক্ত নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য পর্যায়ক্রমে চারজন খলীফা নির্বাচন করা হয়েছে। আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা)। তাঁদের নির্বাচন বিভিন্ন পদ্ধতিতে হলেও প্রত্যেকের নির্বাচনে উক্ত মূলনীতির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। নিম্নে খলীফা চতুষ্টয়ের মনোনয়ন ও নির্বাচন পদ্ধতি তুলে ধরা হলো :

১. শূরা ও জনসমর্থনের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করা : অর্থাৎ প্রথমে রাষ্ট্রের উপদেষ্টা পরিষদের পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক খলীফার হাতে বায়'আত গ্রহণ। তারপর জনসাধারণের বায়'আত গ্রহণ। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ক্ষেত্রে এ নীতিই অনুসরণ করা হয়েছিল।

২. বর্তমান খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফার নাম ঘোষণা, তারপর শূরার অনুমোদন এবং এরপর জনগণের বায়'আত গ্রহণ : এ পদ্ধতিতেই হযরত উমর ফারূক (রা) দ্বিতীয় খলীফা মনোনীত হন।

৩. খলীফা কর্তৃক এমন কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে নির্বাচনী বোর্ড গঠন করা, যারা হবেন রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে পারদর্শী। তারপর তাদেরকে এ মর্মে হিদায়াত দেওয়া যেন তারা রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করে জনগণের মতামতের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন যোগ্যতম ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করে। হযরত উসমান গনী (রা) এ পদ্ধতিতেই খলীফা হয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে যে নির্বাচনী বোর্ড গঠন করেছিলেন এর সদস্য সংখ্যা ছিল সাত—১. হযরত উসমান, ২. হযরত আলী, ৩. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, ৪. হযরত তালহা, ৫. হযরত যুবায়র, ৬. হযরত সা'দ, ৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)। এ নির্বাচনী বোর্ডের আহবায়ক ছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)। এই বোর্ডের প্রতি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নির্দেশ ছিল যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এই বোর্ডের সদস্য থাকবে এবং পরামর্শ দিতে পারবে কিন্তু সে খলীফা হতে পারবে না এবং কেউ তার অনুকূলে প্রস্তাবও করতে পারবে না। যদি প্রস্তাবিত খলীফার পক্ষে-বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়ে, তবে আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের ভোটে এর সমাধান হবে। সদস্যগণ যদি এই ফলাফল মেনে নিতে দ্বিধা ও সংকোচবোধ করেন তবে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) যার পক্ষে রায় দিবেন তিনিই হবেন মনোনীত খলীফা। উক্ত বোর্ডকে সহযোগিতা করার জন্য হযরত উমর ফারূক (রা) মদীনাবাসী আরো পঞ্চাশজন সাহাবীকে মনোনীত করেন। হযরত উমর (রা)-এর ইনতিকালের পর তাঁর নির্দেশ অনুসারে উক্ত নির্বাচনী বোর্ড হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে এ বিষয়ে পরামর্শ বৈঠকে বসেন। প্রথমেই হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) খিলাফাতের দাবি হতে নিজের নাম প্রত্যাহার করেন। অবশিষ্ট সদস্যগণের কেউ কেউ হযরত উসমান (রা)-এর অনুকূলে, আবার কেউ হযরত আলী (রা)-এর অনুকূলে নিজ নিজ নাম প্রত্যাহার করে নেন। অবশেষে হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা) এই দুইজনের যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচন করার প্রশ্ন দেখা দিলে নির্বাচনী বোর্ড এ বিষয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-এর হাতে ন্যাস্ত করেন। তিনি তিন দিন পর্যন্ত

জনমত জরিপ করে শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা)-কে মুসলিম মিল্লাতের খলীফা ঘোষণা করেন।

৪. শূরার সিদ্ধান্ত ও জনগণের সমর্থনে খলীফা মনোনীত করা : চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) এই পদ্ধতিতেই খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন।[৪২]

যোগ্য ব্যক্তি যথানিয়মে খলীফা মনোনীত হওয়ার পর কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর অনুগত হওয়া ও নির্দেশ মেনে চলা জনগণের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

খলীফা একজন হওয়া আবশ্যক

মুসলিম রাষ্ট্র যতই বড় ও বিস্তৃত হোক না কেন, এতে একই সময়ে দুই খলীফার হাতে বায়'আত গ্রহণ করা জায়িয নেই। এটাই অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের অভিমত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْاٰخَرَ مِنْهُمَا ·

দুই খলীফার জন্য বায়'আত গ্রহণ করা হলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে দিবে।[৪৩]

কেননা, একজন খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর অপরজনের পক্ষ হতে খিলাফাতের বায়'আতের জন্য আহবান করা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। এইসব ফিত্‌নার দ্বার রুদ্ধ করার লক্ষ্যেই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হত্যা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকলে অপারগ অবস্থায় এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় নয়।[৪৪]

وَقَالَ اِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِىْ كِتَابِهِ الْاَرْشَادُ قَالَ اَصْحَابُنَا لاَ يَجُوْزُ عَقْدُهَا لِشَخْصَيْنِ قَالَ وَعِنْدِىْ اَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ عَقْدُهَا لاِثْنَيْنِ فِىْ صَقْعٍ وَاحِدٍ وَهٰذَا مَجْمَعٌ عَلَيْهِ قَالَ فَاِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَ الْاِمَامَيْنِ وَتَخَلَّلَتْ بَيْنَهُمَا شَسُوْعٌ فَلِلْاِحْتِمَالِ فِيْهِ مَجَالٌ قَالَ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْقَوَاطِعِ وَحُكْمِىَ الْمَازِرِىُّ هٰذَا الْقَوْلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَاَخِّرِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْاَصْلِ ·

ইমামুল হারামাইন তৎপ্রণীত কিতাব 'আল-ইরশাদ'-এ উল্লেখ করেছেন যে, উলামায়ে কিরামের মতে একই সময় দুই ব্যক্তির খলীফা হওয়া জায়িয নেই। দেশ ছোট হোক বা বড় হোক তাতে হুকুমের মধ্যে কোন ব্যবধান হবে না। আমার মতেও একই দেশে একই সময়ে দুই ব্যক্তির পক্ষ হতে বায়'আত গ্রহণ করা জায়িয নেই। এই বিষয়ে আলিমগণ সকলেই একমত। কিন্তু যদি খলীফার মাঝে বেশ দূরত্ব থাকে এবং দুইজন পৃথক দুই ভূ-খণ্ডের অধিবাসী হয়, তবে প্রত্যেক দেশে একজন করে খলীফা হওয়াতে কোন দোষ নেই। আল্লামা মাযরী (র)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪৫]

এ ক্ষেত্রে আরেকটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। তা হলো এই যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন আমীর হবে। তারপর এই পৃথক পৃথক রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রের রূপ দিয়ে এর জন্য কাউকে এই যুক্তরাষ্ট্রের খলীফা মনোনীত করা যেতে পারে। এতে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও ঠিক থাকবে এবং হাদীসের উপরও আমল হয়ে যাবে।

খলীফার ক্ষমতা ও দায়িত্ব

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সংক্ষেপে বলা যায় যে, খলীফার দায়িত্ব হলো, সর্বপ্রকার বিকৃতির হাত থেকে দীন ইসলামকে রক্ষা করা এবং এর অগ্রগতির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ সর্বসাধারণের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান ও অনুশাসন জারী করা, সর্বস্তরের মুসলমান যাতে নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত তথা আরকানে ইসলামের পাবন্দ হয়ে যায়, এর জন্য চেষ্টা করা, জনগণের মধ্যে আম্‌র বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের পরিবেশ কায়েম করা। দীনের তালিম, তারবিয়াত এবং ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা।

অনুরূপভাবে খলীফার দায়িত্ব হলো, দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করা, সমর অভিযান প্রেরণ করা, জনসাধারণের মধ্যে আইনের শাসন কায়েম করা, ইসলামের দণ্ডবিধি জারী করা, যাকাত-সাদাকা উসূল করা, অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার ইত্যাদি রক্ষা করা। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করা এবং রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড নিজে তত্ত্বাবধান করাও রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দয়িত্ব।[৪৬]

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা খলীফার দায়িত্ব। শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে প্রদেশ গঠন, গভর্নর নিয়োগ, আদালত প্রতিষ্ঠা, বিচারক নিয়োগ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা, সেনানিবাস তৈরি করা, প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও সংকট মুহূর্তে সৈন্য পরিচালনাও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব।

তাহযীব-তামাদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং যোগাযোগের সুবিধা এবং নাগরিক জীবনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণও খলীফার বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবন এ মহৎ উদ্দেশ্যসমূহের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্তেই ব্যয়িত হয়েছিল। তাঁর ওফাতের পর যেসব মনীষী খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরাও নিজেদের জীবন এসব কাজের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।[৪৭]

একাধিক হাদীসের মধ্যে ইমাম বা খলীফার দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ·

সাবধান ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) যিনি সর্বসাধারণের উপর শাসক হিসাবে নিয়োজিত, তিনিও দায়িত্বশীল, তিনিও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবেন।[৪৮]

ন্যায়পরায়ণ খলীফা আল্লাহ্ তা'আলার খুবই প্রিয় ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যালিম রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ্‌র নিকট খুবই ঘৃণিত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ وَاِنَّ اَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَشَدَّهُمْ عَذَابًا وَاَبْعَدَهُمْ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ ·

ন্যায়পরায়ণ খলীফা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হবেন। আর যালিম রাষ্ট্রপ্রধান কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ও সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। অধিকন্তু সে আল্লাহ্‌র দরবার থেকেও বহু দূরে অবস্থান করবে।[৪৯]

অপর এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, তখন সাত প্রকারের মানুষকে তিনি তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। তন্মধ্যে একপ্রকার হবে ন্যায়পরায়ণ ইমাম (বাদশাহ্)।"[৫০]

রাষ্ট্রপ্রধান সর্বদা জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকবেন। কারো প্রতি যুলুম বা খিয়ানাত করবেন না। যদি জনসাধারণের প্রতি যুলুম করেন, তবে জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের সুবাসও তার নসীব হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَا مِنْ وَالٍ يلى رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ الاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

মুসলিম প্রজাদের দায়িত্বশীল কোন প্রশাসক যদি তাদের প্রতি যুলুম করে এবং তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে খিয়ানাত করে মারা যায়, তাহলে আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন।[৫১]

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرُ عَبْدَ اللّٰهِ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةِ الاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রজাসাধারণের উপর শাসক বানিয়েছেন সে যদি তাদের পূর্ণভাবে কল্যাণ কামনা না করে তবে সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না।[৫২]

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন :

لَوْ هَلَكَ حَمَلٌ مِنْ وَلَدِ الضَّاْنِ ضَيَاعًا بِشَاطِئِ فُرَاتٍ خَشِيْتُ اَنْ يَسْئَلَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

যদি ফোরাতের তীরে একটি ছাগলের বাচ্চাও হারিয়ে যায় তবে আমার ভয় হয়, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।[৫৩]

মোটকথা হচ্ছে, খলীফা ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে সর্বাবস্থায় ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণ চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবেন।

ইসলামী হুকুমাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) গভীর রাতে এক অসহায় বিধবা বৃদ্ধা ও তার ক্ষুধাতুর শিশুদের জন্য খাদ্যের বোঝা নিজ পিঠে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গী হযরত আব্বাস (রা) বোঝাটি নিজ মাথায় নিতে চাইলেন; কিন্তু খলীফা তা দিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন :

لاَ وَاللّٰهِ اَنْتَ لاَ تَحْمَلُ جَرَائِمِىْ وَظُلْمِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ وَاَعْلَمْ يَا عَبَّاسُ اَنَّ حَمْلَ جِبَالِ الْحَدِيْدِ وَثِقْلِهَا خَيْرٌ مِنْ حَمْلِ ظُلْمَةٍ كَبُرَتْ اَوْ صَغُرَتْ .

না, আমি তোমাকে দিব না। আল্লাহ্‌র শপথ ! বিচারের দিন তুমি তো আমার অপরাধ ও যুলুমের বোঝা বহন করবে না। হে আব্বাস ! জেনে রেখ, ছোট হোক আর বড় হোক যুলুমের বোঝা বহন করা অপেক্ষা লৌহ পর্বত বহন করা অধিকতর সহজ।[৫৪]

তিনি নিজে খাদ্য বহন করে নিয়ে তাদেরকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ালেন। তারপর গভীর রাতে ফিরে যাওয়ার সময়ে পথিমধ্যে হযরত আব্বাস (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে

আব্বাস ! আমি যখন বৃদ্ধাকে দেখলাম ক্ষুধাতুর শিশুদেরকে খাদ্য প্রস্তুতির কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে তখন আমার মনে হলো যেন একটি পর্বত ভেঙ্গে আমার পিঠে পড়েছে। এখন মনে হচ্ছে, সেই পর্বত আমার উপর থেকে সরে গিয়েছে। বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামী হুকুমতের খলীফা ও কর্মকর্তাদের বিশেষ আদর্শ।

রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব খুবই বিস্তৃত ও ব্যাপক। কেউ যদি ঋণ রেখে বা অসহায় সন্তান রেখে মারা যায়, তবে এ ঋণ পরিশোধ করা এবং ঐ অসহায় সন্তানদের লালন-পালন করাও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِيْ فَاَنَا مَوْلاَهُ .

কেউ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করার মতো তার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে আমি নিজে তা পরিশোধ করে দিবো। আর সে সম্পদশালী হলে তার ওয়ারিসগণ সে ধন-সম্পদের মালিক হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : কেউ যদি ঋণ বা অসহায় সন্তানাদি রেখে মারা যায়, তাহলে তারা যেন আমার নিকট আসে। কেননা আমিই তাদের অভিভাবক।[৫৫]

এ জাতীয় আরো বহু হাদীস এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফার অধিকার কি, এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যক্তব্য হচ্ছে এই যে, খলীফা ইসলামের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। খলীফা নিজে ব্যক্তিগতভাবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে যতদিন পর্যন্ত ইসলামের বিধান অনুসারে পরিচালিত করতে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত জনগণকে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন :

مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ .

যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহ্র আনুগত্য করলো এবং যে আমাকে অমান্য করলো সে আল্লাহ্কেও অমান্য করলো। আর যে আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো এবং যে আমীরকে অমান্য করলো সে আমাকে অমান্য করলো।[৫৬]

এ পর্যায়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বক্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যা তিনি খলীফা মনোনীত হওয়ার পর প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর ঐ ভাষণে বলেছিলেন :

اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَاِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِيْ وَاِنْ اَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِيْ اَلصِّدْقُ اَمَانَةٌ وَالْكِذْبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيْفُ مِنْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِيْ حَتّٰى اُرِيْحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَالْقَوِيُّ فِيْكُمْ ضَعِيْفٌ عِنْدِيْ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ يَدَعُ الْقَوْمُ الْجِهَادَ

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ ضَرَبَهُمُ اللّٰهُ بِالذُّلِّ وَلاَ تَشِيْعُ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ اِلاَّ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِالْبَلاَءِ وَاَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِذَا عَصَيْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ ۔

হে লোক সকল ! আমাকে তোমাদের শাসক নির্বাচন করা হয়েছে; অথচ আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক নই (বিনয়ের প্রকাশার্থে তিনি এ কথাটি বলেছেন)। আমি যদি ভাল কাজ করি তবে আমার সাহায্য-সহায়তা করবে। আর যদি মন্দ পথে চলি, তবে আমাকে সোজা পথে চালাবে। সততাই আমানত। আর মিথ্যাই খিয়ানাত। তোমাদের মধ্যে দুর্বলতম ব্যক্তি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান, আমি তার নিকট তার হক্ পৌঁছিয়ে দিবই ইন্‌শাআল্লাহ্। আর তোমাদের শক্তিধর ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল। কাজেই আমি তার থেকেও হক আদায় করে ছাড়বো ইন্‌শাআল্লাহ্। যে জাতি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেয়, সে জাতির উপর আল্লাহ্ তা'আলা লাঞ্ছনা-অবমাননা চাপিয়ে দেন। যদি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাধারণ বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও আমার আনুগত্য করবে। আর যদি আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হই, তবে এ ক্ষেত্রে তোমাদের আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়।[৫৭]

খলীফার অধিকার সম্পর্কে হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন :

بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلٰى اُثْرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لاَ نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَعَلٰى اَنْ لاَ نُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ ۔

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত (শপথ) গ্রহণ করেছি যে, আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ, পসন্দ-অপসন্দ তথা সর্বাবস্থায় তাঁর কথা শুনবো ও আনুগত্য করবো। আনুগত্যের শপথের সময় আমরা আমাদের নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে কখনো বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার উপরও অঙ্গীকার করেছি। আর তখন আমরা এ মর্মেও অঙ্গীকার করেছি যে, যেখানেই থাকি সদা সত্য কথা বলবো, এ ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবো না। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, আমরা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে কোনরূপ বিবাদে লিপ্ত হবো না। অবশ্য তাদের থেকে সুস্পষ্ট কুফ্রী প্রকাশ পেলে এবং এ বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোন প্রমাণ থাকলে সে ক্ষেত্রে বিবাদে লিপ্ত হওয়াতে কোন দোষ নেই।[৫৮]

প্রখ্যাত হাদীসে ব্যাখ্যাকার আল্লামা তীবি (র) বলেন, খলীফা থেকে কোনরূপ কুফরী প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা জায়িয। বরং এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা এবং তার আনুগত্য না করা ওয়াজিব।[৫৯]

ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা একজন রাখাল সদৃশ্য। জনগণকে দেখাশুনা করার সার্বিক দায়িত্ব পালন করা খলীফার উপর বাধ্যতামূলক। এ দায়িত্ব পালনকালে ব্যক্তিগতভাবে আয়-উপার্জনে লিপ্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় বায়তুলমাল থেকে প্রয়োজন আনুপাতে ভাতা গ্রহণ করা খলীফার জন্য জায়িয। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও বায়তুলমাল থেকে ভাতা গ্রহণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ رضى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اسْتَخْلَفَ اَبُوْبَكْرٍ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِىْ اَنَّ حِرْفَتِىْ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ اَهْلِىْ وَشُغِلْتُ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَيَاْكُلُ اٰلُ اَبِىْ بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ .

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা মনোনীত হবার পর বললেন, আমার কাওমের লোকেরা অবশ্যই জ্ঞাত আছে যে, আমার ব্যবসা আমার পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতে অক্ষম নয়। তবে যেহেতু আমি এখন মুসলমানদের কাজকর্মে ব্যস্ত, তাই আবূ বকরের পরিবার এই মাল (বায়তুলমাল) থেকে খাবে। আর সে মুসলমানদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য তথা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে।[৬০]

হযরত উমর (রা)-ও মুসলিম সাম্রাজ্যের একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় বায়তুলমাল থেকে ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করতেন যতটুকু একজন সাধারণ মানুষ তার প্রয়োজন পূরণে গ্রহণ করতো।[৬১]

খলীফা মনোনীত হওয়ার পর হযরত উমর ফারূক (রা) এক ভাষণে বলেছেন :

اِنَّمَا اَنَا وَمَالَكُمْ كَوَلِيِّ الْيَتِيْمِ اِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ وَاِنِ افْتَقَرْتُ اَكَلْتُ بِالْمَعْرُوْفِ لَكُمْ عَلَىَّ اَيُّهَا النَّاسُ خِصَالٌ فَخُذُوْنِىْ بِهَا لَكُمْ عَلَىَّ اَنْ لاَّ اَجْتَبِىْ شَيْئًا مِنْ خَرَاجِكُمْ وَلاَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مِنْ وَجْهِهِ وَلَكُمْ عَلَىَّ اِذَا وَقَعَ فِىْ يَدَىْ اَنْ لاَّ يَخْرُجَ مِنِّىْ اِلاَّ فِىْ حَقِّهِ وَلَكُمْ عَلَىَّ اَنْ اَزِيْدَ فِىْ عَطِيَاتِكُمْ وَاَسُدَّ ثُغُوْرَكُمْ وَلَكُمْ اَنْ لاَّ اُلْقِيَكُمْ فِى الْمَهَالِكِ .

(হে লোক সকল !) তোমাদের ধন-সম্পদে আমার অধিকার ঠিক ততটুকুই, যতটুকু অধিকার ইয়াতীমের ধন-সম্পদে তার অভিভাবকের। যদি আমি মুখাপেক্ষীহীন হই তবে বায়তুলমাল থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না। আর যদি আমি অভাবী হই তবে প্রয়োজনমাফিক ইনসাফের ভিত্তিতে আমার খোরাক গ্রহণ করবো। হে লোক সকল ! আমার উপর তোমাদের কতিপয় অধিকার রয়েছে, যার জবাবদিহি তোমরা আমার নিকট থেকে অবশ্যই গ্রহণ করবে। ১. রাষ্ট্রের খাজনা ও ট্যাক্স বাবদ গৃহীত অর্থ এবং ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ)-এর মাল যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে জমা করি। অন্যায়ভাবে জমা না করি। ২. এসব সম্পদ যেন আমার হাতে অন্যায়ভাবে ব্যয় না হয়। ৩. তোমাদের মাসিক ও বাৎসরিক ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া। ৪. সীমান্ত সংরক্ষণ করা। ৫. আর তোমাদেরকে বিপদে নিক্ষেপ না করা।[৬২]

মোট কথা, ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা খলীফার হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে এ সব দায়িত্ব পালন করবেন।

উপরোক্ত আলোচনায় খলীফার দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকারের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এ নীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেই একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।

খলীফার অপসারণ

যে সকল অবস্থার কারণে খলীফাকে অপসারণ করা যায়, তা নিম্নরূপ :

এমন ফিস্ক, যা ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। যেমন খলীফা কর্তৃক স্পষ্ট কুফ্রী করা, কুফরী আইন-কানুন জারী করা, ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন-কানুন জারী না করা এবং শরী'আত বিরোধী কাজকে ইসলামের উপর প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি। এ জাতীয় কাজের কারণে খলীফাকে অপসারণ করা জায়িয। (তাকমিলায়ে ফাত্হুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮)

এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, সাতটি কারণে খলীফাকে অপসারণ করা যায় :

১. যদি স্বেচ্ছায় খলীফা ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান, তাহলে তিনি এ দায়িত্ব থেকে অপসারিত হতে পারেন।

২. খলীফা এমন অবস্থায় নিপতিত হওয়া যাতে তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়ে পড়েন। যেমন পাগল হওয়া, অন্ধ, বধির বা মূক হয়ে যাওয়া অথবা এমনভাবে কোথাও বন্দী হওয়া যে, এর থেকে তাঁর মুক্তির কোন আশা করা যায় না। খলীফা উপরোক্ত অবস্থাসমূহের কোন একটিতে পতিত হলে নিজে নিজেই তিনি এ দায়িত্ব থেকে অপসারিত হয়ে যাবেন।

৩. খলীফা কোন কুফ্রী কাজে লিপ্ত হওয়া। যেমন ইসলামী বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করা অথবা বিদ্বেষ পোষণ করা বা বিরোধিতা করা অথবা দীন ইসলামের প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা। উপরোক্ত কুফ্রী কাজের যে কোন একটি খলীফা থেকে প্রকাশিত হলে তিনি নিজে নিজেই এ পদ থেকে অপসারিত হয়ে যাবেন। অগত্যা যদি তিনি উক্ত পদে বহাল থাকার জন্য বল প্রয়োগ করেন, তবে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষমতা থাকলে তাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। উল্লেখ্য, খলীফা যে এ কুফ্রী কাজটি করেছেন, তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে এবং এটি যে কুফ্রী তাও অকাট্য দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

৪. খলীফা এমন ফিস্কের কাজে লিপ্ত হওয়া, যা তার ব্যক্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। খলীফা এ জাতীয় কাজে লিপ্ত হলে তিনি নিজে নিজে এ পদ থেকে অপসারিত হবেন না। তবে অপসারণের উপযুক্ত বলে পরিগণিত হবেন। এ ক্ষেত্রে মুসলিম জনসাধারণের জন্য অপরিহার্য হবে তাকে এ পদ থেকে অপসারণ করে দেওয়া। অবশ্য যদি এতে ফিতনা তথা অরাজকতা বা বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা থাকে, তাহলে এ পদক্ষেপ নেওয়া সঙ্গত হবে না।

৫. খলীফার এমন ফিস্কের কাজে জড়িত হওয়া যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের সম্পদের উপর পতিত হয়। যেমন, যুলুম করে মানুষের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা। এ ক্ষেত্রে

খলীফা আত্মপক্ষ সমর্থনেরও যদি কোন অবকাশ থাকে, তাহলে এ অবস্থায় তিনি অপসারিত হবেন না, বরং জনসাধারণের জন্য ওয়াজিব হবে এ অবস্থায়ও তার আনুগত্য করা।

৬. কোনভাবে জায়িয করার অবকাশ নেই, এ জাতীয় কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে জনগণের টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করা। খলীফা এ জাতীয় কাজ করলে মযলূম জনসাধারণের জন্য জায়িয হবে তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া। এমনকি প্রয়োজনে তার সাথে লড়াই করাও জায়িয হবে। অবশ্য এ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করাও জায়িয। বরং ধৈর্যধারণ করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। উল্লেখ যে, তাঁর বিরুদ্ধে এ লড়াই বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে নয়; বরং যুলুম ও শোষণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে।

৭. খলীফা এমন ফিস্‌কের কাজে জড়িত হওয়া যা দীন ইসলামের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন খলীফা কর্তৃক মানুষকে পাপকাজে বাধ্য করা। এ ক্ষেত্রে খলীফা যদি জনসাধারণকে কুফরী কাজের ব্যাপারে বাধ্য করে তা (حقيقى = প্রকৃত) কুফ্‌র হোক বা (حكمى = রূপক) কুফ্‌র হোক, সর্বাবস্থায়ই এই কুফ্‌রীর উপর স্পষ্ট কুফ্‌রীর হুকুম প্রয়োজ্য হবে। খলীফা যদি লোকদেরকে ইসলাম বিরোধী আইন-কানুনের প্রতি সমর্থন দানের জন্য বাধ্য করেন, তবে তা তো পরিষ্কার কুফ্‌রী কাজ। আর যদি খলীফা এ কথা ভাবেন যে, মানুষের আমল তো ইসলাম পরিপন্থী আইনের উপর, তাই ইসলামী অনুশাসনের অনুকূলে রায় না দিয়ে এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে ইসলাম পরিপন্থী আইনের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য জনগণকে বাধ্য করা। এ জাতীয় কাজ স্পষ্ট কুফ্‌রী না হলেও কুফ্‌রীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা হচ্ছে, এই অবস্থায় খলীফা নিজেই ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়ে যাবেন। যদি ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারে তিনি বল প্রয়োগ করেন, তবে শক্তি থাকলে মুসলিম জনসাধারণের জন্য ওয়াজিব হবে তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারিত করে দেওয়া। তবে এ ক্ষেত্রেও তার কুফ্‌রীর বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

মাজলিসে শূরা : গুরুত্ব ও গঠন প্রণালী

ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শূরার গুরুত্ব অনেক বেশি। শূরা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণ। বরং ইসলামী হুকুমাতের অপর নামই হচ্ছে শূরা।

শূরা অর্থ পরামর্শ। আর মাজলিসে শূরা অর্থ পরামর্শ সভা। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খলীফাকে পরামর্শ দেওয়ার নিমিত্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে একটি মাজলিসে শূরা গঠন করা অপরিহার্য। কুরআন মাজীদে মুসলমানদের গুণাবলী ও কার্য পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ـ

এবং তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। (সূরা শূরা, ৪২ : ৩৮)

অন্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

এবং কাজ-কর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করবে। তারপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯)

পরামর্শের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রহমত ও বরকত রেখেছেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উপর পরামর্শ গ্রহণ করা অপরিহার্য না হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন :

مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ مَشْوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেয়ে নিজ সঙ্গী-সাথীদের সাথে অধিক পরামর্শকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।[৬৩]

জ্ঞানী ও প্রবীণ সাহাবায়ে কিরামের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরামর্শ ছিল অত্যন্ত সুবিদিত। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহ এ ধরনের ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। তাবাকাতে ইব্ন সা'দ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর খিলাফাতকালে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও সংকট দেখা দিলে পরামর্শের জন্য জ্ঞানী-গুণী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও ফকীহ্ ব্যক্তিবর্গের বৈঠক আহবান করতেন। তাঁদের মধ্যে আনসার ও মুহাজির উভয় শ্রেণীর সাহাবীগণ থাকতেন। যেমন, হযরত উমর, উসমান, আলী, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, মু'আয ইব্ন জাবাল, উবায় ইব্ন কা'ব ও হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম। তাঁরা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফাতকালে ফাতওয়া দানের দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন।[৬৪]

'ফুতুহুল বুলদান' ও 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফাতকালে রাষ্ট্রের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সর্বাগ্রে মাজলিসে শূরায় পেশ করা হতো। তারপর মাজলিসে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এ সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ হতো। আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অথবা শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের প্রেক্ষিতে কিংবা অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যমানায় মাজলিসে শূরা ছাড়াও একটি 'মাজলিসে আম' বা সাধারণ সভাও ছিল, এতে মুহাজির ও আনসার সাহাবী ব্যতীত আরবের বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত থাকতেন। জাতীয় জীবনের সংকটময় সময়ে এ মাজলিস আহবান করা হতো। অন্যথায় দৈনন্দিন জীবনের কার্যাদি সমাধানের ক্ষেত্রে মাজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট ছিল।[৬৫]

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একনায়কত্বের কোন অবকাশ নেই। এ কারণেই হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন :

لاَ خِلاَفَةَ اِلاَّ عَنْ مَشْوَرَةٍ .

পরামর্শ ব্যতীত খিলাফাত ব্যবস্থা চলতে পারে না। যদি খলীফা কোন সময় পরামর্শ ছাড়া কাজ করেন অথবা এমন ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করেন, যারা পরামর্শের যোগ্য নয়, তবে তিনি অপসারণ যোগ্য হবেন।[৬৬]

মাজলিসে শূরা এবং মাজলিসে আম-এর সদস্য পদের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি হলো, ইসলামী শরী'আতের বুৎপত্তি এবং তাক্ওয়া। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও এ সমস্ত মাজলিসে উপস্থিত রাখা হতো।[৬৭]

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ফারূক (রা)-এর মাজলিসে শূরাতে ঐ সমস্ত লোককে শামিল করা হতো, যাঁরা কুরআন মাজীদের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতেন।[৬৮] হযরত উমর (রা) প্রশাসন ও বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের যাবতীয় চাকুরির ক্ষেত্রে এই

মূলনীতিকেই সামনে রাখতেন। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ সর্বপ্রকার যুলুম ও বাড়াবাড়ি খতম করে সমাজে ন্যায়ের শাসন কায়েম করার পাশাপাশি কুরআনী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করেছেন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। ফলে জনমনে এর প্রভাব এত বেশি হয়েছিল যে, লোকেরা দলে দলে সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে আরম্ভ করে।

সারকথা হচ্ছে, ইসলামী জ্ঞানে বুৎপত্তিসম্পন্ন তাক্‌ওয়ার গুণে গুণান্বিত লোকদেরকেই উপরোক্ত মাজলিসসমূহের সদস্য মনোনীত করা হবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۔

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

মাজলিসে শূরার সদস্যদের যোগ্যতার প্রতি নির্দেশ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলেছেন :

اِسْتَشِرْ فِىْ اَمْرِكَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اللّٰهَ ۔

তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে ঐ সব লোকের সাথে পরামর্শ করবে, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ করে।[৬৯]

পক্ষান্তরে ফাসিক, পাপী, আল্লাহ্‌র বিধান পালনে অনভ্যস্ত এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে শূরার সদস্য মনোনীত করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, খলীফা اَصْحَابِ حَل و عقد তথা রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে যাদের বুৎপত্তি আছে এবং যাঁরা ফিক্‌হশাস্ত্রে পণ্ডিত, বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, এ জাতীয় আল্লাহ্-ভীরু, মুত্তাকী লোকদের সমন্বয়ে মাজলিসে শূরা তথা উপদেষ্টা পরিষদ সহ আরো প্রয়োজনীয় পরিষদসমূহ গঠন করবেন এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিবেন।

শূরার উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য

পরামর্শ করে কাজ করার মধ্যে বহু কল্যাণ নিহিত আছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরামর্শ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদিও আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই, তথাপিও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছেন; এতে বহু রহমত ও বরকত রয়েছে। যারা পরামর্শ করে কাজ করবে, তারা কখনো উত্তম দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত থাকবে না। আর যারা পরামর্শ করে কাজ করবে না, তারা কখনো ভ্রান্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।[৭০]

হযরত কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার হুকুম প্রদানের মধ্যে রহস্য হচ্ছে এই যে, যাতে তাঁদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কর্মপদ্ধতির উপর তাঁরা খুশি থাকেন এবং এটা যেন পরবর্তী উম্মাতের জন্য আদর্শ হিসাবে বাকী থাকে।[৭১]

এ সম্পর্কে তাফসীরে 'রূহুল মা'আনী" ও তাফসীরে 'বাহরে মুহীত' গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, এতে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। যেমন, ১. الإستظهار برائهم। অর্থাৎ শূরার এ পরামর্শের দ্বারা সিদ্ধান্তটি আরও দৃঢ় হয়। ২. التطيب لأنفسهم। এতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শূরার

—৭১

সদস্যগণ মনের প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। ৩. الْإِذْهَابُ لِأَضْغَانِهِمْ। নেতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ বা ক্ষোভ বিদূরিত হয়। পক্ষান্তরে পরামর্শ না করে কাজ করলে নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ৪. উত্তম দিক-নির্দেশনার উপর কাজ করা সম্ভব হয়। ৫. আল্লাহ্র রহমত নসীব হয়। ৬. আলোচনার ফলে জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা সংশোধন করা যায়। সর্বোপরি পরামর্শ করে কাজ করলে লজ্জিত হওয়া থেকে এবং আত্মঅহংকারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচা যায়। এ কারণে বলা হয় যে مَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَمَنْ أُعْجِبَ بِرَايِهِ ضَلَّ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরামর্শ করে কাজ করে সে লজ্জিত হয় না, আর যে নিজের মতের ব্যাপারে আত্ম-অহংকারে লিপ্ত হলো সে পথভ্রষ্ট হয়।[৭২]

খলীফা তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর বৈধ আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সকলের জন্য অপরিহার্য। পরামর্শ সভায় সদস্যগণ মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন হলেও কার্যক্ষেত্রে খলীফার বৈধ নির্দেশ অমান্য করার কারো অধিকার নেই।[৭৩]

শূরার প্রত্যেক সদস্য হচ্ছে আমানতদার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ ۔

যার নিকট পরামর্শ কামনা করা হয়, সে হচ্ছে আমানতদার।[৭৪]

কাজেই প্রত্যেক সদস্যকে এ আমানতদারী যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ খিয়ানাত করা যাবে না।

শূরা ও রাষ্ট্রপ্রধান

যেসব বিষয় সম্পর্কে শরী'আতে স্পষ্ট কোন বিবরণ নেই, এ জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, সমর অভিযান প্রেরণের ব্যাপারে, রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও মন্ত্রী-মিনিস্টার নিয়োগের বিষয়ে এবং নগর উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে শূরার অধিবেশন ডেকে শূরার সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা খলীফার বিশেষ দায়িত্ব।[৭৫] শূরার অধিবেশনে সদস্যগণ আমানতদারীর সাথে যা কল্যাণকর মনে করেন সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করবেন। নিজের মতকে অবশ্য গ্রহণীয় মনে করা উচিত নয়। আমার মত গ্রহণ করার মধ্যেই কামিয়াবী এবং এর বাইরে না-কামিয়াবী ও ব্যর্থতা, এরূপ ধারণা করে মতপ্রকাশ করা বাড়াবাড়ি বৈ কি। শূরার অধিবেশনে আলোচনান্তে যা সিদ্ধান্ত হবে, খলীফা সে আলোকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন।

উল্লেখ্য যে, কোন বিষয়ে যদি খলীফা এবং শূরার সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়, তাহলে খলীফা শূরার রায় বাস্তবায়িত করবেন না নিজের রায়ের উপর আমল করবেন এ সম্বন্ধে জমহূর তথা অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হলো, এ ক্ষেত্রে খলীফা উপদেষ্টা পরিষদের মতামত বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবেন না; বরং তিনি তাদের মতামত শোনার পর যা ভাল মনে করবেন সে মুতাবিক রায় প্রদান করবেন। ভাল মনে করলে পরিষদের মতামতের অনুকূলে রায় দিতে পারবেন। আর ইচ্ছা করলে তাদের মতামতের বিপক্ষেও রায় দিতে পারবেন। এতে কোন বাধ্য-বাধ্যকতা নেই। হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। খুলাফায়ে রাশিদীনের কর্মধারা থেকেও এ কথাই প্রতীয়মান হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

এবং আপনি কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করবেন। তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯)

কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ

রাষ্ট্রের কর্মসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ইত্যাদিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এভাবে বিভক্ত করার পর রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্ম যাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় এর জন্য কর্মচারি নিয়োগ করাও আবশ্যক। কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের নিয়োগদানকালে তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মপরায়ণ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ইমাম আবূ ইউসুফ (রা) 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থের কয়েক স্থানে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

اَنْ يَكُوْنَ فَقِيْهًا عَالِمًا مُشَاوِرًا لِأَهْلِ الرَّاىِ عَفِيْفًا لاَ يُطْلِعُ النَّاسَ مِنْهُ عَلٰى عَوْرَةٍ وَلاَ يَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ .

শাসনকর্তা, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অবশ্যই ফকীহ্ (ধর্মীয় আইন-কানুন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ), আলিম, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শকারী হতে হবে এবং জনগণের নিকট যিনি সচ্চরিত্রবান বলে পরিচিত এবং যিনি আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগে নিন্দুকের নিন্দার কোন ভয় করেন না।

তিনি অন্যত্র বলেন, "যদি কোন গভর্নর বা কর্মকর্তা প্রজাদের সাথে যুলুম ও খিয়ানাত করে অথবা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করে অথবা দুশ্চরিত্রবান বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাকে দায়িত্বে বহাল রাখা যাবে না।"

উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত উমর ফারুক (রা) কর্মকর্তা বা কর্মচারি নিয়োগদানকালে তাদের মধ্যে ফিক্‌হ ও ইল্‌ম আছে কিনা তা ভালভাবে যাচাই করে দেখতেন।

একবার তিনি জনতার সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন :

اِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْ عُمَّالِىْ لِيَضْرِبُوْا اَبْشَارَكُمْ وَلاَ لِيَأْخُذُوْا اَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فَعَلَ بِهٖ ذٰلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ اِلَىَّ اَقُصُّهُ مِنْهُ .

আমি আমার কর্মকর্তাদের এ জন্য প্রেরণ করিনি যে, তারা তোমাদের লোকদেরকে প্রহার করবে কিংবা তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। যদি কেউ এরূপ করে তবে যার সাথে এভাবে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে সে যেন এ বিষয়ে আমার নিকট নালিশ দেয়, আমি তার থেকে বদলা গ্রহণ করবো।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ১. শাসনকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগকালে তাদের মধ্যে ইল্‌ম-ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞান এবং তাক্‌ওয়ার বিষয়টি ভালভাবে যাচাই করে দেখতে হবে। ২. শাসনকর্তা ও তদীয় কর্মচারিদের প্রতিটি আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও তদারকি করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর অপরিহার্য। ৩. যদি কোন গভর্নর কিংবা শাসনকর্তা যালিম অথবা খিয়ানাতকারী সাব্যস্ত হয়, তবে তাকে বিলম্ব না করে পদচ্যুত করা আবশ্যক। কর্মকর্তা নিয়োগদানের ক্ষেত্রে অপর একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক। আর তা হলো, কোন অযোগ্য লোককে কারো সুপারিশে অথবা আত্মীয়তার কারণে অথবা উৎকোচ গ্রহণ করে প্রশাসনিক কোন দায়িত্বে যেন নিয়োগ না করা হয়। মুসনাদে

আহ্‌মদ গ্রন্থে উল্লিখিত এক হাদীসে আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

فَانَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُحَابَةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً حَتّٰى يَدْخُلَهُ جَهَنَّمَ ·

কোন ব্যক্তিকে যদি মুসলমানদের শাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়, তারপর সে যদি কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে শুধু অনুরাগবশে কর্মচারি হিসাবে নিয়োগ করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হয়। তার কোন দান এবং সৎকাজ আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।[৭৬]

কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং এর প্রতিকার

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য বায়তুলমাল থেকে ভাতা গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। এরদ্বারা তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْهُ زَوْجَةً فَانْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ خَادِمًا فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَانْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا وَفِيْ رِوَايَةِ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَالِكَ فَهُوَ غَالٍ ·

যে ব্যক্তি আমাদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োজিত হবে সে বিয়ে করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বায়তুলমাল থেকে লাভ করবে। খাদিম তথা চাকর-বাকর না থাকলে বায়তুলমালের পয়সা দিয়ে খাদিম রাখবে। বাড়ি-ঘর না থাকলে বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা করবে। অন্য বর্ণনামতে এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে সে হবে খিয়ানাতকারী।[৭৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন :

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ ·

আমি কাউকে রাষ্ট্রের কোন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ করলে অবশ্যই তার জীবিকার ব্যবস্থা করবো। এর থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হবে খিয়ানাত।[৭৮]

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ অবাধ উপার্জন এবং বিলাসী জীবন-যাপন থেকে বিরত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে তাবারী ও কিতাবুল খারাজ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে, হযরত উমর (রা) প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারি থেকে এ মর্মে ওয়াদা নিতেন যে, তারা তুর্কী ঘোড়ায় সাওয়ার হবে না, পাতলা কাপড় ব্যবহার করবে না, মিহি-আটার রুটি খাবে না, দরজায় কখনো দারোয়ান নিযুক্ত করবে না; বরং অভাব-অভিযোগকারী লোকদের জন্য তা সর্বদা খোলা রাখবে।[৭৯]

'ফুতুহুল বুলদান' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উমর (রা) যখন কোন কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন তখন তিনি তার ধন-সম্পদের তালিকা তৈরি করতেন এবং তা সংরক্ষণ করতেন। কোন কর্মকর্তার আর্থিক অবস্থার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা বায়তুলমালে জমা করে নিতেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তাঁর সময়ে একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করা হয়েছিল।

মূলকথা হচ্ছে, যদি রাষ্ট্রের কোন শাসনকর্তা, গভর্নর, কর্মকর্তা বা কর্মচারি যালিম কিংবা খিয়ানাতকারী প্রমাণিত হয়, তাহলে সাথে সাথেই তাকে পদচ্যুত করা আবশ্যক এবং তাকে এরপরও ঐ পদে বহাল রাখা হারাম।[৮০]

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

নাগরিক শব্দের অর্থ নগর বা শহরের অধিবাসী। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় নাগরিক বলতে কোন দেশ বা রাষ্ট্রের এমন সব লোককে বুঝায় যারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় কর্মতৎপরতায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। বস্তুত যেসব নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে, তারা দুই প্রকার : ১. মুসলিম নাগরিক, ২. অমুসলিম নাগরিক। ইসলামের পরিভাষায় অমুসলিম নাগরিককে যিম্মী বলা হয়। নিম্নে মুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো :

মৌলিকভাবে রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকদের যে অধিকার রয়েছে, এর মধ্যে ১. ধর্মীয় অধিকার সহ ব্যক্তিগত অধিকার, ২. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং ৩. রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়গুলো হচ্ছে অন্যতম।

১. ব্যক্তিগত অধিকার : নাগরিকদের জীবন, ধন-সম্পদ এবং ইয্যত-আবরু সম্পর্কিত অধিকারসমূহ ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে গণ্য। এই সকল অধিকার ছাড়া নাগরিকদের পক্ষে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

বাঁচার অধিকার : মানুষের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন জীবনের নিরাপত্তা লাভ। ইসলামের রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধান এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ـ

আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৩)

অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুসারে কাউকে হত্যা করার প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্ত মানুষের জীবনের নিরাপত্তা তার নাগরিক অধিকার। জীবন বলতে শুধু বেঁচে থাকা বুঝায় না, মানুষের ইয্যত-আবরুর নিরাপত্তাও এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কোন নাগরিকের পক্ষে অপর কোন নাগরিকের জীবন, প্রাণ ও ইয্যত-আবরুর উপর হস্তক্ষেপ করা নিতান্তই অমানবিক অপরাধ।

ধর্মীয় নিরাপত্তা : ধর্মীয় নিরাপত্তা নাগরিক জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয়। অর্থাৎ মুসলিম জনসাধারণ যাতে নিজের ধর্ম রক্ষা করে দেশে বসবাস করতে পারে, সে পরিবেশ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম জনসাধারণের ঈমান-আকীদার উপর আঘাত করে রাষ্ট্রের কোন আইন-কানুন প্রণয়ন করা যাবে না এবং এমন কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করা যাবে না যার ফলে ইসলামী বিধি-বিধান উপেক্ষিত হয় এবং আমলের পরিবেশ বিনষ্ট হয়। এরূপ করা হলে নাগরিক অধিকার লংঘিত হবে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা : ইসলাম নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই অধিকার যাতে নাগরিকগণ যথাযথভাবে পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য।

মালিকানার অধিকার : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতে আরেকটি মৌলিক অধিকার হচ্ছে সম্পদে আমানতদারীর ভিত্তিতে মালিকানার অধিকারী হওয়া। প্রত্যেক নাগরিকেরই বৈধ উপায়ে উপার্জন করার এবং উপার্জিত সম্পত্তি নিজের সংরক্ষণে রাখার অধিকার রয়েছে। আর এ সম্পত্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়মে ভোগ করার অধিকারও তাদের রয়েছে। অন্য কোন নাগরিক কারো এই অধিকারে বৈধ কারণ ছাড়া কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

সাম্যের অধিকার : এই পর্যায়ে আইনগত সাম্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত নাগরিক ছোট-বড়, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, শাসক ও শাসিত এক কথায় আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সকলেই আইনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। কেউই এর উর্ধ্বে নয়। অনুরূপভাবে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও সকল নাগরিকের অধিকার সমান। ইসলামী সমাজে অভিজাত এবং নীচু জাতের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। বরং সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই।

মত প্রকাশের অধিকার : প্রতিটি নাগরিকই স্বীয় চিন্তা ও বিশ্বাস অনুসারে ইসলামী বিধানের অধীনে থেকে নিজের মত প্রকাশ করার অধিকার পাবে। মৌখিক এবং লিখিতভাবে তা প্রকাশ ও প্রচার করতে পারবে। এতে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী কিছু করা যাবে না।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের অধিকার : প্রত্যেক নাগরিক বিবাহ করার অধিকার লাভ করবে। এ ব্যাপারে অনৈসলামিক কোন আইন-কানুন তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

শিক্ষার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকই মৌলিক শিক্ষালাভের অধিকারী। 'সবার জন্যই শিক্ষা', এ কথা ইসলামই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ .

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইল্‌ম তলব করা ফরয।[৮১] ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করার পর জাগতিক বিদ্যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে শিক্ষা করাতেও কোন বাধা নেই। কাজেই প্রত্যেক নাগরিক যেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে রাষ্ট্রীয়ভাবে এর ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

২. অর্থনৈতিক অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায় ও উপাদান হতে উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষ থেকে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যুলুম। জায়িয উপার্জনের অবাধ অধিকারের সাথে সাথে উপার্জনের যে কোন উপায় এবং পেশা গ্রহণেরও অধিকার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে তারতম্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করা অনুচিত। চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নাগরিকগণ সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকারী। ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরির ক্ষেত্রে কেউ অনৈসলামিক উপায় অবলম্বন করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রত্যেক নাগরিকেরই খাওয়া-পরা, থাকা, শিক্ষা ও চিকিৎসালাভের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কেউ নিজে জীবিকা সংগ্রহে অক্ষম হলে রাষ্ট্র তার জীবিকার ব্যবস্থা করবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বিশদ বিবরণ রয়েছে।

৩. রাজনৈতিক অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দেশের নাগরিকদের জন্য রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। এ অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। খলীফা নির্বাচনে তাদের

মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক। মুসলিম জনগণের মত না নিয়ে রাষ্ট্রীয় পদ দখল করা কারো জন্য বৈধ নয়। উপরোক্ত অধিকারের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সমান। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের নাগরিকদের উপর যুলুম করলে এর প্রতিবাদ করাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ۔

যালিম শাসকের সামনে হক কথা বলাই হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ।[৮২]

প্রথমে নাগরিক অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। বস্তুত নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হলো, আনুগত্য ও রাষ্ট্রীয় আইন মান্য করা, রাজস্ব আদায় করা এবং জনসেবা ইত্যাদি।

১. আনুগত্য : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলা। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতেই আনুগত্য করতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের।

২. রাজস্ব আদায় করা : রাষ্ট্রের যাবতীয় পাওনা আদায় করা এবং রাজস্ব ও অন্যান্য দেয় সঠিক সময়ে সরকারি তহবিলে জমা করাও নাগরিকদের কর্তব্য। এই ব্যাপারে সরকার যাতে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্র অচল হয়ে যাবে।

৩. জনসেবা : ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জনসেবার প্রতিও তীক্ষ্ণ নযর রাখবে। এটাও নাগরিকদের বিশেষ কর্তব্য। এ কারণেই ইসলামে এ বিষয়ের প্রতি লোকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে অত্যন্ত জোরালোভাবে। অসহায়, ইয়াতীম, বিধবা, দুঃস্থ, বিপদগ্রস্ত ও অনাহারক্লিষ্ট লোকদের প্রতি দানের হাত সম্প্রসারিত করার জন্য কুরআন ও হাদীসে তাকীদ করা হয়েছে।[৮৩]

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জান-মাল হিফাযাতের অধিকার এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নাগরিক অধিকার ইসলামে স্বীকৃত।

অমুসলিমদের অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাদের জীবন রক্ষার অধিকার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ۔

যদি কোন ব্যক্তি কোন মু'আহিদ (যিম্মী)-কে হত্যা করে তবে জান্নাতের ঘ্রাণও তার নসীব হবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরতে থেকেও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।[৮৪]

এমনকি যিম্মীদের প্রতি যুলুম করা থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوْ اِنْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسِهِ فَاَنَا حُجَيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔

সাবধান ! কেউ যদি কোন মু'আহিদের প্রতি যুলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতা বহির্ভূত কোন কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার থেকে কোন মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামাতের দিন আমি তার (মযলূমের) পক্ষ অবলম্বন করবো।[৮৫]

যিম্মী হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন যিম্মীকে হত্যা করে তবে বিনিময়ে তাকেও হত্যা করা হবে।[৮৬]

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম নাগরিকের প্রাণের মর্যাদা একজন মুসলিমের সমান। এ কারণেই একজন অমুসলিম নাগরিকের রক্তপণ একজন মুসলিম নাগরিকের রক্তপণের সমান ধার্য করা হয়েছে।[৮৭]

নবী কারীম (সা)-এর জীবদ্দশায় আমর ইবন উমায়্যা নামক এক ব্যক্তি 'আমির' গোত্রীয় দুইজন মু'আহিদকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দিয়াত (রক্তপণ) মুসলমানদের সমান প্রদান করতে আদেশ দেন।[৮৮]

ইসলামে অমুসলিম যিম্মীদের সম্পদের অধিকার স্বীকৃত। এ কারণেই যিম্মীদের সম্পদ আত্মসাতকারীর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

ইসলাম মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম যিম্মীদেরকে তাদের ধর্ম ও কৃষ্টি-কালচার রক্ষার ব্যাপারেও পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে। ইসলামের স্বর্ণ যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে সকল বিজিত দেশে অমুসলিম লোকদেরকে বসবাসের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, সে সকল দেশে তাদের ধর্মপালন এবং কৃষ্টি রক্ষার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। আবূ উবায়দ (র) 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে পরাজিত কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখ করে বলেন, এ সকল দেশের অধিবাসীগণ মুসলমানদের নিকট পরাজিত হয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। অথচ এ সকল দেশের অমুসলিম অধিবাসীদেরকে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ববৎ বহাল রাখা হয়েছে।[৮৯]

মুসলিম রাষ্ট্রে যিম্মীদের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা জায়িয নেই।[৯০]

অমুসলিম ব্যক্তির সামাজিক ও নাগরিক অধিকারও ইসলামী রাষ্ট্রে স্বীকৃত। ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব অমুসলিম অধিবাসী জীবিকা উপার্জনে অক্ষম তাদেরকে ভাতাদানের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফাতকালে সেনাপতি খালিদ (রা) হিরার অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, তাতে ছিল :

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম হয়ে যাবে অথবা অন্য কোন কারণে বিপদগ্রস্ত হবে অথবা দরিদ্র হয়ে যাবে, তাদের জিয্য়া মওকূফ করে দেওয়া হবে। অধিকন্তু বায়তুলমাল হতে তাদেরকে এবং তাদের পরিবারবর্গকে ভাতা প্রদান করা হবে।'[৯১]

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদা এক বৃদ্ধ ইয়াহূদীকে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে বায়তুলমালের খাজাঞ্চির নিকট পাঠিয়ে আদেশ দিলেন, তাকে এবং তার মত অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য বায়তুলমাল থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দাও। যৌবনে তাদের থেকে জিয্য়া উসূল করে বার্ধক্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেওয়া ন্যায়বিচার নয়।[৯২]

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের চাকুরি লাভ করারও অধিকার রয়েছে। খুলাফায়ে রাশিদীনের যমানায় এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা)-এর সময়কালে মিসরের একটি নদীর নকশা একজন অমুসলিম প্রকৌশলীই তৈরি করেছিল।

এমনিভাবে কূফার শাসনকর্তা সা'দ রুযবান নামক একজন অমুসলিম কারিগর দ্বারা কূফার বায়তুলমাল পুনর্নির্মাণ করান এবং তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে খলীফা হযরত উমর (রা)-এর নিকট তাকে প্রেরণ করেন। হযরত উমর ফারূক (রা) বায়তুলমাল হতে তার জন্য আজীবন ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[৯৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দায়িত্বে সাহাবায়ে কিরামকে নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত উমর, আলী, আবূ উবায়দা (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। আইন ও বিচার বিভাগে হযরত উমর, অর্থ বিভাগে হযরত আবূ উবায়দা এবং যোগাযোগ বিভাগে হযরত আলী, তথ্য বিভাগে হযরত উসমান এবং সাধারণ বিভাগে হযরত যায়দ ইবন্ সাবিত (রা) দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।[৯৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে সুবিচার

জনগণের মধ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে বিশেষ তাকীদ রয়েছে রয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۔

তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! (সূরা নিসা, ৪ : ৫৮) অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ۔

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারের নির্দেশ দেন। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯০)

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র) বলেন, 'আদল' অর্থ বিচারের ক্ষেত্রে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে সমান সমান করা। অর্থাৎ 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' এই নীতিতে বিচারকার্য সম্পাদন করা। শায়খ আবুল বাকা (র)-এর মতে 'আদ্ল' শব্দটি যুলুমের বিপরীত। এর অর্থ হলো, যার যা প্রাপ্য যথাযথভাবে তাকে তা দেওয়া।[৯৫] কুরআন মজীদে আরো ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۔

হে মু'মিনগণ ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্র সাক্ষী স্বরূপ যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক, আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হবে না।। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কেটে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১৩৫)

ন্যায়বিচারের প্রতিদান এবং অন্যায় বিচারের মন্দ পরিণাম প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ ٠

বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জান্নাতী হবে। আর দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামী হবে। জান্নাতী বিচারক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে হক্ (সত্য) জেনে সে মুতাবিক ফায়সালা করেছে। যে ব্যক্তি হক্ জানা সত্ত্বেও আদেশদানের ক্ষেত্রে অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে হবে জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞ অবস্থায় বিচারকার্য সম্পাদন করে সেও জাহান্নামী হবে।[৯৬]

তিনি আরো ইরশাদ করেন : বিচারক অন্যায় না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যখন সে যুলুম করে, তখন আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন না এবং শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়।[৯৭]

মূলকথা হচ্ছে, ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, শাসক-শাসিত এবং আপন-পরের মধ্যে কোন পার্থক্য ও তারতম্য নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحُدُوْدَ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا ٠

হে মানবমন্ডলী ! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। এজন্য যে, তাদের কোন সম্মানিত লোক চুরি করলে তখন তারা তাকে রেহাই দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো তখন তারা তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতো। আল্লাহ্র কসম ! মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে, তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সা) তার হাত কেটে দিবেন।[৯৮]

আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। কেউ এর থেকে উর্ধ্বে নয়। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফাতকালে আপন পুত্র আবূ শাহ্মাকে মদ্যপানের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলে দণ্ড প্রদান করেন।[৯৯]

বিচারক নিয়োগ এবং বিচারের নীতিমালা

আইন-কানুন যতই নিখুঁত হোক না কেন, উপযুক্ত বিচারকের উপরই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। বস্তুত বিচার ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামানের কাযী (বিচারক) নিয়োগ করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন :

بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُرْسِلُنِىْ وَاَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِىْ بِالْقَضَاءِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِىْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ اِذَا تَقَاضَا اِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا

تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ أَحْرٰى أَنْ يَّتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَعْدُ ۔

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ইয়ামানের কাযী (বিচারক) নিযুক্ত করে পাঠানোর প্রাক্কালে আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন! অথচ আমার বয়স অল্প। বিচার সম্পর্কে আমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই তোমার অন্তরে হিদায়াতের নূর পয়দা করে দিবেন এবং তোমার যবানকে (এ বিষয়ে) সুদৃঢ় করে দিবেন। যখন তোমার সামনে বাদী-বিবাদী উপস্থিত হয়ে বিচার প্রার্থনা করবে, তখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষের মতামত না শুনে প্রথম পক্ষের অনুকূলে রায় ঘোষণা করবে না। কেননা দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য তোমাকে মামলার প্রকৃতি উপলব্ধিতে ও সঠিক রায়দানে সাহায্য করবে। হযরত আলী (রা) বলেন, এরপর থেকে কখনো আমি বিচার নিষ্পত্তির ব্যাপারে দ্বিধা-সংশয়ে পতিত হইনি।[১০০]

বিচারক নিয়োগের অধিকার খলীফার জন্য সংরক্ষিত। কাযী নিয়োগের ক্ষেত্রে তার দীনদারী, তাক্‌ওয়া ও যোগ্যতা যাচাই করে দেখা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ تَوَلّٰى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَهُمْ مَنْ هُوَ أَوْلٰى بِذَالِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

যদি কোন ব্যক্তির উপর মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্ব ও শাসনভার অর্পণ করা হয় আর উক্ত ব্যক্তি যদি কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে যার থেকে যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী মানুষ তাদের সমাজে আছে বলে তার জানা থাকে, তবে সে ব্যক্তি আল্লাহ্, রাসূল ও মুসলিম সমাজের (স্বার্থের) সাথে খিয়ানাত করলো।[১০১]

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা যাতে রক্ষিত হয় এবং বিচার যেন সহজলভ্য হয় ও ন্যায়বিচারের সুফল যাতে জনগণের নিকট পৌঁছে এর জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং বাস্তবায়িত করা আবশ্যক :

১. বিচারকের নিকট পৌঁছতে কোন রকমের প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে। কেননা ইসলাম গরীব, অসহায় ও মযলূম মানুষের জন্য আদালতের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কাজেই মোকদ্দমা রুজূকারীর নিকট থেকে অতিরিক্ত কোন ফী ইত্যাদি আদায় করা উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخُلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخُلَّتِهِ وَفَقْرِهِ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে যদি মুসলমানদের কোন বিষয়ে শাসন ও দায়িত্বভার অর্পণ করেন, তারপর সে ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত ও অসহায় লোকদের তার নিকট পৌঁছার ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করে রাখে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে রাখবেন।[১০২]

২. বাদী-বিবাদী উভয়ের ছোট-বড় প্রত্যেক বিষয়ে সমান ব্যবহার করা। বিশ্বখ্যাত 'শামী' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে :

وَيَقْضِيْ فِي الْمَسْجِدِ اَوْ فِيْ دَارِهِ وَيَأْذَنُ عُمُوْمًا وَيَرُدُّ هَدِيَّةً وَدَعْوَةً خَاصَّةً وَيُسَاوِيْ وُجُوْهَا بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ جُلُوْسًا وَاِقْبَالاً وَاِشَارَةً وَنَظَرًا وَيَمْتَنِعُ عَنْ مَسَارَةِ اَحَدِهِمَا وَالْاِشَارَةِ اِلَيْهِ وَرَفْعِ صَوْتِهِ عَلَيْهِ وَالضَّحْكِ فِيْ وَجْهِهِ وَكَذَا الْقِيَامِ لَهُ وَلاَ يَمْزَحُ فِيْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا وَلاَ يُلَقِّنُهُ حُجَّتَهُ وَلاَ يُلَقِّنِ الشَّاهِدَ شَهَادَتَهُ وَلاَ يُكَلِّمُ اَحَدَ الْخَصْمَيْنِ بِلِسَانٍ لاَ يَعْرِفُهُ الْاٰخِرُ ·

ক. কাযী (বিচারক) মসজিদে বা বাড়িতে এমন কোন স্থানে বসে বিচার করবেন যেখানে প্রবেশ করার ব্যাপারে সকলের জন্য অনুমতি রয়েছে। খ. তিনি কারো হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করবেন না। গ. কারো বিশেষ দাওয়াতে অংশগ্রহণ করবেন না। ঘ. বাদী-বিবাদীদেরকে বসানো, তাদের প্রতি মনোযোগ দান, ইশারা কিংবা সংকেতদান অথবা দৃষ্টিদানের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের প্রতি সমতা বজায় রাখবেন। ঙ. কোন এক পক্ষের সাথে গোপন আলাপ, উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলা, মুখোমুখি হাসা, তাদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো এ জাতীয় কোন আচরণ করবেন না। চ. বিচার মঞ্চে বসে ঠাট্টা-মশকরা করবেন না। ছ. সাক্ষী কেমন করে সাক্ষ্য বাক্য উচ্চারণ করবে তা শিখাবেন না। জ. কোন পক্ষ এমন কথা বলবে না অপর পক্ষ যা বুঝতে সক্ষম নয়।

৩. ক. বাদী ব্যক্তি প্রমাণ পেশ করবে।

খ. যদি সে প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহলে বিবাদীর নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ ·

প্রমাণ পেশ করা বাদীর উপর কর্তব্য। আর অস্বীকারকারী (বিবাদী)-এর উপর শপথ করা বাধ্যতামূলক।[১০৩]

গ. শরী'আত বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত বাদী-বিবাদী সর্বাবস্থায় সন্ধি করতে পারে। ঘ. বিচারক তার বিবেচনামতে ফায়সালা প্রদানের পর এ ব্যাপারে পুনঃ বিবেচনা করার ইখ্‌তিয়ার তার রয়েছে। ঙ. মোকদ্দমা পেশ করার একটি নির্দিষ্ট দিন থাকা বাঞ্ছনীয়। চ. ভিনদেশী বা দূরদেশী লোকদের শুনানি আগে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে মোকদ্দমায় এক পক্ষ গরীব ও এক পক্ষ ধনী হলে আচরণের ক্ষেত্রে গরীবের প্রতি সহায়তার নযর প্রদান করা আবশ্যক। ছ. মুসলমানমাত্রই সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত। তবে যদি কোন ব্যক্তি সাজাপ্রাপ্ত হয় কিংবা কখনো মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তবে এ জাতীয় ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারবে না।

৪. বিচারকের জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া বা খিটখিটে মেজাজের হওয়া অনুচিত।[১০৪] এ অবস্থায় বিচারকার্য সম্পাদন করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন :

لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ ·

কোন হাকিম (বিচারক) ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে ফায়সালা করবে না।[১০৫]

৫. আদালত কক্ষে এমন কোন কথাবার্তা না হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে কোন পক্ষের প্রতি জোর-জবরদস্তি প্রমাণিত হয়।

৬. মহিলা ও পুরুষের সাক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রবণ করা বাঞ্ছনীয়।

৭. কোন বিষয় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত রায় ঘোষণা না করা। প্রয়োজনে সময় বৃদ্ধি করে নেওয়া উত্তম। কোন মোকদ্দমার ব্যাপারে রায় দিতে হাকিম অপারগ হলে তা উচ্চ আদালতে স্থানান্তরিত করা উচিত।

৮. বিচারের আসনে বসে উপদেষ্টাদের থেকে মতামত গ্রহণ না করা বাঞ্ছনীয়। মতামত নেওয়া আবশ্যক হলে তা ভিন্নভাবে নেওয়া উচিত।

৯. বিচারক রায় শুনানির সময় বলবে, আমি এই আদালতের বিচারক হিসাবে এই রায় ঘোষণা করছি। ঘোষণা মার্জিত ভাষায় হওয়া উত্তম। যাতে বাদী-বিবাদী আতংকিত না হয়ে পড়ে।

১০. বিচারকের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে, সর্বকাজে আল্লাহ্র হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তবেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।[১০৬]

১১. অনেক সময় সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ভুলের আওতা হতে রেহাই পাওয়া যায় না। কাজেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করবে; যেন তিনি বিবাদ-মীমাংসায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে রায় দেওয়ার তাওফীক দেন।

সাক্ষ্যের নীতিমালা

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার জন্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ একান্ত আবশ্যক। অভিযোগ সম্বন্ধে সত্যের উদ্ঘাটন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামে নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের বিধান রাখা হয়েছে। এক ইয়াহূদী ব্যক্তি চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর লৌহবর্ম চুরি করেছিল। খলীফা তার নিকট তা ফেরত চাইলেন কিন্তু সে তা ফিরিয়ে দিতে রাযী হল না। তখন তিনি একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় আদালতে হাযির হয়ে বিচারপ্রার্থী হলেন। বিচারক খলীফার শুধুমাত্র দাবির উপর ভিত্তি করে রায় না দিয়ে তাকেও সাক্ষী পেশ করার জন্য বললেন। তিনি পুত্র হাসান এবং স্বীয় ক্রীতদাসকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করলেন। হযরত আলী (রা)-এর মত ব্যক্তির দাবি আর হযরত হাসান (রা)-এর মত জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষী প্রদান সত্ত্বেও এতে যেহেতু ইসলামের নিরপেক্ষ বিচারনীতি অনুসারে পিতার অনুকূলে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, তাই বিচারক ইয়াহূদীর পক্ষে রায় প্রদান করেন। নিরপেক্ষ বিচারের এমন দৃষ্টান্ত দেখে ইয়াহূদী মুগ্ধ হয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হলেন এবং 'বর্মটি হযরত আলী (রা)-এর'— এ কথা স্বীকার করে তিনি তাঁকে তা ফেরত দিয়ে দিলেন।[১০৭]

সাক্ষ্যের উপরই যেহেতু নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বিচার অনেকটা নির্ভরশীল, এ কারণে শরী'আতে সাক্ষ্য-প্রমাণের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার অনুসরণ একান্ত আবশ্যক।

১. সাক্ষীর জন্য ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। কেননা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতিরেকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ ব্যাপার। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ ۔

এবং তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। (সূরা তালাক, ৬৫ : ২)

সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। স্নেহ-ভালবাসা এবং ভয়-ভীতি অনেক সময় মানুষকে প্রভাবিত করে। তাই পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং মনিব ও গোলামের সাক্ষ্য পরস্পর গ্রহণযোগ্য নয়।

২. কোন সাক্ষীর ব্যাপারে যদি জানা যায় যে, সে মিথ্যাবাদী, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না; বরং সে শাস্তিযোগ্য হবে। শাস্তির প্রকৃতি ও সময়সীমা রাষ্ট্রের ইখতিয়ারে থাকবে। স্থান-কাল ও পাত্রভেদে তা নিরূপণ করা হবে। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফাতকালে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদের মুখ কালিমাময় করা হতো এবং তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হতো। আল্লামা জামালউদ্দীন যায়লাঈ (র) 'নাসবুর রায়া' গ্রন্থে মুসান্নাফে ইব্ন আবূ শায়বা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে :

انَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ الِى عُمَّالِه بِالشَّامِ فِىْ شَاهِدِ الزُّوْرِ يَضْرِبُ اَرْبَعِيْنَ سُوْطًا وَيَسْخَمُ وَجْهَهُ وَيَحْلِقُ رَأسَهُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ ۔

হযরত উমর (রা) সিরিয়ায় নিযুক্ত গভর্নরের নিকট এ মর্মে পত্র লিখলেন, যেন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে চল্লিশটি বেত লাগানো হয়, তার চেহারা কালিমাময় করা হয়, তার মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হয়।[১০৮]

৩. সাক্ষ্য প্রদানে কোনরূপ গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ না করা এবং সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত না থাকা। কেননা সাক্ষ্য দেওয়া ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَانَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ ۔

এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৩)

৪. সব অপরাধ এক ধরনের নয়; বরং এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে সাক্ষীদের সংখ্যার ক্ষেত্রেও ব্যবধান রাখা হয়েছে। ব্যভিচার সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য অপরিহার্য। হত্যা ও অন্যান্য হদের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্য অবশ্যক। আর অন্যান্য অধিকার তা মাল সংকান্ত হোক বা বিবাহ-তালাক ইত্যাদি সম্পর্কিত হোক, এসবের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট।[১০৯] যেমনিভাবে সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি হয়, অনুরূপভাবে বিবাদীর স্বীকৃতি এবং শপথের মাধ্যমেও বিবাদ মীমাংসা করা হয়ে থাকে।

সমাজে বিভিন্ন রকমের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। সে হিসাবে মামলা-মোকদ্দমার ধরনও ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত হুকুম ফিক্‌হ-এর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। [দ্রষ্টব্য হিদায়া, শামী, আলমগীরী ইত্যাদি]

বর্তমানে কোন রাষ্ট্রে যদি উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে আদালত গঠন করা হয় এবং ইসলামের বিধানমতে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে যুলুম, অবিচার ও ফিত্‌না-ফাসাদ ঐ দেশ থেকে তিরোহিত হবে এবং আল্লাহ্‌র রহমতে সেখানে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

দেশ ও দেশের অধিবাসীদেরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, সীমান্ত হিফাযাত করা এবং অমুসলিম আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমর অভিযান প্রেরণ করা ইত্যাদি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পাদনে দাওয়াত ও জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। দাওয়াত ও জিহাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য একদিকে যেমন একদল মুবাল্লিগ আবশ্যক, অপরদিকে সামরিক শক্তি অর্জন করাও অপরিহার্য। সামরিক শক্তি অর্জন করা ছাড়া মুসলমানদের জান-মাল, ইয্যত-আবরু, ঈমান-আমল এমনকি দেশ রক্ষা করাও সম্ভব নয়। সামরিক শক্তি অর্জন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার নির্দেশ দিয়ে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ·

তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এরদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন। (সূরা আনফাল, ৮ : ৬০)

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা মুসলমানদের উপর সর্বপ্রকার অস্ত্রশক্তি এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে ফরয করে দেওয়া হয়েছে। যেন ইসলামের দুশমন সম্প্রদায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কুরআন মাজীদে اَعِدُّوْا শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে যুগে যে ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন যে যুগে সে ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা অবশ্যক।

অনুরূপভাবে مِنْ قُوَّةٍ শব্দের মধ্যে এ কথার প্রতি ইশারা রয়েছে যে, মুসলিম বাহিনীকে সময়োপযেগী অত্যাধুনিক সমরশক্তিতে বলীয়ান করতে হবে।[১১০]

দীনী দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত

'দাওয়াত' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ ডাকা বা আহবান করা। ইসলামে দীনহারা মানুষকে দীনের দিকে আসার আহবান জানানোকে দাওয়াত বলা হয়।

বস্তুত আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান করাই ছিল নবী-রাসূলগণের প্রধানতম দায়িত্ব। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে কুরআন মাজীদে দাঈ (দাওয়াতদাতা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ·

আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে (আমি আপনাকে পেরণ করেছি)। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৬)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ·

(হে নবী!) আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিক্‌মাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়। আপনার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ১২৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে বাধা দিবে। আর তারাই হল সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৪)

আরো ইরশাদ করেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজে বাধা দান কর এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১০)

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকার পরিণাম যে কত কঠিন সে প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফ্‌রী করেছিল তারা দাঊদ ও মারইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এ কারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৭৮-৭৯)

পবিত্র হাদীসেও দাওয়াতী কাজ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ .

তোমাদের কেউ যদি গর্হিত কাজ হতে দেখে তবে সে তা হাত তথা শক্তি দিয়ে পরিবর্তন করবে। যদি না পারে তবে মুখ দিয়ে বলে তা পরিবর্তন করবে। যদি তাও না পারে তবে অন্তর দিয়ে তা অপসন্দ করবে। আর এটা হল দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।[১১১]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : যদি কওমের কোন ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং কওমের লোকেরা তাকে বারণ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বারণ না করে, তবে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আযাবে নিপতিত করবেন।[১১২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন : "আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমানায় অবস্থানকারী এবং এ সীমানা লংঘনকারী ব্যক্তির উপমা ঐ সম্প্রদায়ের মত যারা লটারীর মাধ্যমে জাহাজে আরোহণ করেছে। এতে তাদের কেউ উপরের তলায় আর কেউ নিচের তলায় স্থান পেয়েছে। নিচের তলার লোকটির পানি আনার জন্য উপরের তলায় যেতে হয়। এতে উপরের তলার লোকদের কষ্ট হয়। এই দেখে নিচের তলার লোকটি একটি কুঠার নিয়ে জাহাজ ছিদ্র করতে আরম্ভ করল। ইত্যবসরে উপরের তলার লোকজন এসে তাকে বলল, তোমার কি হয়েছে ? তুমি একি করছো? জবাবে সে বলল, আমার যাতায়াতের কারণে তোমাদের কষ্ট হয়। অথচ পানি আনা আমার অতীব জরুরী। এ অবস্থায় তারা যদি তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে তবে সে বেঁচে যাবে এবং তারাও বেঁচে যাবে। আর যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ জাহাজে ছিদ্র করতে দেয়, তবে সে ধ্বংস হবে এবং তারাও ধ্বংস হবে।"[১১৩]

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত লোকদের বিরুদ্ধে হক্পন্থীদের অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে। অন্যথায় অন্যায়কারীদের মত তাদের পরিণামও করুণ হবে। উল্লেখ্য যে, দাওয়াতের কাজ সর্বদা চালিয়ে যেতে হবে, পূর্ণাঙ্গ দীনের দাওয়াত দিতে হবে, বিভিন্ন বিষয়ের দাওয়াত দিতে হবে এবং সকলকে দাওয়াত দিতে হবে। আর দাওয়াত শুরু করতে হবে নিজ পরিমণ্ডল থেকে।

জিহাদের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

'জিহাদ্' (جـهـاد) শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, ক্ষমতা, শক্তি ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় :

بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ بِالْقِتَالِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ اَوْ غَيْرِ ذَالِكَ .

জান, মাল, নসীহত ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে লড়াই করার কাজে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জিহাদ বলে।[১১৪]

এ প্রসঙ্গে মাওলানা তকী উসমানী (র) বলেন :

بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِاعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَكَسْرِ شَوْكَةِ الْكُفْرِ وَالْكُفَّارِ سَوَاءٌ كَانَ بِالسِّلَاحِ اَوْ بِالْمَالِ اَوْ بِالْعَمَلِ اَوْ بِالْقَلَمِ اَوْ بِاللِّسَانِ .

হাতিয়ার, ধন-সম্পদ, আমল (কর্ম), ইল্ম, কলম, কথা বা বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র কালেমা তথা দীনকে সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফির ও কুফরের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে সমূলে উৎখাত করার নিমিত্তে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জিহাদ বলে।[১১৫]

বস্তুত বাহ্যদৃষ্টিতে জিহাদ বলতে কিতালকেই (قتال) বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়। কেননা জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আর 'কিতাল' শব্দটি হচ্ছে বিশেষ অর্থবোধক শব্দ। সব কিতাল (লড়াই) জিহাদ। কিন্তু সব জিহাদ কিতাল নয়।[১১৬]

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ তিন প্রকার।

১. নিজের নফ্‌স বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللهِ ـ

প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার ব্যাপরে নিজের নফ্‌সের সাথে জিহাদ করে।[১১৭]

হাদীসে এ জিহাদকে 'জিহাদে আক্‌বার' বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ ـ

আমরা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) থেকে জিহাাদে আক্‌বার (বড় জিহাদ)-এর দিকে ফিরে এসেছি।[১১৮]

২. জিহাদ বিল ইল্‌ম বা ইল্‌মের সাহায্যে জিহাদ করা। এ জিহাদকে কুরআন মাজীদে 'জিহাদে কাবীর' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

فَلاَ تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْ هُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ـ

সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য কর না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবলভাবে জিহাদ চালিয়ে যাও। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫২)

ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (র) জিহাদ বিল ইল্‌মের ব্যাপারে এক সূক্ষ্ম আলোচনার অবতারণা করে বলেছেন, ইসলামের প্রকৃত প্রাণশক্তি এই জিহাদের মধ্যে নিহিত আছে। এই জিহাদের মাধ্যমেই ইসলাম গোটা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে এবং গোটা দুনিয়াব্যাপী তা শ্রেষ্ঠতম মতাদর্শের মর্যাদা লাভ করেছে। যদি ইসলামের শত্রুরা এর পথে বাধা ও অন্তরায় না হতো, তবে দুনিয়ার বুকে কোন সত্য সন্ধানী ব্যক্তি ইসলাম কবূল করা ব্যতিরেকে থাকতে পারত না। জিহাদ বিল ইল্‌ম প্রথমত দুই প্রকার :

১. اَلْمُحَافَظَةُ بِالنَّشْرِ অর্থাৎ প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে দীনের সংরক্ষণ। এটি আবার চার প্রকার : (ক) جِهَادُ بِاللِّسَانِ অর্থাৎ ভাষা ও যুক্তির দ্বারা জিহাদ করা, (খ) جِهَادُ بِالنَّفْسِ অর্থাৎ শরীর ও মনদ্বারা জিহাদ করা, (গ) جِهَادُ بِالْقَلَمِ অর্থাৎ লেখনীর মাধ্যমে জিহাদ করা এবং (ঘ) جِهَادُ بِالْمَالِ অর্থাৎ অর্থসম্পদ ব্যয় করে জিহাদ করা।

২. اَلْمُدَافَعَةُ عَنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করা হয় বা বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালানো হয় অকাট্য ও অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা ঐ সবের মুকাবিলা করা। এটিও চার প্রকার : (ক) জিহাদ বিল-লিসান, (খ) জিহদ বিন-নাফ্‌স, (গ) জিহাদ বিল-কলম, (ঘ) জিহাদ বিল-মাল। এই হিসাবে জিহাদ বিল্ ইল্‌ম সর্বমোট আট প্রকার।

৩. জিহাদে কিতাল। ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় একে جِهَادُ مَعَ اَهْلِ الْحَرْبِ অর্থাৎ শত্রুরাষ্ট্রের (দারুল হরবের) বিরুদ্ধে লড়াই করা বলা হয়। কেউ কেউ একেই জিহাদ বলেছেন। মূলত এটি হচ্ছে জিহাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা।[১১৯]

জিহাদের সকল স্তর ও সকল শ্রেণী যার মধ্যে পাওয়া যাবে সেই হবে মু'মিন। জিহাদের প্রকার আছে। এই সবগুলোর মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তিনি সব ধরনের জিহাদই করে গিয়েছেন তাঁর তেইশ বছরের নুবূওয়াতী যিন্দেগীতে।

জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শা'আইরে দীন তথা দীনের বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষা করা এবং ইসলামের বিধি-বিধান ও অনুশাসন মেনে চলা যেমন একজন মু'মিনের অন্যতম দায়িত্ব, অনুরূপভাবে দীন রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজি রেখে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়াও তার একান্ত কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্‌র দাসত্বে নিয়ে আসার কল্যাণময় মাধ্যম হল এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। জিহাদ ইসলামের শীর্ষ চূড়া। যে ব্যক্তি জিহাদ করল না বা জিহাদের নিয়্যাত রাখল না, তার মৃত্যু তো হল জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। মু'মিনের যিন্দেগী আমৃত্যু জিহাদী যিন্দেগী। জিহাদ তার কর্মসূচি, শাহাদাত তার স্বপ্ন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তার উদ্দেশ্য।

জিহাদের ফযীলত অপরিসীম। এ সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে ? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য। (সূরা তাওবা, ৯ : ১১১)

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

হে মু'মিনগণ ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মমন্তুদ শাস্তি হতে ? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনদ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য। এবং তিনি দান করবেন তোমাদেরকে বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ

আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, আর মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও। (সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ : ১০-১৩)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لَغُدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ·

আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।[১২০]

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ·

আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন। এর দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়।[১২১]

অপর এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَا اَغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَا تَمَسُّهُ النَّارُ ·

আল্লাহ্‌র পথে যে বান্দার দুই পায়ে ধূলি লাগে, সে পা জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।[১২২]

যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয় তাদের মর্যাদা এত বেশি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারবার আল্লাহ্‌র পথে জীবনদানের জন্য স্বীয় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন :

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ·

আমি সে সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি শহীদ হয়ে যাই। আবার জীবত হই এবং আবার শহীদ হয়ে যাই। আবার জীবিত হই এবং আবার শহীদ হয়ে যাই। আবার নতুন জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হয়ে যায় যাই।[১২৩]

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও শাহাদাত লাভ করার ফযীলাত এবং মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

জিহাদ ফরয হওয়ার পটভূমি

জিহাদের এই বিধান পর্যায়ক্রমে ফরয করা হয়েছে। প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন এবং তাঁকে এ মর্মে হুকুম দেয়া হয়েছিল, যেন তিনি কাফিরদের সমূহ কারসাজি, ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনের মুকাবিলায় ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করেন এবং তাদের সমস্ত দুরাচার, দুর্ব্যবহার ইত্যাদিকে উপেক্ষা করেন। ইরশাদ হয়েছে :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ·

অতএব, আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন। (সূরা হিজর, ১৫ : ৯৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ·

আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করুন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯৯)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِنِّىْ اُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُوْا ·

আমি ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সুতরাং তোমরা লড়াই করবে না।[১২৪]

তারপর কাফিরদের সাথে সদ্ভাবে বিতর্ক করার আদেশ প্রদান করা হয়। ইরশাদ হয়েছে :

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ·

এবং আপনি তাদের সাথে বিতর্ক করুন সদ্ভাবে। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ১২৫)

এর পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদের জন্য জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়। (ফরয করা নয়) কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۨ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ·

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দলদ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রীস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৯-৪০)

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, এটিই জিহাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ প্রথম আয়াত। কেউ কেউ বলেন, জিহাদ সম্বন্ধে অবতীর্ণ প্রথম আয়াত হচ্ছে :

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ·

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালংঘন করবে না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯০)

অন্যান্য উলামায়ে কিরামের মতে এ সম্পর্কিত প্রথম আয়াত হচ্ছে :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ·

আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। (সূরা তাওবা, ৯ : ১১১)

এরপর আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করা হয়ে থাকে। ইরশাদ হয়েছে :

فَانْ قٰتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা করবে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯১)

তারপর আক্রমণাত্মক জিহাদের হুকুম দেওয়া হয়। তবে এ পর্যায়ে শর্ত ছিল, নিষিদ্ধ মাস তথা যিলকা'দা, যিলহাজ্জ এবং মুহাররম ও রজব অতিবাহিত হয়ে যাওয়া। তৎকালে এই মাসসমূহে যুদ্ধ করা হারাম ছিল। ইরশাদ হয়েছে :

فَاذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ·

তারপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। (সূরা তাওবা, ৯ : ৫)

সর্বশেষ শর্তমুক্তভাবে আক্রমণাত্মক জিহাদের হুকুম দেওয়া হয়। এমনিভাবে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে জিহাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান প্রদান করা হয়। ইরশাদ হয়েছে :

وَقٰتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ·

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ·

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না, আর সত্য দীনের অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া প্রদান করে। (সূরা তাওবা, ৯ : ২৯)

জিহাদের এই হুকুম কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ ·

আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তখন থেকে আরম্ভ করে এই উম্মাতের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। কোন যালিমের যুলুম এবং কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা তা বন্ধ করতে পারবে না।[১২৫]

অপর এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ·

আমার উম্মাতের একদল লোক সর্বদা হক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লড়াই করবে এবং যেসব অমুসলিম তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে তারা তাদের উপর জয়ী থাকবে। এই উম্মাতের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে।[১২৬]

উল্লেখ যে, জিহাদের বিষয়টি আম বা ব্যাপক অর্থবোধক হলেও কিতালের বিষয়টি হচ্ছে খাস্। এতে কোন তাবীল বা অন্য কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। কাজেই উপরোক্ত হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, প্রত্যেক দেশেই এমন একদল লোক থাকতে হবে, যারা সর্বদা জিহাদের কাজে ব্যাপৃত থাকবে।[১২৭]

জিহাদের হুকুম

আত্মরক্ষামূলক জিহাদ এবং আক্রমণাত্মক জিহাদ উভয় প্রকার জিহাদই ইসলামে ফরয। আত্মরক্ষামূলক জিহাদ ফরযে আইন। অর্থাৎ অমুসলিম যদি কোন মুসলিম জনবসতির উপর আক্রমণ করে, তবে তাদেরকে প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন। ফিকহ্ এর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে :

اَمَّا اِذَا عَمَّ النَّفِيْرُ بِاَنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلٰى بَلَدٍ فَهُوَ فَرْضٌ عَيْنٌ يَفْتَرِضُ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اٰحَادِ الْمُسْلِمِيْنَ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ، فَاِذَا عَمَّ النَّفِيْرُ لاَ يَتَحَقَّقُ الْقِيَامُ بِهِ اِلاَّ بِالْكُلِّ فَبَقِىَ فَرْضًا عَلَى الْكُلِّ عَيْنًا بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ فَيَخْرُجُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلاَهُ وَالْمَرْاَةُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا لِاَنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ وَالْمَرْاَةِ فِىْ حَقِّ الْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوْضَةِ عَيْنًا مُسْتَثْنَاةٌ عَنْ مِلْكِ الْمَوْلٰى وَالزَّوْجِ شَرْعًا كَمَا فِى الصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ وَكَذَا يُبَاحُ لِلْوَلَدِ اَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ اِذْنِ وَالِدَيْهِ لِاَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ لاَ يَظْهَرُ فِىْ فُرُوْضِ الاَعْيَانِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ ·

'নফীরে আম'-এর অবস্থায় অর্থাৎ শত্রু সম্প্রদায় কোন মুসলিম জনবসতির উপর আক্রমণ করলে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমানের উপর তাদের জিহাদের মাধ্যমে প্রতিহত করা ফরযে আইন। 'নফীরে আম' তথা জিহাদের ব্যাপারে সাধারণ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর সকলে একত্রে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া এ ফরয আদায় হবে না। এ সময় ঠিক নামায-রোযার মতই সকল মুসলমানের উপর প্রত্যক্ষভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরয হয়ে যায়। তাই দাসী মনিবের এবং স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কেননা নামায-রোযার ন্যায় যেসব ইবাদত প্রত্যেক মুসলমানের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয, সে ক্ষেত্রে দাসের উপর মনিবের এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন বৈধ কর্তৃত্ব নেই। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় সন্তান তার পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কেননা নামায-রোযার ন্যায় ফরযে আইন ইবাদতের ক্ষেত্রেও সন্তানের উপর পিতামাতার বাধা দেওয়ার অধিকার নেই।[১২৮]

আল্লামা শামী (র)-ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'নিহায়া' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন :

إنَّ الْجِهَادَ اِذَا جَاءَ النَّفِيْرُ اِنَّمَا يَصِيْرُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلٰى مَنْ يَقْرُبُ مِنَ الْعَدُوِّ فَاَمَّا مَنْ وَرَاءَهُمْ بِبُعْدٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يَسَعَهُمْ تَرْكُهُ اِذَا لَمْ يَحْتَجْ اِلَيْهِمْ فَاِنْ احْتَجَّ اِلَيْهِمْ بِاَنْ عَجِزَ مَنْ كَانَ يَقْرُبُ مِنَ الْعَدُوِّ عَنِ الْمُقَاوَمَةِ مَعَ الْعَدُوِّ اَوْ لَمْ يَعْجِزُوْا عَنْهَا لٰكِنَّهُمْ تَكَاسَلُوْا وَلَمْ يُجَاهِدُوْا فَاِنَّهُ يَفْتَرِضُ عَلٰى مَنْ يَلِيْهِمْ فَرْضُ عَيْنٍ كَالصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ لَا يَسَعُهُمْ تَرْكُهُ ثُمَّ وَثُمَّ اِلٰى اَنْ يُفْتَرَضَ عَلٰى جَمِيْعِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ شَرْقًا وَغَرْبًا عَلٰى هٰذَا التَّدْرِيْجِ وَنَظِيْرُهُ اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَاِنَّ مَنْ مَاتَ فِيْ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْبَلَدِ فَعَلٰى جِيْرَانِهِ وَاَهْلِ مَحَلَّتِهِ اَنْ يَقُوْمُوْا بِاَسْبَابِهِ وَلَيْسَ عَلٰى مَنْ كَانَ بِبُعْدٍ مِنَ الْمَيِّتِ اَنْ يَقُوْمُوْا بِذَالِكَ وَاِنْ كَانَ الَّذِيْ بِبُعْدٍ مِنَ الْمَيِّتِ يَعْلَمُ اَنَّ اَهْلَ مَحَلَّتِهِ يُضَيِّعُوْنَ حُقُوْقَهُ اَوْ يَعْجِزُوْنَ عَنْهُ كَانَ عَلَيْهِ اَنْ يَقُوْمُوْا بِحُقُوْقِهِ كَذَاهُنَا .

যখন ব্যাপকভাবে জিহাদের ডাক আসবে তখন জিহাদ ফরযে আইন হবে ঐ সমস্ত লোকের উপর যারা শত্রুর নিকটতম স্থানে অবস্থান করে। আর যারা শত্রু থেকে কিছুটা দূরত্বে নিকটতম স্থানে অবস্থানকারীদের পার্শ্বে অবস্থান করে তাদের উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া। তাদের যদি প্রয়োজন না হয়, তাহলে তারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলেও চলবে। কিন্তু যদি নিকটতম স্থানে অবস্থানকারীরা শত্রুর মুকাবিলায় অক্ষম হওয়ায় অথবা অক্ষম ছিল না কিন্তু অলসতার কারণে তাদের সাথে মুকাবিলা না করায় তাদের প্রয়োজন হয়, তাহলে পার্শ্ববর্তীদের উপর নামায ও রোযার মতই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। তারা কোনভাবেই এই দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাবে না। এভাবে পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্তের প্রত্যেক পরবর্তী মুসলিম বসতির উপর উক্ত দায়িত্ব বর্তাবে। এর দৃষ্টান্ত হলো, মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায। যদি কোন প্রান্তে কোন মুসলমান মারা যায় তাহলে প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসী লোকদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তার দাফন-কাফন এবং জানাযা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। দূরে অবস্থানকারী লোকদের উপর এ দায়িত্ব বর্তায় না। অবশ্য দূরে অবস্থানকারী লোকেরা যদি জানতে পারে যে, নিকটে অবস্থানকারী লোকেরা মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য পালনে অক্ষম কিংবা উদাসীন, তবে দূরবর্তীদের উপর তার জানাযা, দাফন-কাফন সম্পন্ন করার দায়িত্ব বর্তাবে। জিহাদের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপই।[১২৯]

জিহাদ ফরয হওয়ার শর্ত

জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হল, শারীরিক শক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা। অনুরূপভাবে হাতিয়ার সংগ্রহ এবং তা পরিচালনা করতে সক্ষম হওয়াও জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। রাস্তা নিরাপদ হওয়া জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত নয়।[১৩০]

জিহাদ বৈধ হওয়ার শর্ত দু'টি : ১. ইসলামের শত্রুদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর তা কবূল করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করা এবং সন্ধিচুক্তির বিষয়েও অসম্মতি প্রকাশ করা। ২. জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের গৌরব, শান-শওকত এবং শৌর্য-বীর্য প্রকাশ পাওয়ার

আশা করা গেলে এ অবস্থায় জিহাদ করা বৈধ। কিন্তু এরূপ আশা করা না গেলে জিহাদ বৈধ হবে না। কেননা এ অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার শামিল।[১৩১]

হারাম (সম্মানিত) মাসসমূহ যথা রজব, যিলকদ, যিলহাজ্জ ও মুহার্‌রম মাসেও জিহাদ করা জায়িয। এই মাসসমূহে জিহাদ করার ব্যাপারে পূর্বে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে।

মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা বারো হাজার বা ততোধিক হলে কিংবা কাফিরদের সংখ্যার অর্ধেক হলে এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা জায়িয হবে না।[১৩২]

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদের মোহ, খুন-খারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র দাসত্বে নিয়ে আসা এবং যুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার সুশীতল ছায়াতলে লোকদেরকে নিয়ে আসাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।

এতদসত্ত্বেও কতিপয় ওরিয়েন্টালিস্ট (প্রাচ্যবিদ) ইসলামের সমর নীতির উপর এ মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, জিহাদের বিধান প্রবর্তন করে ইসলাম মুসলমানদেরকে খুনখারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত ঘটানোর শিক্ষা দিয়েছে, যা শুধু অনুচিতই নয়; বরং তা মানবতার পরিপন্থীও বটে।

বস্তুত প্রাচ্যবিদদের এই আপত্তি একেবারেই অযৌক্তিক এবং অবান্তর। কেননা মানব সৃষ্টির পর যুগে যুগে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য পয়গাম্বর এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা সকলেই এক আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও স্বীয় রিসালাতের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কেউ কেউ তাঁদের এই আহবান গ্রহণ করে ঈমান এনেছেন। আবার কেউ তা উপেক্ষা করে সত্যত্যাগী কাফির হয়েছে। যারা কাফির, যারা আল্লাহ্‌র আবাধ্য, তারা আল্লাহ্‌দ্রোহী। রাষ্ট্রদ্রোহী লোকদের শাস্তি যেমন মৃত্যুদণ্ড, ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ্‌দ্রোহী লোকদের শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং জিহাদের বিধান যুলুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অধিকন্তু আল্লাহ্‌দ্রোহী মানুষগুলো সমাজদেহের জন্য ক্যান্সার স্বরূপ। ক্যান্সার হতে রোগী বাঁচাতে হলে যেমন তার অপারেশন অপরিহার্য, অনুরূপভাবে সমাজদেহকে সুস্থ ও নিরাময় রাখতে হলেও এই সমস্ত লোককে নিপাত করে সমাজদেহকে কলুষমুক্ত করা অপরিহার্য। অন্যাথায় ক্যান্সার সংক্রমিত হয়ে গোটা দেহে পচন ধরে যাবে। এতে সমাজদেহের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং ডাক্তারের অপারেশন যেমন রোগীর জন্য এক কল্যাণময় ব্যবস্থা, তেমনিভাবে কলুষমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদও বিকল্পহীন এক কল্যাণকর ব্যবস্থা।[১৩৩] পক্ষান্তরে স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন, অবিবেকী ও অর্বাচীন লোকেরাই এর উপর আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। জিহাদের কল্যাণময় সদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۔

আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দলদ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহ্লে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রীস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪০)

জিহাদ যাদের উপর ফরয

শত্রুরাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সকল সক্ষম ব্যক্তির প্রতি জিহাদে অংশগ্রহণের ঘোষণা (নফীরে আম) হয়ে যাওয়ার পর সকল মুসলিমের উপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন। এ অবস্থায় নামায-রোযার মতই প্রত্যেক মুসলমানকে এ কাজে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য। 'নফীরে আম'-এর অবস্থায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরয। এ পর্যায়ে স্ত্রীর জন্য স্বামীর এবং সন্তানের জন্য তার পিতামাতার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না।[১৩৪]

'নফীরে আম'-এর অবস্থায় পুরুষ-মহিলা, দাস-দাসী এক কথায় সকলের উপরই জিহাদ ফরয। এমনকি যেসব সন্তান এখনো বালিগ হয়নি কিন্তু যুদ্ধ করতে সক্ষম, তারাও জিহাদে শরীক হবে। এতে পিতামাতা তাদেরকে নিষেধ করতে পারবে না। যেসব মানুষ রণক্ষেত্রে যেতে সক্ষম কিন্তু শত্রুর মুকাবিলা করতে সক্ষম নয়, তারাও যুদ্ধে শরীক হবে।[১৩৫]

স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরযে কিফায়া। এ অবস্থায় একদল মুসলমানের সর্বদা এ কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সুস্থ, আযাদ এবং জিহাদ করতে সক্ষম এমন ব্যক্তির উপর জিহাদ করা ফরয।[১৩৬]

যদি শোনা যায় যে, অমুসলিম লোকেরা মুসলমনদের রাজ্যে প্রবেশ করে তাদের ধন-সম্পদ, নাবালিগ শিশু সন্তান এবং মহিলাদেরকে নিয়ে গেছে অথচ তাদের মুকাবিলা করার মত শক্তি মুসলমানদের আছে, তাহলে মুসমানদের দেশে থাকা অবস্থায় তাদের পেছনে ধাওয়া করে সকল কিছু ছিনিয়ে আনা মুসলমানদের উপর কর্তব্য। যদি তারা নিজেদের রাষ্ট্রে চলে যায় তাহলেও তাদের হাত থেকে শিশুসন্তান এবং মহিলাদেরকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আর যদি তারা লুটপাট করে শুধু মুসলমানদের ধন-সম্পদ নিয়ে নিজেদের রাষ্ট্রে চলে যায়, তাহলে এ অবস্থায় তাদের ধাওয়া না করাও জায়িয। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও তাদের সাথে যুদ্ধ করা উত্তম।

যে ব্যক্তি নিজের জান-মালদ্বারা জিহাদ করতে সক্ষম, সে জান-মাল খরচ করে জিহাদ করবে। আর যার সম্পদ আছে কিন্তু নিজে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়, সে অন্য কাউকে খরচ দিয়ে যুদ্ধে প্রেরণ করবে। এতে উভয়ই জিহাদের সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তির যুদ্ধ করার মত শারীরিক শক্তি আছে কিন্তু টাকা-পয়সা নেই, সে বায়তুলমাল থেকে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। যদি বায়তুলমাল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তাহলে নিজে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে।[১৩৭]

টাকা-পয়সা দেওয়ার সময় দাতা এই বলে দিবে যে, এই টাকা তোমার, তুমি এরদ্বারা জিহাদ করবে, তাহলে গ্রহীতা যোদ্ধা এই টাকা যুদ্ধের কাজে এবং অন্য কাজেও ব্যয় করতে পারবে। আর যদি বলে, তুমি এই টাকাদ্বারা আমার পক্ষ হতে জিহাদ করবে, তাহলে তার জন্য এই টাকা জিহাদ ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যয় করা জায়িয হবে না।[১৩৮]

যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম নয় যেমন শিশু, মহিলা, অন্ধ, হাত-পা কর্তিত এবং লেংড়া-খোঁড়া ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরয নয়। কোন এলাকায় যদি একাই মাত্র আলিম ও ফকীহ্ থাকে, তবে স্বাভাবিক অবস্থায় সে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না।[১৩৯]

নগদ আদায়যোগ্য ঋণ হলে ঋণদাতা ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অনুমতি না দিলে জিহাদে অংশগ্রহণ জায়িয হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জামিন হয়, তবে তার অনুমতির পর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ঋণদাতা ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত জিহাদের উদ্দেশ্যে বের না হওয়াই উত্তম। ঋণ গ্রহীতার নিকট যদি পরিশোধ করার মত অর্থসম্পদ থাকে কিন্তু ঋণদাতা অনুপস্থিত এ কারণে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না, তাহলে কাউকে ঋণ পরিশোধের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ঋণ নগদ আদায়যোগ্য না হলে তা জিহাদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। যদি এ কথা জানা থাকে যে, জিহাদ থেকে আসার পর ঋণ আদায়ের নির্দিষ্ট সময় আসবে, এর আগে নয়। যার নিকট আমানতের টাকা রক্ষিত আছে, সে এ টাকা কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে।[১৪০]

পিতামাতা জীবিত থাকলে তাদের অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করা সমীচীন নয়। পিতামাতা উভয়ের জীবিত থাকা অবস্থায় কোন একজন অনুমতি দিলে এবং অপরজন অনুমতি না দিলে এ অবস্থায় সন্তানের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়িয হবে না।[১৪১]

'নফীরে আম' না হওয়া অবস্থায়ও পুরুষ যোদ্ধাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে যদি মহিলাদের পক্ষে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়, তাহলে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। যুদ্ধাহত মুজাহিদগণের চিকিৎসা ও তাদের পানি পান করানোর জন্য এবং যোদ্ধাদের খানাপিনা পাকানোর জন্য যুবতী মহিলাদের সমর অভিযানে অংশগ্রহণ করা জায়িয নেই। অবশ্য বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য এসব কাজের উদ্দেশ্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়িয আছে। কিন্তু তারাও সরাসরি যুদ্ধে শরীক হবে না; বরং তারা সেবা-শুশ্রূষার কাজ আঞ্জাম দিবে।[১৪২]

খলীফার জন্য কর্তব্য হল, বছরে কমপক্ষে এক বা দুইবার দারুল হরবের প্রতি সমর অভিযান (মহড়া) প্রেরণ করা। আর জনগণের উপর অপরিহার্য হল এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা করা।[১৪৩]

রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সীমান্ত ও সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাসমূহের হিফাযাত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকাকে 'রিবাত' (رباط) বলা হয়। 'ফাতহুল কাদীর' ও 'বাহরুর রাইক' গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে যে :

الرِّبَاطُ هُوَ الْاِقَامَةُ فِىْ مَوْضِعٍ يَتَوَقَّعُ مِنْهُ هُجُوْمُ الْعَدُوِّ لِدَفْعِهِمْ ٠

যে স্থানে দুশমনদের হামলার আশংকা থাকে এমন স্থানে তাদেরকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সীমান্ত প্রহরার গুরুত্ব প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর; ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং (প্রতিরক্ষায়) সদা প্রস্তুত থাক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০০)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ـ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম।[১৪৪]

হযরত উমর ফারূক (রা) সিরিয়া সফরকালে সীমান্ত শহরগুলো এবং সেখানকার সেনা ছাউনীসমূহ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর তিনি সীমান্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করা যায়। মোটকথা, দেশের সীমান্ত রক্ষা ও দেশীয় নাগরিকদের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা বিধানের লক্ষ্যে সীমান্ত প্রহরার গুরুত্ব অপরিসীম।[১৪৫]

আন্তর্জাতিক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ব্যক্তি জীবন থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য। সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হচ্ছে বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা। শান্তি প্রতিষ্ঠায় চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

তারা (কাফিররা) যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবেন। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আনফাল, ৮ : ৬১)

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সন্ধি চুক্তিতে রয়েছে মানুষের জন্য কল্যাণ। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে হয়েছে। বস্তুত হুদায়বিয়ার সন্ধি বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জন্য প্রতিকূল ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল মুসলমানদের জন্য এক মহাসাফল্য। আল্লাহ্ তা'আলা একে فتح مبين তথা 'স্পষ্ট বিজয়' বলে ঘোষণা করেছেন। এই সন্ধির পরপরই ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ মুবাল্লিগবৃন্দ (ধর্মপ্রচারকগণ) নির্ভিক চিত্তে আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েন। এতে আরবের ঘরে ঘরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এরই ফলে সন্ধি পরবর্তী দু'বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সময়ের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে হুদায়বিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছর পরই মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর সাথী মুসলমানদের সংখ্যা হয়েছিল দশ হাজার। পরবর্তীতে বিদায় হজ্জের বছর এই সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল।

এই সন্ধির ফলে একদিকে ইসলামের দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার যেমন সুযোগ হয়েছিল, তেমনিভাবে অমুসলিমদের জন্য ইসলামকে জানার ও মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণেই দেখা যায় যে, দীর্ঘ উনিশ বছরে ইসলামের যে উন্নতি হয়নি, মাত্র চার বছরে এর তুলনায় অনেক বেশি উন্নতি হয়েছে। সন্ধি চার প্রকার হতে পারে :

১. স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন গোত্রের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা চুক্তি। এই জাতীয় চুক্তিতে মুসলিম ও অমুসলিম পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করা এবং পরস্পর পরস্পরের দুশমনকে প্রতিহত করার ব্যাপারে 'অঙ্গীকারনামা' সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে অমুসলিমদের নিকট থেকে কোন প্রকার জিয্য়া কর নেওয়া হয় না এবং তাদের জমি থেকে কোন প্রকার খিরাজও গ্রহণ করা হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় হিজরত করার পর মদীনার মুসলিম ও অমুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এটিই 'মদীনার সনদ' নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছে। সীরাতে ইব্ন হিশাম, কিতাবুল আমওয়াল, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইত্যাদি গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে।

২. দুই জাতির মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৬ষ্ঠ হিজরী সনে মক্কাবাসীদের সাথে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি হিসাবে পরিচিত।

৩. ইসলামী হুকুমাত বাৎসরিক কিছু অর্থ উসূলের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা অর্জনের ভিত্তিতে কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। আর তাদেরকে তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও কতিপয় ক্ষেত্রে এ জাতীয় সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। আয়লাবাসীদের সাথে তিনি যে চুক্তি করেছিলেন তা এই জাতীয় চুক্তিই ছিল। খুলাফায়ে রাশিদীনের যামানায়ও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

৪. ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক বাৎসরিক নির্ধারিত কিছু পাওয়ার শর্তে কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করে বৈদেশিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে তাদের উপর কাউকে শাসক নিযুক্ত করা। বাহরাইন অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা এ জাতীয় চুক্তিই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহরাইন অধিবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রা)-কে সেখানকার প্রতিনিধি করে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছিলেন।[১৪৬]

শত্রুরাষ্ট্র (হারবী)-এর সাথে সন্ধি চুক্তি হওয়ার পর যদি কোন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে খলীফা সন্ধি বাতিল ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তবে মেয়াদ পর্যন্ত বহাল রাখাই উত্তম। আর যদি একান্তই চুক্তি বাতিল করতে হয় তাহলে শত্রুপক্ষকে প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে। আর যদি সন্ধিতে আবদ্ধ বিপক্ষ দল অতর্কিতভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে, তবে সন্ধি বাতিল করার ঘোষণা দেওয়া ছাড়াই তাদের সাথে লড়াই করা জায়িয হবে। অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হারবীদের সাথে সন্ধি করা হলে এই অর্থ জিয্য়ার খাতে ব্যয় করা হবে।[১৪৭]

সন্ধি চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ করার ঘোষণা করা নিষ্প্রয়োজন। চুক্তির মেয়াদ বাকী থাকা অবস্থায় অমুসলিমদের উপর বা তাদের সীমান্তে আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়িয নয়।[১৪৮]

চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

الاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ‎·

তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে, আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পসন্দ করেন। (সূরা তাওবা, ৯ : ৪)

মোটকথা হচ্ছে, ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। ইসলাম গোটা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ কারণেই বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামে কোন বাধা নেই, যদি এতে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাঘাত না ঘটে।

ভ্রাতৃত্ব ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ইসলামী বিধানমতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষ আল্লাহ্র বান্দা। সমগ্র মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِه ‎·

সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবারভুক্ত। আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে ঐ সৃষ্টি, যে আল্লাহ্র অপরাপর সৃষ্টিকূলের প্রতি অনুগ্রহ করে।[১৪৯]

বস্তুত মানব জাতি দেহের ন্যায় এক অখণ্ড সত্তা। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেমন পৃথক করে দেখা যায় না, তেমনিভাবে সমাজে বসবাসকারী লোকদেরকেও পরস্পরের তুলনায় খাটো করে দেখা যায় না। কর্মে, ব্যবসায় এবং পদমর্যাদায় একজন অপরজন থেকে পৃথক হতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসাবে সকলের মর্যাদাই সমান। মানুষ একে অন্যের ভাই। তাই কেউ কাউকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে অবমাননা করতে পারে না। মানুষ মানুষকে প্রকৃত মর্যাদা দিবে। তা না হলে মানুষ মনুষ্য নামের উপযুক্ত থাকে না। যে মানুষ আত্মমর্যাদার সাথে পরমর্যাদার বিষয়টিকে সংযুক্ত করে আত্ম-পর এক করে গ্রহণ করতে পারে, সেই হল প্রকৃত মানুষ। মানুষ যখন ইসলামের উক্ত বিধান তথা মানব ভ্রাতৃত্ববোধের কথা মেনে চলবে, তখনই দুনিয়ায় প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

ইসলামে ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি যেমনিভাবে স্বীকৃত, অনুরূপভাবে মানবাধিকারের বিষয়টিও। অর্থাৎ মানবাধিকার বলে যা বুঝানো হয় ইসলামে তা পুরোপুরিভাবে স্বীকৃত। বস্তুত মানবাধিকার অর্থ, মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ। আর তা হচ্ছে মানুষের জান-মাল ও ইয্যত-সম্মানের নিরাপত্তা লাভের অধিকার, ভাত-কাপড় লাভ ও বেঁচে থাকার অধিকার, শিশুর অধিকার, নারীর অধিকার এবং শ্রমিক ও মজদুরের অধিকার ইত্যাদি।

মানুষের প্রথম দাবি ও শ্রেষ্ঠ অধিকার হলো বেঁচে থাকার অধিকার। ইসলাম মানুষের এই অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ الاَّ بِالْحَقِّ ـ

আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৩)

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের জান-মাল এবং ইয্যত-সম্মানের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন :

انَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا ـ

তোমাদের রক্ত (জান), তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের ইয্যত-সম্মান তোমাদের উপর পবিত্র যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস।[১৫০]

খাওয়া-পরাই মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ। ইসলামে এ ব্যাপারেও বিশেষ বিধান রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ـ

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে। (সূরা জুমু'আ, ৬২ : ১০)

খেয়ে-পরে বাঁচার এবং ভাল আহার্য ও পরিধেয়ের ব্যবস্থা করা ইসলামের নির্দেশ। আলস্যজনিত দারিদ্র্যে নিজেকে নিক্ষেপ করা ও সমাজের বোঝা করে তোলায় বা দেহকে কষ্ট দেওয়ায় কোন পুণ্য নেই। এ ব্যাপারে ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ইসলাম শিশুর অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলামে শিশুদের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান একটি প্রশংসনীয় কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে শিশুদের খুব ভালবাসতেন। মহানবী (সা)-এর আদর্শমতে শিশুর কল্যাণ বিধানে দায়িত্ব গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি জন্মের সপ্তম দিনে তার একটি সুন্দর নাম রাখা, মাথার চুল কামিয়ে ফেলা এবং আকীকা করার প্রতি হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমনকি শিশুর চারিত্রিক কল্যাণ, শিক্ষাগত চাহিদা এবং সাধারণ মঙ্গলের প্রতি মনোযোগ দেওয়াকে উন্নতমানের বদান্যতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

নারীর অধিকারও ইসলাম নিশ্চিত করেছে। প্রাক-ইসলাম যুগে নারী সমাজ সাধারণ নাগরিক ও পারিবারিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং ভোগ্যপণ্যরূপে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ইসলাম নারীকে প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিয়েতে সম্মতি প্রদান, ধর্ম ও জ্ঞান চর্চার অধিকার, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া, মোহরানা লাভ করা এবং খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকার লাভ ইত্যাদি অধিকার প্রদান করে ইসলাম নারীকে এক মহিমাময় আসনে অধিষ্ঠিত

করেছে। কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

"আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।" (সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ : ৩৫)

সমাজের শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপারেও ইসলাম সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছে। শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে। শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তা পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে তার উপর সাধ্যের অধিক কোন দায়িত্ব চাপানো যাবে না। শিক্ষা স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদি শ্রমিকের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা মালিক বা সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য। কোন ছল-ছুতা ও মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে শ্রমিক ছাটাই করা অন্যায়।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। অমুসলিমদের জান-মাল, ইয্‌যত-সম্মান, চাকুরি ইত্যাদির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

"সাবধান ! যদি কেউ কোন মু'আহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক)-এর প্রতি যুলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা সাধ্য অতিরিক্ত কোন কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার থেকে কোন মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামাতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে থাকব।"[১৫১]

এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামেরই অবদান।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৃ. ৪-৫।
২. কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, পৃ. ৩৩০।
৩. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, মাওলানা মুশাহিদ আলী (র), পৃ. ১।
৪. ইসলামী হুকুমত, হামিদুল আনসারী গাযী, পৃ. ৩০৩-৩৭৪।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।
৬. বুখারী, মুসলিম ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৩০।
৭. ইসলামী হুকুমত, হামিদুল আনসারী গাযী, পৃ. ৩০৩।
৮. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ১৬।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৮।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪।

১২. মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।
১৩. দীন ও শরী'আত, মাওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নু'মানী (র)।
১৪. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৃ. ৩৩-৩৪।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
১৬. ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ৩৮-৩৯।
১৭. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল ওদূদ ভূঁইয়া, পৃ. ৩৪-৩৬।
১৮. দারা কুত্নী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২।
১৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২০।
২০. প্রাগুক্ত, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১৯।
২১. প্রাগুক্ত, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১৯।
২২. কান্যুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, তাবারানী ফিল আওসাত, সূত্র : ইসলামী রাজনীতি, পৃ. ৬৮।
২৩. বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৩।
২৪. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩১৪।
২৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২০-৩২১।
২৬. ইসলামী হুকুমত, হামিদুল আনসারী গাযী, পৃ. ৫৭৭-৫৮০।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৭-৫৮০।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২-৫৭৫।
২৯. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৃ. ১৫৩-১৫৫; ইসলামের অর্থবন্টন ব্যবস্থা, মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (র), পৃ. ৮-৯।
৩০. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২০।
৩১. শারহুল আকাইদ আন্-নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৩৮।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।
৩৩. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৭।
৩৪. শারহুল আকাইদ আন্-নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৪২-১৪৩।
৩৫. ইসলামী হুকুমাত, ড. হামিদুল আনসারী গাযী, পৃ. ৩৭৯।
৩৬. শারহুল আকাইদ আন্-নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৪৩।
৩৭. ইসলামী হুকুমাত, ড. হামিদুল আনসারী গাযী, পৃ. ৩৭৮।
৩৮. শারহুল আকাইদ আন্ নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৪১-১৪২।
৩৯. তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮-২৭৯।
৪০. আল-কুরআনুল কারীম-এর পাদটিকা, পৃ. ৩৬৮।
৪১. তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪।
৪২. শারহুল আকাইদ আন্-নাসাফিয়্যা, পৃ. ১৩৬-১৩৭; ইসলামী হুকুমাত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৭।
৪৩. তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২।
৪৪. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২।
৪৫. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩।
৪৬. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ২১।
৪৭. ইসলামী হুকুমাত, ড. হামিদুল আনসারী গাযী, ৩৯০-৩৯২।
৪৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২০।
৪৯. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২২।

৫০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৬৮।
৫১. প্রাগুক্ত, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২১।
৫২. প্রাগুক্ত, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২১।
৫৩. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড।
৫৪. ইসলামে রাজনীতির ভূমিকা, প্রাগুক্ত।
৫৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ ২৬৩।
৫৬. প্রাগুক্ত, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১৮।
৫৭. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ২৬।
৫৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ ৩১৯।
৫৯. মিশকাত শরীফ (পাদটিকা) পৃ. ৩১৯।
৬০. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮।
৬১. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ২২।
৬২. প্রাগুক্ত (কিতাবুল খারাজ), পৃ. ২৬।
৬৩. তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।
৬৪. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ২৪।
৬৫. প্রগুক্ত, পৃ. ২৪।
৬৬. মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃ. ২১৪।
৬৭. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৩।
৬৮. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯৬।
৬৯. মুস্তাদরাকে হাকেম।
৭০. বায়হাকী, সূত্র : ইসলামী হুকুমাত, পৃ. ৪২৩।
৭১. রূহুল মা'আনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮।
৭২. আল জামি' লি আহ্কামিল কুরআন [ইমাম কুরতুবী (র)], ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬১।
৭৩. ইসলামী হুকুমাত, ড. হামিদুল আনসারী গাযী।
৭৪. তিরমিযী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩০।
৭৫. আল জামি লি আহকামিল কুরআন [ইমাম কুরতুবী (র)], ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬১।
৭৬. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ৩৭-৩৯।
৭৭. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২৬।
৭৮. প্রাগুক্ত, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২৬।
৭৯. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ৩৯-৪০।
৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৮১. ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৪।
৮২. তিরমিযী,সূত্র : মিশকাত, পৃ.৩২২।
৮৩. ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র), পৃ. ৮১-৮৭।
৮৪. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৯৯।
৮৫. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৫৪
৮৬. হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৪৬।
৮৭. হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৭০।
৮৮. নায়লুল আওতার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।

৮৯. কিতাবুল আমওয়াল. পৃ.১০১।
৯০. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০-২৫১।
৯১. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ৩৬
৯২. কিতাবুল খারাজ, পৃ.৮৫।
৯৩. মাওলানা নুর মুহাম্মাদ আজমী রচনাবলী, পৃ.৭৫-৭৬।
৯৪. ইসলামী হুকুমাত, ড. হামিদুল আনসারী গাযী, ৪৭৮-৪৭৯।
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯।
৯৬. আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২৪।
৯৭. তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২৫।
৯৮. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৩।
৯৯. ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, পৃ. ১১৩।
১০০. তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২৫।
১০১. তাবারানী, সূত্র : ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ৪২।
১০২. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২৪।
১০৩. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২৬।
১০৪. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ৪৩-৪৪।
১০৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২২৪।
১০৬. মাবসূত, সূত্র : ইসলামী হুকুমাত, পৃ. ৫২৭-৫২৯।
১০৭. মাবসূত, সূত্র : ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, পৃ. ১১৬-১১৭।
১০৮. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ৪৬-৪৭।
১০৯. হিদায়া, ৩খণ্ড, পৃ. ১৩৮।
১১০. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ১২৪-১২৮।
১১১. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত পৃ. ৪৩৬।
১১২. আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩৭।
১১৩. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩৮।
১১৪. বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৭।
১১৫. তাকমিলা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪।
১১৬. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ১৩৯।
১১৭. মিশকাত, পৃ. ১৫; তাকমিলা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪।
১১৮. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল জিহাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।
১১৯. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ১৪০-১৪২; সীরাতুন নবী (সা), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৩-২১৫।
১২০. সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯২।
১২১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১।
১২২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।
১২৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯২।
১২৪. নাসাঈ, বায়হাকী, ৯ম খণ্ড; মুসতাদরাকে হাকেম, ২য় খণ্ড।
১২৫. মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮।
১২৬. আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

১২৭. শামী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪।
১২৮. বাদায়েউস্ সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৮।
১২৯. শামী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪।
১৩০. শামী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২২-১২৪।
১৩১. ফাতহুল বারী, শারহে বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮; তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৭।
১৩২. শামী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৭-১২৮।
১৩৩. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮।
১৩৪. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩।
১৩৫. সীরাতুল মুস্তফা (সা), ২য় খণ্ড, পৃ. ১১-১৯।
১৩৬. বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, শামী, ৪র্থ খণ্ড, হিদায়া, ২য় খণ্ড।
১৩৭. শামী, ৪র্থ খণ্ড।
১৩৮. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯।
১৩৯. আলগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১।
১৪০. আলগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১।
১৪১. আলগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯; শামী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৬।
১৪২. আলগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০।
১৪৩. আলগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯।
১৪৪. আলগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০।
১৪৫. শামী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২২।
১৪৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩২৯।
১৪৭. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ১২৭।
১৪৮. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ১৩০-১৩৭।
১৪৯. হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩-৫৬৪।
১৫০. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭।
১৫১. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৫।
১৫২. সহীহ্ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩২।
১৫৩. আবূ দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৪৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
মু'আমালাত বা লেনদেন

লেনদেনের গুরুত্ব ও স্বচ্ছতা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মহান রাব্বুল আলামীন সারা বিশ্বপ্রকৃতিকে এমন কুশলীছন্দে বেঁধে দিয়েছেন যে, স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনের জন্যে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

ইসলাম মানুষের এই বাস্তব প্রয়োজনকে লক্ষ্য রেখে লেনদেন সুস্থ, স্বচ্ছ ও দ্বন্দ্বহীন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রেখো। তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে দেয়। কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে আর তার কিছুই যেন না কমায়, কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে। যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রী লোক। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮২)

নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্ভাবনা গৌণ। এ সম্ভাবনা বাকির ক্ষেত্রে প্রকট ও প্রাত্যহিক বাস্তবতা। তাই আল-কুরআনুল কারীমের এই আয়াতে সেই সম্ভাব্য সমস্যা, সংঘাত ও সংকট থেকে উত্তরণের পথই নির্দেশ করা হয়েছে। এই আয়াতে একটি মূলনীতি বলা হয়েছে, বাকি লেনদেনের লিখিত দলীল থাকা চাই যাতে ভুল-চুক না হতে পারে।

আরেকটি কথা বলা হয়েছে, বাকি লেনদেনের একটি নির্ধারিত সময় থাকা আবশ্যক। অনির্ধারিত সময়ের জন্য লেনদেন অবৈধ। কারণ এতে ঝগড়া-বিবাদের দ্বার খুলে যায়। তাই ফিকহবিদগণ বলেছেন, মেয়াদ নির্ধারিত হতে হবে এমনভাবে যাতে কোন ফাঁক-ফোকর না

থাকে। বরং মাস, তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে। ফসল কাটার মৌসুম বা এই জাতীয় অস্পষ্ট কোন মেয়াদে লেনদেন ঠিক নয়।

এখানে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে দেয়।" কাজেই লেখককে নিরপেক্ষ হতে হবে এবং ইনসাফের সাথে তা লিখতে হবে।

তারপর বলা হয়েছে, দলীল লেখাবে ঋণগ্রহীতা। এতে তার স্বীকৃতিপত্রও হয়ে গেল। তাছাড়া ঋণদাতা লেখালে বেশি লেখানোর যে সম্ভাবনা ছিল তাও থাকলো না। এ পর্যায়ে আহবান করা হয়েছে তাকওয়ার প্রতি। এরপর এসব দলীল-দস্তাবিজকে প্রামাণ্য করার জন্য সাক্ষীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেন কোনরূপ অস্বচ্ছতা কিংবা কারচুপির অবকাশ না থাকে। (মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৮৫-৬৮৬ [সংক্ষেপিত])

সারকথা, লেনদেন মানব সমাজের একটি অপরিহার্য অধ্যায়। জীবনব্যাপী এর বিস্তৃতি। এজন্যেই ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মানবজীবনের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানকল্পে রচিত হয়েছে ইসলামী ফিকহের বিশাল অমূল্য ভাণ্ডার। তাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্যার সমাধানকল্পে দলীলসমৃদ্ধ যুক্তিনির্ভর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। এক কথায় লেনদেনের গুরুত্ব ও এর স্বচ্ছতা বিধানে ইসলাম যে অবদান রেখেছে তার তুলনা অন্য ধর্ম বা আদর্শে নেই।

ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি

আরবী 'বাই' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'ক্রয়-বিক্রয়'। বাই' শব্দটি একই সাথে ক্রয়-বিক্রয় উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।[১]

আভিধানিক অর্থে, দু'টো বস্তুর পারস্পরিক বিনিময়কে 'বাই' বলা হয়। বস্তু দু'টির একটিকে সওদা, অন্যটিকে মূল্য বলা হয়। আর কোন কিছুর বিনিময়ে কোন বস্তুকে নিজের মালিকানায় নিয়ে আসাকে বলা হয় ক্রয় (শিরা')।[২]

পরিভাষায় বাই বা ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিক্রমে দু'টি বস্তুর পরস্পর বিনিময়কে।

প্রকারভেদ

ক্রয়-বিক্রয় মূলত চার প্রকার। যথা : নাফিয (কার্যকর), মাওকূফ, ফাসিদ ও বাতিল।

যে ক্রয়-বিক্রয়ে মাল তাৎক্ষণিকভাবেই ক্রেতার মালিকানায় চলে যায়, তাকে বাই'য়ে নাফিয বা কার্যকর ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়। যদি তা কারো অনুমতিনির্ভর হয় এবং তার অনুমতি সাপেক্ষে তা কার্যকর হয় তবে তাকে বাইয়ে মাওকূফ বলে। যে বাই'-এ ত্রুটি থাকে তবে ক্রীত মাল হস্তগত হওয়ার পর তা কার্যকর হয় তাকে বাইয়ে ফাসিদ বলে। আর কোন অবস্থাতেই শুদ্ধ হয় না যে বাই' তাকে বাইয়ে বাতিল বলে।

মাবী' বা পণ্যের দিকে লক্ষ্য করলেও বাই' চার প্রকার। যথা : মুকায়াযা, সরফ, সালাম ও মুতলাক। পরস্পর দু'টি বস্তুর বিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয়টিই বস্তু বা সম্পদ হলে তাকে 'মুকায়াযা' বলা হয়। এক্ষেত্রে উভয়টির যে কোন একটিকে সওদা ও অন্যটিকে মূল্য বলা যায়। যদি পরস্পর বস্তু দুটির উভয়টি মুদ্রা জাতীয় হয়, যেমন স্বর্ণ, রূপা, তবে একে 'সরফ' বলা হয়। যদি কোন বাকি বস্তুর বিনিময়ে নগদ অর্থ প্রদান করা হয় তবে তাকে 'সালাম' (লগ্নি) বলা

হয়। আর যদি কোন জিনিসকে নগদ বা বাকি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাকে মুতলাক বা সাধারণ বাই' বলা হয়।

মূল্যের দিক থেকেও বাই' চার প্রকার। যথা : তাওলিয়াহ্, মুরাবাহাহ, যায়'আ ও মুসাওয়ামাহ। যদি কোন বস্তু যে দামে প্রথমবার ক্রয় করা হয়েছে পুনরায় সেই দামেই বিক্রি করা হয় তবে তাকে 'তাওলিয়াহ্' বলে। যদি পূর্বের দামের চাইতে অধিক দামে বিক্রি করা হয় তবে তাকে 'মুরাবাহাহ্' বলে। যদি পূর্বের দামের চাইতে কম দামে বিক্রি করা হয় তবে তাকে 'যায়'আ' বলা হয়। আর যদি পূর্বের দামের বিষয়টি অগ্রাহ্যপূর্বক ক্রেতা-বিক্রেতার যৌথ সম্মতিক্রমে নতুন ধার্যকৃত মূল্যে বিক্রি করা হয় তবে তাকে 'মুসাওয়ামাহ্' বলে।[৩]

বিধি-বিধান

ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক বিধান হলো, এটা বৈধ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যাতিক্রমও হতে পারে। যেমন জীবন-মরণ সমস্যার ক্ষেত্রে জীবন বাঁচাতে পারে (দৃশ্যত) এমন জিনিস না থাকলে তা ক্রয় করা কিংবা বিক্রি করে ফেললে জীবন হুমকির সম্মুখীন হবে এমন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার দলীল। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ٠

আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা বাকারা, ২ : ২৭৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَأَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ٠

আর তোমরা যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় কর তখন সাক্ষী রেখ। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮২)

এই আয়াত দু'টিতে ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা সর্ম্পকে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য আয়াতটিতে এই বৈধতার কথা শব্দে না থাকলেও তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কারণ, লেনদেনের সময় সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। লেনদেন যদি অবৈধই হতো তাহলে আর সাক্ষী রাখার নির্দেশ দেওয়া হত না। একটি হাদীস আছে, রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন : "স্বর্ণ, স্বর্ণের বিনিময়ে, রূপা, রূপার বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, আটা আটার বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে, লবণ, লবণের বিনিময়ে হলে সমান সমান হাত-বাহাত নগদ (বিক্রি করা বৈধ)। যে ব্যক্তি বেশি দিবে বা বেশি চাইবে, সে সুদে আক্রান্ত হলো। আর যদি এগুলোর প্রকারে ভিন্নতা এসে যায় তাহলে যেভাবে খুশি বিক্রি কর।" এখানে 'যেভাবে খুশি বিক্রি কর' কথাটি স্পষ্টত ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই হাদীসের সারমর্ম হলো, যদি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দু'টি জিনিস এক জাতীয় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বিক্রয় সহীহ্ হওয়ার জন্যে উভয় বস্তু সমান সমান হতে হবে। অবশ্য দু'টি দুই জাতীয় হলে, যেমন চালের বিনিময়ে গম বা আটার বিনিময়ে তৈল, তাহলে এ ক্ষেত্রে সমতার কোন প্রয়োজন নেই। বরং কম-বেশি যে কোন কায়দায় তা বিক্রি হতে পারে। অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "শ্রেষ্ঠ জীবিকা হলো সৎ ব্যবসা ও ব্যক্তির স্বহস্তের উপার্জন। এখানে সৎ ব্যবসা বা ক্রয়-বিক্রয়কে শ্রেষ্ঠ জীবিকা বলা হয়েছে। এসব আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেচাকেনা বা ক্রয়-বিক্রয় একটি বৈধ ও হালাল লেনদেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অনিবার্য প্রয়োজন।[৪]

শর্তাবলী

ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যথা : ১. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। পাগল কিংবা নির্বোধের লেনদেন গ্রহণযোগ্য নয়; ২. সওদা ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী হতে হবে; ৩. সওদা প্রদানযোগ্য হতে হবে; অর্থাৎ শরী'আত কর্তৃক কিংবা বাহ্যিক কোন বাধা থাকা চলবে না। যেমন : এমন ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়, সরকার বা অভিভাবক যার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কারণ,এক্ষেত্রেও সে সওদা হস্তান্তর করতে পারছে না, যথার্থ মহলের বাধার কারণে; ৪. অন্যায়ভাবে বাধ্যকরণ হওয়া চলবে না। কারো চাপের মুখে বাধ্য হয়ে লেনদেন করলে সেটাও বৈধ হবে না; ৫. আল-কুরআন বা এই জাতীয় পবিত্র সওদা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কারীকে মুসলমান হতে হবে; ৬. সমরাস্ত্রের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা শত্রুপক্ষ হওয়া চলবে না; ৭. বিক্রিতব্য বস্তুটি অপবিত্র হওয়া চলবে না; কারণ এ জাতীয় বস্তুর লেনদেনও অবৈধ; ৮. বিক্রেতাকে সওদা হস্তান্তর করার ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে; ৯. বস্তুটির পরিমাণ ও গুণাবলী সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই সম্যক জ্ঞাত হতে হবে।[৫]

শর্তাবলীর প্রকারভেদ

ক্রয়-বিক্রয়ের কতিপয় শর্তাবলী :

১. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে আকিল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। সুতরাং পাগলের লেনদেন গ্রহণযোগ্য নয়।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। সুতরাং অবুঝ শিশুর লেনদেন গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ তার অভিভাবক অনুমোদন না করে।

ঈজাব এবং কবূল একই বিষয়ে হতে হবে। অর্থাৎ যে বিষয়ে লেনদেনের প্রস্তাব, সেই বিষয় সম্পর্কেই হতে হবে। যেমন বিক্রেতা বলল, আমি এই ঘরটি একশ টাকায় বিক্রি করলাম। এই বিক্রি তখনই সংঘটিত হবে ক্রেতা যখন বলবে, হ্যাঁ, আমি এই মূল্যেই এ ঘরটি ক্রয় করলাম।

বিক্রিতব্য বস্তু মওজুদ হতে হবে। অস্তিত্বহীন কোন জিনিসের বিক্রি বৈধ নয়। এমনকি অবর্তমানের মত জিনিসের বিক্রিও অবৈধ। যেমন গর্ভস্থিত বাছুর।

বস্তুটি এমন হতে হবে যার সাথে স্বত্বের সর্ম্পক আছে। স্বত্ব হওয়ার অযোগ্য বস্তুরও বিক্রি অবৈধ। যেমন কাজের অযোগ্য চারা। যদিও তা নিজের ক্ষেতেই হোক না কেন।

বিক্রেতা নিজে বিক্রিতব্য বস্তুর মালিক হতে হবে অথবা উকীল হতে হবে। নিজের মালিকানাধীন নয় কিংবা তাকে উকীলও নিযুক্ত করা হয়নি এমন বস্তুর বিক্রয়ও সংঘটিত হতে পারে না।

বিক্রিতব্য বস্তু শরী'আতের দৃষ্টিতে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। জিনিসটি গ্রহণযোগ্য হতে হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই একজন অপরজনের কথা শুনতে হবে। ঈজাব-কবূল অর্থাৎ প্রস্তাব ও সম্মতি একই বৈঠকে হতে হবে। সওদাটি বিক্রেতার মালিকানাধীন হতে হবে। বিক্রিতব্য বস্তুতে অন্য কারও হক্ থাকতে পারবে না।

ক্রয়-বিক্রয় সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

এ ক্ষেত্রেও ঐ সমস্ত শর্ত পাওয়া যেতে হবে যেগুলো লেনদেন সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত আরও কিছু শর্ত আছে। যেমন লেনদেন সাময়িক

নির্ধারিত সময়ের জন্য হতে পারবে না। বিক্রিত বস্তু এবং তার মূল্য উভয়টিই জানাশোনা হবে, যাতে করে ঝগড়ার পথ না থাকে। কোনরূপ ফাসেদ শর্ত থাকতে পারবে না। বাই'য়ে সালামের ক্ষেত্রে মজলিস ভাঙ্গার পূর্বেই ক্রয়কৃত মাল কব্জা করতে হবে। মুরাবাহাহ ও তাওলিয়ার ক্ষেত্রে প্রথম মূল্য জানা থাকতে হবে।

ক্রয়-বিক্রয় অনিবার্য হওয়ার শর্ত হলো, 'ইখতিয়ারমূলক' শর্ত থাকা চলবে না। যদি পসন্দ-অপসন্দে ভিত্তিতে গ্রহণ করা না করার ইখতিয়ার দেওয়া হয় তাহলে ইখতিয়ারের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাই' লাযেম বা অনিবার্য হয় না।[৬]

বৈধ ও অবৈধ পদ্ধতি

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, ক্রয় ও বিক্রয় বৈধ ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্যে যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে পাওয়া গেলেই তা বৈধ ক্রয়-বিক্রয় বলে বিবেচিত হবে। আর সেগুলোর অবর্তমানে বিবেচিত হবে অবৈধ বলে।

ক্রয়-বিক্রয়ের মূল রুকন বা ভিত্তি হলো ঈজাব ও কবূল। ঈজাব বলা হয়, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রথম যিনি লেনদেনের প্রস্তাব করেন, তার প্রস্তাবকে। আর সেই প্রস্তাবে সম্মতিদানকে কবূল বলা হয়। এই প্রস্তাব ও সম্মতির ক্ষেত্রে শব্দ না হয়ে এই অর্থজ্ঞাপক কোন কর্মও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে।[৭]

সুতরাং যে কোন ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্যে প্রথম লক্ষ্য করতে হবে ঈজাব-কবূল হয়েছে কিনা। অতঃপর তার শর্তাবলী। যদি চার শ্রেণীতে বিভক্ত সকল শর্ত পাওয়া যায় তাহলে সে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ বৈধ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বা হালাল হওয়ার জন্য শরী'আত আরোপিত সকল প্রকার রুকন ও শর্তাবলীর আলোকে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। যদি এসবের সমন্বয় ঘটে, তবেই তা أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ। 'আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন'-এর অন্তর্ভুক্ত ও বৈধ বলে অনুসৃত হবে। অন্যথ্যায় তা হবে অবৈধ ও হারাম।

নগদ লেনদেনে ক্রয়-বিক্রয়

লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনই সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক স্বচ্ছ পদ্ধতি। নগদ মূল্য ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নিঃসন্দেহে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১) তবে এই বৈধতার জন্য বেচাকেনা বৈধতার যেসব শর্ত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলো অবশ্য পালনীয়। সুতরাং সেসব শর্তের আওতায় থেকেই নগদ সকল প্রকার লেনদেন সম্পাদিত হতে হবে।

বাকি বিক্রয়

ইসলামের দৃষ্টিতে বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে বৈধ। তবে শর্ত হলো, মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারিত থাকতে হবে।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ইয়াহূদীর কাছ থেকে বাকিতে কিছু খাবার খরিদ করেছিলেন এবং বিনিময়ে তাঁর (সা) একটি লৌহবর্মও সেই ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।[৮]

মুরাবাহাহ্—মুনাফাভিত্তিক লেনদেন

'মুরাবাহাহ্' শব্দটি 'রাবহুন' শব্দ থেকে উদ্‌গত। অর্থ অতিরিক্ত, বাড়তি, লাভ ইত্যাদি

পরিভাষায় কোন বস্তুকে ক্রয়কৃত মূল্যের চাইতে অধিক মূল্যে (বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে) বিক্রি করাকে 'মুরাবাহাহ্' বলা হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ শরী'আত সমর্থিত লেনদেন।[৯]

সন্দেহ নেই এটি একটি অতীব প্রচলিত লেনদেন। ব্যবসায়িক জগতে এর প্রয়োজন অত্যাধিক। কারণ, মানুষ লেনদেন করেই লাভবান হওয়ার জন্যে। ইসলাম লাভবান হওয়ার জন্য এ পথকে উন্মুক্ত রেখেছে বরং সুশৃঙ্খল করেছে কয়েকেটি শর্ত আরোপের মাধ্যমে। আমাদের হানাফী মাযহাবমতে, মুরাবাহা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত দুটি। যথা : উভয় শর্তের বর্ণনার জন্য হাওয়ালার প্রয়োজন।

এক. মাবী' বা বিক্রিত বস্তুটি মুদ্রা জাতীয় হতে পারবে না। যেমন দু'টি স্বর্ণ মুদ্রাকে দুইশ' বিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করল। পুনরায় এই দু'টি মুদ্রাকেই বিক্রি করল পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা লাভে। অর্থাৎ দুইশ' পঁচিশটি মুদ্রায়। এটি জায়িয হবে না। কারণ, মুদ্রা নির্ধারিত করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। তখন এই নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাধার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

এই জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রেতা যখন বিক্রিতব্য বস্তুর দাম বর্ণনা করবে, তখন ব্যবসায়িক রেওয়াজ সমর্থিত খরচাদিও মূল দামের সাথে যোগ করে বলতে পারে। যেমন কাপড় রঙানো খরচ, সেলাই করার খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি।

দুই. মুরাবাহা বৈধ হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো, প্রথম যে দামে জিনিসটি খরিদ করা হয়েছিল সেই দামটি 'মিসলী' হতে হবে। মিসলী অর্থ যার তুলনা বা সমমানের বস্তু সহজলভ্য। যেমন টাকা-পয়সা। অনুরূপভাবে বাটখারার পরিমাপ ও পাত্রবিশেষের পরিমাপ অনুরূপ সংখ্যার পরিমাপেও বিক্রি জায়িয আছে যদি তা কাছাকাছি মাপের হয়। যেমন : দশ টাকায় কেনা একটি জিনিস বার টাকায় বিক্রি করল, অথবা দশ সের চালের বিনিময়ে কেনা একটি বস্তু বার সের চালের বিনিময়ে বিক্রি করল। কিংবা দশ টুকরির (পাত্র বিশেষ) বিনিময়ে কেনা জিনিস বার টুকরির বিনিময়ে বিক্রি করলে এটা বৈধ। তবে সংখ্যা জাতীয় মূল্যের ক্ষেত্রে যদি বস্তুর পারস্পরিক ব্যবধানটা অসামান্য হয় যেমন প্রাণীর বিনিময়ে কিছু বিক্রি করা, সে ক্ষেত্রে অবশ্য অতিরিক্ত আরও দু'টি শর্ত আছে। এক. প্রথম বিক্রির মূল্য আর দ্বিতীয় বিক্রির মূল্য একই বস্তু হতে হবে। দুই. লাভের পরিমাণ জানা থাকতে হবে। যেমন : বকর রাশেদের কাছ থেকে একটি ছাগলের বিনিময়ে একটি কাপড় খরিদ করল। তারপর উমর কোন উপায়ে সেই ছাগলটির মালিক হয়ে গেল এবং এই ছাগলটি ও অতিরিক্ত দশ টাকার বিনিময়ে বকরের (এই ছাগলের বিনিময়েই) সদ্য কেনা কাপড়টি খরিদ করল এটা জয়িয। কিন্তু যদি অন্য একটি ছাগলের বিনিময়ে বলে, তাহলে বৈধ হবে না। কারণ, দু'টি ছাগলের পারস্পরিক ব্যবধান অনেক এবং প্রাকৃতিক। অনুরূপ কত টাকা লাভ দিবে তা না বলে, যদি বলে দামের শতকরা পাঁচ টাকা লাভ দিবে, তাও হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মূল্য অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। যা কিনা পরবর্তীতে ঝগড়াঝাটির কারণ হতে পারে।[১০]

মুরাবাহাহ্ বা মুনাফাভিত্তিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি লেনদেন সমাপ্ত হবার পর বিক্রেতার মিথ্যা বা ধোঁকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্য ক্রেতা ইচ্ছা করলে ক্রয়কৃত সামান ফেরত দিতে পারে এবং বিক্রেতা তা ফেরত নিতে বাধ্য। কিন্তু সামান নিতে চাইলে ক্রেতাকে পরিপূর্ণ মূল্য দিয়েই নিতে হবে। কারণ, এটা মুনাফাভিত্তিক লেনদেন। সুতরাং ধরা হবে বিক্রেতা

মিথ্যার আশ্রয়ে অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ করতে চেয়েছে। এখানে অপরাধ শুধু মিথ্যা বলাটা। অতিরিক্ত লাভ চাওয়াটা অপরাধ নয়।[১১]

হুকূক (স্বত্ব) বিক্রয় (শেয়ার, লাইসেন্স, রয়্যালটি, সুনাম)

'হুকূক' হক্-এর বহুবচন। 'হক্' অর্থ স্বত্ব-অধিকার। বর্তমান যুগে অনেক স্বত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। যেগুলোর লেনদেনও হচ্ছে নিয়মিত। আধুনিক আইনে এর কোনটিকে অনুমোদন করে আবার কোনটিকে অনুমোদন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধরনের হুকুকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হল।

হুকূকে মুজাররাদাহ্

যে সকল স্বত্বের বিনিময় গ্রহণ বা বিক্রিকরণ সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদগণ আলোচনা করেছেন এগুলো দুই প্রকার :

১. শর'ঈ হুকূক—অর্থাৎ যে সকল স্বত্ব সরাসরি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত।

২. উরফী হুকূক—অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত স্বত্ব এবং শরী'আতও যেগুলোকে নিষেধ করেনি। এই উভয় প্রকার স্বত্বই আবার দুই প্রকার : স্বত্বাধিকারীদেরকে বিপদমুক্তকরণের লক্ষ্যে অনুমোদিত এবং প্রকৃত অর্থেই শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত।

স্বত্বাধিকারীদেরকে নিরাপত্তা বিধান ও সমস্যামুক্ত রাখার লক্ষ্যে শরী'আত অনুমোদন দেয় এমন হুকূকের উদাহরণ হলো, হক্বে শুফ্'আ। অবাঞ্ছিত কেউ এসে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিতে না পারে, সে জন্যেই এই ব্যবস্থা। প্রকৃত অর্থেই শরী'আত অনুমোদন করে এমন হক্ আবার কয়েক প্রকার :

(ক) যে কোন বস্তু থেকে উপকার লাভের অধিকার, যেমন রাস্তায় চলার অধিকার, (খ) পানি পাওয়ার অধিকার, (গ) পানি প্রবাহিত করার অধিকার, (ঘ) প্রথমে কব্জা বা হস্তগত করার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার, (ঙ) লেনদেনের ফলে প্রতিষ্ঠিত অধিকার।

হুকূকে শরীয়াহ্

শরী'আত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অধিকার যেমন মীরাস বা কিসাস সূত্রে প্রতিষ্ঠিত স্বত্ব, স্ত্রীর সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণের অধিকার ইত্যাদি। একে হুকূকে জরুরীয়্যাহ্ও (অত্যাবশকীয় স্বত্ব) বলা হয়। যেমন হককে শুফ্'আ।

হুকূকে শরীয়াহ্ ও জরুরিয়্যাহ্র কোনটিরই বেচাবিক্রি জায়িয নেই। এখানে হুকূকে মুজাররাদার কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করা গেল।[১২]

রচনা ও প্রকাশনা স্বত্ব ও তার বিক্রি

যে ব্যক্তি কোন জিনিস আবিষ্কার করে বা রচনা করে, সেই তার স্বত্বাধিকারী হয়। তার আবিষ্কৃত বস্তুর প্রস্তুতকরণ ও বাজারজাতকরণের অধিকার একমাত্র তার। এই আবিষ্কারক বা রচয়িতা অনেক সময় আবার এই আবিষ্কৃত জিনিসের স্বত্বটি বিক্রি করে দেয়। তখন তার ক্রেতা সেই জিনিসের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অধিকার লাভ করে। অনেক সময় বইপত্র রচনার ও সংকলনের ক্ষেত্রেও এই স্বত্ব অন্যের কাছে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এখন প্রশ্ন হল আবিষ্কার, সৃষ্টি ও প্রকাশনার স্বত্বকে শরী'আত সমর্থন করে কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যে ব্যক্তি কোন জিনিস সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে চাই তা বস্তু হোক বা না হোক, অন্যান্য মানুষের তুলনায় সেই এর উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অধিক হক্‌দার। হযরত আসমার ইব্‌ন মুদাররাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "মুসলমানরা এখনও কদম রাখেনি এমন জিনিসের প্রতি যে প্রথম যাবে সেই তার অধিকারী হবে।"[১৩]

এ কথা যখন প্রমাণিত হলো, আবিষ্কার একটি শরী'আত সমর্থিত স্বত্ব। যে ব্যক্তি কোন জিনিসের আবিষ্কার করবে সেই তার সর্বাধিক হক্‌দার। অধিকন্তু যদি এই স্বত্ব সরকারি নিবন্ধীকরণ করিয়ে নেওয়া হয় যা ব্যয়সাধ্য একটি ব্যাপার, তখন এই আবিষ্কার ও প্রকাশনা স্বত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারি স্বত্বের মর্যাদা লাভ করে। এ কারণেই সমকালীন আলিমগণের একটি বিরাট অংশ এই স্বত্বের বিক্রিকে বৈধ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মাওলানা আবদুর হাই লক্ষ্ণৌবীর শাগরিদ মাওলানা ফতেহ্ মুহাম্মদ লক্ষ্ণৌবী, মাওলানা মুফ্‌তী কিফায়াতুল্লাহ্, মাওলানা মুফ্‌তী নিযামুদ্দীন (মুফ্‌তী দারুল উলূম দেওবন্দ), মাওলানা মুফ্‌তী আবদুর রহীম লাজপূরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৪]

শেয়ার লাইসেন্স : সূচনা ও তাৎপর্য

'শেয়ার' আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি নয়া সংযোজন। প্রাচীনকালে 'শিরকাত' বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসার রেওয়াজ ছিল। কয়েক সদস্য মিলে একত্রে ব্যবসা করত তখনকার লোকেরা। বর্তমানে যেটাকে 'পার্টনারশিপ ব্যবসা' বলে। কিন্তু বিগত দুই শতাব্দী ধরে ব্যবসার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে যাকে 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' বলে। আর এখান থেকেই শেয়ার বিক্রির উদ্ভব হয়।

কোম্পানীর শেয়ারকে আরবী ভাষায় 'সাহ্‌ম' বলা হয়। শেয়ার মূলত কোম্পানীর মালে শেয়ার হোল্ডারের মালিকানার সুষম অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন কেউ যদি শেয়ার কিনে তবে শেয়ার সার্টিফিকেটের কাগজটি কোম্পানীতে তার মালিকানার বিশেষ অংশের পরিচায়ক। সুতরাং শেয়ার ক্রয়ের ফলে ক্রেতা কোম্পানীর সহায়-সম্পদের অংশবিশেষের মালিক বলে বিবেচিত।

আগের যমানায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি ছিল ছোট ও সংকীর্ণ। দু'চারজন পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। কিন্তু বড় ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানা গড়ার জন্য যে বিরাট অংকের পুঁজির প্রয়োজন তা অনেক সময় গুটি কতক লোকের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না। আর সে কারণেই কোম্পানী সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে প্রচলিত নিয়ম হলো, যখন কোন কোম্পানী আত্মপ্রকাশ করে, সর্বপ্রথম তারা তাদের সংগঠন কাঠামো ও নিয়মাবলী প্রকাশ করে এবং শেয়ারসমূহ চালু করে। শেয়ার চালু করার অর্থ হলো কোম্পানী কর্তৃক জনগণকে কোম্পানীতে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান। কোম্পানী গঠিত হওয়ার পর তারা বাজারে শেয়ার চালু করে এবং জনগণকে তা ক্রয়ের আহবান জনায়। এতে শেয়ার ক্রেতা সেই কোম্পানীর কায়-কারবারে অংশীদার হয়ে যায়। সাধারণত এটাকে শেয়ার ক্রয় বলা হয়। কিন্তু শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা ক্রয়-বিক্রয় নয়। কারণ, শেয়ার ক্রয় করার পর এর বিনিময়ে কোন মাল-সামান সামনে পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা কোম্পানী এখনো কাজ-কারবার শুরু করেনি। কোম্পানী এখন গঠিত হচ্ছে মাত্র।

সারকথা, যেভাবে দু'চারজন একত্রিত হয়ে সমন্বিত পুঁজির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে, তেমনি কোম্পানীও জনগণের একটি বিশাল অংশকে সাথে নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করে। এভাবেই শেয়ার ক্রেতা কোম্পানীর একজন অংশীদার হয়ে যায়। আর শেয়ার সার্টিফিকেট মূলত সেই অংশীদারিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। এটাই শেয়ারের হাকীকত ও তাৎপর্য।[১৫]

নতুন কোম্পানীর শেয়ারের হুকুম

কোন কোম্পনী যখন সর্বপ্রথম শেয়ার ছাড়ে, তখন একটি শর্তের সাথে সেই শেয়ার ক্রয় করা বৈধ। শর্ত হলো, কোম্পানী কোন হারাম কারবার শুরু করছে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। কিন্তু হালাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শেয়ার ছাড়া হলে যেমন : টেক্সটাইল কোম্পানী, অটো মোবাইল কোম্পানী, তাহলে এসব কোম্পানীর শেয়ার কেনা সম্পূর্ণভাবেই বৈধ।[১৬]

শেয়ার হোল্ডারগণ বিভিন্ন সময়ে স্টক মার্কেটে নিজ নিজ শেয়ার বিক্রি করে থাকে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এসব ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী

কোন ব্যক্তি যদি স্টক মার্কেট থেকে শেয়ার খরিদ করতে চায় তাহলে অবশ্যই শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চারটি শর্ত লক্ষণীয়—

১. প্রথম শর্ত হলো, সে কোম্পানী কোনরূপ হারাম কারবারে জড়িত না থাকা। যেমন : সুদভিত্তিক ব্যাংক না হওয়া, সুদ বা জুয়াভিত্তিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী না হওয়া, মদের কোম্পানী না হওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ হারাম কারবারে জড়িত কোন কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করা কোন অবস্থাতেই জায়িয নেই। প্রথম শেয়ার ছাড়ার সময়ও জায়িয নেই এবং পরবর্তীতে স্টক মার্কেট থেকেও জায়িয নেই।

২. দ্বিতীয় শর্ত হলো, কোম্পানীর সকল অর্থ সম্পদ নগদ টাকা না হওয়া। বরং কিছু স্থাবর সম্পত্তি থাকতে হবে। যেমন : বিল্ডিং নির্মাণ করে নেওয়া, জমি খরিদ করে নেওয়া ইত্যাদি। সুতারাং যদি কোম্পানীর কোন স্থাবর সম্পদ না থাকে, বরং তার সকল সম্পদ নগদ টাকা হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় এই কোম্পানীর শেয়ারসমূহ ভেল্যু (মূল দাম) থেকে কম বা বেশি দামে বিক্রি করা জায়িয হবে না।

কারণ, এই কোম্পানীতে বিনিয়োগকৃত অর্থদ্বারা কোন স্থাবর সম্পত্তি ইমারত বা মেশিন-পত্র খরিদ করা হয়নি; বরং বিনিয়োগকৃত সকল অর্থ নগদরূপে আছে। এমতাবস্থায় দশ টাকার শেয়ার দশ টাকারই প্রতিনিধিত্ব করছে, ঠিক যেমন দশ টাকার বন্ড দশ টাকার প্রতিনিধিত্ব করে বা দশ টাকার নোট দশ টাকার পরিচয় বহন করে। সুতরাং দশ টাকার শেয়ার যখন দশ টাকার প্রতিনিধিত্ব করছে এ সূত্রে এ শেয়ারকে এগার টাকা বা নয় টাকা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয হবে না। কেননা এটা দশ টাকার নোটকে এগার টাকা বা নয় টাকায় বিক্রি করারই নামান্তর হবে, যা সুদ হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হারাম।

অবশ্য যদি কোম্পানীর কিছু মাল স্থাবর হয়, যেমন কাঁচামাল ক্রয় করে নিল বা বিল্ডিং নির্মাণ করল, তাহলে দশ টাকার শেয়ারকে কমবেশি দামে বিক্রি করা জায়িয হবে।

৩. তৃতীয় শর্ত, এ শর্তটি বোঝার পূর্বে আরেকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। তা হলো, বর্তমানে যত শেয়ার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তন্মধ্যে অধিকাংশ কোম্পানীর বুনিয়াদী কায়-কারবার অবৈধ নয়। তবে কোন কোন কোম্পানী দু'ভাবে সুদী কারবারের সাথে জড়িত হয়।

এক. এ কোম্পানীর সমুদয় ফান্ড বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ নেয়। দুই. কোম্পানীগুলো তাদের সঞ্চয়ী টাকা সুদী একাউন্টে জমা রাখে এবং এর উপর ব্যাংক থেকে সুদ গ্রহণ করে এবং এটাও আয়ের একটা অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।

এই ধরনের কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ আছে। উলামায়ে কিরামের এক জামাতের মতে কোন মুসলমানের জন্য এই ধরনের কোম্পানীর সাথে কারবারে জড়িত হওয়া জায়িয নেই। কারণ, এই কোম্পানীগুলো হারাম কাজে জড়িত। অতএব যখন কেউ এই কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করল তখন সে কার্যত এই কারবারে অংশীদার হয়ে গেল। তাই উলামায়ে কিরামের মতে এ ধরনের কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা জায়িয নেই যতক্ষণ না সুদ গ্রহণ বা প্রদান বর্জন করে।

উলামায়ে কিরামের দ্বিতীয় জামাতের মত হল, যদিও উক্ত কোম্পানীগুলোর মধ্যে এই ত্রুটি পাওয়া যায়, তবুও যদি কোন কোম্পানীর বুনিয়াদি কারবার হালাল হয় তাহলে দুই শর্তের ভিত্তিতে এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা যেতে পারে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) ও হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র) এই মত পোষণ করেছেন। মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ তকী উসমানী বলেন, এই মতটি সঠিক মনে হয়। শর্ত দু'টি হলো—এক. শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানীর অভ্যন্তরে থেকে সুদী কারবারের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভূমিকা নিবে।

৪. চতুর্থ শর্ত, এটি তৃতীয় শর্তের দ্বিতীয় অংশও বটে। তাহলো ডিভিডেন্ড (লভ্যাংশ) ভাগ হওয়ার পদ্ধতি। উক্ত ব্যক্তি আয়ের বিবরণীর মাধ্যমে জেনে নিবে যে, আমদানির শতকরা কত অংশ সুদী ডিপোজিট থেকে অর্জিত হয়েছে। যেমন ধরা যাক, উক্ত কোম্পানীর আয়ের শতকরা পাঁচভাগ সুদী ডিপোজিটে টাকা রাখার দ্বারা অর্জিত হয়েছে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার মুনাফা শতকরা পাঁচভাগ গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দিবে।

সুতরাং কোম্পানীর আসল কারবার যদি হালাল হয় কিন্তু কোম্পানী ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে কিংবা অতিরিক্ত টাকা সুদী একাউন্টে জমা রেখে সুদ গ্রহণ করে থাকে, এই অবস্থায় উক্ত দুই শর্তের উপর আমল করা হলে এসব কোম্পানীর শেয়ারসমূহ ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ থাকবে।

মোটকথা, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হওয়ার শর্ত মোট চারটি : ১. মূল কারবার হালাল হওয়া, ২. কোম্পানীর কিছু সম্পদ স্থাবর হওয়া, ৩. কোম্পানী সুদী লেনদেন করলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, ৪. লভ্যাংশ ভাগ হওয়ার সময় সুদ ডিপোজিট থেকে প্রাপ্ত অংশ গরীব ও মিস্‌কীনকে দিয়ে দেওয়া।[১৭]

শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য

বর্তমান স্টক মার্কেটে সাধারণত দুই উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়—১. কিছু লোক পুঁজি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে শেয়ার খরিদ করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, শেয়ার খরিদপূর্বক কোম্পানীর অংশীদার হওয়া এবং ঘরে বসে এর বাৎসরিক মুনাফা ভোগ করা। এমন ব্যক্তিদের জন্য উল্লিখিত চারটি শর্তসহ শেয়ার খরিদ করা জয়িয। ২. আবার কিছু লোক এমনও আছে যাদের উদ্দেশ্য হল ক্যাপিট্যাল গেইন তথা পুঁজি সঞ্চয়। তারা পূর্ব থেকে অনুমান করে এমন কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করে যার শেয়ারের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব বেশি এবং দাম বাড়ার সাথে সাথেই তা বিক্রি করে মুনাফা লাভ করে। কিংবা কোন কোম্পানীর শেয়ার মূল্য হ্রাস

পাওয়ার পর তা খরিদ করে পরে তা চড়া দামে বিক্রি করে। এভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই মুনাফা অর্জন তাদের লক্ষ্য থাকে। বাৎসরিক মুনাফা অর্জন তাদের লক্ষ্য নয়। মূলত তারা মূল শেয়ারটাকেই বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে লেনদেন করে। প্রশ্ন হল শরী'আতের দৃষ্টিতে এই পদ্ধতির অবকাশ কতটুকু ?

এ প্রশ্নে জবাব হলো, যেভাবে শেয়ার খরিদ করা জায়িয তেমনি তার বিক্রিও জায়িয। তবে অবশ্যই উল্লিখিত চারটি শর্ত মেনে চলতে হবে। অবশ্য এই জায়িয বলার ক্ষেত্রে একটি সমস্যাও আছে। তা হলো, স্টক এক্সচেঞ্জে অনেক সময় কোম্পানীগুলোর পারস্পরিক ডিফারেন্স বরাবর করার উদ্দেশ্যে লেনদেন হয়। শেয়ারের উপর কোন প্রকার কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং তা উদ্দেশ্যও হয় না। এ শুধুমাত্র জুয়া ও প্রতারণা। শরী'আতে এর কোন অবকাশ নেই।[১৮]

সরবরাহ করার পূর্বেই শেয়ার বিক্রি করা : এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, শেয়ার সরবরাহ এবং হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা জায়িয কিনা? অনেক সময় দেখা যায়, কোম্পানী শেয়ার কেবলমাত্র বাজারে ছেড়েছে, এখনও প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। অথচ এর শেয়ারগুলো কয়েক দফা বিক্রি হয়ে গেছে।

এ প্রশ্নের জবাব বোঝার পূর্বে একটি মূলনীতি বুঝতে হবে। মূলনীতিটি হলো, কোন জিনিস হস্তগত হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা জায়িয নেই। তবে কজা করার ক্ষেত্রে সর্বদাই বাস্তবভাবে (ফিজিক্যাল পজিশন) কজা আবশ্যক নয়; বরং হুক্‌মী তথা আইনগত কজাও যথেষ্ট।

শেয়ার হস্তগত হওয়ার অর্থ : মনে রাখতে হবে শেয়ার সার্টিফিকেট কোন শেয়ার নয়; বরং কোম্পানীর অভ্যন্তরে বিশেষ অংশের মালিকানার নাম শেয়ার। আর সার্টিফিকেট পত্রটি তারই প্রমাণমাত্র। সুতরাং মনে করুন, কোম্পানীতে এক ব্যক্তির মালিকানা নিশ্চিত হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও সে সার্টিফিকেট লাভ করেনি। তবুও সে ব্যক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে উক্ত কোম্পানীর বিশেষ অংশের মালিক হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন : কেউ একটি গাড়ি কিনেছে এবং ক্রেতার নিকট তা পৌঁছে গেছে। কিন্তু যার কাছ থেকে তা ক্রয় করা হয়েছে এখনও গাড়িটি তার নামেই রেজিস্টার্ড আছে। এখন গাড়িটি যেহেতু ক্রেতার হাতে পৌঁছে গেছে, তাই ক্রেতার নামে কেবল রেজিস্টার্ড না হওয়ার কারণেই বলা যাবে না যে, গাড়িটি পরিপূর্ণভাবে ক্রেতার হস্তগত হয়নি। এমনিভাবে শেয়ার সার্টিফিকেটটিও মূলত রেজিস্টার্ড গাড়ির মত। কারণ শেয়ার কোম্পানীর যে অংশটির মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তো কোম্পানীতে গিয়ে তা উসূল করবে না। তাই সে অংশটা তার মালিকানায় আসার অর্থ হলো, সে অংশের লাভ-লোকসান ও দায়-দায়িত্বে হক্‌দার হওয়া।

যেমন, কেউ আজকে স্টক মার্কেট থেকে একটি শেয়ার ক্রয় করল। এখনও সার্টিফিকেট পায়নি। ইতোমধ্যেই যে কোনো দুর্যোগে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন ক্ষতিটা কার হল? ক্ষতিটা যদি ক্রেতারও হয়ে থাকে তাহলে মনে করতে হবে শেয়ার ক্রেতার রিস্কে এসে গেছে। এ অবস্থায় ক্রেতা শেয়ার বিক্রি করতে পারবে। আর ক্ষতি ক্রেতার না হয়ে যদি বিক্রেতার হয় তাহলে মনে করতে উক্ত শেয়ার ক্রেতার রিস্কে আসেনি। এই অবস্থায় শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রেতার হাতে না আসা পর্যন্ত সে তা বিক্রি করতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, শেয়ার বিক্রি করার সাথে সাথে রিস্ক ট্রান্সফার হয় কিনা। তা বলা মুশকিল। এটা বরং সংশ্লিষ্টরাই বলতে পারবেন। তবে উপরোল্লিখিত মূলনীতির আলোকে

এখন যে কেউ এর ফায়সালা করতে পারবে। অবশ্য সর্বাবস্থায় উত্তম হলো, সরবরাহ না পাওয়া পর্যন্ত বিক্রি না করা।

চেঞ্জ-এর ক্রয়-বিক্রয় জায়িয নেই : স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের আরেকটি নিয়ম আছে। যাকে চেঞ্জ বলা হয়। এটিও অর্থ বিনিয়োগের একটি নিয়ম। এর পদ্ধতি হলো শেয়ারের মালিক নগদ টাকার প্রয়োজনে কারো কাছে শেয়ার নিয়ে যায় এবং তাকে বলে, আজ এই শেয়ারগুলো আমি এত টাকার বিনিময়ে আপনার কাছে বিক্রি করছি। এক সপ্তাহ পর এর চাইতে বেশি মূল্যে আবার খরিদ করে নিব। ঠিক যেন বিক্রেতা শর্ত করে নিল যে, এ শেয়ারগুলো আরও অধিক মূল্যে তাকে ফেরত দিতে হবে। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের বেচা-বিক্রি জায়িয আছে কি? শরী'আতের স্পষ্ট ফায়সালা-জায়িয নেই। কারণে,শরী'আতের স্পষ্ট মূলনীতি হলো, বেচাকেনায় এমন কোন শর্তারোপ জায়িয নেই যা মূল বেচাকেনার পরিপন্থী। উল্লিখিত অধিক মূল্যে পুনঃবিক্রির একটি শর্ত ফাসেদ বা হারাম শর্ত। সুতরাং চেঞ্জ-এর এই বেচাকেনা সম্পূর্ণই অবৈধ।[১৯]

শেয়ারের উপর যাকাতের বিধান : শেয়ার মূলত কোম্পানীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান অংশ বিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং কেউ যদি ক্যাপিটাল গেইন অর্থাৎ শেয়ার বিক্রি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে, বাৎসরিক মুনাফা লাভ তার উদ্দেশ্য না হয়, এই অবস্থায় শরী'আতের দৃষ্টিতে ভ্যালু অনুযায়ী এর শেয়ারসমূহের যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি বাৎসরিক মুনাফা হাসিলই আসল লক্ষ্য হয় এবং মনে মনে এই খেয়াল থাকে যে, ভাল দাম পেলে আগেই বিক্রি করে দিব, এই অবস্থায় শেয়ারসমূহের মার্কেটে ভ্যালুর কেবল ঐ অংশের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে যেটা যাকাতযোগ্য মালের মুকাবিলায় হবে। বিষয়টি এমন—

ধরা যাক, শেয়ার মার্কেটে ভ্যালু ১০০ টাকা। এর মধ্যে ৬০ টাকা বিল্ডিং ও মেশিনারীর মুকাবিলায়। ৪০ টাকা কাঁচামাল, উৎপাদিত দ্রব্য এবং নগদ টাকার মুকাবিলায়। এখানে যেহেতু এ শেয়ারের ৪০ টাকা যাকাতযোগ্য অংশসমূহের মুকাবিলায়, সেহেতু শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে ৪০ টাকার যাকাত আদায় ওয়াজিব। বাকি ৬০ টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

নিম্নের সারণীতে তা দেখানো হলো :

যেসব মালে যাকাত নেই		যাকাতযোগ্য			মোটকথা
		যাকাতযোগ্য মাল		নগদ	
বিল্ডিং ৩০%	মেশিনারী ৩০%	উৎপাদিত মাল ১৫%	কাঁচামাল ১৫%	১০%	১০০%

মোটকথা, যাকাতযোগ্য মালের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের কাঁচামালের মূল্যে এবং নগদ টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে। আর নগদ টাকার মধ্যে ব্যাংক ব্যালেন্স, শেয়ার, প্রাইজবন্ড, ডিফেন্সসেভিং সার্টিফিকেট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে। বন্ড ও সার্টিফিকেটের মার্কেট ভ্যালু ধরে হিসাব করা হবে এবং এ বিধান শুধু শেয়ারের ক্ষেত্রে নয়; বরং প্রত্যেক কারবারে উল্লিখিত জিনিসগুলো যাকাতযোগ্য সম্পদ বলেই গণ্য হবে। তবে বিল্ডিং ও মেশিনারী যাকাতের যোগ্য সম্পদ নয়।[২০]

সুনাম (Goodwill)

বর্তমানে ব্যবসায়ের সুনাম ও ট্রেডমার্ক বিক্রির বিষয়টিও সংযোজিত হয়েছে। এক ব্যবসায়ী বা কোম্পানী মাল তৈরি করে পরিবেশন করে দেশ-বিদেশ রপ্তানি করে। একই জিনিস যেহেতু বৈশিষ্ট ও গুণাবলির ব্যবধানের কারণে অনেক পার্থক্য হয়ে যায়। ক্রেতারা যখন দেখে বাজারে অমুক ব্যবসায়ীর বা কোম্পানীর সুনাম রয়েছে, তখন তা ক্রয় করতে আগ্রহী হয়। ফলে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে ব্যবসায়ের এই সুনাম ও ট্রেডমার্ক একটি মূল্যবান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই জাতীয় সুনামসম্পন্ন মাল কিংবা আকর্ষণীয় ট্রেডমার্কযুক্ত পণ্য অধিক মুনাফা বয়ে আনে। কোম্পানীর ট্রেডমার্ক ও ব্যবসায়ীর সুনামের নকল প্রতিরোধের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে তা রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এক কোম্পানীর ট্রেডমার্ক অন্য কোম্পানীর জন্যে, এক ব্যবসায়ীর দেওয়া নাম অন্য ব্যবসায়ীর জন্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে এই রেজিস্ট্রিকৃত নাম ও ট্রেডমার্ক এক স্থূলমূল্যসম্পন্ন পণ্যের মর্যাদা লাভ করেছে এবং ব্যবসায়ী অঙ্গনে এখন এই নাম ও ট্রেডমার্কের বেচাকেনা শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, এই ধরনের বেচাকেনা শরী'আত সমর্থন করে কী? বলা বাহুল্য, নাম কিংবা ট্রেডমার্ক কোন মাল নয়, স্থূলবস্তু নয়; বরং এটা হলো, এই নাম ও মার্ক ব্যবহারের অধিকারমাত্র। মূলত এটা স্বত্বাধিকারীর জন্য অগ্রগামিতার স্বত্ব এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারি রেজিস্ট্রেশনের কারণে। এটা এখন বিদ্যমান, তবে ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুত নয়। স্থানান্তরযোগ্য বা বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত নয়। ফিকহ্‌বিদগণের মূলনীতি অনুসারে এর বেচাকেনা জায়িয নেই, তবে বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, যেভাবে মালের বিনিময়ে চাকুরি ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু বিক্রি করা যায় না। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এই ফাতোয়াই দিয়েছেন।[২১]

মাওলানা তকী উসমানী লিখেন—আমার মতে, যদি ব্যবসায়ী সুনাম ও ট্রেডমার্ক সাধারণ স্বত্বসম; এর রেজিস্ট্রেশন করতে সরকারের দফতরে প্রচুর ছোটাছুটি করতে, পয়সা খরচ করতে হয়। আর এসবের পরে এটা একটা কানুনী বা আইনগত মর্যাদা লাভ করে। রেজিস্ট্রেশনের পর প্রাপ্ত সরকারি সার্টিফিকেটই যার প্রমাণ। আর এতসব সিঁড়ি অতিক্রান্ত করার পর এর স্বত্ব স্থিতিশীল বস্তুর স্বত্বের মতই হয়ে যায়। আর ব্যবসায়ীর রেওয়াজ অনুযায়ী এটা সরাসরি বস্তুর মত হয়ে যায়। সুতরাং এর বেচাকেনা বৈধ হওয়া উচিত। কারণ, কোন কোন অবস্তু বস্তুর হুকুমের শামিল করার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার প্রভাব থাকে। কারণ আল্লামা ইব্‌ন আবিদীনের মতে, কোন জিনিসকে মানুষ মাল বলে গণ্য করলেই তা মাল হয়ে যায়। যেমন গ্যাস, বিদ্যুৎ অতীতকালে বস্তু ও মাল বলে গণ্য করা হতো না, এখন হয়। কারণ এগুলো মানুষ কব্জা ও করতে পারে না আবার কায়েম বিয্‌-যাত—সাধিষ্ঠও নয়। এরপরও মানুষের ব্যাপক উপকার ও রেওয়াজের ভিত্তিতে এগুলো দামী মাল হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে বেচাবিক্রি হচ্ছে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ী সুনাম ও ট্রেডমার্কও সরকারি খাতায় রেজিস্ট্রেশনের পর তা ব্যবসায়ীদের রেওয়াজ অনুযায়ী দামী বস্তু বলে বিবেচিত হয় এবং সরকারি সার্টিফিকেটের মাধ্যমে তার উপর কব্জাও সম্ভব হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন জিনিস 'মাল' হওয়ার যাবতীয় উপাদান এর মধ্যে আছে, শুধু এতটুকু বলা যায় এটা 'কায়েম বিয্‌-যাত' নয়। সুতরাং এর বেচাবিক্রি জায়িয হওয়া উচিত। তবে দু'টি শর্তের সাথে—১. সরকারিভাবে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হতে হবে, ২. ক্রেতার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা প্রচারিত হতে হবে যে, এখন থেকে এই মাল অমুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন

করবে। যেন ক্রেতাদের মধ্যে কোন আশংকার সৃষ্টি না হয়। সাথে সাথে পূর্বের মান বজায় রাখতেও সচেষ্ট হতে হবে।[২২]

ছাদের উপরে শূন্যস্থান বিক্রয়

বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে, ঘনবসতির কারণে ছাদের উপরের শূন্যস্থান বিক্রির একটি প্রথা চালু হয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এই বিক্রয় সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্যে মূল্যের বিপরীতে একটি সম্পদ বা সওদা থাকতে হয়। ভিন্ন ভাষায়, বিক্রিত বস্তুটি মাল হতে হয়। আর এমন বস্তুকেই মাল বলা যায় যা কব্জা করা যায় এবং যার সংরক্ষণ সম্ভব। পক্ষান্তরে ছাদের উপরের শূন্যস্থানের সম্পর্ক বাতাসের সাথে, ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে এক শূন্যস্থানে। যা মাবী' বা বিক্রিত বস্তু হওয়ার যোগ্য নয়। তাই এর বিক্রিও বৈধ নয়।[২৩]

হ্যাঁ, যদি কোন বিল্ডিং বহুতলবিশিষ্ট হয় তবে উপরের তলা, নিচতলা আলাদা আলাদা বিক্রি করা যেতে পারে। কারণ, বিল্ডিং-এর উপরের তলা বিক্রিযোগ্য, কব্জা ও সংরক্ষণযোগ্য বস্তু।[২৪]

ছাদের উপরের শূন্যস্থান বিক্রি অবৈধ হওয়ার একটি কারণ হলো, সাধারণত এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় অনর্থক ঝগড়ার সৃষ্টি করে। ঘরবাড়ি ছাড়া শুধু শূন্যস্থান বিক্রিরও রেওয়াজ রয়েছে। যেমন, একজনের কাছে মাটি থেকে দশ ফুট উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত বিক্রি করা হলো, অন্যজনের কাছে সেই দশ ফুট থেকে বিশ ফুট উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত বিক্রি করা হলো, একই কারণে এই ধরনের বেচাকেনাও অবৈধ।

মুশারাকা

মুশারাকা 'শিরকাত' শব্দ থেকে উদ্‌গত। আভিধানিক অর্থ (অংশীদারিত্ব) শরীক হওয়া। পরিভাষায় দুই ব্যক্তি কোন সম্পদে শরীক হওয়াকে 'মুশারাকা' বলা হয়। এর অনেক প্রকার রয়েছে :

প্রথমত, মুশারাকা দুই প্রকার : ১. শিরকাতে মিল্‌ক, ২. শিরকাতে উকূদ।

শিরকাতে মিলক বলা হয় কোন লেনদেন ছাড়াই দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন সম্পদের মালিক হয়ে যাওয়া। যেমন : মৃত ব্যক্তি মীরাসের অধিকারী হওয়া।

কোন বস্তু ও তার লভ্যাংশে অংশীদরিত্বের ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কৃত লেনদেনকে 'শিরকাতে 'উকূদ' বলা হয়।

শিরকাতুল মিল্‌কের সাথে সম্পৃক্ত জরুরী মাসাইল

যদি দুই ব্যক্তি একটি জমিতে শরীক হয় এবং একজন উপস্থিত থাকে আর অন্যজন থাকে অনুপস্থিত, তবে জমির জন্যে উপকারী হলে উপস্থিত ব্যক্তি পুরো জমিতে ফসল ফলাতে পারে। তবে অনুপস্থিত ব্যক্তি পরে প্রথম ব্যক্তির সমান সময় এই জমি চাষ করতে পারবে। কিন্তু যদি এই ফসল করাটা জমির জন্যে ক্ষতিকর হয় কিংবা না করাটা জমির জন্য উপকারী হয়, তবে উপস্থিত ব্যক্তি এই জমিতে কোন ফসল করতে পারবে না। যদি করে তাহলে জবর-দখলের আওতায় পড়বে। অনুপস্থিত ব্যক্তি এমতাবস্থায় উপস্থিত হয়ে পড়লে জমির নিজের অংশ বন্টন করে আলাদা করে নিবে বা ফসল কেটে ফেলে দিতে পারে। আর এ

ফসলের কারণে যে ক্ষতি হবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে প্রথম ব্যক্তি বাধ্য থাকবে। তবে ফসল যদি বড় হয়ে যায় এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান পূর্বক প্রথম ব্যক্তি ফসলও নিয়ে নিতে পারবে।

যদি দুই ব্যক্তি একটি বসতবাড়ির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মালিক হয় এবং তাদের একজন অনুপস্থিত থাকে তাহলে লক্ষ্য করতে হবে এই বাড়িতে বসবাস করাটা বাড়ির সব দরজার জন্যে ক্ষতিকর কিনা। যদি ক্ষতিকর না হয়ে বরং উপকারী হয়, তাহলে উপস্থিত ব্যক্তি পুরো বাড়িটাই ব্যবহার করতে পারে। আর যদি ক্ষতিকর হয় তাহলে বাড়ির কামরা ও অন্যান্য জায়গা ভাগ করে সে শুধু নিজের অংশটুকুই ব্যবহার করতে পারবে।[২৫]

যদি কোন ব্যক্তি তার সম্পদ অন্যজনের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ফেলে এমতাবস্থায় তাদের কেউই অপরজনের অনুমতি ছাড়া নিজের অংশ বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু যদি একত্রিত মিশ্রিত বস্তুর মীরাস সূত্রে দুই ব্যক্তি মালিক হয় তাহলে প্রত্যেকেই দ্বিতীয়জনের অনুমতি ছাড়াই নিজের অংশের মালিক হবে এবং বিক্রি করতে পারবে।

যদি দুই ব্যক্তি এমন বস্তুর মালিকানায় শরীক হয় যা বন্টনযোগ্য নয়। যেমন : নৌকা, কূপ, গাড়ি, পানি সেচের মেশিন, আটা পেষার মেশিন ইত্যাদি। এগুলোকে বন্টন করলে তার মূল কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি এই জাতীয় জিনিসের ক্ষেত্রে জিনিসটি সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এক শরীক সংস্কার করতে অসম্মত হয়, তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে বিষয়টি কাযীর দরবারে উত্থাপনের পূর্বেই সংস্কার করে ফেলা উচিত। কারণ এই জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে বিচারক শরীক ব্যক্তিকে সংস্কার সম্পর্কে সংবাদ দিবেন এবং তাকে আদেশ করবেন। যদি সে অসম্মত হয় তাহলে সম্মতজনকেই সংস্কার করতে বলবেন। তারপর অসম্মতজনকে তার অংশের খরচ আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে বলবেন। সুতরাং বস্তুটি সংস্কার না করে নষ্ট করার চাইতে পূর্বেই সংস্কার করে ফেলা উচিত।[২৬]

শিরকাতুল উকূদ

শিরকাতুল উকূদ তিন প্রকার : ১. শিরকাত বিল-মাল, ২. শিরকাত বিল-আবদান, ৩. শিরকাত বিল-উজুহ। এর প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার : মুফাওয়াযা ও ইনান।

শিরকাত বিল-মাল বলা হয়, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এই মর্মে ঐকমত্য হওয়া যে, তাদের প্রত্যেকেই একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ যোগান দিবে এবং অর্জিত লভ্যাংশে তাদের প্রত্যেকেরই একটি নির্ধারিত অংশ থাকবে।

শিরকাত বিল-আবদান বলা হয়, দুই কারিগর বা শ্রমিক এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, তারা উভয়ে মিলে বিনা পুঁজিতে কাজ করবে এবং উপার্জিত অর্থ উভয়ে বন্টন করে নিবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই অন্যজনের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হবে।[২৭]

শিরকাত বিল-উজুহ্ বলা হয়, এমন দুই ব্যক্তির যৌথ ব্যবসাকে যাদের কোন অর্থ নেই তবে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান আছে। মানুষ তাদের বিশ্বাসও করে। তারা এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, দুইজনেই বাকিতে মালপত্র খরিদ করবে। বিক্রি করে যা লাভ হয় দুইজনে বন্টন করে নিবে।

বাইয়ে মুশারাকার রুকন একটি। আর তা হলো, ঈজাব-কবূল। তবে তা মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়; বরং যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করলেই হয়ে যায়। তবে এই চুক্তি সম্পাদিত

হওয়ার পর একজনের অনুমতি ব্যতীত অন্যজন বিক্রি করতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন সময়সীমা নির্ধারিত থাকে তাহলে সেই সীমা অতিক্রান্ত হবার পর ক্রয় করলে তা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। যৌথ ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়, বাহন, বন্ধক ইত্যাদির ব্যাপারে সকল অংশীদারের সমান অধিকার থাকবে।

বাই'য়ে সালাম

'সালাম'-এর পরিভাষায় অর্থ হলো, সুনির্ধারিত সময় ও সম্পদের চুক্তিতে অগ্রীম মূল্য প্রদান করা।[২৮]

এর পদ্ধতি হলো, ফসল বা বিক্রিত পণ্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে নির্ধারিত পরিমাণ ফসল বা বিক্রিত পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট করে তা অগ্রিম প্রদান করা।

এ ধরনের লেনদেন শরী'আতে জায়িয। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ٠

হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য লেনদেন কর তখন তা লিপিবদ্ধ করে রেখো। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮২)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এখানে 'দায়ন' বা লেনদেন বলতে বাইয়ে' সালামকেই বুঝানো হয়েছে।

তদুপরি বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি বাইয়ে' সালামের লেনদেন করে, সে যেন নির্ধারিত কায়ল, নির্ধারিত ওজন ও নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে তা সম্পাদন করে।[২৯] তাছাড়া ইজ্মা (ঐকমত্য) দ্বারাও এর বৈধতা স্বীকৃত।

শর্তাবলী

বাইয়ে 'সালাম সহীহ্ হওয়ার বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। মূল লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত একটি শর্ত রয়েছে। আর তা হলো, লেনদেন করার সময় শর্ত থাকতে পারবে না। অর্থাৎ বিক্রিত পণ্য ফেরত দেওয়া-নেওয়া চলবে না।[৩০]

মূল্য বা পুঁজির সাথে সম্পৃক্ত শর্ত পাঁচটি : ১. বিনিময় হিসেবে যা দিচ্ছে তা কোন্ জাতীয় বস্তু তা বর্ণনা করে দেওয়া। যেমন : টাকা-পয়সা ইত্যাদি, ২. ফসল জাতীয় হলে তা কোন্ প্রকারের তা বর্ণনা করে দেওয়া। যেমন : গম বা যব ইত্যাদি, ৩. ভাল-মন্দ বা মাঝারী বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ থাকতে হবে, ৪. পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে, ৫. আলোচনার ঐ বৈঠকেই মূল্য হস্তগত হতে হবে।

বিক্রিত পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত শর্ত দশটি। এর মধ্যে চারটি হল বিক্রিত পণ্যের জিন্স (জাত), প্রকার, গুণাগুণ ও পরিমাণ পূর্বের ন্যায় উল্লেখ করা। আর বাকী ছয়টি হল : ১. বিক্রিত পণ্য বাকিতে প্রদান করতে হবে, ২. যে বস্তুর লেনদেন হচ্ছে তা বাজারে সহজলভ্য হতে হবে, ৩. বস্তুটি নির্ধারণযোগ্য হতে হবে, ৪. কোথায় তা হস্তান্তর করা হবে সে জায়গার নামও উল্লেখ থাকতে হবে, ৫. সুদের কোনরূপ কারণ এতে না থাকা, ৬. বাকিতে প্রদত্ত বস্তুটি চার প্রকারের যে কোন এক প্রকারের হতে হবে : (ক) মাকীলাত তথা বিশেষ পাত্রদ্বারা মাপা হয় এমন বস্তু, (খ) মাওযূনাত তথা পাল্লা দিয়ে মাপা হয় এমন বস্তু, (গ) মা'দূদাত তথা

সংখ্যায় পরিমাপ নির্ধারণ করা যায় এমন বস্তু। যদি বস্তুগুলোর পারস্পরিক ব্যবধান খুবই কাছাকাছি হয় তবেই এই তৃতীয় প্রকারে লেনদেন হতে পারে, অন্যথায় নয়, (ঘ) মাযরূ'আত তথা গজ বা মিটার হিসেবে পরিমাপযোগ্য বস্তু।[৩১]

অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মানবকল্যাণমূলক বাইয়ে' সালামের লেনদেনের এই ধারাটি যেন স্বচ্ছ ও বিবাদমুক্ত হয় এর জন্যে আরোপ করা হয়েছে উপরোক্ত শতসমূহ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ সকল শর্ত আরোপ করা না হলে এই লেনদেনের ক্ষেত্রসমূহ অস্পষ্টতার আশংকা ছিল। পরিণামে কেউ আর উৎসাহিত হবে না এই কল্যাণময় লেনদেনে। অবশেষে সমাজ বঞ্চিত হত উন্নতি ও সমৃদ্ধির এক বিশাল উৎস থেকে।

বাগ-বাগিচার ফলমূলের বেচাকেনা

বাগ-বাগিচার ফলমূল সাধারণত তিন অবস্থায় বেচাকেনা হয়ে থাকে : ১. গাছে ফল প্রকাশিত হওয়ার পূবেই বিক্রি করা, ২. খাওয়া ও ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা এবং ৩. খাওয়া ও ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পর বিক্রি করা।

প্রথম অবস্থায় ফলমূল বেচাকেনা করা নাজায়িয। খাওয়া ও ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে ফলমূল বিক্রি করলে যদি—(১) বিক্রির সময় এই শর্তে বিক্রি করা হয় যে, ক্রেতা কেনার সাথে সাথেই ফল কেটে নিয়ে যাবে, গাছে ঝুলিয়ে রাখবে না। তবে তা সর্বসম্মতভাবে জায়িয, (২) ব্যবহারযোগ্য হওয়া পর্যন্ত গাছেই থাকবে, এই শর্তে বিক্রি করা সকল ইমামের মতে নাজায়িয, (৩) কোনরূপ শর্ত ছাড়া বিক্রি করা, তা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জায়িয। তবে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে সাথে সাথেই ক্রেতাকে তা কেটে নিতে বাধ্য করতে পারবে।[৩২]

এরপর বিক্রিরও তিনটি অবস্থা আছে। যথা : ১. ফল কেটে ফেলার শর্তে বিক্রি করা করা, ২. গাছেই পাকা পর্যন্ত রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা এবং ৩. শর্তহীন বিক্রি করা।

হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, প্রথম ও তৃতীয় শর্ত জায়িয। কিন্তু দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা জায়িয নয়। তৃতীয় সুরতেও বিক্রেতা আদেশ করামাত্র ক্রেতা ফল কেটে নিতে বাধ্য থাকবে।[৩৩]

গাছের সমগ্র ফল এমন অবস্থায় বিক্রি করা যখন কিছু ফল প্রকাশিত হয়েছে আর কিছু এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে।এ অবস্থায় তা বেচাকেনা করার ব্যাপারে হানাফী ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ সরাসরি অবৈধ বলেছেন। আর কেউ বলেছেন, অধিকাংশ ফল প্রকাশিত হলে তা বৈধ হবে।

মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে বেচাকেনা

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, স্থাবর সম্পত্তি হস্তগত হওয়ার পূর্বেই বিক্রি জায়িয। তবে অস্থাবর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পূর্বে বেচাকেনা করা জায়িয নয়।[৩৪] অবশ্য এই হস্তগত হওয়ারও ব্যাখ্যা রয়েছে। হস্তগত হওয়ার অর্থ হলো, নিজের প্রাপ্য সুনির্ধারিত হয়ে যাওয়া। কাজেই সওদার প্রকৃতির ব্যবধানে এই হস্তগত হওয়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ব্যবধান ঘটবে। সওদা যদি সোনা-রূপা বা টাকা-পয়সা হয় তাহলে সারসরি হস্তগত হওয়ার দ্বারাই তা নির্ধারিত হবে। কারণ এগুলো মুখে বা ইশারায় চিহ্নিত করলে চিহ্নিত হয়। পক্ষান্তরে যদি চাল, ডাল, গম ইত্যাদি বস্তু হয়, তাহলে লেনদেনের সময় ক্রেতার অংশটা

ইশারা করে দেখিয়ে দিলেই তা চিহ্নিত ও তার হক নির্ধারিত হয়ে যায় এবং এতটুকুতেই লেনদেন পূর্ণতা লাভ করে। তারপর ইচ্ছা করলে সে তা বেচাবিক্রিও করতে পারে। কারণ, তার অংশ সুচিহ্নিত সুনির্ধারিত ও হস্তান্তর সম্ভব এবং হস্তান্তর করতে কোনরূপ সমস্যাও নেই।[৩৫] আর স্থাবর সম্পত্তি তো সর্বাবস্থায় স্থির ও চিহ্নিত। সুতরাং এর কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

ওয়াদি'আত—জমা রাখা

কোন বস্তু কারও কাছে হিফাযতের উদ্দেশ্যে জমা রাখা। পরিভাষায় বলা হয়, নিজের সম্পদ অন্যের কাছে স্পষ্ট ভাষায় কিংবা ইশারায় (পরোক্ষভাবে) সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা। যেমন কেউ বলল, এই জিনিসটি রাখুন এবং আমার জন্যে তা হিফাযত করুন। আর পরোক্ষভাবে (দালালাতান) ওয়াদি'আত হলো, কেউ অনুপস্থিত ব্যক্তির কোন সামান পতিত অবস্থায় পেয়ে তুলে নিল, এটা তার কাছে ওয়াদিআত হয়ে গেল।

ওয়াদি'আত (জমা রাখা) ও আমানতের মধ্যে পার্থক্য হলো, আমানতের ক্ষেত্রে ঈজাব ও কবূল শর্ত নয়। কিন্তু ওয়াদি'আতের ক্ষেত্রে ঈজাব ও কবূল শর্ত।[৩৬]

শর্তাবলী : ওয়াদি'আত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন :

ক. ঈজাব-কবূল, কথায় বা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে হবে যেমন : পরিষ্কার ভাষায় বলল, আমি আপনার কাছে এই জিনিসটি ওয়াদি'আত রাখলাম। অথবা কেউ কারও সামনে একটি জিনিস রেখে চলে গেল, কিছু বলল না। এটাও ওয়াদি'আত। তাই যার সামনে রাখা হলো সে যদি জিনিসটি এখানেই ফেলে চলে যায় আর জিনিসটি হারিয়ে যায়, তাহলে তাকে এর ভর্তুকি দিতে হবে।[৩৭]

খ. যে বস্তুটি ওয়াদি'আত রাখা হবে তা হস্তগত হওয়াও সম্ভবপর হতে হবে। যেমন কেউ উড়ন্ত পাখিটি দেখিয়ে কাউকে বলল, আমি এই পাখিটি আপনার কাছে ওয়াদি'আত রাখলাম। এটা ওয়াদি'আত হবে না।

গ. যার কাছে ওয়াদি'আত রাখা হবে তাকেও মুকাল্লাফ হতে হবে। যদি কোন শিশুর কাছে কোন জিনিস ওয়াদি'আত রাখা হয় আর শিশু নিজেই ওটা নষ্ট করে ফেলে, তাহলে কোন জরিমানা নেই। কারণ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি শরী'আতের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়।[৩৮]

হুকুম : ওয়াদি'আত গ্রহীতার হাতে আমানাত স্বরূপ, তাই এর সংরক্ষণ নিজে কিংবা নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা এর হিফাযত করা তার কর্তব্য।[৩৯]

এ কারণেই ওয়াদি'আতের সম্পদ হারিয়ে গেলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়াদি'আত গ্রহীতাকেই ভর্তুকি দিতে হয়। যেমন :

ক. অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ওয়াদি'আত রাখল। এখন যদি জিনিসটি নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় তাহলে দাতাকে ভর্তুকি দিতে হবে। কিন্তু যদি একান্ত দরকার ও অপারগতার মুহূর্তে অপরিচিত জনের কাছে ওয়াদি'আত রাখে—যেমন ঘরে আগুন লেগেছে। নিকটে পরিচিত কেউ নেই। তখন অবশ্য অপরিচিত ব্যক্তির কাছেই রাখতে হবে তবুও জিনিসটি আগুনে জ্বলতে দেওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে জিনিসটি নষ্ট হলে কিংবা হারিয়ে গেলে জরিমানা দিতে হবে না।[৪০]

খ. ওয়াদি'আত প্রদায়ক তার সম্পদ ফেরত চাচ্ছে। গ্রহীতা দিতেও সক্ষম। কিন্তু দেয়নি। অতঃপর জিনিসটি নষ্ট হয়ে গেল। তাকে ভর্তুকি দিতে হবে।

গ. নিজের সম্পদের সাথে ওয়াদি'আত মাল এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেছে যে আলাদা করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায়ও ভর্তুকি দিতে হবে।

ঘ. যদি ওয়াদি'আতের কিছু অংশ খরচ করে ফেলে এবং তা পূরণ করে অবশিষ্টাংশের সাথে মিশিয়ে ফেলে, তাহলে পুরোটাই ভর্তুকি বহন করতে হবে। কারণ সংমিশ্রণের ফলে বস্তুর মূল অস্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৪১]

ঙ. হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ওয়াদি'আত সহ সফর করা বৈধ। এতে কোন খরচ থাকলেও অসুবিধা নেই। তবে যদি দাতা এই ধরনের শর্তারোপ করে যে, এটা নিয়ে সফর করা যাবে না, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

আরিয়াত—ধার দেওয়া

'আরিয়াত' অর্থ কর্জ বা ধার দেওয়া। পরিভাষায় 'আরিয়াত' বলা হয় কোন প্রতিদান ছাড়াই কাউকে কোন জিনিসে উপস্বত্ব ভোগ করার অধিকার প্রদান করা। কেউ যদি কাউকে বলে, আমি জিনিসটি তোমাকে আরিয়াত দিলাম, কিংবা বলল, এই ঘরটি তোমাকে থাকতে দিলাম, এই কাপড়টি ব্যবহার করতে দিলাম ইত্যাদি, তাহলেই আরিয়াত সংঘটিত হয়ে যাবে।[৪২]

আরিয়াত গ্রহীতার কাছে আমানত স্বরূপ। দাতা চাইলে যে কোন সময় ফিরিয়ে নিতে পারে। তার হস্তক্ষেপ ছাড়া নষ্ট হয়ে গেলে কোন ভর্তুকিও নেই। এ কারণেই গ্রহীতা চাইলে ওটা ভাড়া দিতে পারবে না। দিলে এবং ভাড়াটিয়ার হাতে জিনিসটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে জিনিসটি যদি এমন হয় যে, হাত বদলের দ্বারা তাতে কোন ব্যবধান হবে না, তাহলে গ্রহীতা অন্য কাউকে আরিয়াত দিতে পারবে।[৪৩]

প্রাসঙ্গিক মাসাইল

টাকা-পয়সা, দিনার-দিরহাম, ওজন করা এবং সংখ্যা হিসেবে প্রদত্ত জিনিসপত্র আরিয়াত দিলে তা কর্জ বলে বিবেচিত হবে। কারণ এগুলো মূল অস্তিত্ব যথাবস্থায় রেখে তারদ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। আরিয়াত মানেই হলো, মূল ঠিক রেখে তারদ্বারা ফায়দা উঠানো।

ঘর তৈরি বা গাছ লাগানোর জন্যে আরিয়াত জায়িয আছে। আরিয়াতদাতা চাইলে আবার যে কোন সময় জায়গা ফেরত নিতে পারে এবং গ্রহীতাকে ঘর ও গাছ উপড়ে ফেলতে বাধ্য করতে পারে। অবশ্য যদি আরিয়াতের মেয়াদ নির্ধারিত থাকে আর মালিক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ফেরত নিয়ে নেয়, তাও বৈধ হবে, তবে মাকরূহ।

অবশ্য ফসল করতে দিলে ফসল কাটা পর্যন্ত সুযোগ দিতে হবে। সময়সীমা পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকাও এ ক্ষেত্রে জরুরী নয়।

আরিয়াত ফেরত প্রদানের খরচা গ্রহীতার জিম্মায় থাকবে।[৪৪]

ইজারা

ইজারার আভিধানিক অর্থ পারিশ্রমিক, উপস্বত্ব বিক্রি। পরিভাষায় 'ইজারা' বলা হয় কোন বিনিময়ের ভিত্তিতে উপস্বত্ব ভোগ বা উপকৃত হওয়ার আকদ বা চুক্তিকে। শরী'আতের দৃষ্টিতে

এই ধরনের চুক্তি বৈধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "তোমরা শ্রমিককে তার গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে যাও।"[৪৫]

শর্তাবলী : ইজারা বৈধ হওয়ার শর্ত দু'টি। এক. পারিশ্রমিক জানা থাকতে হবে। দুই. উপস্বত্বের পরিমাণ জানা থাকতে হবে।

পারিশ্রমিক জানা থাকা তো স্পষ্ট কথা। উপস্বত্ব জানা থাকা বা নির্ধারিত হওয়ার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে। যেমন : কেউ কারও ঘর ভাড়া নিল, এখানে কতদিনের জন্যে ভাড়া নিচ্ছে এটা উল্লেখ থাকলেই উপস্বত্বের পরিমাণ জানা হয়ে গেল। গাড়ি ভাড়া নিলে কতটুকু পথ যাবে, কিংবা কোথায় যাবে এর উল্লেখ করলেই উপস্বত্বের পরিমাণ জানা হয়ে গেল। যার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক নির্ধারিত হবে। মোটকথা, ইজারা বৈধ হওয়ার জন্য ভাড়া দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই ভাড়ার পরিমাণ ও যে জিনিসের ভাড়া হচ্ছে তারও পরিমাণ জানা থাকতে হবে। যাতে পরে ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি না হয়।

পারিশ্রমিক সংক্রান্ত কয়েকটি মাস'আলা

সাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে চুক্তি (আক্দ) সমাপ্ত হতেই মূল্য প্রদান ওয়াজিব হয়ে পড়ে। ইজারার ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থার যে কোন একটিতে পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়— ক. শুরুতেই পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়ার শর্ত থাকলে, খ. শর্ত ছাড়াই যদি শুরুতেই দিয়ে দেয়, গ. চুক্তির কাজ শেষ হয়ে গেলে।[৪৬]

বাড়ি, জমি ইত্যাদি ভাড়া নিলে চুক্তির সময় যদি ভাড়া দেওয়ার সময় উল্লেখ না থাকে তাহলে মালিক প্রতি একদিন পরপর একদিনের ভাড়া চাইতে পারবে। কিন্তু ভাড়া দেওয়ার সময় চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ভাড়া চাইতে পারবে না।[৪৭]

কোন্ কোন্ জিনিস ইজারা দেওয়া যায়

ঘর, দোকানপাট ইত্যাদি কর্মের প্রকৃতি বর্ণনা ছাড়াই ভাড়া নেওয়া যায়। তবে ঘর-দরজার জন্যে ক্ষতিকর কোন কাজ করতে গেলে তার বর্ণনা থাকা উচিত। যেমন : কামারের ও ধোপার শিল্পকর্ম বিল্ডিংকে দুর্বল করে দেয়। বর্তমানের ছাপাখানা ইত্যাদিও এই ধরনের।

ফসলের জমি ভাড়া নিলে জমির পার্শ্বস্থ পানির নালা ও পথ উল্লেখ ছাড়াই ভাড়াটিয়া ব্যবহার করতে পারবে। কারণ, এ ছাড়া তার ভাড়া নেওয়াটাই অনর্থক। তবে ক্ষেতে কি ধরনের ফসল ফলাবে তার বিবরণ অথবা যে কোন ধরনের ফসল করতে পারবে বলে সাধারণ অনুমতির উল্লেখ থাকতে হবে।

ঘরবাড়ি করার উদ্দেশ্যে কিংবা গাছ-গাছালি লাগানোর লক্ষ্যে খালি মাঠ ভাড়া নেওয়া যায়। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে জায়গা খালি করে পূর্বাবস্থায় মালিকের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

কেউ যদি কোন বাহন ভাড়া নেয় এবং এতে কে সাওয়ার হবে তার কোন ব্যাখ্যা না থাকে, তাহলে যে কাউকে সওয়ার করাতে পারবে। অনুরূপভাবে যে ধরনের সামান বহন করার শর্ত থাকে, সে মাফিকই বহন করতে হবে। শর্ত না থাকলে সব ধরনের সামানই বহন করতে পারবে। উল্লেখ্য, শর্তবহির্ভূত কর্মের ফলে বাহনের কোন ক্ষতি সাধিত হলে তা ভাড়াটিয়াকেই বহন করতে হবে।[৪৮]

ইজারায়ে ফাসিদা সংক্রান্ত মাসাইল

সাধারণ লেনদেন যেভাবে প্রকৃত স্বার্থবিরোধী শর্ত (শর্তে ফাসিদ) আরোপ করলে তা ফাসিদ বলে বিবেচিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইজারার ক্ষেত্রেও শর্ত ফাসিদদ্বারা ইজারা ফাসিদ বলে বিবেচিত হবে এবং এ থেকে উত্তরণের পথ হলো এই ফাসিদ শর্তটি বাদ বা রহিত করে দেওয়া। কিন্তু যদি এই শর্তের বর্তমানেই ইজারা বাস্তবায়িত হয়ে যায় তাহলে 'আজরে মিসল্' অর্থাৎ এই জাতীয় বিশুদ্ধ ইজারায় যা প্রাপ্য হতে পারে এখানেও তাই প্রাপ্য বলে বিবেচিত হবে।

কেউ কোন বাড়ি ভাড়া নিল এবং বলল, ভাড়া প্রতিমাসে এত টাকা। তাহলে শুধু একমাসের জন্য ইজারা সহীহ্ হবে। অন্যান্য মাসের ক্ষেত্রে ফাসিদ হবে। কারণ সেগুলোর সীমা জানা নেই। তবে যদি কতমাস থাকবে তার উল্লেখ করে, তাহলে উল্লিখিত মাসসমূহের ইজারা বৈধ। অথবা যদি প্রথম মাস অতিক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় মাসের সামান্য সময়ও এই বাড়িতে কাটিয়ে ফেলে তাহলে দ্বিতীয় মাসের ক্ষেত্রে ইজারা সহীহ্ হয়ে যাবে এবং বাড়িওয়ালা তাকে বের করতে পারবে না।[৪৯]

কেউ এক বছরের জন্যে বাড়ি ভাড়া নিল দশ হাজার টাকায়। তবে সম্প্রতি ভাড়া কত তার কোন উল্লেখ করল না, তবুও তা জায়িয আছে।

রাহ্‌ন (বন্ধক)

রাহ্‌নের আভিধানিক অর্থ আটক রাখা। পরিভাষায় পরিশোধ করা সম্ভব এমন কোন অধিকারের বিনিময়ে কোন জিনিস বন্ধক রাখাকে 'রাহ্‌ন' বলে। কুরআন শরীফে আছে :

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ

তোমরা যদি সফরে থাক এবং (লেনদেন লিপিবদ্ধ করার) কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৩)।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ইয়াহূদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছিলেন এবং তাঁর (সা) লৌহবর্মটি বন্ধক রেখেছিলেন। পবিত্র আয়াত ও হাদীস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, 'রাহ্‌ন' একটি সম্পূর্ণ বৈধ লেনদেন এবং এর বৈধতার উপর ইজ্‌মাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৫০]

রাহ্‌ন সংঘটিত হয় ঈজাব-কবূলের মাধ্যমে। এর পূর্ণাঙ্গতা ঘটে বন্ধকী বস্তু হস্তগত করার দ্বারা। দাতা যখন বন্ধকী বস্তু হস্তান্তর করে ফেলবে তখন তা বন্ধকী গ্রহীতার দায়িত্বে চলে যাবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ তার যিম্মায়। কারণ, তার পাওনা যথাযথভাবে পরিশোধের পথ সুগম করার লক্ষ্যে শরী'আত-এর অনুমোদন করেছে। সুতরাং এই বন্ধকী তার পাওনা আদায়ের গ্যারান্টি স্বরূপ কিন্তু সে এটির মালিকও নয়, আবার এটা তার হাতে নিছক আমানতও নয়। অবশ্য যদি বন্ধকী বস্তু তার হাত থেকে হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকেই এই ভর্তুকী বহন করতে হবে।[৫১]

বন্ধকদাতা বন্ধকী বস্তুটি ঋণ পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে না। এমনকি এর ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হবে।

ঋণ পরিশোধের অনিবার্যতাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই যেহেতু এই রাহ্ন প্রথার ব্যবস্থা, তাই একমাত্র ওয়াজিব (পরিশোধ অত্যাবশ্যকীয়) ঋণের ক্ষেত্রেই কেবল বন্ধক রাখা যেতে পারে। সুতরাং যে ঋণ এখনো ওয়াজিব হয়নি, বরং অসমাপ্ত পর্যায়ে আছে, তার জন্যে বন্ধকীর দাবি করা অবান্তর।[৫২]

বন্ধকী বস্তু যদি গ্রহীতার হাতে হারিয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে তার মূল্য আর মূলধনের মধ্যে কোন ব্যবধান আছে কিনা? যদি না থাকে অর্থাৎ মূলধন আর বন্ধকীর মূল্য সমান সমান হয়, তাহলে বন্ধকী বস্তু হারিয়ে গেলে ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। আর যদি বন্ধকী বস্তুর দাম মূলধনের চাইতে বেশি হয় তাহলে সমপরিমাণ ঋণ পরিশোধ আর অতিরিক্তটুকু গ্রহীতার হাতে আমানত মনে করতে হবে। আর আমানত হারিয়ে গেলে তার কোন জরিমানা নেই। অবশ্য যদি বন্ধকীর বস্তুর চাইতে ঋণ পরিমাণে বেশি হয় তবে বন্ধকীর মূল্য পরিমাণ ঋণ পরিশোধিত বলে বিবেচিত হবে। ঋণদাতা অবশিষ্ট ঋণ পরে আদায় করে নিবে।

উল্লেখ্য, যেদিন বন্ধকী গ্রহীতা তা কব্জা করবে সেদিনের মূল্যই হারিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বন্ধকীর মান নির্ধারণের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হবে।[৫৩]

বন্ধক গ্রহণের পর পাওনা আদায়ের পদ্ধতি

বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী বস্তু আটক রেখেও ঋণ তলব করতে পারে। কারণ, বন্ধকীর দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়নি; বরং আদায়ের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র। তবে বন্ধক গ্রহীতা যখন পাওনা চাইবে তখন তাকে বন্ধকী বস্তু উপস্থিত করার নির্দেশ দেওয়া হবে। তারপর তার পাওনা হস্তগত হলে সে বন্ধকী বস্তু হস্তান্তর করবে, এর পূর্বে নয়।

কিন্তু যদি যেখানে ঋণ ও বন্ধকের লেনদেন হয়েছে সেখানে না হয়ে ভিন্ন কোন শহরে পাওনাদার তার পাওনা চায় এবং বন্ধকী বস্তুটিও এমন যা বহন করা কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, তাহলে বন্ধকী বস্তু উপস্থিত করতে বলা হবে। আর যদি বন্ধকী বস্তু বহন করাটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়, তাহলে বন্ধকী বস্তু উপস্থিত করা ছাড়াই ঋণ পরিশোধ করতে বলা হবে এবং বন্ধকী বস্তু উপস্থিত করতে বাধ্য করা হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন কারণবশত ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকী বস্তুটি বিক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং কোন মধ্যস্থতা নিয়োগ করে। যেমন সে বলল, ভাই পাওনাদারের তাগাদায় বাঁচতে পারছি না। আমার বন্ধকী জিনিসটি তুমি সালিস হয়ে বিক্রি করে দাও। তারপর সে বিক্রিও করে দিল, নগদ কিংবা বাকি, এমতাবস্থায় বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী বস্তু উপস্থিত করতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, বিক্রিত বন্ধকী বস্তু উপস্থিত করা তার পক্ষে অসম্ভব। এমনিভাবে যদি খোদ বন্ধক গ্রহীতাকেই বন্ধকীটি বিক্রি করতে বলে আর সে বিক্রিও করে ফেলে, তাহলে মূল্য হস্তগত করার আগ পর্যন্ত বন্ধকী বস্তু উপস্থিত করার আদেশ দেওয়া যাবে না। মূল্য হস্তগত হওয়ার পর এরূপ আদেশ হলে মূল বন্ধকীর স্থলে দাম উপস্থিত করলেই যথেষ্ট হবে।

বন্ধকদাতা যদি বন্ধকী বস্তুটি বন্ধক গ্রহীতার (পাওনাদার) কাছে না রেখে অন্য কোন ব্যক্তির কাছে আমানত রাখে, তাহলেও পাওনাদারকে বন্ধকী বস্তু উপস্থিত করতে বলা যাবে না। কারণ, ওটা তার কব্জায় নেই। অনুরূপভাবে বন্ধকীর আমানতদার যদি অনুপস্থিত থাকে, সে কারণে পাওনাদারের ঋণ পরিশোধে বিলম্বও করা যাবে না।

বন্ধক গ্রহীতা চাইলে ঋণ পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত বন্ধকী বস্তু আটকে রাখতে পারে। বিক্রিতে বাধা দিতে পারে। আংশিক আদায় এবং আংশিক অনাদায়ের ক্ষেত্রেও একই বিধান। ঋণ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করবার পরই তাকে বাধ্য করা যাবে বন্ধকী বস্তু ফেরত দেওয়ার জন্য, এর পূর্বে নয়।[৫৪]

বন্ধকী বস্তুর ব্যবহার ও সংরক্ষণ

বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক দাতার অনুমতি ছাড়া রক্ষিত বস্তুটি কোনরূপ কাজে লাগাতে পারবে না। কারণ, ওটা তার কাছে সংরক্ষিত, ব্যবহারের জন্যে নয়। এটা সে বেচতেও পারবে না, ভাড়াও দিতে পারবে না, ভাড়া ছাড়াও কাউকে ব্যবহার করতে দিতে পারবে না।[৫৫]

গ্রহীতার দায়িত্ব হলো, নিজে বা পরিবারের কাউকে দিয়ে রক্ষিত বস্তুটির হিফাযত করা। যদি পরিবারের বাইরে কাউকে দিয়ে হিফাযত করে কিংবা কারো কাছে আমানত রেখে দেয়, তাহলে এর দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। অনুরূপভাবে বন্ধকী বস্তুর সংরক্ষণের বেলায় যদি হিফাযতের প্রচলিত নিয়ম লংঘন করে, তাহলেও ভর্তুকি দিতে হবে।[৫৬]

বন্ধকী বস্তু যে ঘরে সংরক্ষণ করা হবে তার ভাড়া বন্ধক গ্রহীতাকে দিতে হবে। অনুরূপভাবে পাহারাদার এবং বন্ধকী বস্তুর ব্যয়ভার বন্ধকদাতার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, বন্ধকী বস্তুটির অস্তিত্ব ও তার সত্তাগত কল্যাণার্থে ব্যয়িত খরচ বহন করবে দাতা। কারণ, সে এর মালিক। এর লাভের ভাগীও সে-ই। আর সংরক্ষণ সংক্রান্ত এবং মালিকের হাতে যথাযথ অবস্থায় হস্তান্তর করতে যা প্রয়োজন তা হলো গ্রহীতার দায়িত্ব।

গ্রহীতা যদি দাতাকে বিনা ভাড়ায় বন্ধকী বস্তুটি ব্যবহার করতে দেয় এবং দাতার হস্তগত হয়ে যায়, তাহলে গ্রহীতা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর যদি দাতার হাত থেকে জিনিসটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে গ্রহীতার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। যদি উভয়ের যে কেউ অপরজনের অনুমতিক্রমে তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে ভাড়া ছাড়া ব্যবহার করতে দেয়, তাহলেও দায়িত্বভার রহিত হয়ে যাবে।

যৌথ মালিকানাধীন বস্তু বন্ধক রাখা যায় না। গাছ ছাড়া গাছের ফল, জমি ছাড়া গাছ বা ফসল বন্ধক রাখা যায় না। কারণ, এক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থায় হস্তান্তর করা অসম্ভব। তাই জমি বন্ধক রাখলে ফসল, ঘর-বাড়ি, গাছ-গাছালি সবই তার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আমানত জাতীয় জিনিসও বন্ধক রাখা যায় না। কারণে আমানতে ভর্তুকি নেই। আর বন্ধকীতে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক। কাজেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। এ কারণেই অংশীদারী সম্পদ রাহন রাখা যায় না।

বাইয়ে' সালামের অগ্রিম মূল্য (মূল পূঁজি) ও বাইয়ে 'সারাফের মূল্য বন্ধক রাখা জায়িয।[৫৭]

শুফ্'আ : পরিচয় ও অধিকার

শুফ্'আর আভিধানিক অর্থ হলো মিলানো। পরিভাষায় মূল জমির অংশীদারিত্ব কিংবা প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতে জমির মালিকানা লাভকে শুফ্'আ বলে।[৫৮] শুফ্'আ শরী'আতসম্মত একটি অধিকার। এতে সম্পদের শরীক বা প্রতিবেশীরা অবাঞ্ছিত মানুষের ক্ষতিকর সংস্পর্শ থেকে বাঁচার সুযোগ লাভ করে।

তিনটি কারণে একজন অন্যজনের জমিতে শুফ্'আর দাবি করতে পারে : ১. যদি কেউ জমি বিক্রেতার ঐ জমিতে সরাসরি অংশীদার হয়, ২. যদি উভয়ের জমির পথ ও পানি সেচের নালা এক হয়, ৩. যদি কেউ ঐ জমির প্রতিবেশী হয়।

উপরোক্ত তিন প্রকারের দাবিদারগণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে জমির মালিকানা লাভ করবে। যদি কেউ সরাসরি কোন জমির অংশীদার এবং জমি ক্রয়ের প্রার্থীও হয়, তাহলে তার বর্তমানে অন্য কেউ দাবি করতে পারবে না। তারপর পথ ও সেচের নালায় শরীক ব্যক্তি এবং সর্বশেষ প্রতিবেশীর হক্ হবে। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি শুফ'আর দাবি না করে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি তথা প্রতিবেশী শুফ্'আর দাবি করতে পারবে। এ মর্মে হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : "শুফ'আর অধিকার অবন্টিত সম্পদের অংশীদার ব্যক্তির।" অন্য এক হাদীসে আছে : "বাড়ির প্রতিবেশী বাড়ির অধিক হকদার।" অপর এক হাদীসে আছে, "প্রতিবেশীই শুফ'আর অধিক হকদার"।[৫৯]

জমি এবং অবন্টিত সম্পদ যেমন : কূপ, আটা পেষার চাক্কি ইত্যাদিতে শুফ'আর দাবি জায়িয। এছাড়া অন্য কোন সম্পদে শুফ'আর দাবি স্বীকৃত নয়।[৬০] মালিক তার জমি বিক্রি করার পরই শুফ্'আর দাবি করা যায়—এর পূর্বে নয়। কারণ, জায়গার মালিক যদি স্বীকার করে যে, আমি জমি বিক্রি করছি, ক্রেতা স্বীকার না করলেও শুফ্'আর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

তবে শুফ্'আ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দু'টি শর্ত আছে : ক. শুফ্'আর দাবি করতে হবে; খ. সাক্ষী থাকতে হবে। কারণ শুফ্'আ একটি দুর্বল হক্। এ জন্যে দাবি করা ছাড়া তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর সে দাবি প্রমাণের জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন।[৬১]

ক্রেতা যেহেতু বৈধ পদ্ধতিতে খরিদসূত্রে জমির মালিক হয়ে গেছে এবং জমি তার হস্তগতও হয়ে গেছে, সুতরাং এখন শফী যদি হক্কে শুফ্'আ ভিত্তিতে এই জমি নিতে চায়, তাহলে হয়ত ক্রেতার কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে নিতে হবে অথবা আদালতের ফয়সালার ভিত্তিতে সে মালিক হতে পারবে।

শুফ্'আর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে শুফ্'আর দাবি করতে হবে এবং শুফ্'আর দাবি তিনভাবে উত্থাপিত হবে :

এক. সংশ্লিষ্ট জমি বিক্রির কথা শোনার সাথে সাথেই সেই মজলিসে দাবি করতে হবে। যদি না করে তাহলে হক্কে শুফ্'আ বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কারণ,এতে প্রমাণিত হচ্ছে তার এই জমির প্রতি আকর্ষণ নেই।

দুই. দাবির দ্বিতীয় পর্যায় হলো, মজলিসেই শুফ্'আর দাবি উচ্চারণ পূর্বক জমি যদি হস্তান্তর না হয়ে থাকে তাহলে মালিকের কাছে গিয়ে তার শুফ্'আর দাবির উপর কোন সাক্ষী রাখবে। যদি জমি হস্তান্তর হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ক্রেতার কাছে অথবা মূল জমির কাছে দাঁড়িয়ে সাক্ষী রাখবে। বক্তব্যের পদ্ধতি হবে এমন : 'অমুক ব্যক্তি এই জমি খরিদ করেছে। আমি এর শুফ্'আর অধিকারী। আমি পূর্বেও এর শুফ্'আর দাবি করেছি এখনও করছি। তোমরা সাক্ষী থেকো'। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেছেন, এই সময় জায়গার নাম এবং পরিমাপের কথাও উল্লেখ করতে হবে।

বিচারক বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করবেন, এ জমি সে বিক্রি করেছে কিনা? যদি সে জমি বিক্রির ব্যাপারে অস্বীকার করে তবে বিচারক শফীর নিকট এ বিষয়ে সাক্ষী তলব করবেন। যদি শফী সাক্ষী পেশ করতে অপারগ হয় তাহলে বিচারক ক্রেতার নিকট থেকে এ মর্মে শপথ গ্রহণ করবেন যে, "আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি এ জমি খরিদ করিনি" অথবা শপথ করে বলবে, শফী যে ভিত্তিতে শুফ্'আর দাবি করেছে তা যথাযথ নয়। তবে বিচারক তার শুফ্'আর দাবি নাকচ করে দিবেন।[৬২]

হালাল-হারাম

ইসলাম শরী'আতে হালাল-হারাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সকল আসমানী গ্রন্থে হালাল-হারামের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। হালাল-হারামের বিষয়টি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যেসব বিষয়কে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, 'শরী'আতের পরিভাষায় তা হালাল। আর কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে যে সব বিষয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা 'হারাম'।[৬৩]

হালাল-হারাম বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব জাতির কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এ বিধান পালনেই নিহিত রয়েছে মানুষের আত্মার কল্যাণ, দেহের কল্যাণ এবং বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা।এ বিধান দীন-ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর থেকে সকল প্রকার কঠোরতা তুলে নিয়েছেন। 'সব কিছুই বৈধ, কোন কিছুই নিষিদ্ধ নয়' এ নীতিহীনতা থেকেও তিনি আমাদের মুক্ত করেছেন। কোন কোন গোষ্ঠী কৃচ্ছ্রসাধন করতে গিয়ে সকল প্রকার পবিত্র জিনিস নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং অনেক ঘৃণ্য জিনিসকে নিজেরা হালাল করে নিয়েছে। ইসলামের হালাল-হারাম বিধান মানুষকে এ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। আল্লাহ্ তা' আল্লাহ্ বলেন :

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ .

যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জীলে, যা তাদের নিকট আছে, তাতে লেখা দেখতে পায়, যিনি তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেন ও অসৎকাজে বাধা দেন, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করেন ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন এবং যিনি তাদের মুক্ত করেন তাদের গুরুভার থেকে ও শৃংখল থেকে, যা তাদের ওপর ছিল। (সূরা আ'রাফ,৭ : ১৫৭)

হালাল-হারামের মূলনীতি

ক. হালাল-হারাম নির্ধারণে মানুষের ইখতিয়ার নেই। হালাল-হারাম নির্ধারণের একমাত্র অধিকার আল্লাহর। তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কেউ যদি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করে, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। ইয়াহূদী এবং খ্রীস্টান পাদ্রী ও ধর্মযাজকগণ হালাল-হারাম নির্ধারণ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٠

তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-তনয় মাসীহকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহ্-এর ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র! (সূরা তাওবা, ৯ : ৩১)

হযরত আদী ইবন হাতিম (রা) পূর্বে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ছিলেন, ইসলাম কবূল করার পর তিনি উক্ত আয়াত সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন :

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوْنَ ٠

ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো তাদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের ইবাদত করেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : এ পাদ্রী-পণ্ডিতরাই তো তাদের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং তারা তা মেনে নিয়েছে। তাই ছিল তাদের ইবাদত। অর্থাৎ হালাল-হারামের ব্যাপারে পণ্ডিতদের অনুকরণকেই ইবাদত বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হালাল-হারামকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٠

যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১৯)

নবী কারীম (সা) বলেন :

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ٠

হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট।[৬৪]

খ. সকল প্রকার হারাম বস্তুই ক্ষতিকর। শরী'আতের সকল বিধানই মানুষের জন্য কল্যাণকর। যেসব জিনিস অপবিত্র, নিকৃষ্ট এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো হারাম করে দিয়েছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ٠

লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করে, বলুন, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও। কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। (সূরা বাকারা, ২ : ২১৯)

যে সকল উপকরণ হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়, শরী'আত সেগুলোকেও হারাম করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মূলনীতি হচ্ছে :

مَا اَدّٰى اِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ ٠

যা কিছু হারামের দিকে ধাবিত করে তাও হারাম।[৬৫]

যেমন ব্যভিচার হারাম, যেসব কাজ ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করে, শরী'আত সেগুলোকেও হারাম করেছে। যেমন : বেগানা নারী-পুরুষের নির্জনে একত্রিত হওয়া, অবাধ দেখা-সাক্ষাত, প্রেম-প্রীতি, নগ্ন ছবি, যৌন উত্তেজক গান-বাজনা ইত্যাদি।[৬৬]

গ. হারাম কাজ করার জন্য কৌশল অবলম্বনও হারাম।

অপকৌশল অবলম্বন করে হারাম কাজ সম্পাদন করাও হারাম। এটা শয়তানের প্ররোচনা। শয়তান যুগে যুগে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল অবলম্বনে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদেরকে শনিবার দিন মাছ ধরতে নিষেধ করেন। তারা কৌশল অবলম্বন করে শুক্রবারে গর্ত খুঁড়ে রাখত, শনিবারে তাতে এসে মাছ জমা হতো, আর রোববার দিন তা তারা ধরত। আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য তাদের শাস্তি প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لَا تَرْكَبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُوْدُ وَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللّٰهِ بِادْنَى الْحِيَلِ ۔

ইয়াহূদীরা যে কাজ করেছিল তোমরা তা করো না। আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা সামান্য কৌশলের সাহায্যে হালাল করতে যেয়ো না।[৬৭]

কোন হারাম জিনিসের নাম বা তার বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন করলে এবং তাতে তার মূল অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটলে সে জিনিস হালাল হবে না। যেমন, 'মদ'কে পানীয় এবং 'সুদ'-কে মুনাফা (Interest) নামে অভিহিত করলে তা হালাল হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ يَسْمُوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ۔

আমার উম্মাতের একদল লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তাকে হালাল মনে করবে।[৬৮]

নবী কারীম (সা) আরও বলেন :

يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الرِّبَا بِاسْمِ الْبَيْعِ ۔

মানুষের মধ্যে এমন একটি যুগ আসবে যখন তারা 'সুদ'কে ক্রয়-বিক্রয়ের নামে অভিহিত করে তা হালাল মনে করবে।[৬৯]

খাদ্য ও পানীয়

অপবিত্র, ক্ষতিকর এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে জড় জাতীয় সকল খাদ্যই হালাল। মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় এমন বস্তু এবং অপরের মালিকানাধীন জড়বস্তু হালাল নয়।[৭০]

পানীয় দ্রব্যে অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হলে তা হারাম হয়ে যায়। বিষ এবং বিষ জাতীয় সকল বস্তুই হারাম। প্রাণী এবং বিষাক্ত উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত সকল বিষই হারাম।[৭১] বিষ নয় অথচ ক্ষতিকর এমন বস্তুও হারাম। যেমন : কাদা, মাটি, পাথর, কয়লা ইত্যাদি।[৭২]

ধূমপান একটি ক্ষতিকর বস্তু। এটি স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। সম্পদের অপচয় ঘটায়। এ কারণে এটিও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত।[৭৩] যে বস্তুতে অন্যের অধিকার আছে তা হারাম। যেমন : চোরাই মাল, লুটতরাজের মাল, ছিনতাইকৃত মাল ইত্যাদি।

প্রাণী দুই প্রকার : জলচর ও স্থলচর। এ সকল প্রাণীর মধ্যে কোন্‌টি হালাল এবং কোন্‌টি হারাম শরী'আতে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۔

যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদের নিকট বিশদভাবেই বিবৃত করেছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১৯)

জলচর প্রাণী

জলচর প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মাছই হালাল। মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীই হালাল নয়।[৭৪]

স্থলচর প্রাণী

স্থলচর প্রাণীর মধ্যে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۔

চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য এতে শীত নিবারক উপকরণ ও অনেক উপকার রয়েছে। এ থেকে তোমরা আহার করে থাক। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ۔

হে মু'মিনগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে তা ব্যতীত চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হল। (সূরা মায়িদা, ৫ : ১)

আয়াতাংশে উল্লেখিত আন'আম (চতুষ্পদ জন্তু) দ্বারা উট, গরু, ছাগল ও অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায়।

হালাল প্রাণীসমূহ

গরু, মহিষ, উট, ছাগল, হরিণ, ভেড়া ইত্যাদি। কিন্তু ঘোড়া, গাধা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বন্য গাধা এবং খরগোশও হালাল। নবী কারীম (সা)-কে একদা একটি ভূনা খরগোশ হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি তা থেকে খান এবং সাহাবীগণকে তা থেকে খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এ ছাড়া খরগোশ হিংস্র জন্তুও নয় এবং সে কোন মৃত জিনিসও খায় না। কাজেই তা খাওয়া হালাল।[৭৫]

দন্ত দিয়ে শিকারকারী হিংস্র জন্তু এবং নখর দিয়ে শিকারকারী পাখি খাওয়া জায়িয নয়। নখর দিয়ে শিকারকারী সকল প্রকার পাখি এবং দাঁত দিয়ে শিকারকারী সকল প্রকার হিংস্র জন্তু খেতে নবী কারীম (সা) নিষেধ করেছেন।[৭৬] ঈগল, বাজ, শকুন, চিল, কাক ইত্যাদি নখর দিয়ে শিকার করে বলে এসব পাখি খাওয়া জায়িয নেই। বাঘ, সিংহ, চিতা, বানর, ভল্লুক, হাতি, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি জন্তু দাঁত দিয়ে শিকার করে থাকে। এ কারণে এসব জন্তু খাওয়া নাজায়িয। সাপ, গুঁইসাপ, বেজি, ইঁদুর, চিকা, বাদুড়, কচ্ছপ, পাণ্ডা, ভীমরুল এবং সকল প্রকার পোকা-মাকড় খাওয়া নাজায়িয। খচ্চর এবং গৃহপালিত গাধা খাওয়া জায়িয নেই।

কুরআন শরীফে দশ প্রকার খাদ্য হারাম বলে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ·

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবেহ্কৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনের মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা যবেহ্ করতে পেরেছ তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীতে বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীরদ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা। এই সব হল পাপকাজ। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩)

১. মৃত জন্তু হারাম হওয়ার কারণ

ক. সুস্থ মানব প্রকৃতি মৃত জীব ঘৃণা করে। বিবেকবান মানুষ মৃত জন্তু খাওয়াকে মানুষের জন্য নিতান্তই অশোভন ও হীনকাজ বলে গণ্য করে। এ কারণে সকল আসমানী কিতাবে মৃত জন্তু খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

খ. মৃত জন্তু সম্পর্কে আশঙ্কা থাকে যে, সেটি কোন রোগের কারণে অথবা বিষাক্ত বস্তু খেয়ে মারা গিয়েছে। এরূপ মৃত জন্তু আহার করলে মানুষের বিরাট ক্ষতি হতে পারে।

গ. মানুষের মধ্যে মুর্দা হারাম করে আল্লাহ্ তা'আলা পশুপাখিগুলোর জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই প্রকার মৃত প্রাণীকে হালাল করে দিয়েছেন। একটি মাছ আর অপরটি টিড্ডী। ইব্ন উমর (রা) বলেন :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ اَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ ، وَاَمَّا الدَّمَانِ ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ·

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী এবং দু'প্রকারের রক্ত হালাল করেছেন। মৃত প্রাণী দু'টি হল, মাছ ও টিড্ডী। আর রক্ত দু'টি হল কলিজা এবং প্লীহা।[৭৭]

২. প্রবাহিত রক্ত : প্রবাহিত রক্ত অপবিত্র। সুস্থ মানব প্রকৃতি তা স্বভাবতই ঘৃণা করে থাকে। এ ছাড়া মৃত জন্তুর ন্যায় এতে ক্ষতিকর জীবাণু থাকাও সম্ভব। জাহিলী যুগে তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে উট বা অন্য কোন জন্তুকে আঘাত করা হত। রক্ত যখন ফিন্‌কি দিয়ে বের হত তখন আঘাতকারী ব্যক্তি তা পান করত। এতে জন্তুটি তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করত। দুর্বল হয়ে পড়ত। এসব কারণে আল্লাহ্ তা'আলা প্রবহমান রক্ত হারাম করে দেন।[৭৮]

৩. শূকরের মাংস : শূকরের মাংস খাওয়া হারাম। শূকর মূলত অপবিত্র। শূকর সাধারণত মল-মূত্র ইত্যাদি নাপাক বস্তু খেয়ে থাকে। অধিকন্তু এর মধ্যে রয়েছে ঘৃণ্য পাশবিক আচরণ। তাছাড়া এটি একটি হিংস্র প্রাণী। ইত্যাদি কারণে শূকর খাওয়া হারাম। আধুনিক স্বাস্থ্য

বিজ্ঞানের মতে শূকর খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে, শূকরের মাংস থেকে 'ট্রিচিনিয়াসিস' নামক এক প্রকার ক্রিমি রোগ হয় যা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে শূকরের মাংস সবসময় আহার করলে মানব চরিত্রে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হয় এবং আত্মমর্যাদাবোধ বিনষ্ট হয়ে যায়।[৭৯]

৪. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্যে উৎসর্গিত জন্তু : আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহ্ করা শির্ক। মূর্তিপূজারীরা তাদের দেব-দেবীর নামে জানোয়ার উৎসর্গ করত, বলি দিত। এ কাজটি সম্পূর্ণ শির্ক এ জাতীয় জন্তু আহার করা হারাম।

উপরের উল্লিখিত চারটি জিনিসই মূলত হারাম। সূরা মায়িদায় কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এতে হারাম বস্তুর সংখ্যা দশে উন্নীত হয়েছে। অবশিষ্টগুলো এই :

৫. শ্বাসরোধে মৃত জন্তু 'মুনখানিকা';

৬. প্রহারের কারণে মৃত জন্তু 'মাওকূযা';

৭. উঁচু স্থান থেকে পতনের কারণে মৃত জন্তু 'মুতারাদ্দিয়া';

৮. শিং-এর গুঁতায় মৃত জন্তু 'নাতীহা';

৯. হিংস্র পশু কর্তৃক খাওয়ার কারণে মৃত জন্তু।

এ পাঁচ প্রকারের জন্তুর কথা উল্লেখের পর ইরশাদ হয়েছে :

إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ‎.

অর্থাৎ এসবের মধ্যে কোন জন্তুকে জীবিত পেয়ে তা যবেহ্ করা হলে সেটা খাওয়া হালাল।

১০. দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া জন্তু : আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেবতা, শক্তি বা ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জন্তু-জানোয়ার যবেহ্ বা বলি দেওয়া হলে তাও খাওয়া হারাম। জাহিলী যুগে কা'বার চতুষ্পার্শ্বে এরূপ বহু স্থান ছিল যেখানে মুশরিকরা জীবজন্তু দেবতার নামে বলি দিত। বর্তমানকালেও অমুসলিমদের মধ্যে বলিদানের প্রথা আছে। এটা সম্পূর্ণ শির্ক। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নামে জীব-জন্তু বলি দেওয়া ও তা খাওয়া উভয়ই হারাম।

জীবন্ত জন্তুর কেটে দেওয়া অংশবিশেষের হুকুম : জীবন্ত জন্তুর কোন অংশ কেটে নিয়ে তা খাওয়া হারাম, আরবের লোকেরা জীবন্ত দুম্বার পিছনের দিকের তেলের থলি কেটে নিয়ে তা খেত। মহানবী (সা) এটাকে হারাম ঘোষণা করেন। আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী (র) বর্ণনা করেন :

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ ‎.

জীবন্ত জন্তুর কোন অংশ কেটে নেওয়া হলে তাও মৃত।[৮০] অর্থাৎ মৃত জন্তুর ন্যায় সেটাও হারাম।

মৃত মাছ ও পঙ্গপালের হুকুম : শরী'আতের বিধানে মৃত মাছ আহার করা হালাল। নবী কারীম (সা)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ ‎.

সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত (মাছ) হালাল।[৮১]

পঙ্গপাল সম্পর্কে শরী'আতের অনুরূপ বিধান রয়েছে। নবী কারীম (সা) মৃত পঙ্গপাল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ইব্‌ন আবূ লায়লা (রা) বলেন :

غَزَوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ ـ

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে পঙ্গপাল আহার করেছি।[৮২]

মৃত জন্তুর চামড়া, হাড্ডি, পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করা

শরী'আতে মৃত জন্তু খাওয়া হারাম, কিন্তু মৃত জন্তুর চামড়া, হাড্ডি, পশম, শিং ও নখর ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন :

تُصُدِّقَ عَلٰى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلاَّ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا فَدَ بَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهٖ فَقَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّمَا حُرِمَ اَكْلُهَا ـ

হযরত মায়মূনা (রা)-এর ক্রীতদাসকে একটি ছাগল সাদাকা স্বরূপ দেওয়া হলো, পরে সেটি মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : তোমরা এর চামড়া নিলে না কেন ? তা শুকিয়ে নিয়ে (দাবাগাত করে) এরদ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পারতে? তারা বললেন, এটা তো মৃত। তিনি বললেন : হারাম তো মৃত জন্তু আহার করা।[৮৩]

শুধু পায়খানা ভক্ষণকারী প্রাণীর হুকুম

কোন উট, গরু, ছাগল, মোরগ-মুরগী ইত্যাদি হালাল প্রাণী যদি পায়খানা খেতে অভ্যস্ত হয় এবং এতে তার শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, তবে এরূপ প্রাণীকে 'জাল্লালা' বলা হয়। এ ধরনের প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া এবং দুধপান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত আছে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَاَلْبَانِهَا ـ

ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাল্লালার গোশ্‌ত খেতে এবং দুধপান করতে নিষেধ করেছেন।[৮৪]

অপর এক হাদীসে আছে :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوْبِهَا وَاَكْلِ لُحُوْمِهَا ـ

আমর ইব্‌ন শু'আইব (রা) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন এবং জাল্লালার উপর আরোহণ করতে এবং তার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।[৮৫]

অপবিত্র বস্তু হারাম

শরী'আতের একটি মূলনীতি হচ্ছে পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ٠

তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন অপবিত্র, নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৭)

যেসব বস্তু সাধারণভাবে মানব সমষ্টির সুস্থ রুচিতে জঘন্য ও নিকৃষ্ট মনে হয়, যেমন পোকা-মাকড়, উকুন, শুক্র ইত্যাদি। এগুলো সবই অপবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।[৮৬]

অমুসলিম দেশ থেকে প্রাপ্ত গোশ্তের হুকুম

অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশত দুই শর্তে হালাল : ক. হালাল জন্তুর গোশ্ত হতে হবে; খ. শরী'আত অনুমোদিত পদ্ধতিতে যবেহ্কৃত হতে হবে।

উল্লেখিত শর্ত দু'টি পাওয়া না গেলে সেই গোশ্ত খাওয়া হালাল হবে না।

অনন্যোপায় হলে শরী'আতের বিধান

অনন্যোপায় হলে কেবলমাত্র জীবন রক্ষা পায় এ পরিমাণ হারাম গোশ্ত বা বস্তু খাওয়া বৈধ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٠

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় (সে তা থেকে খেলে) তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা, ২ : ১৭৩)।

ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে, لَا يَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمَيْتَةِ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ

অনন্যোপায় ব্যক্তি কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষা পায় এ পরিমাণ মৃতজন্তু থেকে আহার করতে পারবে।[৮৭] অন্যের মালিকানাধীন খাদ্যসামগ্রী পাওয়া গেলে অনন্যোপায় ব্যক্তি তা খেতে পারবে, যদিও মালিকের অনুমতি না থাকে। অধিকাংশ আলিমের মতে পরে মালিককে খাদ্যের বিনিময় আদায় করে দিবে। মালিক উপস্থিত থাকা অবস্থায় যদি অনন্যোপায় ব্যক্তিকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করে তবে ক্ষমতা থাকলে সে জবরদস্তি করে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে।[৮৮]

যবেহ্ ও শিকার

যে সকল জন্তু ও পাখির গোশ্ত খাওয়া যায় তা হালাল হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নাম নিয়ে

যবেহ্ করা শর্ত। যবেহ্ করা হলে গোশ্‌ত থেকে অপবিত্র রক্ত বের হয়ে যায়, আর এতে গোশ্‌ত হালাল হয়।[৮৯] আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ٠

তবে তোমরা যা যবেহ্ করতে পেরেছ। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩)

যবেহ্‌কারীর অত্যাবশকীয় বৈশিষ্ট্য

১. যবেহ্‌কারী ব্যক্তি তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। যেমন মুসলিম ব্যক্তি আকীদাগত দিক থেকেই তাওহীদে বিশ্বাসী। আর ইয়াহূদী এবং খ্রীস্টানগণ যারা নিজেদের তাওহীদে বিশ্বাসী বলে দাবি করে, তাদের যবেহ্‌কৃত জন্তু খাওয়াও হালাল। তবে আহলে কিতাব যদি যবেহ্ করার সময় জ্ঞাতসারে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে, তাহলে তাদের যবেহ্ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয়। আহলে কিতাবের যবেহ্‌কৃত প্রাণীর গোশ্‌তের হুকুম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ٠

তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হল। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৫)

২. যবেহ্‌কারী যদি 'তাসমিয়া' (বিসমিল্লাহ) উচ্চারণ করতে জানে এবং যবেহের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকে, তবে তার যবেহ্‌কৃত প্রাণীর গোশ্‌ত হালাল হবে। যদিও সে অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা পাগল কিংবা স্ত্রীলোক হয়, আর যদি সে তাসমিয়ার জ্ঞান না রাখে বা যবেহ্ করার পদ্ধতি না জানে, তবে তার যবেহ্‌কৃত প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ নয়।[৯০] অগ্নিপূজারী মূর্তিপূজারী বা মুরতাদ ব্যক্তির যবেহ্‌কৃত প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল নয়।[৯১]

যবেহ্ করার মাসনূন তরীকা

যে অস্ত্র দিয়ে প্রাণী যবেহ্ করা হবে তা ধারাল হতে হবে। যাতে রক্ত প্রবাহিত হতে পারে এবং রগ ভালভাবে কেটে যায়। যেমন ছুরি, তরবারি, কাঁচ, বাঁশের ধারালো ছিলকা, ধারালো পাথর এবং কাষ্ঠ নির্মিত ধারালো অস্ত্র।[৯২]

হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اَحَدُنَا اَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّيْنٌ اَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ اَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِاسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ٠

আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমাদের কেউ শিকার পেল, কিন্তু তখন তার কাছে চাকু নেই, এমতাবস্থায় সে কি শাণিত পাথর বা বাঁশের ছিলকা দিয়ে যবেহ্ করবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : রক্ত প্রবাহিত করবে যে জিনিস দ্বারাই হোক এবং তার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করবে।[৯৩]

২. 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বার' বলে গলদেশে ছুরি চালাতে হবে। উটের বেলায় বুকে ছুরি চালানো উত্তম।

৩. খাদ্যনালী (حلقوم) এবং বুকের উপর অংশের (لبه) মাঝখানে যবেহ্ করতে হবে। যবেহ্-এর ক্ষেত্রে চারটি রগ কাটা হয়। হলকুম (খাদ্যনালী), মারিউ (শ্বাসনালী), ওয়াদজান (গলার মধ্যের বড় দু'টি রগ)।

উল্লেখ্য নখ, দাঁত এবং শিং শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে তা দিয়ে যবেহ্ করা জায়িয আছে।[৯৪] হলকুম, শ্বাসনালী এবং মোটা রগ দু'টির যে কোন একটি কাটা হলে যবেহ্ শুদ্ধ হবে।[৯৫] তবে অন্যমতে যে কোন তিনটি কাটা গেলেও যবেহ্ হয়ে যাবে।[৯৬] যবেহ্ করার পূর্বেই অস্ত্র ধারালো করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : "প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ইহ্‌সান করা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর ওয়াজিব করেছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন ভালভাবে হত্যা করবে। আর যখন যবেহ্ করবে তখন সুন্দরভাবে যবেহ্ করবে।"[৯৭] জন্তুকে শুইয়ে রেখে অস্ত্রে ধার দেওয়া মাকরূহ্। জনৈক সাহাবী একটি ছাগলকে শুইয়ে রেখে অস্ত্রে ধার দিচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

لَقَدْ اَرَدْتَ اَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ هَلاَّ حَدَدْتَهَا قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا .

তুমি জন্তুটিকে একাধিক মৃত্যু দিতে চাও! তাকে শোয়ানোর পূর্বেই কেন অস্ত্র ধার দিলে না?[৯৮]

৪. যবেহ্ করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে। যবেহ্‌কারী ইচ্ছাপূর্বক বিস্‌মিল্লাহ্ বলা ছেড়ে দিলে যবেহ্‌কৃত প্রাণীটি মৃত হিসেবে পরিগণিত হবে। তার গোশ্‌ত খাওয়া যাবে না। ভুলবশত 'বিস্‌মিল্লাহ্' না বললে প্রাণীটির গোশ্‌ত খাওয়া যাবে।[৯৯] কোন প্রাণীর গোশ্‌ত হালাল হওয়ার জন্য শরী'আত অনুমোদিত পন্থায় যবেহ্ করা অত্যাবশ্যক। বিদ্যুৎ স্পর্শে কোন প্রাণী মারা গেলে এর গোশ্‌ত খাওয়া জায়িয নেই।

যবেহ্-এর ক্ষেত্রে কি কি মাকরূহ্

১. ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে যবেহ্ করা মাকরূহ্।

২. যবেহ্ করার পর রূহ্ না যাওয়া পর্যন্ত প্রাণীর ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়া বা চামড়া ছাড়ানো মাকরূহ্।

শিকার

শিকার করা মুবাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا .

যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। (সূরা মায়িদা, ৫ : ২)

ইহ্‌রামরত অবস্থায় এবং হরম এলাকায় শিকার করা অবৈধ। এ ছাড়া জলে ও স্থলে সর্বাবস্থায় শিকার করা জায়িয।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا .

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। আর যতক্ষণ ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৯৬)

উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রাণী হত্যা করার অনুমতি ইসলামে নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِىْ عَبَثًا وَلَمْ لِيَقْتُلْنِىْ مَنْفَعَةً .

যে লোক একটি চড়ুইপাখি উদ্দেশ্যহীনভাবে হত্যা করবে। কিয়ামাতের দিন তা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করবে, হে আমার প্রতিপালক ! অমুক লোকটি আমাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে হত্যা করেছিল, কোন উপকার লাভের জন্য হত্যা করেনি।[১০০]

যদি শিকারকে তোমার জন্য আটকে রাখে, আর তুমি সেটা জীবন্ত অবস্থায় হাতে পাও তাহলে তুমি যবাই করবে।[১০১]

শিকার করার উপায়

দুই উপায়ে শিকার করা যায় : ক. তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রদ্বারা যেমন : তীর, বল্লম, তরবারি ইত্যাদি, খ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী জন্তুদ্বারা, যেমন : কুকুর ও বাজপাখি।

অস্ত্রদ্বারা শিকার করার শর্ত দু'টি। আর তা এই :

ক. তীর বা অস্ত্র নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহ্' উচ্চারণ করবে।

খ. অস্ত্রটি শিকারের দেহের মধ্যে এমনভাবে বিদ্ধ হবে যে, এ আঘাতদ্বারা রক্তক্ষরণেই তার মৃত্যু হবে। অস্ত্রের চাপে পড়ে যেন মৃত্যু না হয়। হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, إِنِّىْ أَرْمِىْ بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأَصِيْدُ

আমি ফলা ছাড়া তীরদ্বারাই শিকার করি। সেটি কি খাওয়া জায়িয হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ .

যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে বিদ্ধ হয় তবে খাও। আর যদি আড়াআড়িভাবে লাগে এবং তার চাপে জন্তুটি মারা যায় তবে তা খাবে না। কেননা তা প্রহারে মৃত বলে বিবেচিত।[১০২] এ হিসাবে বন্দুক, পিস্তল, রিভলভারের গুলিদ্বারা শিকারকৃত জন্তু যবেহ্ করা ছাড়া হালাল হবে না।[১০৩]

প্রস্তরখণ্ড, ইটের টুকরা বা অনুরূপ ভারী বস্তু নিক্ষেপ করে বা লাঠিদ্বারা কোন জন্তুকে আঘাত করে মারা হলে তা খাওয়াও হালাল হবে না। তবে তা যদি জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়

এবং যবেহ্ করা হয় তাহলে খাওয়া যাবে। তীর, ধনুক ইত্যাদিদ্বারা শিকারকৃত জন্তু জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে তা যবেহ্ করতে হবে। আর মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে যবেহ্ ছাড়াই তা খাওয়া জায়িয হবে।[১০৪]

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী

প্রাণীর শিকার : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বা শিকারী পাখিদ্বারা শিকার করা জন্তু খাওয়া বৈধ।

তবে এ জন্যে নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ হওয়া আবশ্যক :

১. শিকারী জন্তু বা পাখি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

২. শিকারী জন্তু বা পাখি মালিকের জন্যে শিকার করবে; সে নিজে এর থেকে খাবে না।

৩. শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় 'বিস্মিল্লাহ্' বলে পাঠাতে হবে। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۔

লোকে আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্যে কী কী হালাল করা হয়েছে ? বলুন, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পাখি যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তারা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা ভক্ষণ করবে এবং এতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করবে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪)

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বা পাখি দ্বারা শিকারকৃত জন্তু যদি জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে তা যবেহ্ করতে হবে।

তীর নিক্ষেপের পর যদি শিকার চোখের আড়ালে চলে যায় এবং শিকারী তা তালাশ করতে থাকে আর কিছু সময় পর তা মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তা খাওয়া জায়িয হবে। আর যদি সে এর তালাশে না থাকে এবং পরে মৃত অবস্থায় পায়, তবে তা খাওয়া যাবে না। যদি শিকারকৃত জন্তুর দেহে তার তীরের আঘাতের সাথে অন্য কোন তীরের আঘাত দেখা যায়, তবে তা খাওয়া যাবে না।

কোন জন্তুর প্রতি তীর নিক্ষেপের পরে তা যদি পানিতে পড়ে বা কোন ছাদ বা পাহাড়ে পতিত হয়ে সেখানে থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে, তবে তা খাওয়া যাবে না। কিন্তু তীর নিক্ষেপের পরপরই যদি মাটিতে পতিত হয় তা হলে তা খাওয়া যাবে।[১০৫]

মাদকদ্রব্য

'মদ' বলা হয় এমন পানীয়কে যা পান করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়। মদকে কুরআন মাজীদে 'খামর' (خمر) বলা হয়েছে। মদ বা মাদকদ্রব্য মানুষের জ্ঞানকে ঢেকে ফেলে। এজন্য এটাকে হারাম করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নেশাগ্রস্ত করে। অতএব যে বস্তুই নেশা সৃষ্টি করে তাই নিষিদ্ধ। মদ্যপান সকল অপরাধ ও পাপ কাজের উৎস। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَلْخَمْرُ اُمُّ الْفَوَاحِشِ وَالْكَبَائِرِ ـ

মদ্যপান সকল অশ্লীলতা ও কবীরা গুনাহের উৎস।[১০৬]

মদ্যপান এক অভিশপ্ত কাজ। আর এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল লোকই অভিশপ্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهَا وَاٰكِلَ عَنْهَا ـ

মদ, যে ব্যক্তি তা পান করে, যে তা পান করায়, যে তা বিক্রি করে, যে তা ক্রয় করে, যে তা তৈরি করায়, যে তা তৈরি করে, যে তা বহন করে, যার জন্য তা বহন করা হয় এবং যে এর মূল্য ভক্ষণ করে, সকলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন।[১০৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ عَلٰى اُمَّتِى الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের জন্য মদ ও জুয়া হারাম করে দিয়েছেন।[১০৮]

হযরত উমর ফারূক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন :

اِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةِ اَشْيَاءِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ - وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ـ

মদ হারাম হওয়ার হুকুম রয়েছে। মদ পাঁচটি বস্তু থেকে তৈরি হয়—আঙুর, খেজুর, গম, যব এবং মধু। আর যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে, তাই খামর।[১০৯]

ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণের মতে, যে সব বস্তুর মধ্যে নেশা আছে তা সব নিষিদ্ধ। তা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা ধর্তব্য হবে না। সেটা আঙুরের, খেজুরের, মধু, গম, যব অথবা অন্য কিছুর তৈরি হলে তাও নিষিদ্ধ। কারণ বিশেষ ও সাধারণ ক্ষতির দিক থেকে সব একই পর্যায়ভুক্ত। আর এ সবই আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র এবং নামায থেকে মানুষকে বিরত রাখে। মানুষে মানুষে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে।[১১০]

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

হে মু'মিনগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। তাই তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান মদ ও

জুয়াদ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? (সূরা মায়িদা, ৫ : ৯০-৯১)

মাদকদ্রব্যের পরিমাণ কম হোক কি বেশি হোক, উভয় অবস্থায়ই তা হারাম।[১১১] নবী কারীম (সা)-এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ .

যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে, তার কম পরিমাণও হারাম।[১১২]

শরী'আতের মূলনীতি হচ্ছে, যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে, অনুভূতি ও বোধশক্তি হরণ করে বা প্রভাবিত করে, তাই নিষিদ্ধ।

যেসব দ্রব্য মদের মতই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে হরণ করে, চেতনাকে বিলোপ করে, শরী'আতের দৃষ্টিতে এমন সব দ্রব্যও নিষিদ্ধ। গাঁজা, আফিম, কোকেন প্রভৃতি এ পর্যায়েরই জিনিস। এসব বস্তু মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয়। এমনকি এতে মানুষ নিজের সত্তা, নিজের দীন, ধর্ম ও দুনিয়া সবকিছুই ভুলে গিয়ে নিছক কল্পনার জগতে বিচরণ করতে শুরু করে।[১১৩]

এ ধরনের মাদকদ্রব্য পানে স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ে। স্নায়ুমণ্ডলী চেতনা হারিয়ে ফেলে। ফলে এসব বিষাক্ত দ্রব্য পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি সমাজদেহে ব্যাপক পচন ধরিয়ে দেয়, এতে ধন-সম্পদের অপচয় হয় এবং পরিবারে ভাঙ্গন ধরে। এ জন্যে দুর্নীতি ও অসৎ পন্থা অবলম্বনেও তাদের কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধা থাকে না।[১১৪] বর্তমানে মানুষ অধিক হারে যেসব মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ছে সেগুলো হচ্ছে, ফেনসিডিল, হাশিশ, আফিম, গাঁজা, হিরোইন, পেথিডিন ইত্যাদি।

এ সকল দ্রব্য মদের মতই ক্ষতিকারক; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলোর ক্ষতি আরও মারাত্মক। নিম্নে এগুলোর কিছু কিছু ক্ষতির দিক উল্লেখ করা হলো :

চোখের ক্ষতি : চোখের মণি সংকুচিত হওয়া, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া। শ্বাস প্রণালীর ক্ষতি, খুসখুসে কাশি থেকে যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হওয়া।

হৃদযন্ত্র ও রক্ত প্রণালীতে ক্ষতি : হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, হৃদযন্ত্র বড় হয়ে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া, রক্ত কণিকার সংখ্যার পরিবর্তন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি।

যকৃত (লিভার)-এর ক্ষতি : জন্ডিস, হেপাটাইটিস, সিরোসিস ও ক্যান্সার।

কিডনীর ক্ষতি : এর কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, ঘন ঘন সংক্রমণ হওয়া, পরিশেষে কিডনী অকার্যকর হয়ে যাওয়া।

খাদ্য প্রণালীতে ক্ষতি : রুচি কমে পাওয়া, হজমশক্তি হ্রাস পাওয়া, আলসার, এসিডিটি কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্যান্সার ইত্যাদি।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র এবং মানসিক সমস্যা : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রলাপ বকা, আত্মহত্যার প্রবণতা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অসচেতনতা, চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়া, স্নায়ুবিক

দুর্বলতা, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, অস্থিরতা, বিষণ্ণতা ইত্যাদি গুরুতর মানসিক রোগ দেখা দেয়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ী বা মেশিন চালালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বারেবারে একই জায়গায় সূঁচদ্বারা পেথিডিন ইনজেকশান নেওয়ার ফলে ঐ স্থানে ক্ষত থেকে সংক্রমণ, প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মাংসপেশীতে গ্যাংগ্রিন বা পচন সৃষ্টি হতে পারে।

মাদক দ্রব্যের উৎপাদক ও ব্যবসা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদের ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এমনকি অমুসলিমদের সাথেও এ ব্যবসা করা জায়িয নেই। মদ ও মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রফতানি সব কিছুই নিষিদ্ধ। এসব কারখানায় চাকুরি করাও সমানভাবে নিষিদ্ধ।

নবী কারীম (সা) মদের ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেছেন। তারা হচ্ছে :

وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىْ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهَا .

মদ উৎপানকারী, যে উৎপাদন করায়, মদ্যপায়ী, বহনকারী, যার কাছে বহন করে নেওয়া হয়, যে পান করায়, পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষণকারী, ক্রয়কারী এবং যার জন্যে তা ক্রয় করা হয়—এ সকলেরই উপর অভিশাপ।[১১৫]

মদপানের সকল পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদ তৈরিকারীর নিকট আঙুর বিক্রি করাও নিষিদ্ধ। মহানবী (সা) বলেন :

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ اَيَّامَ الْقِطَافِ حَتّٰى يَبِيْعَهُ مِنْ يَهُوْدِيٍّ اَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلٰى بَصِيْرَةٍ .

যে লোক আঙুরের ফসল কেটে তা জমা করে রাখে কোন ইয়াহূদী, খ্রীস্টান বা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে, যে তা থেকে মদ তৈরি করবে, তা হলে সে জেনেশুনেই আগুনে ঝাপ দিল।[১১৬]

উল্লিখিত হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, কোন অমুসলিম ব্যক্তিও যদি কোন মুসলমানের তালগাছ এ উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে (এমনকি বিনিময় ছাড়াও) নিতে চায় যে, ঐ গাছের রস থেকে সে তাড়ি তৈরি করবে, তবে ঐ গাছ ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া বৈধ হবে না। খেজুর গাছের বেলায় একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

মিসরের মুফতী শায়খ আবদুল মাজীদ সলীম (র)-কে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম কি হবে জিজ্ঞাসা করা হয় :

১. চেতনানাশক দ্রব্যাদির লেনদেন।

২. চেতনানাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা।

৩. বিক্রয় অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভাং ইত্যাদির উৎপাদন করা।

৪. এ ব্যবসা থেকে লব্ধ অর্থের হুকুম।

শায়খ আবদুল মাজীদ (র)-এর জবাবে বলেন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, চেতনানাশক দ্রব্যাদির লেনদেন হারাম, কেননা এতে শারীরিক ক্ষতি এবং বহুবিধ ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ সকল দ্রব্য জ্ঞান ধ্বংস করে। শরীর বিনষ্ট করে। কাজেই শরী'আত এসব দ্রব্যের লেনেদেনের অনুমোদন দিতে পারে না। এছাড়া এগুলোর চেয়ে কম ক্ষতিকর বস্তুও হারাম। আর এ কারণেই কোন কোন হানাফী আলিম বলেন :

اِنَّ مَنْ قَالَ بِحِلِّ الْحَشِيْشِ زِنْدِيْقٌ مُبْتَدِعٌ ۔

যে ব্যক্তি ভাংকে হালাল বলে, সে ধর্মত্যাগী ও বিদ'আতী।[১১৭]

চেতনানাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম, এতে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীমূলক কাজে সহায়তা করা হয়। আর এ সহায়তা হারাম। মাদকদ্রব্য তৈরির উদ্দেশ্যে ভাং, আফিম ইত্যাদি উৎপাদন করাও সম্পূর্ণরূপে হারাম। আর এসব দ্রব্য থেকে লব্ধ অর্থও হারাম এবং অবৈধ।[১১৮]

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন :

اِنَّ اللّٰهَ اِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তুকে হারাম করেন তখন তার মূল্যকেও হারাম করে দেন।[১১৯]

মদ্যপায়ীদের আসরে যাওয়া, তাদের সঙ্গে উঠা বসা করা নিষেধ

হযরত উমর ফারূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلٰى مَائِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ۔

আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার ব্যক্তি যেন এমন খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চায় একত্রে না বসে, যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়। (আহ্‌মাদ)

মদপানের শাস্তি

সকল ফিকহ্শাস্ত্রবিদের মতে মদ্যপায়ীকে যথার্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মালিক (র)-এর মতে মদ্যপায়ীর শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। সাহাবীগণের যুগে আশি বেত্রাঘাতের ওপর ঐকমত্য স্থাপিত হয়।[১২০]

শাস্তির শর্ত

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির উপর শরী'আতের 'হদ্' প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া জরুরী :

১. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, পাগলের উপর হদ্ জারী করা যাবে না।

২. বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, অপ্রাপ্ত বয়স্কের প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না।

৩. মুসলমান হওয়া, কাফির ব্যক্তির উপর হদ্ প্রযোজ্য নয়।

৪. ইচ্ছাপূর্বক সেবনকারী হওয়া, ভুলবশত সেবন করলে বা জোরপূর্বক সেবন করানো হলে তার উপর হদ্ প্রযোজ্য হবে না।

৫. মুযতার বা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মদপান করলে তার উপর হদ্ প্রযোজ্য হবে না।[১২১]

পোশাক-পরিচ্ছদ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের যে সকল নিয়ামত দান করেছেন পোশাক-পরিচ্ছদ এগুলোর মধ্যে অন্যতম। পোশাকদ্বারা দু'টো লক্ষ্য অর্জিত হয়। একটি লজ্জাস্থান আবৃতকরণ আর দ্বিতীয়টি সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰبَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ٠

হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি, আর তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহ্র নির্দেশসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৬)

পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰبَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ٠

হে বনী আদম! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ٠

আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি সুন্দরকে পসন্দ করেন।[১২২]

পোশাকের হুকুম তিন পর্যায়ে বিভক্ত। ফরয, মুস্তাহাব এবং হারাম। এমন ধরনের পোশাক পরিধান করা ফরয যারদ্বারা সতর আবৃত হয়। যে পোশাকে দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে দেহকে রক্ষা করা যায়, তা পরিধান করা মুস্তাহাব।[১২৩] এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখযোগ্য :

عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ اَيِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ اٰتَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَاِذَا اٰتَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ ٠

আবুল আহ্ওয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা)-এর নিকট নিম্নমানের একটি পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হলাম। তখন নবী (সা) আমাকে বললেন : তোমার কোন সম্পদ আছে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)! তখন তাকে বললেন : কি ধরনের সম্পদ আছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উট, ছাগল,

ঘোড়া এবং গোলাম দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সম্পদ দান করেছেন তাই আল্লাহ্র এ অনুগ্রহের নমুনা ও মর্যাদা তোমার মধ্যে প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয়।[১২৪]

ইবাদতের সময়, জুমু'আ ও ঈদের নামাযে এবং জনসমাজে যাওয়ার সময় উত্তম পোশাক পরিধান একান্ত সমীচীন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হিব্বান (র) বর্ণনা করেন :

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عَلىٰ اَحَدِكُمْ اِنْ وَجَدَ اَوْ مَا عَلىٰ اَحَدِكُمْ اِنْ وَجَدْتُّمْ اَنْ يَّتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَىْ مِهْنَتِهٖ ۔

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমাদের কেউ যদি ব্যবহারের দু'টি কাপড়ের অতিরিক্ত জুমু'আর জন্যে পৃথক দু'টি কাপড় রাখতে সক্ষম হয় তবে এতে কোন দোষ নেই।[১২৫] (বরং এটা (উত্তম)।

পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা, সোনার গহনা ব্যবহার করা এবং মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে যে পোশাক নির্ধারিত, তা পরিধান করা হারাম। অনুরূপভাবে পুরুষদের জন্য যে পোশাক বিশেষভাবে নির্ধারিত, তা মহিলাদের পরিধান করা হারাম। এমনিভাবে অহংকার ও সীমালংঘনমূলক পোশাক ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। এমন হাল্কা-পাতলা কাপড় অথবা এমন আঁটসাট কাপড় পরিধান করা যাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, তা পরিধান করা নিষিদ্ধ।

রেশমী পোশাক সম্পর্কেই হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন :

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبِسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ ۔

যে পুরুষ লোক দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে সে আখিরাতে রেশমী পোশাক পাবে না।[১২৬]

সোনা-রূপার তৈজসপত্র এবং রেশমী তৈরি আসন ব্যবহার নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে :

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ۔

হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা) আমাদেরকে সোনা ও রূপার তৈজসপত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। মোটা ধরনের রেশমী কাপড় এবং অন্যান্য সকল রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং তাতে বসতেও তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।[১২৭]

ওযর অবস্থায় এবং রোগ থেকে নিষ্কৃতিলাভের আশায় রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়িয আছে। যেমন যুদ্ধের ময়দানে রেশমী পোশাক পরা সাহিবায়নের[১২৮] মতে বৈধ।[১২৯] কেননা রেশমী পোশাকের চাকচিক্যে শত্রুর অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হতে পারে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, যুদ্ধের ময়দানেও রেশমী পোশাক পরা মাকরূহ্।[১৩০]

জামার নিম্নভাগে নক্‌শা স্বরূপ তিন অথবা চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় লাগানো জায়িয আছে।[১৩১] যে কাপড়ের তানায় রেশমী সুতা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু বানায় অন্য সুতা যেমন তুলার সুতা বা পশম ব্যবহার করা হয়েছে, তা ব্যবহার করা জায়িয আছে। কেননা কাপড় বুননের ক্ষেত্রে বানাই প্রধান।[১৩২] তবে তানায় অন্য সুতা এবং বানায় রেশমী সুতা ব্যবহার করা হলে তা পরিধান করা জায়িয নেই।[১৩৩] স্ত্রীলোকদের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা জায়িয আছে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَبِأَخْذِيْ يَدَيْهِ حَرِيْرٌ وَبِالْأُخْرٰى ذَهَبٌ وَقَالَ هٰذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلٰى ذُكُرِ أُمَّتِيْ حَلَالٌ عَلَى الْمَرْأَةِ .

নবী কারীম (সা) একদিন এক হাতে রেশম এবং অপর হাতে স্বর্ণ নিয়ে বের হয়ে আসেন এবং বলেন : এ দু'টি বস্তু আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল।

অলংকারাদির ব্যবহার

পুরুষদের জন্য সোনা-রূপার ব্যবহার হারাম।[১৩৪]

হযরত আলী (রা) বলেন :

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ .

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১৩৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন, তখন তিনি সেটি টেনে বের করে নিক্ষেপ করলেন।

স্বর্ণের আংটির ন্যায় স্বর্ণের কলম, স্বর্ণের চেইন ইত্যাদি স্বর্ণের যাবতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম।[১৩৬]

পুরুষের জন্য রৌপ্য নির্মিত আংটি ব্যবহার করা জায়িয আছে। তবে তা যেন এক মিস্‌কাল থেকে কম হয়। পাথরের আংটি ব্যবহার করাও জায়িয।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

تَخَتَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ .

তোমরা আকীকের আংটি ব্যবহার কর। কেননা তা বরকতময়।[১৩৭]

লোহা ও পিতলের আংটি ব্যবহার করা হারাম।[১৩৮]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তির হাতে পিতলের আংটি দেখে তাকে বলেন :

مَالِيْ أَجِدُ مِنْكَ رَائِحَةَ الْأَصْنَامِ .

তোমার থেকে আমি মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি।

আর এক ব্যক্তির হাতে তিনি লোহার আংটি দেখে তাকে বললেন :

مَالِيْ أَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ .

আমি তোমার হাতে দোযখবাসীদের গহনা দেখতে পাচ্ছি।[১৩৯]

কারো কোন দাঁত পড়ে গেলে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা সোনা দিয়ে বাঁধাই করা বৈধ নয়। তবে রূপা দিয়ে মোড়ান যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সোনা ও রূপা উভয় দ্রব্য দিয়েই মোড়ান যাবে।[১৪০] অনুরূপভাবে দাঁত পড়ে গেলে ঐ স্থানে রূপা নির্মিত দাঁত লাগাতে কোন দোষ নেই। তবে সোনা নির্মিত দাঁত লাগান মাকরূহ্।[১৪১] এভাবে প্রয়োজনবশত রূপার নাক সংযোজন করা সাহিবায়নের মতে জায়িয আছে। সাহিবায়ন আরফাজাহ্ ইব্ন আস'আদ (রা)-এর হাদীসদ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। তিনি বলেন :

أُصِيبَ أَنْفِيْ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَىَّ فَأَمَرَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ أَنِ اتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ·

কুলাব যুদ্ধের দিন আমার নাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন আমি রূপা দিয়ে নাক তৈরি করি। কিন্তু তা দুর্গন্ধ হয়ে যায়। তখন নবী কারীম (সা) আমাকে একটি সোনার নাক সংযোজন করার হুকুম দেন।[১৪২]

গৌরব ও অহংকারের পোশাক পরিধান করা

নিজেকে বড় মনে করে অহমিকায় পড়ে যাওয়াই হচ্ছে অহংকার। আর অন্যদের তুলনায় নিজেকে বড় বলে যাহির করাই হচ্ছে গৌরব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ·

আল্লাহ্ পসন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীকে (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৩)

যে পোশাক পরিধান করে মানুষের মাঝে খ্যাতি অর্জনের প্রত্যাশা করে, তাকে খ্যাতির পোশাক বলা হয়। এরূপ পোশাক পরিধান করা হারাম।[১৪৩]

ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন :

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مُذِلَّةٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ·

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার পোশাক পরিয়ে দেবেন।[১৪৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেন :

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ·

যে ব্যক্তি তার কাপড় অহংকারবশত টেনে চলবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি দৃষ্টি দেবেন না।[১৪৫]

নবী কারীম (সা) আরও বলেন :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا وَتَصَدَّقُوْا فِيْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَلاَ مُخِيْلَةٍ ·

তোমরা খাও, পান কর, পরিধান কর কিন্তু এমন ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করবে না এবং অহংকারবোধ করবে না।[১৪৬]

অপর একটি হাদীসে হযরত ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الْخَيْلَاءِ خَسَفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ٠

এক ব্যক্তি অহংকারবশত তার লুঙ্গি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হয় ফলে সে কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে ধসে যেতে থাকবে।[১৪৭]

পুরুষের জন্য পায়ের গিরার নিচ পর্যন্ত পোশাক পরা হারাম। এর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاَزَارِ فِى النَّارِ ٠

যে ব্যক্তি পায়ের টাখনুর নিচ পর্যন্ত কাপড় পরিধান করবে, সে দোযখে যাবে।[১৪৮]

স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজের মাথার চুলের সাথে অপরের চুলের জোড়া লাগান মাকরূহ্।[১৪৯]

হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত :

اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ٠

চুলে যে জোড়া লাগায় (পরচুলা) এবং যে অন্যের দ্বারা এ কাজ করায়, উভয় নারীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ।[১৫০]

নারী সম্পর্কে যখন এ কথা, তখন পুরুষরা এ কাজ করলে তো নিশ্চয়ই এ অভিশাপে পড়ে যাবে—তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। চুলের সাথে চুল ছাড়া পশম, বস্ত্রখণ্ড বা সুতা ইত্যাদি জড়ান হলে তাতে কোন দোষ নেই।[১৫১]

ক্রীড়াকৌতুক ও চিত্তবিনোদন

ইসলাম বাস্তবসম্মত একটি জীবন বিধান। তাতে মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবগত চাহিদার প্রতিও নযর রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এভাবে যে, পানাহার যেমন তার প্রকৃতির চাহিদা মেটায়, আনন্দ-স্ফূর্তি ও ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদিও তার প্রকৃতিগত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত।

ক্রীড়া-কৌতুক অর্থ আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা এবং খোশগল্প এগুলো মানব জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা। মানুষ সব সময় একই অবস্থায় থাকতে পারে না। দীর্ঘক্ষণ ধরে কঠিন কাজে নিয়োজিত থাকার পর কিছু বিরতির প্রয়োজন হয়। আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে চিত্ত বিনোদনের দরকার হয়। মহানবী (সা) আমাদের জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। এতে তাঁর মুবারক পা দু'খানি ফুলে যেত। আল্লাহ্র ভয়ে কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অন্যদের সাথে কৌতুকও করতেন। হাসি-খুশি থাকা পসন্দ করতেন। প্রিয় নবী (সা) হালকা রসিকতাও করতেন। ইমাম বাগাবী (র) তাঁর সনদে বর্ণনা করেন :

اَتَتْ عَجُوْزَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَدْخُلَنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا اُمَّ فُلاَنٍ اَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا عَجُوْزَةٌ قَالَ فَوَلَّتْ تَبْكِىْ قَالَ اَخْبِرُوْهَا اَنَّهَا لاَ تَدْخُلُهَا وَهِىَ عَجُوْزَةٌ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ـ

এক বৃদ্ধা মহিলা নবী কারীম (সা)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন। তখন নবী কারীম (সা) বললেন : হে অমুকের মা ! বৃদ্ধা তো জান্নাতে যাবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে লাগলেন। নবী কারীম (সা) বৃদ্ধার এ অবস্থা দেখে লোকদের বললেন : তাকে জানিয়ে দাও, কেউ বৃদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে যাবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "আমি তাদের সৃষ্টি করব নবতররূপে। আমি তাদের কুমারী বানিয়ে দেব।"[১৫২]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, শরী'আতের আওতায় থেকে হাসি-কৌতুক করতে কোন দোষ নেই। হযরত আনাস (রা) বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰى اَنْ كَانَ لَيَقُوْلُ لِاَخٍ لِىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ـ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথে মিশতেন। এমনকি তিনি আমার এক ছোট ভাইকে বলতেন : হে আবূ উমায়ের! তোমার নুগায়ের (চড়ুই-এর অনুরূপ লাল ঠোঁটবিশিষ্ট) পাখি কি করেছে ?[১৫৩]

ইমাম তিরমিযী (র) এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নবী কারীম (সা) কৌতুক করতেন। আর তিনি একটি ছোট বালককে 'আবূ উমায়ের' উপনাম প্রদান করেন এবং এ উপনামে ডাকেন। এ হাদীস থেকে আরো বোঝা যায় যে, ছোট বালককে খেলার জন্য পাখি দেওয়া যায়।

মহানবী (সা)-এর কৌতুক সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, গ্রামে বসবাসকারী এক সাহাবীর নাম ছিল যাহির। তিনি যখন নবী কারীম (সা)-এর নিকট আসতেন তখন গ্রামে উৎপাদিত হাদিয়া (তরিতরকারি) নবী কারীম (সা)-এর নিকট পেশ করতেন। আর তিনি যখন মদীনা থেকে ফেরত যেতেন তখন নবী কারীম (সা) তাকে শহরের কিছু খাদ্যদ্রব্য দিতেন। একবার নবী কারীম (সা) তাঁকে বললেন :

اِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوْهُ ـ

যাহির আমাদের গ্রাম আর আমরা তার শহর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ভালবাসতেন। যাহির (রা) তেমন সুশ্রী ছিলেন না। একদিন তিনি কোন এক স্থানে দাঁড়িয়ে তার মাল-সামগ্রী বিক্রি করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিকট আসেন এবং পিছনদিক থেকে নিজের হাত দিয়ে যাহিরের চোখ এমনভাবে ঢেকে নেন যাতে যাহির (রা) তাঁকে চিনতে না পারেন। তখন যাহির (রা) বলেন, এই কে ? আমাকে ছেড়ে

দাও! তারপর তিনি লক্ষ্য করেন এবং নবী কারীম (সা)-কে চিনে ফেলেন। তাঁকে চেনার পর যাহির (রা) আপন পিঠ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্ষের সাথে মিলিয়ে নিলেন। তখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا وَاللّٰهِ تَجِدُنِىْ كَاسِدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لٰكِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ اَوْ قَالَ اَنْتَ عِنْدَ اللّٰهِ غَالٍ ۔

কে এই দাসটিকে ক্রয় করবে ? তখন যাহির (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি আমাকে বিক্রি করেন তবে অতি কম মূল্যই পাবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কিন্তু তুমি আল্লাহ্র নিকট স্বল্প মূল্যের নও। অথবা তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত মূল্যবান।[১৫৪]

হযরত আনাস (রা) থেকে মহানবী (সা)-এর কৌতুক সম্পর্কিত অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে :

اَنَّ رَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلَ اِلاَّ النُّوْقُ ۔

কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একটি সওয়ারীর জন্তু চান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, একটি উট্নীর বাচ্চা তোমাকে দেব। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উট্নীর বাচ্চা দিয়ে কী করব ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, প্রত্যেক উটই তো উট্নীর বাচ্চা।[১৫৫]

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে বোঝা যায়, কৌতুক ও রসিকতা করা মুবাহ্। ইমাম গাযালী (র) বলেন, যে হাসি-ঠাট্টা বা কৌতুকে অশ্লীলতা নেই, তা হালাল। তবে অধিক মাত্রায় কৌতুক করা এবং সবসময় কৌতুকে নিয়োজিত থাকা নিষিদ্ধ। কারণ অধিক মাত্রার কৌতুক অধিক হাসি-ঠাট্টার উদ্রেক ঘটায়। আর অধিক হাসি অন্তর থেকে আল্লাহ্র ভয়-ভীতি দূর করে দেয়। কোন কোন অবস্থায় তা প্রতিহিংসা সৃষ্টি করে। যে হাসি-ঠাট্টায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ।

মহানবী (সা) বলেন :

وَيْلٌ لِلَّذِىْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ يُضْحِكُ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ۔

ধ্বংস তার, যে লোকদের হাসাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস।[১৫৬]

মহানবী (সা) থেকে যে কৌতুকের বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল বাস্তব ও সত্য ঘটনা। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন :

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُلاَعِبُنَا قَالَ اِنِّىْ لاَ اَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا تُدَاعِبُنَا يَعْنِىْ تُمَازِحُنَا ۔

সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক করেন ? তখন তিনি বললেন : আমি সত্য ছাড়া কিছুই বলি না।

এমন কিছু খেলা আছে যা মনে আনন্দ সৃষ্টি করে, শরীরে শক্তি বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ লাভে সহায়তা করে, এ ধরনের খেলা শরী'আতে জায়িয। যেমন দৌড় প্রতিযোগিতা, তীর, তরবারি, বল্লম, বর্শা চালনা ইত্যাদি।

দৌড় প্রতিযোগিতা

সাহাবায়ে কিরাম দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। নবী কারীম (সা) তা করার জন্য তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। হযরত আলী (রা) দৌড়ে খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন ছিলেন।[১৫৭]

তীর নিক্ষেপ

তীর নিক্ষেপ খেলা শরী'আতসম্মত। এমনিভাবে হাতিয়ারসহ প্রত্যেক প্রকারের নিক্ষেপমূলক খেলা বৈধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমাদের জন্য তীরন্দাযী শিক্ষা করা কর্তব্য। কেননা এটা তোমাদের জন্য একটি উত্তম খেলা।[১৫৮]

বর্শা চালানো

তীর নিক্ষেপের ন্যায় বর্শা চালানোও একপ্রকার বৈধ খেলা। মহানবী (সা) মসজিদে নববীতে হাবশীদের এ খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন :

وكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحَرَابِ فَاَمَّا سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاَمَّا قَالَ اَتَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلٰى خَدِّهٖ وَهُوَ يَقُوْلُ دُوْنَكُمْ يَا بَنِيْ اَرْفِدَةَ حَتّٰى اِذَا مَلَلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِيْ ·

ঈদের দিন হাবশীরা বর্শা ও ঢালের খেলা খেলত। এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরয করলাম অথবা তিনি নিজেই বললেন : তুমি কি (তাদের খেলা) দেখতে চাও ? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের পাশে। তিনি তাদেরে বলছিলেন, চালিয়ে যাও হে বনূ আরফিদা (হাবশীদের উপাধি)! পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখন তিনি আমাকে বললেন : কি তোমার (দেখা) হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে চলে যাও।[১৫৯]

হাবশীদের এ খেলার দিনটি ছিল ঈদের দিন। তাদের খেলার সামগ্রীগুলো ছিল যুদ্ধাস্ত্র। হাদীসটির ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী (র) বলেন, এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, যুদ্ধের অস্ত্রাদিদ্বারা প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে খেলা করা বৈধ।

ঘোড় সওয়ারী

ঘোড় সওয়ারী একটি কল্যাণমূলক কাজ। ঘোড়া, খচ্চর, উট, গাধা প্রভৃতি জন্তুর ওপর সওয়ার হওয়া এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলা করা বৈধ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ سَبَقَ اِلاَّ فِيْ نَصْلٍ اَوْخُفٍّ اَوْحَافِرٍ ·

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ঘোড়া অথবা তীর নিক্ষেপ অথবা উটের প্রতিযোগিতা ব্যতীত অন্য প্রতিযোগিতা নেই।[১৬০]

ঘোড়া প্রতিযোগিতা খেলা বৈধ। তবে যে সব ঘোড়া জুয়া খেলায় ব্যবহৃত হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে শয়তানী ঘোড়া বলেছেন। তার মূল্য গ্রহণ, তাকে ঘাস খাওয়ানো এবং তার পিঠে সওয়ার হওয়াকে গুনাহ্ বলেছেন।[১৬১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোড়াকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন : ঘোড়া তিন ধরনের হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র ঘোড়া, মানুষের ঘোড়া এবং শয়তানের ঘোড়া। যে ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের কাজে নিয়োজিত, তা আল্লাহ্‌র ঘোড়া। তাকে ঘাস খাওয়ান, তার পায়খানা-পেশাব সব কিছুতেই কল্যাণ নিহিত। আর যে ঘোড়া জুয়া লেখায় বা বাজি ধরায় ব্যবহৃত হয়, তা শয়তানের ঘোড়া। আর লোকেরা যেসব ঘোড়া বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লালন-পালন করে, তা মানুষের ঘোড়া, তা দারিদ্র্য বিদূরণে কাজে লাগে।[১৬২]

শিকার করা

শিকার এক ধরনের খেলা, এটি বড় আনন্দদায়ক খেলা। এতে যেমন সামগ্রী মেলে, উপার্জন হয়, তেমনি তা ব্যায়াম চর্চাও বটে। ইহ্‌রাম অবস্থায় এবং হারাম শরীফে এ শিকার করা জায়িয নেই। শিকার তীর, বল্লম, বন্দুক বা শিকারী জন্তুদ্বারা করা যেতে পারে।

চিত্ত বিনোদন ও দেহ-মনকে আনন্দ দান করা, দিলের প্রশান্তি ও সুখানুভূতির ব্যবস্থা করা শরী'আতে নিষিদ্ধ নয়। এতে নবতর উদ্যম লাভ করা যায়, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, নতুন ও তাজা মন নিয়ে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয়। হযরত আলী মুরতাযা (রা) বলেন :

إِنَّ الْقُلُوْبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوْا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ ـ

দেহের ন্যায় মনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজেই ক্লান্তি দূর করার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত রসাত্মক আলোচনায় প্রবৃত্ত হও।

তিনি আরও বলেন :

رَوِّحُوا الْقَلْبَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ فَاِنَّ الْقُلُوْبَ اِذَا اُكْرِهَ عَمِيَ ـ

দিলকে সময়ের ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ ও শান্তি দান কর। কেননা দিলের অস্বস্তি তাকে অন্ধ বানিয়ে দেয়।[১৬৩]

কসম

কসম 'ইয়ামীন' শব্দের সমার্থক। আভিধানিক অর্থ 'শক্তি'। ইসলামী পরিভাষায় 'কসম' এমন এক শক্তিময় বন্ধনকে বুঝায় যারদ্বারা কসমকারী ব্যক্তির কোন কাজ করা বা না করার ইচ্ছা দৃঢ় করা হয়।[১৬৪]

কসম তিন প্রকার : ১. গামূস, ২. মুন'আকিদাহ্ ও ৩. লাগ্‌ব।

গামূস : অতীত বা বর্তমানকালের কোন বিষয় সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম খাওয়া। এই ধরনের কসম করা কাবীরা গুনাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ ۔

যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

এ জাতীয় কসমের কোন কাফ্ফারা নেই। এর পাপ থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ্র দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার করা।

মুন'আকিদাহ্ : ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার উপর কসম খাওয়া। যদি কসম ভঙ্গ করে তাহলে কাফ্ফারা দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা অনর্থক শপথের জন্য তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেসবের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। এর কাফ্ফারা, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্যদান যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান কিংবা একজন ক্রীতদাস মুক্তি। আর যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিনদিন রোযা রাখা। এটাই তোমাদের কসমের কাফ্ফারা। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৮৯)

লাগ্ব : লাগব বলা হয়, কসমকারী অতীত বা বর্তমানকালের কোন একটি বিষয়ে নিজের ধারণা অনুযায়ী কসম করছে অথচ বিষয়টি বাস্তবে তার ধারণামাফিক নয়, বরং তার বিপরীত। এই কসমের ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে তাকে পাকড়া করবেন না।

কসম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত

কসম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, আল্লাহ্র নাম অথবা আল্লাহ্র গুণাবলীর দ্বারা কসম করা। আল্লাহ্র ইয্যতের কসম, আল্লাহ্র মর্যাদার কসম, এই জাতীয় শব্দদ্বারা কসম করা যেতে পারে।

কিন্তু আল্লাহ্র ইল্মের কসম, আল্লাহ্র রাগের কসম, আল্লাহ্র রহমতের কসম শুদ্ধ নয়। কারণ, এসব শব্দ কসমের ক্ষেত্রে অপ্রচলিত। (হিদায়া)

উল্লেখ্য, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম করা হারাম। যদি কেউ এই জাতীয় কসম করে যেমন বলল, কা'বার কসম, নবীজীর কসম। তাহলে সে কসমকারী বলে গণ্য হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ ۔

তোমাদের কেউ কসম করলে সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে। অন্যথায় সে যেন চুপ থাকে।[১৬৫]

যদি কেউ কুরআনের কসম খায় তাহলে সেটা কসম বলে বিবেচিত হবে। যদি এইভাবে বলে যে, কুরআনের কসম, কালামুল্লাহ্র কসম অথবা কুরআন শরীফের প্রতি ইঙ্গিত করে

বলল, এই কুরআনে যে আল্লাহ্‌র কালাম আছে তার কসম, তাহলে কসম হবে। এই কসম ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮)

কসমের কাফ্‌ফারা

কসমের কাফ্‌ফারা তিনভাবে হতে পারে। পূর্বোল্লেখিত আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে :

১. একজন ক্রীতদাস বা দাসী আযাদ করে দেওয়া, ২. দশজন মিস্‌কীনকে বস্ত্র দান করা। প্রত্যেককে কমপক্ষে এতটুকু কাপড় দেওয়া যারদ্বারা নামায আদায় করা যায়, ৩. দশজন মিস্‌কীনকে খাবার দেওয়া। খাবরের ক্ষেত্রে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যম ধরনের খাবার দেওয়া।

যদি এই তিনটির কোনটিই সম্ভব না হয়, তাহলে ধারাবাহিকভাবে তিনদিন রোযা রাখতে হবে।[১৬৬]

যদি কোন ব্যক্তি কসম ভঙ্গ করার পূর্বেই কাফ্‌ফারা আদায় করে ফেলে, তাহলে তা আদায় হবে না। কারণ, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় কসম ভঙ্গ করার পর।[১৬৭]

পাপকাজের কসম করা

পাপকাজের কসম করা নিষিদ্ধ। তাই যদি কেউ কসম করে যে, আমি নামায আদায় করব না, পিতার সাথে কথা বলব না, অমুক ব্যক্তিকে অবশ্যই হত্যা করব ইত্যাদি। তাহলে নিজ থেকেই কসম ভঙ্গ করে তার কাফ্‌ফারা দিয়ে দেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ٠

যদি কোন ব্যক্তি (কোন কিছু করা বা না করার উপর) কসম করে, তারপর এর বিপরীত দিকটা তার কাছে উত্তম মনে হয়, তখন সে যেন উত্তম কাজটাই করে আর কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয়।[১৬৮]

যদি কোন ব্যক্তি নিজের উপর হালালকে হারাম করার কসম খায়, যেমন বলল, যদি আমার ভাই তার মেয়েকে অমুকের সাথে বিয়ে দেয় তাহলে আমার জন্যে এখানে থাকা হারাম হবে। পরিভাষায় এটাও কসম। এই জাতীয় কসমের ক্ষেত্রে যদি ঐ হালাল কাজটি সে করে, তাহলে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

অনুরূপভাবে পূর্ব থেকেই হারাম কাজকে যদি নিজের উপর কসম খেয়ে হারাম করে, সেক্ষেত্রেও কসম হয়ে যাবে। কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হবে। যেমন কেউ বলল, ভবিষ্যতে আমার জন্যে সিনেমা দেখা হারাম, অথবা শরাব পান করা হারাম, যদি এই কাজ করে তাহলে এর জন্য কঠিন গুনাহগার হবে। সাথে সাথে কসমের কাফ্‌ফারাও দিতে হবে।[১৬৯]

কসম সম্পর্কিত বিবিধ মাসাইল

যদি কোন ব্যক্তি 'ইনশাআল্লাহ্' (যদি আল্লাহ্ চান) যোগ করে কসম করে, তাহলে

কসম কার্যকর হবে না। যেমন কেউ বলল, আল্লাহ্‌র কসম, ইনশাআল্লাহ্ আমি মুরগী খাব না। তাহলে তার কসম হয়নি।[১৭০] আর যদি কিছুক্ষণ বিরতির পর 'ইনশাআল্লাহ্' বলে তবে কসম কার্যকর হবে।[১৭১]

কসম পরিপূর্ণ ও কার্যকর হওয়ার জন্যে তা মুখে উচ্চারণ করা জরুরী। যদি কোন ব্যক্তি মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে কসম করে, তাহলে কসম পূর্ণ ও কার্যকর হবে না এবং সংকল্প বিরোধী কিছু করে বসলে কাফ্ফারাও দিতে হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি এই মর্মে কসম করে যে, আমি ঘরে প্রবেশ করব না। তারপর সে কা'বা শরীফ, মাসজিদ, মন্দির কিংবা গীর্জা ঘরে প্রবেশ করল। তাহলে সে কসম ভেঙ্গেছে বলা যাবে না। কারণ, পরিভাষায় মানুষ সাধারণ ঘর বলতে এগুলোকে বুঝে না। (হিদায়া)

অনুরূপ ঘরের সাথে সম্পৃক্ত যেসব অংশ রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি এবং দরজা বন্ধ করলে তা ঘরের আওতায়ও পড়ে না এমন স্থানে প্রবেশ করলেও ঘরে প্রবেশ করেছে বলা যাবে না।

কেউ যদি কোন বাড়িতে অবস্থানরত অবস্থায় কসম করে বলে, আমি এই বাড়িতে প্রবেশ করব না। তাহলে এই বাড়ি থেকে বের হয়ে পুনরায় এই বাড়িতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি বলে, আমি এই বাড়িতে বসবাস করব না, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যেতে হবে। দেরী করলে কসম ভেঙ্গে যাবে।

অনুরূপভাবে যদি কসম করে যে, আমি এই বাড়িতে বসবাস করব না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তার সামানপত্র ও পরিবারের লোকজন সেখানেই রয়ে গেল, তাহলে সে কসমভঙ্গকারী বলেই গণ্য হবে। কারণ, মাল-সামান ও পরিবারের লোকজন বাড়িতে অবস্থান করলে সেও অবস্থান করছে বলে সমাজে মনে করা হয়। (হিদায়া)

কেউ যদি কসম করে আমি মসজিদ থেকে বের হব না। তারপর অন্য কাউকে আদেশ করল আমাকে বের করে দাও এবং বের করেও দিল। তাহলে কসম ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য যদি কেউ জোর করে বের করে দেয়, তাহলে কসম ভাঙ্গবে না। কারণ এতে তার হাত নেই।

কেউ কসম করল, আমি জানাযায় অংশগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন কাজে ঘর থেকে বের হব না। তারপর সে জানাযায় বের হল। ইত্যবসরে অন্য কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে চলে গেল। তাহলে তার কসম ভাঙ্গবে না। কারণ, তার বের হওয়াটা ছিল জানাযার উদ্দেশ্যেই।

কেউ যদি কসম করে, আমি এই গাছ থেকে কিছু খাব না, তাহলে এর ফল খেলেই কসম ভেঙ্গে যাবে। কসম করল, গোশ্‌ত খাবে না। পরে মাছ খেল। এতে কসম ভাঙ্গবে না। যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। তারপর সে ঐ ব্যক্তির সাথে এতটুকু কথা বলল যে, ঐ ব্যক্তি সজাগ থাকলে শুনতে পেত। কিন্তু সে ছিল ঘুমন্ত। তাই শুনতে পায়নি। এমতাবস্থায় কসম ভেঙ্গে যাবে। যদি কসম করে বলে, আমি কথা বলব না, যদি নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে, তবে কসম ভাঙ্গবে না। যদি নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করে, তাহলে কসম ভেঙ্গে যাবে।[১৭২] কেউ বলল, আমি যদি অমুক কাজটি করে

থাকি, তাহলে আমার উপর একমাস রোযা ওয়াজিব হবে। দেখা গেল সে ঐ কাজটি করেছে। তাহলে একমাসের রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে।[১৭৩] কেউ বলল, আমি যদি তোমার ঘরে প্রবেশ করি তাহলে আমি আমার পিতার সন্তান নই। পরে সে সেই ঘরে প্রবেশ করল। এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদি কোন ব্যক্তি কসম খায়, আমি এই গাভীর দুধ পান করব না। তাহলে এই গাভীর দুধ থেকে তৈরি ঘি খেতে পারবে এবং এর বাচ্চার দুধও পান করাতে কোন আপত্তি নেই। কেবল এই গাভীর দুধ পান করলেই কাফ্ফারা দিতে হবে। কেউ কসম করল, আমি অমুক দিন কর্জ পরিশোধ করব। যদি এর পূর্বেই আদায় করে দেয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কসমের কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে যদি ধীরে ধীরে আদায় করে, যেমন আজকে কিছু দিল, আট-দশদিন পর আবার কিছু দিল; কিছু দিল দশজন মিস্কীনকে নির্ধারিত পরিমাণে, তাহলে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যদি একজন মিস্কীনকে দশদিন দুই বেলা করে আহার করায় তাতেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। ধনী ব্যক্তি যদি কসমের কাফ্ফারা রোযার মাধ্যমে আদায় করে, তাহলে কাফ্ফারা আদায় হবে না।

মানত

মানতকে আরবীতে 'নযর' বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ মানত করা, ভয়-ভীতি। ইমাম রাগিব ইসপাহানী (র) বলেন, নযরের পরিভাষিক অর্থ হল, আল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রকাশের লক্ষ্যে ওয়াজিব নয় এমন কোন কাজকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া। তবে শর্ত হল, ঐ কাজ যেন কোন ওয়াজিব ইবাদত জাতীয় হয়।[১৭৪]

মানত সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যে কাজের মানত হয় সেটা পুণ্যময় কাজ হতে হবে। সুতরাং পাপ ও অন্যায় কাজের মানত করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। সম্পদের ব্যাপারে মানত করা হলে তা নিজের মালিকানাধীন সম্পদ হতে হবে। অন্যের সম্পদের ক্ষেত্রে মানত করলে তা সহীহ্ হবে না।[১৭৫]

উল্লেখ্য, যে কাজের মানত করা হবে সে কাজটি নেককাজ হওয়ার অর্থ হলো, সেই কাজটি 'ইবাদতে মাক্সুদাহ্' হতে হবে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে মানত করা হচ্ছে সে উদ্দেশ্য হাসিলের প্রেক্ষিতে এমন কিছু করার মানত করতে হবে যা কোন না কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব বা ফরয হয়। যেমন রোযা রাখা, নামায আদায় করা ইত্যাদির মানত করা।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করলে মানত হবে না। কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নামে মানত করা শির্ক। মানত করার পর তা পূরণ করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

মানতের কাফ্ফারার আহার্য, অর্থ ও অন্যান্য বস্তু পাওয়ার যোগ্য তারাই, যারা যাকাত ও ওয়াজিব সাদাকা পাওয়ার যোগ্য।[১৭৬] মানত করার শরী'আতসম্মত পদ্ধতি হলো এরূপ বলা, যদি আমার কাজটি হয়ে যায় তাহলে আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে এত টাকা সাদাকা করে দেব, অথবা গরু-ছাগল যবেহ্ করে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিব, অথবা এই সংখ্যক রোযা রাখব কিংবা এত রাকা'আত নামায আদায় করবো ইত্যাদি।

মানত করার সময় যদি কোন স্থান, সময় বা কোন ফকীরকে নির্দিষ্ট করে মানত করা হয়, তাহলে তা রক্ষা করা মানতকারীর জন্য আবশ্যিক নয়; বরং অন্য সময়, অন্য স্থানে অন্য যে কাউকে দিলেও মানত আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি বিশেষ কোন বস্তুর মানত করা হয়, তাহলেও ঐ বস্তুর সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা করে দিলেও মানত আদায় হয়ে যাবে। কিংবা তার সমমানের অন্য কিছুও দিতে পারে।[১৭৭]

মানত সম্পর্কিত বিবিধ মাসাইল

যদি কোন ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট কোন প্রাণী মানত করে, এবং সে প্রাণী যদি মারা যায় তাহলে মানতকারী যদি গরীব হয় তাহলে তাকে মানত পূরণ করতে হবে না। যদি ধনী হয় তাহলে নতুনকরে আরেকটি প্রাণী খরিদ করে মানত পূরণ করতে হবে।[১৭৮]

আল্লাহ্ ছাড়া কোন পীর-বুযুর্গের নামে মানত করা হারাম। কোন গাভী মানত করার পরে যদি তার পেটে বাচ্চা পাওয়া যায় তবে এই বাচ্চাও মানতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি মানত করল যে, আমার যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে একটি গরু সাদাকা করব। সন্তান জন্মলাভের পর সে যদি আস্তে আস্তে সেই গরুর মূল্য গরীব-মিস্কীনকে সাদাকা করে দেয়, তাহলে তা জায়িয আছে। তবে আদায়ের ব্যাপারে গরুর পূর্ণ মূল্য যাতে আদায় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারো মা অসুস্থ হলে যদি সে নিয়্যাত করে যে, আমি মসজিদে আল্লাহ্র ওয়াস্তে পাঁচশত টাকা দিব। তারপর তার মা অসুস্থ অবস্থায়ই মারা যায়। এমতাবস্থায় নিয়্যাতকারী ঐ টাকাটা মসজিদে অথবা কোন গরীব-মিস্কীনকে দিয়ে দিবে। এই টাকা দিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে খানাপিনা করানো জায়িয হবে না।[১৭৯]

মানত করা কুরবানীর গোশ্ত মানতকারী নিজে খেতে পারবে না। এটা গরীব-মিস্কীনের হক। তাদেরকেই তা বন্টন করে দিতে হবে। নির্ধারিত গরু-ছাগলের মানত না করে যদি সাধারণভাবে গরু-ছাগল মানত করে, তাহলে কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত পালনীয়, মানতের ক্ষেত্রেও সেগুলো পালনীয়।

যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের শর্তে মানত করে, তাহলে শিরনী বিতরণ না করে সমপরিমাণ অর্থও ফকীর-মিস্কীনকে বন্টন করে দিতে পারে। কিন্তু সেই অর্থ দিয়ে মসজিদের জন্য কোন আসবাবপত্র ক্রয় করে দিতে পারবে না। মানতের নামায সামর্থ্য থাকলে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। কোন গরীবকে কিছু টাকা দেওয়ার মানত করার পর তার কাছে পূর্বে পাওনা টাকা মাফ করে দিলে এতে মানত আদায় হবে না। তবে পাওনা টাকা উসূল করে যদি সেই ব্যক্তিকেই ঐ টাকা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আদায় হয়ে যাবে।

নিজের সন্তানের সুস্থতা, জীবিত ফেরত আসা বা অন্য কোন বৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের শর্তে যদি গরীবদের মধ্যে শিরনী, মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণের মানত করে, তাহলে মানত শুদ্ধ হবে। তবে মানতে উল্লিখিত জিনিসগুলোই বন্টন করা জরুরী নয়। এর মূল্য ফকীর-মিস্কীনকে দিয়ে দিলেও তা আদায় হয়ে যাবে।[১৮০]

উট যবেহ্ করার মানত করলে তদস্থলে সাতটি বকরী যবেহ করলেও মানত আদায় হয়ে যাবে।[১৮১]

মানতের পশু নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়িয নয়। যেমন : হালচাষ করা বা বোঝা বহন করা ইত্যাদি।

কোন মহিলার স্বামী বা কোন আপনজন অসুস্থ হয়ে পড়ল অথবা কঠিন বিপদে আক্রান্ত হলো। তখন সে ছয়মাসের রোযার মানত করল। মানতের পর সে রোগ কিংবা বিপদমুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু মানতকারী উক্ত মহিলা মানত পূরণে দেরী করে ফেলল। অবশেষে সে নিজেও এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, তখন আর তার পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় তাকে সুস্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যদি সুস্থ হওয়ার আশা একেবারেই না থাকে তাহলে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে মানতের রোযাগুলোর 'ফিদয়া', আদায় করার অসিয়্যাত করে যেতে হবে। কিন্তু সে বেঁচে থাকতে 'ফিদয়া' দিতে পারবে না। যদি 'ফিদয়া' দিয়ে দেয় তবে তবে রোযা আদায় হবে না। সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় ছয়মাসের রোযা রাখতে হবে।

ছেলে অসুস্থ, পিতা মানত করল যদি ছেলেটা ভালো হয়ে ওঠে তাহলে দশজন হাফিয ডেকে কুরআন খতম করাব। মনে মনে তাঁদেরকে খানাপিনারও নিয়্যাত করল। এমতাবস্থায় এটা কোন মানতই হয়নি। তাই ছেলের সুস্থতার পর কিছুই করা আবশ্যক নয়।[১৮২]

কেউ মানত করল, আমি বাগদাদ শরীফ গিয়ে হযরত আবদুল কাদির জীলানী (র) অথবা অন্য কোন পীরের মাযারের গিলাফ বানিয়ে দেব। এই জাতীয় মানত করার দ্বারা তা পূরণ করা আবশ্যক নয়। যদি মানতকারী এই পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতেই চায় তাহলে যেন তা গরীব-মিস্কীনদেরকে সাদাকা করে দেয় এবং এর সাওয়াব যদি সেই বড়পীরের রূহতে বখ্শীশ করে দেয়, তা জায়িয হবে।

কেউ যদি একটি বক্‌রী এই নিয়্যাতে পোষে যে, এরদ্বারা বড়পীর সাহেবের নামে খানা খাওয়াব। যদি উদ্দেশ্য এই থাকে যে, আল্লাহ্‌র নামে ছগলটা যবেহ্ করে গোশ্ত মানুষকে সাদাকা করে দেব, তাহলে এটা জায়িয। আল্লাহ্‌র নামে যবেহ্ করার পর এটা গরীব-মিস্‌কীনদের খাওয়ানো জায়িয। কিন্তু যবেহ্ যদি পীরের নামে করা হয়, তাহলে তা জায়িয হবে না।

কেউ যদি মানত করে যে, আমার সন্তান সুস্থ হলে কিংবা বিপদমুক্ত হলে একটি গরু বা অন্য কোন পশু আল্লাহ্‌র নামে ছেড়ে দিব। সন্তান সুস্থ হলে কিংবা বিপদ কেটে গেলে উক্ত প্রাণী এভাবে যথারীতি ছেড়েও দেয়, এভাবে মানত করা সহীহ্ নয় এবং পশু ছেড়ে দেওয়াও জায়িয নয়। এভাবে মানত করে পশু ছেড়ে দেওয়ার পরও ঐ ব্যক্তিই এই প্রাণীর মালিক থেকে যাবে। সে নিজে অথবা তার অনুমতিতে অন্য যে কেউ এটা যবেহ করে খেতে পারে এবং বেচাকেনা করতে পারবে।[১৮৩]

'যদি এতদিনের মধ্যে আমার অমুক কাজ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্‌র নামে এত টাকা দান করব', এইভাবে মানত করার পর যদি নির্ধারিত সময়ের ভিতর কাজটি সম্পন্ন না হয় তাহলে এই মানত পূরণ করা জরুরী নয়।

মানত পূরণ করার সময় মারা গেল। যদি মারা যাওয়ার সময় সে অসিয়্যাত করে যায় আর তার অসিয়্যাত পূরণ করার মত শরী'আতসম্মত সম্পদ থাকে, তাহলে তার ওয়ারিসদের উপর তা আদায় করা জরুরী। অসিয়্যাত করে না গেলে ওয়ারিসদের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

এক ব্যক্তি মানত করল আমি যখন আমার নতুন বাড়িতে থাকতে শুরু করব তখন বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করে খানা খাওয়াব। এদিকে তার ছেলের আকীকা করারও প্রয়োজন ছিল। সে আকীকা করে বন্ধু-বান্ধব দাওয়াত করে খাইয়ে দিল এতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, এই জাতীয় কথার দ্বারা মানত সহীহ্ হয় না। তাই খাওয়ানোটা ওয়াজিব ছিল না।[১৮৪]

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাহরুর রাইক, ইবনুন নুজাইম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।
২. আল-ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭।
৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭-১৪৮।
৪. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩-১৫৪।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পাদটীকা পৃ. ১৬৬-১৬৮।
৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. ফিকহী মাকালাত, মাওলানা তকী উসমানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০।
১৩. আবূ দাঊদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।
১৪. ফিকহী মাকালাত, পৃ. ২২৫।
১৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২১।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২২।
২৩. হিদায়া, ভাষ্য ও পার্শ্বটীকা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬।
২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. আল-ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৬।
৩০. প্রাগুক্ত।
৩১. প্রাগুক্ত।
৩২. তাকমিলা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।
৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১।
৩৫. প্রাগুক্ত।
৩৬. আল-ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।
৩৮. প্রাগুক্ত।
৩৯. হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩।
৪০. আল-ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩।
৪১. হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬২।
৪২. প্রাগুক্ত।
৪৩. প্রাগুক্ত।
৪৪. হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮১-২৮২।
৪৫. ইব্‌ন মাজাহ, পৃ. ১৭৮।
৪৬. হিদায়া, কিতাবুল ইজারাত।
৪৭. প্রাগুক্ত।
৪৮. প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৭-২৯৯।
৪৯. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২।
৫০. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০০।
৫১. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১৭।
৫২. প্রাগুক্ত।
৫৩. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০২-৫০৪।
৫৪. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৪-৫০৫।
৫৫. প্রাগুক্ত পৃ. ৫২২।
৫৬. প্রাগুক্ত পৃ. ৫২২-৫২৩।
৫৭. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১১।
৫৮. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।
৫৯. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।
৬০. প্রাগুক্ত।
৬১. প্রাগুক্ত।
৬২. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।
৬৩. কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, সাইয়্যেদ মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্‌সান (র) পৃ. ২৬৭।
৬৪. বুখারী শরীফ সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪১।
৬৫. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ৫০।
৬৬. প্রাগুক্ত।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৬৮. মুসনাদে আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)।
৬৯. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ. ৫২।
৭০. ফিকহুস সুন্নাহ, আস-সায়্যিদ সাবিক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬।
৭১. প্রাগুক্ত।
৭২. প্রাগুক্ত।
৭৩. প্রাগুক্ত।
৭৪. আল-ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরাবা'আহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯।
৭৫. নাতাইজুল আফকার, ৯ম খণ্ড; আহমদ ইব্‌ন কুদর, পৃ. ৫০২।
৭৬. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৫৯।
৭৭. আহমাদ ও ইব্‌ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৬১।
৭৮. ফিকহুয্ যাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
৭৯. কুরআনে বিজ্ঞান, ডা. গোলাম মোয়াজ্জম, পৃ. ৬২।
৮০. আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।
৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৮২. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৮৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫২।
৮৪. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৬১।
৮৫. আবূ দাউদ, পৃ. ৫৩৪।
৮৬. ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭।
৮৭. আহ্‌কামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
৮৮. ফিকহুস্ সুন্নাহ্, পৃ. ২২।
৮৯. শামী, ৫ম খণ্ড।
৯০. নাতাইজুল আফ্‌কার, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭।
৯১. প্রাগুক্ত।
৯২. ফিকহুস্ সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭।
৯৩. আবূ দাউদ ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৫৮।
৯৪. হিদায়া।
৯৫. নাতাইজুল আফ্‌কার, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩।
৯৬. হিদায়া।
৯৭. প্রাগুক্ত।
৯৮. প্রাগুক্ত।
৯৯. নাতাইজুল আফ্‌কার, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯।
১০০. ফিকহুস্ সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০।
১০১. মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪।
১০২. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৫।
১০৩. মা'আরেফুল কোরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯।
১০৪. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ, ৪৯৪।
১০৫. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫।
১০৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।
১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪।
১০৯. উমদাতুল ক্বারী, বদরুদ্দীন আইনী, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১৭১।
১১০. ফিক্হুস্ সুন্নাহ্, পৃ. ৫২২-৫২৪।
১১১. প্রাগুক্ত।
১১২. তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯।
১১৩. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ. ১০৮।
১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯।
১১৫. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ. ১০৪।
১১৬. প্রাগুক্ত।
১১৭. ফিকহুস্ সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩২-৫৩৩।
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮।
১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০।
১২০. ফাতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১০।
১২১. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯।
১২২. মুসলিম শরীফ, সূত্র : রিয়াদুস্ সালিহীন, পৃ. ২৮৫।
১২৩. ফিকহুস্ সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩।
১২৪. আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬২।
১২৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।
১২৬. উমাদাতুল ক্বারী, ১১ খণ্ড, পৃ. ১২।
১২৭. উমাদাতুল ক্বারী, ১১ খণ্ড, পৃ. ১৪।
১২৮. ইমাম ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে একত্রে সাহিবাইন বলা হয়।
১২৯. ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯।
১৩০. প্রাগুক্ত।
১৩১. নাতাইজুল আফ্কার, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৮।
১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০।
১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
১৩৪. হিদায়া ও নাতাইজুল আফ্কার, পৃ. ১৭।
১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ২২।
১৩৬. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ. ১১৬।
১৩৭. নাতাইজুল আফ্কার, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২২।
১৩৮. প্রাগুক্ত।
১৩৯. তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৭৮।
১৪০. কাযীখান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭১; নাতাইজুল আফ্কার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।
১৪১. প্রাগুক্ত।
১৪২. ফিকহুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২।
১৪৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।
১৪৪. ইব্‌ন মাজাহ, পৃ. ২৭৫।
১৪৫. উমাদাতুল ক্বারী, শরহে বুখারী, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৯৫।

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৯৪।
১৪৭. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৭৩।
১৪৮. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৭৩।
১৪৯. কাযীখান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭২।
১৫০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮১।
১৫১. কাযীখান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭২।
১৫২. তাফসীরে খাযিন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৯।
১৫৩. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯।
১৫৪. শামাইলে তিরমিযী, পৃ. ১৬।
১৫৫. শামাইলে তিরমিযী, পৃ. ১৬।
১৫৬. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২-২৭৪।
১৫৭. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ. ৩৭৪।
১৫৮. ফিকহুস্ সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০।
১৫৯. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১।
১৬০. তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৩৭।
১৬১. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ. ৩৭৮।
১৬২. ফিকহুস্ সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১-৬২।
১৬৩. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ. ৩৭২।
১৬৪. হিদায়া ২য় খণ্ড, পাদটীকা, পৃ. ১১; আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১।
১৬৫. মিশকাত, পৃ. ২৯৬।
১৬৬. হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮১।
১৬৭. প্রাগুক্ত।
১৬৮. বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮৪; হিদায়া ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২।
১৬৯. আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৫।
১৭০. আলমগীরী, ২য় খণ্ড।
১৭১. প্রাগুক্ত।
১৭২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭।
১৭৩. প্রাগুক্ত।
১৭৪. কাওয়াইদুল ফিক্হ।
১৭৫. ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১৫৭।
১৭৬. বেহেশ্তী জেওর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭।
১৭৭. আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০।
১৭৮. ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৯৮।
১৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
১৮০. আহ্সানুল ফাতাওয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৩।
১৮১. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬।
১৮২. প্রাগুক্ত।
১৮৩. মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৩।
১৮৪. প্রাগুক্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

অসিয়্যাত, ওয়াক্ফ ও মীরাস

অসিয়্যাতের পরিচিতি ও গুরুত্ব

'অসিয়্যাত'-এর আভিধানিক অর্থ আদেশ দান, ভার অর্পণ। এটা অসিয়্যাতকারীর জীবদ্দশায় বা তার মৃত্যুর পরে পালনের জন্যও হতে পারে।[১]

শরীআতের পরিভাষায় অসিয়্যাত বলতে কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরবর্তীকালের জন্য কাউকে কোন কিছুর মালিকানা প্রদানার্থে নির্দেশ দান বুঝায়।[২]

যে বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয় তাকেও অসিয়্যা বলে।[৩]

কোন সম্পত্তিও হতে পারে কিংবা সম্পত্তির উপকার-উপযোগ, যার প্রতি অসিয়্যাত কার্যে পরিণত করার ভার অর্পিত হয় তাকে অসী (ট্রাস্টি) বলা হয়।[৪]

জীবনের ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার করার আখেরী সুযোগ এ অসিয়্যাতের বিধান এবং সেই সঙ্গে একটা উত্তম কাজ করে বিদায় নেওয়ার এক সুন্দরতম ব্যবস্থা বটে। প্রিয় নবী (সা) ইরশাদ করেন :

انَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ اَمْوَالِكُمْ فِىْ اٰخِرِ اَعْمَالِكُمْ زِيَادَةً عَلٰى اَعْمَالِكُمْ فَضَعُوْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ .

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদদ্বারা দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন, যাতে তোমরা তোমাদের জীবনের শেষকালে বিগত পুণ্যের উপর অধিকতর পুণ্য অর্জন করতে পার। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা তোমরা এ সম্পদ ব্যয় করো।[৫]

যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসে কোন অংশ নেই, তাদের জন্য অসিয়্যাতের অনুমতি রয়েছে। অনাত্মীয় সম্পর্কেও অসিয়্যত জায়িয। যেসব আত্মীয়-স্বজনের মীরাসে অংশীদারিত্ব রয়েছে তাদের জন্য অসিয়্যাত নিষিদ্ধ। কিন্তু অপরাপর ওয়ারিস যদি অনুমতি দেয় তবে বিশেষ বিশেষ কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়্যাত করা জায়িয। এ সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الاَّ اَنْ تُجِيْزَهُ الْوَرَثَةُ .

কোন ওয়ারিসেরও অসিয়্যাত বৈধ নয়। তবে অপরাপর ওয়ারিসগণ অনুমতি দিলে তা জায়িয।[৬]

মীরাসের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অসিয়্যাত এবং ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ .

ইহা যা অসিয়্যাত করা হয় তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। (সূরা নিসা, ৪ : ১১)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ .

হে মু'মিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসিয়্যাত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ১০৬)

অসিয়্যাত বৈধ হওয়ার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর অসিয়্যাতের ঘটনা। তিনি অসুস্থ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর শয্যাপাশে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি অসিয়্যাত করতে চাই। নবী কারীম (সা) বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ ? নবী কারীম (সা) বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? নবী কারীম (সা) বললেন : এক-তৃতীয়াংশ। তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া উত্তম।[৭]

বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ 'আদ্-দুররুল মুখ্তার'-এ অসিয়্যাতকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (ক) ওয়াজিব, (খ) মুবাহ্, (গ) মাকরূহ্ ও (ঘ) মুসতাহাব।[৮]

সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জসহ আল্লাহ্ ও বান্দার যে সমস্ত হক আদায় থেকে যায়, সে সম্পর্কে অসিয়্যাত করে যাওয়া ওয়াজিব। ধনী ব্যক্তি সম্পর্কে অসিয়্যাত করা মুবাহ্। আল্লামা ইব্ন আবিদীন (র) বলেন, ধনী ব্যক্তি যদি ইল্ম অনুরাগী ও সৎকর্মপরায়ণ হয় অথবা এমন আত্মীয় হয় যে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা এমনিতে ধনী হলেও তার পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি হয়, তবে তার জন্য অসিয়্যাত করা উত্তম হবে। ফাসিক পাপাচারীর জন্য অসিয়্যাত করা মাকরূহ্। তবে অসিয়্যাতের ফলে যদি ফাসিক ব্যক্তির সংশোধনের আশা করা যায়, যেমন চোর হয়ত চুরি করা ছেড়ে দিবে, তবে তার জন্য অসিয়্যাত করা উত্তম হবে।

এছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। প্রিয় নবী (সা) অসিয়্যাত করার জন্য উৎসাহ দান করেছেন। যেমন পূর্বে বর্ণিত হাদীস : "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদদ্বারা দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন। যাতে তোমরা তোমাদের জীবনের ক্রান্তিকালে বিগত পুণ্যের উপর অধিকতর পুণ্য অর্জন করতে পার। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা তোমরা এ সম্পদ ব্যয় কর।"[৯]

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন :

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ لَّهُ شَيْئٌ يُوْصٰى فِيْهِ اَنْ يَّبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ وَفِىْ رِوَايَةٍ ثَلَاثُ لَيَالٍ اِلاَّ وَصِيَّةٌ مَّكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ .

অসিয়্যাত করতে পারে এমন কোন সম্পদ যদি কোন মুসলিমের থাকে, তবে সে সম্পর্কে অসিয়্যাত লিখে নিজের কাছে রেখে তার পক্ষে দুই কি তিন রাত কাটানো উচিত নয়।[১০]

অসিয়্যাতের নিয়ম-নীতি

অসিয়্যাত সংঘটিত হয় প্রস্তাব ও গ্রহণের মাধ্যমে। মূসী (অসিয়্যাতকারী) প্রস্তাব করবে এবং মূসা-লাহু (যার জন্য অসিয়্যাত করা হয়) কবূল বা গ্রহণ করবে। যেমন মূসী বলবে, আমি

অমুকের জন্য এক হাজার টাকা বা আমার অমুক বাড়িটি কিংবা অমুক গরু বা গাছটি অসিয়্যাত করলাম। অতঃপর মূসা-লাহু বলবে, আমি গ্রহণ করলাম। অসিয়্যাতের প্রস্তাব গ্রহণের প্রকৃত সময় হচ্ছে মূসীর মৃত্যুর পর। তার মৃত্যুর আগে মূসা-লাহু গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান যাই করুক তা ধর্তব্য নয়। কাজেই মূসীর মৃত্যুর আগে সে যদি প্রত্যাখ্যানও করে তবুও মৃত্যুর পর তার গ্রহণ বৈধ হবে। অনুরূপ মূসীর মৃত্যুর পূর্বে সে গ্রহণ করলে মৃত্যুর পর তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।[১১]

মূসা-লাহু কর্তৃক গ্রহণ করে নেওয়ার পর অসিয়্যাত চূড়ান্ত ও অনিবার্য হয়ে যায় এবং মূসা-বিহী (অসিয়্যতের বস্তু)-তে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর আর মূসীর ওয়ারিসের সম্পত্তি ছাড়া তার তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে না। মূসা-লাহু প্রত্যাখ্যান করলে অসিয়্যাত বলবৎ থাকে না। কাজেই একবার প্রত্যাখ্যান করে ফেললে তারপর আর তা গ্রহণ করার অধিকার থাকে না।[১২]

অসিয়্যাতের শর্তাবলী

(ক) ঐচ্ছিক দান-খয়রাত করার অধিকারী হওয়া তথা প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

(খ) স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে অসিয়্যাত করা। কাজেই পরিহাস স্বরূপ, চাপের মুখে কিংবা ভুলবশত অসিয়্যাত করলে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা এগুলো ইচ্ছার পরিপন্থী।

(গ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমপরিমাণ বা তার বেশি ঋণ না থাকা। এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অসিয়্যাত সহীহ্ নয়। কেননা ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব আর অসিয়্যাত হচ্ছে নফল। নফলের উপর ওয়াজিব অগ্রাধিকার রাখে। এ কারণেই পরিত্যক্ত সম্পত্তিদ্বারা প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হয় এবং তারপর অবশিষ্ট থাকলে অসিয়্যাত পূরণ করতে হয়।[১৩]

যার জন্য অসিয়্যাত করা হয় (মূসা-লাহু)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলী

(ক) অসিয়্যাতকালে তার জীবিত থাকা। মৃত কিংবা অনাগত ব্যক্তির জন্য অসিয়্যাত বৈধ নয়। ছয়মাসের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী গর্ভস্থ সন্তানের জন্য অসিয়্যাত বৈধ।

(খ) ওয়ারিসের জন্য অসিয়্যাত বৈধ নয়, তবে অন্য সব-ওয়ারিস-এর অনুমতি থাকলে তা বৈধ থাকবে।

(গ) হত্যাকারীর জন্য অসিয়্যাত করা জায়িয নেই।[১৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ ۔

"হত্যাকারীর জন্য অসিয়্যাত বৈধ নয়।" অবশ্য হত্যাকারী শিশু বা উন্মাদ হলে তার জন্য অসিয়্যাত বৈধ। উল্লেখ্য, হত্যাকারীর জন্য যে অসিয়্যাত করা জায়িয নয় এটা মূসীর ওয়ারিসদের স্বার্থে। কাজেই ওয়ারিসগণ যদি অনুমতি দেয় তবে জায়িয হবে।

যে বস্তু সম্পর্কে অসিয়্যাত করা হয় (মূসা-বিহী) তা কোন মাল (সম্পদ) বা এ জাতীয় কোন কিছু হতে হবে। মূসা-বিহী কেবল মাল হলেই চলবে না, বরং তার মূল্যও থাকতে হবে। সুতরাং কোন মুসলিমের পক্ষে মাদক দ্রব্যের অসিয়্যাত বৈধ নয়। বাড়িতে বসবাস, জমিতে চাষাবাদ এবং বাগানের ফসল ভোগ করা ইত্যাদির ব্যাপারে অসিয়্যাত করা বৈধ।

যেসব কারণে অসিয়্যাত বাতিল হয়

অসিয়্যাতকারী (মূসী) যদি সরাসরি অসিয়্যাত বাতিল করে দেয়, তবে অসিয়্যাত বাতিল হয়ে যায়। মূসী সম্পূর্ণরূপে উন্মাদ হয়ে গেলেও অসিয়্যাত বাতিল হয়ে যায়। বেহুঁশ হওয়ার দ্বারা বাতিল হয় না, যার জন্য অসিয়্যাত করা হয় (মূসা-লাহু) যদি মূসীর আগে ইনতিকাল করে, তাতেও অসিয়্যাত বাতিল বলে গণ্য হয়।

মূসা-বিহী (অসিয়্যাতের বস্তু) বিনষ্ট হয়ে গেলেও অসিয়্যাত বাতিল হয়। যদি সে বস্তুটি ইঙ্গিতকৃত ও সুনির্দিষ্ট হয়। যেমন, আমি ঐ ছাগলটি অমুকের জন্য অসিয়্যাত করলাম। এ ক্ষেত্রে ছাগলটি মারা গেলে অসিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে। অসিয়্যাতের বস্তু (মূসা-বিহী) চুরি বা ছিনতাই হওয়ার পর যদি ফিরে পাওয়া যায় তবে অসিয়্যাত বাতিল হবে না।

অসিয়্যাত প্রত্যাহার

অসিয়্যাতকারী (মূসী)-এর পক্ষে অসিয়্যাত কোন চুক্তি নয়, কাজেই অসিয়্যাত করার পর যতদিন সে জীবিত থাকে ততদিন তা প্রত্যাহার করার অধিকার তার থাকে। প্রত্যাহার সরাসরি মৌখিকভাবেও হতে পারে, আবার পরোক্ষভাবেও হতে পারে। সরাসরি এভাবে যে, মূসী বলবে, আমি অমুকের জন্য যে অসিয়্যাত করেছিলাম তা প্রত্যাহার করে নিলাম। পরোক্ষভাবে মূসী তার অসিয়্যাতের বস্তুতে এমন কোন কাজ করল বা সে সম্পর্কে এমন কোন কথা বলল, যা প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রমাণ বহন করে, যেমন সে কারও জন্য একটা কাপড় অসিয়্যাত করেছিল, তারপর সে তা কেটে জামা বানাল বা সেটি বিক্রি করে দিল কিংবা কাউকে দান করল এবং দানগ্রহীতা তা হস্তগত করে নিল।[১৫]

অসিয়্যাতের সর্বাধিক মাত্রা

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সবচেয়ে বেশি অধিকার তার ওয়ারিসদের। অগ্রাধিকার বিবেচনায় ওয়ারিসদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ রাখা আবশ্যক। তাই তাদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ রেখে বাকী এক-তৃতীয়াংশের ভেতর অসিয়্যাতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এটাই হবে অসিয়্যাতের সর্বাধিক মাত্রা। হযরত সা'দ (রা)-এর অসিয়্যাত সংক্রান্ত হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। মোটকথা, সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়্যত করা জায়িয নয়; তবে যদি মূসীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসগণ এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদের অসিয়্যাত অনুমোদন করে, তাহলে সে অসিয়্যাত বৈধ হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ওয়ারিসগণ প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের অনুমোদন গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে মূসীর জীবদ্দশায় অনুমোদনও গ্রহণযোগ্য নয়।[১৬]

ওয়ারিসগণ যদি দরিদ্র হয় এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ বেশি না হয় তবে অসিয়্যাত না করাই উত্তম। আর অর্থ-সম্পদ যদি বেশি হয় এবং ওয়ারিসগণ দরিদ্র হয় তবে পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশ নয়, বরং তার কম পরিমাণের অসিয়্যাত করা উত্তম। এক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ এবং এক-চতুর্থাংশের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ সম্পদের অসিয়্যাত করা উত্তম। ওয়ারিসগণ ধনী হলে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ অসিয়্যাত করা উত্তম। আর

অসিয়্যাতের ক্ষেত্রে সেসব আত্মীয়-স্বজনকেই আগে বিবেচনায় রাখা উচিত যারা মীরাসের কোন অংশ পায় না। এক্ষেত্রেও যেসব আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক নেই, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম। যাতে করে এর মাধ্যমে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ মুছে গিয়ে সম্পর্কচ্ছেদের আশঙ্কা হতে আত্মীয়তা রক্ষা পায়। তবে এ নিয়ম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি দুই আত্মীয় দীনদারী ও অভাব-অনটনের দিক থেকে সমপর্যায়ের হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকে।

যে আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক আছে সে যদি বেশি অভাবগ্রস্ত হয় এবং দীনদারীও তার মধ্যে বেশি থাকে, তবে অসিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া শ্রেয়।

অসিয়্যাতের হুকুম

যার জন্য অসিয়্যাত করা হয় সে যখন অসিয়্যাত কবূল করবে, তখন অসিয়্যাতের বস্তুতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তা সে হস্তগত করুক আর নাই করুক। অসিয়্যাত যদি বস্তু সম্পর্কে হয়, যেমন- জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদিপশু ইত্যাদি ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে বা দান-খয়রাতও করতে পারবে। অসিয়্যাতকারীর মৃত্যুর পর অসিয়্যাতের বস্তুতে কিছু বৃদ্ধি ঘটলে, যেমন- গাছে ফল ধরল, গাভী বাচ্চা দিল ইত্যাদি, তাও অসিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি বস্তুর উপকার-উপযোগ সম্পর্কে অসিয়্যাত করা হয়, তবে কোন মেয়াদের উল্লেখ না থাকলে জীবনভর এবং মেয়াদের উল্লেখ থাকলে মেয়াদ পর্যন্ত তার ভোগাধিকার লাভ করবে। কিন্তু বস্তুর মালিকানা থাকবে ওয়ারিসদের।[১৭] যেমন অসিয়্যাত করা হল, অমুক বাড়িটিতে যেন অমুককে বাস করতে দেওয়া হয়। তবে ঐ ব্যক্তি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে উক্ত বাড়িতে বসবাস করতে পারবে। তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ সেখানে বাস করতে পারবে না, বরং বাড়িটি কাউকে দেওয়ার অসিয়্যাত থাকলে সে ব্যক্তির হাতে হস্তান্তর করা হবে অন্যথায় মূসীর ওয়ারিসদের কাছে প্রত্যার্পিত হবে।[১৮]

অসী নিয়োগ

অসিয়্যাত কার্যকর করার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয় পরিভাষায় তাকে 'অসী' বলে। 'অসী' তিন রকমের হতে পারে : (ক) বিশ্বস্ত ও সক্ষম ব্যক্তি অর্থাৎ অসিয়্যাত বিশ্বস্ততার সাথে কার্যকর করার ক্ষমতা যার আছে, (খ) বিশ্বস্ত কিন্তু অক্ষম এবং (গ) ফাসিক বা কাফির।[১৯]

বিশ্বস্ত ও সক্ষম ব্যক্তিকে 'অসী' নিয়োগ করা হলে তাকে তার দায়িত্বে বহাল রাখা হবে। আদালত তাকে অব্যাহতি দিতে পারবে না। যদি বিশ্বস্ত হয়, কিন্তু অসিয়্যাত কার্যকর করার ক্ষমতা তা না থাকে, তবে আদালত তাকে অব্যাহতি না দিয়ে তার সঙ্গে একজন সক্ষম ব্যক্তিকে অসী নিযুক্ত করবে। সে মূসী নিযুক্ত অসীকে তার দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবে। আর অসীর মধ্যে যদি বিশ্বস্ততাই না থাকে তথা সে ফাসিক বা কাফির হয়, তবে আদালতের কর্তব্য তাকে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ করা।

নারী কিংবা অন্ধ ব্যক্তিকেও 'অসী' নিয়োগ করা যেতে পারে। শিশুকে অসী বানানো জায়িয নয়। এরূপ করা হলে আদালতও তদস্থলে অন্য অসী নিযুক্ত করবে। অসী নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রস্তাব ও গ্রহণ আবশ্যক। যেমন মূসী বলবে, তুমি আমার অসী হও বা তুমি আমার অসিয়্যাত

কার্যকর করো কিংবা আমার মৃত্যুর পর আমার শিশু সন্তানদের তত্ত্বাবধান করো ইত্যাদি। এরূপ বললে সেটা হবে প্রস্তাব। তারপর যাকে প্রস্তাব দেওয়া হলো তার ইখ্তিয়ার বা ইচ্ছা হলে গ্রহণ করবে বা প্রত্যাখ্যান করবে।

অসিয়্যাতকারীর জীবদ্দশায় যদি সে চুপ থাকে, তারপর অসিয়্যাতকারীর মৃত্যু হয়ে যায় তবে এ অবস্থায়ও তার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ইখাতিয়ার থাকবে। কিন্তু জীবদ্দশায় প্রত্যাখ্যান করলে মৃত্যুর পর গ্রহণ করার অধিকার থাকে না।[২০]

মূসীর জীবদ্দশায় যদি কোন ব্যক্তি অসী হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় এবং তারপর মূসীর মৃত্যু হয়ে যায়, তবে বিষয়টি চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। ওয়ারিসদের পক্ষ হতে অসী সম্পর্কে কোন অভিযোগ দায়ের হলে আদালত তদন্ত করে দেখবে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাকে অব্যাহতি দিবে, অন্যথায় নয়।[২১]

একাধিক ব্যক্তিকেও অসী নিয়োগ করা যেতে পারে এবং এটা দু'ভাবে হতে পারে : (ক) সমুদয় বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে সম্মিলিতভাবে অসী নিয়োগ এবং (ঘ) পৃথক পৃথক বিষয়ে পৃথক ব্যক্তিকে অসী নিয়োগ।

দু'জনকে সম্মিলিতভাবে অসী নিয়োগ করা হলে উভয়কে সম্মিলিতভাবে কার্যকর করতে হবে। স্বতন্ত্রভাবে কারো কিছু করার ইখ্তিয়ার থাকবে না। তবে কতগুলো বিষয় এর থেকে ব্যতিক্রম, যথা : মৃতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা, মৃতের ঋণ পরিশোধ করা, নির্দিষ্ট কোন বস্তু সম্পর্কে অসিয়্যাত থাকলে তা কার্যকর করা, আমানত প্রত্যার্পণ করা, মৃত ব্যক্তি কারও কিছু আত্মসাৎ করে থাকলে তা প্রত্যার্পণ করা, কারও কাছে মৃত ব্যক্তির কিছু পাওনা থাকলে সে ব্যাপারে দাবি উত্থাপন ও মামলা-মোকদ্দমা করা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিসের পক্ষে উপহার-উপঢৌকন কবূল করা এবং নির্দিষ্ট কোন ফকীরের জন্য দান-খয়রাতের অসিয়্যাত থাকলে তা কার্যকর করা। দুই ব্যক্তিকে অসী নিয়োগকালে মূসী যদি প্রত্যেককেই পূর্ণাঙ্গ অসীরূপে নিয়োগ দান করে, তবে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রভাবে অসিয়্যাত কার্যকর করার ক্ষমতা থাকবে।

দুই ব্যক্তি অসী নিয়োগের পর যদি একজন মারা যায়, তবে আদালতের রায় ছাড়া অপরজন পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করবে না। আদালত সমীচীন মনে করলে একা তাকেই অসী সাব্যস্ত করে পূর্ণ ক্ষমতা দান করবে। অন্যথায় মৃত অসীর স্থলে আরেকজনকে নিয়োগ দেবে। দুই ব্যক্তিকে অসী বানানোর পর যদি অসিয়্যাতকারীর মৃত্যু হয় এবং তারপর একজন কবূল করে ও অন্যজন বিরত থাকে, তবে অপরজন একা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবে না।

দুই ব্যক্তিকে যদি পৃথক পৃথক বিষয়ে অসী করা হয়, যেমন একজনকে ঋণ পরিশোধের জন্য এবং অপরজনকে তার ধনসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করার জন্য, তবে সে ক্ষেত্রে উভয়েই সম্মিলিতভাবে যাবতীয় বিষয়ের অসীরূপে গণ্য হবে।

কেউ যদি তার দুই পুত্রের জন্য পৃথকভাবে দুই ব্যক্তিকে অসী নিযুক্ত করে কিংবা পৃথক সম্পদ যেমন উপস্থিত সম্পদের জন্য একজনকে এবং অনুপস্থিত সম্পদের জন্য অপর একজনকে অসী নিযুক্ত করে এবং শর্ত করে দেয় যে, একজনের অসীয়্যাতের বিষয়ে অপরজন শরীক থাকবে না, তা হলে শর্তানুযায়ী উভয়ই পৃথক অসী সাব্যস্ত হবে, কিন্তু এরূপ শর্ত না থাকলে তারা সম্মিলিতভাবে অসী হবে।[২২]

অসীগণ সচ্ছল হলে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে না।

অসিয়্যাত পূরণের নিয়ম

মূসীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিদ্বারা প্রথমে ঋণ পরিশোধ করা হবে। অসিয়্যাত যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি হয় তবে আনুপাতিক হারে হ্রাস করতে হবে। অবশ্য মূসীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ অসিয়্যাত অনুমোদন করলে হ্রাস করার প্রয়োজন নেই।

অসিয়্যাত বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন : হক্কুল্লাহ্ বা হক্কুল-ইবাদ সম্পর্কে, আবার হক্কুল্লাহ্ হলে তা ফরয কার্যের জন্য হবে অথবা নফল কার্যের জন্য। অসিয়্যাত যদি এসবগুলো সম্পর্কেই হয় এবং এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিদ্বারা কিংবা ওয়ারিসদের অনুমোদনক্রমে তার অতিরিক্ত সম্পদদ্বারা আদায় করা সম্ভব হয়, তবে সবগুলোই আদায় করা হবে। নচেৎ গুরুত্বের পর্যায়ক্রম হিসাবে একের পর এক পূরণ করা হবে। যেমন, প্রথমে সালাত-সাওমের ফিত্‌রা, বদলী হজ্জ, যাকাত, কাফ্ফারা ইত্যাদির অসিয়্যাত পূরণ করা হবে। অতঃপর নফল অসিয়্যাত পূরণ করা হবে, যেমন নফল হজ্জ, গরীবদের জন্য দান-খয়রাত, মসজিদে ও জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য ইত্যাদি।

যদি গুরুত্বের দিক থেকে সবগুলো অসিয়্যাত সমমর্যাদার হয় তবে অসিয়্যাতের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী তা পূরণ করা হবে।[২৩]

ওয়াক্ফ পরিচিতি ও গুরুত্ব

'ওয়াক্ফ'-এর আভিধানিক অর্থ বেঁধে রাখা। ওয়াক্ফ সম্পত্তি (মাওকূফ) অর্থে শব্দটি প্রসিদ্ধ। এর বহুবচন 'আওকাফ' (أوقاف)

শরী'আতের পরিভাষায়, কোন বস্তু আল্লাহ্‌র মালিকানায় রেখে তার উৎপাদন বা উপযোগকে গরীবদের মধ্যে কিংবা যে কোন কল্যাণ খাতে দান করাকে 'ওয়াক্ফ' বলা হয়।

ওয়াক্ফ পুণ্যলাভের একটি উপায়। ইসলামে এটা কেবল বৈধ রীতিই নয়, বরং একটি প্রশংসনীয় কাজ। ইসলাম এ কাজে উৎসাহ দান করে। ওয়াক্ফ এমন একটি পুণ্যের কাজ যা দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পসন্দনীয় কাজে ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। ওয়াক্ফ হচ্ছে সমাজ সেবা ও জনকল্যাণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতা ইন্‌তিকালের পরও তার সে দান মানবতার কল্যাণে বহাল থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اذَا مَاتَ الانْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ الاَّ مِنْ ثَلاَثٍ الاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ ۔

মানুষ মারা যাওয়ার পর তিনটি ছাড়া তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। ঐ তিনটি বিষয় হলো : সাদাকায়ে জারিয়া, যে ইল্‌মদ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।[২৪]

ইসলামের শুরু হতে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ্ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের এই সুন্দরতম ব্যবস্থা অনুসরণ করে এসেছে। স্বয়ং মহানবী (সা) ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম থেকে ওয়াক্ফ করার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৫]

হযরত উমর ফারূক (রা) তো খায়বারে প্রাপ্ত তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও দামী সম্পত্তিই ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন, যা বুখারী ও মুসলিম শরীফসহ সিহাহ্ সিত্তার সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[২৬] দ্বিতীয় খলীফা যখন সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পরামর্শ চান তখন তিনি তাঁকে বলেছেন :

تَصَدَّقْ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَلٰكِنْ تُنْفَقُ ثَمَرَتُهُ :

তুমি তা এমনভাবে সাদাকা কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, উত্তরাধিকার হিসেবে বন্টন করা হবে না, বরং এর উপযোগ ব্যয় করা হবে। (ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৫)

ওয়াক্ফের শর্তাবলী

'ওয়াক্ফ' সহীহ্ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত আছে। তন্মধ্যে কতকের সম্পর্ক ওয়াক্ফকারীর সঙ্গে, কতকের সম্পর্ক ওয়াক্ফ কর্মের সঙ্গে এবং কতকের সম্পর্ক ওয়াক্ফ সম্পত্তির সঙ্গে।

ওয়াক্ফকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলী :

১. আকিল তথা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। কাজেই পাগল ও শিশুর ওয়াক্ফ সহীহ্ নয়।

৩. স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া। ক্রীতদাসের ওয়াক্ফ সহীহ্ নয়। ওয়াক্ফ সহীহ্ হওয়ার জন্য ওয়াক্ফকারীর মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কোন জিম্মি যদি বিধি মুতাবিক ওয়াক্ফ করে, তবে তা জায়িয হবে।

ওয়াক্ফ কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ওয়াক্ফ হতে হবে এমন কোন পুণ্যকর্মের জন্য যা শরী'আতের দৃষ্টিতে সাওয়াবের কাজ।

২. ওয়াক্ফকে কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল করে রাখা যাবে না। যেমন অমুক ব্যক্তি যদি আসে তবে আমার এ জমি ওয়াক্ফ।[২৭]

৩. ওয়াক্ফকালে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করে তার অর্থ নিজ ইচ্ছামত ব্যয় করার শর্ত আরোপ করা যাবে না। যেমন বলল, আমি এ জমি এই শর্তে ওয়াক্ফ করছি যে, যখন ইচ্ছা আমি এটা বিক্রি করে এর অর্থ নিজ কাজে খরচ করতে বা দান-সাদাকা করতে পারব। এরূপ শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্ফ সহীহ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন, অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ সহীহ্ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।[২৮]

৪. ওয়াক্ফ সহীহ্ হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, ওয়াক্ফকালে বিবেচনার জন্য সময় হাতে রাখা যাবে না। যেমন বলল, আমি এই জমি এই শর্তে ওয়াক্ফ করছি যে, তিন দিন বিবেচনা করে দেখব এবং ইচ্ছা হলে এ সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করতে পারব। এরূপ করলে ওয়াক্ফ সহীহ্ হবে না। তবে মসজিদের জন্য এভাবে ওয়াক্ফ করে মসজিদ তৈরি করলে ওয়াক্ফ সহীহ্ হবে, কিন্তু বিবেচনার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

৫. ওয়াক্ফ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য না হওয়া। কাজেই নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা সহীহ্ হবে না। অবশ্য স্থায়িত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়।[২৯]

৬. নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তার বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা সহীহ্ হবে না। কেননা এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ ওয়াক্ফ স্থায়ীভাবে হওয়া শর্ত। সুতরাং ওয়াক্ফ করতে হবে এমন খাতে যা স্থায়ী হয়। যেমন সাধারণভাবে দরিদ্রদের জন্য, মসজিদের জন্য ইত্যাদি।

ওয়াক্ফ সম্পত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াক্ফের বস্তুতে দাতার মালিকানা থাকা শর্ত। কাজেই জবরদখলকৃত জমির ওয়াক্ফ বৈধ নয়, এমনকি পরবর্তীতে তা কিনে মূল্য পরিশোধ করলেও পূর্বের ওয়াক্ফ সহীহ্ হবে না।[৩০] তবে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ছাড়া যদি ওয়াক্ফ করে এবং পরবর্তীতে প্রকৃত মালিক তা অনুমোদন করে, তবে ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হবে।[৩১]

২. ওয়াক্ফের বস্তু সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। কেউ বলল, আমি আমার জমি থেকে ওয়াক্ফ করলাম, কিন্তু কোথাকার কতটুকু জমি তা বলল না, এরূপ ওয়াক্ফ সহীহ্ হবে না।[৩২] তবে কোন সুপ্রসিদ্ধ জমি বা বাড়ি, যা সকলেই চেনে, তার পরিমাণ ও সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হবে।[৩৩]

৩. ওয়াক্ফ সহীহ্ হওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে ওয়াক্ফ বস্তু কোন স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি হবে না, বরং স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে। অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ বৈধ নয়। তবে যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিক্রম। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) সহ আরও বহু সাহাবী যুদ্ধসামগ্রী ওয়াক্ফ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা অনুমোদন করেছিলেন।[৩৪]

ওয়াক্ফ করার নিয়ম

নির্দিষ্ট কিছু শব্দদ্বারা ওয়াক্ফ সংঘটিত হয়। ওয়াক্ফকারীর সে সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে এর কিছু নমুনা পেশ করা হলো।

ওয়াক্ফের সংজ্ঞা থেকে জানা যায় যে, ওয়াক্ফের মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত রেখে তার লাভ বা উৎপাদন উপযোগ ওয়াক্ফ খাতে ব্যয় করা হয়। কাজেই ওয়াক্ফের ভাষায় বা ওয়াক্ফকারীর নিয়্যতে এটা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, যে যে বস্তু ওয়াক্ফ করেছে তা সংরক্ষিত রাখা হবে। সেই সঙ্গে উপরে বর্ণিত শর্তাবলীর প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোন শব্দ বা শর্ত যুক্ত করা যাবে না, যদ্দ্বারা উক্ত শর্তের লংঘন ঘটে এবং ওয়াক্ফ মেয়াদী হয়ে পড়ে বা কোন এক সময়ে তার ব্যয় খাত শেষ হয়ে যায়।

সুতরাং ওয়াক্ফের ভাষা হবে এরূপ—আমার এই জমি আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পর স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ, আমার এই জমি দরিদ্রদের জন্য ওয়াক্ফ, আমার এই জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ, আমার এই জমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে ওয়াক্ফ। এটা বিক্রি করা যাবে না এবং এর মধ্যে উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে না। আমার এই জমির ফসল স্থায়ীভাবে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আমার মৃত্যুর পর এই জমির ফসল অমুক পাবে এবং তারপর তার আত্মীয়বর্গ এবং তাদের পর গরীবগণ। মোদ্দাকথা, ওয়াক্ফের শর্তাবলীর পরিপন্থী না হয় এমন যে কোন ভাষাই ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওয়াক্ফকৃত মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হলে কিংবা স্থায়ীভাবে চলতে পারে সেভাবে ওয়াক্ফ-করা না হলে ওয়াক্ফ বলে গণ্য হবে না।

স্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ

স্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ বৈধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একখণ্ড জমি মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিলেন। তাছাড়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মক্কা শরীফের বাড়িটি, হযরত উমর (রা) খায়বারের জমি, হযরত উসমান (রা) রোওমার জমি, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাঁর মদীনার একটি ও মিসরের একটি বাড়ি ওয়াক্ফ করেছিলেন। এভাবে বহু সাহাবী থেকে স্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৫]

ফসলের জমি, বাড়ি, গোসলখানা, জলাশয়, রাস্তা ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। জমি ওয়াক্ফ করলে তাতে অবস্থিত বৃক্ষ ওয়াক্ফের মধ্যে শামিল হবে, কিন্তু ফসল শামিল হবে না। তবে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যদি ফসলের কথা উল্লেখ করে, তাহলে তাও ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। যেমন বলল, আমি এই জমিতে যা কিছু আছে সবসহ জমিটি ওয়াক্ফ করলাম।

জমি ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে সে জমিতে যাওয়ার পথ ও পানি সেচের ঘাট ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩৬]

জমিতে যদি বৃক্ষ থাকে তবে তা সহই জমি ওয়াক্ফ করতে হবে। বৃক্ষ ব্যতীত কেবল জমি ওয়াক্ফ করলে তা জায়িয হবে না। জমির অংশবিশেষ ওয়াক্ফ করলে কতটুকু অংশ তা উল্লেখ করতে হবে। অবশ্য গোটা খণ্ডই যদি ওয়াক্ফ করা হয় তবে তার পরিমাণ উল্লেখ জরুরী নয়।[৩৭]

অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ

কতগুলো ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে অবস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ জায়িয নয়। ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) এরূপ ওয়াক্ফ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা অনুমোদন করেছিলেন।

কোন অস্থাবর সম্পত্তি যদি স্থাবর সম্পত্তির অধীনে থাকে তবে স্থাবর সম্পত্তির অধীনে তার ওয়াক্ফ বৈধ। যেমন কোন জমিতে চাষাবাদের সামগ্রী আছে, এখন জমির মালিক যদি জমির সঙ্গে সেসব সামগ্রীও ওয়াক্ফ করে দেয় তবে তা বৈধ হবে।[৩৮]

কোন অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফের প্রচলন যদি থাকে তার ওয়াক্ফও বৈধ। যেমন জানাযা ও কবর খননের সামগ্রী।

কুরআন মাজীদ ও দীনি কিতাবাদি ওয়াক্ফ করা জায়িয। ওয়াক্ফকারী যদি কোন নির্দিষ্ট মসজিদের জন্য কুরআন মাজীদ ওয়াক্ফ করে, তবে তা সে মসজিদেই সংরক্ষিত রাখা উচিত। অন্যত্র স্থানান্তরিত করা উচিত নয়। আর যদি মসজিদের মুসল্লীদের জন্য ওয়াক্ফ করে নির্দিষ্ট কোন মসজিদের জন্য নয়, তবে তা অন্য মসজিদে নেওয়া জায়িয আছে।

টাকা-পয়সা ওয়াক্ফ করাও বৈধ। তবে ওয়াক্ফ বস্তুর মূলকে অবশিষ্ট রেখে কেবল তার উৎপাদন উপযোগদ্বারাই উপকার লাভ বৈধ। তাই এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, আসল টাকা ব্যয় করা যাবে না, বরং তার লভ্যাংশ ব্যয় করতে হবে।[৩৯]

বিভাজনকৃত নয় (মূশা')—এমন বস্তুর ওয়াক্ফ

বিভাজনযোগ্য নয় এমন বস্তুকে মূশা' বলে। এটা দু'প্রকার : (ক) যা বিভাজনযোগ্য নয়, বা বিভাজন করলে তা কোন উপকারে আসে না, (খ) বিভাজনযোগ্য বস্তু, কিন্তু এখনও বিভাজন করা হয়নি।

বিভাজনযোগ্য নয় এমন বস্তুর ওয়াক্ফ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। যেমন একটি গোসলখানার দু'জন মালিক। একজন তার অর্ধেক ওয়াক্ফ করে দিল।

যেসব বস্তু বিভাজনযোগ্য তা অবিভক্ত অবস্থায় ওয়াক্ফ বৈধ কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে পরবর্তীকালের ফকীহ্গণ বৈধ বলে রায় দিয়েছেন।[৪০]

জমির অবিভক্ত অংশ ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফকারীর অংশ পৃথক না করে তাতে মসজিদ ও কবরস্থান করা জায়িয নয়।[৪১]

ওয়াক্ফের হুকুম

ওয়াক্ফ সম্পাদনের পর তা বেচাকেনা করা বা অন্য কোনভাবে কাউকে তার মালিক বানিয়ে দেওয়া যাবে না। বরং যে কাজে ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তজ্জন্য তা সংরক্ষিত থাকবে। সে সম্পত্তি থেকে যা উৎপন্ন হবে তা যথানিয়মেই ব্যয় করা হবে।[৪২]

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের জন্য তাতে দখল প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না।

ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা

ওয়াক্ফকারী ইচ্ছা করলে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করতে পারে। সে পরিবর্তনের ইখ্তিয়ার তার নিজের জন্যও নির্দিষ্ট করতে পারে। আবার অন্যের উপরও তা ন্যস্ত করতে পারে কিংবা নিজের ও অন্যের উভয়ের উপর তা ন্যস্ত রাখতে পারে। যার উপরই ন্যস্ত করা হোক না কেন, পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা জায়িয।[৪৩]

ওয়াক্ফদাতা যদি পরিবর্তনের শর্তারোপ না করে, সেক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির দু'অবস্থা হতে পারে। এক অবস্থায় পরিবর্তন করা জায়িয এবং আরেক অবস্থায় জায়িয নয়।

যে অবস্থায় পরিবর্তন করা জায়িয তা হলো : ওয়াক্ফ সম্পত্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তা কোনও উপকারে আসে না। এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন : (ক) ফসলের জমি, কিন্তু তাতে আদৌ ফসল জন্মায় না, (খ) কিংবা ফসল জন্মালেও এত খরচ পড়ে যে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে আদালত সে সম্পত্তি পরিবর্তন করতে পারে।

তবে এ পরিবর্তনের জন্য কতগুলো শর্ত আছে, যথা : (ক) ওয়াক্ফ সম্পত্তি কিনতে হবে, (খ) পরিবর্তনের ফায়সালাদাতা বিজ্ঞ, মুত্তাকী (কাযী, বিচারক) হতে হবে, (গ) এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে হবে যে বিক্রেতার কাছে ঋণগ্রস্ত নয়, (ঘ) নিজের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কাছেও বিক্রি করা যাবে না, (ঙ) পরিবর্তে যে জমি ক্রয় করা হবে তা একই মহল্লায় বা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট ও লাভজনক মহল্লায় হতে হবে।[৪৪]

ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফকালে পরিবর্তনের শর্ত আরোপ না করে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি কিছুটা লাভজনক হয়, সে অবস্থায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা যাবে না। (রাদ্দুল মুহ্তার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৪; ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৮)

ওয়াক্ফকারী নিজের জন্য, সন্তান-সন্তুতির জন্য এবং অন্যান্য আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করা

ওয়াক্ফকারী নিজের জন্যও ওয়াক্ফ করতে পারে। যেমন : সে বলল, এই জমি আমার নিজের জন্য ওয়াক্ফ ও সাদাকা বা আমি এই জমি এই শর্তে ওয়াক্ফ করছি যে, আমি যতদিন

বেঁচে থাকব, এর সম্পূর্ণ বা আংশিক আয় নিজেই ভোগ করব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এরূপ ওয়াক্ফ করাকে বৈধ বলেছেন।

অনুরূপভাবে পুত্র-কন্যা, নাতি-নাত্নী ও পরবর্তী বংশধরদের জন্যও ওয়াক্ফ বৈধ। যদি বলে আমার এই সম্পত্তি আমার জন্য ওয়াক্ফ তবে তার ঔরসজাত পুত্র-কন্যা সে ওয়াক্ফের অন্তর্ভূক্ত হবে অর্থাৎ নিজের সন্তানরাই তা পাবে। নাতি-নাতনীরা নয়। আর সন্তানদের কেউ জীবিত না থাকলে তা দরিদ্রের মধ্যে ব্যয় করা হবে।

যদি সন্তানের সঙ্গে সন্তানের সন্তানদের কথাও উল্লেখ করে তবে তারাও সে ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের সন্তানগণ (তৃতীয় প্রজন্ম) অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু যদি সন্তান, তার সন্তান ও অন্য সন্তান এভাবে তিন স্তরে উল্লেখ করে, তবে যতকাল পর্যন্ত তার বংশধারা অব্যাহত থাকবে সে সম্পত্তির আয় তাদের মধ্যেই বণ্টন করা হবে। যদি কখনও বংশ বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।[৪৫]

সুনির্দিষ্ট কোন সন্তানের কথা না বলে, বরং সাধারণভাবে সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করার পর যদি এক সন্তানের মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তার অংশ জীবিত সন্তানদেরকে দেওয়া হবে। যার কোন পুত্র সন্তান নেই কিন্তু পৌত্র আছে সে যদি তার সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করে তবে এক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় পৌত্রকে দেওয়া হবে। পরে যদি তার কোন ঔরসজাত সন্তান জন্ম নেয় তবে তখন থেকে তা তাকেই প্রদান করা হবে।[৪৬]

যদি বর্তমান সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করে তবে পরে জন্মগ্রহণকারী সন্তান সে ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৭]

আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করলে মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেই তার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ওয়াক্ফের আয় থেকে তাদেরকে মাথাপিছু সমান হারে বণ্টন করা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯) শুধু আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে ওয়াক্ফকারীর পিতামাতা, দাদা ও ঔরসজাত সন্তান তার অন্তভুক্ত হয় না।

ওয়াক্ফকারী ইচ্ছা করলে নির্দিষ্টভাবে তার গরীব আত্মীয়-স্বজন বা দীনদার আত্মীয়-স্বজনের জন্যও ওয়াক্ফ করতে পারে, যা পালন করা মুতাওয়াল্লীর জন্য আবশ্যিক হবে।

পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে ওয়াক্ফের আয় সে অনুসারেই বিতরণ করা হবে। যেমন ওয়াক্ফকারী বলল, এই জমি আমার নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য, তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য এক্ষেত্রে দাতার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়গণই প্রথমে হকদার হবে উত্তরাধিকারের নীতি অনুযায়ী। তাদের মধ্যে যদি একজনও জীবিত থাকে তবে সে একাই ওয়াক্ফের সমুদয় আয় লাভ করবে, পরবর্তীগণ কিছুই পাবে না। এরূপ কেউ জীবিত না থাকলে তখন দ্বিতীয় স্তরের আত্মীয়গণ, তারপর তৃতীয় স্তরের আত্মীয়গণ এভবে পর্যায়ক্রমিকভাবে তারা হক্দার হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৩৮০)

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা খুবই সাওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরি করে তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।[৪৮]

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ দু'ভাবে হতে পারে : মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান এবং মসজিদের উন্নয়নকার্য ও আসবাবপত্রসহ অন্যান্য খরচাদির জন্য স্থাপন-অস্থাবর সম্পত্তি দান। মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ওয়াক্ফ করলে তা সমর্পণ না করা পর্যন্ত দাতার মালিকানায় থাকবে। সমর্পণ কথা বা কাজ উভয় পদ্ধতিতেই হতে পারে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, ওয়াক্ফকারী যদি এই ঘোষণা প্রদান করে যে, আমি এ জমিতে মসজিদ বানালাম, তবে তাই যথেষ্ট। এরদ্বারাই তা মসজিদরূপে গণ্য হবে এবং দাতার মালিকানাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মসজিদের ঘোষণা দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং জামাআতের সঙ্গে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান এবং আযান ও ইকামতসহ সালাত আদায়ও জরুরী। অন্যথায় দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না এবং তা মসজিদরূপে গণ্য হয় না।[৪৯]

আযান-ইকামত ছাড়া গোপনে সালাত আদায় করলে মসজিদ সাব্যস্ত হবে না।

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করার পর মুতাওয়াল্লীর হাতে সমর্পণদ্বারাও মসজিদ চূড়ান্ত হয়ে যায়, যদিও সালাত আদায় করা না হয়।[৫০]

মসজিদ সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর ওয়াক্ফ প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে না এবং তা বিক্রয় করা কিংবা উত্তরাধিকর সূত্রে তাতে কারও মালিকানা লাভেরও অবকাশ থাকে না।[৫১]

মসজিদের উন্নয়নকার্য ও অপরাপর খরচাদির জন্য স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা যেতে পারে, যার আয় থেকে গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করার কথা যোগ করাও বৈধ এবং তা না করলেও ওয়াক্ফ সহীহ্ হবে। যদি গরীবদের সাহায্য করার কথা উল্লেখ করা হয় তবে মসজিদের ব্যয় নির্ধারণের পর কিছু বেঁচে থাকলে তা তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।[৫২]

এমনিভাবে গাছপালা ও টাকা-পয়সা ইত্যাদিও ওয়াক্ফ করা যায়, যা মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করাদ্বারা চূড়ান্ত হবে।[৫৩]

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি কেবল মসজিদের নির্মাণ-উন্নয়ন কাজেই ব্যবহার করা যায়; সাজ-সজ্জা ও অলংকরণের কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়।[৫৪]

কেবল মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় যদি উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা মসজিদের জন্য আয়বৃদ্ধির খাতে বিনিয়োগ করা হবে, দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না।[৫৫]

অন্যান্য জনহিতকর কাজে ওয়াক্ফ করা

ঈদগাহ, মাদরাসা, করবস্থান, মুসাফিরখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরি, জনসধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কুয়া, খাল, পুকুর ইত্যাদি খননসহ যে কোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্ফ করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসাফিরদের জন্য একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ করেছিলেন।[৫৬]

হযরত উসমান (রা) মদীনাবাসীর পানির কষ্ট দূর করার মানসে 'রুমা' নামক কূপ ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯)

এরূপ ওয়াক্ফদ্বারা ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হতে পারে। অর্থাৎ সকলের জন্যই এরূপ কবরস্থানে দাফন করা, মুসাফিরখানায় অবস্থান করা এবং কুয়ার পানি ব্যবহার করা বৈধ।[৫৭]

ওয়াক্ফ করার সময় কবরস্থানে গাছপালা থাকলে ওয়ারিসগণ তা কেটে নিতে পারে, কিন্তু কবরস্থান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গাছপালা ওয়াক্ফকৃত ভূমির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ওয়াক্ফ করার পর যদি কবরস্থানে বৃক্ষ জন্মায় তবে তা রোপণকারীর হবে। কে রোপণকারী তা জানা না থাকলে সে বৃক্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী ওয়াক্ফরূপে গণ্য হবে এবং তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কবরস্থানের কাজে ব্যবহৃত হবে। (বাহরুর রাইক ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪; আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪; ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৯)

মুমূর্ষু ব্যক্তির ওয়াক্ফ

মৃত্যু-শয্যাশায়ী রোগী ইচ্ছা করলে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওয়াক্ফ করতে পারে, তার বেশি নয়। যদি বেশি করে তবে তা ওয়ারিসদের অনুমতিসাপেক্ষে কার্যকর হবে। অনুমতি না দিলে এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অংশের ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। যদি কিছু সংখ্যক ওয়ারিস অনুমতি দেয় এবং কিছু সংখ্যক না দেয়, তবে অনুমতিদাতাদের অংশ পরিমাণ কার্যকর হবে আর বাকিদের অংশের ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে।

মুমূর্ষু ব্যক্তির ওয়াক্ফকৃত জমিতে যদি বৃক্ষ থাকে এবং তার মৃত্যুর আগে তাতে ফল ধরে, তবে তাও ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ওয়াক্ফের দিনই যদি তাতে ফল থাকে, তবে তা ওয়াক্ফের মধ্যে দাখিল হবে না; বরং তা ওয়ারিসগণ পাবে।[৫৮]

মুমূর্ষু ব্যক্তির যদি তার সম্পত্তির সমপরিমাণ ঋণ থাকে, তবে তার ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে।[৫৯]

ঋণ যদি সম্পত্তির সম-পরিমাণ না হয়, বরং তার চেয়ে কম হয়, তবে ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে ওয়াক্ফ বৈধ।[৬০]

মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি নিয়োগ

ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রয়োজন। তাকে মুতাওয়াল্লী বলে।

মুতাওয়াল্লী নিয়োগের অধিকার ওয়াক্ফকারীর নিজের। তার মৃত্যুর পর এ অধিকার লাভ করে তার নিযুক্ত অসী (ট্রাস্টি)। তারপর এ দায়িত্ব বর্তায় সরকার বা সরকারি প্রতিনিধির উপর।[৬১]

ওয়াক্ফকারী ইচ্ছা করলে মুতাওয়াল্লীর পদটি নিজের জন্যও সংরক্ষণ করতে পারে। কিংবা এ শর্তও আরোপ করতে পারে যে, মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে হবে তার বংশধরদের মধ্যে হতে কাউকে।[৬২]

প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্বস্ত এবং স্বয়ং কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তত্ত্বাবধানকার্য পালনে সক্ষম ব্যক্তিকেই এ পদে নিয়োগ দান বৈধ। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ এবং চক্ষুষ্মান ও অন্ধের কোন প্রভেদ নেই। উপরিউক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকাই নিয়োগদানের জন্য যথেষ্ট। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৮; আল বাহরুর-রাইক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৬; রাদ্দুল মুহ্তার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৭৮-৫৭৯।)

নাবালিগকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হলে বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। বালিগ হওয়ার পর সে মুতাওয়াল্লী সাব্যস্ত হবে।[৬৩]

ওয়াক্ফকারীর জীবিত অবস্থায় তার নিযুক্ত মুতাওয়াল্লীর যদি ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লীর নিয়োগের অধিকার তারই। যদি ওয়াক্ফকারী জীবিত না থাকে, তখন এ ইখতিয়ার হবে তার অসীর। যদি তার কোন অসী না থাকে তখন এ দায়িত্ব বর্তাবে কাযীর উপর।

ওয়াক্ফ করার পর কাউকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করার আগেই যদি ওয়াক্ফকারীর মৃত্যু হয়ে যায়, তবে কাযী কাউকে এ পদে নিয়োগ দান করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত দাতার বংশধরদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কাউকে 'মুতাওয়াল্লী' বানানো হবে না। উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে বাইরের কাউকে এ পদে নিযুক্ত করার পর ওয়াকফ্কারীর বংশে কোন উপযুক্ত লোকের জন্ম হলে পদটি তারই প্রাপ্য হবে। (আল-বাহরুর রাইক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩২)

ওয়াক্ফ সম্পত্তির কোন 'মুতাওয়াল্লী' না থাকলে, যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তারা কাউকে মুতাওয়াল্লী বানিয়ে নিতে পারে। এমনিভাবে মসজিদের মুতাওয়াল্লীর ইনতিকাল হয়ে গেলে মহল্লাবাসী পরামর্শক্রমে কাউকে এ পদে নিযুক্ত করতে পারে।

মুতাওয়াল্লী ইচ্ছা করলে তার কোন প্রতিনিধির মাধ্যওমে ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্য সম্পাদন করতে পারে। তবে নিয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি মুতাওয়াল্লীরই ইখতিয়ারাধীন থাকবে।[৬৪]

উল্লেখ্য, বর্তমানকালের মসজিদ কমিটি বা অপরাপর ওয়াক্ফ-সম্পত্তির পরিচালনা পরিষদকে আমরা মুত্তাওয়াল্লীর প্রতিনিধি ধরে নিতে পারি। কাজেই তাদের নিয়োগ-বরখাস্তের বিষয়টি মুতাওয়াল্লীর ইখ্তিয়ারাধীন। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, ওয়াক্ফকারী একাধিক ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতঃ তাদের উপর পরিচালনার ভার অর্পণ করেছে এবং তারাই পরিচালনা কমিটিরূপে পরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে সে কমিটি স্বয়ং মুতাওয়াল্লী; মুতাওয়াল্লীর প্রতিনিধি নয়।

মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব

ওয়াক্ফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তার আয়-উৎপাদন যথাযথ খাতে ব্যবহার করাই মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির মূল দায়িত্ব।

ওয়াক্ফের আয়দ্বারা সর্বপ্রথম ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংস্কারকার্য সম্পাদন করা হবে। এতে যদি সমূদয় আয়ও ব্যয় হয়ে যায়, তবুও এটা করা মুতাওয়াল্লীর প্রথম দায়িত্ব। যেমন জলাবদ্ধতার কারণে জমিতে কোন ফসল হয় না। তাই মাটি ফেলে ভরাট করা (কিংবা পানি সেচ করে চারদিকে বাঁধ নির্মাণ করা) আবশ্যক। কাজেই জমিকে আবাদযোগ্য করার জন্য মুতাওয়াল্লীকে প্রথমে এটা করতে হবে। এমনিভাবে মসজিদ জরাজীর্ণ হয়ে পড়লে বা ঈদগাহ ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গেলে ফাণ্ডের অর্থদ্বারা সর্বপ্রথম এর সংস্কারকার্য সম্পাদন করতে হবে। তারপর আয়ের কিছু অবশিষ্ট থাকলে নির্মাণ ও সংস্কারকার্যের কাছাকাছি যে কাজ, তাতে সে অর্থ ব্যয় করা হবে। আর তা হচ্ছে ওয়াক্ফের অভ্যন্তরীণ বিনির্মাণ, যদ্দ্বারা ওয়াক্ফের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়, যেমন মসজিদের জন্য ইমাম ও মুআয্যিন। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে এতটুকু পরিমাণ বেতন-ভাতা দিতে হবে, যা তাদের জীবন-নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হয়। তারপরও কিছু

বেঁচে থাকলে ওয়াক্ফের অপরাপর প্রয়োজনে যেমন মসজিদের জন্য বিছানা, বাতি প্রভৃতির ব্যবস্থাকরণে তা ব্যয় করা হবে। মসজিদ অলংকরণের কাজে ওয়াক্ফের অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রয়োজন সমাধার পরও কিছু অর্থ বেঁচে থাকলে তা দ্বারা মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি লাভজনক কোন বস্তু কিনে রাখতে পারে। ক্রয়কৃত সে বস্তুটি ওয়াক্ফরূপে গণ্য হবে না। কাজেই তা বিক্রি করা বৈধ হবে। হ্যাঁ, তার অর্থ অবশ্যই ওয়াক্ফ সম্পত্তির অংশ। কাজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে তার ব্যবহার বৈধ নয়। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮; শামী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬৯)

ওয়াক্ফ সম্পত্তি (বাড়ি ইত্যাদি) যদি বসবাসের জন্য হয়, তবে যে বা যারা তাতে বাস করবে তাদেরকেই নির্মাণ ও সংস্কার ব্যয় বহন করতে হবে। ওয়াক্ফের আয়দ্বারা তা নির্বাহ করা হবে না। বসবাসকারী যদি তা করতে সম্মত না হয় বা সে দরিদ্র হয়, যদ্দরুন তার পক্ষে সে ব্যয় বহন সম্ভব না হয়, তবে সে বাড়ি ভাড়া দিয়ে তার অর্থদ্বারা সংস্কারকার্য সম্পাদন করা হবে এবং তারপর তা বসবাসকীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।[৬৫]

মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটিকে সর্বদা ওয়াক্ফের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না যদ্দরুন ওয়াক্ফের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়, যেমন ওয়াক্ফের দোকান, জমি ইত্যাদি ন্যায্যমূল্যের কমে ভাড়া দেওয়া বা ওয়াক্ফের কাজে শ্রমিক নিয়োগ করতে গিয়ে বাজার দরের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া ইত্যাদি। এরূপ করলে মুতাওয়াল্লীর পক্ষে সেটা খিয়ানাত বলে সাব্যস্ত হবে। এমনিভাবে ওয়াক্ফের বস্তু কাউকে ধার-কর্জ দেওয়াও তার জন্য বৈধ নয়। ওয়াক্ফের কোন আয়-উপার্জন যদি বিক্রি করা হয় তবে মুতাওয়াল্লী স্বয়ং তা ক্রয় করতে পারবে না, তাতে দৃশ্যত ওয়াক্ফ-সম্পত্তির উপকার হলেও।[৬৬]

মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির অব্যাহতি

ওয়াক্ফকারী ইচ্ছা করলে বিনা অপরাধেই মুতাওয়াল্লীকে অব্যাহতি দান করতে পারে, কিন্তু কাযী এটা বিনা অপরাধে পারেন না। হ্যাঁ, মুতাওয়াল্লী যদি কোন অপরাধ তথা ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে খিয়ানাত করে, তবে কাযী (সরকারি প্রতিনিধি) তাকে অব্যাহতি দান করবেন। ফাণ্ডে অর্থ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্ফ সম্পত্তির নির্মাণ, সংস্কারকার্য না করা, ওয়াক্ফ-সম্পত্তি বিক্রয় করে ফেলা ইত্যাদি বিষয়গুলো খিয়ানাত এবং মুতাওয়াল্লীর বরখাস্তের অপরাধ।[৬৭]

মুতাওয়াল্লী যদি উম্মাদ হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় এক বছরকাল দীর্ঘায়িত হয়, তবে তাকে অব্যাহতি দান করা হবে। এক বছরের কম হলে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। সুস্থ হওয়ার পর তাকে পুনরায় সে পদে বহাল করা হবে।[৬৮]

পরিচালনা কমিটি যদি মুতাওয়াল্লীও হয় তবে তো উপরোক্ত বিধি-বিধান তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যদি মুতাওয়াল্লীর প্রতিনিধি হয় তবে মুতাওয়াল্লী যখন ইচ্ছা সে কমিটি বরখাস্ত করতে পারে।[৬৯]

মীরাস-এর সংজ্ঞা ও বিবরণ

'মীরাস' আরবী শব্দ। অভিধানিক অর্থ উত্তরাধিকার হওয়া, এক ব্যক্তির নিকট হতে অন্য ব্যক্তির নিকট বা এক জাতি হতে অপর জাতির নিকট কোন কিছু স্থানান্তরিত হওয়া, তা ধন-সম্পদ হোক কি জ্ঞান-গরিমা বা অন্য কিছু।

শরী'আতের পরিভাষায় মৃত ব্যক্তি হতে তার জীবিত ওয়ারিসদের নিকট পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়াকে মীরাস বলে।[৭০]

প্রাক-ইসলামী যুগে মীরাসের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও বিরাজ করত চরম স্বেচ্ছাচারিতা। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে গণ্য করা হত শক্তিমানের একচেটিয়া অধিকার, যে কারণে নারী ও শিশুর কোন প্রাপ্য তাতে স্বীকার করা হত না। কেবল আরবে নয়, উত্তরাধিকার বণ্টন সর্বত্রই ছিল এরূপ বৈষম্যগ্রস্ত, স্বেচ্ছাচার কবলিত।[৭১]

ইসলাম এ অন্যায়ের বিলোপ সাধন করে উত্তরাধিকার বণ্টনে সুষম, ন্যায়ানুগ ও সর্বজনহিতকর এক পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রথমে মূলনীতির আকারে ঘোষণা হয় :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশি হোক, এক নির্ধারিত অংশ। (সূরা নিসা, ৪ : ৭)

অর্থাৎ মীরাস বণ্টনের ভিত্তি হবে নিকটাত্মীয়তা আর মৃতের সম্পত্তিতে যেমন পুরুষের, তেমনি নারীরও অধিকার থাকবে। শিশু-যুবা-বৃদ্ধ ও নর-নারী নির্বিশেষে সকলেই হবে এর হিস্যাদার। নিকটাত্মীয়গণও সকলে এক পর্যায়ের নয়। নৈকট্যেরও বিভিন্ন রকমফের আছে। কাজেই অংশ বণ্টনে পার্থক্য করা হবে কিনা এবং নারী-পুরুষের অংশ সমান কিনা; এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর বেশি থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ,

আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ, তার সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। এ সবই সে যা অসিয়্যাত করে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতম তা তোমরা অবগত নও। এটা আল্লাহ্‌র বিধান; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, অসিয়্যাত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমরা যা অসিয়্যাত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর বেশি হলে সকলে সমঅংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশে; এটা যা অসিয়্যাত করা হয় তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর; যদি কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (সূরা নিসা, ৪ : ১১-১২)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে, তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাইবোন উভয় থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান, তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এই আশঙ্কায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা নিসা, ৪ : ১৭৬)

মীরাসের উক্ত বিধি-বিধানের প্রতি আস্থাশীল হওয়া এবং তা পালন করার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অন্যাথায় দুনিয়া ও অখিরাতের জীবন দুঃখ-জর্জরিত হতে বাধ্য। ইরশাদ হচ্ছে :

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে দাখিল করেন জান্নাতে। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা

মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করলে তিনি তাকে নিক্ষেপ করবেন আগুনে, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা নিসা, ৪ : ১৩-১৪)

বিশ্বমানবতার শান্তি রক্ষা করার জন্য ইসলাম এমন দিক-নির্দেশনা দিয়েছে যা স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ। এ নীতি সর্বত্র যথাযথভাবে অনুসৃত হলে জোর-যুলুম ও পক্ষপাতিত্বের পথ রুদ্ধ হয়ে ন্যায় ও সাম্যের বুনিয়াদে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠবে। এ কারণেই মহানবী (সা) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান শিক্ষার প্রতি জোর তাকিদ প্রদান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন : "তোমরা ফারাইয শিক্ষা কর ও শিক্ষা দাও, ইহা জ্ঞানের অর্ধেক।" (মুফীদুল ওয়ারিসীন, পৃ. ৫৬; মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫)

উত্তরাধিকার বণ্টনের ভিত্তি

উত্তরাধিকার বণ্টনের ভিত্তি কী হবে ? প্রয়োজন, আত্মীয়তা না অন্য কিছু? প্রয়োজনকে যদি ভিত্তি করা হয় তবে মৃত ব্যক্তির পুত্রকন্যা, ভাইবোন, পিতামাতা ও স্ত্রী সচ্ছল হলে তারা কেউ তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন হিস্যা পাবে না, সমুদয় সম্পত্তি দীন-দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ নীতি সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়। সুন্দর পরিসর ও আদর্শ সমাজ এভাবে গড়ে ওঠতে পারে না। বরং যা বন্টনের জন্য এ ব্যবস্থা, সেই অর্থ-সম্পদের উন্নয়নই যে ব্যাহত হবে তাই নয়, তার অস্তিত্বও হবে বিপন্ন। পুত্রকন্যা স্বচ্ছল জীবন যাপন করবে, ভবিষ্যত বংশধর সুখে থাকবে, এটাই তো ব্যক্তির অর্থোপার্জনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। এখন উত্তরাধিকার বণ্টনে যদি এই মৌল প্রেরণাকে মূল্যায়ন না করে অনাত্মীয়ের দারিদ্র্য ও প্রয়োজনকে মূল ভিত্তি করা হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই উপার্জন ও সঞ্চয়ের আগ্রহ বিনষ্ট ও অর্থ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে এবং ফলত আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল হয়ে সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে যাবে। সংগত কারণেই এই স্বভাববিরোধী নীতি দুনিয়ার কোনও সম্প্রদায় গ্রহণ করেনি। বরং আবহমানকাল হতে আত্মীয়তাই উত্তরাধিকার বণ্টনের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। (জাওয়াহিরুল ফিক্হ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬)

কিন্তু আত্মীয়তার পরিসরও তো অতি ব্যাপক। এক আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান হিসাবে বিশ্বের সমস্ত মানুষই তো আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা। সুতরাং সহজসাধ্য ও কল্যাণপ্রসূ বণ্টনের জন্য আত্মীয়তার এক সংকুচিত পরিমণ্ডল নির্ণয় করা অপরিহার্য। ইসলামী শরী'আত এটা সম্পন্ন করেছে নিকট ও দূর সূত্রের বিভেদ রেখাদ্বারা, অর্থাৎ মৃতের সঙ্গে যারা নিকটাত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ, কেবল তারাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এরূপ আত্মীয়তা তিন প্রকার : (ক) জন্মসূত্রে আত্মীয়তা—এর মধ্যে পড়ে পিতামাতা, সন্তান, ভাইবোন, চাচা, ফুপু ইত্যাদি। (খ) বিবাহ সূত্রে আত্মীয়তা—স্বামী-স্ত্রী এর অন্তর্ভুক্ত। (গ) মুক্তিদানের সূত্রে দাস-মালিকের মধ্যে স্থাপিত সম্বন্ধ। যাকে আত্মীয়তা স্বরূপ বিবেচনা করা যায়।

উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার শর্তাবলী

উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার শর্ত দু'টি : (ক) সম্পদের মালিকের মৃত্যু হওয়া এবং (খ) তার মৃত্যুকালে ওয়ারিসদের জীবত থাকা। কাজেই মূরিসের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার সম্পত্তিতে ওয়ারিসদের হক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

মূরিস যদি নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তার জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে কোন কিছু জানা না যায়, তখন বিচারক তার ব্যাপারে যথারীতি ফায়সালা দিবেন। লক্ষাণাদির ভিত্তিতে বিচারক তার মৃত্যুর পক্ষে রায় দিলে তাকে মৃত বলে গণ্য করতঃ তার সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে।[৭২]

মৃতের যে সমস্ত আত্মীয় ওয়ারিস হয়

পূর্বেই বলা হয়েছে, উত্তরাধিকার লাভের ভিত্তি হচ্ছে মৃতের সঙ্গে নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক। এ হিসাবে যেসব আত্মীয় ওয়ারিস হয় তারা মোট পঁচিশ শ্রেণীর লোক। পনের শ্রেণীর পুরুষ এবং দশ শ্রেণীর নারী।

পুরুষ ওয়ারিসগণ হচ্ছে : (১) পুত্র, (২) পৌত্র, (৩) পিতা, (৪) দাদা, (৫) আপন ভাই, (৬) বৈমাত্রেয় ভাই, (৭) বৈপিত্রেয় ভাই, (৮) আপন ভাইয়ের পুত্র, (৯) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, (১০) আপন চাচা, (১১) বৈমাত্রেয় চাচা, (১২) আপন চাচাত ভাই, (১৩) বৈমাত্রেয় চাচাত ভাই, (১৪) স্বামী, (১৫) মুক্তিদানকারী মনিব।

নারী ওয়ারিসগণ : (১) কন্যা, (২) মাতা, (৩) পৌত্রী, (৪) দাদী, (৫) নানী, (৬) আপন বোন, (৭) বৈমাত্রেয় বোন, (৮) বৈপিত্রেয়ী বোন, (৯) স্ত্রী, (১০) মুক্তিদানকারিণী।[৭৩]

যেসব আত্মীয় ওয়ারিস হয় না

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে নিকট আত্মীয়তা না থাকায় যারা তার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না তারা হচ্ছে : (১) মৃতের সৎপুত্র ও কন্যা অর্থাৎ স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীর সন্তান, (২) সৎপিতা, (৩) মৃতার সৎপুত্র ও কন্যা, (৪) সৎমা, (৫) মৃত ব্যক্তির শ্বশুরকুলের আত্মীয়বর্গ, শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শালিকা ইত্যাদি। এমনিভাবে এর বিপরীতে মৃত ব্যক্তির জামাতা ও ভগ্নিপতি, (৬) মৃত মহিলার শ্বশুরকুলের আত্মীয়বর্গ, যথা শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ ইত্যাদি। অনুরূপ মৃতব্যক্তির পুত্রবধূ, ভাবী ইত্যাদি, (৭) পোষ্য পুত্র ও কন্যা, (৮) ধর্ম পিতামাতা।[৭৪]

ওয়ারিসদের শ্রেণী বিভাগ

নিকটাত্মীয় হওয়ার ভিত্তিতে যেসব আত্মীয় উত্তরাধিকারী হয় তারা দুইভাবে বিভক্ত : (১) যাবিল-ফুরূয, (২) আসাবা। কুরআন, হাদীস বা ইজমাদ্বারা যেসব ওয়ারিসের অংশ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত, তাদেরকে 'যাবিল-ফুরূয' বলে।

আসাবা হচ্ছে সেই সব ওয়ারিস যারা যাবিল-ফুরূযের অবর্তমানে সমূদয় সম্পত্তির অধিকারী হয় আর যদি যাবিল-ফুরূয বর্তমান থাকে তবে তাদের অংশ বণ্টনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তার মালিক হয়।[৭৫]

যাবিল-ফুরূয

যাবিল-ফুরূয মোট বারজন। এর মধ্যে চারজন পুরুষ : (১) পিতা, (২) দাদা ও তদূর্ধ পুরুষগণ, (৩) বৈপিত্রেয় ভাই, (৪) স্বামী। অবশিষ্ট আটজন মহিলা : (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) পৌত্রি, (৪) সহোদরা বোন, (৫) বৈমাত্রেয়া বোন, (৬) বৈপিত্রেয়া বোন, (৭) মা, (৮) দাদী।

আসাবার বিবরণ

আসাবা প্রথমত দুই প্রকার। আসাবা নাসাবিয়্যা ও আসাবা সাবাবিয়্যা। মৃতের সঙ্গে যাদের বংশীয় সম্বন্ধ আছে, তারা 'আসাবা নাসাবিয়্যা'। আর যাদের এরূপ সম্বন্ধ নেই কিন্তু বিশেষ কারণে তারা মীরাস লাভ করে, তারা 'আসাবা সাবাবিয়্যা'।

আসাবা নাসাবিয়্যা তিন প্রকার : (১) আসাবা বি নাফসিহী। এরা এমন পুরুষ ওয়ারিস, মৃতের সঙ্গে যার সম্বন্ধ স্থাপনে কোন নারীর মধ্যস্থতা নেই, (২) আসবা বি গায়রিহী। এরা এমন নারী ওয়ারিস, যারা স্বয়ং আসাবা হয় না, বরং কোন পুরুষ ওয়ারিসের কারণে আসাবারূপে গণ্য হয়, (৩) আসাবা মা'আ গায়রিহী, যেসকল নারী ওয়ারিস অপর নারী ওয়ারিসের সঙ্গে আসাবা হয়।[৭৬]

আসাবা বি নাফসিহী

আসাবা বি নাফসিহী-এর অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়গণ চারটি ধারায় বিভক্ত : (ক) পুত্রীয় ধারা। মৃতের পৌত্র ও তার নিচের পুত্রগণ এর অন্তর্ভুক্ত, (খ) পিতৃ ধারা। এর মধ্যে মৃত ব্যক্তির পিতা, দাদা ও তার উপরের পুরুষগণ, (গ) ভ্রাতৃ ধারা। এর মধ্যে পড়ে আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাতিজা, বৈমাত্রেয় ভাতিজা ও তদনিম্ন পুরুষগণ। এ ধারাটি আপন ও বৈমাত্রেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বৈপিত্রেয় সম্বন্ধীয় আত্মীয়তা এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। তারা যাবিল-ফুরূযের মধ্যে পড়ে, (ঘ) চাচাত ধারা, পিতার আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, পিতার আপন ভাইয়ের পুত্র, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র এবং তাদের অধঃস্তন এ ধারার অন্তর্ভুক্ত। (আল-মাওয়ারিস, পৃ. ৬৫-৬৬)

আসাবার মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি

আসাবা বি নাফ্সিহীর অন্তর্ভুক্ত আত্মীয় যদি একাধিক হয় তখন সম্পত্তি বণ্টনে অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হবে। অগ্রাধিকার বিবেচনার নীতি তিনটি :

(ক) ধারাভিত্তিক অগ্রাধিকার : উল্লিখিত চার ধারার আসাবার মধ্যে প্রথমোক্ত ধারার আসাবা অন্যদের উপর অগ্রাধিকার রাখে। কাজেই তাদের বর্তমানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধারার আসাবা উত্তরাধিকার লাভ করে না। এ ধারার কোন আসাবা না থাকলে তখন দ্বিতীয় ধারার আসাবা অগ্রাধিকার লাভ করে। তাদের অবর্তমানে তৃতীয় ধারা এবং সবশেষে চতুর্থ ধারার আসাবা হক্দার বিবেচিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, পিতা, ভাই ও চাচা জীবিত থাকে তখন যাবিল-ফুরূযের অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট সম্পদ পুত্র পাবে। পিতা, ভাই ও চাচা আসাবা হিসাবে তাতে অংশ পাবে না। যদি পুত্র না থাকে তবে বাকি তিনজনের মধ্যে পিতা অগ্রাধিকার হবে। যদি কেবল ভাই ও চাচা থাকে সে ক্ষেত্রে চাচার উপর ভাইয়ের অগ্রাধিকার থাকবে।

(খ) স্তরভিত্তিক অগ্রাধিকার : যদি একই ধারার আসাবার অন্তর্ভুক্ত একাধিক আত্মীয় থাকে এবং ধারাভিত্তিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তারা উত্তরাধিকারী হয়, সে ক্ষেত্রে স্তরভিত্তিক অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি পুত্র ও পৌত্র-উভয় রেখে মারা যায়, তবে প্রথম ধারার আসাবা হিসাবে পুত্র ও পৌত্র উভয়ই হক্দার হয় বটে। কিন্তু আত্মীয়তার স্তর হিসাবে পৌত্রের তুলনায় পুত্র মৃত ব্যক্তির বেশি নিকটতম। কাজেই আসাবা হিসেবে পুত্রই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভ করবে, পৌত্র নয়।[৭৭]

(গ) আত্মীয়তার দৃঢ়তাভিত্তিক অগ্রাধিকার : একই ধারা ও একই স্তরের একাধিক আসাবা থাকলে সেক্ষেত্রে আত্মীয়তার দৃঢ়তার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। যেমন এক ব্যক্তি আপন ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় আপন ভাই আসাবা হিসাবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে। বৈমাত্রেয় ভাই কিছুই পাবে না। কেননা আত্মীয়তার শক্তি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের তুলনায় আপন ভাইয়ের বেশি।

উল্লেখ্য এই নীতিটি কেবল ভ্রাতৃত্ব ও চাচাত ধারার আসাবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পুত্রীয় ও পিতৃত্বের ধারায় নয়।[৭৮]

আসাবা বি গায়রিহী

ওয়ারিসদের মধ্যে এমন চারজন নারী আছে, যারা আপনা-আপনি আসাবা হয় না বটে, তবে পুরুষ আসাবা থাকার কারণে তাদের সঙ্গে সে নারীগণও আসাবারূপে গণ্য হয়। এরা হচ্ছে : (১) ঔরসজাত কন্যা, মৃতের যদি পুত্র ও কন্যা উভয়ই থাকে, তবে পুত্রের কারণে কন্যাও আসাবা হয়; (২) পৌত্রি, মৃতের পৌত্র ও পৌত্রি উভয়ে থাকলে পৌত্রের কারণে পৌত্রিও আসাবা হয়; (৩) আপন বোন, মৃতের আপন ভাই ও বোন থাকলে ভাইয়ের কারণে বোনও আসাবা হয়; (৪) বৈমাত্রেয় বোন, মৃতের বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে ভাইয়ের কারণে বোন আসাবা হয়।[৭৯]

উল্লিখিত চারজন নারী তাদের ভাইয়ের কারণে আসাবা হয়, 'পুরুষ নারীর দ্বিগুণ'–এ নীতিতে তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে।

আসাবা মা'আ গায়রিহী

মৃত ব্যক্তির যদি কন্যা বা পৌত্রি এবং আপন বা বৈমাত্রেয়ী বোন থাকে আর তাদের সঙ্গে কোন ভাই না থাকে, সে ক্ষেত্রে কন্যা বা পৌত্রির সঙ্গে বোন আসাবা হয়, যাবিল-ফুরূয হিসাবে কন্যার অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে আসাবা হিসাবে তা বোন পাবে।

আসাবা সাবাবিয়্যা

মৃত ব্যক্তি যদি আযাদকৃত গোলাম হয়ে থাকে তবে তাকে আযাদ করার কারণে তার মনিব আসাবা সাবাবিয়্যা হবে। তার বংশগত কোন ওয়ারিস না থাকলে আসাবা সাবাবিয়্যা হিসেবে উক্ত আযাদকারী মনিব তার সম্পত্তির অধিকারী হবে।[৮০] অবশ্য বর্তমানকালে এর প্রচলন নেই।

মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিদ্বারা সর্বপ্রথম তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হবে, তারপর তার ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ে তার অসিয়্যাত পূরণ করা হবে। তা দাফন-কাফন ও ঋণ পরিশোধের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকবে তার এক-তৃতীয়াংশদ্বারা। চতুর্থ পর্যায়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃতের ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এক্ষেত্রে যাবিল-ফুরূযের অগ্রাধিকার। তাদের অংশ প্রদানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা প্রথম শ্রেণীর আসাবা (অর্থাৎ আসাবা নাসাবিয়্যা)-এর মধ্যে অগ্রাধিকার বিধি অনুযায়ী পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ নীতিতে বণ্টন করা হবে। এ শ্রেণীর কোন আসাবা না থাকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসাবা অর্থাৎ আসাবা সাবাবিয়্যা সে সম্পত্তির অধিকারী হবে। এ শ্রেণীর মধ্যে তা পুনর্বণ্টন করা হবে। অবশ্য স্বামী ও স্ত্রী পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন হিস্যা পাবে না।

যাবিল-ফুরূয ও আসাবা এর মধ্যে কেউ জীবিত না থাকলে তখন মৃতের সঙ্গে স্ত্রীলোকের মধ্যস্থতায় সম্পর্কিত আত্মীয়গণ (যাবিল-আরহাম) সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এরূপ কেউও যদি না থাকে তবে মৃতের সমুদয় সম্পত্তি বায়তুলমালে জমা হবে।

যাবিল-ফুরূযের অংশসমূহের বিবরণ

১. পিতার অবস্থা ও অংশ : পিতার মোট তিনটি অবস্থা হতে পারে—(ক) পিতার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির কোন পুরুষ সন্তান (পুত্র, পৌত্র, পুত্র-যত নিচে হোক) জীবিত থাকে, (খ) পিতার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির কোন পুরুষ সন্তান (যত নিচেরই হোক) জীবিত না থাকে, (গ) মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে (তা যত নিচেরই হোক)।

প্রথম অবস্থায় পিতার অংশ এক-ষষ্ঠাংশ। দ্বিতীয় অবস্থায় পিতা যেমন যাবিল-ফুরূয তেমনি আসাবাও বটে। সুতরাং যাবিল-ফুরূয হিসেবে তার অংশ এক-ষষ্ঠাংশ এবং অন্যান্য যাবিল-ফুরূযের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে আসাবা হিসেবে তাও পিতার হক্।

তৃতীয় অবস্থায় পিতার অংশ নির্ধরিত নেই। কেননা এ অবস্থায় কেবলই আসাবা। সুতরাং অন্যান্য ওয়ারিসদের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সমুদয় সম্পত্তি পিতা লাভ করবে।

২. দাদার অবস্থা ও অংশ : মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকলে দাদা মীরাসের অংশ পায় না। কেননা আত্মীয়তার স্তর হিসেবে দাদা অপেক্ষা পিতা নিকটতম। পিতা না থাকলে তখন দাদা পিতার স্থানে চলে আসে এবং পিতার অনুরূপ অংশ পাবে।[৮১]

৩. বৈপিত্রেয় ভাই : বৈপিত্রেয় ভাই কখনও আসাবা হয় না, যাবিল-ফুরূয হিসেবে তার তিন অবস্থা—(ক) মৃত ব্যক্তির এরূপ ভাই একজন থাকলে তার অংশ এক-ষষ্ঠাংশ। এরূপ ভাই একাধিক থাকলে তারা সবাই মিলে এক-তৃতীয়াংশ। যা তারা সমহারে ভাগ করে নেবে। এরূপ ভাইয়ের সঙ্গে বোন থাকলে সেও ভাইয়ের সমান অংশ পাবে। বৈপিত্রেয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশ তারতম্য হয় না, (খ) মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী (যত নিচের হোক না কেন) কিংবা পিতা-পিতামহ জীবিত থাকলে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন কোন অংশ পায় না।

৪. স্বামীর অবস্থা ও অংশ : স্বামীর দুই অবস্থা—(ক) স্ত্রী তার মৃত্যুকালে স্বামীর সঙ্গে কোন সন্তান-সন্তুতি (এই স্বামীর বা অন্য স্বামীর ঔরসজাত) পুত্র, কন্যা বা নাতি-নাতনী যত নিচেরই হোক রেখে গেলে, (খ) কোন সন্তান-সন্তুতি রেখে না গেলে।

স্ত্রীর কোন সন্তান-সন্তুতি না থাকলে তখন স্বামী তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ লাভ করে। যদি কোন সন্তান-সন্তুতি থাকে (তা যত নিচেরই হোক) তবে স্বামীর অংশ এক-চতুর্থাংশ হবে।[৮২]

৫. স্ত্রীর অবস্থা ও মীরাস : স্বামী যেমন স্ত্রীর মীরাস থেকে কখনও বঞ্চিত হয় না, তেমনি স্ত্রীও স্বামীর মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় না। মীরাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর দুই অবস্থা—(ক) স্বামীর যদি কোন সন্তান-সন্তুতি থাকে, তা যে স্ত্রীরই গর্ভজাত হোক না কেন, তবে স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ লাভ করে, (খ) স্বামী যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তবে স্ত্রীর অংশ এক-চতুর্থাংশ।

উল্লেখ্য, স্ত্রী একাধিক থাকলে তারা সম্মিলিতভাবে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ লাভ করবে।

৬. কন্যার মীরাস : কন্যাও সর্বাবস্থায়ই মীরাসের অধিকারী হয়, তার যদি কোন ভাই থাকে তখন আসাবা হিসাবে, অন্যথায় যাবিল-ফুরূয হিসাবে সে মীরাস পাবে। তার সর্বমোট তিন অবস্থা—(ক) কন্যা যদি একজন থাকে এবং সঙ্গে তার কোন ভাই না থাকে তবে সে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে, (খ) কন্যা একাধিক থাকলে এবং সঙ্গে কোন ভাই না

থাকলে তারা সবাই মিলে দুই-তৃতীয়াংশ অংশ লাভ করবে যা তাদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করা হবে, (গ) কন্যার সঙ্গে যদি মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র জীবিত থাকে তবে সেক্ষেত্রে কন্যা হিসাবে মীরাস পাবে এবং যাবিল-ফুরূযের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুণ—এ নীতিতে পুত্র-কন্যার মধ্যে বন্টন করা হবে। (সিরাজী, পৃ. ১১-১২)

৭. পৌত্রির মীরাস : পুত্রের কন্যা, পৌত্রের কন্যা, প্রপৌত্রের কন্যা এভাবে যত নিচে যাক যথাক্রমে একের অবর্তমানে অপরজন পৌত্রি হিসাবে মীরাস লাভ করবে। পৌত্রির মোট ছয় অবস্থা—(ক) মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র ও কন্যা কেউ না থাকে কেবল এক পৌত্রি থাকে তখন সে কন্যার অনুরূপ সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পায়, (খ) মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র ও কন্যা কেউ না থাকে কিন্তু দুই বা ততোধিক পৌত্রি থাকে তবে এ অবস্থায় কন্যাদের মত তারা দুই-তৃতীয়াংশ অংশ পাবে, (গ) মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র ও কন্যা না থাকে কিন্তু এক বা একাধিক পৌত্রির সঙ্গে কোন পৌত্রও থাকে তবে যাবিল-ফুরূযের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকে আসাবা হিসাবে পৌত্র-পৌত্রি তা লাভ করবে এবং নারীর দ্বিগুণ পুরুষ-নীতিতে তা তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, (ঘ) যদি মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র ও কন্যা না থাকে, পৌত্রও না থাকে কিন্তু এক বা একাধিক পৌত্রি থাকে এবং সেই সঙ্গে প্রপৌত্রও থাকে তবে সেক্ষেত্রেও তৃতীয় অবস্থায় অনুরূপ আসাবা হিসাবে প্রপৌত্রের সঙ্গে পৌত্রিগণ সম্পত্তি লাভ করবে, (ঙ) মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র-প্রপৌত্র কিছুই না থাকে, কিন্তু একজন কন্যা থাকে তবে পৌত্রি সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ অংশ পাবে। তা পৌত্রি একজন হোক বা একাধিক, (চ) মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র জীবিত থাকলে পৌত্রি বঞ্চিত হবে। এমনিভাবে যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র ও পৌত্র না থাকে কিন্তু দুই বা ততোধিক কন্যাসন্তান থাকে, তখনও পৌত্রি বঞ্চিত হবে।[৮৩]

উল্লেখ্য, একাধিক পৌত্রির মধ্যে মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে এটা বিবেচ্য নয় যে, তারা মৃতের একই পুত্রের সন্তান, না একাধিক পুত্রের ? বরং যত পুত্রেরই সন্তান হোক তাদের সর্বমোট সংখ্যা বিবেচ্য। উদাহরণত মৃত ব্যক্তির এক পুত্রের আছে এক কন্যা এবং অপর পুত্রের তিন কন্যা। এ অবস্থায় নিয়মানুসারে পৌত্রিগণ মীরাসের যে অংশ পাবে তা উল্লিখিত চার পৌত্রির মধ্যে সমহারে বণ্টন করা হবে। এমন নয় যে, দুই পিতার সন্তান হিসাবে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করতঃ এক পিতার কন্যাকে অর্ধেক এবং অপর পিতার তিন কন্যাকে বাকি অর্ধেক দেওয়া হবে।

আরও উল্লেখ্য যে, পৌত্রির ক্ষেত্রে পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে যে অবস্থা হয়, অনুরূপ অবস্থায় প্রপৌত্রির ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য হবে। যদি তার সঙ্গে পৌত্র-পৌত্রি জীবিত থাকে। যেমন একজন পৌত্রি জীবিত থাকলে প্রপৌত্রি (একবা একাধিক) এক-ষষ্ঠাংশ অংশ পাবে এবং দু'জন পৌত্রি থাকলে এবং প্রপৌত্রির সঙ্গে প্রপৌত্র না থাকলে প্রপৌত্রিগণ কিছুই পাবে না। এমনিভাবে পৌত্র জীবিত থাকলেও প্রপৌত্রি কিছু পায় না। পৌত্রির মীরাস হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস ও ইজ্‌মাদ্বারা প্রমাণিত।

৮. সহোদর বোনের মীরাস : মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার সহোদর বোন কখনও যাবিল-ফুরূয হিসাবে এবং কখনও আসাবা হিসাবে অংশ লাভ করে। আবার কখনও বঞ্চিত হয়। তার সর্বমোট পাঁচ অবস্থা—(ক) মৃত ব্যক্তির পুত্র-পৌত্র, প্রপৌত্র, (যত নিচে হোক),

পিতা কিংবা দাদা জীবিত থাকলে সহোদর বোন কোন অংশ পায় না, (খ) উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের কেউ যদি জীবিত না থাকে এবং মৃত ব্যক্তির কন্যা, পৌত্রি ও সহোদর ভাইও না থাকে, তখন সহোদর বোন যাবিল-ফুরূয হিসেবে অংশ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে বোন একজন হলে সে অর্ধেক অংশ পাবে, (গ) দুই বা ততোধিক হলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ অংশ পাবে, (ঘ) মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই জীবিত থাকলে বোন আসাবা বি গায়রিহী হয়ে যায় এবং যাবিল-ফুরূযের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি নারীর দ্বিগুণ পুরুষ—এ নিয়মে ভাইবোনের মধ্যে বণ্টন করতে হয়, (ঙ) মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই জীবিত না থাকলে তখন যদি কন্যা বা পৌত্রি থাকে তবে তাদের অংশ প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবা হিসাবে সহোদর বোন লাভ করবে।[৮৪]

৯. বৈমাত্রেয় বোনের মীরাস : মৃতের যদি সহোদরা বোন না থাকে কিন্তু বৈমাত্রেয় বোন থাকে তখন সেও সহোদরা বোনের ন্যায় অংশ পাবে। বৈমাত্রেয় বোনের মোট সাত অবস্থা, তন্মধ্যে পাঁচ অবস্থা সহোদরা বোনের ন্যায়—(১) মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, কন্যা, পৌত্রি (যত নিচের হোক) ও সহোদরা বোন না থাকে, কেবল একজন বৈমাত্রেয় বোন থাকে তবে তার অংশ অর্ধেক, (২) উপরোক্ত অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন একাধিক থাকলে তারা সবাই সমানভাবে দুই-তৃতীয়াংশ অংশ পাবে, (৩) মৃত ব্যক্তির যদি কন্যা অথবা পৌত্রি (যত নিচের হোক) থাকে, কিন্তু সহোদরা বোন না থাকে তবে বৈমাত্রেয় বোন আসাবা হবে—যদি তার সঙ্গে কোন ভাই না থাকে, (৪) মৃত ব্যক্তির যদি কন্যা অথবা পৌত্রি না থাকে, কিন্তু একজন সহোদরা কোন থাকে তবে বৈমাত্রেয় বোন এক-ষষ্ঠাংশ অংশ পাবে। তা একজন হোক বা একাধিক, (৫) সহোদরা বোন একাধিক থাকলে বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হয়, (৬) বৈমাত্রেয় বোনের সঙ্গে যদি বৈমাত্রেয় ভাইও থাকে তবে বোন তার ভাইয়ের সঙ্গে আসাবা হবে, (৭) মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, পিতা, পিতামহ, সহোদর ভাই কিংবা একজন সহোদরা বোন এবং তার সঙ্গে মৃতের কন্যা বা পৌত্রি (যত নিচে হোক) জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয় বোন কিছুই পায় না।[৮৫]

১০. বৈপিত্রেয়ী বোন (মায়ের গর্ভজাত অন্য স্বামীর সন্তান) : বৈপিত্রেয়ী বোনের তিন অবস্থা—(ক) মৃত ব্যক্তির যদি বৈপিত্রেয় ভাই না থাকে তবে বৈপিত্রেয়ী বোন এক-ষষ্ঠাংশ অংশ পাবে, (খ) বৈপিত্রেয়ী বোন দুই বা ততোধিক থাকলে বা এরূপ বোনের সঙ্গে ভাইও থাকলে তারা সকলে মিলে এক-তৃতীয়াংশ অংশ পাবে এবং তা তাদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করা হবে, (গ) মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পৌত্র, পৌত্রি (যত নিচে হোক) অথবা পিতা বা দাদা জীবিত থাকলে বৈপিত্রেয়ী বোন (এবং ভাইও) কিছুই পায় না।[৮৬]

১১. মায়ের অবস্থা ও তার অংশ : মা সর্বাবস্থায়ই তার মৃত সন্তানের মীরাস লাভ করে। কখনো বঞ্চিত হয় না। তার তিন অবস্থা—(১) মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পৌত্র, পৌত্রি (যত নিচে হোক) কিংবা একাধিক ভাইবোন (তা যে রকমের ভাইবোন হোক) জীবিত থাকলে মা তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ অংশ পাবে। (২) মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও পিতামাতা কিংবা স্বামী ও পিতামাতা জীবিত থাকলে স্ত্রীর বা স্বামীর অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অংশ মা পাবে, (৩) মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পৌত্র, পৌত্রি (যত নিচে হোক) একাধিক

ভাইবোন এবং স্ত্রী ও পিতামাতা বা স্বামী ও পিতামাতা উভয়ে জীবিত না থাকলে মা সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অংশ পাবে।[৮৬]

দাদী ও নানীর মীরাস

দাদী বলতে কেবল পিতার মা-ই নয়, বরং পিতামহের মা, পিতামহীর মা (পিতার নানী) প্রপিতামহের মা, প্রপিতামহীর মা (এভাবে যত উপরে হোক) সবাই দাদীর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ নানী বলতেও কেবল মায়ের মা-ই নয়, বরং নানীর মা, নানীর মায়ের মা, এভাবে যত উপরে যাক সকলেই বোঝায়। এদের মধ্যে প্রথম স্তরের বর্তমানে দ্বিতীয় স্তরের এবং দ্বিতীয় স্তরের বর্তমানে তৃতীয় স্তরের দাদী-নানী বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ পিতার মা ও মায়ের মা-এর বর্তমানে পরদাদার মা ও পরনানীর মা মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়। দাদী ও নানীর মোট তিন অবস্থা : (১) মৃত ব্যক্তির মা জীবিত থাকলে দাদী ও নানী মীরাস পায় না, (২) পিতা ও পিতামহ জীবিত থাকলে দাদী বঞ্চিত হয় কিন্তু নানীর অংশ ঠিক থাকে। তার অংশ এক-ষষ্ঠাংশ, (৩) পিতামাতা, পিতামহ (যত উর্ধ্বে হোক) কেউ জীবিত না থাকলে দাদী ও নানী উভয়ে মীরাস পায়। তাদের মিলিত অংশ এক-ষষ্ঠাংশ, যা তাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে।[৮৭]

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল জামে-লি-আহ্কামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবী (রা), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪; তাফসীরে রূহুল মা'আনী : ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।
২. আল জামে-লি-আহ্কামিল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪।
৩. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৮।
৪. তাফসীরে রূহুল মা'আনী : ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।
৫. বাদায়েউস্ সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০।
৬. আহ্কামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫।
৭. বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০; আহ্কামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭।
৮. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৮।
৯. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৮-৫৬৯; বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩৩২।
১০. আহ্কামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪।
১১. বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩৩৩।
১২. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, টীকাসহ; আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯০।
১৩. বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।
১৪. বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯।
১৫. বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮-৩৯৪।
১৬. হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩৯।
১৭. বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩৮৫।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬।
১৯. আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৭।
২০. আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৭-১৩৮।
২১. আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৯।

২২. আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৯।
২৩. বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৭১।
২৪. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫।
২৫. বাদায়েউস সানায়ে, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬।
২৬. ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৫।
২৭. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২।
২৮. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২।
২৯. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; শামী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০১।
৩০. ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০১; আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩।
৩১. ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০১।
৩২. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।
৩৩. ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৫।
৩৪. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭।
৩৫. বাদায়েউস সানায়ে, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২০; ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৫; নাসবুর রায়া, ৩য় খণ্ড, ওয়াক্ফ অধ্যায়, পৃ. ৪৭৬-৪৭৮।
৩৬. শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬২।
৩৭. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।
৩৮. শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।
৩৯. শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।
৪০. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; রাদ্দুল মুহ্তার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৩।
৪১. প্রাগুক্ত, রাদ্দুল মুহ্তার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।
৪২. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২।
৪৩. রাদ্দুল মুহ্তার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৮৩-৫৮৬; ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৮।
৪৪. শামী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৪; আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০।
৪৫. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।
৪৬. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।
৪৭. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।
৪৮. বুখারী ও মুসলিম, ১ম খণ্ড।
৪৯. দুররুল-মুখতার; রাদ্দুল মুহতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৪৫; আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪; ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৩।
৫০. রাদ্দুল মুহ্তার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪০৪-৪০৫; আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪।
৫১. হিদায়া ও তার ভাষ্য–ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৫।
৫২. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬০।
৫৩. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬০।
৫৪. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬১।
৫৫. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩।
৫৬. ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৫।
৫৭. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৬; হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৯।
৫৮. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪।

৫৯. রাদ্দুল মুহ্‌তার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬০১; ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৮।
৬০. দুররুল মুখ্‌তার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬০১।
৬১. তানবীরুল আবসার, শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৭৭।
৬২. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৮।
৬৩. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৮; শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৭৯।
৬৪. ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪২।
৬৫. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।
৬৬. বাহরুর রাইক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৩৯।
৬৭. বাহরুর রাইক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪; আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩; আল-বায়যাবিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৩।
৬৮. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬; ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪২।
৬৯. আলমগীরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬; ফাতহুল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪২।
৭০. আল-মাওয়ারিস ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৩১-৩২।
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৭২. আল-মাওয়ারিস, পৃ. ৩৭; আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৫৬।
৭৩. আল-মাওয়ারিস, পৃ. ৪২-৪৩।
৭৪. মুফীদুল ওয়ারিসীন, পৃ. ৬৬-৬৭।
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।
৭৬. আল-মাওয়ারিস, পৃ. ৬৫-৬৬।
৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।
৭৮. আল-মাওয়ারিস, পৃ. ৬৭।
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
৮০. আল-মাওয়ারিস, পৃ. ৬৫-৭০।
৮১. আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।
৮২. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৭৪।
৮৩. আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।
৮৪. সিরাজী, পৃ. ১৭-১৮।
৮৫. প্রাগুক্ত।
৮৬. আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৫০।
৮৭. শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৭৫।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইহ্‌সান ও আখ্‌লাক

ইহ্‌সান : পরিচিতি ও গুরুত্ব

'ইহ্‌সান' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর ব্যবহার। ভালভাবে কোন কাজ সম্পাদন করা, কারো কষ্ট লাঘব করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'ইহ্‌সান' হলো, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য উত্তমরূপে ইবাদত করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যাবতীয় কর্তব্য সুন্দর ও উত্তমরূপে সম্পাদন করার নামই ইহ্‌সান। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۔

যে ব্যক্তি ইহ্‌সানকারীরূপে আল্লাহ্‌র নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, সে তো মজবুত হাতল ধারণ করে, আর সমস্ত কাজের ফলাফল তো আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে। (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ২২)

ইবাদতকারী ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ ۔

তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতে না পেলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন।[১]

পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, অতিথি, দুঃস্থ, ইয়াতীমের প্রতি ইহ্‌সান তথা সদাচরণ করার জন্য কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۔

এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফিরদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা নিসা, ৪ : ৩৬)

মানুষ ছাড়াও উদ্ভিদ, প্রাণী, জীব-জন্তু এবং কীট-পতঙ্গের প্রতিও ইহ্‌সান করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ ۔

তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে, তাহলে আসমানের অধিপতি আল্লাহ্ও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযী শরীফ)

'ইহ্সান' একটি মহৎ গুণ। মানব জীবনে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ইহ্সানের (মাকামে) স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যই আধ্যাত্মিকতার যাবতীয় সাধনা, এই ইহ্সানই হল তাসাওউফের মূল হাকীকত।

তাসাওউফ : সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

মুসলিম দর্শনে 'তাসাওউফ নামে খ্যাত। 'সূফী' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, 'সূফী' শব্দটি 'আহলুস সুফ্ফা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে 'সূফী' শব্দটি 'সূফ' বা পশম শব্দ হতে উৎপন্ন। কেননা, পশমী বস্ত্র সরলতা ও আড়ম্বরহীনতার প্রতীক। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ বিলাস-ব্যসনের পরিবর্তে সাদাসিধা পোশাক পরিধান করতেন। তাই এ পশমী পোশাক পরিধানকারীগণ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে 'সূফী' নামে পরিচিত।

মুসলিম জাতির চিন্তাধারার অন্যান্য দিকের মত তাসাওউফও কুরআন-হাদীসের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লামা শামী (র) বলেছেন, ইল্মে তাসাওউফ হলো 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান', যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সৎগুণসমূহের প্রকারভেদ এবং তা অর্জনের পন্থা ও অসৎ স্বভাবসমূহের শ্রেণীবিভাগ এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবগত হওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম যাকারিয়্যা আল-আনসারী (র) ইল্মে তাসাওউফের সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

اَلتَّصَوُّفُ عِلْمٌ تُعْرَفُ بِهِ اَحْوَالُ تَزْكِيَةِ النُّفُوْسِ وَتَصْفِيَةِ الْاَخْلَاقِ وَ تَعْمِيْرِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الْاَبَدِيَّةِ ·

যে ইল্মের দ্বারা অনন্ত সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের যাহির ও বাতিন গঠন করা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়, তাকে 'ইল্মে তাসাওউফ' বলা হয়।

'দুররুল মুখ্তার' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, অবস্থাভেদে তাসাওউফ শিক্ষা করা ফরযে আইন, কখনো ফরযে কিফায়া এবং কখনো মুস্তাহাব। যে পরিমাণ তাসাওউফ শিক্ষার ফলে মানুষের চরিত্র বিশুদ্ধ ও মার্জিত হতে পারে, ততটুকু তাসাওউফ শিক্ষা করা ফরযে আইন। আর যে পরিমাণ তাসাওউফ শিক্ষার ফলে অন্যকে তা শিক্ষা দেওয়া যায়, এ পরিমাণ শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া, আর যে পরিমাণ শিক্ষার ফলে ইলমে তাসাওউফের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, সে পরিমাণ শিক্ষা করা মুস্তাহাব। ইল্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ ·

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইল্ম অর্জন করা ফরয।[২]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (র) তাঁর গ্রন্থ 'মিরকাত'-এর প্রথম খণ্ডে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন : "শরী'আতের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন না করলে মা'রিফাত লাভ যেমন সম্ভব নয়, তদ্রূপ ইল্মে মা'রিফাতও সঠিকভাবে না শিখলে শরী'আতের হুকুম-আহ্কামও ঠিকমত আদায় করা যায় না।" এজন্য ইমাম মালিক (র) বলেছেন, "যে

ব্যক্তি শুধু ফিকহ্ বা শরী'আতের জ্ঞনার্জন করেছে কিন্তু তাসাওউফ বা মা'রিফাতের জ্ঞানার্জন করেনি, সে ব্যক্তি ফাসিক। আর যে ব্যক্তি ইল্‌মে ফিক্‌হ না শিখে, কেবল ইলমে তাসাওউফ শিখে সূফী হয়েছে, সে যিন্দীক। কারণ ফিক্‌হ শিক্ষা না করার কারণে সে কখনো নিজের আকীদা ও ঈমান ঠিক রাখতে সক্ষম হবে না। অতএব যে ব্যক্তি উভয় প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।" এ সম্পর্কে আবূ তালিব মাক্কী (র)-এর বক্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন : উভয় প্রকারের বিদ্যাই আসল।"

'মাযাহেরে হক' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে 'বাবুল ঈমান' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, "এটা জানা কর্তব্য যে, ধর্মের ভিত্তি এবং এর পূর্ণতা ফিকহ্, আকাইদ ও তাসাওউফের উপর নির্ভর করে।"

একদা হযরত জিববরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুহাম্মাদ! ইসলাম কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ইসলাম হলো, এরূপ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্‌র ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযান মাসে রোযা রাখা এবং সামর্থ্য হলে আল্লাহ্‌র ঘরে হজ্জ করা। এরপর জিব্‌রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখা, ফিরিশ্‌তা, কিতাব, রাসূলগণ, শেষ দিন ও তাক্‌দীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখাই হলো ঈমান। হাদীসে জিব্‌রীলে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের পর জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহ্সান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন :

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ۔

তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছো। আর তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। (মিশকাত, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়)

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত, 'ইসলাম' শব্দটি ফিক্‌হের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ক্রিয়াকলাপের বিধান এতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের 'ঈমান' শব্দের দ্বারা 'আকাইদ' বা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি এবং 'ইহসান' শব্দটিতে আল্লাহ্‌র প্রতি একান্তভাবে মনোনিবেশ করার ইঙ্গিত তথা ইলমে বাতিন বা তাসাওউফ শিক্ষার প্রতি নির্দেশ রয়েছে।

তাসাওউফ সত্য হওয়ার দলীল

তাসাওউফ সত্য হওয়ার দলীল সম্পর্কে উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এবং হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র)-এর অভিমত পেশ করা হলো, মাওলানা থানভী (র) বলেন, "কোন কোন লোক বা কাটখোট্টা আলিম তাসাওউফ ইন্‌কার (অস্বীকার) করে থাকেন। এখানে তাদের ভালভাবে বুঝানো হবে যে, তাসাওউফ সত্য।" (তালীমুদ্দীন, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

ইমাম গাযালী (র) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'এহ্ইয়া ও উলূমুদ্দীন' (৫ম খণ্ড)-এর 'ইলমে মা'আরিফাত অর্জনের জন্য ইল্‌মে শরী'আতের প্রমাণ' এ অধ্যায়ে ইলহাম ও কাশ্‌ফ সম্পর্কে বলেন, ইলহামরূপে কারো নিকট কিছু প্রকাশ হলে এবং অজ্ঞাত স্থানে হতে কোন জ্ঞান হৃদয়ে পতিত হলে, বিশুদ্ধ পন্থার সাহায্যে সে ব্যক্তি আরিফ বা তত্ত্বজ্ঞানের সূফীতে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি

নিজের আত্মার মধ্যে এরূপ কোন কিছু উপলব্ধি করতে পারে না, তার উচিত এর উপর বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا .

যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৯)

সব সময় ইবাদতে মগ্ন থাকার দরুন ইলমে মা'রিফাত বা তত্ত্বজ্ঞান আত্মার উপর ইলহাম ও কাশ্‌ফরূপে প্রকাশ পায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ্ তাকে এমন জ্ঞান দান করেন, যা পূর্বে তার অজানা ছিল। যা সে আমল করে, তিনি তার ভিতর তাকে তাওফীক দেন, যে পর্যন্ত তার জন্য জান্নাত অবধারিত না হয়। আর যে ব্যক্তি তার বিদ্যানুযায়ী আমল করে না, সে তার বিদ্যার ভিতর ঘুরতে থাকে। সে যা আমল করে, তার জন্য তিনি তাকে তাওফীক প্রদান করেন না, যে পর্যন্ত না জাহান্নাম তার জন্য সুনিশ্চিত হয়।" এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا .

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার জন্য পথ বের করে দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا .

হে ঈমানদারগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি প্রদান করবেন। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৯)

এখানে ফুরকানের অর্থ হিদায়াত ও নূর, যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যা পার্থক্য করা যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দু'আয় বলতেন : "হে আল্লাহ্! আমাকে নূর দান কর। আমার নূরকে আরো বৃদ্ধি করে দাও। আমার আত্মায় নূর দাও, আমার যবানে নূর দাও, আমার শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তিতে নূর দাও, আমার পশমে, রক্ত-মাংস ও অস্থিতে নূর দাও।" (আল-হাদীস)

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ .

আল্লাহ্ যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোতে রয়েছে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ২২)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "তোমরা মু'মিনের ফিরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করবে, কেননা সে আল্লাহ্‌র নূরের সাহায্যে দেখে থাকে।"[৩] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

وَلَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُ فِىْ اُمَّتِىْ اَحَدٌ فَاِنَّهٗ عُمَرُ .

তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণের মধ্যে যেরূপ ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে উমর ফারূক সেরূপ।

'মুহাদ্দাস' শব্দের অর্থ হল, এমন ব্যক্তি যার অন্তরে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন জিনিসের ইলহাম হয়। এ পর্যায়ে উল্লেখ্য যে, হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে মাসজিদে নববীতে জুমু'আর দিনে খুতবার সময় বলেন :

يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ الْجَبَلِ .

হে সারিয়া ! পর্বতের দিকে (লক্ষ্য কর), পর্বতের দিকে (লক্ষ্য কর)।

খুত্‌বা দেওয়ার সময় তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জানতে পারেন যে, শত্রু সেনারা নাহ্ওয়ান্দ নামক রণক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী সে ব্যাপারে বে-খবর ছিল। এ অবস্থায় তিনি তাদের সতর্ক করার জন্য এ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ নির্দেশ বাণীটি তখনই সারিয়ার কাছে পৌঁছেছিল এবং সে মুতাবিক রণ-কৌশল গ্রহণ করায় সমূহ ক্ষতি থেকে তাঁরা রক্ষা পেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ .

জেনে রাখ ! নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র ওলী, তাদের কোন ভয় নেই এবং তাদের কোন শংকা নেই। যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬২-৬৪)

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেছেন, এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, বেলায়েত দু'টি জিনিসের দ্বারা হাসিল হয়, প্রথমটি 'ঈমান' এবং দ্বিতীয়টি 'তাক্ওয়া। অতএব যে ব্যক্তি যত বেশি ঈমান এবং তাক্ওয়ার অধিকারী, সে তত বড় ওলী বা বিলায়েতের অধিকারী। অতএব এটা স্বীকৃত সত্য যে, বিলায়েত বা ওলীর জন্য উঁচুস্তরের ঈমান ও তাক্ওয়া দরকার। কিন্তু বাতিন বা অভ্যন্তরীণ অবস্থার পবিত্রতা সাধন ছাড়া কিছুতেই উঁচুস্তরের ঈমান ও তাক্ওয়া হাসিল হতে পারে না। কেননা ঈমান তো বাতিন (অর্থাৎ দিল বা অন্তরের) দ্বারাই হাসিল হয়। আর প্রকাশ্য তাক্ওয়া যদিও জাহির অর্থাৎ শরীরদ্বারাই হাসিল হয়ে থাকে, কিন্তু আসল তাক্ওয়া কিছুতেই অন্তর ব্যতীত শুধু শরীরদ্বারা হাসিল হয় না। অতএব জানা গেল যে, বিলায়েতের মর্তবা হাসিলের জন্য প্রধানত দু'টি জিনিসের দরকার। এক. আকাইদ দুরস্ত রেখে জরুরী আমলের পাবন্দ হওয়া এবং দুই. বাতিন দুরস্ত করা। (তালীমুদ্দীন, ২য় খণ্ড)

বস্তুত আত্মা পবিত্র হলে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে সৌভাগ্যশালী হবে এবং আত্মা অপবিত্র হলে দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে। আত্মারই আলো বা অন্ধকারের কারণে এর সৎ গুণাবলী ও দোষাবলী বাহ্যিক প্রকাশিত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَلاَ اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ .

জেনে রেখ ! শরীরের মধ্যে এক টুক্‌রা গোশ্‌ত আছে, যদি তা পরিশুদ্ধ হয়, তবে গোটা শরীরই পরিশুদ্ধ হয়। আর যদি তা খারাপ হয়, তবে সমস্ত শরীরই খারাপ হয়। মনে রেখ ! তা হলো কাল্‌ব বা দিল।[8]

এ কাল্‌ব বা আত্মাকে পবিত্র করার পদ্ধতি যে ইল্‌মদ্বারা জানা যায়, তাকেই 'ইল্‌মে তাসাওউফ' বলে। আর এই তাসাওউফের মাধ্যমেই মানব অন্তঃকরণ, কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদি যাবতীয় কলুষিত বিষয় থেকে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে।

ইখলাস ও নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা

ইখ্লাস হলো আন্তরিকতার সাথে কাজ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। (সূরা বায়্যিনাহ্, ৯৮ : ৫)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ـ

জেনে রাখ ! অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৩)

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মু'আয (রা)-কে বলেন : হে মু'আয! তুমি ইখ্লাসের সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাতে অল্প ইবাদতই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (আল-হাদীস)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, ইখলাস বা আন্তরিকতাসহ দীনের কাজ করলে তা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই পসন্দনীয়। ইখলাসের সাথে নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِءٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ـ

আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের কাজের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তার কাজের ফলাফল আল্লাহ্‌র কাছে সেরূপ পাবে, যেরূপ সে নিয়্যাত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, অবশ্যই তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। আর কেউ যদি পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্যে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার লক্ষ্যে হিজরত করে, তবে তার হিজরত হবে সে জন্যই।[৫]

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, মানুষ যখন কোন কাজ করে তখন সে মনে মনে একটা উদ্দেশ্য ঠিক করে সে কাজের প্রতি অগ্রসর হয়। এটা মানুষের জন্মগত স্বভাব। এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ তার কাজের ফলাফল আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। যেমন, 'হিজরত' বড় পুণ্যের কাজ এবং কঠিনও। কারণ,এতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধন-দৌলত, ঘরবাড়ি সব কিছুই পরিত্যাগ করতে হয়। কুরআন ও হাদীসে হিজরতের অনেক সাওয়াব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কাজেই, যে ব্যক্তি এ কঠিন আমলের জন্য প্রস্তুত হবে, সে নিশ্চয়ই এ উদ্দেশ্য নিয়ে তা সম্পন্ন করবে। যদি তার উদ্দেশ্য হয় এ মহান ত্যাগের দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা, তবে সে তার এ কাজের ফল তার উদ্দেশ্য ও নিয়্যাত অনুসারে পাবে। আল্লাহ্‌র কাছে বিশেষ মর্যাদা পাবে এবং এর ফলে তার এ দেশত্যাগ সার্থক হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে হিজরত করবে, যেমন সুখ্যাতি লাভ করা, টাকা উপার্জন করা, কোন নারীকে বিয়ে করা বা এজাতীয় কোন হীনস্বার্থ হাসিল করা, সে কোনরূপ সাওয়াবের অধিকারী

হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "সর্বপ্রথম বিচারের জন্য কিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে শহীদ হয়েছিল। সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার যেসব নিয়ামত ভোগ করেছিল তা তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে এবং তা স্বীকার করবে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি এ সব নিয়ামতের বিনিময়ে কি আমল করেছ ? সে বলবে, হে আমার রব! আমি তো তোমার দীনের জন্য জিহাদ করে শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো জিহাদ করেছিলে বীরপুরুষ বলে অভিহিত হওয়ার জন্য। তাতো তোমাকে বলা হয়েছে, তারপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে ইল্ম শিখেছে এবং অপরকে শিখিয়েছে ও কুরআন পড়েছে। তাকেও তার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করতে দেওয়া হবে এবং সে তা স্বীকার করবে। সে বলবে, হে আমার রব ! আমি ইল্ম শিখেছি ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ তিলওয়াত করেছি। আর আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা তোমাকে আলিম বলবে এবং কুরআন পড়েছ যাতে লোকেরা বলে সে একজন ক্বারী, তা তো বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে আল্লাহ্র হুকুমে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রকার ধন-সম্পদ থেকে প্রচুর পরিমাণ দিয়েছেন তাকেও তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে এবং সে তা স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, এ ব্যাপারে তুমি কি আমল করেছো ? সে বলবে, হে আমার রব ! যেখানে দান করলে আপনি সন্তুষ্ট, আমি সে সব স্থানে দান-খয়রাত করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো, তুমি তো এই জন্য তা করেছো যাতে তোমাকে দাতা বলা হয়, তা তো বলাও হয়েছে। আল্লাহ্র হুকুমে তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৬]

উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, কাজের আগে উদ্দেশ্য স্থির করা এবং গাফলতির সাথে লক্ষ্যহীন অবস্থায় কোন কাজ না করা আর উদ্দেশ্য স্থির হওয়ার পর তা আল্লাহ্র ও রাসূলের নির্ধারিত কষ্টিপাথরে ঘষে দেখা যে, এতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হবেন, না অসন্তুষ্ট হবেন? পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে পার্থিব উদ্দেশ্যে কোন আমল করা হয়, তা হলে এতে আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন বিনিময় পাওয়া যাবে না, বরং শাস্তি হিসাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা) ও দীনের প্রতি মহব্বত

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১)।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা হৃদয়ের সর্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা। আত্মার উন্নতি ও পরিশুদ্ধি লাভের জন্য শত প্রকার উন্নত অবস্থা অর্জন করতে হয়। এর মধ্যে মুখ্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত। এ মহব্বত যখন প্রবল হয়, তখনই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলাকে মহব্বত করা মানব জাতির জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা, তিনিই রাব্বুল আলামীন এবং হায়াত, মউত, রিয্ক, দাওলাত সবই তাঁর হাতে। কাজেই তাঁকে ভালবাসা ও তার সন্তুষ্টি অর্জন একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ ٠

হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দীন থেকে ফিরে গেলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন আল্লাহ্ যাদের (মুসলমানদের) ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৫৪)

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মহব্বত করাও আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (রা) বলেন :

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ٠

তোমাদের মধ্যে কেউ-ই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে, তার নিজের পিতামতা, সন্তান-সন্তুতি এবং সমস্ত লোকের চাইতে অধিক প্রিয় হয়।[৭]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ভীতি প্রদর্শন করে বলেন :

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ٠

আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যা মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না। (সূরা তাওবা, ৯ : ২৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র কাছে যত দু'আ করতেন, নিম্নোক্ত দু'আটি তার মধ্যে অন্যতম :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ٠

হে আল্লাহ্ ! আপনাকে ভালবাসার তাওফীক আমাকে দিন এবং দান করুন ঐ সমস্ত লোকদের ভালবাসা যারা আপনাকে ভালবাসেন, আর দান করুন আমাকে এমন আমলের মহব্বত যে আমল আমাকে আপনার নিকটবর্তী করে দেয়, আর আমার নফ্স, মাল, পরিবার-পরিজন ও সুশীতল পানি অপেক্ষা আপনার মহব্বতকে আমার জন্য অধিক প্রিয় করে দিন।[৮]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা আরবের জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি এসে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)। কিয়ামাত কবে হবে ? নবী (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি সেদিনের জন্য কি সঞ্চয় করেছে ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমি নামায-রোযার সম্বল তো বেশি কিছু সঞ্চয় করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তুমি যাকে ভালবাস, কিয়ামাতের দিন তুমি তার সাথে থাকবে।[৯]

বস্তুত আল্লাহ্র ভালবাসা লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ একান্ত জরুরী। সাহাবীগণের জীবনে রাসূল প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে কুরাইশ সেনারা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অতর্কিতে হামলা করে এবং মুসলমানদের সারিসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কে আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে ? এ আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই সাতজন আনসার বের হয়ে আসেন এবং তাঁদের প্রত্যেকে বিপুল বিক্রমে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধেশেষে জনৈক আনসার মহিলা, যার পিতা, ভাই ও স্বামী এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, পরপর এ তিনটি হৃদয়বিদারক সংবাদ মহিলা সাহাবীয়্যা শুনতে পান। কিন্তু প্রতিবারই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা) কেমন আছেন? লোকেরা বললেন, তিনি নিরাপদে আছেন। অবশেষে মহিলা সাহাবিয়্যা যুদ্ধের ময়দানে হাযির হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা মুবারক দেখে বলে উঠলেন :

كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ·

ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ! আপনি নিরাপদে আছেন, তাই আমার সব বিপদই তুচ্ছ।[১০]

মোটকথা, দীন ইসলাম তার রাসূলের জীবনকে তাঁর অনুসারীদের জন্য আদর্শ হিসাবে পরিগণিত করেছে এবং তাঁর অনুসৃত অনুপম আদর্শকে আল্লাহ্র ভালবাসা ও সন্তুষ্টিলাভের মাধ্যমরূপে পরিণত করেছেন।

তাওবা ও ইস্তিগফার

'তাওবা' অর্থ অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা। মহান আল্লাহ্ মু'মিনদের তাওবা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ·

হে মু'মিনগণ ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর, ২৪ : ৩১)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : পশ্চিমদিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে ব্যক্তি গুনাহের জন্য তাওবা করবে, তার তাওবা আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করবেন।[১১]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন : কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার নামই তাওবা। নবী কারীম (সা) বলেছেন : আমি প্রত্যহ সত্তরবারের অধিক আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাওবা করে থাকি।[১২] রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন :

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهٗ ·

যে ব্যক্তি পাপ থেকে তাওবা করে সে এমন হয়ে যায়, যেন তার কোন পাপই নেই।[১৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন : আদম সন্তান সবাই পাপ করে থাকে, আর পাপীদের মধ্যে তারাই অধিক ভাল যারা বেশি তাওবা করে।[১৪]

নবী করীম (সা) আরো বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আসমানের পশ্চিমদিকে একটা তাওবার দরজা রেখেছেন, যা সত্তর বছরের রাস্তার দূরত্ব পরিমাণ বিস্তৃত এবং পশ্চিমদিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত দরজাটি কখনো বন্ধ করা হবে না।[১৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন : মহান আল্লাহ্ পাপী বান্দার 'তাওবা'য় ঐ ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হন যে উটের পিঠে খাদ্য, পানীয় ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার বোঝাই করে উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর পাড়ি দিতে গিয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লো এবং পথিমধ্যে কোন মরূদ্যানের একটা ছায়ায় উট রেখে পরিশ্রান্ত দেহখানি মাটির উপর রেখে নিদ্রা গেলো। কিছুক্ষণ পর সে ঘুম থেকে জেগে দেখলো যে, তার উটটি সেখানে নেই। ফলে সে অস্থির হয়ে উটটি খুঁজতে লাগলো এবং তার অবস্থা এমন হলো যে, ক্ষুদ্রা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে নিরাশ হয়ে পড়ল এবং একটি গাছের নিচে শুয়ে পড়লো। এ অবস্থায় সে হঠাৎ দেখতে পায় যে, তার উটটি খাদ্য, পানীয় ও সমস্ত দ্রব্যসম্ভারসহ তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর সে আনন্দের আতিশয্যে ভুলবশত বাক্যটি উল্টা বলে ফেলল, আল্লাহ্ আমি তোমার রব, আর তুমি আমার দাস![১৬]

মূলকথা খাদ্য, পানীয় ও সমস্ত দ্রব্যসম্ভারসহ উটকে ফিরে পেয়ে বেদুঈন লোকটি যেরূপ আনন্দিত হয়েছিল, শয়তানের প্ররোচনায় খাহেশাতে নাফসানীর তাগিদে যখন কোন মানুষ গুনাহের কাজ করার পর অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবা করে এবং গুনাহ্ মাফ চায়, আল্লাহ্ সে ব্যক্তির চাইতেও অধিক আনন্দিত হন।

যথাসময়ে তাওবা না করে মুমূর্ষু অবস্থায় অনুশোচনা করলে তা কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۔

তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা আজীবন মন্দকাজ করে এবং তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি এবং তাওবা তাদের জন্যও নয়, যারা মারা যায় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা, যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। (সূরা নিসা, ৪ : ১৮)

খালিস অন্তঃকরণে তাওবা করলে মহান আল্লাহ্ কবূল করেন এবং জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন : তুমি যদি এত অধিক পরিমাণ পাপকাজ করে থাক যে, তা আসমান সম উঁচু হয়, এরপর অনুতাপের সাথে 'তাওবা' কর, তবুও তোমার তাওবা কবূল হবে, প্রত্যাখ্যাত হবে না। (আল-হাদীস)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন : ইবলীস অভিশপ্ত হওয়ার পর আল্লারহ্র দরবারে বলেছিল, হে আল্লাহ্! তোমার ইয্যতের কসম! মানুষের দেহ থেকে তার আত্মা বের না হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানে অবস্থান করবো। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমিও আমার ইয্যতের শপথ করে বলছি, ততক্ষণ আমি তার তাওবা কবূল করবো, যদি সে তাওবা করে। (আল-হাদীস)

তাক্‌ওয়া

'তাকওয়া' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, পরহেয করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় তাক্‌ওয়া হলো, একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। যে ব্যক্তির মধ্যে তাক্‌ওয়া থাকে, তাকে মুত্তাকী বলা হয়। সৎগুণাবলীর মধ্যে তাক্‌ওয়া হচ্ছে অন্যতম । যার মধ্যে তাক্‌ওয়া থাকে, সে পার্থিব জীবনের লোভে কোন খারাপ কাজ করে না। সে পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবীরা গুনাহ্ ও অশ্লীল কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে, তাকে মুত্তাকী বলা হয়। মুত্তাকী ব্যক্তি সততা, আমানতদারী, ধৈর্য, শোকর, আদল-ইনসাফ ইত্যাদি ধরনের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে। মুত্তাকীদের পরিচয় প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ

যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখে, আর তারা আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন রাখে। (সূরা বাকারা, ২ : ৩-৪)

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ মুত্তাকীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন : ১. গায়েব বা অদৃশ্য যেমন : আল্লাহ, ফিরিশ্‌তা, জান্নাত-জাহান্নাম, আখিরাত ইত্যাদি যা মানবীয় জ্ঞানে বোধগম্য নয়-এরূপ বিষয়গুলোতে ঈমান রাখা; ২. নামায কায়েম করা অর্থাৎ যথাযথ শর্ত পালন করে নিষ্ঠার সাথে নামায কায়েম করা; ৩. আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা ও ধন-সম্পদ থেকে তাঁরই নির্দেশিত পথে ব্যয় করা; ৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন এবং তাঁর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখা। ৫. মুত্তাকীরা পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী। তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি ইয়াকীন রাখে।

তাক্‌ওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

তাক্‌ওয়া মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের চালিকাশক্তি হচ্ছে তাকওয়া। মানব জীবনের তাক্‌ওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে ভয় কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২) আরো ইরশাদ হয়েছে :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ

আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না ওগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশ্‌ত ও রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৭)

তাক্‌ওয়া আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও ভালবাসা লাভ করার উপায়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۔

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (সূরা তাওবা, ৯ : ৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۔

এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর মনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৪)।

তাক্‌ওয়া অবলম্বন জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। একটি চোখ, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে, আর অপর চোখ যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।[১৭]

তাক্‌ওয়া শুধু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় না, বরং তা জান্নাতে প্রবেশ করতেও সাহায্য করে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۔

আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪০-৪১)

আল্লাহ্‌ তা'আলা অপর অপর আয়াতে ইরশাদ করেন :

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۔

মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। (সূরা দুখান, ৪৪ : ৫১)

মুত্তাকী বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র বাণী :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ۔

তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

তাকওয়া সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে সমাজে ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এবং তাক্‌ওয়ার অভাবে মানব চরিত্র পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, যার নযীর বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমানে সমস্যাসংকুল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে যতদিন না তাক্‌ওয়া সৃষ্টি হবে, ততদিন মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গল আশা করা যায় না। তাই বলা যায়, তাক্‌ওয়া হলো মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের মুক্তি ও নাজাতের জন্য মূল চাবিকাঠি।

তাওয়াক্কুল

'তাওয়াক্কুল' অর্থ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত হলে মানুষ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যে অর্জন করতে পারে, তাওয়াক্কুল সেসব গুণের মধ্যে অন্যতম।

তাওয়াক্কুল অবলম্বন প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

আর তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (সূরা মায়িদা, ৫ : ২৩)

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۔

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারী লোকদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯)

তিনি আরও ইরশাদ করেন

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۔

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে, তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (সূরা তালাক, ৬৫ : ৩)

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যেরূপ তাওয়াক্কুল করা উচিত তোমরা যদি তাঁর প্রতি সেরূপ তাওয়াক্কুল করতে পার, তবে তিনি তোমাদের রিয্ক দান করবেন, যেমন পশু-পক্ষীকে রিয্ক দিয়ে থাকেন। পশু-পক্ষীরা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে বেরিয়ে যায় এবং দিন শেষে পূর্ণ উদরে তৃপ্ত হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসে।[৮৮]

হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে যখন কাফিরগণ চড়কে বেঁধে নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছিল, তখন তিনি বলেছিলেন :

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۔

আল্লাহ্ই আমার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি আমার উত্তম কর্মনির্ধারক।

ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আগুনের প্রতি নির্দেশ দেন :

يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۔

হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাও। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৬৯) (সুবহানাল্লাহ্) মহান আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করলে, তার বিনিময় এরূপই হয়ে থাকে।

মূলকথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সব সময় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখা খুবই জরুরী। ভাল-মন্দ সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করা কর্তব্য। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

—৮৮

যিক্‌র-আয্‌কার

'যিক্‌র'-এর আভিধানিক অর্থ স্মরণ করা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় মনেপ্রাণে মহান আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করাকে যিক্‌র বলে। আর যে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাকে যাকির-স্মরণকারী বলা হয়।

যিক্‌রের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে দুনিয়াতে তাঁরই গোলামী ও ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত ইবাদতের মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিক্‌র। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাবস্থায় তাঁর যিক্‌রে মশগুল থাকার জন্য বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً أَصِيْلاً ·

হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪১-৪২)

যিক্‌র দুই প্রকার : ১. যিক্‌রে কালবী-অন্তরের যিক্‌র, ২. যিক্‌রে লিসানী-মুখের যিক্‌র।

কালবদ্বারা সব সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা সম্ভব। তাই কালবের মধ্যে যিক্‌র জারী করার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য খুবই জরুরী। সর্বক্ষণ জিন্দা কালবের দ্বারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যিক্‌রের গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَالَّذِىْ لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ·

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে এবং যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে না—তাদের দৃষ্টান্ত হলো, জীবিত ও মৃতের ন্যায়।[১৯]

যিক্‌রে লিসানী—মুখ দিয়ে যিক্‌র। এ যিক্‌র মুখে উচ্চারণ করা হয়। এর গুরুত্বও কম নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ·

তোমাদের জিহ্‌বা যেন সব সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌রে সিক্ত থাকে।[২০]

ইমাম গাযালী (র) যিক্‌রের চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি যিক্‌রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে চায়, তাহলে তাকে এর আরো তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। কেননা, যিক্‌রের প্রথম তিনটি স্তর খোসার ন্যায় এবং চতুর্থ বা শেষ স্তরটি হলো শাঁসের মত।

প্রথম স্তরে শুধু মুখে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা, অন্তর দিয়ে স্মরণ না করা। এ ধরনের যিক্‌র তেমন ফলপ্রদ নয়। কেননা, এতে মন আল্লাহ্ থেকে সম্পূর্ণ গাফিল থাকে, তবে এ যিক্‌র একেবারে নিষ্ফল যায় না। কেননা, আল্লাহ্ বলেন :

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ ·

তোমরা আমার যিক্‌র কর, আমিও তোমাদের কথা স্মরণ রাখবো। (সূরা বাকারা, ২ : ১৫২)

দ্বিতীয় স্তরে মুখে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের সাথে অন্তরেও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়, তবে এত একাগ্রতা থাকে না; বরং কোন কোন সময় অন্তর আল্লাহ্‌র যিক্‌র শূন্য হয়। এরূপ যিক্‌রে ফল পাওয়া গেলেও তা পূর্ণ ও স্থায়ী হয় না।

তৃতীয় স্তরে মুখে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের সাথে অন্তরেও সমানভাবে তাঁর যিক্‌র করা হয়। এ স্তরে কখনো অন্তর যিক্‌রশূন্য হয় না, বরং অন্তরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র বদ্ধমূল হয়ে থাকে। এরূপ যিক্‌রদ্বারা যিক্‌রকারী ব্যক্তি যথেষ্ট সুফল পেয়ে থাকেন এবং তার যথেষ্ট আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়ে থাকে। এ শ্রেণীর লোকদের কাজকর্ম একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

চতুর্থ স্তরের যিক্‌রকারী একমাত্র আল্লাহ্‌কে হাযির-নাযির জেনে, তাঁর মহব্বতে নিমজ্জিত থেকে অন্তরে সব সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে থাকেন। যিক্‌রের মাধ্যমে বান্দার সাথে মহান আল্লাহ্‌র যোগসূত্র স্থাপন হয়। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

فَاذْكُرُوْنِىْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ‎.

তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাকারা, ২ : ১৫২)

হাদীসে কুদ্‌সীতে আছে, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি।[২১] আল্লাহ্‌র যিক্‌রে আত্মিক শান্তি হাসিল হয়। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ‎.

জেনে রেখ! আল্লাহ্‌র স্মরণেই আত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে। (সূরা রা'দ, ১৩ : ২৮)

আল্লাহ্‌র যিক্‌র আত্মাকে সজীব রাখে। পার্থিব স্বার্থের জন্য মানুষ সব সময় ব্যস্ত থাকে। ফলে তার কালব বা আত্মা দুর্বল ও কঠিন হয়ে পড়ে। এরূপ মৃতপ্রায় আত্মাকে সজীব করে তোলার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ্‌র যিক্‌র। আর অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার উপকরণ হলো আল্লাহ্‌র যিক্‌র।[২২]

যিকরের দ্বারা অন্তরের কালিমা দূর হয়। শয়তান মানুষকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করে এবং এর ফলে মানুষের অন্তরে কালিমা সৃষ্টি হয়। আর এ কালিমা দূর করার উপায় হলো আল্লাহ্‌র যিক্‌র। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لِكُلِّ شَيْئٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ ‎.

প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার করার উপকরণ আছে। আর অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার উপকরণ হলো, আল্লাহ্‌র যিক্‌র। (বায়হাকী)

নবী কারীম (সা) আরো বলেন : তোমরা আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতীত অধিক কথা বলবে না। কেননা, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতীত অধিক কথা বললে অন্তর কাল হয়ে যায়, আর নিশ্চয়ই কঠিন হৃদয় ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রহমত হতে অধিকতর দূরে।[২৩]

যিক্‌রের দ্বারা শয়তান বিতাড়িত হয়। যে মানুষের অন্তরে সব সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌র থাকে, শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ ۔

শয়তান আদম সন্তানের (মানুষের) অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহ্র যিক্র করে, তখন শয়তান পালিয়ে যায় এবং যখন সে আল্লাহ্র যিক্র থেকে গাফিল হয়, তখন শয়তান মানুষকে প্ররোচনা দেয়।[২৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের সার্বিক কল্যাণ তথা মুক্তির ক্ষেত্রে যিক্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এজন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বারবার যিক্রের কথা বলা হয়েছে। সব সময় যিক্র করার পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য তরিকতপন্থী হক্কানী কামিল শায়খের নিকট বায়'আত গ্রহণ করা জরুরী।

দু'আ

দু'আর আভিধানিক অর্থ ডাকা বা চাওয়া। দু'আ হলো, আদবের সাথে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহ্র কাছে চাওয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۔

তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬০)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ ۔

দু'আ ইবাদতের মগজ স্বরূপ।[২৫]

অর্থাৎ দু'আই ইবাদতের মূল। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তাক্দীরের লেখা শুধু দু'আই খণ্ডন করতে পারে। (তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৫)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন : আল্লাহ্র নিকট বান্দার দু'আ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান জিনিস আর কিছু নেই।[২৬] একাগ্রচিত্তে কাকুতি-মিনতিসহ দু'আ করলে তা কবূল হয়। মন গলিয়ে বিনয়ের সাথে দু'আ না করলে তা কবূল হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ ۔

উদাসীন ও অমনোযোগী ব্যক্তির দু'আ আল্লাহ্ কবূল করেন না।[২৭] কাজেই দু'আ করার সময় এদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ۔

যার জন্য দু'আর দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ যাকে দু'আ করার তাওফীক দান করা হয়েছে) তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে।[২৮]

দু'আ কবূলের জন্য যেমন বিশেষ বিশেষ আদব আছে, তেমন বিশেষ বিশেষ সময় ও স্থানও আছে।

দু'আ কবূলের হওয়ার আদবসমূহ

খোরাক, পোশাক এবং উপার্জন হালাল হওয়া, নিয়্যাত খালেস হওয়া, দু'আ করার আগে কোন নেককাজ করা, যেমন : নামায পড়া, যিক্‌র করা, দান-সাদাকা করা ইত্যাদি কাজ করার পর এরূপ দু'আ করা, ইয়া আল্লাহ! আমি এ কাজটি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, এর বরকতে তোমার খাস রহমতে আমার দু'আ কবূল কর। পাক-পবিত্র হয়ে দু'আ করা, কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা, দু'আর সময় নামাযের সুরতে বসা, দু'আর শুরুতে ও শেষে নবী কারীম (সা)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা, দু'আর প্রথম ও শেষে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা আদায় করা, দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করা। বিনয়ের সাথে কাকুতি-মিনতিসহ দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব দু'আ করেছেন সেসব দু'আ করা, দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য দু'আ করা, নিজের জন্য, বাপ-মায়ের জন্য, সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করা, একান্ত বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তির সাথে দু'আ করা, দু'আ শেষে দু'হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করা ইত্যাদি।[২৯]

দু'আ কবূল হওয়ার বিশেষ বিশেষ সময়

মু'মিন ব্যক্তি খাঁটি দিলে দু'আ করলে তা সব সময়ই কবূল হয়। অবশ্য এমন বিশেষ কিছু সময় আছে, যখনকার দু'আ বিশেষভাবে কবূল হয়ে থাকে। যেমন : (১) শবেকদর অর্থাৎ মাহে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে, (২) আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ যিলহজ্জ তারিখে, (৩) মাহে রমযানের দিন ও রাতে, (৪) আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, (৫) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর, (৬) নফল নামাযের সিজ্‌দার অবস্থায়, (৭) কুরআন শরীফ তিলওয়াতের পর, বিশেষত খতমে কুরআনের পর, (৮) যমযমের পানিপান করার সময়, (৯) যিক্‌রের মজলিসে দু'আ কবূল হয়, (১০) নামাযের মধ্যে ইমাম যখন সূরা ফাতিহা শেষ করেন এবং সকলে আমীন বলে, (১১) নামাযের ইকামাত বলার সময়, (১২) যখন আল্লাহ্‌র রহমতের পানি বর্ষিত হয়, (১৩) যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর নযর পড়ে ইত্যাদি।

দু'আ কবূল হওয়ার বিশেষ বিশেষ স্থান

যেসব স্থানে দু'আ কবূল হয় তার মধ্যে মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারার গুরুত্ব সমধিক। এর মধ্যে বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাওযা মুবারাকের কাছে এবং মক্কা শরীফে বিভিন্ন স্থানে দু'আ কবূল হয়। যেমন : তাওয়াফের স্থানে (মাতাফ), মুলতাজাম অর্থাৎ হাজ্‌রে আসওয়াদ ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানে, মিজাবে রহমাতের নিচে, অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্ শরীফের বৃষ্টির পানি পড়ার নালার নিচে, কা'বাঘরের অভ্যন্তরে, যমযম কুয়ার কাছে, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপরে, এই দুই পাহাড়ের মাঝে সাঈ করার সময়, মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে, আরাফার ময়দানে, মুজদালিফাতে এবং মিনাতে শয়তানকে কংকর মারার স্থানে।[৩০]

যেসব লোকের দু'আ কবূল হয়

একনিষ্ঠভাবে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করলে তা কবূল হওয়ার ব্যাপারে আশা করা যায়। তবে কতিপয় লোক এমন আছেন যাদের দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা

বিশেষ করে কবূল করে থাকেন, তারা হলেন—বিপদগ্রস্ত ও পীড়িত লোকের দু'আ, অত্যাচারিত লোকের দু'আ, সন্তানের জন্য মা-বাবার দু'আ, ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ, আল্লাহ্র ওলীগণের দু'আ, যে সন্তান মা-বাবার তাঁবেদারী ও খিদমত করে, তার দু'আ, মুসাফিরের দু'আ, রোযাদারের ইফ্তারের সময়ের দু'আ, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ এবং হাজীগণের বাড়ি ফেরার পথের দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে কবূল করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, কোন দু'আ বিফলে যায় না। খালিসভাবে কাকুতি-মিনতিসহ দু'আ করলে তা অবশ্যই কবূল হয়। তবে এর সুরত তিনটি, যথা : (১) যখন বান্দা কোন কিছুর জন্য দু'আ করে, তখন তার জন্য তা কল্যাণকর হলে আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে থাকেন: (২) কোন সময় ঐ দু'আর দ্বারা অন্য কোন বালা-মুসীবত আল্লাহ্ দূর করে দেন; (৩) আবার কখনো এর বদ্লা আখিরাতে প্রদান করা হয়।

মাসনূন দু'আসমূহ

যে কোন অবস্থায় যে কোন শব্দে এবং যে কোন ভাষায়ই আল্লাহ্র কাছে দু'আ করা যায়। তবে কুরআন ও হাদীস বর্ণিত দু'আই সর্বোত্তম দু'আ। কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত দু'আসমূহ থেকে কিছু দু'আ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

আল-কুরআনের কতিপয় দু'আ :

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ‌. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ‌. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ‌.

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন, তাদের পথ, যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন, তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। (সূরা ফাতিহা, ১ : ৫-৬-৭)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ‌.

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (সূরা বাকারা, ২ : ১২৭)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ‌.

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করুন। (সূরা বাকারা, ২ : ২০১)

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ‌.

হে আমাদের প্রতিপালক ! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের

পাপমোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন। (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৬)

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করবেন না এবং আপনার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮)

... اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্ ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে যান, যাকে ইচ্ছা আপনি পরাক্রমশালী করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৬)

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজের সীমালংঘন আপনি ক্ষমা করে দিন। আমাদের সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪৭)

رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۔ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۔ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত করলেন এবং যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদের সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন। হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে দিন এবং কিয়ামাতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯২-১৯৪)

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলমানরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২৬)

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ۔

আপনিই তো আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৫)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৩)

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۔

হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (সূরা ইউসূফ, ১২ : ১০১)

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমার প্রার্থনা কবূল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করে দিন। (সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৪০-৪১)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৪)

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি নিজে হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন। (সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ১০)

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۔

হে আমার প্রতিপালক ! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বাহা, ২০ : ২৫-২৮)

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۔

হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন। (সূরা ত্বাহা, ২০ : ১১৪)

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ۔

হে প্রভু ! আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৩)

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۔

আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আপনি পবিত্র, মহান ! আমি তো সীমালংঘকারী। (সূরা আম্বিয়া, ২১ :-৮৭)

رَبِّ لاَ تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۔

হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে একা নিঃসন্তান রাখবেন না, আপনি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৯)

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۔

হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে এমনভাবে অবতরণ করান, যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ২৯)

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না, এবং আপনার অনুগ্রহ আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায় হতে রক্ষা করুন। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৮৫-৮৬)

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۔

হে আমার প্রতিপালক ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ৯৭-৯৮)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরীত করুন; এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৫)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۔

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দান করুন, যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর এবং আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪)

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬ : ৮)

হাদীসে বর্ণিত কতিপয় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَائِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

হে আল্লাহ্ ! আপনি মাফ করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ্, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল প্রকার সীমালংঘন এবং আমার সেসব গুনাহ্ যা আপনি আমার চেয়েও বেশি জানেন। হে আল্লাহ্ ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ইচ্ছাকৃত পাপ, উপহাসমূলক পাপ এবং আমার ভুলত্রুটি। আর এই রকমের সকল পাপ যা আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ্ ! আপনি মাফ করে দিন আমার সেসব গুনাহ্ যা আমি আগে করেছি, যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি যা প্রকাশ্যে করেছি এবং ঐসব গুনাহ্ও যার সম্বন্ধে আপনি আমার চেয়েও অধিক জ্ঞাত। আপনিই যাকে ইচ্ছা আগে বাড়ান এবং যাকে ইচ্ছা পশ্চাতে ফেলেন। আর আপনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।[৩১]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ۔

হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট হিদায়াত ও তাক্ওয়া চাই এবং চাই সংযম, পবিত্রতা ও মুখাপেক্ষীহীনতা।[৩২]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ۔

হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হিদায়াত করুন, বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমাকে রিযক দান করুন।[৩৩]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ۔

হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার ভালবাসা চাই এবং ভালবাসা চাই ঐ আল্লাহ্ওয়ালাদের, যারা আপনাকে ভালবাসে। আরো ভালবাসা চাই, এমন আমলের প্রতি যা আপনার ভালবাসা পর্যন্ত আমাকে পৌঁছিয়ে দেয়। হে আল্লাহ্ ! আপনার ভালবাসাকে আমার নিকট আমার নফস, সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি হতেও অধিক প্রিয় করে দিন।[৩৪]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ ۔

হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতকারী ও উত্তম চরিত্র কামনা করি এবং কামনা করি তাক্দীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার মন-মানসিকতা।[৩৫]

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ۔

হে আল্লাহ্ ! পবিত্র করুন আমার হৃদয়কে মুনাফিকী থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে, এবং আমার চক্ষুকে খিয়ানত থেকে। আপনিই তো চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে অবগত আচেন।[৩৬]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ۔

হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুঃশ্চিন্তা, পেরেশানী, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও লোকজনের (অন্যায়) আধিপত্য থেকে।[৩৭]

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَایَ بِالْمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۔

হে আল্লাহ্ ! আমার পাপসমূহ বরফ শীতল পানিদ্বারা ধুয়ে সাফ করে দিন এবং আমার অন্তরকে পাপরাশি থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর আমার ও আমার গুনাহ্গুলোর মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন যত দূরত্ব আপনি দুনিয়ার পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।[৩৮]

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا ۔

হে আল্লাহ্ ! আমার নাফ্সকে তাক্ওয়া দান করুন এবং তাকে পরিশুদ্ধ রাখুন। আপনি তো এর শ্রেষ্ঠ পরিশুদ্ধকারী এবং আপনিই তো ওলী-অভিভাবক। হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাই ঐ ইল্ম থেকে যা কোন উপকারে আসে না, ঐ কলব থেকে যার মধ্যে আপনার ভয়ভীতি নেই, ঐ নাফ্স থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং ঐ দু'আ থেকে যা (আপনার দরবারে) কবূল হয় না।[৩৯]

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ ۔

হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকটই আত্মসমর্পণ করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার উপরই ভরসা করেছি, আপনার নিকটই আমি ফিরে এসেছি এবং আপনার সাহায্যেই আমি বিতর্ক করেছি।[৪০]

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ۔

হে চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারক ! আমি আপনার রহমতের উসিলা দিয়ে আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ۔

হে আল্লাহ্! আমাকে দীনের ব্যাপারে সঠিক পথে রাখুন, যে দীন আমার সবকিছুর রক্ষাকবচ। আমাকে দুনিয়ার ব্যাপারে সঠিক পথে রাখুন যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার আখিরাতকে কল্যাণময় করুন যা আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। আমার জীবনকে যাবতীয় কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় করে দিন এবং আমার মৃত্যুকে সকল অনিষ্ট থেকে হিফাযত করে আরামদায়ক করে দিন।[৪১]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ -

হে আল্লাহ্ ! যে কাজে আপনার দয়া এবং ক্ষমা অবধারিত, আমি আপনার নিকট তা চাই, আরো চাই আমি সকল পাপকাজ থেকে মুক্তি ও সকল প্রকার কল্যাণে সমৃদ্ধ হতে। আমি আপনার নিকট চাই জান্নাত লাভে ধন্য হতে এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত পেতে।[৪২]

اَللّٰهُمَّ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا -

হে আল্লাহ্ ! আমাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে আধিপত্য দিবেন না যে আমাদের প্রতি সদয় আচরণ করবে না।[৪৩]

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا -

হে আল্লাহ্ ! আমাদের জন্য বৃদ্ধি করে দিন, ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না, আমাদেরকে সম্মান দান করুন, অপমানিত করবেন না, আমাদেরকে নি'আমত দান করুন, বঞ্চিত করবেন না, আমাদেরকে অগ্রাধিকার দান করুন, অন্যকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দিবেন না এবং আমাদের সন্তুষ্ট করুন। আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।[৪৪]

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ -

হে আল্লাহ্ ! হারাম বস্তু থেকে আমাকে হিফাযত করে হালাল বস্তুকে আমার জন্য যথেষ্ট করে দিন। আর আপনি ব্যতীত অন্যসব কিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।[৪৫]

বিশেষ দু'আসমূহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষ সময় বিশেষ দু'আ সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ জাতীয় কিছু দ'আ নিম্নে বর্ণিত হল :

বিছানায় শয়নকালে দু'আ ;

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ -

হে আল্লাহ্ ! আপনার নামে আমি ঘুমাই এবং জাগ্রত হই।[৪৬]

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরের দু'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۔

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়ে তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যানীত হবো।[৪৭]

মাগরিব ও ফজরের পরে পড়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ ۔

হে আল্লাহ্ ! আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।[৪৮]
(এ দু'আটি সাতবার করে পাঠ করবে)।

সকাল-সন্ধ্যায় (তিনবার করে) পড়ার দু'আ :

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ۔

রব হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রতি, দীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী হিসবে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি আমি রাযী ও সন্তুষ্ট আছি।[৪৯]

সফরে যাত্রাকালে পড়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ ۔

হে আল্লাহ্ ! আমরা আমাদের এ সফরের মধ্যে আপনার নিকট কল্যাণ ও তাক্ওয়া চাই এবং চাই এমন আমল যার উপর আপনি রাযী ও সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ্ ! আমাদের এ সফরকে আপনি সহজ করে দিন এবং এর দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করে দিন। ইয়া আল্লাহ্ ! সফরে আপনিই আমাদের সাথী এবং আপনিই আমাদের স্থলাভিষিক্ত আমাদের পরিবারের জন্য। হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট সফরের দুঃখ-কষ্ট এবং ভয়ানক দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রত্যাবর্তনের পর স্বীয় মাল-আসবাব এবং পরিবার-পরিজনের মধ্যে অশুভ অবস্থা প্রত্যক্ষ করা থেকে।[৫০]

যানবাহন বা সওয়ারীতে আরোহণকালে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে পড়ার দু'আ :

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۔

পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সামর্থ্যবান ছিলাম না এগুলোকে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১৩-১৪)

পানাহারের পূর্বে পড়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ ‌.

হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমি আপনার নামেই খানা আরম্ভ করছি।[৫১]

খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলতে ভুলে গেলে খাওয়ার অবস্থায় স্মরণ হলেই পড়বে :

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ‌.

আল্লাহ্‌র নামের সাথে খানার শুরু এবং শেষ।

খানা শেষে পড়ার দু'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ‌.

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫২]

শৌচাগারে যাওয়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ‌.

হে আল্লাহ্ ! নর-নারী উভয় প্রকার দুষ্ট জিন্ থেকে আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি।[৫৩]

শৌচাগার থেকে বের হওয়ার পর পড়ার দু'আ :

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِيْ

হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র যিনি অপবিত্র বস্তু আমার থেকে দূর করে দিয়ে আমাকে শান্তি দান করেছেন।[৫৪]

উযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলে উযূ আরম্ভ করবে। তারপর পঠিতব্য দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ ‌.

হে আল্লাহ্ ! আমার গুনাহ্ মাফ করে দিন, আমার ঘরে প্রাচুর্য দান করুন এবং বরকত দিন আমার জীবনোপকরণের মধ্যে।[৫৫]

উযূর শেষে পড়ার দু'আ :

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ‌.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল : হে আল্লাহ্ ! আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।[৫৬]

মসজিদে প্রবেশকালে পড়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ·

হে আল্লাহ্ ! আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বারসমূহ খুলে দিন।[৫৭]

মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ·

হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করি।[৫৮]

রিয়া ও খ্যাতির লিপ্সা পরিহার

রিয়ার অর্থ আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ না হয়ে লোক দেখানোর জন্য নেককাজ করা। ইহা শিরকে খফীর অন্তর্ভুক্ত। ইবাদতের সময় যদি কারো মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় যে, মানুষ আমার এই ইবাদত সম্পর্কে অবগত হোক এবং আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোক, তবে বুঝতে হবে যে, তার হৃদয়ে এ মারাত্মক ব্যাধি রয়েছে। লোক দেখানোর জন্য যে ইবাদত করা হবে, সে ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবূল হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ·

অতএব যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন নেক আমল করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ১১০)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ·

আর দুর্ভোগ সেসব নামাযীর জন্য, যারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন এবং যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তা করে। (সূরা মাউন, ১০৭ : ৪-৬)

'রিয়া' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করেন যে, কিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কোন ধরনের ইবাদত করেছ ? সে বলবে, আমি আমার জীবন আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানী করে শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি কেবল এজন্য যুদ্ধ করেছিলে যে, লোকেরা তোমাকে বীরযোদ্ধা বলবে। হে ফিরিশ্তাগণ, তোমরা একে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অনুরূপভাবে এ হাদীসে আলিম ও দাতা সম্পর্কেও উল্লেখ রয়েছে।[৫৯]

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি আমার উম্মাতের জন্য যে বিষয়ে সব চাইতে অধিক ভয় করি তা হলো শিরকে আসগার (ছোট শিরক)। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ছোট শির্ক কী ? তিনি বলেন, তা হলো 'রিয়া' অর্থাৎ যে ইবাদত মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ্ এদের লক্ষ্য করে বলবেন : তোমরা যাদের দেখানোর জন্যে ইবাদত করেছিলে, তাদের কাছে গিয়ে দেখ কোন বিনিময় বা কল্যাণ পাও কিনা।[৬০]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেন : তোমরা আল্লাহ্র নিকট 'জুব্বুল হুয্ন' (দুঃখ-কষ্টের গর্ত) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! জুব্বুল হুয্ন কী ? তখন তিনি বলেন : তা হচ্ছে জাহান্নামের একটি গভীর গর্ত, যা থেকে জাহান্নামীগণ দৈনিক চারশতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি বলেন : ঐ সমস্ত ইবাদতকারী যারা লোক দেখানোর জন্য আমল করে।[৬১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ; মানুষ আমার ইবাদত করার সময় এতে অন্য কাউকে শরীক করলে আমি তা কবূল করি না, বরং তার সেসব ইবাদত ছেড়ে দেই।[৬২]

কিসে 'রিয়া' প্রকাশ পায় ? এর জবাবে বলা যায় যে, অন্যে সম্মান করবে, ধার্মিক বলে মনে করবে, তাদের অন্তরে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে, এ উদ্দেশ্যে নিজকে লোকদের সামনে পরহেযগাররূপে প্রকাশ করা ইত্যাদি রিয়ার আলামত। বিভিন্নভাবে রিয়া প্রকাশ পায় : দেহের বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গিতে রিয়া প্রকাশ পায়। যেমন : নিজেকে দুর্বল প্রকাশ করা যাতে মানুষ মনে করে যে, এ ব্যক্তি কঠোর ইবাদত ও রিয়াযত করে। মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো রাখা, যাতে লোকে মনে করে, ইবাদতে লিপ্ত ও ব্যস্ত থাকার কারণে সে মাথার চুল আঁচড়ানোর সময় পায় না।

পোশাক-পরিচ্ছদে 'রিয়া' প্রকাশ পায়। যেমন : পশমের মোটা অপরিষ্কার ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করা, যাতে লোকে মনে করে, এ ব্যক্তি দরবেশ।

কথাবার্তায় 'রিয়া' যেমন : কেউ সবসময় মুখ ও ঠোঁট নাড়তে থাকে, যাতে লোকেরা মনে করে সে আল্লাহ্র যিক্রে লিপ্ত আছে। অথচ এরা কাল্বী যিক্র করে না। কেননা অন্তরে যিক্র করলে তো মানুষ দেখবে না।

ইবাদতে 'রিয়া' যেমন : লোক দেখাবার জন্য সুন্দর করে নামায আদায় করা, যাতে লোকে আবেদ বলে। দান-সাদাকা করার সময় এমনভাবে করা, যাতে লোকে মনে করে, লোকটা খুবই দানশীল ইত্যাদি।

নিয়্যাতের তারতম্য অনুসারে 'রিয়া' বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে :

প্রথম : সাওয়াব লাভের আশা না করে কেবল লোকের প্রশংসালাভের জন্য কাজ করা। এ ধরনের রিয়া অতিশয় মারাত্মক।

দ্বিতীয় : লোকের শ্রদ্ধা প্রাপ্তির আশাই প্রবল এবং সাওয়াবের আশা খুবই কম। এরূপ লোক মানুষের সাথে থাকলে অতি আগ্রহের সাথে ইবাদত করে এবং একা থাকলে অবহেলা প্রদর্শন করে। এরূপ রিয়াও ঘৃণ্য অপরাধ।

তৃতীয় : এ শ্রেণীর লোকেরা সাওয়াবের আশায় একাকীও রোযা-নামায আদায় করে কিন্তু অন্তরে রিয়া থাকার কারণে অন্য লোক দেখলে তার ইবাদত বাড়িয়ে দেয়। এ শ্রেণীর লোকদের ইবাদত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না। তবে রিয়ার উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করবে, আল্লাহ্র কাছে তা কবূল হবে না।

কল্বে সালীম

বস্তুত কাল্ব ও দেহের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। তবে এর মধ্যে কাল্বই হচ্ছে আসল। দেহ হচ্ছে আবরণ মাত্র। দেহের হিফাযতের চেয়ে কাল্ব-এর হিফাযত আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মূলত কাল্বই হচ্ছে হিদায়াতের কেন্দ্রবিন্দু। এ কারণে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ ۔

জিব্রাঈল কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার কাল্বে। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৯৩-১৯৪)

কাল্বের গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ ۔

জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে এক টুক্রা গোশ্ত পিণ্ড আছে, যদি তা সংশোধিত হয়, তবে গোটা শরীরই সংশোধিত হয়। আর যদি তা খারাপ হয়, তবে সমস্ত শরীরই খারাপ হয়। মনে রেখো, তা হলো কাল্ব বা দিল।[৬৩]

কাল্বের রোগ-ব্যাধি : কাল্ব স্বচ্ছ আয়নার মত। মানুষ যখনই কোন গুনাহের কাজ করে, তখনই কাল্বে একটা কাল দাগ পড়ে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ۔

কখনও নয়, ওদের অন্তরে ওদের কৃতকর্মই মরিচা ধরিয়েছে। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ : ১৪)

যারা কাল্ব বা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, তারাই দুনিয়াতে ও আখিরাতে সত্যিকার সফলতা ও সৌভাগ্য লাভ করবে। মহান আল্লাহ্র বাণী :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۔

সে-ই সফলকাম হবে যে নিজকে পবিত্র করে। (সূরা শামস্, ৯১ : ৯)

আর যে ব্যক্তি তার আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করবে না, সে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۔

এবং সেই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে। (সূরা শামস্, ৯১ : ১০)

কিয়ামাতের দিন সন্তান-সন্তুতি ও ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না, তবে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে, সেই সফলকাম হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বাণী :

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۔

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোন উপকারে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্র নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে (সূরা শু'আরা, ২৬ : ৮৮-৮৯)

বস্তুত কাল্‌বে সালীম বা বিশুদ্ধ অন্তর হাসিল না হলে আখিরাতে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাই দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আত্মজ্ঞান হাসিলের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া সকলের জন্য অপরিহার্য।

মানব জীবনে ইহ্‌সানের প্রভাব

ইহ্‌সান মানব চরিত্রের অমূল্য সম্পদ। ইহ্‌সানই মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাতের মর্যাদা দান করেছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ইহ্‌সানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ইহ্‌সানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। ইহ্‌সান অবলম্বনকারী লোকদের আল্লাহ্ তা'আলা অধিক পসন্দ করেন।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

أَحْسِنُوا، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

তোমরা ইহ্‌সান কর। কেননা আল্লাহ্ ইহ্‌সানকারীদের ভালবাসেন। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইহ্‌সানকারীদের সাথে আছেন। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৯)

ইহ্‌সানের ন্যায় মহৎ গুণ ব্যতীত প্রকৃত মু'মিন হওয়া যায় না। কারণ ঈমানের বিভিন্ন আহ্‌কাম ও আমল সুন্দররূপে সম্পন্ন করার জন্য ইহ্‌সান অপরিহার্য। আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তাঁর ইবাদত করার জন্য ইহ্‌সান দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

"ইহ্‌সানকারীরূপে যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে সে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে মজবুত হাতল ধারণ করেছে।" (সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ২২)

ইহ্‌সানের মাধ্যমে মানুষের মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হয়। ইহ্‌সানই মানুষকে সৃষ্টি জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। ইহ্‌সানের বিনিময়ে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ ـ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে ? (সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ : ৬০)।

মূলকথা, ইবাদতের চূড়ান্ত পর্যায় হল ইহ্‌সান। এ পর্যায়ে পৌঁছতে হলে বহু সাধনার প্রয়োজন। বস্তুত তাসাওউফের আসল লক্ষ্যই হল ইহ্‌সানের স্তরে উন্নীত হওয়া। যারা এ সাধনায় রত থাকেন তারা একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্বাদ লাভ করতে সক্ষম হন, অপরদিকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতিও তারা থাকেন সহানুভূতিশীল।

আখ্‌লাকে হাসানা : পরিচিতি ও গুরুত্ব

'আখ্‌লাক (أخلاق) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ চরিত্র, স্বভাব, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি। মানুষের দৈনিক কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং

স্বভাবের প্রকাশ পায়, সেসবের সমষ্টি হলো 'আখ্লাক'। শরী'আতের পরিভাষায় আখ্লাক হলো, মানুষের সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে সদাচার ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা।

ইসলামে মানব চরিত্রের যেসব মহৎ গুণাবলীর কথা উল্লেখ আছে, তাকে আখ্লাকে হাসানা বা উত্তম চরিত্র বলা হয়। ইসলামী শিক্ষা তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান আদর্শভিত্তিক চরিত্রই হলো 'আখ্লাকে হাসানা'। 'আখ্লাক' শব্দের অর্থ ব্যাপক। সামাজিক জীব হিসেবে মানব চরিত্রের প্রতিটি দিকই আখ্লাকের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত আখ্লাকের ক্ষেত্র বিস্তৃত। আল্লাহ্র সৃষ্টি জীবজন্তুর সাথে আচার-ব্যবহার ও সম্পর্ক বজায় রাখাও আখ্লাকের আওতাভুক্ত।

মানব চরিত্রের সৎ এবং অসৎ গুণাবলীর প্রেক্ষাপটে 'আখ্লাক' দুই ধরনের : ১. আখ্লাকে হাসানা, ২. আখ্লাকে সায়্যিআ।

আখ্লাকে হাসানা হলো, ইসলামে যেসব মহৎ গুণাবলীর কথা উল্লেখ আছে সেগুলো মানব চরিত্রে বিদ্যমান থাকলে তাকে আখ্লাকে হাসানা বা উত্তম চরিত্র বলা হয়। তাক্ওয়া, সিদ্ক, যিক্র, সবর, শোকর, আদল, ইহ্সান, আফ্উ, খিদমতে খালক ইত্যাদি গুণ আখ্লাকে হাসানার অন্তর্ভুক্ত।

আখ্লাকে সায়্যিআ হলো, যে সব অসৎ গুণ মানুষকে হীন নীচ, ইতর শ্রেণীভুক্ত ও নিন্দনীয় করে। ফিস্ক, খিয়ানাত, গীবত, নিফাক, কিয্ব ইত্যাদি মন্দ স্বভাবগুলো আখ্লাকে সায়্যিআর অন্তর্ভুক্ত।

মানব জীবনে আখ্লাকে হাসানার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের পার্থিব জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা যেমন আখ্লাকে হাসানার উপর নির্ভরশীল, তেমনি তার পারলৌকিক সুখ-শান্তি এবং নিরাপত্তাও এর উপর নির্ভর করে। একজন সৎ স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি যেমন সমাজে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকেন, তেমনি তিনি মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছেও প্রিয় হয়ে থাকেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনাদর্শই হল আখ্লাকে হাসানার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। (সূরা কালাম, ৬৮ : ৪)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ ـ

আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।[৬৪]

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হলেন সকল মহৎ গুণের এক মহান আদর্শ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ـ

মু'মিনদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী তারাই, যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।[৬৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন :

اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا ۔

তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র বা আখ্লাক সর্বোৎকৃষ্ট।[৬৬]

অপর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কিয়ামাতের দিন মু'মিন ব্যক্তির নেকীর পাল্লায় অধিক ভারী বস্তু হবে উত্তম চরিত্র।[৬৭]

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই তার উপর অনেক গুরুদায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে। আল্লাহ্র যমীনে মানুষ তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাও আল্লাহ্ মানুষকে দিয়েছেন, যাতে সে আল্লাহ্র ইচ্ছামত তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে পারে। আর এ জন্য প্রয়োজন হলো ইসলামী আখ্লাক তথা 'আখ্লাকে হাসানা' তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। বস্তুত দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের জন্য প্রতিটি মানুষের সচ্চরিত্রবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় মানব জীবন ব্যর্থতার গ্লানিতে পরিপূর্ণ হবে।

সততা ও সত্যবাদিতা

সবসময় সত্য কথা বলা এবং কোন অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করা, প্রলোভন বা ভীতি প্রদর্শনের সামনেও সত্যের উপর অটল থাকা প্রকৃত ঈমানদারীর লক্ষণ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۔

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (সূরা তাওবা, ৯ : ১১৯)

সততা ও সত্যবাদিতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ ۔

সত্যবাদিতা পুণ্যের কাজ। আর পুণ্য জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়।

মিথ্যাবাদিতাকে সকল পাপের উৎস হিসাবে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে :

اِنَّمَا الْكِذْبُ اُمٌّ لِكُلِّ الذُّنُوْبِ ۔

বস্তুত মিথ্যা সকল পাপের জননী।

যারা মিথ্যাবাদী তাদের কেউ বিশ্বাস করে না এবং বিপদের সময় তারা কারো সাহায্য পায় না। যেমন : এক রাখালের ঘটনা, যে জঙ্গলে পশুপাল চরাবার সময় মাঝে মাঝে বাঘ, বাঘ বলে চিৎকার দিত। আশপাশের লোকজন তার সাহায্যের জন্য যখন যেত, তখন সে খিলখিল করে হাসতো এবং লোকেরা দুঃখিত মনে ফিরে যেত। কিন্তু যেদিন সত্যিই বাঘ আসলো সেদিন তার চিৎকার শুনে কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলো না; বরং লোকেরা মনে করলো, সে মিথ্যা কথাই বলছে। ফলে বাঘ তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে।

সমাজ জীবনে যারা মিথ্যাচারী, তারা সকলের নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত। সকলেই তাদের ঘৃণা করে এবং সোহবত থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে যারা সত্যবাদী, তাঁদেরকে সবাই

শ্রদ্ধা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নুবূওয়াতপূর্ব জীবনে সত্যবাদিতার জন্য তাঁর কওমের লোকদের থেকে 'আল-আমীন' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। নুবূওয়াতপ্রাপ্তির পরও তার সমাজের এই সব লোক, যারা তাঁর উপরে ঈমান আনেনি, তারাও তাদের ধন-সম্পদ তাঁর কাছে তাঁর সত্যবাদিতার কারণে আমানত রাখতো। হিজরতের সময় যা তিনি মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আলী মুরতাযা (রা)-কে দায়িত্ব দিয়ে যান এবং হযরত আলী (রা) সেসব গচ্ছিত মালামাল মালিকদেরকে ফিরিয়ে দেন। সত্যবাদী লোকদের পরিচয় আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে এভাবে দিয়েছেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ـ

বস্তুত তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৫)

বস্তুত সততা ও সত্যবাদিতা আখ্লাকে হাসানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে এ গুণের সমাহার থাকবে, সমাজের সব ধরনের লোক তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে এবং সে আখিরাতে আল্লাহ্র কাছে এর বিনিময় লাভ করবে এবং সত্যবাদিতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ধৈর্য ও সহমর্মিতা

'সবর' (صبر) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ধৈর্য, দৃঢ়তা, বিরত রাখা ইত্যাদি। বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্ট বালা-মুসীবতে অবিচল চিত্তে সব কিছু আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করে ধৈর্যধারণ করাকে 'সবর' বলে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে : ১. হারাম ও নাজায়িয বিষয়বস্তুগুলো থেকে নাফস্কে বিরত রাখা, ২. আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যে নাফ্সকে বাধ্য করা এবং ৩. যে কোন বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা। যারা ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাহায্য করেন। যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

হে মু'মিনগণ ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহ্র নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা, ২ : ১৫৩)

সবরের প্রকারভেদ

মানুষের জীবনে কখনো সুখ আসে, আবার কখনো দুঃখ আসে। প্রতিকূল সকল অবস্থায় তাকে সবর করতে হয়।

ইমাম গাযালী (র) সবর বা ধৈর্যকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন : ১. আল্লাহ্র ইবাদতে সবর, ২. আনন্দ ও খুশির সময় সবর, ৩. যুলুম ও অত্যাচারের সময় সবর, ৪. পাপ বা হারাম থেকে বিরত থাকার উপর সবর এবং ৫. বিপদ-আপদে সবর করা।

সবরের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

মানব জীবনে সবর বা ধৈর্য এমন একটা মানবিক গুণ, যার অনুশীলন ব্যতীত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য আশা করা যায় না। যদিও ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ, তথাপি এটা এমন এক মহৎ গুণ, যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণকর জীবন যাপনের জন্য সবরের গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۔

বস্তুত ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার পুরোপুরিভাবেই দেওয়া হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ১০)

ইসলামের যে পাঁচটি মূল স্তম্ভ আছে, সেগুলো পালনের জন্য সবরের প্রয়োজন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য, রোযা রাখা, যাকাত প্রদান ও হজ্জ পালন করতে হলে সবরের প্রয়োজন। শরী'আতের অন্যান্য হুকুম-আহ্কাম পালনের জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। বস্তুত ধর্মহীন জীবন-যাপন যেমন স্ফূর্তিদায়ক, ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন তেমনি কষ্টকর। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবরকে ঈমানের পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। সবরের গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَلصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ۔

ধৈর্যের বিনিময় হলো জান্নাত।

পবিত্র কুরআনে সত্তরেরও অধিক জায়গায় সবর বা ধৈর্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔

যারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৯৬)

ব্যক্তিগত জীবনেও সবরের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা উপার্জন করে। এ ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব সহজভাবে পালন করা সম্ভব হয় না; যদি না লোভ ও হুমকির মুখে ধৈর্য ও সাহসিকতার মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তা হলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০০)

ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিল ও ভালবাসা অর্জনের উপায় হচ্ছে সবর করা। যেমন আল্লাহ্র বাণী :

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ·

আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪৬)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ·

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথী। (সূরা বাকারা, ২ : ১৫৩)

সমাজ, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক জীবনেও সবরের প্রয়োজন অনেক বেশি। বর্তমান পারমাণবিক যুগে পরাশক্তিসমূহের যে কোন একজন শাসকের অধৈর্য অঙ্গুলির টিপেই বিশ্বময় পারমাণবিক অস্ত্রের বিধ্বংসী খেলা শুরু হয়ে যেতে পারে, যার ফলে মানব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধৈর্যের চর্চা এবং ধৈর্যের উপর অটল থাকার প্রয়োজনীয়তা অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশি।

শোক্র ও কৃতজ্ঞতা

'শোক্র' (شكر) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ। পরিভাষায় অনুগ্রহ লাভের কারণে হৃদয়, মুখ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রদান করাকে 'শোক্র' বলে।[৬৮]

বস্তুত শোক্র হল আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত ভোগ করার পর প্রসন্ন চিত্তে বিনয় ও নম্রতার সাথে, তাঁর নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

মানুষ পার্থিব জীবনে আল্লাহ্র নিয়ামতদ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতি মুহূর্তে মানুষ আল্লাহ্র নিয়ামত নানাভাবে ভোগ করছে। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র অদ্ভুত সৃষ্টি। চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, শ্বাস-প্রণালী, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি এক-একটা রহস্যময় সৃষ্টি। কেবল মানব দেহই নয়, বরং মহাবিশ্বে যা কিছু দেখা যায় বা দেখা যায় না, সবাই আল্লাহ্র একক সৃষ্টি এবং মানবজাতির জন্য অফুরন্ত নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শোক্র আদায় করা মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে বলেন :

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ·

তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা করলে এর সংখ্যা গুণে শেষ করতে পারবে না। আর মানুষ অবশ্যই অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৪)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য। এ চারিত্রিক গুণকে বাধ্যতামূলক করে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন :

وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ·

আর তোমরা আমার নিয়ামতের শোক্র আদায় কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাকারা, ২ : ১৫২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ·

অতএব তুমি আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৬)

সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে। শোক্র করলে আল্লাহ্ নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দিবেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ·

যদি তোমরা আমার নিয়ামতের শোক্র আদায় করো, তবে আমি তোমাদের জন্য তা আরো বাড়িয়ে দিব। আর যদি তোমরা আমার নিয়ামতকে অস্বীকার কর তবে জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আমার আযাব খুবই কঠোর। (সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৭)

শোক্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

শোক্র বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানব চরিত্রের অমূল্য সম্পদ। শোক্রের ন্যায় চারিত্রিক গুণ যেমন মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং অধিক নিয়ামত লাভের জন্য অপরিহার্য, তেমনি সামাজিক সম্প্রীতি, সংহতি ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। মানুষের জীবনে সবচাইতে বড় সাফল্য হলো আখিরাতে নাজাত পাওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শোক্র আদায় করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তাকে নাজাত দিবেন এবং পুরস্কৃত করবেন।

যেমন আল্লাহ্র বাণী :

وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ·

অচিরেই আল্লাহ্ শোক্র-আদায়কারীদেরকে প্রতিদান দিবেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪৪)

যে ব্যক্তি শোক্র আদায় করে, তার মর্যাদা অনেক বেশি, মহান আল্লাহ্ তাকে পসন্দ করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ ·

কৃতজ্ঞ আহার গ্রহণকারীর মর্যাদা ধৈর্যশীল রোযাদারের সমান।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিয়ামত লাভ করে শোক্র আদায় করে, আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তার নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ ·

যদি তোমরা শোক্র আদায় কর তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেব। (সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৭)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ·

হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র জিনিস দান করেছি। তা থেকে তোমরা আহার করো, আর আল্লাহ্র শোক্র আদায় করো, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো। (সূরা বাকারা, ২ : ১৭২)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আল্লাহ্র ইবাদতে পরিপূর্ণতা আসে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যেমন অবশ্য পালনীয় ইবাদত, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল নিয়ামতের শোক্র আদায় করাও ইবাদত।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র বাণী :

وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۔

আর তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতের শোক্র আদায় করো। যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ১১৪)

সমাজ জীবনে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় শোক্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন মানুষ কারো উপকারে সন্তুষ্ট হয়ে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি হয়। মানুষ যদি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়, তবে সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্র নিকটও কৃতজ্ঞ নয়।[৬৯]

আদ্ল-ন্যায়পরায়ণতা

'আদল' (عــدل) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ইনসাফ, সুবিচার করা, সমান করে দেওয়া ইত্যাদি। আদল হলো, কুরআন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক যাবতীয় কথা ও কাজে কম ও বেশি না করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহ্র নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী যার যা হক ও অধিকার আছে, তা আদায়ের সুষ্ঠু নীতিমালা ও সুব্যবস্থা করার নীতিই আদল, যাকে ইনসাফও বলা হয়।

আদ্লের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পার্থিব জীবনের সর্বত্র ইনসাফ প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। কেননা, আদল ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন হতে জাতীয়, আন্তর্জাতিক কোন জীবনই শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ মহৎ গুণের অধিকারী হলে মানুষ মানবিক মর্যাদাবোধ এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। ব্যক্তি জীবনে ইনসাফের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের অধিকার সংরক্ষণ করার সাথে সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমার উপর তোমার চোখের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার শরীরের অধিকার আছে। অনুরীপভাবে তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে।[৭০]

সামাজিক জীবনেও ইনসাফের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিরা পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কর্মজীবন ও পেশাগত জীবন নির্বাহ্ করে। কাজেই কারো প্রতি যাতে যুলুম

না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একমাত্র আল্লাহ্র বিধানই মানুষের সমাজ জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ۰

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৯০)

জাতীয় জীবনেও ইনসাফের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন মানুষের জাতীয় জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যিম্মাদারী শাসক শ্রেণীর হাতে থাকে। দেশের শাসন ব্যবস্থা যদি ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তবে জাতীয় জীবনে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। সুতরাং জাতীয় জীবনে শান্তি, স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۰

তোমরা সুবিচার করবে; তা তাক্ওয়ার নিকটতম। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৮)

বিচার ব্যবস্থায় ইনসাফের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ অত্যাচারিত হয়ে বিচারের দ্বারস্থ হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়বিচার করা বিচারকের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র বাণী :

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۰

তোমরা যখন মানুষের বিচার করবে, তখন তোমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৮)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۰

আর যখন তুমি বিচার করবে, তখন লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদেরে পসন্দ করেন। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪২)

ন্যায়বিচারের ব্যাপারে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, যেই ক্ষতিগ্রস্ত হোক না কেন, ন্যায়ের মানদণ্ড অবশ্যই কায়েম রাখতে হবে। এখানে কোন হেরফের করা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র কঠোর নির্দেশ রয়েছে :

وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ ۰

এবং আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। (সূরা নূর, ২৪ : ২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একবার একজন কুরাইশ বংশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়লে তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে সে মহিলার শাস্তি লাঘব করার জন্য নবী (সা)-এর কাছে সুপারিশ করা হলে তিনি (সা) বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কোন সাধারণ লোক

অন্যায় করলে, তার শাস্তি হতো, অথচ কোন মর্যাদাবান লোক অন্যায় করলে তার শাস্তি হতো না। আল্লাহ্‌র শপথ ! মুহাম্মাদ (সা)-এর কন্যা ফাতিমাও যদি এ কাজ করতো, তবুও আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।[৭১]

ক্ষমা ও উদারতা

দয়ামায়া, ক্ষমা ও উদারতা মহান আল্লাহ্‌র অন্যতম গুণ। আরবী 'আফ্উ' শব্দের অর্থ ক্ষমা করা। ইসলামী পরিভাষায় 'আফ্উ' হলো, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেওয়া। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সকল অবাধ্য গুনাহ্গার বান্দাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। তাঁর কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও বহু সংখ্যক মানুষ তাঁকে এবং তাঁর দেওয়া জীবন বিধানকে কেবল অস্বীকারই করে না; বরং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শিরকের ন্যায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। অথচ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এগুলো অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ـ

আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯৯)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ـ

অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯)

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে 'ক্ষমা'কে নবী-রাসূলগণের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ـ

অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। (সূরা আহ্কাফ, ৪৬ : ৩৫)

প্রতিটি মানুষের জন্য দয়া ও ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

আর তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৪)

দয়ামায়া ও ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতি ও নির্দেশ অনুসরণ করা আবশ্যক। মানুষ ভুল-ত্রুটিমুক্ত নয়। কোন কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া তার পক্ষে খুবই

স্বাভাবিক। কাজেই সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা করাই শ্রেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী :

وَسَارِعُوٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে ধাবমান হও যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ন্যায়। যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সম্বরণকারী আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ নেক্‌কার লোকদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৩-১৩৪)

অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করা তাক্‌ওয়া লাভের উপায় এবং ক্ষমা তাক্‌ওয়ার নিকটবর্তী গুণ। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ـ

আর মাফ করে দেওয়াই তাক্‌ওয়ার নিকটতম। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৭)

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপরাধীদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছেন :

لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ـ

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের এসব গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত।

বিনয় ও সরলতা

ইসলামে বিনয় ও সরলতা অবলম্বন হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনয়ের অর্থ হল, আল্লাহ্‌র অন্য বান্দাদের তুলনায় নিজেকে ছোট জ্ঞান করা এবং অন্যদেরকে বড় মনে করা। বিনয় আল্লাহ্‌র নিকট খুবই পসন্দনীয়। এটি মর্যাদালাভের একটি বিশেষ সোপান। বিনয় অবলম্বনকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ ـ

কেউ যদি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন।[৭২]

বস্তুত আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা হতে হলে বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে :

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ـ

রাহমানের (আল্লাহ্‌র) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩)

লেনদেনসহ সর্বপ্রকার আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বিনয় ও কোমলতা প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা নিজে বিনয় অবলম্বনকারী, তিনি বিনয়কে পসন্দ করেন এবং তিনি নম্রতা অবলম্বনকারীকে এত বেশি দান করেন যা কঠোরচিত্ত ব্যক্তিকে দান করেন না।[৭৩]

সরলতা মু'মিনের যিন্দেগীর ভূষণ। পক্ষান্তরে কুটিলতা হচ্ছে পাপীষ্ঠ হওয়ার নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ ٠

প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি সরল ও ভদ্র হয়ে থাকে। আর পাপী ব্যক্তি প্রতারক ও নীচু ধরনের হয়ে থাকে।[৭৪]

দানশীলতা ও বদান্যতা

সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বসবাস করে। কেউ ধনী আবার কেউ গরীব। ধনীদের জন্য উচিত গরীবদের সহযোগিতায় দানের হাত সম্প্রসারিত করা। সমাজের গরীব শ্রেণীর লোকদের প্রতি দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করা একটি মহৎ কাজ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ তাগিদ রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ٠

হে মু'মিনগণ ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর। (সূরা বাকারা, ২ : ২৬৭)

দানশীলতার ফযীলতের কথা উল্লেখপূর্বক কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٠

যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশত শস্যকণা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা, ২ : ২৬১)

আল্লাহ্ তা'আলা হলেন সবচেয়ে বড় দাতা। তারপর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাতা হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তাঁর দানের তুলনা হয় না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ ٠

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা।[৭৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন দানশীলতার মূর্ত প্রতীক। জীবনে কেউ তাঁর নিকট কিছু চেয়েছে এবং জবাবে তিনি না বলেছেন এমনটি কখনো হয়নি। হযরত আনাস (রা) বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ ٠

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমস্ত মানুষের তুলনায় সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও সর্বাধিক সাহসী ছিলেন।[৭৬]

দানশীলতা মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ (এর ডালপালাসমূহ দুনিয়াতে ছড়িয়ে আছে)। যে এর কোন একটি ধারণ করবে তা তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, আর কৃপণতা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। কেউ এর কোন ডাল ধারণ করলে তা তাকে জাহান্নামে পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।"[৭৭]

নিজের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

তোমরা যা ভালবাস তা ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯২)

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবূ তালহা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, 'তোমরা যা ভালবাস তা ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না।' আর আমার সর্বাধিক প্রিয় হল বায়রুহা বাগানটি। এটি আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি দান করে দিলাম। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ্র নিকট পুণ্য ও সঞ্চয় চাই। সুতরাং আল্লাহ্র নিবেদিত পথে আপনি তা ব্যয় করুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বাহ ! এতো লাভজনক সম্পদ, এতো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বললে আমি তা শুনলাম। তুমি এ সম্পদ তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। এটাই আমি ভাল মনে করছি। তখন আবূ তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! তাই করব। তারপর আবূ তালহা (রা) ঐ সম্পত্তি তাঁর চাচাত ভাইবোন ও আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।[৭৮]

হযরত আবূ দাঊদ আনসারী (রা) বলেন, আমাদেরকে সাদাকা করার হুকুম করার পর আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। আমাদের মধ্যে কেউ অক্লান্ত পরিশ্রম করে কেবল এক মুদ্দ (গম বা খেজুর) আনতে পারতো (এবং তা সাদাকা করতো)। অথচ এখন আমাদের কারো কারো এক লাখ পরিমাণ (দিরহাম) রয়েছে।[৭৯]

ইমাম গাযালী (র) বলেন, দানকারীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :

১. তাঁরা যা কিছু পান তার সবকিছুই আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ্র প্রেমের সত্যতা প্রদর্শন করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর অপূর্ব দান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঘরে যা ছিল সব কিছুই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে হাযির করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আবূ বকর ! নিজের জন্য কি রেখে এসেছ ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

২. এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের ধন আল্লাহ্র পথে দান করেন না সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের খাওয়া-পরার পর সর্বদাই দীন-দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য সচেষ্ট থাকেন। যখনই সুযোগ পান তখনই তারা অকাতরে দান করে অভাবগ্রস্তদের সহায়তা করে থাকেন। তারা

কেবল যাকাতের নির্ধারিত অংশ দান করেই ক্ষান্ত থাকেন না; বরং প্রয়োজনে সব কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে দেন, কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ٠

লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তারা ব্যয় করবে ? বলুন, যা উদ্বৃত্ত সবই (ব্যয় করবে)। (সূরা বাকারা, ২ : ২১৯)

৩. এই শ্রেণীর লোকেরা কেবল যাকাতের নির্ধারিত অংশ দান করাকেই যথেষ্ট মনে করেন। তারা যাকাত দান করতে কোনরূপ কার্পণ্য করেন না।

দানকারীর জন্য কর্তব্য হল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করা। উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করা, উত্তম মাল দান করা ও গোপনে দান করার পর তা বলে বেড়াবে না এবং গ্রহীতাকে কোনরূপ কষ্ট দিবে না।[৮০]

আমানতদারী

আমানতদারী একটি মহৎ গুণ। সব ব্যাপারে আমানতদারী রক্ষা করার জন্য ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا ٠

আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পণ করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৫)

কুরআন মজীদের দুই জায়গায় প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির পরিচয় ও গুণাবলীর কথা উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ٠

এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ৮ ও সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৩২)

আমানতদারী ঈমানের আলামত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ ٠

যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই এবং যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না, তার মধ্যে দীন নেই।[৮১]

আমানতের খিয়ানাত করা মুনাফিকীর আলামত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ٠

মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১ যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে এর বরখেলাপ করে এবং ৩. আমানত রাখলে এতে খিয়ানাত করে ।[৮২]

অঙ্গীকার রক্ষা করা

অঙ্গীকার রক্ষা করা সত্যপরায়ণতারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বৈধভাবে যার সাথেই অঙ্গীকার করা হোক না কেন, তা রক্ষা করা আবশ্যক। কুরআন ও হাদীসে অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ·

এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে; প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৪)

কুরআন মজীদে নেক আমল ও নেক বান্দাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُوْا

এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তারা পূর্ণ করে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৭৭)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অধিকাংশ ভাষণের মধ্যেই বলতেন ; "যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, দীন ইসলামে তার কোন অংশ নেই।" অধিকন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকের লক্ষণ।[৮৩]

সৃষ্টির সেবা

সৃষ্টির সেবা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত ইলম ও বক্তৃতার দ্বারা মানুষের মস্তিষ্ককে বশীভূত করা যায় কিন্তু মানুষের অন্তরকে তেমন কোন প্রভাবিত করা যায় না। মানুষের অন্তর প্রভাবিত হয় সেবা ও খিদমতের দ্বারা। এই সেবা বা খিদমত দুইভাবে করা যায় : ১. আত্মিক, ২. বৈষয়িক। বৈষয়িক সেবার তুলনায় আত্মিক সেবার বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে কুরআন ও হাদীসে আত্মিক সেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

فَوَ اللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ اَحْمَرَ النَّعَمِ ·

আল্লাহ্‌র কসম ! তোমার দাওয়াতে আল্লাহ্ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দান করেন তবে তা তোমার জন্য লালবর্ণের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়া অপেক্ষাও অনেক উত্তম।[৮৪]

বৈষয়িক খিদমতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ·

পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্‌, পরকাল, ফিরিশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থসংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা—যারা সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী। (সূরা বাকারা, ২ : ১৭৭)

মানব সেবার গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন :

سَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلاَّ الشَّهَادَةَ ٠

কওমের নেতা সফরের অবস্থায় তাদের খাদেম থাকবে। যে ব্যক্তি খিদমতের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অগ্রগামী হবে, কেউ তাকে আমলের মাধ্যমে পেছনে ফেলতে পারবে না। অবশ্য শহীদ ব্যক্তি পারবে।[৮৫]

জনসেবা এবং খিদমতের মূর্তপ্রতীক ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)। সেবার এ গুণটি তাঁর মধ্যে নুবূওয়াতপ্রাপ্তির আগেও বিদ্যমান ছিল। প্রথম ওহীপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং এ ঘটনা হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি নিম্নোক্ত বাণীদ্বারা নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দিলেন :

كَلاَّ وَاللّٰهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ ٠

আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়ের প্রতি সদাচরণ করেন, অসহায় ব্যক্তির বোঝা বহন করেন, নিঃস্ব-ব্যক্তির অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করে দেন; মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহায়তা দান করেন।[৮৬]

মূলকথা হল, ইসলাম মানুষের সেবা ও খিদমতের জন্য, সমাজের উপকারের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। যাতে সমাজ থেকে অশান্তি ও অবজ্ঞা দূর হয়ে নেমে আসে সমাজ জীবনে শান্তির ফল্গুধারা। ইসলাম শুধু মানুষের সেবার প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে না; বরং আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির প্রতি সেবাদানের ব্যাপারেও অনুপ্রাণিত করে।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلرَّحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ ٠

যারা অন্যের প্রতি দয়া করে, রহমান—অতি দয়াবান প্রভু তাদের প্রতি দয়া করেন। সুতরাং পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তোমরা রহম কর। তাহলে আকাশের অধিষ্ঠিত প্রভুও তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।[৮৭]

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهِ ٠

সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবারভুক্ত। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পরিবারভুক্তদের প্রতি সদাচার করে। (মিশকাত)

—৯২

বীরত্ব ও সাহসিকতা

এ জগতে মানুষকে নানা রকম বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে চলতে হয়। তার উপর কখনো অর্পিত হয় অসুস্থতা, কখনো অভাব-অনটন, কখনো শত্রু-দুশমনের যুলুম ও অত্যাচার, আবার কখনো তাকে চলতে হয় প্রতিকূল পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে। এসব ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হল, সাহসিকতার সাথে নিজ কর্মে অবিচল থাকা। সাহসিকতা ও বীরত্ব ছাড়া এ পৃথিবীতে দীন, ঈমান এমন কি নিজ সত্তা নিয়ে টিকে থাকাও সম্ভব নয়। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে এ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মাতকে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং নিজেও তা অবলম্বন করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْجَعَ النَّاسِ ۔

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী ব্যক্তি ছিলেন।[৮৮]

হুনায়নের যুদ্ধের দিন স্বল্পসংখ্যক সাহাবী ব্যতীত সকলেই যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ স্থানে অবিচল থেকে ঘোষণা করছিলেন :

اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ اَنَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ۔

আমি আল্লাহ্র নবী এতে কোন মিথ্যা নেই এবং আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।[৮৯] তাঁর বীরত্বসুলভ নেতৃত্বের ফলে সাহাবীগণ পুনরায় সমবেত হন এবং বিজয় লাভ করেন।

একবার মদীনা আক্রমণের সংবাদে আতংক ছড়িয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে মদীনার চারপাশ ঘুরে এসে সাহাবায়ে কিরামকে আতংকমুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর তেইশ বছরের নুবূওয়াতী জিন্দেগীতে সাহাবায়ে কিরামকে বীরত্ব ও সাহসিকতার উপরই গড়ে তুলেছিলেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, মূতা ইত্যাদি যুদ্ধে এর উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে কাপুরুষতা দীন-ঈমান-এর জন্য ক্ষতিকর। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাপুরুষতা থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চেয়েছেন এবং উম্মাতকেও পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আত্মসংযম ও আত্মমর্যাদাবোধ

মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি জাতীয় যত মন্দ স্বভাব আছে, এগুলোকে অবদমিত করা এবং এর জন্য সাধনা করা আবশ্যক। এই কঠিন পথে চলা যাতে সহজ হয় এবং যাতে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়, এর জন্যই কোন শায়খে কামিলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা হয়। তবে শায়খের আনুগত্য করতে গিয়ে শরী'আত বিরোধী কোন পন্থা বা তরীকা অবলম্বন করা আদৌ সমীচীন হবে না।

অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা

আখলাকে হাসানার মধ্যে 'অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা' বিষয়টি হচ্ছে অন্যতম। দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা করা হারাম। সাধারণ অবস্থায় অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

ظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا ۔

মু'মিনদের প্রতি তোমরা ভাল ধারণা পোষণ করবে।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ۔

তোমরা কু-ধারণা পোষণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কেননা কু-ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা।[৯১]

সুধারণা পোষণ করা প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۔

এই কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, এতো স্পষ্ট অপবাদ। (সূরা নূর, ২৪ : ১২)

লজ্জাশীলতা

লজ্জা ও সম্ভ্রম মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ যারদ্বারা বহুবিধ নৈতিক গুণাবলীর বিস্তৃতি ঘটে। স্বচ্ছতা ও নির্মলতার বিকাশ সাধিত হয় এবং সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ ۔

লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।[৯২]

শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও-এ গুণে গুণান্বিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا ۔

তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর দরবারে মুনাজাতে উভয় হাত উত্তোলন করে, তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[৯৩]

লজ্জা এমন একটি গুণ যার ফলে সর্বদা কল্যাণ লাভ করা যায়। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন :

بِالْحَيَاءِ لَا يَاْتِيْ اِلَّا بِخَيْرٍ ۔

লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই বয়ে আনে।[৯৪]

লজ্জা মানুষকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। লজ্জাহীন মানুষ নির্বিঘ্নে ভাল-মন্দ সকল কাজ করতে পারে। কোন কিছুই তাকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِذَا لَمْ يَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ۔

লজ্জা-শরম না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে।[৯৫]

হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী কারীম (সা) এক আনসারী সাহাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার ভাই তাকে বেশি লজ্জাশীল না হওয়ার জন্য ওয়ায

করছিল (কেননা তা জীবিকা ও ইল্‌মের জন্য ক্ষতিকর)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাকে এভাবে থাকতে দাও। যেহেতু লজ্জাশীলতা ঈমানেরই একটি অঙ্গ।[৯৬]

তবে এ জাতীয় কাজের ক্ষেত্রে লজ্জা করা উচিত নয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ ۔

এবং আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে সংকোচবোধ করেন না। (সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ : ৫৩)

আখ্‌লাকে সায়্যিআ (মন্দ স্বভাব) : পরিচিতি ও অপকারিতা

মানুষের মধ্যে এমন কিছু স্বভাব-চরিত্র রয়েছে যা নিকৃষ্ট ও অপসন্দনীয়। এ জাতীয় স্বভাব-চরিত্রকে 'আখ্‌লাকে সায়্যিআ' বলা হয়। আখ্‌লাকে সায়্যিআ যেমন মিথ্যা, গাফলতী, মূর্খতা, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা, কৃপণতা, গীবত, প্রতারণা, হিংসা, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, পদ ও সম্পদের মোহ, ওয়াদাভঙ্গ করা ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেভাবে সৎচরিত্রের বহু ফযীলত ও উপকারের কথা বলেছেন তদ্রূপ তিনি মন্দ চরিত্র ও নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বিষয়েও লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ ۔

দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না।[৯৭]

বস্তুত চরিত্র সংশোধন ব্যতীত আত্মার সংশোধন সম্ভব নয়। এসব চারিত্রিক দুর্বলতার যতগুলো দিক রয়েছে, সবগুলোর সংশোধন অত্যাবশ্যক।

মন্দ স্বভাবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফিল থাকা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ، قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۔

যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামাতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন ? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। তিনি বলবেন, এরূপ আমার নির্দশনাবলী তোমার নিকটে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং যেভাবে আজ তুমি বিস্মৃত হলে। (সূরা ত্বাহা, ২০ : ১২৪-১২৬)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۔

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান। তারপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ·

যে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না, এদের দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃতের ন্যায়।[৯৮]

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ ·

শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে লেগে থাকে। যখন বান্দা আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, তখন শয়তান পিছিয়ে যায় এবং যখন সে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে, তখন শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয়।[৯৯]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন :

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ ·

প্রত্যেক জিনিসেরই পরিচ্ছন্ন করার উপায় রয়েছে, আর অন্তর পরিষ্কার করার উপায় হল আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা।[১০০]

অহংকার ও আত্মম্ভরিতা

আত্মার ব্যাধিসমূহের মধ্যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হচ্ছে গুরুতর একটি ব্যাধি। অহংকার মানে হচ্ছে নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় জ্ঞান করা এবং অন্যকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করা। দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেছে শয়তান। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ·

আমি তার (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে অগ্নিদ্বারা সৃষ্টি করেছো এবং তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছো। (সূরা আ'রাফ ৭ : ১২)

তার এ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির পর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন :

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ·

তুমি এই স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৩)

অহংকারের কুফল অনেক বেশি। অহংকারী ব্যক্তি যেহেতু নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে, এ কারণে সে সাধারণ মানুষের সাথে উঠা-বসা, পানাহার ও কথাবার্তা বলাকে নিজের মর্যাদার খেলাপ মনে করে। যখন সে মানুষের সাথে মিলিত হয় তখন কামনা করে যে, মানুষ তাকে সম্মান করুক। ঐ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ·

আল্লাহ্ কোন উদ্ধত-অহংকারীকে পসন্দ করেন না। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৮)

হাদীসে কুদ্সীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ ـ

বড়ত্ব আমার চাদর এবং মহানত্ব আমার ইযার। কেউ যদি এ দু'টির কোন একটির ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।[১০১]

অহংকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ـ

যার অন্তরে এক যাররা (অণু) পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না।[১০২]

অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণসমূহ অনেক। তবে সাধারণভাবে মানুষ বংশ-কুল, রূপ-সৌন্দর্য, মাল-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ্য, বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারীর আধিক্যের কারণে অহংকার করে থাকে। ইসলাম এগুলোর অপকারিতা ও অকল্যাণের কথা তুলে ধরে এ কথা প্রমাণ করছে যে, এসবের কোনটি অহংকার ও গর্বের হতে পারে না। কাজেই অহংকার ও আত্মম্ভারিতা বর্জন করে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

মিথ্যাচার

কথাবার্তা ও কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা গুরুতর অপরাধ। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ

সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩০)

আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য বর্জন করা অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ـ

এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭২)

এমনকি শিশুদের মন ভুলানোর জন্য অসত্য কথা বলাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। অল্পবয়সী এক সাহাবী বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের ঘরে ছিলেন। মা আমাকে ডেকে বললেন, এসো, তোমাকে কিছু দিব। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি তাকে কিছু দিতে চেয়েছ? মা বললেন, তাকে খেজুর দিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি তাকে এ সময় কিছু না দিতে, তাহলে এই মিথ্যাটিও তোমার আমলনামায় লেখা হত।[১০৩]

মিথ্যা মানুষকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

وَاِيَّكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا ·

তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, মিথ্যা পাপাচার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। ব্যক্তি যখন অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে, তখন আল্লাহ্র নিকট তাকে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।[১০৪]

মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকীর নিদর্শনও বটে। হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : মুনাফিকের আলামত ৩টি—এর মধ্যে একটি হল, যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে।[১০৫]

অঙ্গীকার ভঙ্গ করাও এক প্রকারের মিথ্যা। মু'মিনের জন্য উচিত অঙ্গীকার রক্ষা করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে মুনাফিকীর নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। কোন কথা শোনার পর তা যাচাই না করে বলতে থাকা মানুষকে এক পর্যায়ে মিথ্যা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ·

কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়া জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে বেড়ায়।[১০৬]

সম্মান ও সম্পদের মোহ

ওলীগণের মতে সম্মান ও সম্পদের মোহ (হুব্বে জাহা ও হুব্বে মাল) হচ্ছে সমস্ত অনিষ্টের মূল। বস্তুত সম্মানের মোহ-এর মর্ম হল, জনগণের মনের উপর আধিপত্য বিস্তারের কামনা করা বা এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা যে, সকলের মন যেন আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সকলে যেন আমার প্রশংসা করে। মান-সম্মানের লিপ্সা ব্যক্তির দীন-দুনিয়া উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلاَ فِيْ غَنَمٍ فَاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِه ·

ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে যে রকম ক্ষতির আশংকা থাকে, সম্মান লিপ্সা ও সম্পদের মোহ মানুষের দীনের জন্য তার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর।[১০৭]

বস্তুত সম্মানের অতিমোহ নিতান্তই ক্ষতিকর। এর কারণে মানবতার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষসহ নানা প্রকার রোগব্যাধি সৃষ্টি হয়। এতে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এমনকি পর্যায়ক্রমে তা খুন-খারাবির কারণ হয়ে যায়। সম্পদের লোভ-লালসাও আখলাকে সায়্যিআর মধ্যে একটি গুরুতর বিষয়। বিশেষভাবে লোভ-লালসার সাথে যদি কৃপণতার ছোঁয়াচও থাকে। তাহলে তা হবে অধিকতর নিকৃষ্ট বিষয়। বস্তুত কারো লোভী হওয়ার মানে এই নয় যে, সে তার ধন-সম্পদ খরচ করে না; বরং এর মানে হল, সে অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং অবৈধ উপায়ে তা হস্তগত করার চেষ্টা করে। ইসলাম এরূপ লোভকে

নিষিদ্ধ করেছে। এর দু'টি ক্ষতিকর দিক রয়েছে : ১. একটি হচ্ছে কৃপণতা, ২. আর অপরটি হচ্ছে হিংসা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۔

যারদ্বারা আল্লাহ্ পাক তোমাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো না। (সূরা নিসা, ৪ : ৩২)

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এবং খুন-খারাবিসহ অধিকাংশ বিপর্যয়ের পেছনে লোভ-লালসার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এই জিনিসই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে এবং পরস্পরকে রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উস্কিয়ে দিয়েছে। আর এই লোভ-লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।[১০৮]

এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোভ-লালসাকে সর্বদা দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণার উপকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : "ঈমান এবং লোভ এক অন্তরে একত্রিত হতে পারে না।" এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা, ঈমানের পরিণাম হচ্ছে ধৈর্য, তাওয়াক্কুল এবং অল্পে তুষ্ট থাকা ইত্যাদি। আর লোভ-লালসার পরিণাম হচ্ছে অশান্তি, ধৈর্যহীনতা এবং অস্বস্তিবোধ।[১০৯]

তিনি আরো বলেন : মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হয় কিন্তু দু'টি জিনিস তার মধ্যে যৌবনপ্রাপ্ত (প্রবল) হতে থাকে : ১. দুনিয়ার মহব্বত, ২. অধিক আকাঙ্ক্ষা।[১১০]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

أَوَّلُ صَلَاحِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ ۔

এই উম্মাতের প্রথম সফলতা এসেছে ইয়াকীন ও যুহ্দ (নিরাসক্ত হওয়া)-এর মধ্য দিয়ে। আর তাদের প্রথম ধ্বংস আসছে কৃপণতা ও লোভের মধ্যে দিয়ে।[১১১]

দুনিয়ার মহব্বত

দুনিয়া কেবল সম্পদ ও সম্মানের প্রতি অনুরাগকেই বলা হয় না। বরং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের জীবনের যত অবস্থা আছে, সবই দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ার মায়াই সমস্ত কর্মের মূল। দুনিয়ার কাজ-কারবার, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, ধন-সম্পদ ইত্যাদি যে কোন বস্তুর সাথে অন্তরাত্মাকে আবদ্ধ করার নামই হচ্ছে হুব্বে দুনিয়া বা দুনিয়ার মহব্বত।

বস্তুত দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের সম্বল সংগ্রহ করার জায়গা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : اَلدُّنْيَاءُ مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ —দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।[১১২]

দুনিয়া মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার স্থান। এটা মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়; বরং মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল আখিরাত। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে এমনভাবে আত্মহারা হয়ে যায় যে, সে কোথা থেকে এসেছে এবং তার গন্তব্যস্থল কোথায় ? এ ব্যাপারে সে উদাসীন থাকে। এইভাবে যারা পার্থিব বিষয়াদিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۔

তোমরা জেনে রেখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্বপ্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। এর উপমা বৃষ্টি, যারদ্বারা উৎপন্ন শস্য ভাণ্ডার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۔

এবং আখিরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৪)

আখিরাত বিস্মৃত ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত লোকদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ ۔

সাবধান ! দুনিয়া অভিশপ্ত তবে আল্লাহ্‌র যিকর তাঁর প্রিয় আমল, আলিম এবং মুতা'আল্লিম (জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী) ব্যতীত পৃথিবীতে যত কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।[১১৩]

দুনিয়া ও আখিরাত পরস্পর সতীনের মত। একটিকে মহব্বত করলে অপরটি স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ۔

যে ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করল সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে মহব্বত করল সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। সুতরাং তোমরা অস্থায়ী বস্তুত উপর চিরস্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দিবে।[১১৪]

তিনি আরো বলেছেন : দুনিয়া পেছনের দিক চলে যাচ্ছে। আর আখিরাত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এ দু'টির প্রত্যেকটির রয়েছে আসক্তবৃন্দ। সুতরাং তোমরা আখিরাতের আসক্ত হয়ে থকো; দুনিয়ার আসক্ত হয়ো না। কারণ এখন আমলের সময়, কিন্তু হিসাব নেই। আর আগামীকাল হবে হিসাবের, সেখানে আমল করার সুযোগ নেই।[১১৫]

দুনিয়া লিপ্সার অকল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে নবী (সা) বলেন :

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ ۔

দীনার ও দিরহামের গোলামবৃন্দ ধ্বংস হোক। তাদেরকে এসব কিছু দেওয়া হলে তারা সন্তুষ্ট থাকে। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।[১১৬]

কৃপণতা

কৃপণতা একটি মন্দ স্বভাব। খিয়ানাত, বিশ্বাসঘাতকতা, নির্দয়তা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব থেকে এর সৃষ্টি হয়। ইসলাম কৃপণতার মূলোৎপাটনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ কারণেই ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অভাবগ্রস্তকে সাহায্যদান, ইয়াতীমদের লালন-পালন ও ঋণগ্রস্তদেরকে সাহায্যদান মুসলমানদের কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নুবূওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে এ সকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন বলে হযরত খাদীজা (রা)-এর উক্তি থেকে প্রকাশ পায়। তিনি বলেন—আপনি আত্মীয়ের প্রতি সদাচার করেন, অসহায় ব্যক্তির বোঝা বহন করেন, নিঃস্ব ব্যক্তির জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহায়তা দান করেন।[১১৭]

কৃপণতা মানুষের জন্য কখনো কল্যাণকর নয়; বরং তা অনিষ্টই বয়ে আনে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের ইরশাদ হয়েছে :

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ٠

এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে—বরং এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে বিষয়ে তারা কৃপণতা করবে, কিয়ামাতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮০)

কৃপণতা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ইরশাদ হয়েছে :

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ٠

তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নামে)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং আমরা অভাবগ্রস্তদের আহার্য দান করতাম না। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৫ : ৪২-৪৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ ٠

কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে থাকে কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী থাকবে।[১১৮]

কৃপণের পরিণাম সম্পর্কে নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন :

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَّانٌ ٠

প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি নিজ অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১১৯]

তিনি আরো বলেন : 'কৃপণতা ও মন্দ স্বভাব মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।'[১২০]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন : 'তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা এ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদেরকে উসকিয়ে দিয়েছে যেন তারা রক্তপাত ঘটায় এবং হারামকে হালাল জানে।'[১২১]

অপব্যয় ও অপচয়

ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা যেমনিভাবে দূষণীয়, অনুরূপভাবে অপব্যয় এবং অপচয়ও দূষণীয়। 'ইসরাফ' অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরী'আতের পরিভাষায়, বৈধকাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাকে 'ইসরাফ' বা অপচয় বলে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ٠

এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৭)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ٠

এবং আহার করবে ও পান করবে। কিন্তু অপব্যয় করবে না। তিনি অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)

আর অবৈধ কাজে ব্যয় করাকে 'তাবযীর' বা অপব্যয় বলে। ইসলামে এটিও নিষিদ্ধ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ٠

আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬-২৭)

আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা হতে হলে ও অপচয় পরিহার করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ مَعِيْشَتِهِ ٠

ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

অপর একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ ٠

যে ব্যক্তি ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে, সে কখনো ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয় না।[১২২]

ক্রোধ ও রাগ

ক্রোধ ও রাগের বলগাহীন ব্যবহার বহু অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক নির্দয় ও অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ড মানুষ ক্রোধ ও রাগের কারণে করে ফেলে। কিন্তু পরবর্তীতে এর কারণে অনেক ক্ষেত্রে লজ্জিত ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হতে হয়। তাই মুসলমানের জন্য উচিত ক্রোধের সময় নিজেকে সম্বরণ করা এবং অকারণে রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ না করা। আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকী লোকদের প্রশংসা করে বলেন :

وَاِذَا مَا غَضِبُوْاهُمْ يَغْفِرُوْنَ ٠

এবং যখন তারা ক্রোধান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সূরা শূরা, ৪২ : ৩৭)

স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া তো সহজ ব্যাপার। কিন্তু রাগের সময় ক্ষমা করা তেমন সহজ বিষয় নয়। তারপরও একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল এ অবস্থায়ও নিজেকে সম্বরণ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ٠

ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করে; বরং সেই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে সম্বরণ করতে পারে।[১২৩]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অসিয়্যাত করুন। তিনি বললেন, রাগ করবে না। লোকটি বারবার তার কথাটি বলতে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও একই জবাব দিলেন এবং বললেন, রাগ করবে না।[১২৪]

তিনি আরো বললেন : গোস্বা শয়তানের তরফ থেকে আসে। শয়তান আগুনের তৈরি। আর আগুনকে পানি ঠাণ্ডা করে। যদি কারো গোস্বা হয় তবে তার উচিত উযূ করে নেওয়া।[১২৫]

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : যদি দাঁড়ানো অবস্থায় কারো গোস্বা হয় তবে সে যেন বসে যায়। এতেও যদি তা প্রশমিত না হয় তবে সে যেন শুয়ে পড়ে।[১২৬] অকারণে রাগ করাতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন : "গোস্বা মানুষের ঈমানকে নষ্ট করে দেয় যেমনিভাবে তিক্ত ফল মধুকে নষ্ট করে দেয়।"[১২৭]

হিংসা-বিদ্বেষ

আখ্লাকে সায়্যিআর মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের বিষয়টি মারাত্মক ক্ষতিকর। অন্যের সুখ-সম্পদ নষ্ট হয়ে নিজে এর মালিক হওয়ার কামনা করাকে হিংসা (হাসাদ) বলা হয়। অপরের প্রতি হিংসা করা হারাম। হিংসার বহু কারণ রয়েছে। যেমন : শত্রুতা, অহংকার, নিজের অসদুদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, নেতৃত্বের লোভ, কাঙ্ক্ষিত অনুগত লোকদের অধিক যোগ্য হয়ে যাওয়া এবং কোন সুযোগ-সুবিধা হাসিল হওয়া, ব্যক্তি বা খান্দানী-নীচুতা বা কার্পণ্য ইত্যাদি। এসব কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে থাকে। ইসলামী শরী'আতে এগুলো সবই নিষিদ্ধ।

হিংসার অনিষ্টকারিতার কথা উল্লেখ পূর্বক রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ۔

তোমরা হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কেননা হিংসা নেক আমলকে খেয়ে ফেলে যেমনিভাবে আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়।[১২৮]

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ۔

তোমরা অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা এরূপ ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা। আর কারো দোষ-অনুসন্ধান করো না, কারো গোপণীয় বিষয় তালাশ করো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিবে না, আর পরস্পর হিংসা করবে না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করবে না, বরং সবাই আল্লাহ্র বান্দা, ভাই ভাই হয়ে থাকবে।[১২৯]

আল্লাহ্ তা'আলা হিংসা থেকে পানাহ্ চাওয়ার জন্য কুরআন মাজীদে শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۔

এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে (পানাহ্ চাই), যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক, ১১৩ : ৫)

অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার বিষয়টিও আখ্লাকী বদ-অভ্যাসের মধ্যে শামিল। কোন কারণে কারো প্রতি দুশমনীর ভাব দীর্ঘ সময় ধরে রাখার নাম বিদ্বেষ। অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম। হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "প্রতি জুমু'আর (সপ্তাহের) সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ পেশ করা হয় এবং সমস্ত মু'মিন বান্দাদের গুনাহ্-খাতা ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু যাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও দুশমনী আছে, তাদেরকে ক্ষমা করা হয় না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও, যেন তারা ফিরে আসে, অর্থাৎ মিলে যায়।"[১৩০]

তিনি আরো বলেন : "তিন ব্যক্তির গুনাহ্ মাফ হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি।"[১৩১]

খোদপসন্দী ও আত্মগৌরব

খোদপসন্দী অর্থাৎ নিজেকে নিজে ভাল মনে করা এটাও অহংকারেরই একটি শাখা। তবে অহংকার ও খোদপসন্দীয় মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে এই যে, অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করাকে অহংকার বলে। আর অন্যের দিকে লক্ষ্য না করে কেবল নিজেকে মহতি গুণের মালিক বলে ধারণা করা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণাবলীকে নিজস্ব সম্পদ মনে করত তা হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ ভয় না করাকে খোদপসন্দী বা আত্মগৌরব বলে। তাসাওউফের

ভাষায় একে 'উজ্ব' বলা হয়। খোদপসন্দীর ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَلاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۔

অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করবে না, কে মুত্তাকী এ সম্পর্কে তিনিই সম্যক জানেন। (সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ৩২)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

وَمَا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ اَشَدُّ هُنَّ ۔

প্রবৃত্তির অনুগামী হওয়া, কৃপণতার অনুগত হওয়া এবং আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হওয়া, এগুলো হচ্ছে ধ্বংসাত্মক বদ্ অভ্যাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে এসবের মধ্যে শেষোক্তটি হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য।[১৩২]

নিজেকে পসন্দ করা, নিজের রায়কে বিজ্ঞতম মনে করা এবং অন্যের মতামতের প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান না করাতে বিভিন্ন ধরনের অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ ধরনের মন-মানসিকতার কারণেই পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। কাজেই নিজের কাজ ও রায়কে নির্ভুল না ভেবে অন্যের রায়ের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কিতাবে আছে اِتَّهِمُوْا رَاْيَكُمْ 'তোমরা তোমাদের নিজেদের রায়কে সন্দেহযুক্ত মনে করবে।' এই নীতির অনুসরণ ব্যতীত সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

অশ্লীল কথাবার্তা

অশ্লীল কথাবার্তাও আখ্লাকে সায়্যিআর অন্তর্ভুক্ত। কাম-প্রবৃত্তি তাড়িত হয়েও মানুষ অশ্লীল কথা বলে। আবার ক্রোধের বশীভূত হয়েও লোকেরা এ ধরনের কথাবার্তা বলে থাকে। কোন অবস্থাতেই অশ্লীল কথাবার্তা ও গালিগালাজ করা জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ قِتَالُهُ كُفْرٌ ۔

কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফিস্ক এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।[১৩৩]

তিনি আরো বলেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلاَ بِاللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيُّ ۔

প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি কারো প্রতি ভর্ৎসনা ও লা'নত করে না এবং সে কোন অশালীন এবং অশ্লীল কথাও বলে না।[১৩৪]

হযরত আনাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) গালিগালাজকারী, অশালীনভাষী এবং অভিসম্পাতকারী ছিলেন না। আমাদের কারো উপর তিনি নারাজ হলে কেবল একটুকু বলতেন যে, তার কি হল! তার কপাল ধূলিময় হোক।"[১৩৫]

তিনি আরো বলেন, তুমি রূঢ়-ব্যবহার এবং অশালীন আচরণ বা কথা বর্জন করবে।[১৩৬]

ইসলামী শরী'আতে গালিগালাজ, অশালীন ও অশ্লীল কথাবার্তা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল, গালিগালাজের সময় সীমালংঘন হয়ে যায়। একজনে যদি কারো বাপকে গালি দেয় তবে অপরজন তার বাবা-মা সহ সকলকে গালি দেয়। এভাবে সীমালংঘন হয়ে পরে মারামারির উপক্রম হয়ে যায়। অশালীন ও অশ্লীল কথা বলতে যারা অভ্যস্ত, লোকেরা তাদেরকে ঘৃণা করে। কেউ তাদের সাথে মেলামেশা করতে চায় না। গালমন্দ করা অভদ্রতা ও সভ্যতার পরিপন্থী কাজ। অধিকন্তু এতে অন্য মানুষের কষ্ট হয়। কোন মুসলমানকে এমনকি কোন মানুষকে কষ্ট দেওয়াও নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

প্রকৃত মুসলমান সেই, যার কথা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।[১৩৭]

অপর এক বর্ণনায় "অন্য মুসলমান" এর স্থানে "অন্য মানুষ" বর্ণিত হয়েছে। কাজেই অশালীন ও অশ্লীল কথাবার্তা বলে কাউকে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অনুচিত।

ধোঁকা ও প্রতারণা

লেনদেন ও বেচাকেনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতারণা করা; পণ্যদ্রব্যের পরিচয় দান কিংবা বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল প্রচারণা করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন খাদ্যবস্তুর স্তূপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় এর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এর অভ্যন্তরে সিক্ত পেলেন। তখন তিনি বললেন : হে খাদ্যের মালিক! এটি কি ? জবাবে সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! বৃষ্টির কারণে এরূপ হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন :

اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ .

তুমি ভিজা খাদ্যশস্য উপরে রাখলে না কেন ? তাহলে তো ক্রেতাগণ এর অবস্থা দেখতে পেত (প্রতারিত হত না)। যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না।[১৩৮]

ধোঁকা ও প্রতারণা হীন মানসিকতার পরিচায়ক। এর মাধ্যমে অপরকে ঠকানো হয় এবং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, ইত্যাকার কারণে ইসলামী শরী'আতে ধোঁকা ও প্রতারণা হারাম।

খোশামোদ, তোষামোদ ও অতিশয় প্রশংসা

খোশামোদ. তোষামোদ এবং কারো প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করা নীচুতা ও লজ্জাহীনতার আলামত। সাথে সাথে মিথ্যার একটি প্রচ্ছন্ন রূপও এতে লুকায়িত থাকে। যারা এভাবে অন্যের খোশামোদ করে এবং অবাস্তবভাবে অপরের প্রশংসা করে, তারা একই সাথে তিন ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকে : ১. খোশামোদকারী লোকেরা নিজের মতলব হাসিলের জন্য এমন সব প্রশংসা করে যা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটা নির্লজ্জ মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, ২. প্রশংসাকারী ব্যক্তি নিজের মুখদ্বারা এমন প্রশংসাসূচক বাক্যাবলী উচ্চারণ করে যার প্রতি সে নিজেও বিশ্বাসী নয়। এ ধরনের কথা মুনাফিকী বৈ কি ? ৩. এভাবে প্রশংসা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করে। এতে তার নীচুতা, নির্লজ্জতা ও হঠকারিতা প্রকাশ পায়।

এ ধরনের প্রশংসা করার কারণে প্রশংসিত ব্যক্তির দুই ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে : প্রথমত, সে অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, দ্বিতীয়ত, সে এই মিথ্যা প্রশংসা শ্রবণ করে নিজের সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে এবং অন্যান্য লোকদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নযরে দেখতে থাকে। আর সর্বক্ষণ সমস্ত মানুষের পক্ষ হতে এ জাতীয় প্রশংসা বাণী শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। পরিণামে তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে, কৃতকর্মের উপর প্রশংসিত হওয়ার কামনা করার পাশাপাশি অকৃতকর্মের উপরও প্রশংসিত হতে চায়। এ ধরনের নির্লজ্জ কামনাকারী লোকদের পরিণাম সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কার্যের জন্যও প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে—এরূপ তুমি কখনো মনে করবে না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৮)

মতলব হাসিলের জন্য অবাস্তব ও মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা অন্যায়। এহেন প্রশংসা যা উক্ত ব্যক্তির নিজের জন্যও ক্ষতিকর। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, একদা নবী কারীম (সা) একজনকে আরেকজনের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করতে শুনে বললেন : তোমরা তো লোকটিকে মেরে ফেললে অথবা বললেন, লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে।[১৩৯] যদি কারো প্রশংসা করতেই হয় বলবে, তার সম্পর্কে আমার ধারণা এরূপ।[১৪০]

মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা হলে প্রশংসিত ব্যক্তি অহংকারী হয়ে যাবে, তার জীবনের গতি থেমে যাবে এবং তার নিজের দোষ আর তখন তার নযরে পড়বে না। এ কারণে মুখের উপর প্রশংসাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ .

তোমরা যদি কাউকে মাত্রাভিত্তিক প্রশংসা করতে দেখ তাহলে তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারবে।[১৪১]

কোন ফাসিক ব্যক্তির প্রশংসা করা আরো জঘন্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ .

কোন ফাসিক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা ক্রোধান্বিত হন এবং এতে তাঁর আর্‌শ প্রকম্পিত হয়ে উঠে।[১৪২]

দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি, যে এক ব্যক্তির নিকট তার প্রশংসা করে, অন্যত্র গিয়ে আবার তার বদ্‌নাম করে এবং সম্মুখস্থ ব্যক্তির প্রশংসা করে, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

বলেন : "দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করবে, কিয়ামাতের দিন তার মুখে একটি আগুনের জিহ্বা লাগিয়ে দেওয়া হবে।"[১৪৩]

গ্রন্থপঞ্জি

১. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১১।
২. ইব্ন মাজাহ, পৃ. ২০।
৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫৫৬।
৪. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪১।
৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১১।
৬. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৩।
৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১২।
৮. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৯-২২০।
৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৬।
১০. সীরাতুল মুস্তাফা (ইব্ন হিশাম), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০৬।
১১. মিশকাত, পৃ. ২০৩।
১২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২০৩।
১৩. মিশকাত, পৃ. ২০৬।
১৪. তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২০৪।
১৫. মিশকাত, পৃ. ২০৪-২০৫।
১৬. মিশকাত, পৃ. ২০৩।
১৭. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৩২।
১৮. তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২০৪।
১৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৬।
২০. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৮।
২১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৬।
২২. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৯।
২৩. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৮।
২৪. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৯।
২৫. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৪।
২৬. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৪।
২৭. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৫।
২৮. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৫।
২৯. মা'আরিফুল হাদীস, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩০-১৩৪।
৩০. শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯১
৩১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৮।
৩২. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৮।
৩৩. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৮।
৩৪. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২২০।
৩৫. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২২০।

৩৬. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২২০।
৩৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৬।
৩৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৬।
৩৯. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৬।
৪১. রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ৫১৫।
৪২. রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ৫২০
৪৩. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৯।
৪৪. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৯।
৪৫. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৬।
৪৬. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২০৮।
৪৭. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২০৮।
৪৮. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১০।
৪৯. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১০।
৫০. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২১৩।
৫১. খাসাইলে নববী (সা), পৃ. ৩৪১।
৫২. খাসাইলে নববী (সা), পৃ. ৩৪১।
৫৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২।
৫৪. মিশকাত, পৃ. ৪৩; খাসাইলে নববী (সা), পৃ. ৩৫০।
৫৫. ইসলাম ক্যায়া হ্যায়, মাওলানা মনযূর নুমানী (র), পৃ. ২২১।
৫৬. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৯।
৫৭. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৬৮।
৫৮. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৬৮।
৫৯. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৩।
৬০. আহ্মাদ ও বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৫৬।
৬১. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৮।
৬২. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৫৪।
৬৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪১।
৬৪. মুসনাদে আহ্মাদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩২।
৬৫. আবূ দাঊদ, সূত্র : মিশকাত, ৪৩২-৪৩৩।
৬৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩১।
৬৭. আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত।
৬৮. কাওয়াইদুল ফিক্হ, পৃ. ৩৪১।
৬৯. আবূ দাঊদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২।
৭০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৭৯।
৭১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩১৪।
৭২. মুসলিম শরীফ, সূত্র : রিয়াদুস সালিহীন, পৃ. ২৮২।
৭৩. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩১।
৭৪. তিরমিযী ও আবূ দাঊদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩২।
৭৫. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

৭৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫১৮।
৭৭. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৬৭।
৭৮. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৪।
৭৯. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৩।
৮০. তাবলীগে দীন, ইমাম গাযালী (র), পৃ. ৭-৯।
৮১. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৫।
৮২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৭।
৮৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৭।
৮৪. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৬০৬।
৮৫. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৩৪০।
৮৬. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।
৮৭. আবূ দাঊদ ও তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৩।
৮৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৫১৮।
৮৯. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৭।
৯০. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯১।
৯১. নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬২।
৯২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১২।
৯৩. তিরমিযী ও আবূ দাঊদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৫।
৯৪. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩১।
৯৫. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩১।
৯৬. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩১।
৯৭. আবূ দাঊদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩১।
৯৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৬।
৯৯. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯১।
১০০. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৯৯।
১০১. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩৩।
১০২. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩৩।
১০৩. আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদব; মিথ্যা বলার ভয়াবহতা অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১।
১০৪. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪১২।
১০৫. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৭।
১০৬. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৮।
১০৭. তিরমিযী ও দারিমী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৪১।
১০৮. মুসলিম, সূত্র : সীরাতুন্নবী (সা) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৫।
১০৯. নাসাঈ ও তিরমিযী।
১১০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৫০।
১১১. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৫০।
১১২. আল-মুরশিদুল আমীন : ইমাম গাযালী (র) (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ২০৯।
১১৩ তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৪১।
১১৪. আহ্মাদ ও বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৪১।

১১৫. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫০।
১১৬. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫২।
১১৭. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।
১১৮. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৬৪।
১১৯. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৬৫।
১২০. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৬৫।
১২১. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৬৪।
১২২. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃ. ৯৭০।
১২৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩৩।
১২৪. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩৩।
১২৫. আবূ দাঊদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৪৪।
১২৬. আহ্মাদ ও তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৪৪।
১২৭. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৪৪।
১২৮. আবূ দাঊদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৮।
১২৯. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৭।
১৩০. মুসলিম শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪২৮।
১৩১. আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী (র)।
১৩২. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪৩৪।
১৩৩. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আদাব, পৃ. ৮৯৩।
১৩৪. তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪১৩।
১৩৫. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আদাব, পৃ. ৮৯১।
১৩৬. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আদাব, পৃ. ৮৯১।
১৩৭. বুখারী শরীফ, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ১৪।
১৩৮. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ২৪৮।
১৩৯. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯৫।
১৪০. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯৫।
১৪১. মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪১২।
১৪২. বায়হাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪১৪।
১৪৩. দারিমী, সূত্র : মিশকাত, পৃ. ৪১৩।

ইফা-২০১২-২০১৩-প্র/৯১৫০(উ)-১০,২৫০

দৈনন্দিন জীবনে

ইসলাম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন